মাসিক পত্রিকা

উনবিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড
আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮
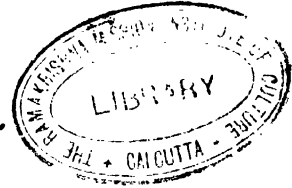
ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

সম্পাদক
শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গশ্রী

ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৫৮

উপন্যাস

কবিতা

নাটক

আমাদের নূতন শোরুম এবং কারখানা
১৬৭ সি, ১৬৭সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
আমাদের পুরাতন শোরুম এবং কারখানা
১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীটের বিপরীত দিকে
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল
এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
ফোন. বি.বি.১৭৬১
গ্রাম ব্রিলিয়্যান্টস
M.B.SIRKAR & SONS
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১/বি. রাসবিহারী এভিনিউ-কলিকাতা
B.B
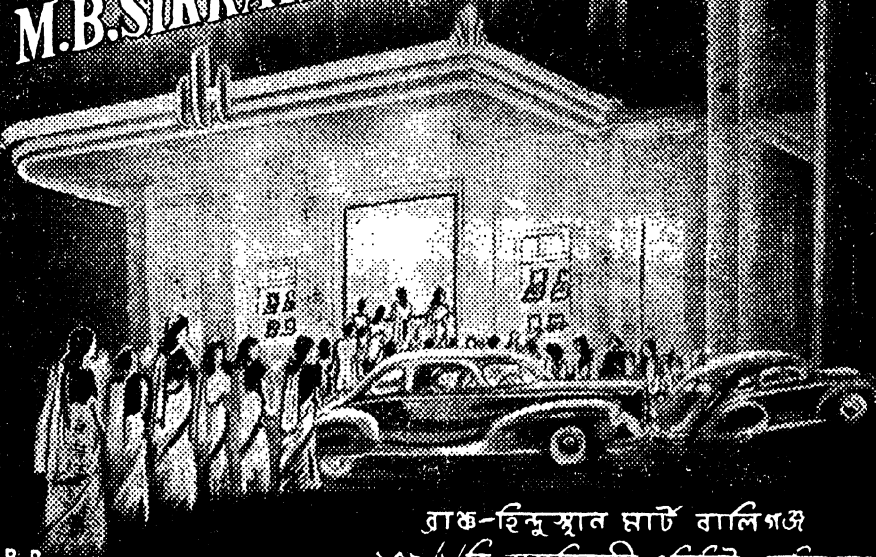
উনবিংশ বর্ষ　　　আষাঢ়—১৩৫৮　　　১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

বঙ্গশ্রী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে বঙ্গের শ্রী পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্"—

বাঙ্গলার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—এই শ্রী—লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামলঅঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভাল-হিমাচল—
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।"

বাঙ্গালা নদীমাতৃক। ইহার মৃত্তিকার স্বভাবজ গুণ উর্ব্বরতা হেতু দেশ শস্যশ্যামল—ফলে ফুলে সুশোভিত; এই প্রাচুর্য্য বাঙ্গালীকে প্রতিভার অনুশীলনে উৎসাহশীল করিয়াছিল।

নদীমাতৃক বাঙ্গালার অধিবাসীরা আত্মরক্ষা-তৎপর ছিল—তাহারা দেশের স্বাধীনতায় আঘাতকারীর সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইত না। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"

"পরাজিলা রঘুরাজ নিজ ভুজবলে
তরীযোগে সমাগত বঙ্গরাজদলে;
নির্ম্মিলা বিজয়স্তম্ভ দ্বীপের উপরে
শতমুখে যথা গঙ্গা পশেন সাগরে।"
(নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ)

ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, কালিদাস বঙ্গীয়দিগের নৌ-যুদ্ধের খ্যাতি অবগত ছিলেন। এই যুদ্ধ-তৎপরতা প্রতাপাদিত্যের সময়েও সপ্রকাশ ছিল।

রঘুর প্রসঙ্গে কালিদাস আর একটি কথা বলিয়াছেন—রঘু বঙ্গীয় রাজগণকে পরাভূত করিয়া আবার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—

"আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম।
ফলৈঃসংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥"

"উন্মুলিয়া শালিধান্য রোপিলে আবার
দেয় যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ—
প্রণমি রঘুর পদে, প্রসাদে তাঁহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য তাঁরে দিলা বহু ধন॥

(নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ)

ইহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, বঙ্গীয় নৃপতিগণকে স্থায়ী বশ্যতাপাশে বদ্ধ রাখা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া রঘু তাঁহাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব প্রতীক লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি দীর্ঘকাল বাঙ্গালার রাজারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনও ছিলেন। সেই স্বাধীনতা মোগল পাঠান মহারাষ্ট্রীয় সকলেরই আক্রমণ রোধ করিতে দ্বিধানুভব করে নাই।

শ্রীসমৃদ্ধজন্য বাঙ্গালা সম্বন্ধে দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—

"আমি যাব বঙ্গে,
আমার কপাল যাবে সঙ্গে।"

অর্থাৎ বাঙ্গলায় কাহারও অভাব হয় সত্য, কিন্তু ভয় হয়—

"অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।"

ঐতিহাসিক কালে পর্য্যটক বার্ণিয়ার ভারত ভ্রমণে আসিয়া বাঙ্গলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট—সে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের কথা।

বার্ণিয়ার বলেন—

যুগে যুগে মিশরকেই পৃথিবীর রম্যতম ও সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়েও বহু লেখক বলেন, আর কোন দেশ মিশরের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। কিন্তু দুই বার বাঙ্গালায় যাইয়া আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশ। বাঙ্গালায় এত চাউল উৎপন্ন হয় যে, বাঙ্গালা কেবল নিকটবর্ত্তীই নহে পরন্তু দূরস্থিত দেশেও চাউল সরবরাহ করে। গঙ্গার পথে চাউল পাটনা পর্য্যন্ত প্রেরিত হয় এবং সমুদ্রপথে মসলীপট্টনে এবং করমণ্ডল কূলে আরও নানা বন্দরে রপ্তানী হয়। বাঙ্গলা হইতে চাউল বিদেশেও প্রেরিত হয়—তাহার মধ্যে সিংহল ও মালদ্বীপ প্রধান। বাঙ্গালায় প্রভূত পরিমাণ শর্করা প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গলা হইতেই গলকণ্ডা ও কর্ণাটক রাজ্যে শর্করা প্রেরিত হয়—সে সকল স্থানে শর্করার উৎপাদন অতি অল্প; কেবল তাহাই নহে—মোকা ও বসোরা হইতে ঐ চিনি আরবে ও মেশপটেমিয়ায় (ইরাকে) এবং বন্দর আব্বাস হইতে পারস্যে প্রেরিত হয়। বাঙ্গলার মিষ্টান্নও প্রসিদ্ধ। * * * বাঙ্গলায় পর্ত্তুগীজরা লেবু ও একরূপ মূল (বোধ হয় শতমূলী) মোরব্বা করিয়া বিক্রয় করে। আর বাঙ্গলার সাধারণ ফল আম ও আনারস ও হরীতকীর ত কথাই নাই

বাঙ্গলায় মিশরের মত গম উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু তাহা যদি ত্রুটি হয়, তবে সেজন্য বাঙ্গলার অধিবাসীরাই দায়ী; কারণ, তাহারা মিশরবাসীদিগের তুলনায় অধিক ভাত ব্যবহার করে—প্রায়ই রুটী খায় না। তবুও দেশের প্রয়োজনানুরূপ গম বাঙ্গলায় উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারা যে স্বল্প মূল্যের কিন্তু উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত হয়, তাহাই ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ ও ডাচ জাহাজের নাবিকদিগকে সরবরাহ করা হইয়া থাকে, সাধারণ লোক ভাতের সহিত যে তিন চারি প্রকার সব্জ ও মাখন ব্যবহার করে, তাহা নাম মাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। টাকায় ২০টি বা ততোহধিক ভাল মুর্গী পাওয়া যায়। হাঁসের মূল্যও অতি অল্প। ছাগ ও মেষ স্বল্পমূল্য ও অনেক আছে এবং শূকর এত অল্পমূল্য যে, যে সকল পর্ত্তুগীজ বাঙ্গলায় বাস করে, তাহারা প্রায় কেবল শূকরের মাংসই খায়। * * * সর্ব্বপ্রকার মৎস্যও ঐরূপ প্রভূত পরিমাণে

টাট্‌কা ও লবনে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক কথায় বাঙ্গালায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ উপকরণই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্যই ডাচদিগের দ্বারা তাহাদিগের উপনিবেশসমূহ হইতে বিতাড়িত বহু খৃষ্টান, বহু পর্ত্তুগিজ ও ফিরিঙ্গী এই উর্ব্বর দেশে আসিয়া বাস করে। জেসুইট ও অগাষ্টিন সম্প্রদায়ের খৃষ্টানরা বড় বড় গির্জ্জা করিয়াছে এবং অবাধে আপনাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। হুগলীতেই ৮।৯ হাজার খৃষ্টান আছে, সমগ্র বাঙ্গলায় তাহাদিগের সংখ্যা ২৫ হাজার হইবে। দেশের অসাধারণ উর্ব্বরতা * * * হেতু পর্টুগিজ, ইংরেজ ও ডাচ সকলের মধ্যে একটি কথা প্রবাদের মত হইয়াছে—বাঙ্গালায় প্রবেশের শত দ্বার মুক্ত, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও নাই।

এইরূপে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা করিয়া বার্ণিয়ার বাঙ্গালীদিগের দ্বারা উৎপন্ন যে সকল পণ্য ব্যবসার্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিদেশী বণিকরা আকৃষ্ট হইত, সে সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

আর কোন দেশে ব্যবসায়ীর লোভনীয় এত প্রকার পণ্য আছে বলিয়া আমার জানা নাই। চিনির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাহা মূল্যবান পণ্য। কিন্তু চিনি ব্যতীত বাঙ্গলায় এত কার্পাস ও রেসমী কাপড় পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালাকে কেবল হিন্দুস্থানের বা মোগল সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যেরই নহে, পরন্তু প্রতিবেশী রাজ্য-সমূহের—এমন কি য়ুরোপেরও কার্পাস ও রেশমী কাপড়ের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরাই বাঙ্গালা হইতে নানাস্থানে—বিশেষ জাপানে ও য়ুরোপে—যে পরিমাণে সর্ব্ববিধ—মোটা ও মিহি—সাদা ও রঙ্গীন কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী করে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরেজ ও পর্টুগিজ ব্যবসায়ীরাও এই পণ্যের ব্যবসা করিয়া থাকে—তাহাদিগের ব্যবসার উপকরণ কাপড়ের পরিমাণও অল্প নহে। রেশম ও সর্ব্ববিধ রেশমী কাপড় সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। লাহোর ও কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের জন্য যেমন নানা বিদেশের জন্যও তেমনই প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে যে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ অনুমান করা দুঃসাধ্য। বাঙ্গালার রেশম পারস্যের, সিরিয়ার, সৈদের ও বেইরুটের রেশমের মত উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহার মূল্য অল্প এবং বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে—সযত্নে বাছিয়া লইলে ও বয়ন করিলে সেই রেশমে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র হইতে পারে। ডাচরা কাসিমবাজারে রেশমের যে কুঠী বসিয়াছে, তাহাতে কখন কখন ৭ বা ৮ শত ভারতীয় নিযুক্ত করে। ঐ স্থানে ইংরেজদিগের ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর কুঠীতেও পরিমাণানুসারে লোক নিয়োগ হয়।

ইহার পরে বার্ণিয়ার বাঙ্গালার (বাঙ্গালা তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় গঠিত ছিল), অন্য কতকগুলি পণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশ বিহারের।

তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন :

বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় যে, সমগ্র দেশে—রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় দিকে অসংখ্য খাল আছে। গঙ্গার জল পৃথিবীর অন্য যে কোন নদীর জলের তুলনায় উৎকৃষ্ট, ইহাই ভারতীয়দিগের বিশ্বাস। সেই জলের জন্য এবং জলপথে পণ্য বহনের জন্য পূর্ব্বকালে লোক অসাধারণ শ্রম করিয়া এই সকল খাল খনন করিয়াছিল। এই সকল খালের দুই কূলে নগরে ও পল্লীগ্রামে বহু হিন্দুর বাস; আর—বিস্তৃত ক্ষেত্রে ধান্যের, ইক্ষুর, দ্বিদলের, তিন ও চারি প্রকার সজীর, সরিষার, তৈলের জন্য তিলের চাষের ক্ষেত্র; রেশমের পোকার আহার্য্যজন্য দুই বা তিন ফিট উচ্চ তুঁত গাছেরও চাষ হয়। বার্ণিয়ারের বঙ্গশ্রী-বর্ণনায় অত্যুক্তির লেশমাত্র নাই।

বাঙ্গলার পণ্যে বাণিজ্য করিতে বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা কিরূপ আগ্রহশীল ছিল, তাহা ইংরেজদিগের বাঙ্গলায় বাণিজ্যের অনুমতি লাভচেষ্টায় বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজদিগের লিখিত সাধারণ ইতিহাসে বলা হইয়াছিল, জাহাজের চিকিৎসক গেব্রিয়েল বৌটন বাদশাহের দুহিতার চিকিৎসা করিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিনা শুল্কে বাঙ্গলায় ইংরেজের বাণিজ্যাধিকারের ছাড় পাইয়াছিলেন;

কিন্তু তিনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর দরবারে গমন করেন নাই। তাহার পূর্ব্বে ইংরেজ বণিকরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করিয়াছিল। সে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে মুসলীপট্টন কুঠী হইতে ৮ জন ইংরেজ কার্টরাইটের নেতৃত্বে দেশীয় নৌকায় যাত্রা করিয়া ২১শে এপ্রিল মোগল সরকারের শুল্কঘাট হরিশপুরে আসিয়া উপনীত হন। নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া কার্টরাইট কয়জন সঙ্গী লইয়া হরিশপুর হইতে কটকে গমন করেন। তখন কটক মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি বাঙ্গালার নবাব নাজিমের অধীনস্থ উড়িষ্যা-শাসকের রাজধানী। তথায় ইংরেজ আগন্তুকরা শাসককেই নবাব মনে করিয়া তাঁহার দরবারে উপনীত হয়েন। "নবাব" স্বীয় পদ উপানৎমুক্ত করিলে কার্টরাইটকে সেই চরণ চুম্বন করিতে হয়। ফলে ৬ই মে ইংরেজরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার ছাড় লাভ করে।

অবশ্য ইংরেজ বণিকদিগের এই ব্যবহারে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কারণ, ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রার রাজা যখন ইংরেজ "পত্নী" পাইলে বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বাণিজ্যাধিকার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের একজন তাঁহার সুন্দরী কন্যাকে রাজার ভোগার্থ দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে কার্য্য খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। রাজার অন্য পত্নীরা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশিত হইলে পিতা সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও অসম্মত হয়েন নাই।

বার্ণিয়ার বাঙ্গলায় যে বহুসংখ্যক খালের উল্লেখ করিয়াছেন সে সকল যে বাঙ্গার শ্রী বর্দ্ধিত করিবার সহায় ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছেন, এই সকল খালের কথায় তাঁহার ভগীরথের গঙ্গানয়নের কথা মনে পড়িয়াছিল। এই সকল খালে গঙ্গার উর্ব্বরতাপ্রদানকারী রক্তাভ জল বর্ষার জলের সহিত মিলিয়া ভূমি উর্ব্বর করিত। যাহারা এই সকল খাল খনন করিয়াছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"They lived in spacious days and designed like Titans."

আজ অযত্নে, অনাদরে, অজ্ঞতায় সেই সকল খাল "মজিয়া" গিয়াছে; তাই বাঙ্গলার আর সে শ্রী নাই, তাহার ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়াছে, ও হইতেছে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও পূর্ব্ববৎ নাই।

গঙ্গার জলের উর্ব্বরতা শক্তি ও পাবনী শক্তি অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রোগজীবাণু গঙ্গার জলে পতিত হইলে দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। গলিত শবের পার্শ্বেও জীবাণু গঙ্গার জলে গতায়ু হয়।

এই জলের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার উপকরণও অসাধারণ। সেই জন্য বাঙ্গলার লোক গঙ্গার জল আনিবার জন্য আগ্রহশীল ছিল—তাহারা খাল কাটিয়া সমগ্র প্রদেশ উর্ব্বর ও স্নিগ্ধ করিত।

বাঙ্গালী সেই কারণে অভাব হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

এই অবস্থা লোপ পাইতেও দীর্ঘকাল গিয়াছিল। কারণ, খালগুলি ক্রমে নদীতে পরিণত হইয়াছিল এবং সেগুলি নষ্ট হওয়া সময়সাধ্য। প্রদেশের জল কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় তাহা বিবেচনা না করিয়া রাজপথ নির্ম্মাণ, খালে জল নিকাশের জন্য সেতুর সংখ্যাল্পতা, রেলের জন্য সেতু নির্ম্মাণে নদীর গতি বিবেচনা না করা, রেলপথ রক্ষার জন্য বাঁধ রচনা—এইরূপ নানা কারণে ক্রমে নদী বা খাল নষ্ট হইয়াছে—সে সকলের আবশ্যক সংস্কারও হয় নাই। প্রজারা স্বাবলম্বনের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছে—"পথকর" দিয়া আপনাদিগের কার্য্যভার জিলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিয়াছে।

যখন ইংরেজের শাসনকালে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন, তখন তিনি গ্রামের সমৃদ্ধ গৃহস্থ গোলোকচন্দ্র বসুর মুখে গ্রামের বর্ণনা শুনাইয়াছিলেন—

"বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি সুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমীজমা ক'রে গিয়েছেন, তাতে কখন পরের চাকরী স্বীকার কর্ত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়,

অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়। যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু! আমার সোনার স্বরপুর, কিছুই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?"

গ্রামের মোড়লের বাড়ীর বর্ণনা—

"বেলায় ৬০ খানা পাত পড়তো, ১০ খানা লাঙ্গল ছিল, দামড়া ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড় দৌড়ের মাঠ। আহা! যখন আশধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়।"

'নীলদর্পণ' ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রচারিত হয় এবং তাহা লইয়া সমগ্র প্রদেশে তুমুল বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। তখনও বাঙ্গালার শ্রী কিরূপ ছিল, তাহা গোলোকচন্দ্র বসুর উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়।

সেই শ্রী নানা কারণে নষ্ট হইয়াছে। নীলকররা বাঙ্গলায় নীলের চাষে প্রজার উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাই 'নীলদর্পণে' ব্যক্ত হয়। বাঙ্গলার প্রজা ইংরেজ নীলকরের সে অত্যাচার সহ্য করে নাই—বিদ্রোহী হইয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই বহু দিন পরে গান্ধীজীর দ্বারা অনুসৃত হয় এবং অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধ নামে পরিচিত। বাঙ্গলায় য়ুরোপীয় নীলকররা যে নীল উৎপন্ন করিত, তাহা সমগ্র ভারতে উৎপন্ন নীলের শতকরা ৩৮ ভাগ। বাঙ্গলা ব্যতীত যুক্ত প্রদেশে (তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বলিয়া পরিচিত) শতকরা ২০ ভাগের অধিক ও বিহারে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ উৎপন্ন হইত। বিহারের পাটনা, সাহাবাদ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ছাপরা ও ত্রিহুতে নীলের চাষ হইত। বাঙ্গলার যে সকল জিলার প্রজারা বিদ্রোহী হয়, সে সকলের নাম—

জিলা	উৎপন্ন নীল (মণ)
রাজসাহী	৩,৫১২ ,,
মালদহ	২,৭৭৭ ,,
মুর্শিদাবাদ	৪,৯১২ ,,
নদীয়া	৮,০১৩ ,,
যশোহর	৮,৬৩৫ ,,
ফরিদপুর	১,৪৮৮ ,,
মোট	২৯,৩৪৭ মণ

য়ুরোপীয় নীলকররা কিরূপ বিলাসে বাস করিত, তাহার পরিচয় আমরা কোল্‌সওয়ার্দ্দী গ্রাণ্টের পুস্তকে পাই।

নীলকররা নীলের চাষের জন্য বহু উর্ব্বর জমী অধিকার করিত।

তাহার পরে পাটের কথা। পাট বাঙ্গলার প্রধান রপ্তানী পণ্যের অন্যতম। বিদেশের পণ্যের উপকরণ-রূপে পাটের ব্যবহার যত বর্দ্ধিত হইয়াছে, ততই পাট চাষের জন্য ধান্যের চাষের জমী কমিয়াছে। ফলে পাটের চাষ প্রভৃতিতে খাদ্যশস্য—বিশেষ ধান্যের চাষ কমিয়াছে এবং বার্নিয়ারের সময়ে যে বাঙ্গালা "দেশ—বিদেশে বিতরিছ অন্ন" ছিল—যে বাঙ্গালা হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী হইত, সেই বাঙ্গালা চাউলের জন্য ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে এবং যে বাঙ্গালায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে আর লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সেই বাঙ্গালায় গত যুদ্ধের সময় যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক অন্নাভাবে বাঙ্গালার ঘাটে, বাটে, মাঠে—প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

বাঙ্গালার শ্রী কিরূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহা ইহাতে বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা হইতে যত কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র রপ্তানী হইত, তাহার উল্লেখও বার্নিয়ার করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থসর্ব্বস্ব ব্যবস্থায়—বৃটেনের শিল্পের উন্নতি-সাধন জন্য এ দেশের কাপড়ের শিল্প (কার্পাস ও রেশমী) নষ্ট করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলসন বলিয়াছেন—ভারতবর্ষ যখন বিদেশীর অধীন হয়, তখন বিদেশী শাসক অসঙ্গত উপায়ের বাহু বিস্তার

করিয়া ভারতীয় বয়ন শিল্প, শ্বাসরোধ করিয়া, নষ্ট করিয়াছিল—ন্যায়সঙ্গত উপায় থাকিলে ভারতের শিল্প নষ্ট হইত না—বৃটেনের কাপড়ের কল কখন ভারতের হাতের তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিত না। এই শিল্পনাশ বাঙ্গালাতেই প্রথমে প্রবল হয়; কারণ, বাঙ্গালা প্রথমে ইংরেজের শাসনাধীন হয় এবং বাঙ্গালার শিল্পজপণ্যের খ্যাতি সমধিক ছিল।

আজ কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাসের ফলে বাঙ্গালায় তুলার চাষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যদিও বাঙ্গালায়—বাঙ্গালার বাহির হইতেও অনেক তুলা আমদানী হইত, তথাপি বাঙ্গলায়ও তাহার চাষ ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্লাণ্ডার্স ও ডেনমার্কের পথে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) তুলা পৌঁছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গভর্নর-জেনারলকে পরীক্ষার্থ ৫ লক্ষ পাউণ্ড তুলা পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেন। ফলে কোথায় কিরূপ তুলা উৎপন্ন হয়, ভারতে ইংরেজ সরকার সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে হিসাব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করেন, তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গালা প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় নিম্নলিখিত পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত—

জিলা	উৎপন্ন তুলা (পাউণ্ডে)
বীরভূম	৭৪০,০০০
বিষ্ণুপুর	৭৪০,০০০
বর্দ্ধমান	৩,৭০৮,০০০
যশোহর	৪৬৪,০০০
মুর্শিদাবাদ	৬,০০০
নদীয়া	২২০,০০০
রংপুর	২৬,৭৫০
ত্রিপুরা	৮০০,০০০
মেদিনীপুর	৬৮,৯৬০
শান্তিপুর	১০৮,০০০
চট্টগ্রাম	৪৯,০০০
মালদহ	১৩২,০০০
ঢাকা	৩৬৪,০০০

ঢাকায় যে তুলার চাষ হইত, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়, এবং তাহা হইতে যে সূতা প্রস্তুত করা হইত, তাহাই ঢাকাই মসলিন বয়নের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বাঙ্গালার জমি কার্পাস চাষের উপযোগী নহে, এমন মনে করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বাঙ্গলায় সরকারের বোটানিক্যাল গার্ডেন থাকিলেও তথায় এই চাষের আবশ্যক পরীক্ষা করা হয় নাই। এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটী যে কাজ করিয়াছিলেন, সরকার সোসাইটীকে কিছু অর্থ-সাহায্য দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে আখড়া নামক স্থানে সোসাইটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া এই চাষ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই কৃষিক্ষেত্রে আপল্যাণ্ড জিয়র্জিয়ান তুলার গাছ সতেজই দেখা গিয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ফোর্ট গ্লষ্টর কাপড়ের কলের পরিদর্শক প্যাট্রিক আখড়ায় উৎপন্ন তুলা ও সেই তুলায় প্রস্তুত সূত্রের একখানি ১০ গজ কাপড় দর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সেই সঙ্গে পত্রে লিখিয়াছিলেন —

"This cotton I have carefully watched through the various stages of cleaning, carding, roving, spinning etc. and have no hesitation in characterising it as equal to the very best Upland Georgian cotton. The staple is fully as long, and I could say, stronger and better for mule spinning than any I have imported from America."

এইরূপ মতের পরেও কি কারণে এই পরীক্ষা ত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গালা যে নানারূপ ফলের গাছের উপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য। এক মুর্শিদাবাদে যত প্রকার উৎকৃষ্ট আম্রবৃক্ষ হয়, তত আর কোথাও হয় না। কলিকাতার দাক্ষণে লিচু, পীচ, জামরুল, গোলাপজাম, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ভাল জন্মে। কেহ কেহ বলেন, এই সকলের কতকগুলি চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বঙ্গাধিপ রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় ঐ অঞ্চলে আসিয়া বাসকালে আনাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় ধান্যও নানাপ্রকার।

বাঙ্গালার শ্রী প্রাকৃতিক দানে সমৃদ্ধ—কারণ, বাঙ্গালা সুজলা এবং বাঙ্গালার লোক জলের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে দ্বিধানুভব করিত না। বাঙ্গালায় পুষ্করিণী খনন পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত—জলে পান ও সেচ হইত। কোন কোন বিদেশী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন —পুষ্করিণীর জলে কিরূপে সেচের কায করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইলে পৃথিবীর লোককে বিষ্ণুপুরে যাইতে হইবে। বাঙ্গালী পুষ্করিণীতে ও বাঁধে জল সঞ্চয় করিয়া কৃষিকার্য্যে তাহা প্রয়োগে কিরূপ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল, বিষ্ণুপুরে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি অতি সহজ—ছড়ার মত সূত্রে রচনা করিয়া জটিল অঙ্কের বিষয় বুঝাইয়া গিয়াছেন, সেই শুভঙ্কর জমীর নিম্নগতা হিসাব করিয়া বর্ষাকালে যে জল গড়াইয়া যায় তাহা পুষ্করিণী ও বাঁধে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—জলের পরিমাণ অনুসারে জমাতে সেচের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এক দিকে খাল কাটিয়া গঙ্গার জল লইয়া ভূমি সরস ও উর্ব্বর করা, আর এক দিকে পুষ্করিণী খনন ও বাঁধ রচনা করিয়া জলে সেচের ব্যবস্থা করা—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়, নলকূপ বসাইয়া সেচের কায করা হইবে। নলকূপের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তাহার অনেকগুলি অসুবিধাও আছে—

(১) সকল স্থানে ভূমি নলকূপের স্থায়িত্বের উপযোগী নহে।

(২) নলকূপ একবার নষ্ট হইলে, তাহার সংস্কার সহজে হয় না এবং সংস্কার ব্যয়সাধ্য—সকল স্থানে সংস্কার করিবার লোকও পাওয়া যায় না।

(৩) কুমারাপ্পা বলিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে নলকূপের জন্য লোক চাষ করিতে পারিতেছে না। এই উক্তি প্রথমে বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য। যে স্থানে কোন ধনীলোক বা প্রতিষ্ঠান গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জল উত্তোলনের ব্যবস্থা করায় নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অগভীর নলকূপে আর জল পাওয়া যায় না—এমন কি সাধারণ কূপ বা ইন্দারায়ও জল শুকাইয়া যায়। ভূমির নিম্ন স্তরের জল যত পাওয়া যায়, তত উপরের স্তরের জল নামিয়া যায়। ইহাতে হয়—"গুণ হৈয়া দোষ"।

(৪) নলকূপের জলে সেচের কার্য্য করিতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্তিতে কল বসান প্রয়োজন হয় এবং সে জন্য ব্যয়সাধ্য কল (মোটর) ব্যবহার করিতে হয়। কলের মধ্যে মধ্যে সংস্কার প্রয়োজন হয় এবং কল একবার অচল হইলে সেচের কাযও বন্ধ হইয়া যায়।

পুষ্করিণীতে ও বাঁধে এ সকল অসুবিধা থাকে না। আবার পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ হওয়ায় খাদ্যোপকরণ সহজলভ্য হয়। মৎস্যের চাষের জন্য আমেরিকার সরকার "ডিম" সংগ্রহ করিয়া তাহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফুটাইয়া "পোনা" করিয়া—সেগুলি মানুষের অঙ্গুলীর মত বড় হইলে নদীতে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় পুষ্করিণীতে ও বাঁধে লোক সযত্নে মৎস্যের চাষ করিত —জলায়ও প্রভূত পরিমাণ মৎস্য জন্মিত।

কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালাকে বলিয়াছেন—"রত্নপ্রসূ বাঙ্গালার সুবা"। বাঙ্গালার অবস্থা তাহাই ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব-নাজিম হইয়াছিলেন। তিনি মশনদে বসিয়া পুণ্যাহের পরে ২ শত গোযানে এক কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিল্লীতে বাদসাহের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তোষাখানা'র দারোগা তাহা দিতে গিয়াছিলেন এবং ৩ শত আরোহী ও ৫ শত পদাতিক সৈনিক তাহা রক্ষার জন্য সঙ্গে গিয়াছিল। জায়গীরের ও খাসনবিশীর আয় স্বতন্ত্রভাবে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সম্রাটের জন্য উপহার হস্তী, অশ্ব, সূক্ষ্মবস্ত্র প্রভৃতিও ছিল।

এইরূপে বাঙ্গালার অর্থ দিল্লীতে গিয়াছে। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"যেদিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না; দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন

আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ত তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুম্মা মস্‌জিদ, সেকন্দরা, ফতেপুর সিক্রী বা বৈজয়ন্তুতুল্য শাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে, নাদের শাহা বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে, সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরাণ তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।"

দিল্লীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইলে চতুর মুর্শিদকুলী খাঁন কতকটা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন—দিল্লীর প্রাপ্য রাজস্ব আর নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিতেন না। সেই জন্য মুর্শিদাবাদে নবাবের সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রার চৌথ আদায় করিবার পরেও যে অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাহা দেখিয়া ক্লাইব বিস্মিত হইয়াছিলেন—তিনি তাঁহার অংশের অর্থ ও স্বর্ণরৌপ্য যে সিন্দুকে লইয়া গিয়াছিলেন—বিলাতে তাঁহার শয়নকক্ষের নিকটে তাহা দেখিয়া তাঁহার ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—পাপের সেই নিদর্শন নিকটে রাখিয়া তিনি কিরূপে সুনিদ্রা লাভ করেন?

মোগলের পূর্ব্বে পাঠানরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। তাহারা প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করে নাই। পাঠানদিগের সময়ে বাঙ্গালীরাই বাঙ্গালা শাসন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা, বীরভূমের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা যেমন—তেমনই ওদিকে বারভূঁইঞা। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, বাঙ্গালার জমীদাররা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১,১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিতেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ ইহাতেই অনুমান করা যায়।

"হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিবেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন।"

সিরাজদ্দৌলার শাসনকালেও মুর্শিদাবাদ এত অট্টালিকায় শোভিত ছিল যে, এক অট্টালিকার ছাত হইতে অপর অট্টালিকার ছাতে যাওয়া যাইত।

এই বাঙ্গালায় দারিদ্র্য দুঃখ ছিল না।

ক্ষতিপূরণ

সুরুচি সেনগুপ্তা

চারদিকেই একটা বিস্ময়ের ছায়াপাত হয়। এ এক রহস্য! আত্মীয় কুটুম্ব আর পরিচিত বন্ধু মহলে কিছুদিন পর্য্যন্ত শুধু অতন্দ্র আর নিশীথিনীর বিয়ের কথা নিয়েই আলোচনা চলে। ধনী পিতার সুন্দরী, সুশিক্ষিতা মেয়ে নিশীথিনী। ইয়োরোপের উচ্চ ডিগ্রী আয়ত্ত করা ছাড়াও সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এমন কি খেলাধূলাতেও তার প্রচুর খ্যাতি আছে। সেই মেয়ের বিয়ে হ'ল কিনা বিপত্নীক অতন্দ্রের সঙ্গে! রূপ আর এম, এ ডিগ্রী ছাড়া তার আছে আছে কি? সাধারণ চাক্‌রী ক'রে কোনো মতে সংসার চালায় সে। না আছে গাড়ী, বাড়ী, না আছে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স! তা ছাড়া বোঝার উপর শাকের আঁটির মত তিনটি সপত্নী-সন্তান বর্ত্তমান! এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থেকে শেষে এমন বিবাহে কি করে নিশীথিনীর প্রবৃত্তি হল, সে কথা কেউ ভেবে পায় না।

আট বছর আগের ফেলে আসা এক সন্ধ্যার ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, সেদিন একটি বর্ষাকালের সজল সন্ধ্যা। বিচ্ছিন্ন কাজলরেখার মত কৃষ্ণ মেঘের সারি আকাশের চারদিকে ব্যূহ রচনা ক'রে সংগ্রামের জন্য গর্জ্জন সুরু করেছে। সেই আসন্ন বর্ষণ উপেক্ষা ক'রে নদীর পাড়ে বসেছিল অতন্দ্র আর নিশীথিনী। বর্ষার আকাশের মত তাদের মুখও অন্ধকার, কণ্ঠে অশ্রুর আভাষ!

নিশীথিনী বলে, 'আমার বাবার টাকা আছে, এই কি আমার অপরাধ? এই অপরাধে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে?'

তার একখানা হাত গভীর ভাবে নিপীড়ন ক'রে অতন্দ্র বলে, 'তোমাকে পরিত্যাগ ক'রছি একথা কেন ভাবছ নিশা? তোমাকে বড় ভালোবাসি বলেই দুঃখের মধ্যে টেনে আন্‌তে ভয় পাই। আমাদের এই ভালোবাসা যদি সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ভেঙ্গে পড়ে, সে যে আমাদের দু'জনেরই অসহ্য হবে নিশা!'

অতন্দ্রের যুক্ত করতল থেকে নিশীথিনী তার হাতখানা মুক্ত ক'রে আনে: 'দাম্পত্য জীবন মাত্রেই তো এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই তো মানুষের পথ চল্‌তে হয়। তবে তুমি এত ভয় পাও কেন?'

—'তোমাকে পাওয়া আমার পরম পাওয়া নিশা, তাই আমার এত ভয়। তোমাকে লাভ কর্‌বার কোনো যোগ্যতাই যে আমার নেই নিশা! আমার আর্থিক অবস্থা তুমি জানো। গ্রামের বাড়ীতে রুগ্না মা মৃত্যু-শয্যায়, তাঁকে কল্‌কাতায় এনে চিকিৎসা করাবো তেমন আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আমার স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য হবে গ্রামে গিয়ে তাঁর সেবা করা। তোমার কর্ত্তব্যে তুমি কখনো অবহেলা করবে না, সে তো আমি জানি। গ্রামে থাকা তোমার অভ্যেস নেই, গণ্ডগ্রামে সেই অস্বচ্ছল সংসারে গিয়ে শয্যাগত রোগীর সেবা করা যে কত কষ্ট, সে কথা তুমি এখন বুঝবে না। জেনে শুনে এত কষ্ট আর অসুবিধের মধ্যে কেমন ক'রে তোমাকে টেনে আন্‌ব নিশা!'

সজল আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নিশা বলে, 'এই কষ্ট আর অসুবিধেকেই তুমি এত বড় ক'রে দেখছ? যথার্থ প্রেমের কাছে এ সব কি নেহাৎই তুচ্ছ নয়?'

—'জগৎটা বড় কঠিন বাস্তবে গড়া নিশা! সেই বাস্তবের সম্মুখীন হ'লে আমাদের ভালোবাসায় ফাটল্ ধর্‌বে বলেই আমার বিশ্বাস।'

—'আমার সঙ্গে তখন তোমার প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল, তখন তোমার দীনতা সম্বন্ধে তো তোমার নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আমার বাবা যে ধনী, আমি যে সুখে লালিতা-পালিতা, এ-ও তুমি জান্‌তে। আমার উচ্চ স্তরের গুণাবলী সম্বন্ধেও তুমি অজ্ঞ ছিলে না। তবে

আমাদের সেই পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেওয়া উচিত হয়নি তোমার।'

—'নিশ্চয় সেটা আমার অনুচিত হ'য়েছে। কিন্তু তোমাকে দেখেই এত ভালো লেগেছিল যে নিজেকে সংযত করার সাধ্য আমার ছিল না।'

-'আর এখন বুঝি নিজেকে সংযত ক'রবার প্রচুর ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রেছ?'

—'তোমাকে পাওয়ার প্রলোভন থেকে নিজেকে সংযত করা যে কত কঠিন, সে কথা জানেন অন্তর্য্যামী। তোমাকে ভালোবাসি বলেই দৈন্য দুর্দ্দশার মধ্যে টেনে আনতে আমার বড় ক্লেশ হয় নিশা! আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমার বাবা তোমাকে পরিত্যাগ করবেন একথা তুমি নিজেই বিশ্বাস কর, তখন তুমি কি অভাবের এত দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারবে?'

—'এ তো নতুন নয়, ভালোবাসার জন্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত তো জগতে কম নেই।'

—'সব জানি নিশা, তবু ভয় হয়, অভাবের উত্তাপে যদি তোমার কোমল মন শুষ্ক হ'য়ে ওঠে, সে আমি সইব কেমন করে?'

—'তবে এখন কি করবে?'

—'আমার মনে হয় আমাদের দু'জনেরই আরো কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিত। তোমাকে লাভ করবার জন্য আমার এখনো কঠোর তপস্যার প্রয়োজন আছে।'

এর পর কিছুদিন চ'লে গেছে; নিশিথিনীর সঙ্গে অতন্দ্রের আর দেখা হয় নি। তার পরেই সংবাদ পত্রের মারফৎ সে সংবাদ পায় যে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য নিশীথিনী ইয়োরোপ যাত্রা ক'রেছে! যে অভিমান আর বেদনায় সে দেশ ছেড়ে চলে গেল, গভীর ভাবে সেটা সে নিজের বুকে অনুভব করে। একবার দেখা হলে তার সে অভিমান দূর করতে, সে বেদনা মুছে ফেলতে তার তো এক মুহূর্ত্তও লাগ্‌ত না। কিন্তু বিশাল বারিধি দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে! সে ব্যবধান দূর করবার ক্ষমতা তো তার নেই! মৃত্যুশয্যাশায়িনী মায়ের সে একমাত্র সন্তান, সে দরিদ্র, তাই সমুদ্রের ওপারের নাগাল পায় না সে। বিদীর্ণ বক্ষভেদ ক'রে বার বার শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

শনিবার রাত্রে বাড়ী গিয়ে সোমবার সকালে ক'লকাতায় ফিরে আসে অতন্দ্র। একজন পরিচারিকার উপর মায়ের শুশ্রূষার ভার আছে। গ্রাম সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনও দেখা শোনা করেন। কিন্তু তবুও মায়ের অযত্ন হয়। নিরবচ্ছিন্ন সেবাকার্য্যে অপারগ হয়ে পরিচারিকাও বার বার আপত্তি জানায়। গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ বয়স্থা একটী মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য অতন্দ্রকে পীড়াপীড়ি করে। মায়ের এই সময়ে যদি বউ এসে সেবা না করে তবে লোকে সন্তান কামনা করে কেন? এসব অনুরোধে কর্ণপাত না করলেও মায়ের সেবার জন্য যথার্থ দরদী একজন আত্মীয়ার প্রয়োজন এ কথা বুঝে অতন্দ্র ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনেক চিন্তার পর অবশেষে মায়ের দূর সম্পর্কীয়া অষ্টাদশ বর্ষীয়া বোনঝি কুন্তীকে নিয়ে আসে সে মায়ের সেবার জন্য। কুন্তী মেয়েটি ভালো, সুন্দরী না হ'লেও যৌবন লাবণ্যে টল টল ঢল ঢল করে। গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে, কাজেই সরমে সংকোচে সর্ব্বদাই অবনত। সে এসে পরম আগ্রহে মায়ের সেবার ভার গ্রহণ করে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অতন্দ্র।

সেবার গুণেই বুঝি মা একটু ভালো হয়ে ওঠেন। কিন্তু আশু মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকলেও জীবনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার আশা ছিল না। যে কদিন বাঁচবেন, এমনি শয্যা-আশ্রয় করে ধুঁকে ধুঁকেই তাঁকে বাঁচতে হবে। তাই নিরুপায় আগ্রহে তিনি কুন্তীকে আঁকড়ে ধরেন।

মা এখন বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসেন, শীর্ণ হাত দিয়ে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'পরের মেয়েকে আমি আর কদিন আটকে রাখব বাবা? অথচ এ পোড়া দেহ থেকে প্রাণ তো বার হ'তে চায় না। ওর মা-ও ওকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। তুই একবার বল্‌ বাবা, ওকে আমি ঘরের লক্ষ্মী ক'রে ঘরে নিয়ে আসি।'

অসম্ভব চম্‌কে ওঠে অতন্দ্র, এ সম্ভাবনা যে মায়ের মনে আসতে পারে, এ তো সে একবারও ভাবে নি!

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলে, 'না, না, মা, সে হয় না; বিয়ে আমি করব না, তুমি আমাকে সে অনুরোধ কোরো না।'

'কেনরে, বিয়ে করবি নে কেন, সেই বিয়ে করবি একদিন, কিন্তু তখন আমি থাকব না! কুন্তী চলে গেলে বিছানায় পড়ে আমি পচে হেজে মরব।'

—'কেন মা, কুন্তীর কি না গেলেই নয়? ওর মা তো খুব গরীব, মেয়েটি আমাদের এখানে খেয়ে পরে আছে, নিয়ে যেতেই বা তিনি চান কেন?'

—'বয়স্থা মেয়েকে এভাবে পরের সংসারে ফেলে রেখেছে বলে লোকে বড় নিন্দে করছে। গরীব হ'লেও সকলেরই একটা মান সম্মান আছে তো'! সেই-বা বেশীদিন এখানে থাকবে কি আশায়, আমিই বা রাখতে চাইব কিসের অধিকারে? আর ওর এই সেবার ঋণ তো আমি শুধতে পারব না, সে ঋণ নিয়েই আমাকে মরতে হবে।'

দু'হাতে মায়ের শীর্ণ দেহ জড়িয়ে ধরে অতন্দ্র বলে, 'তোমার ঋণ আমি রাখব না মা! তুমি চলে গেলে সংসারে আমি একা, তখন আমি টাকা পয়সা খরচ করে সুপাত্র দেখে ওর বিয়ে দিতে পারব।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

রাত্রে খেতে বসে প্রদীপের আলোকে অতন্দ্র চকিতে কুন্তীর আনত মুখের দিকে একবার তাকায়। তার অধরের স্বাভাবিক মিষ্টি হাসিটি আজ ম্লান। মনে হয় চোখের কোণে এখনো এক ফোঁটা জল লেগে আছে। অতন্দ্রের মন মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মা আজ যে প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে কি কুন্তীর সমর্থন আছে? সে-ও কি তেমনি কিছু প্রত্যাশা করে? আশা ভঙ্গেই কি আজ তার চোখে ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এসেছে? সে কোমল স্বরে বলে, 'বাঃ কি চমৎকার তুমি রেঁধেছ কুন্তি, এত ভালো রাঁধতে শিখলে কার কাছে?'

—'মা শিখিয়েছেন।'

—'মার জন্য তোমাকে রাতদিন খাটতে হয়, আবার আমার জন্য এত রেঁধেছ কেন?'

—'সারা সপ্তাহ মেসে খেতে আপনার কত কষ্ট হয়, দু' একদিনের জন্য বাড়ী আসেন—'

—'কিন্তু তোমার এই সব রান্না খেয়ে আমার অভ্যেস বদলে যাচ্ছে, এর পর মেসের খাওয়া আর রুচবে না দেখছি।'

পান সেজে এনে কুন্তী তার হাতে দেয়। এই মমতাময়ী নারীর নিঃসঙ্গ সেবার প্রতিদান দেওয়া তো তার সাধ্য নেই,—

সহসা অতন্দ্রের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

শীতের প্রারম্ভেই মায়ের অসুখ বেড়ে ওঠে। কিছু দিনের ছুটি নিয়ে অতন্দ্র তাঁর কাছে চ'লে আসে। মায়ের সেই প্রস্তাবনার পর থেকে কুন্তীর সান্নিধ্য থেকে সে দূরে থাক্‌তে চায়, কিন্তু এখন দু'জনেরই সমবেতভাবে রাতদিন মার কাছে থেকে সেবা ক'র্‌তে হয় ব'লে সময় সময় সে বড় কুণ্ঠা বোধ করে। মায়ের শেষ দিন এগিয়ে আসে ধাপে ধাপে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্থিরতাও বাড়ে, 'আমাকে কথা দে অতন্, কুন্তীকে তুই দুঃখু দিবি নে? বল্ ওকে তুই ঘরের লক্ষ্মী ক'রে ঘরে রাখ্‌বি? ওর হাতে তোকে না দিয়ে গেলে যে আমি নিশ্চিন্ত মনে চোখ্ বুজ্‌তে পার্‌ব না রে? ওর কাছে আমার যত ঋণ হ'য়েছে, সে তো টাকায় শোধ হয় না! তা' ছাড়া ওর মনটার দিকেও তুই একটু চাইবি নে? আমার কথা রাখ্ অতন্, আমার নিঃশ্বাসটুকু থাক্‌তে থাক্‌তে ওকে তুই বিয়ে কর বাবা! আমি শান্তিতে চোখ্ বুজি।' আত্মীয় স্বজন যাঁরা কাছে থাকেন, তাঁরাও অতন্দ্রকে পীড়াপীড়ি করেন, মায়ের মৃত্যুকালে যে ছেলে তাঁকে মর্ম্মপীড়া দেয় সে কুপুত্র ইত্যাদি নানা উপদেশে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে তোলে। অবশেষে একদিন গোধূলি লগ্নে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অতন্দ্র কুন্তীকে বিবাহ করে।

তার কয়েক দিন পরেই মা হাসিমুখে মহাযাত্রা করেন।

দুই

তারপর চ'লে গেছে অনেকদিন। অন্তরের একান্তে যত বেদনাই সঞ্চিত থাকুক না কেন, কুন্তীকে নিয়ে সংসার গ'ড়ে উঠেছে অতন্দ্রের। যে নারী তার তিনটি ছেলেমেয়ের জননী, আর সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, সে যে তার

অন্তরও খানিকটে জয় ক'রে নেবে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

ছোট ছেলেটির বয়স যখন ছ'মাস, তখন হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে কুন্তী তার সাধের সংসার ফেলে চ'লে যায়। প্রিয় বিচ্ছেদের আঘাত ছাড়াও শিশু সন্তান ক'টিকে নিয়েই অতন্দ্র বেশী বিপদে পড়ল। মা তার যে সংসার বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চোখ্ বুজেছিলেন, সে সংসার ভেঙ্গে দিলেন ভগবান।

দিন কারো ব'সে থাকে না, অতন্দ্রেরও থাক্‌ল না। মাতৃহারা ছেলেমেয়ে তিনটি কোনোমতে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। ছোট ছেলে বেণুর যখন দেড় বৎসর বয়স, তখন একদিন দুপুর বেলা ঝিয়ের চোখ্ এড়িয়ে সে রাস্তায় নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ী এসে প'ড়ল তার উপরে।

চারদিকে একটা 'হায়' 'হায়' শব্দ উঠ্‌ল, থেমে গেল গাড়ীখানা। গাড়ী ড্রাইভ ক'রছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা; ব্যস্ত হ'য়ে নেমে এলেন তিনি। এক মুহূর্ত্তে আহত রক্তাক্ত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে গাড়ীতে উঠে ব'স্‌লেন। মুখ বাড়িয়ে সমবেত জনতাকে নিজের গাড়ীর নম্বর জানিয়ে হস্‌পিটালের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিলেন।

খবর গেল অতন্দ্রের অফিসে। ধনীর এই উদ্ধত গতি-বিধিকে খর্ব্ব ক'রতে হবে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে সে ছুটে আসে হস্‌পিটালে।

একখানা কেবিনে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা বেণু শুয়ে আছে, একজন নার্স ঘরের ভিতর চলাফেরা করছে, আর দৃষ্টিতে গভীর উদ্বেগ নিয়ে যে মহিলাটি শিয়রে ব'সে আছেন, তার দিকে এক পলক চেয়েই অতন্দ্র একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। মহিলাটিও বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়ালেন।

—'নিশীথিনী তুমি ? কবে এলে তুমি বিলেত থেকে' ? বলেই আহত ছেলের দিকে তাকিয়ে সে তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—

—'বেণু বাপ আমার !'

রুদ্ধশ্বাসে নিশীথিনী বলে, 'এ ছেলে কি তোমার অতন্দ্র !'

—'হ্যাঁ, আমার মাতৃহীন শিশু। ধনীর স্পর্দ্ধিত গাড়ীর চাকায় আজ সে প্রাণ হারাতে ব'সেছে। টাকা থাক্‌লেই লোকে হৃদয়হীন পাষাণে পরিণত হয়—তাকে একবার পেলে—'

—'বল বল, থাম্‌লে কেন অতন্দ্র, ধনীকে তো তুমি চিরদিনই কৃপার চোখে দেখেছ, আজ তো নতুন নয়। কিন্তু আজ যে তোমার এত বড় ক্ষতি ক'রেছে তাকে তুমি ক্ষমা কোরো না। সে তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে, যে শাস্তি হয়, দাও—মুষ্টিবদ্ধ করতল শিথিল হ'য়ে পড়ে অতন্দ্রের, নয়নের রোষ-বহ্নি নিভে গিয়ে বিস্ময়ে ঝক্ ঝক্ করে।

—'তুমি ! তুমিই আমার ছেলেকে চাপা দিয়েছ নিশা !

—'হাঁ অতন্দ্র, আমার দুর্ভাগ্য !' বলেই সে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। অতন্দ্র একবার আহত শিশুর যন্ত্রণা বিকৃত মুখের দিকে একবার নিশীথিনীর বেদনাহত মুখের দিকে তাকায়। তারও যেন ব'ল্‌বার মত আর একটি কথাও অবশিষ্ট নেই।

নিঃশব্দে দু'জনে শিশুটির সেবা করে, ব্যাকুল স্নেহে চেয়ে থাকে মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে।

বেঁচে উঠ্‌ল বেণু, কিন্তু পঙ্গু হ'য়ে গেল চির দিনের মত। মাতৃহীন পঙ্গু সন্তানের দিকে চেয়ে অতন্দ্রের চোখ দিয়ে জল পড়ে, নিশীথিনীও আঁচলে চোখ্ মোছে।

কয়েকদিন পর সেদিন মুখ খোলে নিশীথিনী, 'এ শিশু যদি তোমার না হ'য়ে অন্যের হ'ত, আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত অতন্দ্র, কিন্তু তুমি কি আমার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে না ?'

ভগবান যদি ক্ষতিগ্রস্ত করেন, ক্ষতিপূরণ কার কাছে চাইব নিশা। তা ছাড়া এ ক্ষতি একা আমার নয়। এই শিশুর জন্য তুমি অহরহ অন্তরের গ্লানি ভোগ করছ, অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে একে বাঁচিয়ে তুলেছ। ক্ষতি না করেও তুমি অনেক ক্ষতিপূরণ দিয়েছ নিশা।'

—'এতে এর ক্ষতিপূরণ হয়নি। এই যে পঙ্গু শিশু, এর মা নেই, চিরজীবন একে টানবে কে ? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে; তুমি ওর সব ভার আমাকে গ্রহণ করতে অনুমতি দাও।'

'কিন্তু—'

বাধা দিয়ে নিশীথিনী বলে, 'তুমি যা বলবে সে আমি জানি, আর জানি বলেই আমার জীবনের বসন্তকে আমি নির্ম্মম হস্তে হত্যা করেছি। মনের মধ্যে যত ফুল ফুটেছিল, সব ঝরে গেছে, সুগন্ধও মিশিয়ে গেছে বাতাসে। আমি তোমার প্রিয়া হতে চাইনে, তোমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী হবার সাধও আর আমার নেই, আমি হতে চাই এই পঙ্গু শিশুর সেবিকা। সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না, এই আমার ভিক্ষা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

[ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পর পর তিনটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। অনেকে প্রবন্ধ লেখকের নাম জানিতে চাওয়ায় এবার দেওয়া হইল। বঙ্কিমের চাকুরী জীবন, এবং উপন্যাসাবলীর মূল সূত্র এবং পটভূমিকা সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা থাকিবে।—লেখক]

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়*। বঙ্কিম-প্রতিভার অরুণোদয় হইল। গ্রন্থখানি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হয়। প্রথম রচনা বলিয়া বঙ্কিম ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সমক্ষে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠান্তে বঙ্কিম প্রশ্ন করেন—

"ভাষার স্থানে স্থানে ব্যাকরণদোষ আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি?"

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত হৃষিকেশ শাস্ত্রীর পিতা) উত্তর করেন—

"গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি?"

বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন—

"আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।"

দুর্গেশনন্দিনী কি ভাবে গৃহীত হয় এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহাশয় লিখিয়াছেন—†

"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল। সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

"বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা সেরূপ কল্পনার কমনীয়া লীলা সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ ওসমানের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব, প্রখরা বিমলার চাতুর্য্য ও জগন্মোহিনী কমনীয়া শক্তিময়ী আয়েষার প্রগাঢ় নিঃশব্দ হৃদয়ভাব, গড়মন্দারণ, দেবমন্দির, কতলুখাঁর গৃহে উৎসব—এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তানীয়, অবিনশ্বর! কল্পনার সাগর মন্থন করিয়া মহারথী বঙ্কিম এই অমৃত রসসাহিত্য প্রবাহিত করিলেন—বঙ্গবাসিগণ সে অমৃতসাগরে ভাসিল।

"নিন্দুকগণ নিন্দার তান তুলিলেন। দুর্গেশনন্দিনী বিদেশীয় ভাবে পূর্ণ, বঙ্কিমবাবু বিকৃতমস্তিষ্ক, কিন্তু সে নিন্দা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর জয় জয় নাদ দেশপূর্ণ করিল, গগনে উত্থিত হইল। দুর্গেশনন্দিনীতে বিদেশীয় শিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ওসমান ও জগৎ সিংহের উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব। আয়েষার প্রগাঢ় নিভৃত হৃদয়ের ভাব বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব। বিমলার অপূর্ব্ব জীঘাংসা ও বৈর নির্য্যাতন বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব, বিদেশীয় শিক্ষা লাভ করিয়া বহুবিদ্যা লাভ করিয়া বঙ্কিম দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এইটী আধুনিক সময়ের ভাব, এই ভাব বঙ্কিমে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী কি দোষ?"

---

* সম্পাদকদ্বয় বলেন, মার্চ্চ মাসে, তাহা ঠিক নয়।

† (সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, শ্রাবণ১৩০২)।

কিন্তু এই দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বঙ্কিম-জীবনী লেখক শচীশচন্দ্র একটী ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—

"বোধ হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাসখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন।"

কথাটী প্রকৃত নহে। দুর্গেশনন্দিনী আরম্ভ হয় খুলনায় এবং শেষ হয় বারুইপুরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। কালীনাথ বাবু নিজে বারুইপুরে দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে দেখেন। ইহা শচীশ বাবুর জন্মেরও পূর্ব্বের ঘটনা। পক্ষান্তরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী ও সঙ্গী অনুজ পূর্ণচন্দ্রের লিখিত বিবরণই প্রকৃত বলিয়া মনেহয়।

বঙ্কিমসহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"নব প্রকাশিত 'সংকল্প' মাসিক পত্রে কোনও প্রসিদ্ধ লেখক 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—"বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।"

অতঃপরে পূর্ণচন্দ্র বলেন, "এই কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।*"

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পরেই নানাপ্রকার সমালোচনায় দেশ বেশ মুখর হইয়া উঠিল। কেহ বলিলেন, ভাষা ঠিক হয় নাই, কেহ বলিলেন, ভাবের দৈন্য আছে, কেহ বলিলেন, স্কটের অনুকরণদোষে দুষ্ট, আবার কেহ বলিলেন, ইহাতে অশ্লীলতা আছে। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দের সহিত প্রচলিত বাঙ্গলা কথার সংমিশ্রণ গুরুচণ্ডাল দোষ বলিয়া অভিহিত করিলেন। এবং নানারূপে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম স্বরচিত জীবনীর খসড়ায় লিখিয়াছেন—"সোমপ্রকাশের" সমালোচনার প্রধান কারণ ব্যক্তিগত। বারুইপুর থানার এলাকায় চাংড়ী-পোতা গ্রাম হইতেই ইহা পরিচালিত হইত।"

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "রহস্য সন্দর্ভ" এবং গিরিশ ঘোষ সম্পাদিত বেঙ্গলী (১৮৬৫, ডিসেম্বর) দুর্গেশনন্দিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে সোমপ্রকাশের সমালোচনা যাহাই হউক, উহার লেখকগণ যে অন্তরে অন্তরে উহার খুব প্রশংসা করিতেন, সোমপ্রকাশের অন্যতম লেখক ও পরিচালক স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় তাহা উদ্‌ঘাটিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—*

"দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল! কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন···

"বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গলা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা, অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যমা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোম-প্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদের নাম "শব পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই—যাহারা শব বলে তাহারা দাহ বলে, যাহারা মড়া বলে তাহারা তৎসঙ্গে পোড়া বলে। কেহই শব পোড়া মড়া দাহ বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা-দোষে দোষী, আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোম-প্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম। এবং বঙ্কিমী দলকে "শবপোড়া মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ

---

* বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ৭২ পৃঃ।

* "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পৃঃ ২৭০—২৭১।

করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।"

পূর্ণচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্যজগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। "দুর্গেশনন্দিনীর" আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন।

..."দুর্গেশনন্দিনী" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ৺তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভুদেববাবুর জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন, "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি "দুর্গেশনন্দিনী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটী যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার কোন উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।" ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদবাক্য সফল হইয়াছিল যতদিন না দেবী চৌধুরাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, ততদিন দুর্গেশনন্দিনীরই বিক্রয় বেশী ছিল।"

বস্তুতঃ দুর্গেশনন্দিনী আজিও সর্ব্বজন প্রশংসিত।

অনেকে মনে করিলেন—দুর্গেশনন্দিনী মৌলিক পুস্তক নহে, স্কটের আইভানহোর অনুকরণে লিখিত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বহু লোকের নিকট বলিয়াছেন,"দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে আইভানহো আমি পড়ি নাই।" অনেকে একথা বিশ্বাস করেন নাই, আবার যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘনিষ্টভাবে চিনিতেন, জানিতেন যে তিনি যাহা নহেন, কথায় বা কার্য্যে তাহা দেখাইতে চাহেন না, তাঁহারাও জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এ সম্বন্ধে কালীনাথ বাবুর স্মৃতিকথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"Ivanhoe-র ছায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজ মুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন, আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না কেন আমি বঙ্কিমবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণা অপহৃত করিয়াছি। কেননা আমি তাঁহার Honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহাহউক, দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা যে একটী অভিনব সৃষ্টি ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।"

"শকুন্তলা তত্ত্ব" প্রণেতা চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "দুর্গেশনন্দিনী" প'ড়িয়া মনে হইল ইহা স্কটের আইভানহো পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে আইভানহো পড়ি নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?' আমি বলিয়াছিলাম, 'না হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।' তিনি বলিয়াছিলেন, "সমালোচনা অন্যায় হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়, সমালোচক জানিতেন না যে তখনও আমি আইভানহো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।" হিন্দু পেট্রিয়টের মন্তব্যের একস্থানে আছে—

"বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে তস্কর মাত্র, তিনি স্কটের আইভানহো নামক উপন্যাসের কয়েকটী দৃশ্য ও চরিত্রের অবিকল অনুবাদ করিয়া তাহা দুর্গেশনন্দিনীতে নিজের বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আয়েষা রেবেকারই নকল।"

এই অশ্রাব্য কটুক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তৃপ্তি হইবার কারণ কি পাঠককে বুঝাইয়া বলা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টের সমালোচনা পড়িয়াই তিনি একখণ্ড আইভানহো ক্রয় করিয়া উহা আদ্যন্ত পাঠ করেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে সত্যই রেবেকা এবং আয়েষার মধ্যে বিলক্ষণ সৌদৃশ্য রহিয়াছে, আর আনন্দিত হইলেন যে পাশ্চাত্য যাদুকর (Wizard of the West) স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের রেবেকা তাহার উপন্যাসখানির প্রায়

* স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা—(প্রদীপ—আষাঢ়, ১৩০৬, ২য় ভাগ সপ্তম সংখ্যা)

দশ আনা অংশ জুড়িয়া বসিলেও স্বল্প কথায় আয়েষার যে গরীয়সী চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা রেবেকা হইতে আরও মহত্তর। স্কটের সুখ্যাতি তখন সমগ্র ইউরোপ এবং সভ্য দেশমাত্রেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে (বিশেষতঃ ১৮২৮—১৮৫০ যুগে) আর দুর্গেশনন্দিনী ষষ্ঠবিংশতি যুবকের প্রথম উদ্যম মাত্র। বঙ্কিমের ইহাতে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় জন্মিল, বুঝিলেন উপন্যাস রচনায় তাহার সম্পূর্ণ যোগ্যতা রহিয়াছে। মনে মনে বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করিলেন। ইহার ফলেই "কপালকুণ্ডলা" রচিত হয়। পরিকল্পনা ক্ষেত্র তো প্রস্তুতই ছিল, এবার গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। দুর্গেশনন্দিনী তাড়াতাড়ি লিখিতে হয়, প্রুফেও বিশেষ পরিবর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু কপালকুণ্ডলা লিখিয়া বারম্বার পাঠ করিলেন এবং প্রতিবারেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

এইবার রেবেকা ও আয়েষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যকীয় মনে করিতেছি।

দুর্গেশনন্দিনীর প্রতি চরিত্রই সজীব একদিকে বুদ্ধিমতী চটুলা বিমলা অপর দিকে বীরবর ওসমান। বিমলা একদিকে প্রহরীকে কার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে—"আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, এ পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়া তোমার সঙ্গে যাই।" আবার বধ্যভূমে স্বামীকে বলিতেছে—"আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" আর পাঠান কুলতিলক ওসমান যুদ্ধজয়ার্থে কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, কিন্তু যুদ্ধ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিত নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। গিলবার্ট ডি বয়েজের সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেও অনেক পার্থক্য। যাহা হউক রেবেকার কথাই বলিতেছি। সর্ব্বত্র রেবেকাকে মহীয়সী করিতে স্কটের চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। প্রথমে কৃপণ পিতার অনর্থক মানসিক ক্লেশ অনুভব করিয়া পিতৃবৎসলা রেবেকা বিষাদিনী, বিষাদ ছায়ায় তাহার দেহসৌন্দর্য্য আরও লাবণ্যময়ী হইল। তারপরে টুর্ণামেণ্ট প্রান্তরে পিতৃঅবমাননায় ব্যথিতা, তবু গর্ব্বিতা। রেবেকা স্বজাতির অবমাননায় দুঃখকুণ্ঠিতা কিন্তু তথাপি প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দিতা। তারপর নিঃসহায়, মুমূর্ষু আইভানহোর প্রতি রেবেকার দয়া—কতকটা পরোপকার কতকটা পিতার প্রতি পূর্ব্বানুকম্পার প্রতিদান—তাহাতে পিতারও আনন্দ। বিজন অরণ্যে যখন দস্যুদল বেড়িল, রেবেকার প্রাণের আবেগ রুগ্ন যুবকের জন্য ফাটিয়া পড়িল। লম্পট বয়েজ গিলবার্টের যখন সে করায়ত্ত, তখনই চরিত্রের বীর্য্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—তাহার ভীমামূর্ত্তি দেখিয়া ভীষণ গিলবার্টও স্তম্ভিত। রেবেকা বলিতেছে—

"Remain where thou art, proud Templar, or at thy choice advance!—one foot nearer,and I plunge myself from the precipice."

Chap. XX.

"স্থাথ, দুর্ম্মতি যদি একপদ অগ্রসর হইবি এইখান হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিব, ধর্ম্মের সহিত তুলনায় প্রাণ কি ছাড়!"

পাপাচারী গিলবার্টও অত্যাচারে বিরত হইল

আবার রেবেকাকে দেখিলাম অবরুদ্ধ অবস্থায় ছদ্মবেশী পুরোহিতের সন্নিধানে। পরের জন্য আত্মত্যাগোদ্যত রেবেকা পুরোহিতকে বলিতেছে—

"একবার পিতঃ রুগ্ন শয্যাশায়ীর কাছে আসুন।"

তাঁহার এই উন্নত চরিত্রে জাত্যাভিমানী সেড্রিকও ইহুদি কন্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিল না।

আবার দেখি যখন আইভানহো কারাগারে রুগ্ন-শয্যায় রহিয়াছেন, আর ছদ্মবেশী সিংহরাজা (Rechard I) তাহারই উদ্ধারার্থ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, শুশ্রূষাকারিণী রেবেকা গবাক্ষে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের ফলাফল আহত ব্যক্তিকে শুনাইতেছেন।

বিচারকর্ত্তা Grand Master-এর কাছে রেবেকার গম্ভীর মূর্ত্তি আরও বিস্ময়কর। গ্রীবা উন্নত করিয়া রেবেকা বলিতেছে—

"Nay,but for the love of your own daughters Alas! she s aid recollecting herself—"you have no daughters! Yet for the remembrance of your mother's let me not be thus handled in your presence."

"একবার নিজ তনয়ার পবিত্রতা স্মরণ করুন, একবার মানবজাতির মাতৃরূপিণী রমণীর মহত্ত্ব ভাবিয়া বিচার করুন। আমার প্রতি যেন অসম্মান না হয় তাহাই দেখুন।"

বিচার হইয়া গেল। রেবেকা দৃঢ়ভাবে বলিল—এ মানুষের বিচার আমি মানিনা। আমার জন্য যুদ্ধ করিয়া আমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার উপযুক্ত বীর আছে।" তাঁহার কথাই ঠিক হইল—রুগ্নশয্যা হইতে সদ্য প্রত্যাগত আইভানহোই champion হইলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রে গিলবার্টও বলিতে বাধ্য হয়—"সত্য রেবেকা, আমি তোমার শত্রু, এখন আর শত্রু নই, তোমার প্রতি অত্যাচার অসম্ভব।"

বস্তুতঃ এত উপাদান যোগাইয়া, এত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া, এত পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া কবি যেন রেবেকাকে একটা অমানুষী চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা স্বাভাবিকের চেয়েও স্বাভাবিক।

সৌদৃশ্য কিছু আছে যে তাহা সত্য, সৌদৃশ্য না থাকিলে তবে আর সমালোচকবর্গ আয়েষাকে রেবেকার অনুরূপ মনে করিবেন কেন? উভয়েই আপন প্রণয় পাত্রের রোগে শুশ্রূষাকারিণী, কারাগারে সঙ্গিনী; উভয়ই গ্রন্থশেষে সপত্নীকে অলঙ্কার পরাইয়া আসিয়াছেন, উভয়েই শেষ বিদায়ের বিষাদকালে বাঞ্ছিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। উভয়েরই প্রণয়সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্য। বুদ্ধিমতী রেবেকা জানে সে ইহুদী, আইভানহো খ্রীষ্টীয়ান, বিবাহ হইতে পারে না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আয়েষাও জানে সে মুসলমান, জগৎ সিংহ হিন্দু, বিবাহ হইতে পারে না। রেবেকা আইভানহোকে রওয়েণাতে আসক্ত বলিয়া জানে, আর আয়েষাও জগৎ সিংহকে তিলোত্তমায় আসক্ত বলিয়া জানে। সৌদৃশ্য এইখানে।

আবার পার্থক্যও খুবই বেশী। রেবেকার সহিষ্ণুতা পরপারগতা হেতু, ঔদাস্যজনিত—আর নবাবনন্দিনী আয়েষা প্রতাপশালিনী নবাবপুত্রীর নবাবগৃহে প্রভুত্ব ঘরে বাহিরে, আশৈশব সে প্রভুত্বময়ী আর সে প্রভুত্ব সম্পূর্ণ অপ্রতিহত। তথাপি এই গর্ব্বিতা নারী কত কমনীয়া, কত মহনীয়া কত স্নেহশীলা—তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলে সকলে দেখিল 'কি সুন্দর!' জগৎ সিংহ ভাবে এ চমৎকারকারিণী পরহিত-মূর্ত্তিময়ী কেমন করিয়া এই মৃন্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল? ওসমানেরও সে গুণমুগ্ধ! কিন্তু আবার ওস্মানকেই কিরূপ মৃদু তিরস্কার করিয়া কিরূপ নির্ব্বাক্ করিয়া ফেলিল তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ওসমান কহিলেন—

"আমি আশালতা ধরিয়া আছি, আর কতকাল তাহার তলে জল সিঞ্চন করিব।"

আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওসমান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ওসমান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।'

একটি কথায়ই ওসমানের হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল।

অপরদিকে আয়েষার সহিষ্ণুতার সহিত রেবেকার তুলনাই হয় না। এই গর্ব্বিতা প্রাসাদ-সুখপালিতা নবাবপুত্রী বাঞ্ছিতের বিচ্ছেদ যে কিরূপ সহ্য করিলেন, সে অঙ্কনে বঙ্কিম স্যার ওয়ালটার স্কটকেও নিঃসন্দেহে অতিক্রম করিয়াছেন। তাহার সহিষ্ণুতা উপর্য্যুপরি বিপদ-অবহেলা-লাঞ্ছনা-নিগৃহিতা রেবেকার অপেক্ষাও যে অধিকতর মহিমময়ী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সাধারণ অগ্নিতে আয়েষা চরিত্রের মহা উপকরণ দাহ্য নয়, আরও পবিত্র ও উজ্জ্বল হইয়াছে। বিচ্ছেদে তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তনও বঙ্কিম অনুধাবন করিয়াছেন। বিষাদে তাঁহারও প্রাণ বিসর্জ্জনের বাসনা হইয়াছিল। প্রাণের বেদনা সে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই! এইখানেই আয়েষার চরিত্রের স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট।

আয়েষা-চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে "মুক্তকণ্ঠ" অধ্যায়ে। স্নেহ, মায়া, নিঃস্বার্থপরতা, গাম্ভীর্য্য, প্রকৃত বীরত্ব, পবিত্রতা, গর্ব্ব ও অভিমান প্রভৃতি ভাবরাশির একত্র সমাবেশ এই পরিচ্ছেদে।

জগৎ সিংহ তিলোত্তমাকে বিদায় দিয়াছেন—আয়েষা জগৎসিংহকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু জগৎসিংহ যাইতে চাহিতেছেন না···আবার চক্ষে দরদরধারা

বিগলিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আয়েষা রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা—রাজপুত্র আমি আর কাঁদিব না।

প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া রাজপুত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে আবার নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সহসা ওসমান আসিল—ক্ষণকাল স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া পরে ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল, "নবাবপুত্রি! এ উত্তম।"

আয়েষা ওসমানের কথার অভিপ্রায় নিঃশেষে বুঝিতে পারিলেন, মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, কিন্তু কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, স্থির স্বরে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওসমান?"

তারপর পর্দ্দার পর পর্দ্দায় চড়াইয়া আয়েষা যখন বলিলেন, "তবে শোন ওসমান, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।" সেই দৃশ্যে আয়েষার দৃঢ়তা বিকম্পিত করে নাই এমন মানবহৃদয় দৃষ্ট হয় না। পরক্ষণেই আবার ওসমানের স্নেহভিক্ষা করিয়া আয়েষা কি কমনীয়তা দেখাইল! কিন্তু দেখা যায় যে, এই দগ্ধ হৃদয়ের তাপ আরও হঠাৎ প্রকাশ পাইয়াছে আয়েষার গর্ব্বে। আয়েষা বলিতেছে—

"আয়েষা অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে।"

বাকী কথায় গর্ব্ব, স্নেহশীলতা, ক্ষমা ভিক্ষা প্রভৃতির সমাবেশে আয়েষা চরিত্র বস্তুতই অতুলনীয়। তার পরে রাজপুত্রের নিকট তিলোত্তমার সতীত্বের কথা বলিয়া দেবার জন্য মুমূর্ষু পিতাকে অনুরোধ, তিলোত্তমা-জগৎ-সিংহের বিবাহে সানন্দ যোগদান, তিলোত্তমাকে হস্তে রত্নভূষণ পরাইয়া দেওন প্রভৃতি আয়েষার গর্ব্ব, ধৈর্য্য ও মহত্ত্বই সূচিত করে। এই গর্ব্ব রেবেকা অপেক্ষা আয়েষার অনেক অধিক। আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। রেবেকার সেবা ও উপকার প্রভৃতিতে আইভান-হোর প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা যেন দূর হইতে কেমন উঁকি ঝুঁকি মারিত, কিন্তু জগৎসিংহকে ভালবাসিলেও গর্ব্বিতা আয়েষার সেবার অন্তরালে আত্মত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়; তারপর গরলাধার অঙ্গুরীয় পান করিবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং অন্তিমে কাজ করিবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি ভাব বর্ণনায় অল্প কথায় স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া বঙ্কিম প্রথম উপন্যাসেই যে স্কটের অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আর অনুকরণ সর্ব্বত্রই দোষনীয় নয়। প্লুটার্ককে সেক্সপিয়রও আদিম বলিয়া মনে করিতেন, রামায়ণ মহাভারত হইতে অনেকে গল্প ও ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই গ্রহণ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রও আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করিতেন, যেমন অতঃপর রজনীতে করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কাউএল দুর্গেশনন্দিনীর যে সমালোচনা করেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন—"এ কথা সত্য নহে যে 'দুর্গেশনন্দিনী' আইভানহোর ছায়ামাত্র It is far from being a servile copy.

সে সময়ে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্র Scotsman-এর সহিত সকলেই বোধ হয় একমত হইবেন, সফোক্লিস রচিত Antigi এন্টিজি চরিত্রের পরে আয়েষার মত গরীয়সী চরিত্র কোন সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই,—কি প্রেমিকার দিক হইতে, কি মহত্ত্বের দিক হইতে, কি ত্যাগের দিক হইতে, কি কলানৈপুণ্যের দিক হইতে।

এইবার বাঙ্গলা ভাষার তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। এই সময়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বড় অশ্রদ্ধা ছিল। তৎকালে শিক্ষিত সমাজ তাহাদের নিজের "মাতৃসম মাতৃভাষাকে" এত ঘৃণা করিতেন যে, পরস্বাপহরণকেও ততটা করিতেন না! কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা কেতাব পড়িতেছেন দৃষ্ট হইলে, তিনি যেরূপ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেন, বোধ হয় কুলকলঙ্কের কথা প্রকাশেও এতটা হইতেন না। ইহারা বাঙ্গলা ভাষা মূর্খ অসভ্য এবং গাড়োলদের জন্য মনে করিতেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গ সাহিত্যের আদর" নামক ব্যঙ্গনাট্যে এই অবস্থার কতকটা পরিচয় দিয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষিত—কি জ্ঞান বাঙ্গলা-ফাঙ্গলা ওসব ছোট-লোকে পড়ে, ওসব আমাদের শোভা পায়?

ভার্য্যা—কেন তোমরা কি ?

উচ্চ—আমাদের হলো Polished Society—ওসব বাজে লোকে লেখে, বাজে লোকে পড়ে, সাহেব লোকের কাছে দর নেই—Polished Societyতে কি ও সব চলে ?

ভার্য্যা—তা মাতৃভাষার উপর পালিশ ষষ্ঠীর এত রাগ কেন ?

উচ্চ—আরে মা ম'রে ছাই হ'য়ে গিয়েছেন, তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন সম্পর্ক কি ?

ভার্য্যা—আমারও তো ঐ ভাষা—আমি তো ম'রে ছাই হই নাই ?

উচ্চ—Yes, for the sake of my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা পড়ব, কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়।

ভার্য্যা—তাই মন্দ কি ?

উচ্চ—কিন্তু এই ঘরে দোর দিয়ে পড়্‌ব—কেউ না টের পায়…

এই শিক্ষিত (এজু) দলের নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, তাঁহাকে কোন সভায় বাঙ্গলা বক্তৃতার সময় Liberty Hall-এর অনুবাদ করিবার আবশ্যক হয়। তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন "Gentlemen this is Liberty Hall" মহাশয়েরা ইহা হয়—ইহা হয়—(অনেক পরে) স্বাধীনতার মন্দির। এই দলের আর একজন মহাপ্রাজ্ঞ একখানি অভিনন্দন পত্র স্বাক্ষর করাইতে গিয়া address-এর প্রতিশব্দটি মুখস্থ করিলেও কার্য্যকালে স্মৃতিশক্তি এমনই তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিল যে, তিনি উহাকে রঘুনন্দন' বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিলেন। আর একজন প্রাজ্ঞ বকুম্‌ কথাটির বাঙ্গলা লিখিলেন বহু। এইরূপ বাঙ্গলা বিদ্যার অনেক উদাহরণ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল ও একাল" নামক পুস্তকে দিয়াছেন।

শিক্ষিত সমাজের এই দুর্দ্দশা, তাহার উপর বাঙ্গলার সাহিত্যেরও কোনরূপ উন্নতি দেখা যাইত না। এ সময়ে কবিগুরু ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে লেখা অনেকটা সখের উপর নির্ভর ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলালেও নিজ নাম দিতে সাহস করেন নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র Journal of Asiatic Society-তে সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া যে যশ অর্জ্জন করেন, বাংলা লেখার কলঙ্ক তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, কিন্তু বাংলা লিখিবার জন্য প্যারীচাঁদকে বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এরূপ ক্ষেত্রে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, শিক্ষাভিমানী, সমাজে যশস্বী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমবাবুর পক্ষে ইংরাজী লিখিয়া সম্মান লাভের প্রয়াসই স্বাভাবিক। তাই কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত বাংলা রচনার দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্বদেশভক্তের পক্ষে—ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমের পক্ষে—মাতৃসম মাতৃ ভাষার প্রতি উদাসীন থাকাই অসম্ভব। তাই আমরা শীঘ্রই বঙ্কিমকে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম—ক্রমে দেখিলাম রাজরাজেশ্বরী মা আমাদের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণ মন্দিরের রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাহার জাগ্রত অধিনায়ক পূজারী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রথমে বঙ্কিমের রচনায় ইংরাজীনবীশীর বিকার দৃষ্ট হইত, কিন্তু উহা সুবর্ণের শ্যামিকা মাত্র—শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রমে তাহার বাংলা অসামান্য প্রতিভায় গুপ্ত কবির আদর্শে বিশুদ্ধ ও সহজ বাংলায় পরিণত হয়। বঙ্কিম নিজেও লিখিয়াছেন, "অনেক প্রয়াসের পরে আমি ভাষার সরলতা লাভ করিয়াছি।"

'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাগরী ভাষার পক্ষপাতী লোকদিগের নিকটে হাস্যাস্পদ হন বটে, কিন্তু যে নূতন সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেন, তাহাই শাশ্বত সাহিত্যরূপে পরিণত হইয়াছে। তাই আজও তাঁহার সাহিত্য সম্রাটের আসন সমানভাবে উজ্জ্বল ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে তিনি নিজেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিয়াছেন।*

* বঙ্গদর্শন ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ "বাঙ্গলা ভাষা"।

"সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লেখে না। যদি একথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে আমার লেখা দুই চারিজন পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ণে প্রবৃত্ত হউন। যে তাহার যশ করে করুক আমরা কখনো যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খল স্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞান বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে "পরোপকার" ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ণের উদ্দেশ্য নাই।"

এদিকে সাধারণ লোকেও এ সময়ে সাগরী ভাষা আমল দিত না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "অক্ষয়কুমার দত্তের জীগিষা, জিজিবিষার সহিত—চিট্‌চিমিষা শব্দ ব্যবহার করিয়া লোকে হাসাহাসি করিত।"

এদিকে বঙ্কিম হুতোমী ভাষার রুচির নিন্দা করেন এবং ভাষার দরিদ্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, আবার টেকচাঁদী ভাষা সম্বন্ধেও মনে করেন—গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না, কেননা এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

বঙ্কিম যে নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া জননী বঙ্গভাষাকে দেবমন্দিরে সংস্থাপিত করেন, দুর্গেশনন্দিনীই তাহার প্রথম সোপান এবং কিরূপে সেই ভাষা নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের মতানুসরণ না করিয়া শক্তিশালিনী শব্দৈশ্বর্য্যে ও সাহিত্যাবিষ্কারে বিভুষিতা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের উক্তিই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। **রবীন্দ্রনাথ** লিখিয়াছেন—

"মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজী পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্ব্বতন এন্‌ট্রেন্স পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত হীন মলিন ভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতনা। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানব জীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন, তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারিনা।

"তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্প শিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজীতে দুইছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজী সমুদ্রে তাহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মিত করিতেছেন, সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিলনা।

"বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ

করিয়া একটী অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

"কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্খা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌন্দর্য্য গর্ব্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

"তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

"বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারো পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাতে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব প্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না। যেখানে লেখক অবহেলা করে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিক ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এ-মন গুরুভার আর কিছু নাই। তাহার নিয়ত ভাবাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখন সাহিত্য ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয়না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

"বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।

"বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয় বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।"

রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, সব্যসাচী বঙ্কিম একহস্ত গঠনকার্য্যে একহস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে সম্বাদ প্রভাকরে (৯ই নভেম্বর ১৮৬৫) কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছে—

"বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্টবোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসংখ্য জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া শান্তি স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িণী কর্ত্তব্য পক্ষেও ইহার নিকট অনেক বিচারক পরাস্ত হন।"

'দুর্গেশনন্দিনী' বাহির হইবার কয়েক মাস মধ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং মাসে ৫০০৲ বেতন পাইতে লাগিলেন। একবৎসর পূর্ব্বে হইলে আমরা বোধহয় সাহিত্য সম্রাটকে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রের শরীর খারাপ হইল এবং তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া দেড় মাস ছুটি লইলেন (১৮৬৬ সালের ২২শে জুন হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)।

বাড়ী থাকিতেই কপালকুণ্ডলা মুদ্রাঙ্কিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসেন এবং দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের ক্লাসে পড়িবার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। ছুটি ফুরাইলে তিনি বারুইপুরে পুনরায় আসেন এবং ১৮৬৬ সালের ৮ই আগষ্ট হইতে ১৮৬৭ সালের মে পর্য্যন্ত ১০ মাসকাল অবস্থান করেন। কপাল-কুণ্ডলার প্রকাশই পূর্ব্বোক্ত ছুটি লইবার কারণ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগেই কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয় এবং এই উপন্যাসখানি তাঁহাকে গৌরবের উচ্চ শিখরে সমারূঢ় করে। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—

'এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিমবাবুর যশোরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। এই যশ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলা প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে দুইখানি নাটকই যন্ত্রস্থ করিয়াছিলেন।"

এবার দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির মনোভাবও পরিবর্ত্তিত হইল। সোমপ্রকাশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল, হিন্দু পেট্রিয়টে স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় খুব সুন্দর সমালোচনা করিলেন এবং 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষও উহার গুণকীর্ত্তন করিলেন।* অক্ষয় চন্দ্র সরকারও পিতাপুত্র শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূণ্য অথচ রসপরিপূর্ণ হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গলায় আর নাই। কেবল মাত্র কপালকুণ্ডলা লিখিলেই কপালকুণ্ডলাকার 'কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন।"

* Bengalee 1866. Dec. 8.

বস্তুতঃ কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমের রাজসিংহাসন সুদৃঢ় হইল। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী ও প্রাঞ্জল। সেইকালে নবীনতায়, সরসতায়, চিত্রকুশলতায় দুর্গেশ-নন্দিনী অদ্বিতীয় ছিল। সেই ভাষা আরও গম্ভীর ও সারগর্ভ হইয়া আসিল 'কপালকুণ্ডলায়'। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল, নিন্দুকের রসনা স্তম্ভিত হইল।

অতঃপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী লিখিতে আরম্ভ করেন।

বারুইপুরে অবস্থানকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কিছু কিছু কালীনাথবাবুর স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোন পুস্তকবিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম, তিনি শ্রবণ করিতেন এবং স্থলবিশেষ আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭॥টা হইতে ১১॥টা পর্য্যন্ত তাহার পাঠের সময় ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনও Light Reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে ; তাহাতে "Progressieve Development of Species বিষয় লেখা ছিল। তিনি অধ্যয়নে অসমর্থ না থাকিলে কদাপি আমার এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।

"এই সময়ে রামনগরের চিকিৎসা ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ঘোষ একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র আনিয়াছিলেন। মূল্য প্রায় ৩০০-৫০০, টাকা হইবে। বঙ্কিমবাবুর অনুরোধে মহেশ বাবু কয়েকদিনের জন্য অনুবীক্ষণটী তাঁহার কাছে রাখেন। বঙ্কিমবাবু প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অনুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষার সময়ে আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্য সঙ্গী থাকিতাম। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ

শোভাসৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেন, "জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত, আর সমস্তই সুন্দর।"

"এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির উপর উচ্ছ্বাস দেখি নাই। কখনও ঈশ্বরের নাম গুণ শুনি নাই, বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনও পরিচয় কখনও পাই নাই। কিন্তু আমার অনুমান হয়, এই সকল অণুপ্রমাণ সৃষ্টির অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষগোচর করিবার সময় তাঁহার ভাবপ্রবণ অন্তরে বৈজ্ঞানিক জাতীয় একপ্রকার ঈশ্বর ভক্তির বীজ পতিত বা রোপিত হয়, যাহা তাঁহার প্রবীন বয়সে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কথঞ্চিৎ সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

"আমাদের বারুইপুর অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণ বাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোনও অভিমান দেখি নাই; বঙ্কিমবাবুতে কনিষ্ঠের কোনও সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের মধ্যে কোনও লজ্জাসরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কোনও বিষয়ে গোপনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না।

"মধ্যে মধ্যে কবিবর বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগণার Assistant District Suparintendant বাবু জগদীশনাথ রায় বঙ্কিম বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলে কয়েকদিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন। ইঁহারা উভয়েই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং ছুটীর সময় ভিন্ন প্রায়ই অপর সময় আসিতেন না। দীনবন্ধু বাবু বঙ্কিম বাবু অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের প্রবীণ হইবেন এবং জগদীশ বাবু তাঁহা অপেক্ষা আরও বার চৌদ্দ বৎসর প্রবীণ বয়স্ক। একবার কার্য্যোপলক্ষ্যে বঙ্কিম বাবুর মজিলপুরে অবস্থিতিকালে একদিন এই বন্ধুদ্বয় রাত্রি ৮টা ৮॥০ টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিম বাবু পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের আগমনের কোন সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না জানি না। তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্কিম বাবু যাহাতে তাঁহাদের গাড়ীর শব্দ শুনিতে না পান এমন স্থানে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা বাসাবাড়ীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন "আমরা বাগবাজারের মেথরাণী।" বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের ব্যঙ্গস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কালুয়া নিকাল দেও, কালুয়া নিকাল দেও।" এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া তাঁহারা বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। *

"বঙ্কিম বাবুর এত গুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিয়োডোর পার্কারের "Ten Sermons" নামে পুস্তকখানি তাহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, সপ্তাহান্তে আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেম, "Such worst English I have never read." আমি পার্কারের লেখার ও ইংরেজীর খুব ভক্ত ছিলাম! তাঁহার হেয়জ্ঞানসূচক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।

"এই সময়ে বঙ্কিম বাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিলপুরে আসিতেন, তখন সেখানকার হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। হরমোহন দত্তের ষ্টেট তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল, তাঁহার পুত্রদ্বয় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে বাস করিতেন।"

এক পুত্রের সহিত বঙ্কিম বাবুর বেশ সখ্যতা হয়। দত্তবাবুদের একটি বাড়ীর ছবিই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তের বাড়ীর বিবৃতিতে হুবহু পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর বাড়ী হইতেও কতকটা ছায়া পাওয়া যাইত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে জমিদার বাবুর বৃহদায়তন বাড়ীই বিষবৃক্ষের দত্তবাবুর বাড়ী, আর কাল্পনিক গোবিন্দপুরই সত্যিকার মজিলপুর। বারুইপুরে থাকিতেই বঙ্কিম জগদীশনাথ রায়ের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন।

* শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় যে ১৯১৮-এর ভারতী'তে লিখিয়াছেন—এই ঘটনা কাঁথির, তাহা ঠিক নয় এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

কালীনাথবাবু আরও বলেন—

"একদিন বারুইপুরের এক বাড়ীতে বজ্রপাত হওয়ায় কয়েকটা লোকই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে; একজন হঠাৎ মারা পড়ে। বঙ্কিম বাবু শুনিবামাত্রই সব কাজ ফেলিয়া সেখানে ছুটিয়া যান আমিও তাঁহার অনুগমন করি! সেই সময় এক পাদরী সাহেবও ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হন। অবিলম্বে বঙ্কিম বাবু তাহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া দেন ও এদিগের সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ডাক্তার আসিয়া বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও তাহার সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন!"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে একটী বিশেষ কাজে বঙ্কিমচন্দ্রকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। এ সময়ে আদালতের আমলাদের বেতন নির্দ্ধারণ জন্য একটী কমিশন (Commission for revision of salaries of Ministerial Officers) বসে * এবং বঙ্কিম সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত হন। এই কার্য্যে সরকার বাহাদুর বঙ্কিমের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই কার্য্যে দক্ষ সিভিলিয়ান প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন। বঙ্কিমের কার্য্য-দক্ষতার তিন মাস মধ্যেই উক্ত কাজ শেষ হইয়া গেলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য কলিকাতার কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেব সেই সময় ছয় মাসের ছুটি লইয়া বিলাত (Home) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে তাহার স্থলেই বঙ্কিমকে পদটি দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু যখন চার্জ্জ বুঝিতে যাইবেন, ম্যাকেঞ্জি বঙ্কিমকে চার্জ্জ না দিয়া মঞ্জুরী ছুটি কর্ত্তন করিয়া লয়েন। ইহার পশ্চাতে যে ষড়যন্ত্র ছিল বঙ্কিমের বুঝিতে বাকী রহিল না, অতঃপর বঙ্কিমকে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার জেনারেলের নবসৃষ্ট পদটি দিতে চাহে, কিন্তু বঙ্কিম উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে আলিপুর সদরে বদলী করা হয় (১৮৬৭, ১লা অক্টোবর)।

বঙ্কিম যে সময় কলিকাতায় ছিলেন, (১৮৬৭, জুলাই হইতে ডিসেম্বর) তৃতীয় বার্ষিক 'ল' ক্লাসের লেকচার শেষ করেন।* কি ভাবে আসিতেন ও উপস্থিতি মঞ্জুর করাইয়া লইতেন এই বিষয়ে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি কথাটি 'পিতাপুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

"প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। এখন যেখানে সিটি কলেজ, (গোলদিঘির দক্ষিণ ধারে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে) তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে আরদালীকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর সুশ্রী গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমাজ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টারী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটী ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন মহাশয়।" কৃষ্ণকমল বলিলেন, "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোল-দীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই যা, কিছু কিন্তু'।*

---

* Bankim on special duty is posted temporarily to the Sudder Station of 24 Perganas, Aug., 21, 1867 Calcutta Gazette. See also quarterly civil hest.

* ১৮৫৬—১৮৫৭, ১৮৫৭-৫৮তে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাস পূর্ব্বেই শেষ করিয়াছিলেন।

† এই সম্বন্ধে, কিছু controversy হইয়াছিল বিপিন গুপ্ত মহাশয়ের "পুরাতন প্রসঙ্গে"। অক্ষয় বাবুর কথাই প্রামাণিক লয়া উদ্ধৃত হইল

অক্ষয়বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীগণের বয়স বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক কম ছিল।

১৮৬৮-র প্রথম হইতেই বঙ্কিম পুনরায় বারুইপুরে যাইতে আদিষ্ট হন। যে ব্যক্তি তাঁহার কার্য্য করিতেছিলেন, অনেক কাজ গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন এরূপ রাষ্ট্র হয়। কিন্তু বঙ্কিম লিখিয়াছেন, "এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে"। কিন্তু এবার আলিপুরের জজ সাহেব বফোর্ট (F. R. Beaufort) প্রবল শত্রু হইয়া উঠেন। ইনি বিশেষ কারণে বঙ্কিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। গভর্ণমেণ্টের নিকটেও বফোর্টের সুনাম ছিল না। সিনিয়ার জজ হওয়া সত্ত্বেও ইনি হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। যাহাহউক, বফোর্ট অতঃপর বঙ্কিমের রায় দেখিলেই উল্টাসুর ধরিতেন। যদিচ পুর্ব্বে খুব কম নড়চড় হইত। বঙ্কিম বাবু বড়ই অপ্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

একটী মোকদ্দমার আপিলের রায়ে সাহেব বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বঙ্কিমও এ অপমান সহ্য করিলেন না। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এই মোকদ্দমার আপিল করিতে অনুরোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, যদি হাইকোর্ট ঐরূপ তীব্র মন্তব্যের বিন্দুমাত্র কারণ আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, তবে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। কমিশনার সাহেব উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি বঙ্কিমকে সমর্থন করিয়া জজ সাহেবকে হেয় করিতে চাহিলেন না। আবার এদিকে হাইকোর্টে আপিল হইলেও তাঁহার বিপদের আশঙ্কা, কারণ হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিকট বফোর্টের সুনাম ছিল না। কমিশনার সাহেব বুদ্ধি করিয়া জজ সাহেবকে তাঁহার মন্তব্য হাইকোর্টের গোচরীভূত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জজ সাহেব তাহা করিতে ভয় পাইলেন। অতঃপরে কমিশনার সাহেবের মধ্যস্থতায় বফোর্টের আচরণ অনেকটা সংযত হইয়া যায়। বঙ্কিমের উপর আর কোন অশিষ্ট আচরণের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

বঙ্কিম এবার ১৮৬৮-র ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে দুই মাস প্রিভিলেজ লীভ লইয়া আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আইন পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

ইহার পরে মৃণালিনী পরিসমাপ্ত ও সংশোধিত করিতে ব্রতী হন। নানারূপ কাজের ঝঞ্ঝাটে সামান্য মাত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আবার দীর্ঘ ছুটি লইবার আবশ্যক হইল। তিনি ১৮৬৯ খৃঃ, ৫ই জুন হইতে ছয়মাস ছুটি লইলেন। এবার 'মৃণালিনী'তে বর্ণিত স্থানগুলি দেখিয়া আসিবার জন্য কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসেন।

১৮৬৯ খৃঃ, নভেম্বরে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়।

নানাস্থান ঘুরিয়া আসিবার পরে, এবার কলিকাতা আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। চাকুরী জীবনে তো দেখিয়াছেন উপরওয়ালাদের অধিকাংশই পক্ষপাতী। কার্য্যকুশলতার অনুরূপ পুরস্কার নাই, চাটুকারিতার পুরস্কার আছে। চাকুরীর উপরে বঙ্কিমের বিরাগ জন্মিয়াছে। তাই ওকালতি করিবেন বলিয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণ ও অবস্থাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার ঝোঁকের মাথায় কিছু করিবার পাত্রও ছিলেন না। এই সময় তাঁহার সময়কার দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি, নীলকুঠীর কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, কালীমোহন দাস, চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীনাথ দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশ মিত্র প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ও কম ছিল না।* বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া বলেন।

"আপনি চাকুরীতেই ৫০০৲ টাকা মাস পান, অনেক প্রাচীন উকীলেরই এই আয় আর হয় না।"

* "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" গ্রন্থে পৃঃ ১৬৮ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, এক সময়ে উহা ২০০০৲ অবধি হইয়াছিল।

বঙ্কিম কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। মনে করিলেন—এইসব বন্ধুগণ তাহার শক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু দুইটি ঘটনায় তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই স্থির করেন। এই ঘটনা দুইটি এইখানে উল্লেখনীয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় বঙ্কিমচন্দ্র জনৈক উকীল বন্ধুর বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছেন। তিনি একজন অন্তরঙ্গই ছিলেন এবং তাহার বেশ পশার ছিল।

উভয় বন্ধু খুব প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় একজন সাধারণ তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইল, তাহার চেহারা কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহারে তাহাকে বিশেষ ভদ্র বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু উকীল বন্ধুটি তাহাকে খুব সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। সে অভ্যর্থনার আড়ম্বর বঙ্কিমের চক্ষে খুবই বিসদৃশ ও অদ্ভুত মনে হইল, এবং বিস্ময়ের উপর বিস্ময় যে বঙ্কিমকে ছাড়িয়া বন্ধুটি সেই ব্যক্তিকে লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। কেবল ব্যস্ত নয়, তাহার কাছে বন্ধুটি যেন বড়ই সঙ্কুচিত, কতই না চাটুবাদে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যগ্র হইলেন। অথচ বিশেষ আবশ্যকীয় কথা ছিল বলিয়াও মনে হইল না। বঙ্কিম স্তব্ধভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে লোকটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটি কে হে?"

বন্ধু—ইনি হাইকোর্টের একজন মোক্তার।

বঙ্কিম—ইঁহার সঙ্গে তোমাদের এইরূপ ব্যবহার করতে হয় নাকি?

উকীল বন্ধু—এটা রুটীর কথা ভায়া, এটা রুটীর কথা! It is a bread problem.

বঙ্কিম ভাবিলেন এরূপ হীন কার্য্য তাহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। উকীল হইবার বাসনায় এই তাঁহার প্রথম আঘাত লাগিল।

এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অবস্থায় বঙ্কিম একদিন রেলে চড়িয়া কোন স্থানে যাইতেছিলেন, দৈবাৎ ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার দেখা হয়। কথাচ্ছলে ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করেন—

"শুনচি নাকি আপনি ওকালতি ক'রবেন স্থির ক'রেছেন, কথাটা কি ঠিক?"

বঙ্কিম—ভাবছি ওকালতি করবো, চাকুরী ভাল লাগে না, তবে এখনও ঠিক কর্ত্তে পারি নাই।

ভূদেব বাবু—আপনি উকীল হ'লে দেশের বিশেষ ক্ষতি হবে।

বঙ্কিম বাবু—কেন?

ভূদেব বাবু—তা হ'লে আর আমরা দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার মত নভেল পড়তে পাবো না।

এই কথার অর্থ বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করিলেন—বিশেষতঃ ভূদেব বাবুর ন্যায় লোকের অভিমত পাইয়া। ভূদেব বাবুর উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সাহিত্যই জীবনের আদর্শ করিয়া দেশবাসীর সেবায় নিরত থাকিবেন, ভবিষ্যৎ অর্থ সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিবেন, না স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আত্মোন্নতি করিবেন—বঙ্কিমচন্দ্র বিষম চিন্তায় পড়িলেন। অবশেষে সাহিত্যসেবার জন্য ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া 'জীবনের অভিসম্পাত' চাকুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিয়া ফেলিলেন। বঙ্কিম অতঃপরে কি করিলেন তাহা সকলেই দেখিবেন, কিন্তু এখানে সুচিকিৎসকের কাজ করিয়া ভূদেব বাবুও বাঙ্গলাসাহিত্যের ও বাঙ্গালী জাতির কম উপকার সাধন করেন নাই। এসময়ে ভূদেব বাবু ছাড়া অন্য কেহই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না। সুতরাং ইহার জন্যও ভূদেব বাবুর নিকটে বাঙ্গলা সাহিত্য কম ঋণী নয়!

ছুটি ফুরাইলে একটি স্বাস্থ্যকর জাগায় যাহাতে বদলী হইতে পারেন, এরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কমিশনার রিভার্স টমসনের (পরে স্যার রিভার্স টমসন) সহিত বঙ্কিমের মনোমালিন্য ছিল। বিশেষতঃ অন্যতম ডেপুটি, সাহেবদের প্রিয় রাজেন্দ্র মিত্র (ডক্টর রাজেন্দ্র নহেন) বঙ্কিমের উপর বড়ই ঈর্ষান্বিত ছিলেন। অবশেষে বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান।

'মৃণালিনী'তে প্রথম জাতীয়তা বোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাধবাচার্য্যই জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি হেমচন্দ্রকে উদ্দীপিত করিতেছেন—

"তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তুমি কি প্রকারে শত্রু-শাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?"

হেমচন্দ্র—রাজ্য, শিক্ষা, গর্ব্ব অতলজলে ডুবিয়া যাউক।

মাধবাচার্য্য—নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল? কেনই বা দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পর্য্যন্ত সকল বিদ্যা শিখাইলাম?

গৌড়রাজ্যের পতনের ইতিহাস সম্বন্ধেও এখানে আক্ষেপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"ষষ্টি বৎসর পরে মিনূহাজউদ্দিন এইরূপ লিখিয়াছেন, ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বল, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্র ফলক।

বাঙ্গলার খাঁটি ইতিহাস লাভ করিবার জন্য বঙ্কিমের এই প্রথম আগ্রহ!

আবার অন্যত্র বলিতেছেন—

"সেইদিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আগে নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেইদিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না—উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ইত স্বাভাবিক।

মৃণালিনীর একটী গান বঙ্কিমচন্দ্রের বড় প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই গাহিতেন—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥"

এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটী কাহিনী পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলেন। অন্য কোন প্রমাণাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম। মনোরমা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা হইবে। তবে উপন্যাসের সব চরিত্রই জীবন্ত। গিরিজায়াও হেমচন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

"বীরপুরুষ বটে; এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

এই সময়ে ইংরাজের জুতা বহিয়া যাহারা বাহিরে বাহাদুরি করিত, তাহাদের পক্ষে এই উক্তি উপযুক্ত কষাঘাত।

এবার যে দিল্লী গিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অভিজ্ঞতা জীবনে তিনি কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। "রাজসিংহ" দিল্লীর ঘটনা অবলম্বনে রচিত, মৃণালিনীতে দিল্লীর "রায় পিথোরার" প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গনভূমির কথা আছে, এবং বার্দ্ধক্যেও 'বৈদিক সাহিত্যে' বক্তৃতা দেওয়ার সময় দিল্লীর 'কুতব মিনারের' বিশাল পরিকল্পনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে।* 'মৃণালিনীতে' প্রয়াগের কথাও আছে—

"একদিন প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অপূর্ব্ব প্রাবৃট দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃটকাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিমগগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গাযমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায়

* In early life I stood at the foot of Kutab Minar wondering at the long shadow which the tall pile cast on the fields smiling in the bright morning sun. Nearly thirty years later I find myself lost in wonder and awe at the all enveloping shadow that the lofty heights to which the old vedic Rishis ascended now cast upon our vaunted mondern culture. May that shadow never grow less. ; Lecture at the Higher Trainning Association, in 189

উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগ-বৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।"

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র Bengal Social Science Association-এর সভায় ১৮৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী "Origin of Hindu Festivals" (হিন্দু উৎসবাদির উৎপত্তি বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। সভাপতি হইয়াছিলেন Mr. Justice Phear—সভাপতি মহাশয় নানা তথ্য সমন্বিত প্রবন্ধ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাদরী লঙ, ওড্রো ও বেভারলী সাহেব (সিভিলিয়ান) আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ও একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।*

[বঙ্কিমের প্রবন্ধের অনুবাদ করেন স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৩২২এর 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়।]

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ছয়মাস ছুটি শেষ হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু দিন বাড়ী থাকিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মস্থান বহরমপুরে চলিয়া যান। [ক্রমশঃ

* উভয়ের প্রবন্ধই Transactions of the Associationsএ বাহির হয়—বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯-এর, আর মিত্র মহাশয়েরটী ১৮৬৮-এ। এসম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মেরী কার্পেণ্টারের উৎসাহে এই এসোসিয়েশন ১৮৬৭-এ গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন মিঃ জাষ্টিস নরম্যান, ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র, ফিয়ার (Sir John Phear) ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সভ্য ছিলেন।

প্রকৃতি ও মানুষ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তোমারে গিয়েছি ভুলে হে বিশ্বপ্রকৃতি
অনন্ত লাবণ্যময়ী! তোমার মাধুরী,
তব বর্ণ সমারোহ, বিচিত্র বিলাস
ভুলে কভু নাহি দেখি! কোথা অবকাশ?
কোথা সেই স্নিগ্ধ শান্তি, নিঝুম নিভৃতি—
জীবন মনের রসায়ন? হেরি শুধু
সীমাহীন উতরোল কর্ম্মপারাবার
কল্লোলিছে চতুর্দ্দিকে; আর তার মাঝে
কাঁদে ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী হৃদয়!
জীবনে সুন্দর গেছে পলাইয়া মোর,—
দিশি দিশি অসুন্দর, কুৎসিতের মেলা!
শুধু বাঁচিবার লাগি' প্রমত্ত প্রয়াস,—
তোমা পানে চাহিবার কোথা অবসর?
কেমনে করিব পান দু'টি আঁখি দিয়া
সৌন্দর্য্য তোমার? শুভ্র জোৎস্নাফুল্লরাতি,

চিরদিন। কোনো স্তব এ হৃদয় হ'তে
উঠে না উচ্ছ্বসি'!—স্তব স্তুতি, আরাধনা
যাহা কিছু সবি মোর মানুষের লাগি'!
ভুলে গেছি কবি আমি রূপের পূজারী,—
ছন্দোগীতি-কল্পনার অনন্ত বৈভব
চিত্তে মোর! তবু তুমি ডাকো—মোরে ডাকো
দুলাইয়া বনবেণী কূজনে, গুঞ্জনে
আভাষে ইঙ্গিতে! হায়, সে মুগ্ধ আহ্বানে
দিই নাকো কোনো সাড়া, উঠি না উল্লসি'।
এ জীবন অন্ধকার কারাকক্ষসম,—
নাহি শান্তি, নাহি আলো, নাহি সমীরণ!
কহ তব মুক্তিমন্ত্র আর একবার
কানে কানে গানে গানে ওগো মায়াময়ী!
এই ঘৃণ্য, অসুন্দর পরিবেশ হ'তে
ফিরে যাই শান্ত, স্নিগ্ধ ভুবনে তোমার—
যেথা শুধু পাখী গায়, নদী ধায়, ফুল ফুটে রয়!

একখানি তিব্বতীয় নাটিকা

শ্রীগুরুদাস সরকার

তিব্বতের ধর্ম্মবিষয়ক যাত্রাগান প্রায়শঃ জাতক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রবন্ধে বর্ণিত নান্‌সাল্‌ নাটিকাটির আখ্যানভাগ খাঁটি তিব্বতীয়। পারিপার্শ্বিকেও তিব্বতীয় ছাড়া কোনও বিদেশী প্রভাব লক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্যাগিনী নান্‌সাল্‌, মীরাবাঈ ও করমেতি বাঈয়ের সহিত তুলনীয়া, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কেহই সন্তানের জননী ছিলেন না এবং তাঁহাদের কাহাকেও স্তন্যপায়ী শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই। লেখককে মূল আখ্যায়িকার ফরাসী অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। মঁশিয়ে বাকো (Bacot) কৃত এই অনুবাদটি ঠিক নাটকাকারে গ্রথিত নয়, মূলেও বোধ হয় এইরূপই আছে, তবে ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নাটকীয় ঘটনার গতি অতি শ্লথ। সংসারের অসারতাই রচয়িতার প্রধান প্রতিপাদ্য। বিশেষ করিয়া তরুণীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই যেন নান্‌সাল্‌ চরিত্রের অবতারণা।

সং-খা-পা, সংস্কৃতে যাঁহার নাম ছিল আর্য্য মহারত্ন সুমতি কীর্ত্তি, তিনি ছিলেন সংখা উপত্যকার বাসিন্দা। হরিদ্রাবর্ণ শিরোভূষণধারী (Yellow Hat) লামা সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। সং-খা-পা আবির্ভূত হন খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, তিনি মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। নান্‌সালে সং-খা-পা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের প্রভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনুষ্য জন্ম জীবাত্মা যে একবার মাত্র লাভ করিতে পারে, এ কথা একাধিক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের কোনও সুদৃঢ় ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এবার নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। নান্‌সালের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্নেহ-মমতা ছিল না, মমত্ব বোধ কম ছিল, এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। পারলৌকিক অমঙ্গলের ভয়ে নান্‌সাল্‌ যে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন—এ কথা সত্য হইলেও, তাঁহার পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া বোধ হইতে ছিল—তাঁহার জননীর ধর্ম্মাচরণে অনাস্থা হেতু, তাই ধারণা জন্মে যে, সকল কিছুর মূলে রহিয়াছে মাতা ও কন্যার আদর্শের সংঘাত। মাতার হৃদয়ে ছিল প্রবল বিষয়তৃষ্ণা আর নির্ব্বাণপ্রার্থিনী নান্‌সাল্‌ সকল কিছু ত্যাগ করিয়া, ত্রিশরণই তাঁহার একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটিকার অপর স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে, কেহবা ভাল, কেহবা মন্দ, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বাভাবিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নান্‌সালের মধুর স্বভাব তাঁহার ননন্দা ও শ্বশ্রূকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, উভয়েই তাঁহার উপর নিতান্ত বিরূপ ছিলেন। পুরুষদিগের মধ্যে "যশোযোগ্য" সত্যই ক্রূর প্রকৃতির পশুর সহিত তুলনীয়। মূল তিব্বতীয় পুঁথিতে লেখকের অনবধানতা হেতু তাঁহাকে একবার নান্‌সালের দেবর, আর একবার তাঁহার সপত্নী-পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সপত্নী-পুত্র হওয়াই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এক স্থলে নান্‌সালের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার দেবরের ব্যবহার তাঁহার পতিগৃহে বাসের পক্ষেই অনুকূল ছিল।

নান্‌সালের স্বামী রিনাঘ্‌কে নিতান্ত মন্দ লোক বলিয়া মনে হয় না। বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি শুধু রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া। এরূপ ক্ষেত্রে, কিছুদিন পরে, নবোঢ়ার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যাইবারই কথা, এবং

কমিয়া যে গিয়াছিল সে কথা নান্‌সাল্ নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। রিনাঘ্ কোনও দিন যে স্বয়ং পত্নীর উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন করিয়াছিল তাঁহার ভগ্নী "সহস্র শুক"। নাটকের কোনও ঘটনা সম্পর্কে তাঁহার প্রথমা পত্নীর উল্লেখ তিনি করেন নাই। সে পত্নী তখন জীবিত না মৃত তাহাও জানিবার উপায় নাই। নান্‌সালের স্বামীগৃহ ত্যাগের পর রিনাঘ্ শ্বশুরালয়ে তাঁহার সন্ধান লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নান্‌সাল্‌কে যে কোনও রূপ তর্জ্জন, তিরস্কার, বা ভয়-প্রদর্শন করেন নাই—ইহাতেই তাঁহার স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মঁশিয়ে বাকো (Bacot) লিখিয়াছেন যে, তিব্বতীয় সমাজবিধি মতে পতি পত্নীর এক বৎসর একত্র বাসের পর তাঁহারা স্বেচ্ছায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন। রিনাঘ্ নাকি এই জন্যই বল প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রিনাঘ্ যে ছান্ প্রদেশের সামন্তপাদীয় শাসনকর্ত্তা, তাঁহার ক্ষমতা যে অপরিসীম, সে কথা ভুলিলেও চলিবে না। নান্‌সালের মাতা এবং নান্‌সালের গুরু সেরাগের মঠাধীশ প্রধান লামা, তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাই এ ক্ষেত্রে রিনাঘের আত্ম-সংযম প্রশংসনীয়ই বলিতে হয়। 31648

যোগসাধনরতা নান্‌সাল্‌কে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন তাঁহার মাতা ও তাঁহার স্বামী। তাঁহার তরুণী পত্নীর তপঃপ্রভাব যে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈহিক শক্তির অপেক্ষাও অধিক—এ কথা রিনাঘ্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গৃহত্যাগিনী করমেতি বাঈকে বৃন্দাবন হইতে ফিরাইয়া আনিতে গিয়া তাঁহার পিতা কন্যার তপঃশক্তিতে অভিভূত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া॥"

ভারতীয় সাধিকার সহিত এ সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্নীর উপদেশ অনুযায়ী তিনি যে অতঃপর ধর্ম্মজীবন যাপন করিবেন, রিনাঘ্ এরূপ অঙ্গীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই নান্‌সাল্, কোথাও বা গান গাহিয়া কথার উত্তর দিয়াছেন, কোথাও বা সুরসংযোগে গাথা উচ্চারণ করিয়াছেন। শ্রীভক্তমালে আছে সাধ্বী মীরাবাঈয়ের "গান শক্তি" ছিল—

"—অসম্ভব অমৃত নিন্দিত,
যাহে দ্রবীভূত হইল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥"

নান্‌সাল্‌ও হয়তো সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন, কিন্তু এ কথার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। গল্পে কথোপকথন যাহাতে নিতান্ত একঘেয়ে না হইয়া পড়ে, মনে হয় সেইজন্যই গান ও গাথাগুলি অল্পাধিক ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথেষ্ট গান না থাকিলে কোন পালাই যে সহজে জমিতে চাহে না!

যেখানে শিশুপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার নিকট হইতে নান্‌সাল বিদায় লইতেছেন, আর যেখানে তাঁহার অধীরা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যোগাসন ত্যাগ করিয়া তিনি গুহার বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, নাটকের এই দুইটি স্থানই নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী। উভয় স্থানেই তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি- তাঁহার সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মাতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নান্‌সালের গুরু সিদ্ধযোগী "মুক্তি পথের পথ প্রদর্শক শাক্য শ্রেষ্ঠ," ভালরূপে পরীক্ষা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য করেন নাই। যতবারই তিনি নান্‌সাল্‌কে পত্নী, মাতা ও কন্যা হিসাবে তাঁহার বিবিধ কর্ত্তব্যের কথা—, তাঁহার ন্যায় বিলাসে লালিতা তরুণীর ধর্ম্মের কঠোর পথের অনুপযোগিতার কথা, সাধনবর্ত্মে নানা বিঘ্ন ও বাধা বিপত্তির কথা, উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন, ততবারই নান্‌সাল্ পরম একাগ্রতার সহিত গুরু সমীপে তাঁহার ঐকান্তিক কামনার কথা নিবেদন করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাতর প্রার্থনা আর উপেক্ষিত হয় নাই। এই দৃঢ় নিষ্ঠা ও একাগ্রতাই নানসালের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। যে দুইজন লামা নান্‌সালকে পতিগৃহ ত্যাগের পূর্ব্বে উপযুক্ত গুরুর সন্ধান দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন, আকস্মিক ভাবে তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ,

অতি প্রাকৃত ঘটনার বিষয়ীভূত বলিয়াই ধরিতে হয়। পিতৃগৃহ ত্যাগের পর একটি সেতুর সান্নিধ্যে কৃষ্ণাকার ছায়া মূর্ত্তির ন্যায় যে দুই জন লামার নিকট তিনি তাঁহার গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও তাঁহাকে সেই একই গুরুর সন্ধান দিয়াছিলেন। ইহাও একরূপ দেবোদ্দিষ্ট ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। লোকাপবাদের ভয় দেখাইয়া, লামাগুরু তাঁহাকে মঠ ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া যে তপশ্চরণ করার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে নান্‌সালের সাধনার পথ যে সুগম হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই নাটিকাটি আকারে ও বিষয়বস্তুতে অনেকটা ইংরাজী "মিষ্ট্রী প্লে" (Mystory play) শ্রেণীর। অনুবাদকও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, অতি দুর্গম দেশবাসী, স্বল্পপরিচিত এক জাতির জাতীয় সাহিত্যের ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের মাপকাঠিতে সকল কিছু মাপ করিতে গেলে চলিবে না।

লেখকের লেখনী দুইচারিটি টানে গ্রামের হাটতলার চিত্র, পশম ব্যবসায়ীদের বস্তা বাঁধার চিত্র, বস্ত্র বয়নরত গ্রাম্য তরুণীদের পারিবারিক বয়নশালার চিত্র, এবং অলস গ্রামবৃদ্ধদের এবং ক্রীড়ারত শিশুদের, গালগল্পে এবং ক্রীড়ায় মত্ত থাকিয়া কাল ও বয়সোপযোগী অবসর বিনোদনের চিত্র, সত্যই বেশ জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইয়াছে।

এ কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, পশম তিব্বতের একটি প্রধান পণ্য। বিভিন্ন হাট হইতে সংগৃহীত হইয়া উহা বিদেশে চালানের জন্য দুর্গম গিরিপথ দিয়া অশ্বতরপৃষ্ঠে কালিম্পং-এর বাজারে প্রেরিত হইয়া থাকে। কার্পেট শিল্পের জন্য তিব্বতীয় পশুলোমের মার্কিণ দেশে যথেষ্ট চাহিদা আছে।

পার্ব্বত্য প্রস্রবণের জল যেখানে সঞ্চিত হইয়া স্বচ্ছতোয়া সরসীর আকার ধারণ করিয়াছে, গ্রামের সেই জল আহরণের স্থানটি স্বতঃই সন্ধ্যা ও অপরাহ্ণ বেলায় পল্লী বধূদের জল আহরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পিতৃগৃহের শ্রমক্লান্ত পরিচারিকাদিগকে না পাঠাইয়া, নানসাল্ নিজেই জল আনিতে গিয়া জননীর তিরস্কার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বাত্যায় বিক্ষুব্ধ জলের স্বচ্ছতা ও নীলাভ দীপ্তি বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার নিজের জীবনও যে অচিরস্থায়ী···এই কথাই মনে হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, ঝটিকায় উদ্বেলিত হইলে যেরূপ জলের স্বচ্ছতা লুপ্ত হয়, তলদেশ আর দৃষ্ট হয় না, মৃত্যু উপস্থিত হইলে তেমনি পরিতাপের আর অবসর থাকে না, স্বচ্ছ দৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের সুবিধা হইবে, অনিচ্ছুক লামা-গুরু তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে নানসাল্ কয়েক স্থলে শুধু অযথা পতিনিন্দা নয়, পিতৃগৃহেরও নিন্দা করিয়াছেন, এবং নাটিকার প্রথমাংশেই, বিবাহ যাহাতে না করিতে হয় সেই জন্য রিনাথের পার্শ্বচরের নিকট আপনার মিথ্যা পরিচয় দিয়াছেন। উদ্দেশ্য অসাধু না হইলেও তাঁহার এরূপ কার্য্যের সমর্থন করা যায় না, তাঁহার ন্যায় উচ্চস্তরের সাধিকার এরূপ আচরণ আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অসমঞ্জস ও খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি তো অবতার নন, শুধু মুক্তিকামী মানবাত্মা মাত্র, তাই মানবোচিত দুর্ব্বলতা, তাঁহার বেলাতেও, কতকটা না থাকিয়া পারে না। হয়তো বা সাধারণ তিব্বতীয়-দিগের নৈতিক আদর্শ "end justifies the means" এই মতেরই সমর্থক হইবে, এবং নাট্যকার উহার প্রভাব একেবারে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। আলোচনা শেষে, গ্রন্থ সমাপ্তি সূচক আশীর্ব্বচনটির উল্লেখ না করিলে অনেক কিছুই বাদ পড়িয়া যায়। উহা প্রতিধ্বনিত করিয়া আমরাও বলিব—

"দুর্ব্বলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হউক,
সকলের চিত্তে আনন্দ বিরাজ করুক,
সুখী হউন আপনারা সকলে।"

নীলা

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায়ামেরও বোধ হয় হেলেনকে দেখে এতোটা চমক লাগেনি যতটা চমক আমার লাগলো নীলাকে দেখে। নীলাভ সমুদ্রের আভা তার চোখের তারায়, পরনে নীল সাড়ী, নীল আকাশের দিকে সুদূর প্রসারী তার দৃষ্টি। বিহারের কোন এক উপজেলা সহরের হোটেলে যে ঐ রকম মেয়েকে আবিষ্কার কোরতে পারবো তা' আমি কল্পনাও কোরতে পারিনি।

প্রথমে পরিচয় তার সাড়ীর সঙ্গে। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের রেলিং থেকে নীল রঙের একটা সাড়ী এসে পড়লো একেবারে আমার পায়ের কাছে—যেন জানালো অভিনন্দন। আর একটু হোলে ত' পায়ের তলাতেই চলে যেতো সাড়ীটা। ভাগ্যিস দেখেছিলুম! মিনিট-খানেক দাঁড়িয়ে রইলুম সাড়ীটার দিকে চেয়ে—মরুভূমিতে হঠাৎ মরুদ্যানের সন্ধান পেলে পথিকরা যেমন দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্ময় ও আনন্দের আতিশয্যে।

এক ভদ্রলোক আরাম কেদারায় শুয়ে পাইপ টানছিলেন। তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তেই তিনি জানালেন স্বাগত সম্ভাষণ। কিন্তু সম্ভাষণের কায়দাটা ঠিক হোটেল-আলার মতো নয়, গৃহস্বামী অতিথিকে যেমনভাবে সাদর আহ্বান জানান অনেকটা সেই রকম।

ছিপ্ ছিপে দোহারা গড়ন ভদ্রলোকের। আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে ও পরনে লংক্লথের পায়জামা। চোখে রিমলেশ চশমা। দেহটা ঈষৎ ধনুকের মতো বাঁকা—ইচ্ছাকৃত কিংবা স্বাভাবিক ঠিক বোঝা গেল না। মাথার চুলে সাদা রঙের ছোপ পড়েছে, মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ। বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। পাইপটা হাতে নিয়ে কেদারা ছেড়ে আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন —আসুন।

প্রথমটা ইতস্ততঃ কোরছিলাম: আপনিই কি এই···

আমাকে কথা শেষ কোরতে না দিয়েই বললেন তিনি: হাঁ, আমিই হোটেলের ম্যানেজার বা মালিক—যা ইচ্ছে বলুন। অবশ্য আমার হোটেল অনেকটা বিশেষ ধরণের। সাধারণ হোটেলের সঙ্গে এর অনেকখানি প্রভেদ।

আমাদেরও তাই মনে হোয়েছিল।

ওপরে উঠে এলুম। সুশীল, আশিস ও ধীরেনও এলো উঠে। বারান্দা সংলগ্ন ঘরটার মধ্যে একদিকে গোটা চারেক বেতের চেয়ার, মাঝখানে বেতের টেবল; অপর পাশে গদীআঁটা খাট ও একটা সাধারণ তক্তপোষ। ঘরের পর অন্য আর একটা বারান্দা। সেই বারান্দাকে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে খান তিনেক ঘর। সেই ঘরগুলো ও বারান্দাকে আবার ছুঁয়ে রয়েছে ছোট্ট ফুলের বাগান। বসার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র এক রকম।

ভদ্রলোক সামনের চেয়ার দেখিয়ে আমাদের বোসতে অনুরোধ কোরলেন।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বোসতে বোসতে দেওয়ালগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখলুম। একটু অভিনব বোলে মনে হোলো! চারটে দেয়াল জুড়ে ছবি—নানা রকমের, নানা রকম ভঙ্গীর। তার মধ্যে নাচের ভঙ্গীই বেশি। দু' একটা অন্য জাতের হাতে আঁকা ছবিও যে না রয়েছে, তা নয়। একদিকের ছবিতে দেখলুম একটি মেয়ে নিদ্রাপ্লুত নয়নে ঢুলছে—তার বেশ-বাস বিস্রস্ত, কুন্তল আলুলায়িত। অন্য আর একটি ছবিতে একটি মেয়ে গভীর ভাবে চুম্বন কোরছে তার প্রিয়তমকে। মেয়েটির দৃষ্টিতে মদনবাণের পরশ, অধরে রতির মোহাবেশ।

এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি ছবিটার দিকে, হঠাৎ খেয়াল হোলো ভদ্রলোকের কথায়: আপনি দেখছি আর্টের বেশ সমজদার—you are really a lover of art, তা' পরে ধীরে-সুস্থে দেখবেন—অন্যান্য ঘরেও ঐ রকম নানা ছবি আছে।

লজ্জিত হলুম। তাড়াতাড়ি মুখটা নামিয়ে নিয়ে কৈফিয়ৎ স্বরূপ একটা কি বোলতে যাচ্ছিলুম; ভদ্রলোক বাধা দিলেন: না না, এতে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই—এ রকম হয়েই থাকে। রসিকজন কখন যে রসে তন্ময় হয়ে যান, তা তাঁরা নিজেরাও জানতে পারেন না।

উত্তর দেওয়া বৃথা জেনে চুপ কোরে গেলুম। এর পরে স্নানের পালা চুকিয়ে দিলে আহারের উদ্যোগপর্ব্ব চোলতে লাগলো।

খাবার টেবলে শুনতে পেলুম অলক্ষ্যের চুড়ির রিম্‌ঝিম্ ও টুং টাং শব্দ! এ রকম বিশেষ শব্দের ওপোর মানুষের লোভ

চিরন্তন। চোখের দৃষ্টি ষ্টীমারের সার্চলাইটের মতোই আশে পাশে ঘোরাফেরা কোরতে লাগলো কোন বিশেষ ব্যক্তিকে খোঁজার উদ্দেশ্যে।

খাওয়ার আয়োজন হ'য়েছিল প্রচুর—সাধারণত: জামাইদের সৌভাগ্যেই এ রকম হওয়া সম্ভব—হোটেলওয়ালারা যে শ্বশুর বাড়ীর মতো আদর আপ্যায়ন ক'রতে জানে এ ধারণা আগে আমার কোনদিনই ছিল না। পৈটিক দেবতাকে পূরোপূরি সন্তুষ্ট ক'রেই উঠলুম। কারণ আর যাই হোক পয়সাটা কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব মিলিয়ে দিতে হবে—সেখানে আর জামাই আদর চলবে না।

মনটা সারাক্ষণ মশগুল হয়ে রইল কোন একজনকে আবিষ্কারের নেশায়।

*

উঠন...উঠন, অনেক বেলা হয়ে গেছে...আপনার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে একেবারে।

শুয়ে শুয়ে মশারীর ভেতর থেকে নারী-কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে উঠে ব'সলুম ব্যস্ত ভাবে। ততোক্ষণে আমার মশারীটা হাত দিয়ে সরিয়ে ফেলেছে আগন্তুক। দৃষ্টি বিনিময় হোলো সঙ্গে সঙ্গে। এই আমি প্রথম দেখলুম নীলাকে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সে—তার হাতে চায়ের কাপ। প্রশ্ন জানালাম বিস্ময়াভূত কণ্ঠে: আপনি...

হ্যাঁ, আমি; আমি নীলা। এখানে থেকে অতিথি সেবা করি। নিন, নিন, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা'টা খেয়ে নিন্—জল এনে রেখেছি বারান্দায়। পরে আলাপ হবে ভালো ক'রে—সলজ্জ হাসি নীলার চোখে মুখে।

তক্ষুণি জবাব দিতে পারলুম না। নিজের অজান্তেই কয়েক মিনিট চেয়ে রইলুম তার দিকে। সদ্যস্নাতা সে। সিক্ত চুলগুলোকে পরিপাটি ক'রে পিঠের ওপোর ছড়িয়ে দিয়েছে। পরণে সাধারণ দেশী সাড়ী। স্নিগ্ধ হাস্যময়ী মুখ। এখানকার নীলাকে দেখে পরবর্ত্তী নীলাকে যেন কল্পনাও করা যায় না। এই নীলার ভেতরেই যে লুকিয়ে ছিল অত রহস্য তা' তখনি জানবো কি ক'রে?

নীলার কথায় খেয়াল হোলো: কি ব্যাপার, অতো ভাবছেন কি? বন্ধুদের কথা? তাঁরা অনেক ক'রে আপনাকে তুলতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বেড়াতে চ'লে গেছে। ওরা চ'লে গেলে পর আপনার চা বানিয়েছি। কিন্তু তা'ও যখন ঠাণ্ডা হ'তে চলল, তখন ভাবলুম না ডেকে তুল্লে আপনার চা খাওয়া হবে না—তাই নিজেই চা নিয়ে এলুম।

সত্যিই তাই, এবারে সহজভাবে বল্লুম আমি, থাকি মেসে, ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ওঠবার অভ্যেস নেই। তাই অনেক সময় চা'টা আর ভাত'টা এক আসনে ব'সেই খেয়ে নিতে হয়।

সেটা আপনার বলার আগে আপনার ঘুমের বহর দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। উত্তর দিল নীলা, যাই হোক চা'টা এবারে খেয়ে নিন, ইতিমধ্যে খাবার জুড়িয়ে গেছে বোধ হয়।

ধন্যবাদ!—কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করলুম, আমার চা খাওয়ার সম্বন্ধেও যে কেউ চিন্তা ক'র্‌তে পারে তা' আমি কল্পনাও ক'রতে পারি না। ব্যাপারটা একটা নতুন অনুভূতি জাগায়। আনমনা হয়ে উঠলুম কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে; পরে বল্লুম: ঠাণ্ডা চা খেয়ে খেয়ে ঠাণ্ডাটাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে—কাজেই ঠাণ্ডা চা'তে আমার কোন অসুবিধেই হবে না।

ধূমায়িত কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলুম। আঃ! একটা আরামসূচক ধ্বনি উচ্চারিত হলো জিবের সঙ্কেতে।

সত্যিই আপনি অদ্ভুত, বল্লে নীলা হেসে। তার হাসিতে কি এক অজানা মাদকতার আভাস পেলুম। এতো অল্পেতে চিনে ফেল্লেন? প্রশ্ন জানালাম।

সময়ের দীর্ঘতাই জানার একমাত্র মাপকাঠি নয়। অনেক মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যেও বোঝা যায়, আপনি সে জাতীয় লোক। এখন আমি চলি, অনেক কাজ পড়ে আছে, পরে আবার দেখা হবে।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই চলে গেলো নীলা। ভাবতে লাগ্‌লুম নীলার কথা—তার কথাই ভাবলুম। আমার মনটা সে এমন ভাবে আচ্ছন্ন কোরে রইলো যে শরীর খারাপের অজুহাতে বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে পর্য্যন্ত বেরোলুম না।

* *

হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে বিছানায় উঠে বোস্‌লুম। রাত তখন খুব বেশী নয়—পাশের কোন দেয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজলো। ভেতরের বারান্দায় যেন আলোর হাট ব'সেছে। তার আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগোলাম। দরজার কাছাকাছি আসতেই দৃষ্টি বিনিময় হলো নীলার সঙ্গে। তার নীল তারার দৃষ্টিতে সমুদ্রের গভীরতা—কি যেন বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে তার চোখের ঐ দু'টি তারায়। ভেতরে অবগাহন না কোরলে রহস্যের কোন কিনারা

করা যাবে না। এই কি সেই সকালের নীলা? যেন চেনাই যাচ্ছে না একেবারে!

চোখের ইসারায় আমায় আহ্বান জানাল সে। বারান্দায় গেলুম। বিরাট ফরাস পাতা—জন আটেক লোক বোসে, হাতে তাস। উপরি আরো দু'চার জন রয়েছে সাকরেদি করার জন্যে। একপাশে ছোট্ট একটি রূপোলি পাহাড়—আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকায় ভর্ত্তি। ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝ্‌তে কিছুই বাকী রইল না। চোরা চাউনি দিয়ে একবার তির্য্যক গতিতে চেয়ে নিলুম কয়েনগুলোর দিকে।

নীলা লক্ষ্য ক'রেছে আমার দৃষ্টি। পলকে চোখ ফিরিয়ে সে পাশের ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য ক'রে বল্লে, কি ব্যাপার জীবনবাবু—এতো মুষড়ে প'ড়েছেন কেন?—এক কাপ চা দেবো নাকি? কথিত জীবনবাবু তাঁর হাতের তাসের দিকে সমস্ত একাগ্রতা প্রয়োগ কোরে ছিলেন। নীলার কথায় তাঁর সেই একাগ্রতায় বাধা পড়লো। বল্লেন তিনি নীলার দিকে চেয়ে একটু রহস্য ক'রে, তা' দাও না সুন্দরী তোমার হাতের এক কাপ চা—ভাগ্যটা তা' হ'লে ফেরে কিনা একবার পরখ ক'রে দেখি।

সামনেই চায়ের ট্রে ছিল। নীলা সোনালী রঙের কেটলী থেকে সোনালী রংয়ের কাপে গরম লীকার ঢাল্‌লো। তারপর দুধ ও চিনি মিশিয়ে চায়ের কাপটা তুলে দিলো জীবনবাবুর হাতে।

জীবনবাবু খুসী হয়ে বল্লেন: বহুত আচ্ছা, আজ তোমার প্রচুর বক্‌সিস্ মিল্‌বে।

জী—হুজুর! আপকো মর্জ্জি। নীলা একটু প্রগল্‌ভ্‌ হয়ে ওঠে।

কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো মনটা। অথচ কারণও কিছু নেই। সত্যিই তো নীলার ওপোর নেই আমার কোন অধিকার। তবে কেন এই রোষ?—এর জবাব মনের কাছে সহজে মিল্‌লো না—হয়তো সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই মানুষের মনটা গ'ড়ে উঠেছে এইভাবে।

নজর পড়লো হঠাৎ সকালের সেই আদ্দির পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকের দিকে। এক কোণায় ব'সে তিনি টাকা গুনছেন। তাঁর কোচরটা কয়েনে ভারী হ'য়ে উঠেছে। হাতছানি দিয়ে নীলাকে তিনি ডাকলেন: শোন নীলা, এই টাকাগুলো নিয়ে যাও, আর আলমারী থেকে বোতল ও গ্লাসগুলো বার করো। ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝ্‌তে পারলুম। একটু পরেই যথাযথ আদেশ পালন ক'রলো নীলা।

পুলিংয়ের টাকাটা রেখে এসে শেরির বোতল ও গ্লাসগুলো রাখলো সে সব্বাইর মাঝখানে।

শরৎবাবু ঝানু খেলোয়ার। দু দু বার ট্রাই হোয়েছে তাঁর। প্রথমে গ্লাসে গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে অন্যান্য সবাইকে তিনিই কোরলেন বিতরণ। মণ্ডলীরা যথাকর্ত্তব্য পালন কোরলেন। সিগারেটের পাতলা ধোঁয়ায় জায়গাটা উঠলো ভরে। খেলাটা উঠেছে জমে। ব্রজেনবাবু ব'সেছেন শরৎবাবুর ঠিক বিপরীত দিকে। তাঁর দিকে চাইতেই দেখলুম তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে শরৎবাবুকে যেন বিশেষ কিছু ব'লতে চাইছেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। আমার সঙ্গে নীলার দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই সে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা প্রকাশ ক'রতে বারণ ক'রলো। তা' হ'লে সেও কি বুঝ্‌তে পেরেছে ব্যাপারটা!

এই সুযোগে আরো একবার চেয়ে নিলুম নীলার দিকে। হঠাৎ চাইলে চোখ ঝলসে যায়। নীল সাড়ীটাকে পেঁচিয়ে কোমড়ে জড়িয়েছে। ত্রিশূলাকৃতি টিপ কপালে, হাতে সূক্ষ্ম একজোড়া কঙ্কন। সহজেই বেশ একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। তার চোখের দৃষ্টিতে চিরকালের নারীত্বের মোহময় আবেশ—সহজেই পুরুষকে কাছে টানতে চায়।—আবার মনে হোলো সকালের কথা। সত্যি সকালের নীলাতে আর এখনকার নীলাতে কত তফাৎ। এই কি সে'ই নীলা যে সকালে অতো দরদী মন নিয়ে আমার জন্যে চা নিয়ে ব'সে ছিলো? বিশ্বাস ক'রতে যেন মন চাইছে না। এ রকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নীলাকে বুঝি মানায় না—অন্ততঃ আমার মন তা' স্বীকার ক'রে নিতে চাইলো না।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ কোরছিলুম। সবাই যেন অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। মনে হচ্ছে আমি অবাঞ্ছিত—এ' আসরে প্রবেশের ছাড়পত্র আমার নেই।

ম্যানেজার ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে ভদ্রতার রেসটা বজায় রাখবার জন্যেই যেন একবার বল্লেন, খেলবেন নাকি এক হাত?

আমতা আমতা কোরতে থাকি...আমি--আমি—কোন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোতে চায়না।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, বুঝেছি। বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না, এই তো? আচ্ছা তা হলে থাক।

খেলা আবার চলতে লাগলো পূরোদমে। চোখের ইসারা আর হাতের তাস দেখা ছাড়া অন্য কোন কথাবার্ত্তা নেই।

ভালো লাগলো না এদের সঙ্গ। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাংলোর সামনের খোলা জায়গায় পায়চারি কোরতে লাগলুম। কিছুক্ষণ বাদে বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বোসলুম তাতে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। মুঠো মুঠো আলো অকৃপণ হাতে গাছ-পালা পাহাড়-পর্ব্বতের ওপোর ছড়িয়ে দিয়েছে সে

হঠাৎ পেছনে কার হাতের স্পর্শ অনুভব কোরলুম। চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নীলা। বিস্ময়ে মনটা ভরে উঠলো। এই জ্যোৎস্না রাতে এ' রকম নির্জ্জন জায়গায় স্বল্প পরিচিত একজন যুবককে যে একটি মেয়ে অসঙ্কোচে স্পর্শ কোরতে পারে তা' সাধারণ মন দিয়ে কল্পনাও করা যায় না। মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠলুম। হয়তো ফ্লার্ট করার এ' এক নোতুন পন্থা। সোজাসুজি হাত পাততে পারছেনা তাই নানান ছলনার আশ্রয় নিয়েছে।

চিন্তায় বাধা পড়লো নীলার কথায়: আমাকে এই অবস্থায় দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছেন, না? ভাবছেন মেয়েটা কি বেহায়া—সাধারণ শালীনতাবোধটুকু পর্য্যন্ত নেই? ভালো কোরে পরিচয় হোতে না হোতেই ফ্লার্ট করার অভিনয় সুরু করে দিয়েছে, তাই নয়?

নীলা যে সত্যি আমার মনের কথাটা এ' রকম ভাবে ধরতে পারবে তা আমি বুঝতে পারিনি। তা হলেও সত্যি কথাটা ত' আর সব সময় সবক্ষেত্রে প্রকাশ করা চলে না? তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লুম: না ঠিক তা নয়। আমার বরঞ্চ আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে অন্য কারণে—আপনার সহজ-স্বচ্ছ নির্ভীক ভাব যেন ভালোই লাগ্‌ছে।

কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা মনে হোলো আমার মতো নীলাও ধরতে পেরেছে।

বল্লে সে নিঃসঙ্কোচে: কথাটা যে মিথ্যে তা আপনিও যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। তবে যতোটা খারাপ আমায় ভাবছেন ততটা খারাপ আমি নই। আসুন না মাঠটার মাঝখানে গিয়ে বসি—দু'জনেই বসা যাবে। ভয় নেই, আমি আপনাকে ইলোপ কোরে পালাবো না।—মুখের ভাবটা এমন কোর্‌লো নীলা দেখে যেন মনে হোলো সত্যি আমি ইলোপমেন্টের ভয় পেয়েছি।

আমার পৌরুষে ঘা লাগলো। একটা মেয়ের যা সাহস আছে আমার সেটুকু সাহসও নেই? —চেয়ার ছেড়ে উঠে মাঠের দিকে এগোলাম। নীলাও চল্ল সঙ্গে। গিয়ে বোসলুম একটা গাছের গুড়ির ওপোর দু'জনে।

প্রথমেই মুখ খুল্লো নীলা: সত্যিই আমার জীবনটা বিচিত্র। মুখ তুলে চাইলুম নীলার দিকে।

সে'ও আমার দিকে মুখ তুলে চাইলো: হ্যাঁ সত্যিই নানা বৈচিত্র্যভরা আমার জীবনটা। ঐ যে লোকটি, অর্থাৎ হোটেলের ম্যানেজার—একটু থেমে কথা শেষ কোরলো নীলা: উনি—উনি আমার স্বামী।

বলেন কি? আচমকা মুখ দিয়ে আপন হতেই যেন কথাটা বেরিয়ে গেলো। এই মুহূর্ত্তে বিরাট একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলে কিংবা চাঁদটা হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়লেও বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য বোধ করতুম না। বলে চল্লো নীলা: এ' আমাকে অভিনয় কোরতে হয়, তাই এ' রকম বেশ, এ' রকম ভঙ্গী। —থামলো কিছুক্ষণের জন্যে সে। তাঁর কথার যেন নীরব সম্মতি পেতে চায় আমার কাছ থেকে।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম: বলুন।

আবার সুরু কোরলো নীলা: প্রায় পাঁচ বছর আগে আমার বিয়ে হয়। অবশ্য বিয়ে সেটা নয়—বিয়ের নামে জোর কোরে আমার ইজ্জতই হরণ করা হোয়েছিল কয়েক দিনের চেষ্টায়। —বেহালার বিখ্যাত জমিদার সুপ্রসন্ন রায়, নামকরা কোলিয়ারির ম্যানেজার। গাঁয়ে এসেছেন তশিল আদায় কোরতে। একে অবিবাহিত তায় প্রৌঢ়—ভয়ে সবাই তটস্থ। তশিল আদায়ের দিকে তাঁর যতটা না নজর তার চেয়ে নজর বেশী অন্দরমহলের দিকে। অনেক মেয়ের সর্ব্বনাশ তিনি কোরলেন। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বাবা সভয়ে মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। মধু চাকর সঙ্গে সঙ্গে তামাক এনে হাজির কোরলো। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত। লোকটার ওপোর বরাবরই আমার রাগ ছিলো প্রচুর। তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে গাঁয়ের অনেককে অনেকবার বোলেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। সবাই এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বোলতে নারাজ। এক একবার মনে হোয়েছে আমি নিজেই এর প্রতিবাদ জানাবো। আমার মনটাও বরাবর একটু একগুঁয়ে। বাবা মা এর জন্যে অনেক শাসন কোরেছেন, কিন্তু বাগ মানাতে পারেননি।

বোধ হয় সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলুম। বাবার কাছে চাইলেন খাজনা—গত দু' সনের খাজনা এক সঙ্গে দিতে হবে। বাবা বললেন, আজ তা দেওয়া সম্ভব নয়, আর একদিন যেন আসেন।

সুপ্রসন্ন রায় বললেন : আমি তাঁর মাইনে করা চাকর নাকি যে আবার আসবো খোসামোদ কোরতে ! নিজে যেন দিয়ে আসেন।

আমার মেজাজটা ভীষণ রুক্ষ হয়ে উঠলো। সহ্য কোরতে পারলুম না। বললুম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে : সভ্য ভাবে কথা বোলতে শিখুন। বাবা আপনার আসার কথা বলেননি, প্রকারান্তরে আপনার পাইক-পেয়াদার কথাই বোলেছেন।

ও! তাই নাকি ? সভ্যতাটা তা হ'লে এখান থেকে তোমার কাছেই শিখতে হবে ? লোলুপ ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি নিয়ে চাইলেন তিনি আমার দিকে। আর কোন কথা বল্লেন না তিনি—তোখুনি বেরিয়ে গেলেন আমাদের বাড়ী থেকে। এর ফলাফল ঠিক তখোন বুঝিনি, বুঝেছিলুম দিন কয়েক বাদে।

একটা ব্যাপার আশ্চর্য্য লাগছিলো খুবই। এরপরে ঘন ঘন কয়েকদিন লোকটি আমাদের বাড়ী যাতায়াত কোরলেন। তাঁর আলাপ-ব্যবহার দেখে মনেই কোরতে পারলুম না যে তিনি ভেতরে ভেতরে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা কোরছেন। অতীতের ব্যবহারের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেন আমার কাছে : সত্যি আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। ওরকমভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা সভ্যতাবিরুদ্ধ। আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে—সত্যিই তিনি হাতজোড় কোরে ওঠেন আমার সামনে। বলেন আবার বিনীতভাবে : কি জানেন, পূর্ব্বপুরুষের অত্যাচারি রক্ত-কণিকাগুলো কখনো কখনো আমার মধ্যেও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না কিছুতেই—মুখোসটা যেন খুলে পড়ে। বাবা কথাগুলো শুনে কুণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। আমিও মনে মনে লজ্জিত না হয়ে পারি না, ভাবি—লোকটি আসলে হয় তো মোটেই খারাপ নন, আমাদেরই বোঝার ভুল হয়েছে, মানুষের বাইরেটা দেখে সব সময় ভেতরটা বিচার করা ঠিক নয়।

বেশ কয়েকটা দিন অতিবাহিত হোয়েছে। হঠাৎ একদিন বাবার ও আমার নেমন্তন্নপত্র এসে হাজির। শুধু আমাদের বাড়ী অবশ্য নয়—গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেরাও নিমন্ত্রিত হোয়েছেন। বাবা প্রথমে আমাকে নিতে রাজি হননি। আমি তবু জোর কোরে গেলুম। গিয়ে দেখি এ এক মস্ত পার্টির ব্যাপার। বাইরে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বাবা গল্প কোরতে আরম্ভ কোরে দিলেন, আমি ঢুকলুম অন্দরমহলে। সুপ্রসন্ন রায় আমার আগমনেরই প্রতীক্ষা কোরছিলেন। নিয়ে বসালেন তাঁর লাইব্রেরী ঘরে, নিজেও বোসলেন। আলাপ হতে লাগলো নানান্ বিষয় নিয়ে—দেখলুম ভদ্রলোকের পড়াশোনা আছে যথেষ্ট। আলাপ চোলতে চোলতেই ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ বাড়ীর সমস্ত আলো নিভে গেলো—যে ব্যাটারি চার্জ্জ কোরে আলো জ্বালা হচ্ছিল সেটা খারাপ হতেই ব্যাপারটা ঘটলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম আমাদের ঘরের দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলুম, সুপ্রসন্ন রায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : ভয় নেই, মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হোলও তাই, মিনিট পনেরো বাদেই আলো জ্বলে উঠলো, দরজাটাও গেলো খুলে। ঘটনাটার মধ্যে যে সুপ্রসন্ন রায়ের হাত ছিল সেটা বুঝতে পারলেও প্রকাশ করার সুযোগ পেলুম না।

পরদিন থেকেই গ্রামে আমার নামে কুৎসা রটতে লাগলো। সুপ্রসন্ন রায়ের সঙ্গে এর আগে আমি অনেক রাতই কাটিয়েছি; এবং সেটা আমার সম্মতিতেই হোয়েছে। সাক্ষীও জুটে গেলো কয়েক শত—আমার বাবা মাও আমায় বিশ্বাস কোরতে পারলেন না। বাস করা যখোন একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে, এমন সময় সুপ্রসন্ন রায় বিয়ের প্রস্তাব কোরে পাঠালেন। বাবা মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা এবার আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সেই দিনের রাতের ঘটনার পেছনে তা হ'লে এতো বড় চক্রান্ত ছিলো ?

বাংলা দেশের মেয়ে আমি ; যত তেজই থাক, সমস্ত সমাজ ও বাপ মা'র বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার ছিলো না। তাই আমার জীবনের এক দুর্য্যোগময় রাতে সারা জীবনের জন্যে গাট-ছড়া বাধতে হলো সুপ্রসন্ন রায়ের সঙ্গে। লোকটা যে জানোয়ারের চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়, সেটা বুঝতে পেরেছিলুম বিয়ের রাতেই তাঁর পাশবিকতায়—দুঃস্বপ্নের মতো আজো সেটা মনে কোরলে আমার সমস্ত দেহমন শিউরে ওঠে। বুঝতে পারলুম তখোন তাঁর প্রথম দর্শনের লোভার্থ ইঙ্গিতটা।...

থেমে পড়ে নীলা। এক নাগারে বোলতে বোলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দম নেওয়ার তার প্রয়োজন হয়।

আমিও কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত হয়ে পড়লুম। নীলার জীবননাট্যের কাহিনী আমার মনে এক অভুতপূর্ব্ব শিহরণ এনে দিলো। এ'ও তা হ'লে হয়—এ রকমও তা হলে হতে পারে ? হাস্যময়ী ও লাস্যময়ী নীলার অন্তরে এতোখানি ব্যথা, এতোখানি বেদনা ? আমাদের দু'জনের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ কোরতে লাগলো।

পরে একসময় প্রশ্ন না কোরে পারলুম না : এর পর ?

এরপর বুনো হাতিকে পোষ মানাবার চেষ্টা, ক্লান্ত কণ্ঠে বলে চলে নীলা, ব্রাজিল থেকে নিউজিল্যাণ্ড, বার্ম্মা থেকে কোচিন, আর শ্যাম থেকে ইন্দোচিন—এইভাবে প্রায় আধখানা পৃথিবী আমাকে নিয়ে ঘুরিয়েছেন। সঙ্গে নাচ আর গান শিখেছি আমি। পরে কাজে লাগবে ভেবেই হয়তো ও দুটো তখন শেখানো হয়েছিল। অনেক আগেই কোলিয়ারির কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর একদিন সমস্ত রসদ গেলো ফুরিয়ে। কাজেই ঘর বাধার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। বেহারের এই অজানা জায়গায় আস্তানা পাতা হোলো—প্রকারান্তরে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করা হোলো। এতোদিন যে মূলধন আমার পেছনে খরচ করা হোয়েছে—সেটাই সুদে আসলে তোলার ব্যবস্থা চোলছে। নীলার সকালবেলা ও রাতের ভিন্ন ভিন্ন বেশের অর্থটা এবার বুঝতে পারলুম। অনেকটা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললুম : এবারে বুঝতে পারছি আপনার সকাল বেলা ও রাতের বেশভূষা ও মনের তফাৎটা।

আমাকে সমস্ত কথাটা শেষ কোরতে না দিয়েই বললেন : এ আমার লোক আকর্ষণ করার অভিনব পন্থা। হাত পেতে টাকা নি—মদ বিলোই. মাঝে মাঝে আমিও যে একটু না খাই, তা নয়।

মদ খান আপনি ? আমার কথা বলার ভঙ্গীতে বিস্ময় প্রকাশ পায়।

হাঁ খাই বইকি। একদিনেই কি আর অভ্যেস হোয়েছে—ক্রমে দানা বাঁধতে বাঁধতে জমাট হোয়েছে। আর এখোন একটু আধটু নেশার আমেজ আসতে সুরু কোরেছে। থেমে পড়ে নীলা।

আমিও থামলুম কিছুক্ষণের জন্যে।

আবার বললুম: আচ্ছা, আপনার অতীত কাহিনী যে আমার কাছে প্রকাশ কোরলেন, আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে না?

না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নীলা, ভিসুবিয়াসের লাভার মতোই আমার অন্তর ছটফট্ ক'রছিল অতীতকে প্রকাশ করার জন্যে—আজ তার আউট বার্ষ্ট হোলো। প্রথম দর্শনেই যেন মনে হোলো আপনি আমার মনের মানুষ—আপনাকে আমার মনের কথা বোলতে হবে।

এমনভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিলে তুমি ? নিজের দুর্ব্বলতাকে আর কিছুতেই গোপন রাখতে পারলুম না। নীলার ব্যথা ভরা কণ্ঠের মাদকতায় আমার ভেতরের আভিজাত্যের রাশটা একেবারে আলগা হয়ে পড়লো।

বেলাইনি তো, উপভোগ কোরেছি বলুন; বলে যায় নীলা, কত দেশবিদেশ ঘুরলুম, কত লোকের সংস্পর্শে এসেছি। দু' এক বার যে পদস্খলন না হোয়েছে তা' নয়, তবে চোলতে গেলে মাঝে মাঝে হোচট খেতে হবে বৈ কি !

আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো না নীলা ? কেউ জানতে পারবে না—দু'জনে মিলে দূর দূরান্তে এক ভিন্ন জায়গায় আলাদা কোরে ঘর বাঁধবো। সমুদ্রের মতো ফেনায়িত উচ্ছ্বাস নিয়ে তার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বোলে উঠলুম।

ঐ দেখুন। হাত ছাড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখায় নীলা।

চাঁদ অস্তমিতপ্রায়। তার শেষ আয়ুর ক্ষীণ আভা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশের গায়ে, খ'সে যাওয়া নদীর পারের ভাঙা ভাঙা পলিমাটীর মতো।

উঠে দাঁড়ালো নীলা। বল্ল সে : ভোর হোয়ে গেছে। এতোক্ষণ ওরা সব নেশায় মত্ত ছিলো। এবার আমার খোঁজ পড়বে। আমার কথা মনে কোরে ভবিষ্যতে কষ্ট পাবেন না—এই অনুরোধ। একটু থামলো। তারপর আবার বল্ল সে : জীবনে যা চাওয়া যায় তাই-ত' আর সব সময়ে পাওয়া যায় না ! তা হ'লে পৃথিবীর মাধুর্য্যের কোন মূল্যই থাকে না।

আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে চোলতে থাকে নীলা।

ডাক দিয়ে বললুম অনেকটা অন্য মনস্কভাবে : আমার কথার ত' উত্তর দিলে না ?

সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত জবাব এলো।

ইতিমধ্যে সে বাংলোর মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে পড়েছে।

মনের অবসাদ কাটাতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো। তারপর সোজাসুজি ঘরে গিয়ে আশিস—সুশীল—ধীরেনকে টেনে তুল্লুম।

চল্ চল্ তাড়াতাড়ি চল্—ট্রেন ধরতে হবে। ব্যস্তভাবে বল্লুম ওদের।

ব্যাপার কি ? সবাই সমবেত প্রশ্ন জানায়।

পরে শুনবি।

বিছানা পত্তর বেঁধে ভাড়া চুকিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম।

বড় রাস্তায় যখন পা দিয়েছি, দেখতে পেলুম নীলা তখনো আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে ; তার পরনে সেই নীল সাড়ী—বোধ হয় যে সাড়ীটা প্রথমে হোটেলে ঢোকার মুখ দেখেছিলুম।

সভ্যতা সঙ্কট

শ্রীঅবনীনাথ রায়

গত ডিসেম্বর মাসে বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাল গণনার দিক দিয়া এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই আমাদের অধিকাংশের জীবন প্রসারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের জীবনের যেটুকু অংশ পড়িয়াছে তাহা জ্ঞানের দিক দিয়া এমন কিছু সমুজ্জ্বল নয়—সুতরাং এমন কিছু মূল্যবান নয়। জীবনের এই পঞ্চাশ বছর আমাদের কি দিয়া গেল বা না দিল তাহা এই কালের সীমান্তে পৌঁছিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। নচেৎ কি প্রাপ্তি ঘটিল বা অপ্রাপ্তি রহিল তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই—সুতরাং জীবনের লাভ লোকসানের ইতিহাস কিছুতেই পূর্ণ হইয়া উঠিবে না।

এই পঞ্চাশ বছরের সব চেয়ে বড় রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের অবসান। ইংরাজেরা শুধু ভারতে রাজত্বই করে নাই—তাহাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও আমাদের উপর বিন্যস্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহারা যে সফল হইয়াছে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্যদেশীয় সভ্যতা দ্বারা আমরা মুগ্ধ এবং আবিষ্ট হইয়াছি।

এক জাতি যদি অন্য জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহে তবে তাহাকে পরাধীন জাতির দুইটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হয়। প্রথম শিক্ষা, দ্বিতীয় ধর্ম্ম। কারণ এই দুইটি দ্বার দিয়াই মানুষ আলোক প্রাপ্ত হয়। এই দুইটি দুর্গ অধিকার করিতে পারিলে, এমন কি খানিকটা বিধ্বস্ত করিতে পারিলেও আলো আসিবার রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজ সেই পথই অবলম্বন করিয়াছিল।

ভারতীয় শিক্ষা কোনদিন জীবিকা অর্জনের পণ্য-স্বরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। জাতীয় শিক্ষার মূল কথা মানুষের অন্তরের সুপ্ত সংস্কারকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা। এই হিসাবে স্বাধীন ভারতে অদ্যাপি সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। কারণ ইংরাজের প্রদর্শিত পথে এবং চিন্তায় আমরা এখনো চলিতেছি এবং চালিত হইতেছি। ইংরাজের নিজের দেশের শিক্ষার আদর্শ আমাদের থেকে পৃথক। শিক্ষা দ্বারা তাহারা জীবিকার্জ্জনের সমস্যারই সমাধান করিতে চাহে। সেই শিক্ষার সব ভালটুকু আবার ইংরেজ আমাদের দেয় নাই। আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ স্বতন্ত্র—আমরা শিক্ষা-দ্বারা মানুষের অন্তরশায়ী চিৎবৃত্তিসমূহকে জাগরিত করিতে চাই। মানুষ যদি চৈতন্যসম্পন্ন একজন সত্যকারের মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ সার্থক হইল। তদ্বারা যদি সে বড় চাকরী না পায় এবং প্রচুর অর্থাগম যদি তার ভাগ্যে না থাকে, তবে শিক্ষার আদর্শ ব্যর্থ হইয়াছে—এমন কথা আমরা মনে করিব না। ইংরাজের তথা পাশ্চাত্য দেশের নিরিখ অন্য প্রকারের। সেখানে শিক্ষাদ্বারা যে যত বেশী রোজগার করিতে পারে তার শিক্ষা তত সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেখানে বিচারের মানদণ্ড অর্থ—এখানে বিচারের মানদণ্ড মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই অর্থ প্রাচুর্য্যের প্রাধান্য দ্বারা আমরা যে এখনো শাসিত হইতেছি তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের শিক্ষার আদর্শ ইংরাজ একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে—কতকটা সত্য আদর্শ দিতে পারার অক্ষমতায়, কতকটা আমাদিগকে নিজেদের শাসন কার্য্য চালানোর কাজে ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করিবার ইচ্ছায়। সেই ইচ্ছার নাগপাশ এখনো আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ঐ এক কথা। ইংরাজ আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবে না এই চুক্তি ছিল। প্রকাশ্যত ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু ইংরাজ মিশনারিগণ অবাধে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার

সুযোগ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার কার্য্য আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং বিহার ও ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সমধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে, এ কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। অধিকন্তু ইংরাজেরা বাংলা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারে সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টধর্ম্ম বলিলে ভুল হইবে না। সেই চেয়ার, সেই টেবিল, সেই উপাসনা—সবই এক ধরণের। ইহার প্রচারে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মূল সত্যের উপর লোকের আস্থা শিথিল হইয়াছিল। অবশ্য আস্থা শিথিল হইবার ঐতিহাসিক কারণ আরো পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত শূন্যবাদ মানুষকে নাস্তিক্যের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তারপর আসিলেন আচার্য্য শঙ্কর তাঁর মায়াবাদ লইয়া। বুদ্ধের তথা-কথিত শূন্যবাদ এবং শঙ্করের মায়াবাদের যুক্তিজালে শ্রীভগবান জগতে তিষ্ঠিবার ঠাঁই পাইলেন না। অথচ বেদ এবং উপনিষদের যুগে ধর্ম্মের শিক্ষাই ছিল অন্যরূপ। তখন ভগবানকে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা, জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র পূজা করিবার ব্যবস্থা ছিল। সমস্তর মধ্যেই তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আছে ইহাই গীতার দর্শন। কালক্রমে আমরা সেই দর্শন হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই সত্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং অন্যান্য মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবনে ভগবানকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান তাঁর সৃষ্টিতে হারাইয়া যান নাই—তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছেন!

ইংরাজ শাসনের দোষ প্রদর্শন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজ রাজত্ব শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা অপসারিত হইয়াছে। আমরা শুধু দেখিব এই শাসন আমাদের কতখানি সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছে, কিংবা পঙ্গু করিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতার এবং সংস্কৃতির মূল নীতি হইল তিতিক্ষা। তিতিক্ষা মানে ত্যাগ নহে—তিতিক্ষার অর্থ যে যতটুকু দিতে পারে তার চেয়ে বেশী তার কাছ থেকে প্রত্যাশা না করা, টাকা-কড়ি, বাড়ী, গাড়ী, নাম, যশ প্রভৃতি উপকরণ আমরা ত্যাগ করিব এ আমাদের সিদ্ধান্ত নহে। মায়াবাদ বিশ্বাস করিয়া আমরা ঐ ত্যাগের সিদ্ধান্তই করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা জানিব যে, ঐ ধনজন, বাড়ী, গাড়ী, যতই আমরা চাই না কেন বা সংগ্রহ করি না কেন, উহারা ক্ষয়শীল—উহারা আমাকে ভগবান দিতে পরিবে না। মিথ্যা ত্যাগের মোহে পড়িয়া আমরা জাতি হিসাবে কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া গিয়াছিলাম—ফলে জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা সমান তালে চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। অক্ষয় অব্যয় ভগবানকে যাহারা চাহিবে তাহারা ঐ বস্তুগুলিকে অশ্রদ্ধা করিবে না কিন্তু জানিবে যে, উহারা ভগবানকে লাভ করাইয়া দিতে পারিবে না। ভগবানকে পাইতে হইলে কেবলমাত্র ভগবানকেই চাহিতে হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এই আদর্শ মানে না। তাহারা জানে ধন, জন, বাড়ী, গাড়ী, নাম, যশ প্রভৃতিই সব—এই সব পাইলেই জীবন সার্থক হইল—ইহার বেশি জীবনে আর কিছু কাম্য নাই। এই আদর্শের সব চেয়ে বড় বিপদ হইল এই যে, ইহার দ্বারা যে লালসা, যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জন্মে, তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। নিজের দেশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয় না, অপরের দেশকেও নিজের দেশের পায়ের তলায় টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। অপরের দেশকে গ্রাস করিয়া, অপরের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করিয়া, নিজের এই যে উদরস্ফীতির ব্যবস্থা, ইহার মধ্যে কল্যাণ নাই—এ পথ শান্তির পথ নহে। পাশ্চাত্য দেশ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ এই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা মুখে শান্তির কথা বলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, দিনের বেলায় যাহার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলে, রাত্রির গুপ্তসভায় তাহারি প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আপত্তি করে না। অ্যাটম্ বোমা নামক যে গুপ্ত অস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ সংগ্রহ করিয়াছে রাবণের মৃত্যু বাণের মত, তাহাই একদিন তাহার নিজের বিনাশের কারণ হইবে।

জগতের এই সভ্যতা-সঙ্কটের কালে ভারতকে তাহার নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে—একটা আদর্শ বাছিয়া লইতে হইবে। ভারত যদি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুগামী হয়, সে দেশের আদর্শ যদি ভারতের মতঃপূত হয়, তবে সে দেশের ভাগ্যকেও ভারতের গ্রহণ করিতে হইবে। আর সে ভাগ্য অনিবার্য্য—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ যদি তার ঋষি-প্রদর্শিত পথে চলিতে রাজী হয়, যদি ভগবানকেই একান্ত বলিয়া জানে, তিনিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া মানে, তবে কাহারো সহিত তাহার কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ ভগবানকে সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেও তিনি ফুরাইয়া যাইবেন না।

ভারতের এই আদর্শ যাঁহাদের ভাল লাগিবে, তাঁহারা বিংশ শতাব্দীর বাকি অর্দ্ধেক অংশের দিকে তাকাইয়া এই পথেই সাধনা করিয়া চলিবেন।

বিদায়ক্ষণে

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

যাবার বেলায় সেই মালাটি
নাই বা গেলে ছিঁড়ে?
কি দোষ হ'বে তখন যদি
চাও হে বারেক ফিরে?
নয়ন আমার ভরলে জলে
মুছবো দিয়ে এই আঁচলে,
দাঁড়িয়ে রব দুয়ার ধ'রে,
একটু' যেও ধীরে,—
কি দোষ হ'বে তখন যদি
দাঁড়াও বারেক ফিরে?
দুঃখ সুখের অনেক স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে আছে,
হয়তো তাদের রইবে না দাম
সেদিন তোমার কাছে,
পথের দেখা সাথীর মত
ভুল্‌তে সময় লাগবে কত!
আমার অতীত কাটতো যে গো
তোমায় ঘিরে ঘিরে,
তোমারই পথ রইবো চেয়ে
একটু' যেও ধীরে।

প্রার্থনা

শ্রীঅঞ্জলি মজুমদার

তোমার দুয়ারে ভিক্ষা মাগিতে
শেষ হলো মোর বেলা,
ওগো নিষ্ঠুর, মোরে বার বার
কেন এত অবহেলা?
ভাণ্ডারে তব নাই কিগো মোর
এতটুকু অধিকার?
সময় হয়েছে, ওগো ভাণ্ডারী,
খোলো খোলো তব দ্বার
দুয়ারে তোমার রিক্ত-অতিথি—
ভাণ্ডার তব খুলি'
পাত্র ভরিয়া অর্ঘ্য সাজায়ে
দাও হাতে মোর তুলি'।
তাপিত হৃদয় করগো শীতল
ঢালিয়া পীযূষ ধারা,
আমার পৃথিবী করগো এবার
সকল বেদনা-হারা।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

তের

সে দিন ঠাকুমা কুকুরের সৌভাগ্যে বিস্ময় প্রকাশ করলেও নতুন মার গোলাপীর জন্য তাঁকেই মাছ-দুধের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল মিনিট কুড়ির মধ্যেই। না করে উপায় ছিল না। একে ত নতুন মার আদরিণী, তাতে আবার বনেদী বাড়ীর আওতায় থেকে মাছ মাংস আর দুধ-দই খেয়ে অত বড়টী যে হয়েছে, তার নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থার দাবী ছিল।

মানুষের কাছে ভালবাসার প্রতিদান না পাওয়া গেলেও বেড়াল-কুকুরের কাছে পাওয়া যায়। দুদিন না যেতেই গোলাপী স্বেচ্ছায়ই ধরা দিত আমায়। সময় সময় পিঠটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে পুচ্ছটি উর্দ্ধে তুলে আমার পা ঘেষে ঘেষে আদর দেখাত, বশ্যতা জানাত। আমিও তাকে যখন-তখনই বুকে জড়িয়ে ধরতাম, গায়ে পিঠে হাত বুলাতাম, পুসি, পুসি ব'লে ডেকে আদর জানাতাম।

আমি বেড়ালটাকে আদর করতাম দেখে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঠাকুমা খুবই চটতেন, আমি কিন্তু তা গ্রাহ্যই করতাম না। কিছুদিন বাদে মনে হল নতুন মাও পছন্দ করতেন না। কেন করতেন না, শত চেষ্টা করেও তার কারণ পেতাম না খুঁজে। একদিন কিন্তু নিজের কাণেই শুনলাম ক্ষেমী পিসি নতুন মাকে জিজ্ঞেস করছিল—হ্যাঁরে লতু, এখনও তোর সৎ-ছেলেটা ফুট বলের মত চাঁট মারে নাকি গোলাপীকে ? বাব্বা কী দস্যু ছেলে! আহা অমন তুলোর মত তুল-তুলে নরম প্রাণীকি অমন হাতীর পায়ের লাথি খেয়ে বাঁচে!

সেদিন থেকে গোলাপীর কাছে আর ঘেঁষতাম না। সে কিন্তু আগেরই মত আমার গা ঘেঁষে বসত, পা ঘেঁষে চলত - ইচ্ছা যে আমি তাকে কোলে নেই, আদর করি। এক এক দিন নিতামও কোলে ; কিন্তু অতি সংগোপনে।

দ্বিরাগমনের পর থেকেই নতুন মা প্রতিদিনই শিবতলায় যেতে সুরু করলেন। খেয়ে দেয়ে যেতেন আর বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফিরতেন। প্রত্যহই ক্ষেমীপিসির জন্য প্রতীক্ষা করতেন, সে এলেই মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করে বেড়িয়ে পড়তেন। বাবাকে কোর্টে পৌছে দিয়ে মোটর এসে দুয়ারে প্রতীক্ষা করত, আবার নতুন মাকে শিবতলা থেকে বাড়ী পৌছে দিয়ে বাবাকে আনতে চলে যেত। নতুন মা একা একা কোথাও যাওয়া-আসা করতেন না। শনি-রবিবার তিনি আর ক্ষেমীপিসির জন্য দেরী করতেন না। খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলেই বাবাকে সঙ্গে নিয়ে শিবতলায় যেতেন।

নতুন মা নিত্য বাপের বাড়ী যাওয়া-আসা করলেও মামা বাড়ীর কেউ আমাদের বাড়ী আসত না। এই ধরাবাঁধা নিয়মে নিত্য বাপের বাড়ী যাতায়াতটাকে ঠাকুমা একটা সৃষ্টিছাড়া সখ মনে করলেও দেখি-না-দেখি করে উপেক্ষা করেই যাচ্ছিলেন। ফুল-শয্যার পর দিন থেকেই নতুন মা ও বাবার ভাবান্তর লক্ষ্য করে তিনি বেশী রকমই উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন মুখুজ্জে দাদু বললেন—কি ব্যাপার বিধু, নতুন কুটুমদের যে কোন সাড়া-শব্দই নেই? এদিকে ত শুনছি বউমা নিত্যই শিবতলা যাওয়া-আসা করছেন।

ঠাকুমা নিজের বিরক্তি ভাবটা চেপে রেখে বললেন —তা প্রথম প্রথম দু'দশ দিন যাবে বই কি মুখুজ্জে, বিয়ে হলেই কি মেয়েরা বাপের বাড়ীর কথা দু'দিনে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে? সময় লাগে না?

মুখুজ্জে দাদু বললেন—সে কথা খুবই খাঁটি। তবে বাপের বাড়ীর লোকজনদেরও ত আসা চাই। মাখা-মাখিটা কি এক তরফা হয় কখনও? কথাটা ভেবে দেখো বিধু।

ঠাকুমা উদাসভাবেই বললেন—তা দেখবো বই কি মুখুজ্জে। আমি ত সেই বউ ভাতের দিন থেকেই নিত্য ভাবছি।

—ভাবছোই যদি তবে আর দেরী কেন? শুভস্য শীঘ্রং। ভালো কাজ ফেলে রাখতে নেই। আজ চললাম, গিন্নীর মাথায় খেয়াল চেপেছে বাড়ীশুদ্ধ সব্বাই কালীঘাট যাবেন।

মুখুজ্জে দাদু চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাক্‌মাও খুবই বিমনা হয়ে পরলেন।

চৌদ্দ

সেই যে ফুলশয্যার পর দিন ছোট ঠাক্‌মা চলে গেলেন তার পর দিন পনেরো কেটে গেছে। পাছে বাবা রাগ করেন সেই ভয়ে ঠাকমা তার জায়ের নাম মুখেও আনেন না। না আনলেও বাড়ীর সেদিনকার সেই খারাপ আর হাওয়াটা তখনও ঠিক তেমনিই ছিল। নতুন মার মনের ভাবটা ধরা-ছোঁয়া না দিলেও বাবার মনের ভাবটা যে খুবই অপ্রসন্ন ছিল, বাড়ীর সকলেই তা টের পেয়েছিলাম —এমন কি ঝি চাকর পর্য্যন্ত। এতে ঠাক্‌মা বড়ই অস্বস্তি পাচ্ছিলেন মনে।

নতুন মা নিত্যই শিবতলা যাচ্ছিলেন অথচ সেখান-কার কেউ আসছিল না দেখে ঠাকমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। একটা ব্যবস্থার জন্য মন তাঁর আকুলি-বিকুলি করলেও ভেবে চিন্তে কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না। এই সময় মুখুজ্জে দাদুর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত তাঁকে যেন পথ দেখিয়ে দিল। তিনি ঘ্যাদিনে হালে পাণি পেলেন।

ঠাক্‌মা জানতেন ছোট ঠাক্‌মার কোনই দোষ ছিল না। তবু যখন নতুন মা ও বাবা ব্যাপারটাকে নিয়ে ঘোট পাকিয়েছিলেন, তখন সেটাকে যত শীগ্‌গির মিটিয়ে ফেলা যায়—ততই ভাল মনে করলেন।

সেদিন ছিল শনিবার। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে দেখলাম নতুন মাকে নিয়ে বাবা বেরুচ্ছেন; আমি বইটই-গুলো রেখে নীচে যেতেই শিবুর মা বললে—যাও দাদা-মণি খাবার খাওগে—গিন্নীমা বসে আছেন। আমি গিয়ে খেতে বসলাম—ঠাক্‌মা জিজ্ঞেস করলেন—খোকন বেড়াতে যাবি?

আমি সাগ্রহে বললাম—যাবো, কোথায়?

—শিবতলা, তোর নতুন মামা-বাড়ী।

—না ঠাক্‌মা, ওদের বাড়ী আর যাবো না আমি। ছোট ঠাক্‌মার মুখে শোনোনি কি অপমানটা করলো সেদিন?

ঠাক্‌মা বললেন—তোর ছোট ঠাক্‌মার কথা ছেড়ে দে। তার কথায় কথায় মান যায়। চল লক্ষ্মী ভাইটি তোতে আমাতে ঘুরে আসিগে।

ঠাক্‌মা অত করে বললেও আমার কিন্তু মন সরছিল না। আমি বললাম—না ঠাক্‌মা আমি যাব না। তুমি না হয় ক্ষেমী পিসিকে নিয়ে যাও। তা যাচ্ছো যাও, কিন্তু দেখবে ওর তোমাকেও অপমান করবে।

ঠাক্‌মা সংশয়-আকুল চিত্তে বললেন—কি যে বলিস্। শুধু শুধু অপমান করবে কেন? আর যদি করেই, ক্ষেমীর সুমুখে করলে যে আরো বিশ্রী হবে। খাওয়া ত হল, এবার চ' আমার সঙ্গে।

—নতুন মা নিত্য যান, তাঁর সঙ্গে যাও না?

—তার সঙ্গে যাওয়া মানেই ত ক্ষেমীর সঙ্গে যাওয়া, তা ছাড়া তারা যখন যায় তখন কি আমার যাওয়া খাওয়া হয়? তুই চ' লক্ষ্মীটি, মাণিক আমার।

—কিসে যাবে?

—কেন, ঘরের মোটরে?

—মোটরে বাবা ও নতুন মা এই একটু আগে বেরিয়েছেন।

—ও তারা বাড়ী নেই? সত্যি ত আজ যে শনিবার, তা হলে দরোয়ানকে বলগে চট্ করে একটা গাড়ী ডেকে আন্‌তে।

দরোয়ানকে বল্‌তেই সে একটা 'সেকেণ্ড ক্লাস' ছক্কড় ডেকে আন্‌ল। আমরা অবিলম্বে বের হয়ে পড়লাম।

ছক্কড় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে মন্থর ভাবে উত্তর মুখে চলছিল। আগেও কতবার এ-পথ দিয়ে মা'র সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালী বাড়ী গেছি, খড়দ'র শ্যামসুন্দর দেখতে গেছি। তখন মোটরে হু হু করে ছুটে যেতাম, রাস্তার দু'ধারে অমন সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর-বাগান কিছুই নজরে ধরা পড়ত না। সেদিন কিন্তু কত কি সুন্দর জিনিস নতুন করে মন হরণ করল। সে দিনের সে আনন্দ আজও আমার মনে গাঁথা রয়েছে।

আমরা যখন বেলঘরিয়ার কাছাকাছি এসে গেছলাম, আমাদের গাড়ী ঘেঁষে একটা মোটর ধাঁ করে বেরিয়ে গেল কলকাতা মুখো। অমন বে-পরোয়া মোটর চালিয়ে যাওয়ায় ঠাকুমা 'ড্রাইভার'কে মনের সুখে শাপ-শাপান্ত করছিলেন। আমি হেসে বললাম—ওকি হচ্ছে ঠাকুমা; আমাদের 'ড্রাইভার'কে শাপ-মন্নি করছো?

—আমাদের 'ড্রাইভার' কি করে জানলি?

—বাঃরে! আমি বুঝি আমাদের 'মোটর' আর ড্রাইভারকে চিনিনে? বাবা, নতুন মা আর মলী মাসীকেও ত দেখলাম।

ঠাকুমা যেন হঠাৎ চিন্তা-সাগরে ডুব দিলেন। আমার কথার কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর করলেন না। আমার মনও তখন পথের ডান পাশে পড়ে-থাকা একটা লোহার রথ দখল করে বসল, কিন্তু বেশীক্ষণ আটকে রাখতে পারল না। সেই যে আগের বছর মাহেশের রথ দেখতে গেছলাম, ঠাকুমার সঙ্গে সে কথা মনে পড়ে গেল। লোহার রথ থেকে মন ছুট পেয়ে হাজির হল গিয়ে মাহেশের মেলায়। কি সুন্দর আর কত বড় রথ! মেলায় কত কি রকমারি জিনিস-পত্তর। কখন যে আমাদের কলকাতার পক্ষীরাজ টানা ভরাটে রথ রাজপথ ছেড়ে বাঁয়ের একটা গলি-পথে ঢুকে পড়েছিল তা টেরও পাইনি। মিনিট দশেকের মধ্যেই আঁকা-বাঁকা রাস্তা ভেঙ্গে ছক্কড়খানা মামা বাড়ীর দুয়ারে এসে হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াল। সেদিন সদর দুয়ার খোলাই ছিল। আমরা ডাক-হাঁক না দিয়েই বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। উঠানের এক কোণে একটি ঝি এক গাদা বাসন মাজছিল। আমাদের দেখেই হাঁক দিল—কেগা তোমরা?

আমরা কুটুম গো—ঠাকুমা জবাব দিলেন। সে আর জেরা-টেরা করল না; আপন মনে বাসন মাজতে লাগল। আমিও বিনা বাধায় ঠাকুমাকে পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে গেলাম। দেখলাম বড় মামা আর বছর সতেরোর একটি মোটা-সোটা ছেলে চা ও খাবার খাচ্ছে। দিদিমা, বড় মাসী আর চব্বিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি বিধবা নিকটে বসে তাদের খাওয়া দেখছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই সব্বাই যেন হকচকিয়ে উঠল।

বড়মাসী বসে বসেই বল্‌লেন—আরে খোকন বাবু যে! উনি আবার কে এলেন?

বড় মামা ঠাকুমাকে দেখেই বললেন—মামা, মাঐমা এসেছেন।

—আমাদের সতুর শাশুড়ী। আসুন মাঐমা। দিদি ওঁকে বসতে দাও।

বড় মাসী কিন্তু সে কথা কানেও তুল্‌লেন না।

ঠাকুমা বল্‌লেন—তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না সতু; তোমরা খেয়ে নাও। বসবার জন্যে কি—বলেই তিনি দিদিমাকে নমস্কার করে মেঝেতেই বসে পড়লেন। দিদিমা চিরদিনই নমস্কার পেয়েছেন ছাড়া করেছেন বলে মনে হল না। তিনি ঠাকুমাকে নমস্কার করলেন না। একটু এগিয়ে বসে বল্‌লেন—ফুলশয্যার দিন যেতে পারি নি বলে কিছু মনে ক'রো না, বেয়ান। কুটুম-সাক্ষাতের বাড়ী কি ভাড়াটে গাড়ীতে যেতে পারি? আমাদের মধুমণির মোটরখানা পাঠিয়ে দিলে সবাই-ই যেতাম।

দিদিমার এই বোকাটে ধরণের কবুল-উক্তিতে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বড় মাসী বল্‌লেন—কী যে আবোল-তাবোল বলছ ঠিক নেই। না গো মাঐমা মোটরের জন্যে নয়; আমার মেজ বোনের বাড়ী বলা হয়নি বলেই আমরা যাইনি।

বিধবাটিকে দেখিয়ে দিদিমা বললেন—বেয়ান, এটি আমার মেজ মেয়ে—দীপিকা। ওকে ফেলে কি আমরা যেতে পারি?

বড় মাসীর এতেও মন উঠল না। তিনি আরো খোলসা করে বল্‌লেন মোটরের কি ভাবনা ছেলো? আমার নিজের ছেল একখানা, দীপুদের রয়েছে তিনখানা। মোটরের কি অভাব আমাদের? ফুলশয্যায় সবাই-ই যেতাম; কিন্তু মধুর কাকার যা চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি! যাবো কি! শুনেই গা' জ্বলে উঠল।

মেজ মাসীর সত্যই তিনখানা মোটর ছিল না। তার শ্বশুররা তিন ভাই—প্রত্যেকেই পৃথকান্ন। তিনজনেরই আর্থিক অবস্থা ভাল; তাদের প্রত্যেকেরই একখানা করে মোটর ছিল, সত্য; কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় দেখা-সাক্ষাৎও বিশেষ হত না। ইহা ক্ষেম

পিসির মুখেই শোনা কথা। কাজেই বড় মাসীর মোটরের ফলাও ভণিতা শুধু দিদিমার সরল কথাটার একটা অসরল মোড় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

বড় মাসীর কোন মোটর ছিল না। বড় মেসো একটা ভুঁইফোড় কোম্পানীর নামমাত্র পরিচালক ছিলেন তখন। কোম্পানীর একখানা মান্ধাতার আমলের নড়বড়ে মোটর ছিল। বড় মেসোর প্রয়োজন হ'লে মালিকদের খোসামোদ ক'রে কখন-কখন দু'এক ঘণ্টার জন্য সেখানা ব্যবহার করবার অনুমতি পেতেন।

বড় মাসীর এই খোলা ফতোয়ার পর দিদিমার বোধ হয় হুঁস হল বলে তিনি মস্ত ভুল করেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বুদ্ধির বুকটুকু সেরে নিতে গিয়ে বললেন—স্নুকু ঠিকই বলেছে, বেয়ান, মোটরের জন্য নয়। তোমার জা'য়ের যা ছোট লোকের মত কথাবার্ত্তা, শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয় বাপু। মোটরের ভাবনা ছেলো কি আমাদের!

বড় মামা দিদিমার কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন—তুমি থাম ত মা; কি সব যা-তা বলছ!

দিদি-মা ও বড় মাসীর অপমানকর কথাগুলি ঠাকুমা অসম্ভব ধৈর্য্যের সঙ্গে হজম করে বললেন—যা হয়ে গেছে সে সব কথা ভুলে যাও। কাল রবিবার; সকলেরই ছুটি আছে। কাল দুপুরে আমাদের বাড়ী যা-হোক দুটি কিছু মুখে দিতে হবে তোমাদের। ফুলশয্যার দিন সতু না খেয়ে চলে এলো; সে কষ্ট আমার মনে এখনও গাঁথা রয়েছে।

বড় মামা লজ্জা পেয়ে বললেন—লতু বড় অভিমানী কিনা, তাই তার কথাটা না রেখে পারলাম না। সে অত করে বারণ না করলে আমি খেয়েই আসতাম মাঐমা।

ঠাকুমা কথাটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই বড় মামাকে জিগ্‌গেস করলেন—সতু তোমার পাশে ওটি বুঝি তোমার ছোট ভাই?

বড় মামা পাশের ছেলেটির পিঠে হাত দিয়ে বললেন—হ্যাঁ মাঐমা; ওর নাম যতীন।

—কলেজে পড়ে বুঝি?

—না; বইয়ের দোকানে কাজ করে। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েই আর পড়তে চাইল না—কত বললাম।

ঠাকুমা বললেন—তা মন্দটা কি করেছে? এম-এ, বি-এ পাশ করেও ত বাংগালীর ছেলেরা চাকরী ছাড়া আর কিছু করবে না! -

বড় মাসী একটু বড়াই করেই বললেন—সবাই নয়; উনি ত আই এ পাশ করেও কারবারে নেমেছেন।

ঠাকুমা বললেন—ঠিকই করেছে। কারবারেই মা লক্ষ্মীর বেশী দয়া, আর দেশেরও উন্নতি।

ছোট মামাকে লক্ষ্য করে বললেন—বাবা যতী তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু।

ছোট মামা উল্লাসের সঙ্গে বল্‌লেন—যাবো বই কি মাঐমা! আর কেউ না গেলেও আমি যাবোই। লতুকে দিনের মধ্যে দশবার না দেখলে, তার সঙ্গে ঝগড়া না করলে আমার একটুও ভাল লাগে না মাঐমা। বলেই ছোট মামা হেসে ফেলল।

ঠাকুমাও হেসে বল্‌লেন—আমার বউমা ত তোমার বড়, তাকে তুমি নাম ধরে ডাক?

ছোট মামা কপালের সাম্‌নের আধ হাত বহর চুলের গোছাটা সহ মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে—ভারি ত বড়! কুল্লে ত দেড় বছরের।

মেজ মাসী এতক্ষণ একটি কথাও কয় নি। এর স্বভাবটি ছিল বড় মাসীর ঠিক উল্টো। এবার হেসে বল্‌লেন—লতু আর যতী পিঠোপিঠি কিনা, তাই লতুর নাম ধরেই ডাকে। আমিও দাদাকে নাম ধরেই ডাকি। আমাদের বাড়ীর এই একরকম ধরণ, মাঐমা।

ঠাকুমা বল্‌লেন—মন্দটা কি! তুমিও যাবে ত কাল, দীপু?

—যাবো বৈ কি মাঐমা; খোকাকেও সঙ্গে নোব। রোজই বলে মেজ মাসীর বাড়ী যাবে

—বেশ, বেশ, ভা—রী সুখী হলাম, দীপু। খোকাটির ক' বছর হ'ল?

মেজ মাসী উত্তর দেবার আগেই সাত তাড়াতাড়ি দিদিমা বল্‌লেন—সাম্‌নের পৌষে সাতে পা দেবে।

মেজ মাসী বল্‌লেন—না সাতে নয়, আটে পা দেবে।

বড় মাসী মুরুব্বিয়ানা চালে বল্‌লেন—আজ তোমার কি হয়েছে বল ত মা? মাঐমা কি তোমার বাড়ী বিয়ের ছলে মেয়ে দেখতে এসেছেন যে বয়েস কমিয়ে বলছ?

আমাদের দেরী হচ্ছিল দেখে' গাড়োয়ান ডাক-হাঁক করছিল।

ঠাক্‌মা বল্‌লেন—আজ উঠি বেয়ান। কাল এগারোটায় মোটর পাঠাবো।

বড় মাসী নাক টানা দিয়ে বল্‌লেন—ওমা, এগারোটায়! তখন ত আমাদের ঘুমও ভাঙ্গে না অনেক দিন।

বেশ, তা' হলে একটায় পাঠাতে বলবো, মধুকে।—ব'লেই ঠাকমা উঠে প'ড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

বড় মামা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লেন—সে কি, এখুনি উঠবেন কি, মাঐমা! বিমল জলটল খাক আগে। মা, বিমলকে খেতে দাও কিছু।

ঠাক্‌মা বল্‌লেন—আজ না হয় থাক, সতু; খাওয়ার জন্যে কি? কত আসবে, কত খাবে—আজ উঠি, গাড়োয়ানটা জ্বালাতন করছে।

—ওকে বিদেয় ক'রে দি, মাঐমা। লতুরা মাসীকে নিয়ে শো'তে গেছে, এক্ষুনি হয়ত এসে যাবে, একটু বসলে মধুর সঙ্গেই যেতে পারবেন।

ঠাক্‌মা বল্‌লেন—না বাবা, সতু, এই গাড়ীতেই যাই; আমার ঢের কাজ প'ড়ে রয়েছে।

দিদিমা এক প্লেট খাবার এনে বল্‌লেন—নাও বিমল বাবু, খেয়ে নাও। নাতি সম্পর্ক কিনা, তাই বুঝি 'বাবু' ব'লে একটু হাসলেন।

খাবার দেখে ঠাক্‌মা বল্‌লেন—শিবতলায়ও দেখছি সেন ম'শায়ের দোকানের মত কড়া পাকের সন্দেশ পাওয়া যায়!

মেজমাসী বল্‌লেন—শিবতলার সন্দেশ নয়; সেন ম'শায়ের দোকানেরই। একটু আগে লতুরা দিয়ে গেল।

দিদিমা আহ্লাদে অষ্টখণ্ড হয়ে বল্‌লেন—লতু আমার যখনই আসে খালি হাতে আসে না; কিছু না কিছু আনবেই সঙ্গে। বড্ডই ভাই-বোন গত প্রাণ কিনা, বেয়ান।

আমার খাওয়া শেষ হ'তেই ঠাকমা উঠে পড়লেন। ছোট মামা ও মেজমাসী আমাদের সঙ্গে সদর দুয়ার পর্য্যন্ত এল। বড় মামা আগেই নীচে এসেছিলেন গাড়োয়ানকে ঠাণ্ডা রাখতে।

গাড়ীটা মোড় ফিরতেই আমার নজর পড়ল দো-তলার জানালায়; দেখ্‌লাম দিদিমা আর বড় মাসী গাড়ীটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাসছিল।

গাড়ীতে এসে ঠাক্‌মা বল্‌লেন—দ্যাখ খোকন, এখানকার কোন কথা বাড়ী গিয়ে যেন কাউকে বলিস-নে—শিবুর মাকে কি বেহারাকেও না।

তাঁর চোখের কোলে জল গড়াতে দেখে ছেলে মানুষ হ'লেও আমি আন্দাজ ক'রতে পেরেছিলাম, দিদিমাদের ব্যবহারে তিনিও ছোট ঠাক্‌মার মতই বেশ আঘাত পেয়েছেন।

ঠাক্‌মার সেদিনকার অবস্থা মনে প'ড়লেই আমার মন এখনও সময় সময় কানে ফিস ফিস ক'রে বলে—তিনিই ছিলেন বারো আনা মায়ের আদর্শ। নিজের মান খুইয়েও ছেলের সুখশান্তির জন্য অধীর হ'তে মায়ের মত বুঝি আর কেউ পারে না জগতে। [ক্রমশঃ]

পুণ্যশ্লোক শিবচন্দ্র দেব

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মহাত্মা শিবচন্দ্রের সহিত আমার রক্ত-সম্বন্ধ আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সাধ্বী কৈলাসকামিনী আমার পিতামহী। আমার পিতামহ, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অকালে ৪০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে আমার শোকাকুলা পিতামহী দেবী ৮।৯টী শিশু সন্তান লইয়া পিতা শিবচন্দ্রের আশ্রয়ে কয়েক বৎসর যাপন করেন এবং আমার পিতৃদেব নয় বৎসর বয়স হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার নিকট হইতে শৈশবাবধি আমি শিবচন্দ্র দেবের জীবনের বহু পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে শিখিয়াছিলাম। শিবচন্দ্র ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার স্বর্গারোহণ কালে আমার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। সুতরাং শৈশবে তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্যও আমি লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার যে স্বর্গীয় জ্যোতির্বিভাসিত দেবমূর্ত্তি বাল্যস্মৃতি ও আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রতিনিয়ত ধ্যান করিয়াছি, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে—

> "দেখিনি মানব হেন দেবতার মত,
> জানিনে দেবতা হেন মানুষের মত,
> ললাটে বিরাজে তাঁর স্বরগের জ্যোতিঃ
> নয়নে নিবসে তাঁর মর্ত্তের মমতা।"

ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু তাহার বুকে সূর্য্যের কিরণ রশ্মি—তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা আংশিকভাবেও প্রতিবিম্বিত করে, প্রতিফলিত জ্যোতিঃতে আপনাকে ক্ষণকালের জন্যও প্রদীপ্ত করিয়া লয়, দুঃখের বিষয় এই,—লজ্জার বিষয় এই—যে, হতভাগ্য আমরা, আমাদের ব্যর্থ জীবনে মহাপ্রাণ শিবচন্দ্রের চরিত্রের অলৌকিক গৌরব-রশ্মি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিফলিত করিতে পারিলাম না। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া সেই কথাই বারম্বার মনে উদিত হইতেছে।

আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য' নামক বিস্তৃত গ্রন্থে শিবচন্দ্রের যে জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিব।

পুণ্যশ্লোক শিবচন্দ্র দেব

সার্দ্ধ শত বৎসর হইতে চলিল, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই, কোন্নগরে পুণ্যাত্মা শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে জোব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত চাণক নামে প্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিতেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা রাজ্য রক্ষার্থ চাণকে একটী বৃহৎ

সেনানিবাস স্থাপন করে এবং উক্ত স্থান ব্যারাকপুর নামে খ্যাত হয়। এই সময়ে অনেক ভদ্রব্যক্তিকে অন্যত্র চলিয়া আসিতে হয় এবং শিবচন্দ্রের পিতামহ নিধিরাম "গঙ্গার পশ্চিমকুল, বারাণসী সমতুল" মনে করিয়া কোন্নগরে বাটী নির্ম্মাণ করেন। শিবচন্দ্রের পিতা ব্রজকিশোর ইংরাজদের সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন এবং ব্যারাকপুরে কয়েক-খানি বাংলো এবং কোন্নগর ও রিষড়ায় ভূমি ও উদ্যানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্রজকিশোরের চারিটী পুত্রের মধ্যে শিবচন্দ্র ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তখন কোন্নগরে কোনও পাঠশালা ছিল না, গৃহে জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট যৎসামান্য বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে শিখিয়া শিবচন্দ্র মদনমোহন মিত্র নামক তাঁহার এক পিতৃস্বস্রেয়ের নিকট ইংরাজী ওয়ার্ড বুক পড়িয়াছিলেন। ১১ বৎসর বয়সে শিবচন্দ্রের মাতৃবিয়োগের পর প্রায় দুই বৎসর তিনি শিক্ষার কোন সুযোগ পান নাই।

এই সময়ে কলিকাতায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং শিবচন্দ্র তথায় পড়িবার জন্য পিতার নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হাটখোলায় রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইলেন। রামনারায়ণ শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। কয়েক মাস রীড সাহেবের বিদ্যালয়ে পড়িয়া শিবচন্দ্র ১৪ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সপ্তম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন।

ভগ্নীর গৃহে তাঁহার মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন, তবে তিনি পাঠের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ পান নাই বলিয়া একটু অসুবিধা হইয়াছিল, কারণ বাটীর অন্যান্য বালকরা নানা ভাবে বিঘ্ন ঘটাইয়া পাঠের ব্যাঘাত করিত। কিন্তু শিবচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ধৈর্য্যের নিকট তাহারা পরাভূত হইয়াছিল এবং ধীর শান্তস্বভাব শিবচন্দ্রকে কোনরূপে উত্যক্ত করিতে তাহারা লজ্জা পাইত।

পাঁচ মাস সপ্তম শ্রেণীতে পাঠের পর ডবল প্রমোশন লইয়া শিবচন্দ্র পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেন এবং প্রতি বৎসর পাঠে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার লাভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে উঠেন। এই শ্রেণীতে ২ বৎসর পড়িয়া তিনি উচ্চ প্রশংসাপত্র লইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালে একদিন হিন্দু স্কুলের পরিদর্শক প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার শিবচন্দ্রকে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নবপ্রকাশিত ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান উপহার দিয়া বিস্মিত করেন। পরীক্ষায় সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য এই উপহার!

এই সময়ে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক যোগদান করেন, ইঁহার নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইনি

ডেভিড হেয়ার

৪ বৎসরকাল মাত্র হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার ছাত্রগণকে এরূপ মহান ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরিত করিয়া গিয়াছিলেন যে সেই ছাত্রগণ দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারত-

বর্ষের ডিমস্থিনীস দেশপ্রাণ রামগোপাল ঘোষ, সত্যনিষ্ঠ রামতনু লাহিড়ী, ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরহিতব্রত শিবচন্দ্র দেব, জ্ঞানবীর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ডিকেন্স' প্যারীচাঁদ মিত্র, সুপণ্ডিত রসিককৃষ্ণ মল্লিক, 'অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জ্জন্মদাতা' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি আমাদের জাতীয় গৌরব-ভাণ্ডার কিরূপে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ডিরোজিও বাস্তবিক অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাইশ বৎসর ব্যাপী স্বল্প জীবনের মধ্যে তিনি Fakir of Jungheera, Poems, A critique on the Philosophy of Kant প্রভৃতি গ্রন্থে যে প্রতিভার ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে উহা বিকশিত হইলে কিরূপ হইত তাহা ধারণা করা যায় না। তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার প্রমাতামহ কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় History of the Hindoo College নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম:

"শিক্ষকরূপে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবলতর ছিল। তিনি মনে করিতেন যে কেবল শব্দমালা নহে, পরন্তু বিষয় শিক্ষাদানও তাঁহার কর্ত্তব্য; কেবল মস্তিষ্কের নহে পরন্তু হৃদয়ের বিকাশসাধনও তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাবিতে শিখাইতেন, এই দেশের অধিবাসীরা সেই সময়ে যে প্রাচীন সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্ত্বে ও নীতিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ডিরোজিও তাঁহাদিগকে লক্, রীড্, ষ্টুয়ার্ট ও ব্রাউনের অভিমতাদি বুঝাইতেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপনায় পর্য্যবেক্ষণশক্তির ও তর্ককৌশলের যে মৌলিকতা দেখাইতেন, তাহা স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টনেরও অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পরন্তু নিজগৃহে, তর্কসভায় ও অন্যান্য স্থানে, ছাত্রদিগকে আপনার জ্ঞানসম্ভার দান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।"

ডিরোজিওর অন্যতম প্রিয় শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র তদ্বিরচিত ডেবিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে লিখিয়াছেন:

"Derozio appears to have made strong impression on his pupils, as they regularly visited him at his house and spent hours in

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

conversation with him. He continued to teach at home what he had taught at school. He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate and practice all the virtues, shunning vice in every shape. He aften oread examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some with the paramount importance of truth, some with patriotism, some with philanthropy."

তাঁহার শিষ্যগণের উন্নতির জন্য তিনি কত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেন, তাহা ডিরোজিও স্বয়ং একটি সনেটে প্রকাশ করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই :

"অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পদল সম, ধীরে ধীরে হয় বিকশিত
তোমাদের সুকুমার চিত, হেরি আমি উৎসুক নয়নে ;
মানসিক শক্তিচয় যেন ছিল মন্ত্র-মূর্চ্ছিত শয়নে,
সুবর্ণ-শলাকা-স্পর্শে এবে ক্রমে ক্রমে হয় উদ্বোধিত।
যেন হেরি বিহঙ্গম-শিশু, সুখকর বসন্ত-বাসরে
প্রসারিছে ক্ষুদ্র পক্ষ দু'টি, নিজ শক্তি পরীক্ষার তরে।
অবস্থার বায়ু অনুকূল ; বৈশাখী বরষা সম ঝরে
জ্ঞানের প্রথম বারিধারা ; করিতেছে শিশির বর্ষণ
অগণিত নবভাব নিতি ; কি আনন্দে চিত্ত মোর ভরে
হেরি তোমাদের মহাপূজা,—শক্তি-উৎস সত্যের অর্চ্চন
মানস-নয়ন মেলি যবে চেয়ে দেখি ভবিষ্য-মুকুরে,—
যশোমাল্য গাঁথিছেন দেবী ভাগ্যলক্ষ্মী, ভাবি গরিমার
সমুজ্জ্বল মুকুট ভূষণ হবে যাহা তোমাদের শিরে,—
হর্ষনীরে ভাসি, ভাবি বৃথা যাপি নাই জীবন আমার।"

ডিরোজিও ছাত্রগণকে পুঁথিগত বিদ্যা না শিখাইয়া তাঁহাদিগের চিত্ত-বিকাশের জন্যই সমধিক চেষ্টা পাইতেন। ফলে তাঁহার Progress Report প্রায়ই প্রধান শিক্ষকের মনঃপূত হইত না। প্যারীচাঁদ মিত্র এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, একবার হিন্দু কলেজের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ডি আনসেলম ডিরোজিও প্রদত্ত Progress Report পাইয়া এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ডিরোজিও পশ্চাতে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন।

ডিরোজিওর শিক্ষার ফলেই ছাত্রগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছেন এবং হিন্দু আচার ব্যবহারাদি প্রকাশ্যে পদদলিত করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ আসিতে লাগিল। ডিরোজিও পদচ্যুত হইবার অপমান সহ্য করিবার পূর্ব্বে কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে ছাড়িল না। তাঁহার বাটীতে গিয়া এই আদর্শ শিক্ষকের নিকট উপদেশাদি লাভ করিতে লাগিলেন।

সত্য কথা স্বীকার করিতে গেলে বলিতেই হইবে ডিরোজিওর অধিকাংশ শিষ্যের চেষ্টায় দেশের নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হইলেও কাহারও কাহারও চরিত্রে একটু আধটু পান দোষাদি কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু 'একোহছি দোষো গুণ সন্নিপাতে, নিমজ্জতেন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।' পুণ্যাত্মা শিবচন্দ্রের চরিত্রে কোন দোষের লেশ ছিল না এবং চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য তিনি ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "তিনি আমাদের মধ্যে সদাশয়তা, মিতাচারিতা, পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ধর্ম্মভীরুতার আদর্শ ছিলেন। সত্য সত্যই ডিরোজিও-বৃক্ষের এই ফলটী অতি মধুর হইয়াছিল।" ডিরোজিও শিবচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ১৮২৯ সালে ২য় শ্রেণীতে পাঠকালে শিবচন্দ্রের লিখিত 'নীতির উৎপত্তি' বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য স্বীয় স্বাক্ষর-যুক্ত Dugald Stewart-এর কয়েকখানি পুস্তক তিনি পুরস্কার দেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ এবং রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ডাঃ টাইটলারের নিকট শিবচন্দ্র উচ্চ গণিত (Differential Calculus or Method of fluxions) শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর শিবচন্দ্র তাঁহার সহপাঠী রাধানাথ শিকদারের সহিত ত্রিকোণ-মিতিক জরীপ বিভাগে কম্পিউটর নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটী কলেক্টর

নিযুক্ত হন। প্রশংসার সহিত প্রথমে বালেশ্বর এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে তিনি কর্ম্ম করেন।

মিস কলেটকে লিখিত শিবচন্দ্রের পত্রাবলী হইতে প্রতীত হয় যে, ছাত্রাবস্থাতেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজে শিবচন্দ্র উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একেশ্বর-বাদী হন। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হইয়া তিনি ব্রাহ্ম উপাসনা প্রণালীর অনুরাগী হন এবং মেদিনীপুরে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন।

মেদিনীপুর হইতে বদলী হইলে মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম-সমাজ উঠিয়া যায়, এবং পরে ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র ৭০০৲ বেতনে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এক সঙ্গেই আলীপুর ও কলিকাতায় কালেক্টরের কাজ করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি সপ্তাহান্তে কোন্নগরে আসিতেন এবং উার সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা করিতেন।

শিবচন্দ্র দেবের দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কেবল একবার তাঁহাকে একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। একবার সিপাহী বিদ্রোহের সময় ট্রেনে কয়েকজন পদস্থ য়ুরোপীয় দেশীয়দিগের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছিলেন, শিব চন্দ্রের উহা অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি বলেন, কেবল এক পক্ষের দোষ দেখিলে চলিবে না। যখন ধর্ম্মমূলক সংস্কার বশতঃ সিপাহীরা দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে অসম্মত হইয়া-ছিল, তখন তাহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য করা গবর্ণ-মেণ্টের উচিত হয় নাই।" শিবচন্দ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী এবং বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন গবর্ণমেণ্টে এইরূপ রিপোর্ট প্রেরিত হইল এবং হোম সেক্রেটারী পরে লেঃ গবর্ণর স্যর সিসিল বীডন শিবচন্দ্রের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তিনি সত্য যাহা ঘটিয়াছিল অকপটে তাহা স্বীকার করিয়া তিনি যে বিদ্রোহীদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তাহা অস্বীকার করেন। তাঁহার দীর্ঘ সৎকার্য্যের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী শিবচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কোন্নগরে ফিরিয়া আসেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইলেও তিনি বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন নাই, শেষ দিন পর্য্যন্ত জনহিতকর কার্য্যে আপনাকে নিরন্তর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে বদলী হইলে তিনি সপ্তাহান্তে একবার করিয়া কোন্নগরে আসিতেন। গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'কোন্নগর হিতৈষিণী সভা' স্থাপন করেন। উহা তিন বৎসর কাল জীবিত ছিল এবং নানাস্থানে পথ-সংস্কার, পুল নির্ম্মাণ, দরিদ্রগণকে সাহায্য দান, স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ অর্থ দানাদি করিয়াছিল। কোন্নগরের জন্য শিবচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যে অস্বীকৃত হইলেও তিনি কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ভূমির উপরেই বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন শিবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়। তিনি এই বিদ্যালয়ে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের শিক্ষা প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং উহা তৎকালে হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের সমকক্ষ হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন বামাবোধিনী-সম্পাদক সাধু উমেশ চন্দ্র দত্ত উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন এই স্কুল হইতে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও আমার পিতৃদেব পূজ্যপাদ অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও নবম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন; সেই বৎসর আরও একজন ১০৲ টাকার ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া শিবচন্দ্র কোন্নগরে রেল ষ্টেসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই স্থানের অধিবাসিগণকে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বালী বা শ্রীরামপুর ষ্টেসনে উঠিতে বা নামিতে হইত।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন্নগর বাঙ্গালা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন, কারণ লর্ড হার্ডিংএর আমলে যে বাঙ্গালা স্কুল ছিল গভর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই বৎসরই ১লা এপ্রিল তিনি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট গেজেট, শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট সমূহ এবং এসিয়াটিক সোসাইটির বহুমূল্য Bibliothica Indica পর্য্যায়ের গ্রন্থাদি লাইব্রেরী বিনামূল্যে পাইত।

এই বৎসরই ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক লিখিয়া এবং ক্ষতি হইলে ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার করিয়া শিবচন্দ্র কোন্নগরে পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজে পাঠদ্দশাতেই শিবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তৎকালে দেশবাসীর এইরূপ কুসংস্কার ছিল যে লেখাপড়া শিখিলে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হয়। তিনি বিবাহের পর তাঁহার বালিকা পত্নীকে গভীর রাত্রিতে সকলের অলক্ষ্যে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী অম্বিকা দেব এরূপ শিক্ষিতা হইয়াছিলেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি তিনি সাগ্রহে পাঠ করিতেন। শিবচন্দ্র তাঁহার ছয় কন্যাকেও সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহ কেহ বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্রে সুন্দর সুন্দর গদ্য ও পদ্য রচনা লিখিতেন। অমর কবি দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্যে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে—

"কায়স্থ-নিবাস কোন্নগর বিশাল
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল
শিশু পালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

শিবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টকে কোন্নগরে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যর্থ প্রস্তাব করিবার পর স্বয়ং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল নিজ ব্যয়ে নিজগৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং পরে উহার জন্য নিজব্যয়ে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মড়কের সময় গবর্ণমেণ্ট কোন্নগরে একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করেন, কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দিবার আদেশ দেন। শিবচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর ব্যয়ে ঐ বৎসর একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে স্বদেশবাসীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার উদ্বোধন করেন। প্রথমে সমাজ তাঁহার গৃহেই অবস্থিত ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ ভাগীরথী তীরে শিবচন্দ্র দেব প্রদত্ত ভূমির উপর এক সমাজ মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের সংস্কার ও বার্ষিক উৎসবের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ উইলে দান করিয়া গিয়াছেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী ছিল, কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র পৃথক সমাজ গঠিত করিলে উহা শেষোক্ত সমাজের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। শিবচন্দ্র কোনও প্রকার সংকীর্ণতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং সমাজের বার্ষিক উৎসবে উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দ উহাতে যোগদান করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বজরায় করিয়া পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আসিতেন, এবং তখন এদেশে নূতন আমদানী হারমোনিয়ম সহযোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গান করিতেন, পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি। যেমন প্রাচীন হিন্দুজমীদার গৃহে দুর্গোৎসবে বহুদিন ধরিয়া নিমন্ত্রিতগণ আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, সেকালে শিবচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ব্রাহ্মগণ সপরিবারে তাঁহার গৃহে এই সকল উৎসব উপলক্ষে একাধিক দিবস বাস করিতেন।

কোন্নগরবাসিগণ শিবচন্দ্রের সকল সৎকার্য্যের ফল ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর কেহ কেহ তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু—

লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করিয়া দৃকপাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব ন্যায়

তাহা করিতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে এতকাল 'একঘরে' করিয়া অবমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ আজ তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছেন, ইহা দেখিলে ও ভাবিলেও আনন্দ হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যখন মতবিরোধ ঘটে, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে সাধু শিবচন্দ্রকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তিনি প্রথমে

উক্ত সমাজের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু তাহাতে তিনি অস্বীকৃত হইয়া বয়ঃকনিষ্ঠ আনন্দমোহন বসুকে উক্তপদে বরণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন এবং প্রথম দুই বৎসর তিনি সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে ৫ বৎসর এবং তাহার পর আরও ২ বৎসর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাগুলি দীর্ঘ না হইলেও গভীর চিন্তাপ্রসূত ও অত্যন্ত সারগর্ভ।

শিবচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম অনুরাগীছিলেন। তাঁহার বৃহৎ পাঠাগারে বহু গ্রন্থ ছিল। পঠদ্দশায় তিনি তাঁহার সতীর্থ রামকমল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পরে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী হরিমোহন সেনের সহযোগে আরব্যোপন্যাসের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এদেশে শিশুপালন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ না থাকায় শিবচন্দ্র এনড্রু কোম্বের ও অন্যান্য লেখকদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 'শিশুপালন' নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখেন। উহার প্রথম ভাগ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালে এই ধরণের গ্রন্থের অভাবশতঃ উহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শিশুপালন প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। বেথুন বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে উহা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই জন্যই দীনবন্ধু সুরধুনী কাব্যে তাহাকে 'শিশুপালনের পিতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের সমগ্র স্বত্ব তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন।

ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা কল্পে হেয়ার 'প্রাইজ ফণ্ড' নামক একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, উহা হইতে বঙ্গ ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট পুস্তক ও প্রবন্ধাদির জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই সকল পুস্তক ও প্রবন্ধাদির বিচারক ছিলেন; শিবচন্দ্র দেবের 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান' নামক একখানি পুস্তক এই ফণ্ড হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি প্রথমে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' 'প্রেততত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর শিবচন্দ্র অশীতি বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। জীবিতকালে তিনি সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে উইল দ্বারা সাধারণ কার্য্যের জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীও ভাগীরথী তীরে পিতার নামে একটি ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৬০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য ৩০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া ১৩০২ সালের ২৮শে আষাঢ় দেবতুল্য স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য মহাযাত্রা করেন।

চরিত্রের সরলতা, সাধুতা ও মধুরতায়, কর্ত্তব্যে অটল নিষ্ঠায়, দয়া ও দানশীলতায়, বিশ্বপ্রেমের গভীরতায়, ভগবদ্ভক্তির প্রগাঢ়তায়, নীরব কর্ম্মী শিবচন্দ্র ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যগণকে বোধ হয় পরাজিত করিয়া গুরুর শিক্ষা প্রণালীর অন্যায় কলঙ্কমোচন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ ৮০ বৎসর ব্যাপী তাঁহার পূত জীবনের কোথাও এতটুকু কলঙ্ক কালিমা স্পর্শ করে নাই।

সত্যমেব ব্রতং যস্য, দয়া দীনেষু সর্ব্বদা

কাম ক্রোধৌ বশে যস্য, তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

শিবচন্দ্রের জীবনে এই আদর্শই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন।*

কোন্নগরের যে স্থানেই ভ্রমণ করি, সেই স্থানেই তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাই। মনে হয়, কোন পুণ্যতীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছি। সে কালের অন্যতম দেশনায়ক, 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-সম্পাদক সুপণ্ডিত কিশোরীচাঁদ মিত্র একবার কোন্নগর স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতির আসন হইতে একটি বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়া-

* তিনি তাঁহার জীবনের সাফল্যের এই কারণগুলি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—সংযম ও পরিশ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, সাধুতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

ছিলেন, যদি প্রতি গ্রামে একজন করিয়া শিবচন্দ্র দেবের মত লোক থাকিতেন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা অন্যবিধ হইত, দেশের উন্নতির পরিসীমা থাকিত না।"

আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত আজ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। তাঁহার সহিত রক্ত সম্বন্ধ না থাকিলেও করিতাম, আছে বলিয়া আরও বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি যখন দুই বৎসরের শিশু এবং তিনি ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ, তখন তিনি একবার আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য জরুরী কাজের জন্য এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তিনি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপর তলায় আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, আমার তখন একটু সর্দ্দিকাসি হইয়াছিল। কোন্নগরে ফিরিয়াই তাঁহার মনে হইল আমাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেখিয়া গেলেও তাঁহার না দেখিয়া যাওয়ায় তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ একপ্রকার ক্ষমা প্রার্থনার সুরে আমার পিতৃদেবকে—তাঁহার দৌহিত্রকে—পত্র লিখেন এবং আমার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্নেহপরায়ণ মহাত্মা ছিলেন, এবং আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে—

"মহত্তম মানুষের স্পর্শ হ'তে হইনি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে ক'রেছি সঞ্চিত।"

কিন্তু হায়! তাঁহার চরিত্রের মহান আদর্শ নবীনগণের প্রাণে অনুপ্রেরিত করিবার আমার ভাষা বা শক্তি কোথায় ?†

† 'কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ' ও 'কোন্নগর পাঠচক্রে'র মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিবচন্দ্র স্মৃতিসভায় পঠিত।

স্বর্গীয় কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাণী মন্দিরে রোশনাই করে
এসেছিলে কবিবর,
বর্ণে গন্ধে গীতে ও আলোকে
সুশোভিত চরাচর।
তখন রবির শোভার চাকায়
বিস্ময়ে দেশ বিদেশ তাকায়,
পিক কুহরিত মধু মালঞ্চ
সুন্দর মনোহর।

২

চলে গেলে যবে দেশ প্রাণহীন
হত আহতের ভূমি
হে মরমী কবি, স্বপ্নে যে কথা
ভাবো নাই কভু তুমি।
শুধু শঙ্কা ও সংশয় জ্বালা,
শুধু ক্ষতি আর হারাণোর পালা,
তুমি চলে গেলে দেশ পেলে নাক
কাঁদিবার অবসর
মোহাচ্ছন্ন নিজ্জিত জর্জ্জর

৩

ছিলে কবি তুমি কমলার প্রিয়
তাহাতে মিটেনি ক্ষোভ,
বুকেতে বাজিত একতারা তব
দীনতায় ছিল লোভ।
বাউলের পানে চাহি বারবার
উঠিত না মন যেতে দরবার,
তুমি যে ভাবের বাগের জগতে
ফিরিতে নিরন্তর।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

১০, ১১

দিব্যগন্ধ-তুলসী-পৃক্ত বনমালা গলে প'রে'
সে মধু গন্ধে মত্ত ভ্রমর তোলে কল-গুঞ্জন,
তিলক-খচিত-সুন্দর শ্যাম রাখিতে তাদের মন,
মুরলীতে তোলে সুমধুর তান আদরে অধরে ধরি'।
সরসীতে যত সারসহংস বনবিহঙ্গগণ,
চারুগীত শুনে হৃষ্টচিত্তে সেথা করে আগমন;
নিমীলিত করি' নয়নযুগল হরিপদ-করে ধ্যান,
মৌনব্রতাবলম্বী সকলে নাহিক বাহ্যজ্ঞান!

১২, ১৩

বলরাম সহ কর্ণভূষণমাল্যে যাঁর বিলাস,
হর্ষ-পূরিত গিরি-সানুদেশে বেণুরব-মন্দ্রিত,
মেঘের হৃদয়ে জাগে মহতের অতিক্রমণে ত্রাস,
মন্দ মন্দ অনু গর্জ্জন গুরু গর্জ্জন-ভীত!
ওগো সখি শোনো, নবজলধর সুহৃদ ভাবিয়া ফিরে,
ছায়ারূপে করে ছত্র-রচনা, পুষ্প বরিষে শিরে?

১৪, ১৫

ওগো সতি মাতা যশোদা, তোমার সুত অতি সুনিপুন
নানাবিধ গোপক্রীড়া-বিদগ্ধ, গীতবিদ্যাদি গুণ,
আয়ত্তে তাঁর, স্বরজাতী নিজে যতনে শিখেছে সব,
বেণুতে বাজায় নিষাদ ঋষভ এত তাঁর বৈভব!
অধর-বেণুতে শুনি' গীতালাপ হ্রস্ব মধ্য ভেদে
ইন্দ্র মহেশ সুরেশাদি যত না বুঝি আলাপ ক্ষেদে-
আনতচিত্ত, পণ্ডিত তবু দেবতারা মোহগত,
সুরালাপ ভেদ নিশ্চিত নয়, তাই শির অবনত।

১৬, ১৭

ধ্বজবজ্র ও নীরজাঙ্কুশ বিচিত্র চিহ্নিত
নিজ পদাব্জদলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে করে বিচরণ,
গজপতিগতি, অধরে মুরলী গোখুরচিহ্ন ব্যথা,
কমল-চরণ-পরশনে যেন করে তিনি নিরসন।
ভ্রমণের কালে বিলাস-লুলিত বাঁকা কটাক্ষে মোরা
মনোভববেগে আকুল অথির, পাই যেন কুজগতি,
মোহবশে হায়! কবরীকুসুম ঝরিল পড়িল ভুঁয়ে
খসিয়া পড়িল নীবীর বসন, বন্ধনে নাই মতি।

১৮, ১৯

ধেনুগণনায় মণিধর, গলে দয়িত-গন্ধ তুলসী,
মলয় নিয়ত গন্ধ বিতরে, বন্ধুজনের অংশে
ভুজবন্ধনে যখন কৃষ্ণ সুরালাপ তোলে বিলসি,
কৃষ্ণসারের গৃহিণী হরিণী ক্বণিত বেণুর রবে,
গুণসাগরের অনুগত হয়ে ছুটে আসে ভাষাহীন,
গৃহে ফিরিবার বাসনা ত' নাই,
গোপীদেরই মত আশাহীন।

২০, ২১

অনঘে, নন্দনন্দন যবে কুন্দকুসুমদামে,
বিভূষিত হ'য়ে কৌতুকবশে যমুনায় ক্রীড়া করে—
গোপ ও গোধন আবৃত হ'য়ে হরষে বন্ধু সনে,
মত্ত ক্রীড়ায়, মন্দ মলয় বহে সেথা লীলাভরে।
বায়ু চন্দন-গন্ধ পরশে করে তাঁর মান দান,
গন্ধর্বাদি উপদেবতারা করে বন্দনা-গান!

২২, ২৩, ২৪, ২৫

'দনান্তে যবে দেবকী-জঠর-জাত সে গোকুলচন্দ্র,
গোধন লইয়া তব মনোরথ পুরাইতে গৃহে আসে,
ঐ বেণু বাজে, পরম দয়াল, গিরিধারী রাকাশশী,
পথে বুঝি তাঁরে বন্দনা করে বৃদ্ধেরা কৃপা আশে।
অনুচরগণ সতত তাঁহার গাহিছে কীর্ত্তি গান,
হের চাঁদমুখ শ্রমে বিমলিন তথাপি নয়নে হাসি,
ধেনু-খুরজাত ধুলি জালে মালা ধুলায় ধুসর ম্লান,
দিনান্তে এল নিশাপতি সম আনন্দ পরকাশি।
মদঘূর্ণিতলোচন তাঁহার গলদেশে বনমালা,
সুহৃদ-মানদ, ঈষৎ-পক্ক-বদর-পাণ্ডু-মুখ,
কুণ্ডল দোলে সুবর্ণময় গণ্ড করিয়া আলা,
বন্ধুজনার কামনার ধন, গোপিকার শত সুখ।

২৬

শ্রীশুক:

এই মত কৃষ্ণার্পিতচিত্ত গোপীগণ
বিরহে শ্রীকৃষ্ণলীলা করিত স্মরণ!

রণজিৎ কুমার সেন

ষোল

পরদিন ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে মেসে না এসে সোজা গিয়ে উপস্থিত হ'লো বিজন রেবাদের বাড়ীতে। মাঝের হল-ঘরে ব'সে মিঃ মল্লিক তখন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন তরুণ ব্যারিষ্টার দিলীপ দত্তের সঙ্গে। উপরে নিজের ঘরে ব'সে 'গীত-বিতান'-এর পৃষ্ঠা থেকে নতুন কি একটা গানের কলি মুখস্থ ক'রছে রেবা। মিসেস্ মল্লিক মাঝে মাঝে সাম্‌নের বারান্দা দিয়ে এসে ঘুরে যাচ্ছেন।

মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যেতেই বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'শরীর ভালো আছে তো মাসিমা ?'

—'হ্যাঁ বাবা, ভালই আছি।' মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তোমার খবর কি, নিয়মিত কলেজ চ'লেছে ?'

—'শুধু চ'লেছে নয়, পরীক্ষাও এসে গেছে।' স্মিত-হাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'আজকাল আর বড়বেশী সময় পাই না। মা সরস্বতী শেষ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ক'রবেন কি না, কি জানি !'

—'মা সরস্বতী না হ'লেও মায়ের আশীর্ব্বাদ তো র'য়েছে পিছনে। তোমার মতো ছেলের মনে সংশয় আস্‌বে কেন!' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চলো, উপরে গিয়ে বসি, রেবাও উপরে আছে।'

মাঝের হল-ঘর পেরিয়ে মিসেস্ মল্লিকের অনুগমন ক'রতে গিয়ে মিঃ মল্লিক ও দিলীপ দত্তের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল বিজনের। দিলীপ দত্ত ব'ল্‌লো, 'গুড্ ডে, ওয়েল ইউ আর ?'

—'এ্যাজ্ ইউজুয়াল।' থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনাদের খবর কি ?'

—'ট্যু বিজি উইথ্ ফাংশন্, তা ছাড়া ফিজিকালি ও. কে।' ব'লে আবার নিজের কাজে মন দিল দিলীপ দত্ত।

উপরে আস্‌তেই রেবার দেখা পাওয়া গেল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে রুমখানি। হঠাৎ দেয়ালের দিকে চোখ প'ড়তেই দেখা গেল—সুন্দর রূপালী কাঠের ফ্রেমে কার্ডবোর্ডে বাঁধানো র'য়েছে রেবার জন্মদিনে উপহার দেওয়া বিজনের সেই আট লাইনের কবিতাটি: 'পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন...।' রেবা তবে সত্যিই মর্য্যাদা দিয়েছে তাকে!

ততক্ষণে 'গীত বিতান'-এর পৃষ্ঠা বুজিয়ে রেখে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সেছে রেবা।

বিজন জিজ্ঞেস্ কর্‌লো, 'সঙ্গীতচর্চ্চা হ'চ্ছিল নিশ্চয়ই ?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'চর্চ্চা ঠিকই ব'ল্‌তে পারো, তবে সুর নয়, শুধু কথা।'

মেয়ের হ'য়ে এবারে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'কথা ছাড়া সুর আস্‌বে কোত্থেকে বলো বিজু ? ঠাণ্ডা লেগে ক'দিন ধ'রে এমন টন্‌সিল বেড়েছে রেবার, ভয় হ'চ্চে—উৎসবের দিনে গিয়েও সত্যিই কিছু গাইতে পারবে কি না !'

বিজনের চোখ দু'টো এতক্ষণ রেবার দিকেই নিবদ্ধ ছিল, ব'ল্‌লো, 'ভয় নেই, গাইতে ব'ল্‌বো না।'

শুনে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু এক টুক্‌রো হাসি চেপে গেল মাত্র রেবা।

থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কিসের উৎসব মাসিমা? মিঃ দত্তও ফাংশনের কথা উল্লেখ ক'রলেন!'

—'আমাদের সমাজের মাঘোৎসব।' মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সমাজমন্দিরে ফাংশন, যাবতীয় কাজের ভার প'ড়েছে এবারে রেবার বাবা আর দিলীপের উপর। আসলে দিলীপই সব ক'রছে, উনি শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমার কিন্তু সেদিন বিশেষ নেমন্তন্ন, কাল পরশু বাদ দিয়ে সাম্‌নের সোমবার। আশা করি, নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হবে না!'

বিজন ব'ল্‌লো, 'জীবনে নতুন জিনিষ দেখবো, নতুন আনন্দের মধ্যে যোগ দেবার সুযোগ পাবো, এর জন্যে অসুবিধে যদি কিছু হয়ই, সে অসুবিধে বরণ ক'রে না নেয় কে? নিশ্চয়ই আস্‌বো আমি।'

—'এলে খুব খুসী হবো। রাত্রে একেবারে এখান থেকে খেয়ে দেয়ে মেসে ফিরবে।' থেমে মিসেস্ মল্লিক বল্‌লেন, 'নিশিকে ডেকে বিজুকে চা দিতে বল, রেবা।'

বাধা দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'চা এখন থাক মাসিমা, এই কিছুক্ষণ আগেই ছাত্রবাড়ী থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। যখনই আসি, তখনই তো কত কিছু খেয়ে যাই, খাবার উপরেই তো আছি!'

স্নেহকণ্ঠে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'খাবার এই তো বয়স চ'লে যায়। ছোটবেলার দিনগুলোর কথা একবার মনে করো তো বাবা, খাবার নিয়ে তোমরা তিনটিতে কী না ক'রতে?'

সলজ্জ হাসিতে মুখখানি একবার রাঙা হ'য়ে উঠলো বিজনের, অপাঙ্গে একবার রেবার মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা ক'রলো সে।

থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ভালো কথা, ছন্দার খবর কিছু রাখো? মেয়েটার জন্যে বড্ড মায়া হয়।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'কিছুদিন আগে মার চিঠিতে জেনেছিলাম, ছন্দার বরের বড় অসুখ, কি অসুখ শুনিনি। মাকে লিখেছিলাম তাড়াতাড়ি খোঁজ নিয়ে কুশল জানাতে, কিন্তু মার আর কোনো চিঠি এপর্য্যন্ত পাই নি।'

ইতিমধ্যে নীচে থেকে মিসেস্ মল্লিকের ডাক প'ড়লো। বিজনও আর অপেক্ষা ক'রলো না, ব'ল্‌লো 'অতর্কিতে এসে তোমার কথা-চর্চ্চায় কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে গেলাম রেবা; এবারে নিজের স্বার্থেই উঠতে হ'লো, পরীক্ষার প্রিপারেশনের দিকে কিছু মন দিতে হ'চ্ছে।'

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'সোমবার তা হ'লে আস্‌চো নিশ্চয়ই!'

—'আস্‌বো।' ব'লে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গেই আবার সিঁড়ি গলিয়ে নীচে নেমে এলো বিজন।

দিলীপ দত্ত ব'ল্‌লো, 'আমাদের ফাংশনে আপনি কিছু রিসাইট্ করুন না, স্বরচিত কোনো ভালো কবিতা?'

বিজন বল্‌লো, 'যেমন ক'রে ব'ল্‌লেন, তাতে কবিতাকেও অমর্য্যাদা করা হ'লো, আমাকেও ঠাট্টা করা হ'লো। আমি রিসাইট্ ক'রতে পারি, এ আইডিয়া আপনার হ'লো কেমন ক'রে?'

—'আপনার কাব্যচর্চ্চা থেকে।' অতি সহজ সুরেই দিলীপ দত্ত ব'ললো, 'কবিরা ভালো আবৃত্তি ক'রতে পারেন ব'লেই আমার বিশ্বাস ছিল।'

—'কাব্যচর্চ্চা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তা ছাড়া কবিতা লিখলেই যে কবি হওয়া যায় না—এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।' থেমে স্মিতহাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'আপনি বরং সত্যিকারের কোনো জাত-কবিকেই এ ভার দিয়ে তৃপ্ত হ'ন্।'

উত্তরে দিলীপ দত্ত কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বিজুর কথা শোনো।'

—'শুনেছি, খারাপ কিছু বলেনি। অভ্যাস না থাকলে ও কেমন ক'রে আবৃত্তি ক'রবে?' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'উৎসবের দিন বিজু আসবে, রাত্রে এখান থেকে খেয়ে যেতে ব'লে দিলাম।'

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কাজের কাজ ক'রেছ, নানা ঝঞ্ঝাটে আমি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ব'লতেই ভুলে যেতাম। বিজু আমাদের ঘরের ছেলে, উৎসবের দিন ও না থাকলে কি হয়!'

বিজন কিছু একটাও আর ব'ল্‌লো না। নীরবে একসময় বিদায় নিয়ে পথে এসে গাড়ীর জন্য ষ্টপেজে দাঁড়ালো। মাঘের হিমশীতল রাত্রি। কন্‌কনে শীতে

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে নিচ্ছিল। সঙ্গে শীতবস্ত্র ব'লতে কিছু নেই, ক'লকাতার জীবনে একখানি লেপমাত্র তার সম্বল। প্রতি পদে পদে দীনতার উদ্বেল আবর্ত্ত। সংস্কৃতিগত মন নিয়ে জীবনে বড় হ'য়ে উঠতে হ'লে অবস্থারও যে উন্নতির দরকার! অবস্থার সেই পরিপূরক সামর্থ্য কোথায় তার?

অকস্মাৎ সাম্‌নে একখানি ট্রাম এসে দাঁড়িয়ে প'ড়তেই ত্রস্তে উঠে প'ড়লো বিজন।…

পুরো দু'টো দিন তার একরকম আত্মবিশ্লেষণেই কেটে গেল। রাশিকৃত পড়ার চাপ মাথায় থাকতেও বইয়ের সঙ্গে ঠিক মনঃসংযোগ ক'রতে পারলো না সে। জীবনে আর একবার এম্‌নি একটা মুহূর্ত্ত এসেছিল, ছন্দা তখন রাজসাহীতে বউ হ'য়ে যাচ্ছে। দৌলতপুরের নিঃসঙ্গ হ'ষ্টেল-জীবনে ব'সে এম্‌নি ক'রেই উন্মনা হ'য়ে উঠেছিল সে। সেখানে ছিল কলেজ-হ'ষ্টেল, এখানে পাবলিক-মেস। দৌলতপুর আর ক'ল্‌কাতা। আজ নিজেকে নিয়ে ভাবতে ব'সে চিন্তাসূত্রকে আরও অর্থগর্ভ, আরও জটিল ব'লে মনে হ'চ্চে বিজনের কাছে। আজ হৃদয়ের সমস্ত কামনা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে রেবার মধ্যে। যত ঐতিহ্যের মধ্যেই সে মানুষ হোক্, সেই ঐতিহ্যকে জয় ক'রে নিতে হবে তাকে, তবেই তার জীবনের যথার্থ বিকাশ, জীবনের যথার্থ বিস্তৃতি। সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রাণ দিয়ে আজ ভালবাসে রেবাকে। ছন্দাকে ভালোবাসাটা আজ এ ভালোবাসার একেবারেই উল্টো পিঠ। তাকে শুধু দূর থেকেই শুভকামনা জানাতে পারে বিজন, কিন্তু রেবাকে চায় সে প্রণয়ের নিবিড় রসের মধ্যে পরিণিতা বধূরূপে। ভালোবেসে দূর-থেকে আত্মপ্রসাদ লাভকে দার্শনিক প্লেটো যতবড় সংজ্ঞাই দিয়ে থাকুন না কেন, তাতে আজ আর অন্ততঃ বিশ্বাস রাখতে পারছে না সে। রেবাকে পেলে সংস্কৃতি-জগতের বৃহৎ আকাশটা খুলে যাবে তার দু'চোখে; সেই আকাশে প্রাণবন্ত বলাকার মতো উড়ে যেতে পারবে সে কবিতা হ'য়ে। আবার কবিতার প্রতিষ্ঠা হবে তার জীবনে। একদিন বড় হবার আশা নিয়েই অনাত্মীয় এই মহানগরীর পথে পা বাড়িয়েছিল বিজন, আজ সেই অনাত্মীয়তা অনেকখানিই আত্মীয়তায় সিক্ত হ'য়েছে। ঐশ্বর্য্যময়ী এই মহানগরীকে নিবিড় ক'রে পাওয়া এতই কি শক্ত?

একসময় মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি ভাবছো বিজু?'

নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'না, কিছু না।'

পাশ থেকে অরুণ ব'ল্‌লো, 'না কেন, নিশ্চয়ই নতুন কোনো প্লট। সৃষ্টির উন্মাদনায় অধীর বসুন্ধরা। অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই এ কথা, কাব্য-মালিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'

—'কিন্তু—লক্ষ্মী ভিন্ন মালিকাই বা কার গলায় দুল্‌বে?' ব'লে ঠোঁটের ফাঁকে চাপা একটুক্‌রো হাসি গোপন ক'রে নিল মহেন্দ্র।

বিজন বল্‌লো, 'এমন ক'রেও ঠাট্টা ক'রতে পারেন মহিনদা?'

—'ঠাট্টা নয় ভাই, খানিকটা রসিকতা।' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'সারাদিনে রসালাপের ক্ষেত্র তো কোথাও পাইনে, তোমাকে উদ্দেশ্য ক'রে নিজের বুকের জ্বালা তবু খানিকটা মিটিয়ে নেবার অবকাশ পাই।'

অরুণ বল্‌লো, 'মহিনদার বুকেও তবে আগুন জ্বলে? শুধুই তবে বরফের ধোঁয়া নয়?'

—'তারও একটা তাপ আছে—যদিও দাহ নেই।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'লুকোও ক্ষতি নেই, কিন্তু সত্যিই দু'দিন ধ'রে তোমাকে বড্ড টায়ার্ড মনে হ'চ্ছে বিজু; পরীক্ষা সাম্‌নে, খানিকটা চিয়ারফুল হ'তে চেষ্টা করো।'

—'শরীরটা ক'দিন ধ'রে কেমন যেন ভালো যাচ্ছে না মহিনদা, মনে হ'চ্চে—খুব শীগ্‌গিরই কিছু-একটা বড় রকমের অসুখে প'ড়বো আমি।' ব'লে কোথায় এক-দিকে বেরিয়ে প'ড়বার জন্য পা বাড়ালো বিজন।

মহেন্দ্রও সাথে সাথে উঠে প'ড়লো, ব'ল্‌লো, 'শরীর খারাপ বোধ করছো তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এটা বাড়ী নয়, ক'লকাতা সহর; অসুখ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে থাকলে মায়ের মতো শিয়রে ব'সে কেউ স্নেহের হাত বুলিয়ে দেবে না।'

—'আপনি তো র'য়েছেন, ও হাত দু'খানিতেই কি কম স্নেহ ?' মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালো বিজন মহেন্দ্রর মুখের পানে, তারপর দ্রুত-পায়ে কোথায় একদিকে চলে গেল।

মহেন্দ্রও আর অপেক্ষা ক'রলো না। যাবে সে মৌলালীর দিকে কি কাজে, কিন্তু ভুল ক'রে চেপে ব'স্‌লো ধর্ম্মতলার ট্রামে। বিজনের কথাটা তার মনের মধ্যে ঘুরছিল। অনাসক্ত স্নেহহীন জীবনে বিজন আজ তার মধ্যে এমন কি প্রাণরস খুঁজে পেল? কিন্তু বেশীক্ষণ এ চিন্তায় ডুবে থাকৃতে পারলো না সে। ধর্ম্মতলায় এসে এস্‌প্লানেডের দিকে ট্রামটা বাঁক নিতেই আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে খানিকটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো মহেন্দ্র। এখান থেকে রাজাবাজারের গাড়ী ধ'রে তবে তাকে গিয়ে নামতে হবে মৌলালীতে।···

সতের

মাঘী পূর্ণিমার সুন্দর প্রশান্ত বেলা। শীতের মিঠে রোদে স্নান ক'রে উঠেছে ক'লকাতা। ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসবের নহবৎ বাজছে। সোমবার। দিনটা ভুল হবার কারণ নেই। দুপুরের রোদ ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আস্‌চে। যথাসময়েই বিজন গিয়ে উপস্থিত হ'লো সমাজ-মন্দিরে। ফুলে আর পাতাবাহারে সুসজ্জিত মন্দির-গৃহ। সামনে দাঁড়িয়ে দিলীপ দত্ত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা ক'রছে। অফুরন্ত উদ্যম আর কর্ম্মশক্তি, প্রতিভার দীপ্তি ঝ'রে প'ড়ছে দু'চোখ বেয়ে! নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসাচ্ছে গিয়ে সে কক্ষাভ্যন্তরে।

একটু বাদেই কার্য্যসূচী অনুযায়ী আরম্ভ হ'য় গেল অনুষ্ঠান। আচার্য্যের স্বস্তিবাচনের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত। ঘোষকের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'লো মিস্ রেবা মল্লিকের নাম। মঞ্চের একপাশে একটি অর্গান শোভা পাচ্ছিল। একটু বাদেই রেবা এসে ব'স্‌লো সেই অর্গানে। বেজে উঠ্‌লো অর্গান: একটা সুন্দর নরম সুর। টন্‌সিল তবে আজ আর যন্ত্রণা দিচ্ছে না রেবাকে! ভগবানকে ধন্যবাদ। অধীর আগ্রহে খানিকটা গলা উঁচিয়ে ব'স্‌লো বিজন। তন্ময় হ'য়ে গেল সে রেবার গানের মধ্যে:

'কি আছে আমার, দেবো যে তোমারে প্রভু!
শূণ্য হৃদয়ে ব্যর্থ গানের সুর তুলে ধরি তবু।'···

নীরবতায় থম্‌থম্ ক'রছে মন্দিরকক্ষ, তার মধ্যে নিবেদনের নরম সুরে কণ্ঠ ভ'রে উঠেছে রেবার। এতদিন তিলে তিলে প্রতি মুহূর্ত্তে যে গানের প্রতীক্ষায় ঘুরে ম'রেছে বিজন, আজ এতদিনে সেই অধীর প্রতীক্ষা তার সার্থক হ'লো। কি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা, কি অপূর্ব্ব সুর-বিস্তার, কি অনুপম আবেগময় কণ্ঠ! পারবে না কি এই সুর দিয়ে তার জীবনকে ধুয়ে নিতে বিজন, খেলাঘরের পুরোনো জীবনকে আবার কি পারবেনা সে নতুন ক'রে গ্রন্থীবদ্ধ ক'রতে? গানের সুর বেয়ে মনটা অলক্ষ্যে কখন্ আকাশচারী হ'য়ে গেল বিজনের, তা সে নিজেও জানতে পারলো না।

উৎসব ভেঙে গেলে সাম্‌নের গেটে এসে মিঃ মল্লিকের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'রতে গিয়ে বিজন দেখ্‌লো— গাড়ীতে তিল ধারনেরও যায়গা নেই। মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তুমি আস্‌ছো তো বিজু?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আপনারা যান মাসিমা, আমি পিছনে ট্রামে বা বাসে আস্‌চি।'

ট্রাম বাস ভিন্ন গতি নেই। মিঃ মল্লিকের গাড়ীতে তাঁর সংসারের তিনটি প্রাণী ছাড়াও দিলীপ দত্তের জন্য একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, তা ছাড়া ফুলের তোড়া আর বিশেষ বিশেষ সৌখীন সজ্জাদ্রব্যে ড্রাইভারের পাশের সামান্য ফাঁকা জায়গাটা পর্য্যন্ত ভ'রে উঠেছে। এখানে জোর ক'রে গাড়ীতে গিয়ে চেপে ব'স্‌তে নিজের মনেই কেমন যেন বড় একটা সাড়া পেলোনা বিজন।

গাড়ী ছেড়ে দিল।··· উৎসবকক্ষ ধীরে ধীরে খালি হ'য়ে গেল। ক'ল্‌কাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের বিশেষ একটা ছায়াপাত ঘ'টে গেল চোখের উপর দিয়ে। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষনীয় বিষয়গুলির মতো দু'চোখ মেলে একে একে লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌লো বিজন। এরাই ক'ল্‌কাতা সহর, এদের নিয়েই ক'ল্‌কাতা ঐশ্বর্য্যময়ী হ'য়ে উঠেছে। পারবে না কি এদের মধ্যে একদিন আকর্ষনীয় ব্যক্তি হ'য়ে মাথা উঁচু ক'রে দাড়াতে সে? যে কারণে গ্রামের স্কুলের মাষ্টারীকে সে ঘৃণা ক'রেছিল, যে মন নিয়ে

একদিন ছুটে এসেছিল সে শিক্ষালাভের আশায় এখানে, সে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি মানুষ হ'য়ে মানুষের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানো? সত্যিই একদিন যদি সে দ্বিতীয় মাইকেল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের সার্থক শিল্পীরূপে অর্ঘ্য পাবে না কি একদিন সে দেশের এই মানুষদেরই কাছে? তার সঙ্গীতে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে রেবার কণ্ঠ, এম্‌নি ক'রে উৎসবের নহবৎ বাঁচ্‌বে সেদিন তাদের কেন্দ্র ক'রে।

বল্গাহীন ঘোড়ার মতো মনটা আবার যে কখ্‌ন উধাও হ'য়ে গেল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলো না। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলো—দেখলো, সাম্‌নের পথটা এরই মধ্যে অনেকখানি নির্জ্জন হ'য়ে উঠেছে। নিজের কাছেই কেমন যেন খানিকটা লজ্জাবোধ হ'লো এবারে বিজনের। অনেকখানি সময় পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে। নিমন্ত্রণ রক্ষার ব্যাপারে অন্ততঃ একটা সময় বাধা থাকা বাঞ্ছনীয়। কি ভাবচে এতক্ষণ তাকে নিয়ে সবাই? আর অপেক্ষা না ক'রে সাম্‌নেই একটা বাস পেয়ে উঠে ব'স্‌লো বিজন। ট্রামের চাইতে অন্ততঃ কিছুটাও আগে গিয়ে পৌছানো যাবে।...

রাসবিহারী এভিন্যুর ফুটপাতে এসে পা দিতেই একটা বড় দোকানের ঘড়িতে দেখা গেল—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টা।

মিঃ মল্লিক ইতিমধ্যেই খেয়ে শুয়ে প'ড়েছেন। শীতের রাত্রে এ বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া চুকে যেতে আটটার বেশী দেরী হয় না। দিলীপ দত্তও আজ এখান থেকে খেয়ে বাড়ী ফিরেছে, সেই সাথে ভদ্রতার খাতিরে রেবাকেও খেয়ে নিতে হ'য়েছে। মিসেস্ মল্লিক নিশিকান্তর সঙ্গে ব'সে কি সমস্ত গুছাচ্ছিলেন, বিজন এসে কাছে দাঁড়াতেই ব'ল্‌লেন, 'বেশ ছেলে তুমি যা-হোক্, মন্দির থেকে কি তুমি হেঁটে এলে যে এত দেরী হ'লো! অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তোমার মেসোমশাই খেয়ে শুয়ে প'ড়েছেন। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেছে সব কিছু।'

লজ্জা এড়াতে গিয়ে এবারে কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'লো বিজনকে। ব'ল্‌লো, 'কে জান্‌তো মাসিমা, আস্‌তে গিয়ে এমন এ্যাক্সিডেণ্টে প'ড়তে হবে!'

—'এ্যাক্সিডেণ্ট, বলো কি?' সুর পাল্টে গেল এবারে মিসেস্ মল্লিকের কণ্ঠে।

—'তাই তো বলি মাসিমা।' বিজন ব'ল্‌লো, 'জগুবাবুর বাজারের সাম্‌নে এসে আমাদের বাসের সঙ্গে ডালহৌসির একটা ট্রামের সে কি জোর ধাক্কা! বাসটা সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি দুম্‌ড়ে গেল। পুলিশ এলো, লোক দাঁড়িয়ে গেল রাস্তা জুড়ে। আপনার হাতের সুপাচ্য আজ হয়ত আমার অদৃষ্টেই জুটতো না! শরীরের কাঁপুনি এখনও যায়নি মাসিমা।'

ব্যস্ত হ'য়ে এবারে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস্ মল্লিক, ব'ল্‌লেন, 'বসো, ব'সো, ব'সে একটু শান্ত হ'য়ে নাও দিকি এবারে!'

নিশিকান্ত ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতায় জীবন নিয়ে চলা এক মস্ত বিপদ দাদাবাবু।'

উত্তরে বিজন কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'নে, কথা না ব'লে তুই ততক্ষণে খাবার ব্যবস্থা কর্‌ দিকি নিশি। পাশের ঘরের টেব্‌লে আমাকে আর বিজুকে দিয়ে তুই নিজেও রান্নাঘরে ব'সে পড়্‌ গিয়ে। উপর থেকে তোর দিদিমণিকে ডেকে দিয়ে যা, তা হ'লেই হবে।'

বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, রেবা খাবে না?'

—'তার কি এতক্ষণ বাকী আছে, রেবা তার বাবার সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছে। দিলীপের সঙ্গে ব'সেছিল ওরা।' থেমে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'দিলীপ আর উনি না হ'লে উৎসব এত সুন্দর হ'তো না। কেমন লাগ্‌লো', ব'ল্‌লে না তো বিজু?'

—'আমার কথাটা আপনিই তো ব'লে দিলেন, মাসিমা। তা ছাড়া রেবার গান বিস্মিত ক'রে দিয়েছে শ্রোতাদের।'

এবারে কিছু একটাও আর জবাব দিলেন না মিসেস মল্লিক। নীরবে শুধু একবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন তিনি।

খাবার টেবলে রেবা এসে নিজের হাতে পরিবেশন ক'রলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে তুল্‌লো সে বিজনকে।

বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমার পুতুল বিয়ের নেমন্তন্ন খাইয়ে একদিন জব্দ ক'রেছিলে, মনে আছে রেবা? আজও কি ইচ্ছেটা তেম্‌নি নাকি?'

পাশ থেকে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'আহা, কী বা দিয়েছে, ওটুকু খাও; মাংসের দোপেয়াজী—খেতে খারাপ লাগবে না।'

—'ভালো লাগলেই কি পাকস্থলীটা বেড়ে যাবে মাসিমা?' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় রেবা।'

—'ন্যায় অন্যায় মা বুঝবে, আমি উপরে চ'ল্‌লাম। খেয়ে উঠে একটু বরং বিশ্রাম ক'রেই যেয়ো।' ব'লে সিঁড়ি বেয়ে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ব'স্‌লো রেবা।

খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছিল। আঁচিয়ে উঠে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'এবারে আমি একটু কাৎ না হ'য়ে আর পারছি না বাবা। তুমি উপরে গিয়ে দু'দণ্ড ব'সেই বরং যাও, নইলে অনুযোগ তুলবে রেবা।'

—'না, হ'য়েই যাচ্ছি।' ব'লে সিঁড়ি ভেঙে বিজন উপরে উঠে গেল।

রেবা ব'ললো, 'কিছুই খেলে না বিজুদা, শুধু বাক্য ব্যয় ক'রেই উঠে এলে।'

—'বাক্য ব্যয়টা বেশী খাবারের ব্যাপারেই প্রয়োজন।' বিজন ব'ল্‌লো, 'তা যাক্। জীবনে আজ আমার একটা শুভদিন, যাবার আগে এই কথাটাই আজ জানিয়ে যাই তোমাকে।'

—'মানে?'

—'মানে তোমার গান। জীবনে আজ এই প্রথম শুন্‌বার অবকাশ পেলাম।'

—'কেমন লাগলো বলো?' খানিকটা কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে ধ'রলো রেবা।

বিজন ব'ল্‌লো, 'কল্পনারও অতীত। সঙ্গীত যে কত সুন্দর হ'তে পারে, তার একমাত্র উদাহরণ তুমি।'

চোখমুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে রেবা ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রে বাড়িয়ে বোলো না, গর্ব্ব বেড়ে যাবে।' ব'লে হেসে ফেল্‌লো রেবা।

বেশ লাগ্‌লো হাসিটা। নরম ঠোঁট দু'টির আড়ালে চাঁদের আলোর মতো দু' পংক্তি স্বচ্ছ দাঁতের তন্ময় প্রকাশ। দৃষ্টি ফিরতে চাইল না সেদিক থেকে।

থেমে রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি দেখছো বিজুদা?'

এতটুকুও সঙ্কোচ ক'রলো না বিজন, ব'ল্‌লো—'তোমাকে।'

টোল খাওয়া গাল দু'খানি ঈষৎ যেন লজ্জারক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো এবারে রেবার।

বিজন ব'ল্‌লো, 'আবার কবে তোমার গান শুন্‌বার অবকাশ পাবো, তাই ভাব্‌ছি রেবা।'

—'আস্ত পাগল তুমি বিজুদা, ছোটবেলা থেকে একটুও তুমি বদ্‌লাও নি, যাই বলো।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'ভারি তো গান শিখেছি, তাই শুন্‌তেই তুমি অবকাশের কথা তুল্‌ছো।'

—'অবকাশের প্রয়োজন আছে বৈ কি, এতদিনে আজ যেমন অবকাশ পেলাম, এম্‌নি আর কোনোদিন!'

উত্তর ক'রলো না রেবা।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ছোটবেলার কথা ব'ল্‌লে না, তোমাদের কাছে এসে ব'স্‌লে সত্যিই আবার সেই ছোটবেলাকে ফিরে পাই। ইচ্ছে হয়, আবার তেম্‌নি খেলার সাথী হ'য়ে থাকি। কিন্তু মহাকাল কোথাও অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে না। আচ্ছা রেবা?'

—'কি বলো?'

—'পারি নাকি আবার আমরা তেম্‌নি ক'রে ফুটে উঠতে?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'অতীতকে মন দিয়ে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু বয়স দিয়েও কি তেম্‌ন!'

—'বয়সের উপযোগি ক'রেও তো পেতে পারি! ভাববিহ্বল কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'পারি নাকি তুমি আমি এক হ'য়ে নতুন ক'রে জীবনের একতারা বাজাতে? তোমার গান আর আমার কাব্যে সুরলক্ষ্মী অচঞ্চলা হ'য়ে বাধা প'ড়বে আমাদের জীবনে।'

লজ্জারক্ত গাল দু'খানি এবারে আবিররাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো রেবার। উত্তর দেবার ভাষা পেলো না।

শুধু একবার বিজনের মুখের উপর দিয়ে নরম দৃষ্টি বুলিয়ে এনে মাথা নীচু ক'রে নিল সে।

মনের রুদ্ধ বাসনাকে আজ আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না বিজন। জীবনে এমন সুযোগ আর হয়ত দ্বিতীয় দিন পাবে না সে। ব'ল্‌লো, 'বলো, এ কি অসম্ভব আমাদের জীবনে! একদিন যেমন ক'রে খেলা-ঘরে পুতুল সাজিয়েছিলে, তেম্‌নি ক'রে নতুন খেলাঘর কি রচনা করা যায় না, যায় না কি সুন্দর একখানি নীড় রচনা করা—যেখানে তুমি আমি ভিন্ন আর কিছু নেই!' হাত বাড়িয়ে নিজের অলক্ষ্যেই রেবার একখানি হাত স্পর্শ ক'রতে গেল বিজন, কিন্তু পারলো না।

নীরবে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে ব'স্‌লো রেবা। সমস্ত দেহখানি তার কী আবেশে যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কৈশোর আর বাল্যের দিনগুলিকে কেন্দ্র ক'রে একদিন ভালো লেগেছিল বিজুদাকে, হয়ত অলক্ষ্যে কখনো মনে মনে ভালো-বেসেওছিল একদিন, কিন্তু তাকে চিরকালের ক'রে ধ'রে রাখতে পারে নি সে। মাগুরার নিভৃত পল্লীময় জীবনে যা একদিন স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'য়েছিল, ক'লকাতার ঐতিহ্যময় আলোকজ্জ্বল পরিবেশে সে স্বাভাবিকতাকে অনেকখানি অবাস্তব আর অলীক ব'লেই মনে হ'য়েছে। এখানে এসে যে স্বাভাবিকতাকে সে খুঁজে পেলো, তা একেবারেই স্বতন্ত্র পরিবেশ। সেই পরিবেশে দিলীপ দত্তকে ভিন্ন যেন আর কাউকেই ভাবা যায় না। জীবনের অবাধ গতির পথ খুঁজে পেয়েছে তার সাথে রেবা। কিন্তু তাই ব'লে অতীতকেই কি একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারছে সে মন থেকে? স্নেহশীল বিজুদা, প্রিয় বিজুদা, বন্ধু বিজুদা—তাকে কি জোর ক'রে অস্বীকার করা চলে?

চিন্তাসূত্রে কেমন যেন বিপ্লবের গ্রন্থী পাকিয়ে গেল রেবার। আর একবার নরম দৃষ্টিতে মুখখানিকে তুলে ধ'রলো সে বিজনের মুখের দিকে; ব'ল্‌লো. 'বাবা অনেকখানি প্রগতিশীল হ'য়েও যে কতখানি সংস্কারবাদী, সে তো তুমি জানো বিজুদা। নিজেদের সমাজের বাইরে তিনি আর কিছুই বুঝতে চান না। তোমরা ব্রাহ্মণ, আমরা ব্রাহ্ম। বাবা কিম্বা মাসিমাই কি রাজি হবেন?'

—'তাঁদেরই শুধু রাজি অরাজির প্রশ্ন, আমরা কিছু নই?'

—'কিছু নই কেন, তবু—'

—'কি তবু?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'বাবা তাঁর নিজের সমাজের বাইরে কাজ ক'রতে রাজি হবেন না।'

কথা কাটলো বিজন, 'সমাজ যে মানুষের হাতে গড়া একটা ঠুনকো জিনিষ, একথাও কি তিনি জানেন না? সমাজের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সমাজ; মানুষ তার প্রয়োজনে তাকে গ'ড়েছে, আবার প্রয়োজনেই ভাঙচে। প্রতিটি স্বাধীন দেশের দিকে তাকালে আমরা তাই দেখতে পাই। সমাজের সঙ্গে মানবিক ধর্ম্মকে জড়িয়ে নানা ফাঁদের সৃষ্টি ক'রে মরছে শুধু আমাদের দেশের মানুষগুলো। এ সমাজের কথা তুমি ভুলে যাও রেবা।'

—'এ দেশের মানুষ হ'য়ে যখন এদেশেই বাঁচতে হবে, তখন এ সমাজকে অস্বীকার ক'রেই বা চ'লবো কেমন ক'রে বিজুদা?' থেমে রেবা ব'ললো, 'বাবা সহজ সরল মানুষ, কিন্তু এক যায়গায় তিনি কঠিন। সেই কাঠিন্যের ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত যুক্তিই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমাকে ভালোবাসাও কি তবে আমার ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, ব'ল্‌তে চাও?'

এবারে উত্তর করা কঠিন হ'লো রেবার পক্ষে।

পুনরায় বিজন ব'ল্‌লো, 'বলো, এই ব্যর্থতা নিয়েই তবে আমাকে ফিরতে হবে?'

কিছুক্ষণ কেটে গেলে রেবা ব'ল্‌লো, 'তোমাকে যদি ধর্ম্মত্যাগ ক'রতে হয়, পারবে?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'ধর্ম্ম কোথাও ত্যাজ্য হয় না, জীবনের চলার পথে মানুষের সর্ব্ব অবস্থাতেই তার ধর্ম্ম বেঁচে থাকে। ধর্ম্মত্যাগ ব'লে যে কথাটা—সেটা মানুষের ভুল বিশ্বাসের উপরেই টিকে আছে। তবু তোমার কথা পেলে আমি তাও ক'রতে রাজি আছি রেবা। বলো, কথা দাও!'

ব'লে আর একবার হাতখানিকে প্রসারিত ক'রে দিল সে রেবার দিকে। এবারও ব্যর্থভাবেই সেই হাতখানি ফিরে এলো।

এত বড় একটা সত্যাশ্রুতির মধ্যেও নিজেকে ধরা দিতে মনের দিক থেকে কেমন যেন সাড়া পেলো না রেবা। ব'ল্‌লো, 'ব্রাহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মবাদী বাবা মত দিতে রাজি হবেন না। এর বাইরে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না বিজুদা, আমি ব'লতে পারবো না।' কথা শেষ ক'রতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেমন যেন একবার কেঁপে উঠলো রেবার।

স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ল্‌লো, 'আমার কথা পেয়েছি, আর কিছু ব'ল্‌বার নেই আমার। আমি যাচ্ছি। শুধু ছোট্ট ক'রে আর একটা কথা ব'লে যাই; জীবনে বড় হবো, উচ্চ শিক্ষার পথে মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবো, এই আদর্শ নিয়েই ক'ল্‌কাতায় এসেছিলাম। কিন্তু তার পিছনে আরও একটা সত্য ছিল, সে তুমি, ক'ল্‌কাতায় এলে আবার তোমাকে তেম্‌নি ছোটবেলার মতো ফিরে পাবো—এ সত্যও সেই আদর্শের সঙ্গে মিশে ছিল। আজ তুমি আমার জীবনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই আদর্শকে লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ ক'রে তোলো রেবা।'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে যেন কথা হারিয়ে ফেল্‌লো রেবা। অধীর আবেগে নরম ঠোঁট দু'টি শুধু বার কয়েক কেঁপে গেল মাত্র।

ইতিমধ্যে নিচে থেকে নিশিকান্তের গলার শব্দ শোনা গেল। মিসেস্ মল্লিক শোবার পরে-পরেই তখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন। গেটের দরজা বন্ধ ক'রবার অপেক্ষায় এতক্ষণ নীরবে ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকৃচে নিশিকান্ত। শীতের রাত। শয্যার আকর্ষণটা তার পক্ষেও কম কি।

বিজন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী ক'রলো না। যান-বাহনের শেষ গাড়ীর সময়ও সম্ভবতঃ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। রাসবিহারী এভিন্যু টু ওয়েলিংটন—দীর্ঘতর পথের দূরত্ব। শেষ পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটেই হয়ত এই কন্‌কনে হিমেল রাত্রে সেই দুরন্ত জয়ের কৃচ্ছ্রসাধনে পথের নির্জ্জনতায় গা ভাসিয়ে দিতে হবে!—সিঁড়ি গলিয়ে দ্রুত নেমে এসে নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে পথে নেমে প'ড়লো বিজন।

মনের মধ্যে অকস্মাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা দ্রুত ঘুরে গেল রেবার। নিজের মধ্যে কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে। কোনো একটা চিন্তার মধ্যেও মন বেশীক্ষণ স্থির থাকৃচে না। একবার চেষ্টা ক'রলো গীত-বিতানের পৃষ্ঠা খুলে ব'সতে, কিন্তু ভালো লাগলো না; একবার চোখ দু'টোকে দৃঢ়বদ্ধ ক'রলো দেয়ালের দিকে: 'পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন, হও প্রেমময়ী।...' এক একটা অক্ষর যেন এসে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে প'ড়ছে চোখের মণি দু'টোর মধ্যে:

'তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি ঢেলে দিক সর্ব্বলোকে
পারিজাত সুধা,
শুভক্ষণে আমি আজ সাজালাম পুষ্পরাগে
তোমার বসুধা।'

সমস্ত বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো রেবার। একেবারে নতুন অনুভূতি, নতুন ক'রে কোনো কিছুতে অবলুপ্তি। কতক্ষণ যে এম্‌নি ক'রে কাট্‌লো, ব'ল্‌তে পারি না। তারপর একসময় সুইসটাকে অফ্ ক'রে দিয়ে খোলা জানালার পাশে এসে ব'সলো সে। অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি স্নান ক'রে উঠেছে। তার মধ্য থেকে দু' চোখে স্পষ্ট ভেসে উঠচে একটা ত্রিতল বাড়ীর কার্ণিস। দিলীপ দত্তদের বাড়ী ওটা। সেও কি জেগে আছে এতক্ষণ? [ক্রমশঃ

নজরুল কাব্য-প্রসঙ্গ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের আবেগ—বোধ হয় এ দু'টো বস্তুই যে-কোন শক্তিমান কবির অনুপ্রেরণার আনুসঙ্গিক বিষয়, এবং কবির আত্মোপলব্ধিই আবেগ-সঞ্জাত হ'য়ে ছন্দসুষমা ও ধ্বনিবৈচিত্র্যের মারফৎ কবিতায় রূপান্তরিত হয়, এ উক্তি বাহুল্য। কবিদের মধ্যে অনেকেই সাধারণতঃ দু'টো শ্রেণীর সন্ধান করেন, একদল যাঁরা মনের আবেগে কবিতা লেখেন, লেখার একটা দুর্ব্বার ঝোঁকই তাঁদের মনকে ঠেলে নিয়ে যায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, প্রকাশভঙ্গী কি রকম হ'লো সেটা ভেবে দেখবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু আরো একদল কবি আছেন যাঁরা কাব্যের মূল অবলম্বন যে আবেগ এ-সত্য স্বীকার করলেও নিছক আবেগের দ্বারা পরিচালিত হ'তে রাজী হন না। বক্তব্য প্রকাশের জন্য এঁরা সন্ধান করেন যথাযথ কলাকৌশলের, খুব ভেবে-চিন্তে এঁরা তাই কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব গঠন করেন, এঁদের কবিতায় অনুপ্রেরণা যতোটা থাকা আবশ্যক, উদ্যোগ ও পরিশ্রম বোধ হয় তার চাইতে কম থাকে না। অবশ্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই যে এই দুই শ্রেণীর কবিকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে ভাগ করা যায় তা' নয়, কোনো কোনো কবিতায় লক্ষণগুলো খুব মিলেমিশে থাকে; কিন্তু কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই দু'টি ভাগ বোধহয় একরকম অপরিহার্য্য। এ ছাড়া, কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। কাব্য উপভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সেতুবন্ধন হ'চ্ছে কাব্যপাঠকের সংস্কার। বিভিন্ন কালের কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক-মনে ভালো কবিতা ও মন্দ কবিতা সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা গড়ে ওঠে এবং এই ধারণাগুলোই প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠকের সংস্কার। কিন্তু শক্তিমান কবি যিনি, তিনি পাঠকের সংস্কারের গণ্ডীতে নিজের মনকে সীমাবদ্ধ রেখে কবিতা লিখবেন, এরূপ প্রত্যাশা অবশ্যই বুদ্ধিহীনতার নামান্তর। বরং কবি পাঠককে সাহায্য করেন তার সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসবার জন্যে; এবং কবি যদি প্রকৃতই শক্তিমান হন; তা হ'লে তাঁর নতুনতর কাব্যাদর্শকে সচেতন কলা-রসিক শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার ক'রে নেবেন এই-ই হলো সঙ্গত সিদ্ধান্ত। সেই জন্যেই নানা যুগের ও নানা দেশের কাব্যসাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে নতুন উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার সন্ধানে শক্তিমান কবি কাব্য-লোকের দুর্গম ও অনিশ্চিত পথে জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়েছেন; কাব্যজগতের নব-নব দ্বার উন্মুক্ত করেছেন, আর মুগ্ধ পাঠক তার দীর্ঘকালের সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে দিক্‌বিজয়ী কবির অনুগমন ক'রেছে।

কবি নজরুল ইসলাম এই রকমই একজন দিগ্বিজয়ী কবি যিনি সাধারণ বাঙালী পাঠকের সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে ভেঙে কাব্যের নতুন প্রান্তরে নীল উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। যে-কালে নজরুলের আবির্ভাব সেকালে নানা সমস্যা অপেক্ষাকৃত নবীন কবিদের সামনে উপস্থিত ছিল। সকলেই ভাবছিলেন আধুনিক কবিতাকে কী ক'রে নতুন পথে এগিয়ে নেয়া যায়। প্রাক্-রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শ ও কাব্য-রীতিকে পুরণো ও সেকেলে ব'লে মনে হ'য়েছিল তাঁদের কাছে; সুতরাং সে-কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যেই অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর বাঙলা কাব্যের উর্ব্বর ভূমিতে প্রভূত জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব এরূপ সর্ব্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে যে আধুনিক কবি-সমাজ প্রমাদ গণতে থাকেন, কয়েকজন খ্যাতনামা প্রবীন কবি হুবহু রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতির অনুকরণে কাব্যসাধনায় ব্রতী হ'লেন। ফলে, কী ক'রে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব এড়িয়ে নতুন ধরণের কবিতা লেখা যায়, আধুনিক নবীন

উদ্যোগীদের সেইটেই হ'লো ভাবনার বিষয়। এই সময় যাঁর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুচ্ছ থেকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময় সত্যেন দত্তের সহজ আবেগপ্রসূত বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ নানা কবিতা সাধারণ সাহিত্যপাঠককে এরূপ ভাবে আকর্ষণ করেছিল যে মনে হ'তো যেন সত্যেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যাবে। অন্ততঃ তখন এরূপ কাব্যপাঠকের অভাব ছিল না, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সত্যেন দত্তকেই বড়ো কবি বলে' মনে ক'রতেন। কিন্তু নানা কারণেই সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হ'তে পারে নি, আধুনিক নবীন কবি-সম্প্রদায় যে গভীরতার সন্ধান ক'রছিলেন, বিষয়ের দিক থেকে যে নতুন কাব্যাদর্শকে জানতে চেয়েছিলেন, সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতায় তা' খুঁজে পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবস্থাটা যখন এই রকম চলছিল, তখনই এলেন নজরুল। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি দমকা হাওয়ার মতো; বাঙালী প্রাণের অনেক কালের সঞ্চিত জড়তা ও গ্লানি সেই হাওয়ায় উড়ে গেলো। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব যাঁরা এড়াতে চাইছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতিকে যাঁরা পর্য্যাপ্ত ব'লে মেনে নিতে পারছিলেন না, নজরুলের কবিতা যেন তাঁদের চোখের সামনে নবদিগন্তের অরুণা-লোক জেলে দিলো। নজরুল নিজে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব নজরুলকাব্যে তেমন নেই; কিন্তু সত্যেন্দ্র-নাথের দৃষ্টিভঙ্গী, কাব্যের শব্দঝঙ্কার ও পদ-লালিত্যকে নজরুল একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। বরঞ্চ এদিক থেকে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই বোধ হয় ঋণী। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের পার্থক্যটা এইখান-টায় যে, প্রথম কবির কাব্যে শব্দ ঝঙ্কার ও পদ-লালিত্যের আতিশয্য কাব্য-রসিককে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা সেই তুলনায় বড়ো সামান্য ব'লে মনে হয়। পক্ষান্তরে নজরুল শব্দঝঙ্কার ও পদ লালিত্যকে আয়ত্ত ক'রেছেন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যেতেও শাণিত কৃপাণের ধার এনেছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে নজরুল অভিহিত ক'রেছেন 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল' বলে। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। তা ছাড়া, সত্যেন দত্তের মৃত্যু সম্পর্কিত কবিতায় নজরুল লিখছেন: 'চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার, শেষ গান গাওয়া হ'ল নাকো আর…' এবং এই শেষ গান সুস্পষ্ট বক্তব্যের দ্যোতনামূলক ভাষণ ছাড়া যে অন্য কিছু নয়, এটা বোধ হয় অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। নজরুল স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিছক শব্দঝঙ্কার ও পদ-লালিত্য ভাবাবেগপ্রধান বাঙালীমনকে শুধু ঘুম পাড়িয়েই রাখতে পারে; কিন্তু সে মনকে সজাগ ক'রে রাখতে হ'লে আরোও চড়া সুরে কঠিনভাবে নাড়া দেয়া দরকার। তা ছাড়া, তখন সময়টাই এমন প'ড়েছিল যে, সাধারণ কাব্য-পাঠক চড়া গলার বক্তব্য শোনবার জন্যে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েক বছর যেতে না যেতেই এ দেশের রাজনীতির আকাশে ঝড়ের মেঘ ক্রমশই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছিলো এবং নজরুল যখন বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লেন, তখন বাঙলা দেশের যুব-শক্তি আত্মচেতনার ও জাতীয়- জাগরণের অমোঘবাণীর সন্ধান ক'রছিল। রাজনীতির আকাশে এবং মনের আকাশে সর্ব্বত্রই একটা থমথমে ভাব; এই থমথমে আবহাওয়াকে বিদীর্ণ করে উজ্জ্বল প্রাণের অফুরন্ত ভাবাবেগের নববন্যার অপেক্ষায় ছিলেন অনেকেই। এই জন্যেই প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল-কাব্যে বাঙালী পাঠক তার মনের মতোকে খুঁজে পেয়েছিল এবং তরুণ কবিকে জানিয়েছিল স্বাগত আহ্বান।

সাধারণ পাঠকমহলে, নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' বলে' আখ্যাত হ'য়ে থাকেন। বোধ হয় কবির 'বিদ্রোহী' নামের কবিতাটিই ঐরূপ মনোভাব গড়তে সাহায্য ক'রেছে। মনের জগতে কবি ছিলেন অবশ্যই বিদ্রোহী, মনের নানা অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে শাণিত কৃপাণের মতোই এক-এক সময় উদ্যত হ'য়ে উঠেছে তাঁর কবিতা, কিন্তু সমাজ-জীবনেও নজরুল যে কোনো বিদ্রোহাত্মক কর্ম্মপন্থা অনুসরণের জন্যে ব্যস্ত ছিলেন, তা' মনে হয় না। সেই জন্যেই দেখা যাবে—নজরুলের কবিতায় একদিকে যেমন নানা বিদ্রোহাত্মক বাণীর ছড়াছড়ি, অন্যদিকে

তেমনি প্রেম ও বিরহ বিষয়ক কবিতারও অসামান্য প্রাধান্য। সেইজন্যেই এ কথাই হয়তো শেষ পর্যন্ত মনে হবে যে, নজরুল-কাব্য বাঙালীর স্তিমিত প্রাণে কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সাড়া আনলেও বাঙালীজাতির মজ্জাগত রোমান্টিসিজমের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে—নজরুলের আত্মপন্থী ও বিষয়ীপ্রধান কবিতাগুচ্ছ ভালো ক'রে পড়লে এটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যে, বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালের প্রামাণ্য গীতিকাব্যের নির্ঝরধারায় নজরুলের কবিতা নতুন আবেগ সঞ্চারে সহায়তা ক'রেছে। নজরুল-কাব্যের পাশাপাশি এই যে দুটো ধারা—এই উভয় ধারার বিচার না হ'লে নজরুল কাব্য-বিচার সম্পূর্ণ হ'লো বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবে এটা ঠিক যে, আত্মপক্ষী কবিতা উপভোগের জন্যে কাব্য-রসিক বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরের উত্তর-সাধকদের কবিতাবলী পাঠেরজন্যেই উন্মুখ, সেখানেই গীতি কাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা হৃদয় মনকে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত করে, এবং খুব সম্ভব সে-কারণেই নজরুল-কাব্যের রোমান্টিক ভাবালুতার রসাস্বাদে আর আগ্রহ থাকে না। অন্যদিকে নজরুলের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গপ্রধান কবিতা-গুলোই কলারসিককে ভাবায়, নিঃসন্দেহে অভিভূত করে। পাঠক বুঝতে পারেন এইখানেই নতুন কিছু পাওয়া সম্ভব হ'লো। সব দিক থেকে বিচার ক'রে তাই বলা যায় যে নজরুল ভাবের জগতে বিপ্লব এনেছিলেন বলেই তাঁর কবিতা আড়ষ্ট বাঙালী-প্রাণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হ'য়েছে। ভাবের জগতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই ইতিপূর্ব্বে বিপ্লব এনেছিলেন। তাঁর 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' কিংবা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই উক্তিগুলো আমাদের অনেক কালের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও জীর্ণ সংস্কারের উপর একসময় প্রবল আঘাত হেনেছিল। পরলোকে অখণ্ড স্বর্গবাসের প্রার্থনা কিংবা সন্ন্যাসীবেশে সর্ব্বসাধনার সিদ্ধি—এই ধরণের মনোভাব ভারতীয় তথা বাঙালীর মনের প্রাচীন ও জীর্ণ সংস্কারের সঙ্গে জড়িত; তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রচলিত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাবকে কবিতায় রূপমণ্ডিত করলেন, তখন বাঙালী পাঠকের কাছে মর্ত্তালোকের জীবনচেতনা সম্পর্কে নতুন এক উপলব্ধির জগতের দ্বার উন্মুক্ত হ'লো। জীর্ণ সংস্কার ও অন্ধ মনোভাবের বিরুদ্ধে এই যে অভিযান—নজরুল ইসলাম এই অভিযানের পথেই তীব্র আবেগ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, অসত্য ও অন্যায়কে লক্ষ্য ক'রে তিনি অবিরাম হেনেছিলেন তীব্র আবেগময় ছন্দোবদ্ধ বাক্যের তীব্র কষাঘাত; রবীন্দ্র-কাব্যে তীব্রত্য ছিল, নজরুল-কাব্যে প্রকাশ পেলো জ্বালা ও ক্ষোভ। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় মাধুর্য্য এতো বেশী যে, ভর্ৎসনার বাণীতেও যেন আশানুরূপ তীব্রতা খুঁজে পাওয়া যায় না। নজরুল কিন্তু এইদিক থেকে অধিকতর উগ্র হবার চেষ্টায় ছিলেন। ফলে, কবিতার পদ-লালিত্য বিপন্ন হবার উপক্রমও যে মাঝে মাঝে না হ'য়েছিল এমন নয়, কিন্তু নজরুল বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার প্রচেষ্টাকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এইজন্যে দেখা যায়, একদিকে নজরুল কাব্যে সময়োচিত প্রসঙ্গের অবতারণা অন্যদিকে সহজ ভাষায় ও সাবলীল ভঙ্গীতে সে-প্রসঙ্গের প্রকাশ। ভাষার সূক্ষ্ম কারিগরি এবং গুরুগম্ভীর জীবন-দর্শনের অবতারণা—এর কোনোটাতেই তিনি তাঁর হৃদয়কে বাঁধা রাখতে রাজী ছিলেন না বলেই ভাব-প্রচারের খুব জোরালো ও প্রত্যক্ষ ভঙ্গীটাকেই তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন। এর ফলে, নজরুলের কবিতা খুব সাধারণ পাঠককেও খুব প্রবলভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হ'য়েছিল। কবিতা সম্পর্কে মিলটন একদা বলেছিলেন যে, ভালো কবিতাকে সরল, আন্তরিক ও আবেগ সঞ্জাত হ'তে হবে। এইদিক থেকে বিবেচনা ক'রলে নজরুল-কাব্যের উদ্যোগ-আয়োজনকে বোধহয় যথার্থ বলে' অঙ্গীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়। কাব্যপাঠক অভিভূত হন।

অনেকেই নজরুলের প্রেম ও বিরহ সম্পর্কিত কবিতাগুলো সম্পর্কে কিছু বলতে উৎসাহ বোধ করেন না। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অভাব নেই এবং অন্যান্য প্রেমের কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে তুলনা ক'রলে নজরুলের প্রেম ও বিরহ বিষয়ক কবিতাগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য বলে'

মনে না হ'তেও পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নজরুলের এই কবিতাগুলোর আলোচনা না ক'রলে তাঁর কাব্যপ্রতিভার সার্ব্বিক মূল্য-বিচার সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ। কবিতা হিসাবেও এগুলো যে উপভোগ্য নয় একথা বলা যায় না। 'দোলন-চাঁপা', 'সিন্ধু হিন্দোল' 'ছায়ানট' ও 'চক্রবাক'—এই কাব্যছন্দগুলোতে এমন সব কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলো প্রকাশভঙ্গী ও আবেগ-প্রবণতার দিক থেকে সার্থক প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা চটুল নয়; অনুভূতির গভীরতা তাঁর এই কবিতাগুলোতে গাম্ভীর্য্য এনেছে, এনেছে গভীর বিষণ্ণতা। প্রেম ও বিরহের কবিতায় কবি আত্মীয়তা স্থাপন ক'রেছেন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে; বিরহের বিষণ্ণতা তাঁর কবিহৃদয়কে সঙ্কুচিত করেনি কোথাও বরং ছড়িয়ে দিয়েছে বাইরের পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রকাশের মধ্যে।

> কেঁদে ওঠে লতা-পাতা,
> ফুল পাখী নদী জল
> মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
> কাঁদে বুকে উগ্র সুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।

এবং একদিকে প্রেম যেমন কবি-হৃদয়কে ব্যক্তিগত সম্ভোগের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ ক'রেছে, অন্যদিকে বিরহের নির্ম্মমতা কবিকে ঠেলে দিয়েছে সামনের দিকে নবতম দুর্গমযাত্রার প্রান্তরে। খুব সতর্কভাবে বিচার ক'রলে দেখা যাবে—নজরুলের প্রেমের উপলক্ষ্যই হচ্ছে সন্ধান এবং বিরহের পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। কবি যখনই প্রেমের অস্থিরতা অনুভব ক'রেছেন, তখনই সন্ধান ক'রেছেন সেই দয়িতার যার কাছে গেলে তাঁর তৃষিত প্রাণ শান্ত হ'তে পারে। প্রণয়ের ফল্গুস্বপ্ন যখনই ভেঙেছে তখনই কবিহৃদয়ে এসেছে বিরহের সচেতনতা; আর, কবি-মন সঞ্চরণ শুরু ক'রেছে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতিলীলার গভীরতায়। নজরুলের প্রেমের কবিতায় তৃপ্তির অভাব রয়েছে, স্পর্শ-কাতরতাও রয়েছে, কিন্তু কোথাও দুর্ব্বল কামনার উগ্র প্রকাশ কবিতার মাধুর্য্যকে পীড়িত করেনি। কবি দয়িতাকে খুঁজে পাননি; দয়িতার স্মৃতিই তাঁর সম্বল; আর এই স্মৃতিকে সম্বল ক'রেই কবি বেরিয়ে পড়েছেন দুর্গম অনিশ্চিত যাত্রায়, কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন পথ থেকে অন্য পথে, দূর থেকে দূরান্তরে সুদূরের যাত্রায়। দয়িতার কাছ থেকে কবি কিছুই প্রত্যাশা করেন নি অনেক সময়, শুধু নিজে দিয়েই যাবেন এই-ই হ'লো কবির সিদ্ধান্ত। দয়িতার কোনো স্বতন্ত্র শরীরী অস্তিত্ব নেই; কবির গানে, কবির প্রণয়ভাষণেই তার উপস্থিতির আভাষ; কবির একাকীত্বের অন্ধকারে কবিকল্পলোকেই দয়িতার প্রতিভাস। সুতরাং এক-এক সময় এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত যে কবি আসলে প্রিয়াকে চান না; চাননা তার শরীরী উপস্থিতিকে। প্রেয়সীর স্মৃতিই তাঁর সম্বল এবং এই স্মৃতিকে নির্ভর ক'রেই কবি-মন দূরের যাত্রায় মেতে উঠেছে।

> হয়ত তোমার পাবো দেখা,
> যেখানে ঐ নত আকাশ চম্‌ছে বনের সবুজ রেখা।

এই-ই হ'লো কবির মূল বক্তব্য। ফলে, এটা বোধ হয় স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয় যে, 'বিদ্রোহী' ও ঐ জাতীয় কবিতায় যে গতিবেগ উপস্থিত, নজরুলের প্রেমের কবিতায়ও তার আভাষ সুস্পষ্ট। প্রেমের কবিতায় নানা ভঙ্গী, নানা ছন্দ রয়েছে; কোথাও হৃদয়া-বেগ স্মৃতির ভাবে বিষণ্ণ, কোথাও আবেগের প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল। মাঝে-মাঝে এমন সব স্তবক কি পংক্তিও চোখে পড়া সম্ভব—নজরুল-কাব্যের বৈচিত্র্যকে যা' সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়:

> আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় পথে যেতে যেতে।
> ঐ ঘাসের মটর শুঁটীর ক্ষেতে
> আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে॥

এবং এক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে কবি-মনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্কটাই কাব্যরসিকের নজরে পড়বে। নজরে পড়বে যে নজরুল একদিক থেকে প্রকৃতির কবিও। প্রেমাস্পদার অস্তিত্বকে কবি অনুভব ক'রেছেন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, প্রকৃতির নব-নব বৈচিত্র্য ও বিকাশের মাঝে। দয়িতাকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির আকাশ, বাতাস, ফুল, পাখী, চাঁদ, লতার মাঝখানে। তাই শেষ পর্য্যন্ত দয়িতাকে ভালোবাসতে গিয়ে কবি ভালো বেসেছেন প্রকৃতিকে;

প্রকৃতির সঙ্গে অনুভব ক'রেছেন যুগ-যুগান্তের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, অনেক শতাব্দীর নিবিড় আত্মীয়তা। "তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে!" এই-ই হ'চ্ছে কবির প্রণয়াচ্ছন্ন হৃদয়ের কথা। এই উপলব্ধিই কবি-হৃদয়ে এনেছে আবেগ, এনেছে বিহ্বলতা।

মাটীর প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটীর কুটীরে,
খুশীর রঙে ক'রবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

এবং এই ধরণের স্মরণীয় স্তবক নজরুলের প্রেমের কবিতায় প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। কবি-মনের যে একটা অতৃপ্তির সুর, বিষাদের সুর, অনেকে হয়তো তার মূল অনুসন্ধান ক'র্তে চাইবেন সমসাময়িক পারিপার্শ্বিকতায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলের প্রেমের কবিতার এই যে বিষন্নতা এটা রোমান্টিসিজম্-এর অঙ্গীভূত। ইংরেজি রোমান্টিক কবিতায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্টই নজরে পড়বে। বায়রণের অন্তর্দাহ, কীটস্-এর স্পর্শকাতরতা এবং শেলীর আদর্শবাদ—এই সবই নজরুলের প্রেমের কবিতায় কম-বেশী মিলে-মিশে রয়েছে বলতে পারা যায়। আর হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় যে, নজরুল ইসলাম বিষাণ হাতে বাঙলার কাব্যকুঞ্জে হানা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীর মনের পুলকিত নীপবনের যে চিরন্তন বাঁশরীর সুর, তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি।

চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ল'য়ে যায় মোরে!
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে!

বোধহয় এই উদ্ধৃতি থেকেই নজরুলের প্রেম ও বিরহের কবিতার মূল মেজাজটা অনুভব ক'রতে পারা যায়। এই ধরণের কবিতায় নজরুল কখনো হেঁয়ালীর আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তাঁর আবেগময় প্রাঞ্জল বক্তব্য সর্ব্বদাই আন্তরিকতার পথ ধ'রে চলেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা বাঙলা কবিতার প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুগামী বলেই বোধহয় কাব্যপাঠক তাতে অনন্যতার আস্বাদন লাভ করেন না। অথচ নজরুলের এইসব কবিতাকে অস্বীকার করার অসুবিধা অনেক, নজরুল-কাব্যের সমগ্রতার বিচার এইসব কবিতাকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর নয়।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলী অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালী পাঠক যেদিন প্রথম 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়েছিলেন, সেদিনকার অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা বর্ণনা করা অসম্ভব। 'বল বীর—চির উন্নত মম শির' এই বাণী নবজীবনের আহ্বানে সঞ্জীবিত ছিল বলেই পাঠকসমাজকে এতোটা অভিভূত করেছিল। বাঙলা গীতিকবিতার মৃদু গুঞ্জনধ্বনিকে দলন ক'রে যেন আহ্বান এলো অনমনীয় পৌরুষের। বাঙ্গালা পাঠক বুঝতে পারলেন যে, বাঙ্গলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' অথবা 'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন'—এই ধরণের মারাত্মক কথা ইতিপূর্ব্বে আর কোনো বাঙ্গালী কবি বলতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। মোটের উপর, 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বিতরণ ক'রলেন নতুন যুগের এমন বাণী যাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে ছিল অনেক কালের জীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙার সঙ্কল্প। 'বিদ্রোহী' কবিতা যে এতো ভালো লেগেছিল, তার কারণ বক্তব্যের অভিনবত্ব এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য দুই-ই। এই কবিতাই প্রমাণ করলো যে নজরুল নতুন যুগের জনতার কবি, জনজাগরণের কবি। এই কবিতাটির শব্দৌচিত্য, উপমা ও রূপকল্প—এই সবই যথার্থ হওয়ার ফলেই বক্তব্যটা কেবলই হৃদয় মনে হানা দিতে থাকে। দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি স্তবকের পর স্তবক এবং ছবির পর ছবি সাজিয়েছেন; বিদেশী উপকথা থেকে এবং এ দেশের বেদ-পুরাণের কাহিনী থেকে কবিতার নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন তিনি, সবার ওপর, ছন্দের পৌরুষ ও পদলালিত্য। ফল এই হয়েছে যে কবিতাটির সর্ব্বত্রই একটানা দুর্ব্বার গতি অব্যাহত

রয়েছে। আধুনিককালে যাঁরা সমাজসচেতন মন নিয়ে কবিতা লেখায় উদ্যোগী, নজরুলের এই কবিতাটি থেকে তাঁরা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবেন। অন্যত্র নজরুল লিখেছেন :

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে ঐ জাগলো জোয়ার
দুয়ার ভাঙা কল্লোলে!

এবং এখানেও মুক্ত প্রাণের অবাধ সঞ্চরণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। নিজের সাহিত্যিক নীতি সম্পর্কে একবার রমাঁ রলাঁ লিখেছিলেন : "My activities have always and in every case been dynamic. I have always written for those who are on the move." বোধহয় কবি নজরুলের বক্তব্যও ছিল কতকটা এই রকমেরই। জীবনকে নজরুল কখনোই স্থিতিশীল বলে ভাবতে পারেননি; জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা ঘটনা তাঁকে আকর্ষণ ক'রেছে এবং সমাজ-জীবনের অনেক ঘটনাই শ্রীমণ্ডিত হ'য়েছে তাঁর কবিতায়। রলাঁর মতো নজরুলও হয়তো বলতে চেয়েছিলেন : "Life will be nothing to me if it is not movement—straight ahead, of course!" এবং নজরুলের সমাজসচেতন কবিতাগুচ্ছে দুর্বার গতিযুক্ত একটানা প্রগতি যে অব্যাহত ছিল একথা বোধহয় স্বীকার না ক'রে উপায় থাকে না।

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুসিয়ার!

এই ধরণের পংক্তিবিন্যাস নানা দিক থেকেই বাঙালী প্রাণকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হ'য়েছিল। এ দেশের নবজাগ্রত যুবশক্তি যখন পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির পথের সন্ধানে ছিল, সেই সময় নজরুল নামলেন চারণকবির ভূমিকায়। এমন কি অনেক সময় তাঁর কবিতাকে মনে হতে লাগলো দৈববাণীর মতো। বাঙালী প্রাণ তাঁর কবিতায় পেলো আশ্বাস, পেলো আশার বাণী। মুক্তিপথের সন্ধানী তরুণ সমাজে তাঁর কবিতা মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। বৈষ্ণব কবিতার ভাবালুতা ও গীতিকবিতার মৃদু গুঞ্জনের ধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে এই কবিতা উদ্বুদ্ধ ক'রলো অচেতন পৌরুষকে। জাতির জীবনে একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে আর নজরুল সেইসব ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিতা লিখেছেন। হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হ'লো যে জীবন-জিজ্ঞাসাই নজরুল কাব্যের অনুপ্রেরণার হেতুমূল এবং সমসাময়িক ঘটনার প্রতিচিত্রণই তাঁর লক্ষ্য। 'আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?' এই-ই হ'লো কবির জিজ্ঞাসা।

নজরুলের বক্তব্য অনেক সময় এতো বেশী তীব্র ও সুস্পষ্ট যে, কাব্যপাঠককে একেবারে চমকে দেয়। সত্যেন দত্ত মেথরকে বন্ধু বলে' সম্বোধন করেছিলেন, নজরুল কিন্তু বারাঙ্গণাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। এজন্যে নজরুলকে কম বিদ্রূপ সইতে হয়নি, কিন্তু কবি আপন বিশ্বাসে অটল ছিলেন। যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই কবি অভিনন্দিত করেছেন মুক্তি-কামীকে। ঝড়ো হাওয়ার মাঝে শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে ঘর-বদলের পালা শুরু হ'য়েছে—এই ঘোষণা নজরুল-কাব্যে থেকে-থেকেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছে : "চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির। বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা প্রাচীর।" এটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন বলেই কবির মনে আর কোনো সংশয় কোনো দ্বিধা ছিল না।

এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।

সুতরাং কবি তুলেছেন নিপীড়িত প্রাণের নব অভিজান ও নব উত্থানের জয়ধ্বনি। এমন অনেক শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন কবিতাকে সমসাময়িকতার বাহন ক'রলেই কাব্যের জাত গেলো। সমসাময়িক নানা ঘটনার ছায়া নজরুলকাব্যে উপস্থিত বলে' তারা অনেক সময়ই তাঁর কবিতার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। নজরুলের বন্ধুমহলেও বোধহয় এরূপ লোকের অভাব ছিল না। সম্ভবত এঁদের উদ্দেশ ক'রেই নজরুল এ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'আমার কৈফিয়ৎ' নামের কবিতাটিতে। নজরুল যে কিরকম রসিক ছিলেন, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপবিন্যাসে

কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, এই কবিতাটিই তার বিশেষ প্রমাণ বলে' মনে করা যেতে পারে। এই কবিতাতেই তিনি লিখেছেন :

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না,
বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত' একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়,
বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও,
বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

এবং এই স্তবকটিতে বেদনা, ক্ষোভ ও শ্লেষের সুরটা সুস্পষ্ট। নজরুল যে এতোটা আবেগ নিয়ে যুগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি অনুভব ক'রেছিলেন হৃদয় দিয়ে; মেধা দিয়ে নয়। সমসাময়িককে রসোত্তীর্ণ করা সহজ নয়, সুখের বিষয়, নজরুলের অনেক বিখ্যাত কবিতাই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছে। বাঙ্গালীর প্রাণের অন্ধ কুসংস্কার ও আবেগহীন স্থিতিশীলতাকে অবিরাম আঘাত ক'রেছেন তিনি, সেই সঙ্গে নতুন পথের নবজাগরণের মহাকল্লোলের আহ্বানও শুনিয়েছেন নিজের বস্তুবাদী কবিতার মাধ্যমে। রাজনৈতিক ও সামাজিক এই উভয় ধরণের কর্ম্মকাণ্ডের ওপরই কবি রেখেছিলেন সজাগ দৃষ্টি। আর, যেখানেই ভণ্ডামি, যেখানেই ছদ্মবেশে মিথ্যার বেসাতি, সেখানেই কবি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি তুলতে ইতস্ততঃ করেননি। কবিতা যে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার হ'তে পারে, সেই ধারণা বাঙলাদেশে বদ্ধমূল হ'লো বোধ হয় নজরুল-কাব্যপাঠের মধ্যে দিয়েই। নজরুলের কবিতার প্রকাশভঙ্গীও এমন বিচিত্র যে বক্তব্য যাই হোক না কেন কোথাও তা' উপভোগকে পীড়িত করেনি। অনেক সময় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সমসাময়িকতার প্রভাবে নজরুলের কবিদৃষ্টি খণ্ডিত হ'য়েছে। অর্থাৎ, তাঁর কবিতা যতটা প্রক্ষোভী ততোটা লোকোত্তর কলাশিল্পের পরিচায়ক নয়। কবি নিজেও এই কথাটা স্বীকার ক'রেই নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে 'বিশুদ্ধ' কবিতা লেখার সময় হয়তো ভবিষ্যতে কখনো আসতে পারে, কিন্তু কাব্যের তথাকথিত বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে কবি যদি সমসাময়িক কালের সমাজ-জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্ত্ত থেকে দূরে সরে' দাঁড়ান, তাহ'লে তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক আর কিছুই হ'তে পারে না। সেইজন্যই শিল্পের লালিত্যের চাইতেও বাক্যের পৌরুষকেই তিনি বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' তাদের অভিনন্দিত ক'রেছিলেন। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ জাতি' সত্যেন দত্তের এই ভাষণে মানবতাবোধের অভিনবত্বটাই এ-দেশের পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ ক'রেছিল। নজরুল কিন্তু আরোও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন, তিনি সাম্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। অবশ্য এখনকার দিনে ভাব ও ভাবনার অপেক্ষাকৃত সুপরিণতির যুগে নজরুলের অনেক উক্তিকে অতিশয়োক্তির মতো মনে হ'তে পারে, কিন্তু তাহ'লেও সমাজসচেতন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যে অনেকেরই পুরোধা, এটা স্বীকার ক'রে নিয়ে একথাই মনে রাখতে হবে যে, নজরুলের এই অতিশয়োক্তি-গুলোর প্রয়োজন সে-সময় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছিল।

নজরুল ইসলাম নবযৌবনের কবি, এটা মনে রাখলেই তাঁর অনেক অতিশয়োক্তি সম্পর্কে পাঠকের আর ক্ষোভ থাকেনা। তারুণ্যকে, নবযৌবনকে কবি নব-নব রূপে অভিনন্দিত ক'রেছেন। দেশের যুবশক্তির মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ্য ক'রেছিলেন মুক্তির প্রতিশ্রুতি। 'জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি' একথা বলেছেন কবি নজরুল ইসলামই। 'যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!' এই উক্তিও তাঁরই। মোটের উপর, নজরুল-কাব্যের আনকটা স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে কবির যৌবন-বন্দনা। দুষ্টের দমন ও আর্ত্তের উদ্ধারের জন্যে কবি আমন্ত্রণ ক'রেছেন দেশের যুবশক্তিকেই। উন্মত্ত ও হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও কবি দিশেহারা হননি; দৃপ্তকণ্ঠে যৌবনকেই উদ্দেশ ক'রে বলেছেন :

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ, জেগেছে ত তবু, বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া!

এবং শেষের পংক্তিটি পড়লে একথাই মনে হবে যে পরিস্থিতি যতো জটিল ও গোলমেলে হোক না কেন কবির সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ঘটনার সত্য বিশ্লেষণে কখনো উদাসীন থাকেনি। 'অগ্র-পথিক' কবিতাটি নজরুলের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা। সেই কবিতায় কবি আহ্বান ক'রেছেন 'প্রাণ-চঞ্চল প্রাচীর তরুণ কর্ম্মবীরদের' এবং দুলালী দুহিতা জায়া ভগ্নী তরুণীদের। এই কবিতাটিতে আছে গতি, রয়েছে শপথ আর প্রতিশ্রুতি।' 'যৌবন-জল-তরঙ্গ' আরো একটি সার্থক কবিতা। এই কবিতাটিতে মূর্ত্ত হ'য়েছে জড় ও পুরাতনের বিরুদ্ধে নবীনের অভিযান। নজরুল যৌবনকে বরাবরই অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো বিষয়ে সংশয় থাকলে সে-সংশয় প্রকাশ ক'রতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। দেশের যুবশক্তির একটা অংশ যখন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ ক'রলো তখন যুবসমাজের আত্মত্যাগকে অসীম শ্রদ্ধা জানিয়েও ঐ পথ মুক্তির সঠিক পথ কিনা এই প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন বলে' মনে হয়। 'অন্ধ স্বদেশ-দেবতা' কবিতায় এ রকম মনোভাবের আভাস রয়েছে এবং সেখানে তিনি 'ফাঁসির রশ্মি ধরি আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা' এই কথা লিখেছিলেন। অথচ কবিতাটির আগাগোড়া এরূপ মাধুর্য্য রয়েছে যা পাঠক-মনে দীর্ঘ রেখাপাত করে। এই কবিতাটিকে নজরুলের একটি সার্থক রাজনৈতিক কবিতা বলে' মনে করা যেতে পারে। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত লিখে ('অন্তর ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত') নজরুল এটাই সপ্রমাণ ক'রেছেন যে, তিনি শুধু জাতীয় জাগরণের কবি নন; পৃথিবীর দূর-দূরান্তরের নানা দেশের জনগণের স্বাধীকার রক্ষার সংগ্রাম সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা ছিল এবং সে-সংগ্রামের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি একাত্মতা অনুভব ক'রেছিলেন।

পরিশেষে নজরুল-কাব্য সম্বন্ধে এ কথাই বলা দরকার যে, সাহিত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রলে কবিতাগুলো টিঁকবে কিনা এ নিয়ে কবি নিজে কখনো মাথা ঘামাননি। এলিয়ট বলেছেন যে, কাব্য-বিচারে ইতিহাসবোধ আমাদের সহায়। যদি তাই হয়, তবে নজরুল-কাব্য সম্পর্কে আমাদের অধিকতর সজাগ হওয়া উচিত। নজরুল নব যুগের কবি, নবযৌবনের কবি, এই সত্যটিই শেষ পর্য্যন্ত বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়। শব্দগ্রাহ্ ও ভাষাবিন্যাসের দিক থেকেও কবি যে অভিনবত্ব এনেছিলেন সেটাও ভোলা সম্ভব নয়। সময়োপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে অনেক বিদেশী শব্দ, বিশেষ ক'রে আরবী ও ফারসী শব্দ তিনি কবিতায় ঢুকিয়েছিলেন, এবং স্বীকার ক'রে নেয়া দরকার যে, তাতে আশানুরূপ বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি হ'য়েছে। অবশ্য সত্যেন দত্ত এবং পরবর্ত্তিকালে মোহিতলাল এই দিক থেকে চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু নজরুলের উদ্যোগটাকেই স্পষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত বেশী সার্থক বলে' মনে হয়। যেমন সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিমুহূর্ত্তেই নব নব সম্ভাবনার সূত্রপাত হ'চ্ছে, হয়তো আরও কিছুকাল পর নজরুল-কাব্যের রঙ অধিকতর ম্লান মনে হবে। কিন্তু বিশেষ কালের ও বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্ব বরাবরই ক'রবে এই কবিতাগুলো; বাঙলা কাব্য-ক্ষেত্রের ভাবী উদ্যোগীরা নজরুল-কাব্য থেকে যে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রেরণা লাভ ক'রবেন, এ উক্তি বাহুল্য।

বৈদ্যনাথে সাতদিন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

তিন

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ভোর হইয়াছে—সূর্য্যদেবের আলোকরশ্মী তখনও ধরায় আসিয়া পড়ে নাই। ইতিমধ্যে হেমেন্দ্রবাবু কখন বুঝিলাম না উঠিয়া পড়িয়াছেন—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া তিনি বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিলাম। আমি উঠিতেই তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলেন। আমিও পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইলাম।

পথিমধ্যে তিনি রকমারি গল্প করিতে লাগিলেন।—১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসিয়া একবার ডাকবাংলোতে ছিলেন। তাহার পরেই মনীষী রাজনারায়ণ বসুর বাড়ি। ঐ বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ থাকিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ পরলোকগমন করিলে, এই স্থানে এক শোকসভা হয়, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র বক্তৃতা দেন এবং অরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন। হেমেন্দ্র বাবুও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।—ক্রমে রেললাইন পার হইয়া আমরা কোর্টের রাস্তায় পড়িলাম। তথায় কোর্টের সম্মুখে সৌদামিনী ভবনে তিনি কিছুদিন ছিলেন, তাহার কথাও হইল। অতঃপর চৌমাথার নিকট যে ঘড়ি ঘর (ক্লক-টাওয়ার) হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে আমি যখন দেওঘরে আসিয়াছিলাম, তখন এই ঘড়িঘর ছিল না; ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এই ঘড়িটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে দেখিলাম।

ঘড়িঘরের অনতিদূরে এক ডাক্তারখানায় হেমেন্দ্রবাবু লইয়া গেলেন; তথায় তাঁহার পরিচিত দুইজন ডাক্তার বন্ধু আছেন। কম্পাউণ্ডারের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল যে, একজন ডাক্তার সৌরেন্দ্র মুখার্জি গত বৎসর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আর একজন ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তখনও আসেন নাই। সুতরাং ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া মন্দিরের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম।

ভারতের সর্ব্বত্র তীর্থস্থানগুলির যেরূপ অবস্থা এখানেও ঠিক তদ্রূপ। সামনে বহু ভিখারী বসিয়া আছে—মন্দিরের দরজার নিকট হইতেই কয়েকজন পাণ্ডা আসিয়া নাম-ধাম, কোথা হইতে আসিয়াছি প্রভৃতি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা দেবদর্শন করাইবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল বিক্রয় হইতেছে। ঔষধের মত শিশি করিয়া গঙ্গাজল সাজান আছে—দাম চার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত। এক আনার বিল্বপত্র ক্রয় করিয়া বৈদ্যনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। নিচু দরজা—ভিতর একপ্রকার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বলা যায়। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, তাই কোনরকমে ভিতরে ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিলাম।

উইলিয়মস্ টাউনের প্রসিদ্ধ ঝিল

মেঝে হইতে বোধহয় একহাত নীচে বৈদ্যনাথের মস্তক রহিয়াছে ; সেই মাথার উপর গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র ফেলিবার জন্যই যাত্রীদের হুড়াহুড়ি।

বৈদ্যনাথ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায় যে—অতি প্রাচীনকালে লঙ্কাধিপতি রাবণ মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করেন এবং তিনি মহাদেবকে অমর বর দিবার ও তাঁহাকে তাঁহার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প জানান। মহাদেব তাহার কথায় রাজী হন—সেই জন্য রাবণ কৈলাস হইতে তাঁহাকে হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু কথা ছিল যে পথের মাঝখানে মাটিতে তাঁহাকে কোথাও নামান চলিবে না। যেখানে নামান হইবে সেই স্থানেই তিনি রহিয়া যাইবেন।

রাবণকে মহাদেবকে লইয়া লঙ্কায় যাইতে দেখিয়া দেবতারা মহা ভীত হইয়া পড়িলেন, অতঃপর তাঁহারা ব্রহ্মার শরনাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা সমস্ত শুনিয়া বরুণ দেবকে রাবণের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বরুণ প্রবেশ করিতেই রাবণের প্রস্রাবের বেগ আসিল ; তিনি আর পথ চলিতে পারিলেন না। তখন তথায় ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুকে দেখিয়া রাবণ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মহাদেবকে তাঁহার হাতে দিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলেন। বিষ্ণু মহাদেবকে ধরিয়া রহিলেন, কিন্তু রাবণের প্রস্রাব আর শেষ হয় না। তখন বিষ্ণু মহাদেবকে বৈদ্যনাথের ঐ স্থানে রাখিয়া দেন। রাবণ তাহার পর মহাদেবকে উঠাইবার বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তখন রাগ করিয়া রাবণ তাহার মাথার উপর এক ঘুসি মারিয়া চলিয়া যান। রাবণের ঘুসি খাইয়া মহাদেব পাতালে চলিয়া যান ; কেবল তাহার মাথাটি মাটির তলায় রহিয়াছে, আজো দেখা যায়। এমন কি মাথার উপর একটি গর্ত্ত আছে এবং সকলে বলিয়া থাকেন যে উহাই রাবণের হাতের ঘুসির চিহ্ন।

তপোবন পাহাড়

মন্দিরের মধ্যে বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া বাহির হইলাম। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আরো চার-পাঁচটি বড় বড় মন্দির আছে। উহার মধ্যেও বহু দেবদেবী রহিয়াছে। মন্দির হইতে বাহির হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া পুনরায় হেমেন্দ্র বাবু তাঁহার পূর্ব্বকথিত ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় আমরা উভয়ে বাড়ি ফিরিলাম।

চাঁদমোহন বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যাওয়া মাত্রই চা ও জল খাবার আসিল এবং আমরা পুণ্য সঞ্চয় করিতে বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়াছিলাম শুনিয়া বেশ একটু হাসিলেন। তাহার পরে তিনি হেমেন্দ্র বাবুর সহিত সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করিলেন। কথা প্রসঙ্গে সেই দিন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা হইল। বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ও স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ইহাকে একটি মন্ত্র বলিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও আলোচিত হইল। আমি তাঁহাদের আলোচনার মধ্যে একটু বাহির হইয়া গেলাম এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া সৎসঙ্গের আশ্রমে যে অগণিত নরনারী যাইতেছেন, তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

তারপর মধ্যাহ্নে স্নান ও ভোজন সমাপন করিয়া একখানি চেয়ার লইয়া বাগানে একটি গাছের তলায় বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম এবং হেমেন্দ্রবাবু ও চাঁদমোহন বাবু ঘরের মধ্যে গল্প করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে চা খাইয়া পুনরায় একটু বেড়াইয়া আসিলাম। রাত্রে কেষ্ট ও কমলা গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের পালা আরম্ভ করিল; তাহার পর গত রাত্রের ন্যায় ভোজনাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন বুধবার প্রাতে উঠিয়া আমরা নন্দন পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গেলাম; ইহাকে পাহাড় বলিয়া অভিহিত করিলেও, ইহা কেবল নামেই পাহাড়, কাজে কিন্তু একটা বড় পাথরের ঢিবি। পূর্ব্বে ইহার উপর কোন মন্দির ছিল না, এবারে গিয়া দেখিলাম যে পাহাড়ের উপর পাঁচটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিব মন্দির ও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি দেখিতে বেশ সুন্দর।

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের মধ্যে শ্বেত প্রস্তরে "শ্রীমান সেট রাধাকৃষ্ণাসী মালিয়াকে ধর্ম্মপত্নী দ্বারা স্থাপিত—স: ২০০১ শনিবার" এই কথাগুলি দেবনাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে।

এতদ্ব্যতীত পাহাড়ের উপর হনুমানজীর মন্দির, পার্ব্বতী মন্দির ও একটি কালী মন্দির আছে। কালী মূর্ত্তিটি প্রস্তর নির্ম্মিত—খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল; সম্ভবতঃ ইহা অন্য কোন স্থান হইতে আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

হনুমানজীর মন্দিরটিও দেখিতে খুব ভাল লাগিল। এই মন্দিরটি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী উমাঙ্গিনী নামক আমেদাবাদের একটি মহিলা নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন বলিয়া লেখা রহিয়াছে। এই স্থানে হেমেন্দ্র বাবু একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আমি চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তথায় একটি যুবক ও একটি কিশোরীর সহিত আমার আলাপ হইল। কিশোরীর নাম কুমারী ইরা মুখোপাধ্যায়, শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী এবং যুবকটির নিকট হইতে শুনিলাম যে ইরা মুখোপাধ্যায় একজন সুগায়িকা এবং রেডিওতে তিনি প্রায়ই গান করেন। তাহাদের লইয়া হেমেন্দ্রবাবুর নিকট গেলাম। হেমেন্দ্র বাবু তাহাদের অ-বাঙ্গালী ভাবিয়া হিন্দিতে কথা বলিতে সুরু করিয়া দিলেন।

মেয়েটি বলিল যে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলায় বলুন। হেমেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার ভুল বুঝিয়া বাঙ্গলায় কথা বলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের পরিচয় পাইয়া তাহারা আমাদের সহিত এরূপ আলাপ জমাইয়া নিল এবং হেমেন্দ্র বাবুকে তাহারা দাদু, দাদু বলিয়া এরূপ একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিল, যে, তাহাদের দুইজনকে থামাইয়া আমাদের চলিয়া যাওয়া তখন মুস্কিল হইল।

শেষে তাহারা আমাদিগকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং ইরার পিতামাতার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পিতার নাম শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়—তিনিও আমাদের জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন এবং ইরা সুললিত সঙ্গীতের দ্বারা এরূপভাবে আমাদের বিমোহিত করিল যে, আমরাও তাহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়া পারিলাম না। পরে রেডিওতেও তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার 'এই ঘরে আছে তোমার স্মৃতিটি' গানখানি এখনও যেন কানে মধুবর্ষণ করিতেছে [ক্রমশঃ

বরষা

কল্যাণী চক্রবর্ত্তী

সকাল হ'তে সূর্য্য আজি মেঘের কোলে খেলে,
বুঝি তাহার কাজের কথা মনে নাহি খেলে।
তাইতে আজি সকাল হ'তে জগত অন্ধকার,
সারা আকাশ সেজেছে আজ মলিন বদ্ধ দ্বার।

সারা দিনটা বৃথাই যাবে ভেবে লাগে ভয়,
সারা বরষা আকাশ শুধু মেঘে ঢেকে রয়।
এখনই করলে স্মরণ মনে লাগে ভয়,
আকাশ যেন কাল বেশে ক'রবে ভূবন জয়।

তাইতে আজি বাস্তুহারার মনে এত ডর,
পাখীরা সব বর্ষা-আগে বাঁধে আপন ঘর।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[দীননাথ চৌধুরীর বাটীর কক্ষ—সম্মুখের চত্বর]

(ভবশঙ্করী ও সুমিত্রা বসিয়া। উভয়ের পরিধানে রক্তবস্ত্র)

ভবশঙ্করী—(উঠিয়া দেওয়াল গাত্র হইতে একটি বল্লম লইয়া) দেখ, সুমিত্রা! এর ধারের তীক্ষ্ণতা যেন কমে গেছে।

সুমিত্রা—(উদাসভাবে) তুমিই জান শঙ্করী।

শঙ্করী—কেন? তুমি কি কম জান? বাবা তো বলেন সুমিত্রার লক্ষ্য যেমন অব্যর্থ তেমনি প্রাণান্তক।

সুমিত্রা—না শঙ্করী এ আর ভাল লাগে না। কুল-ললনার এই শস্ত্রবিদ্যা—এর দরকারই বা কি আর সার্থকতাই বা কোথায়?

ভবশঙ্করী—(গম্ভীর হইল—তাহার লক্ষ্য যেন কোন সুদূরের প্রতি স্থির হইয়া গেল) সুমিত্রা! তুমি কি বল রোণ নদের জল বয়ে নিয়ে এসে আর তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলেই বাংলার গৃহস্থের কল্যাণ বজায় রাখবে! সুমিত্রা! তুই দেখিস্ নি? আমি দেখতে পাই—বাংলার শান্ত পরিবারের নিরুদ্বেগ জীবন যাপন অসম্ভব করে তুলতে আসছে দুষ্ট শক্তিনাশীরা। মার কোল থেকে ছেলে—স্বামীর বাহু থেকে দুর্ব্বলা সতীকে কেড়ে নিয়েছে—নেবে। বল্‌তে পারিস সুমিত্রা—দ্রৌপদী, প্রমিলা, পদ্মিনী, রিজিয়ার আদর্শ কি কারুর চেয়ে ছোট? সুমিত্রা শক্তি! শক্তি!! আত্মরক্ষায় শক্তির ব্যবহার না জানলে ভারতের রক্ষা নাই (আত্মহারা)

সুমিত্রা—শঙ্করী—বোন্—না না—আমি তা বলিনি—

ভবশঙ্করী—(প্রকৃতিস্থ হইয়া সুমিত্রাকে বুকে টানিয়া লইয়া) ভাই, সুমিত্রা! একটা গান গা—আয়—(হাত ধরিয়া দাঁড়াইল ও পরে বসিল)

গান

আমার ছোট্ট জীবন নাইয়া
বেয়ে চলে পাগলা মাঝি
কোন অজানার পারে রে
আমি জানি না আমি জানি না।
যতই বলি মাতাল মাঝি
থামনা ঘাটের কাছে,

একটু আমি নেমে দেখি
যদি অজানার পাই নিশানা
তরী তবু ভেসেই চলে
ঢেউয়ের উপর বাইয়া॥

(ভবশঙ্করী সুমিত্রার হাতখানি ধরিয়া অপলকদৃষ্টিতে তার বেদনাভরা মুখের দিকে চাহিয়া আছে—সুমিত্রা ভাববিহ্বলা)

(দীননাথের প্রবেশ)

দীননাথ—কি গান গাইলে মা! বাংলার আকাশে বাতাসে পাতায়-ফুলে নদ-নদীতে এমন চেতনা মা! তোদের কি চোখে পড়ে না! মা আমার সৃষ্টির আঁচল মেলে রেখেছেন তার সন্তানদের মানুষ কর্ত্তে—আমার মায়ের ডাক শুনিস নি? তার জয়যাত্রার ডাক শুনে চুপ করে থাকিস্ নি মা তোরা—মা কি একলা যাবে—গা—গা মা! আমার মার মন মাতান গান গা—

(সুমিত্রা আবার গাহিল)

বাংলা আমার মা জননী!
তোমার কোলে জনম নিলে
কত যুগের অমর বাণী
মা আমার সোণার খনি।
এই মাটিতে জনম নিলে
মরণজয়ী সাধক যত

(ওরে) তাইত মায়ের আমার
সাধন খেলার মাতন এত
বাংলা মায়ের চেতন বাণী
রুদ্র মাতন পরশ দিয়ে
সবার হিয়ায় জাগিয়ে দিলে
মায়ের পূজার অমর নেশা
টুটবে মাগো টুটবে
সফল হবে তোমার বাণী
ভারতমাতা নিজের হাতে
পরিয়ে দেবে মুকুটখানি
বাংলা হবে আবার রাণী।

(গান থামিলে দীননাথ শঙ্করী আর সুমিত্রার হাত ধরিয়া)

দীননাথ—এই ত গান! এই আমার মায়ের রূপ! হ্যাঁ মা তোরা পারবি আমার মাকে সাজিয়ে জয়-যাত্রায় যেতে? আমি তোদের সাজিয়ে দেবো। দীন-নাথের আজন্মের সাধনা—হরিদেব ভট্টাচার্য্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার তোদের মাতৃপূজার যোগ্য কোর্ব্বে। ভুরসুট জাগবে মা জাগবে। সুমিত্রা! শঙ্করী!! তোরা পাবি মা পাবি।

সুমিত্রা—কাকা শঙ্করী শস্ত্রবিদ্যায়—সাহসে—জ্ঞানে—বুদ্ধিতে যেমন উন্নতি লাভ করেছে, তেমনি স্নেহ দয়া মায়া তার অন্তরকে ছেয়ে আছে। কাকা শঙ্করী দেবী—কিন্তু—(ইতস্ততঃ) (শঙ্করী চঞ্চল হইয়া উঠিল)।

দীননাথ—মা! কিন্তু কোরো না। বল—আমার কাছে তোমার কোন বাধা নেই।

সুমিত্রা—হ্যাঁ তাই বলছিলাম—আমার বোনের বিবাহের কিছু স্থির হলো?

দীননাথ—সুমিত্রা! তোদের মত মেয়ের বর আমায় খুঁজে বের করতে হবে না। মা! বাংলায় আজ দরকার তোমাদের মত নারীর পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত বাংলা-খানাকে বীর্য্য শক্তিতে দীক্ষিত করা, আমি আশীর্ব্বাদ করি, মা! তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা বাংলার গ্রামে ধ্বনিত হোক।

(বৃদ্ধ রামজীবনের দ্রুত প্রবেশ—গায়ে তার রক্ত—হাতে লাঠি এবং কটিদেশে ছোরা)।

রামজীবন—সর্দ্দার ঠাকুর! একবার আসুন ত। এমন অন্যায় আপনি গাঁয়ে থাকতে হবে? (দীননাথ হাসিল—শঙ্করী ব্যস্তভাবে)।

শঙ্করী—কি হয়েছে—রামজীবন দা?

সুমিত্রা—একি তোমার গায়ে রক্ত অথচ লাঠিতে কিছু নেই, আশ্চর্য্য ত!

রামজীবন—(নিজের দেহের দিকে চাহিয়া) তাইত বলছি সর্দ্দার ঠাকুরকে বিচার কর্ত্তে। আমি লাঠি চালিয়ে বুড়ো হলুম আর একটা বাচ্চা মেয়ে আমার সামনে লাফিয়ে গিয়ে কুড়ুল দিয়েই চিতেটাকে মারলে—নিজেও জখম হলো। তারপর বুড়ো মানুষ আমি তাড়াতাড়ি কি যেতে পারি—তবুও গিয়ে ছুরি দিয়ে তার গলায় দিলুম ঘা। ও বাবা লড়ায়ে ছুড়ীর সে কি রাগ! আমায় বলে—

(ধীরে ধীরে শ্যামার প্রবেশ, গায়ে তার রক্ত, হাতে কুঠার, তাতে রক্ত)।

শ্যামা—দাদু! তুমি আবার সর্দ্দার ঠাকুরের কাছে নালিশ কর্ত্তে এসেছ? বলুন ত আপনারা, কার অন্যায়? সন্ধ্যা বেলায় তামাক দিয়ে তুলসী তলায় "বাতি" দিচ্ছি—বাছুরটা চেঁচিয়ে উঠলো—সামনে দেখি একটা "চিতে"। কুড়ুলটা নিয়ে দিলুম তার মাথায় এক ঘা। আবার কুড়ুল দিয়ে তাকে মারবো, এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এসে বুড়ো মানুষ উনি জানোয়ারটার গলায় ছুরিখানা বসিয়ে দিলেন। কেন? তোমার তামাক ফেলে দৌড়ে আসবার কি দরকার ছিল! আবার তামাক সেজে দিতে ব'লো শ্যামাকে, হ্যাঁ!

দীননাথ—কি হলো আবার রাম কাকা?

রামজীবন—তাইত বলি—আর তোর প্রথম ঘায়েই ত জানোয়ারটা শেষ হয়েছিল। আর কি তার জান ছিল? বাবা! ঐ ছোট্ট মেয়ের হাত! ভেল্কী খেলে! "যেমন তামাক সাজে, আবার তেমনি চিতে মারে।"

শ্যামা—আচ্ছা—আচ্ছা—আমি তোমায় বল্লুম দাদু তামাক খাবে—ব'সে তামাক খাও—আমার কাজে হাত দিও না—অনর্থ ঘটবে।

রামজীবন—আমি বলছি তোমায়—তোমার দেহে রক্ত পড়তে দেখলে আমি চুপ ক'রে থাকবো না—তা সে চিতেই হোক আর ডাকাতই হোক।

(শঙ্করী ধীরে ধীরে যাইয়া শ্যামার হাত ধরিয়া ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল এবং সুমিত্রা তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।)

দীননাথ—শ্যামা! সত্য কথাই বলেছ। তোমার সংসারে বুড়ো কাকার আমার হাত দিতে যাওয়া ঠিক হয় নি। মা আমার এমন বয়সেই যখন এমন অসম সাহসী ও শক্তিময়ী হয়েছে তখন কেন কাকা আর তুমি ওর জন্যে ভাবছো? ও রক্তটক্ত ওদের কাছে কিছু নয়।

রামজীবন—তাইত বলি দিদিকে—এখন আর আমার ভাবনা নেই।

শঙ্করী—শ্যামা! (তাহার দিকে চাহিলে) তোমার কি ভয় করে না?

শ্যামা—এমন ভয়ঙ্কর দাদাম'শাইকে জন্ম থেকে দেখে দেখে আর আমার ভয় নেই। চল দাদু আমরা বাড়ী যাই।

(রামজীবন ও শ্যামার প্রস্থান—অন্যদিকে দীননাথের প্রস্থান—শঙ্করী বিস্মিত দৃষ্টিতে শ্যামার দিকে চাহিয়া—সুমিত্রা তাহার হাত ধরিল)।

[ক্রমশঃ

শঙ্কা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

লো আমার কণ্ঠহারের মধ্য মণি!
বক্ষ'পরে দুলিয়ে তোরে—
দ্বিপ্রহরে শঙ্কা গণি।
আজকে যবে সুপ্রভাতে
ছড়িয়ে দিল আঙিনাতে
আগুনরাঙা বসনখানির—
ঢেউ খেলানো সোহাগরাশি।
সেই সোনালি বর্ণকণা
গর্ব্ব ভরে কয় কত না
ওই বুঝি ও-তনুখানির—
পরশ পেয়ে উঠলো হাসি।
বক্ষে পারিজাতের কুঁড়ি
গন্ধে মনোভৃঙ্গ মাতে—
গুণগুণিয়ে কইছে কতো
গাইছে—তোমার আঙিনাতে
তাইতো মনে ভরসা নাহি
যতই চাহি তোমার পানে,
চোখের কোণে সৌদামিনী
শঙ্করেরো পরাণ হানে।

ঐ মোহিনী মূর্ত্তিখানি
এই ধরণীর সৃষ্টি দিনে
মন্মথেরো মন ভুলানো
মন মথিলো চক্ষে জিনে।
সেই হতে সে আদিম কথা
আদিম রসে ভিয়ান করে
আমিই লিখে আসছি সখি!
নানান্ কবি মূর্ত্তি ধরে।
এই ধরণীর আদম-সুমার
যতই হল হিসাব লিখে
সেই কাহিনী আদম-ইভার
প্রচার হল দিগ্বিদিকে।
আজকে তুমি একটুখানি
সম্বরিয়া সামলে থাকো—
কি জানি চাঁদ লুকায় পাছে
রূপের রাশি লুকিয়ে রাখো।
আমার বড় ভয় লেগেছে
অচিন আঁখির আনাগোনায়
লুকাতে চাই বক্ষোমাঝে
কাজ কি কারো জানাশোনায়

সভ্যতার অভিসম্পাত

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত থাকার মত মানসিক শিক্ষা না থাকাতে আধুনিক মায়েরা সংসারে 'ঠাকুমা দিদিমা' প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাহচর্য্য লাভে বঞ্চিত। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা শিশুদের সঙ্গে নিয়েই সিনেমা বা সামাজিক উৎসব প্রভৃতিতে যেয়ে থাকেন। যার ফলে শিশুর মনের উপর অকারণ সংঘাতের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে মানসিক বিপর্যায়ের পথেই এগিয়ে দেওয়া হয়। এই 'ঠাকুমা দিদিমারাই' ছিলেন আগেকার দিনে শিশু-মনের শিক্ষক। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নানান গল্প, উপাখ্যান, পদাবলীর মধ্যে দিয়ে তাদের মনের উৎকর্ষ্য বিধানে তাঁরা সতত: ব্যস্ত থাকতেন।

মহাপুরুষদের জীবনী বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায়ই পিতাপুত্রের আদর্শের সংঘাত। বজ্র কঠোর পিতা তাঁর আদর্শ থেকে এক চুলও বিচলিত হবেন না। অন্য দিকে অপূর্ব্ব স্নেহময়ী মাতা অসীম সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে পিতাপুত্রের মান বিপর্য্যয়ের সমন্বয় সাধন করতেন। ইদানীং চাকা ঘুরে গেছে। পিতা আপনার চিন্তায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত—ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে একরকম উদাসীন। এদিকে সুখবিলাসী, কর্ম্মবিমুখ পরিচ্ছদ প্রসাধনের পারিপাট্টে অতি মাত্রায় ব্যস্ত আধুনিক মায়েদের অবিবেচনা প্রসূত ব্যবহার ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই এগিয়ে দেয়। তাঁরা সংসারের জন্য খেটে জীবন পাত করেন বটে, কিন্তু তা কর্ত্তব্য বোধে নয়—দায়ে পড়ে। তাই না পান নিজেরা আনন্দ—না পারেন আনন্দ পরিবেশের সৃষ্টি করতে। এ সব আমাদের সভ্যতারই অভিসম্পাত।

আগেকার দিনে 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা' এই ছিল সামাজিক প্রথা। তাই যাতে পুত্র বংশের নাম, যশ, মান রক্ষা করতে পারে সেই ছিল মায়েদের অহর্নিশি ধ্যান। গর্ভাবস্থায় মা সতত: সৎচিন্তা, যে আদর্শে ছেলেকে গড়ে তুলবেন সেই আদর্শের ধ্যানে মন প্রাণ সমর্পণ করতেন। সন্তানের জননী হয়ে ছেলেকে নিত্য নূতন প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাদের চিরউদ্দাম বাসনাকে সংযমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখবার শিক্ষা দিয়ে মানসিক স্থৈর্য্যের উন্নয়নে যত্নবতী হতেন। ফলে সন্তান উত্তরকালে জ্ঞানে, বিদ্যায়, চরিত্রে, কর্ম্ম-দক্ষতায় প্রাতঃস্মরণীয় হতেন। গত উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে যে কয়জন মনীষী জন্ম গ্রহণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মাইকেল, নবীন, গিরিশ ঘোষ, জগদীশ বসু, আচার্য্য প্রফুল্ল, বিদ্যাসাগর, রামেন্দ্র সুন্দর, আশুতোষ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতি—তাঁদের সম কক্ষ হওয়া দূরে থাক কাছাকাছি যাবার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিভার বিকাশ আজ পর্য্যন্ত কারুর হয়েছে কিনা সন্দেহ এই বিংশ শতাব্দীতে, যার অর্দ্ধেক আজ গত। বোধহয় দেশবরেণ্য নেতাজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ জ্যোতিষ্ক।

আধুনিক সভ্যতা আমাদের মনকে এতই বিক্ষিপ্ত করেছে নানান সমস্যার সংঘাতে, তাই কোন গবেষণাতে মন সন্নিবদ্ধ করা এক সুদূর পরাহত ব্যাপার। ফলে সমাজ-কল্যাণকর উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ হতে পারে না। মানসিক উৎকর্ষের পরিবর্ত্তে আর্থিক আভিজাত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে মন বেশী। এ যেন সেই মহাসত্যের—"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি, তাহার খানিক; এতবলি নদীনিরে ফেলিল মাণিক"—গলিত বিকৃত শব। এই যখন পরিবেশ, সেখানে তখন মণীষী সৃষ্টির সুযোগ কোথায়?

কন্যাকে ভাবী আদর্শ জননী হবার শিক্ষা দিতে মায়েদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না আগেকার দিনে। বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রত প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে আহারে, বিহারে সংযম শিক্ষা ও মনেপ্রাণে আদর্শ স্বামী পুত্র লাভের শিক্ষায় দীক্ষিত করতেন। এ যুগে ও সব ঘৃণিত নীচ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। আধুনিক সভ্যসমাজে কিশোরীদের এই বিকৃত মনোবৃত্তি

বয়ঃসন্ধিক্ষণে দেহের সুঠাম গঠনে ও লাবণ্য বৃদ্ধির উপযোগী শরীরের আভ্যন্তরীন রস সঞ্চারে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে। যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই স্কুল কলেজের ছাত্রীদের শ্রীহীন, লালিত্যহীন অঙ্গসৌষ্ঠবে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দীনতা প্রকট হয়ে উঠছে দিন দিন তাঁদের। এই যখন অবস্থা, ভাবী জননীদের তখন কি করে আশা করতে পারা যায়—যে তাঁরা রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির সহায়তা করতে পারবেন।

আজ যে আমরা এই যে অগণিত চশমা পরিশোভিত তরুণ তরুণীদের দেখছি, এসবও আমাদের সভ্যতার অভিসম্পাতের ফলস্বরূপ। পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য। তাই তাদের মধ্যে চশমার প্রাবল্যও আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। তেমনি আমাদের গ্রামের তুলনায় সহরে সভ্যতার আলোকের বিকাশ বেশী। তাই চশমার আধিক্যও বেশী এই সব সহরে। এর মূলে রয়েছে দৈনন্দিন ব্যাপারে মানসিক বিপর্য্যয়। সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনে অনেক কিছু 'চাওয়া ও না পাওয়ার' দ্বন্দ্ব অপরিনত মনের উপর এমন এক আধিপত্য বিস্তার করে যার ফলে তাদের মানসিক সমতা রক্ষা হয়ে পড়ে এক সুদুঃ পরাহত ব্যাপার। একদিকে মন চাইছে সুদুরপ্রসারী অনেক কিছু দেখতে, বুঝতে; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের মনকে অত কিছু দেখতে বা বুঝতে দিতে পারছে না। ফলে থেকে যাচ্ছে তাদের মনের নিভৃত প্রদেশে এক মহা অশান্তি। এই অশান্তির মায়াজাল যতই তাদের মনে আধিপত্য করছে ততই তাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে—স্নায়ুমূলে রক্ত চলাচলে ততই বাধা পাচ্ছে। যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই কারণে অকারণে মাথাধরা, দৃষ্টিক্লান্তি ও আলোকভীতির মধ্যে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করি বেশী অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা। তাই দৃষ্টিশক্তির উপর চাপ পড়ে বেশী। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মশক্তি অনেকটা কমে যায়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই তাই ব্যক্ত করেছেন—"দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে ঢের বেশী বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; যতটা

দেখিলে কাজ ভাল হয় চোখ তার চেয়ে ঢের বেশী দেখে। এবং চোখ যখন পাহাড়ার কাজ করে কাণ তখন অলস হইয়া যায়—যতটা তার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে—।"

মানসিক স্থৈর্য্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই চোখের কোলে কালি মাখা অবস্থা। এই চোখের কালিমা আরশিতে দেখে অনেকেই হয়ত শিউড়ে উঠেন। আর এই কালিমা ঢাকবার অদম্য আকাঙ্খা মনকে আরও বিকৃত করে দেয়। তখনই Dark glass এর স্মরণাপন্ন হতে হয় লোক চক্ষুর দৃষ্টি এড়াবার জন্য। আর মনকে প্রবোধ দেওয়া হয়—অনুভূতি প্রবণ চোখ দুটোকে আলোকের তীব্রতার হাত থেকে বাঁচাবার নাম করে। সৌন্দর্য্য চর্চ্চা হিসাবে আধুনিক মহিলাদের 'কাজলের' নিয়মিত ব্যবহারের অন্তর্নিহিত রহস্যও ঐ কালিমার অস্তিত্ব অন্যের চক্ষে প্রকট হতে না দেওয়ার নামান্তর মাত্র।

ভগবান মনকে সহ্য করবার শক্তি দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু যদি তাকে আনন্দের পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করে কেবলই নিরানন্দের আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তবে তার পরিণতি হবে মানসিক স্থৈর্য্যের অবনতির মধ্যে। এমনি করেই একদিন আবিষ্কার করে বসবে তারা 'চোখ যেন আর ভাল দেখছে না।' কেননা মন দিয়েই আমরা দেখি বেশী চোখের চাইতে। মনের সুষ্ঠু অবস্থার ব্যতিক্রম হলেই আমরা তখন ভাল দেখতে পাবো না। তখনই স্মরণাপন্ন হতে হবে চশমার।

চশমার সাহায্যে দেখবার বা মাথা ধরার প্রকোপের সাময়িক লাঘব হওয়ায় মানসিক অশান্তির হাত থেকে নিস্তার লাভ হলো অনেকটা। কিন্তু আসল অবস্থার অর্থাৎ মানসিক অবস্থার উন্নতি না হলে মাথাধরা আবার ফিরে আসবে। আর চশমা দিয়েও তখন যেন আর তেমন ভাল দেখা যাবে না। এমনি করেই হয় দৃষ্টিশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি আর চশমার পাওয়ারের ক্রমবৃদ্ধি চলতে থাকে দিনের পর দিন।

প্রথম প্রথম দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ চশমাকে মন বেশ ভাল ভাবে নিতে পারেনা—নানান অসুবিধা ও অশান্তির কারণ হয় বলে। পরে কালের মহিমায় চশমা জনিত উৎকণ্ঠা অনেক লাঘব হয় বটে কিন্তু 'অক্ষমতার' খোঁচা মণির নিভৃত অন্তরের শান্তি ব্যাহত করেই চলে। তাই অনেকে 'অক্ষমতাকে' আভিজাত্যের পূত ধারায় অভিষিক্ত করে নিত্য নূতন ফ্যাসানের চশমার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য্য চর্চ্চার নামে মন প্রাণ নিয়োজিত করে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে নিজ অলঙ্কার বৈভব প্রদর্শনে। তাই সভ্যতার মাশুল স্বরূপ 'চশমা' দিন দিন নব নব ভাবে আমাদের চোখের সামনে প্রকট করে তুলছে জাতির মানসিক দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার আতিশয্য।

ফেরীওয়ালা

সন্তোষকুমার অধিকারী

তোমায় যে হাতছানি দিয়ে
ডাকলুম ; জান্‌লার গরাদেতে মাথা রেখে
রোদেপোড়া গলা পীচ পথে গেলে হেঁকে হেঁকে
পশরার ঠেলাগাড়ী নিয়ে।
তোমায় যে ডাকলুম
শোনোনিকি ?
রোদের আগুনে জ্বলে রাস্তায় ঝিকিমিকি
ছায়া কই ? পথ জনহীন ;
স্বপ্নের ছোঁওয়া নেই, অবকাশ নেই নেই
শ্রান্তপথের কোলে চোখ চাওয়া নিমেষেই
ঢুলে পড়ে তন্দ্রানিলীন,
তোমার পশরা নিয়ে হেঁকে হেঁকে গেলে আর
আমি বাতায়ন হ'তে ডাকলুম।
আমার রেশমী চুলে জড়ানো স্বপনখানি,
আমার নয়নে কাঁপে নিখিল ভুবনখানি
উদাসী হিয়ায় ভরা আবেগের পশরায়
তোমার পৃথিবীটুকু আঁকলুম ;
রোদ্ জ্বলা দুপুরের পথে গেলে হেঁকে হেঁকে
পশরার ঠেলাগাড়ী নিয়ে ;—
শোনোনিকি,
তোমায় যে আমি আজ ডাকলুম।

আম আঁটির ভেঁপু

শ্রীরাজেন্দ্র মোহন রায়

সেদিন অপিসে কর্ম্ম-কর্ত্তার কি একটা কথার প্রতিবাদ করিয়া সৎসাহস দেখাইতে গিয়া ঠাকুরদাস তাহার দশ বৎসরের পুরান চাকুরীটা খোয়াইয়া বসিল। নতি স্বীকার করিয়া আবেদন করিলে ইহার বিধান হয়ত একটা হইতে পারিত, কিন্তু সে তার ধার দিয়াও গেল না।

সংসারে ঠাকুরদাস অভিজ্ঞতা লাভ করিল যত জটিল তত কুটিল, তবু সে দুনিয়াদারী শিখিল না, আর পাঁচজনের মত যেমন করিয়া হউক জীবন পথে আগাইয়া গেল না। আজিকার দিনে সংসারে এজন্য কেহ তাহার সুখ্যাতি করিল না বরং অকেজো, অপদার্থ বলিয়া সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিল। কথাটা শুনিয়া অতি নিকট আত্মীয় স্বজনেরা মারমুখ হইয়া উঠিলেন। বন্ধুরা ভাবিল সে ঠেকিয়া শিখিবে, যুগান্তরে তাহারও নিশ্চয় রূপান্তর ঘটিবে। তাহার পরাজয়ই তাহাকে পথ দেখাইবে।

ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া অনেক চেষ্টার পর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বোর্ডিংয়ে ঠাকুরদাস আবার কাজ পাইল। ভদ্রলোক অতিশয় অর্থশালী, কলিকাতায় ৮।১০ খানা বাড়ীর মালিক। ভারতবিভাগের ফলে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবসা তাঁহাকে বেশ দুই পয়সা আয় দিয়াছে। পূর্ব্বে একখানা ছিল, এখন পাঁচখানা বাড়ীতে বোর্ডিং খুলিয়াছেন। উত্তর কলিকাতার এইরূপ একখানা বোর্ডিং বাড়ীতে ঠাকুরদাস ম্যানেজারের পদে বহাল হইয়া আসিল। চাকুরী সে আবার পাইল, কিন্তু মাসাধিক কালও রাখিতে পারিল না।

আহার ও বাসস্থানের খোঁজে যাহারা আসিতে লাগিল, ঠাকুরদাস তাহাদের কাছে কিছুই গোপন না করিয়া কি খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে সবই খুলিয়া বলিল। যাহারা খোঁজ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রথমটা ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু উপায়ান্তর আর নাই ভাবিয়া সেই ব্যবস্থাই মানিয়া লইল। কেহ কেহ আবার সরিয়াও পড়িল। ক্ষতি কিছুই হইল না। মেম্বারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ীতেই লাগিল। তবু কথাটা—মালিকের কাণে উঠিল। কাণে গিয়া অন্তরে জ্বালা ধরাইয়া দিল।

সন্ধ্যায় ঠাকুরদাস হিসাব-নিকাশের খাতা দেখিতেছিল। বোর্ডিং-এর ভোলা চাকর আসিয়া বলিল, ম্যানেজার বাবু, বাবু ডেকেছেন।

উঠিয়া গিয়া ঠাকুরদাস মালিকের সমীপে দাঁড়াইতেই তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদাসকে একবার দেখিয়া লইলেন। পরমুহূর্ত্তে দৃঢ় ও ভারী গলায় বলিয়া উঠিলেন: আপনাকে আমি মাইনে দিয়ে রেখেছি কি আমার কেচ্ছা গাওয়ার জন্যে? খাওয়া খারাপ। দু'বেলা ডাল হয় না; ঝোলে ডুব দিয়ে মাছের টুক্‌রো খুঁজে নিতে হয়—এ কথাগুলো কে আপনাকে ব'ল্‌তে ব'লে দিয়েছে? এই নিন্ আপনার মাইনে, কাল থেকে আপনার এখানে চাকুরী নেই।

ঠাকুরদাস বলিল, মিথ্যা বলেছি কি? আমি ওটা আগে না বললেও তারা পরে জানতে পারতো। তাতে আরও খারাপ হ'ত। দু'টো গালাগালি, দু'টো অপমানের কথা।

দুই ওষ্ঠের মধ্যে পাইপটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, বেশ, আর একটি কথাও না। এবার পথ দেখুন।

ঠাকুরদাসও তেমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সব কিছু চুকাইয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বোর্ডিং ছাড়িয়া দিল। হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া একটা নির্জ্জন জায়গায় সে ভাবিতে বসিল। ছয়মাস পর যা হোক একটা কাজ জুটিয়াছিল, তাহাও থাকিল না। কিন্তু সেই বা কি করিবে! সংসারে থাকিয়া সংসারের মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আর পাঁচজনের হইতে তাহার এই এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন

প্রকৃতি কি করিয়া গড়িয়া উঠিল তাহাই সে বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল। জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় সে দেখিয়াছে সংসারের বাস্তব রূপ। তবু কেন সে সেই সত্যটা স্বীকার করিতেছে না, মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না! ভবিষ্যতের ভাবনা আছে, তাহার জীবনের আরও প্রয়োজন আছে অথচ সে জীবনের এমনই একটা পথ বাহিয়া চলিয়াছে, যাহা সংসারে কাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত নয়। এমনই একটা চিন্তার ধারা বাহিয়া ঠাকুরদাস কত কি ভাবিল।

পরদিন সে ফটকা অপিস অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইল। বড় বড় মাড়োয়ারীর সেখানে সমাগম হয়। তাহাদের ধরিয়া যদি তাহার কোন একটা উপায় হয় এই কুহকে পড়িয়া সে সারাদিন সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল। বৈকালের দিকে সুযোগ বুঝিয়া সে জনৈক মাড়োয়ারীকে তাহার আরজী জানাইল। সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঠাকুরদাসের সুন্দর চেহারার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে তিনি ঠাকুরদাসকে বলিলেন, আপনার উচ্চ শিক্ষা আছে। সুন্দর চেহারা আছে। কিন্তু কেবল উচ্চ শিক্ষালাভে সংসারে আজকাল কিছুই করিতে পারা যাইবে না। উচ্চ শিক্ষার সহিত আপনার উপযুক্ত বুদ্ধির সমাবেশ চাই। এই বলিয়া তিনি এক অভিনব ব্যবসায়ের ইঙ্গিত করিলেন। এ্যাম্পুলের (ampull) ভিতর ঔষধের পরিবর্ত্তে নিছক গঙ্গিকার জল ভরিয়া উহাই ঐ ঔষধের নামে বড় বড় ঔষধের দোকানে বিক্রয়ার্থে চালাইতে হইবে। তাহার নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারখানা আছে। ঠাকুরদাস সহযোগী হইতে রাজী হইলে কালই সে এই ব্যবসায়ে নামিতে পারে। স্তম্ভিত ঠাকুরদাস সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

তারপর কত দিন কাটিয়া গেল। ঠাকুরদাস আরও কয়েক জায়গায় কাজ পাইল। কাজ পাইয়া আবার কাজ ছাড়িল। তারপর চাকুরী ছাড়িয়া সে কয়েকটা ছোট রকমের ব্যবসা আরম্ভ করিল। যাহাদিগের সহিত সহযোগিতায় সে ব্যবসা করিতেছিল তাহারা কিছু দিনের মধ্যেই তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া প্রমাদ গুণিল। অন্তরে বাহিরে এমন খাঁটী ও ভাল মানুষের সাহচর্য্যে ব্যবসায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি বুঝিয়া তাহারা সরিয়া পড়িল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে গিয়াও ঠাকুরদাস অনেকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া ফেলিল। অনেক দিন অনেক রকম করিয়া যতটুকু সফলতা সে পাইল তাহা একটা সংসারের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভীষণ জীবনসংগ্রামের সম্মুখে সে ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে দেখিল একটি বালক ফেরিওয়ালাও এই বয়সে আজিকার যুগের মানুষের মত চলিতে শিখিয়াছে। সুবিধামত কথা বলে, দুনিয়াদারী জানে। একদিন এক ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ভদ্রলোক অনেক দিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন, এখন গেঞ্জীর ব্যবসায়ী। তিনি ঠাকুরদাসকে বলিলেন, জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিন মশায়। যুগান্তরে রূপান্তর —এ অমোঘ বাণী।

ঠাকুরদাস এই ইঙ্গিত, এই নির্দ্দেশ আজ নূতন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে মনের একটা গভীর প্রদেশে গিয়া দাঁড়াইল। একখানা কথা দশখানা হইয়া তাহার হৃদয়ের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া দিতে লাগিল। আজ তাহার মনে হইল সমস্ত সংসারটাই যাহা নয় তাহারই বিরাট অভিনয়। নেতাদের আগড়ুম-বাগড়ুম, আন্তর্জ্জাতিক উদাত্ত আহ্বান—এর তাৎপর্য্য কোথায়!

ভাবিতে ভাবিতে সে ঘরে ফিরিল। পিতা ও মাতার মরণের পর হইতে তাহার সংসারের অবস্থা দ্রুত খারাপ হইতে চলিয়াছে।— স্ত্রী মণিকা নিস্তব্ধ, যেন পাষাণ মূর্ত্তি। আজকাল সে আর কোনই উপদেশ নির্দ্দেশ করে না। তাহার দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক—যেন সে অহরহ কি একটা ভয়ের বস্তু দেখিতেছে।

স্বামী-স্ত্রীতে কয়দিন কোন কথা-বার্ত্তা ছিল না। —ঠাকুরদাস সমস্ত দিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রির অন্ধকারে ঘরে ফিরে, তারপর দুইটী খাইয়াই শুইয়া পড়ে। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। আজ তিন দিন সে কোথাও বাহির হয় নাই। ঘরে শুইয়া পড়িয়া নিরন্তর ভাবিতেছে। অতীত ও ভবিষ্যতকে সে জীবনে এমন করিয়া আর কখনও ভাবে নাই। সব চাইতে তাহার বেশী দুঃখ হইতেছিল মণিকার মুখের দিকে

তাকাইয়া। দিন দিন একি হইতে চলিয়াছে! কথায় কথায় মতভেদ, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে বাঁধার সৃষ্টি; এত দিন এও ভাল ছিল, কিন্তু আজ যাহা হইতে চলিয়াছে তাহা কলহ নহে, সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন রূপ। একে ত অভাব অনটনের সংসারে দুর্দ্দশার শেষ নাই, তারপর মণিকা তাহার অতি নিকটে থাকিয়াও বহু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে নিদারুণ দুঃখে, মনস্তাপে সে নির্জ্জীবের মত বিছানার এক ধারে পড়িয়া ছিল।

এই কয়দিন স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মণিকাও অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছিল। আজ সে আর নিশ্চুপ হইয়া থাকিতে পারিল না। ঠারকুরদাসের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহার গায়ে একখানা হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, কি দিনরাত ভাবছ?

ঠাকুরদাস ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া অত্যন্ত অপরাধীর মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের দুই কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মণিকা আঁচলের এক-প্রান্তে তাহা মুছাইয়া দিল।

ঘর নিস্তব্ধ। তখন বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিতেছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের শব্দের সঙ্গে বায়ুর স্বননে ঠাকুরদাসের ব্যথিত, ক্ষুধিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গভীরভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন ডাক দিয়া বারংবার দৃঢ়স্বরে তাহাকে বলিয়া দিতে লাগিল—ঠাকুরদাস, তুই অতি নির্ব্বোধ, অকেজো, অপদার্থ। মিছামিছি তুই পরাজয় মানিয়া নিলি। তোর অপিসের বড় সাহেব বোর্ডিং এর মালিক, মারোয়াড়ী ভদ্রলোক কিসের অপরাধী!

ঠাকুরদাস কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে! সেদিন বৈশাখের সংক্রান্তি। সারা দিন ঘন বৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। অপরাহ্নের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে ঠাকুরদাস উদ্‌ভ্রান্তের মত বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রাজপথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সে ফিরিল না। পরের দিন মধ্যাহ্নেও সে আহার করিতে বাড়ী আসিল না।

আর মণিকা! সে সমস্ত দিন না খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখমুখ ফুলাইয়া মিছামিছি এঘর ওঘর করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইল, সে বাড়ীতে দীপ জ্বালিল না। শাঁখের ধ্বনির ভিতর দিয়া আজ সে আর সংসারিক মঙ্গল-ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লইল না।

বর্ষার সেই মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ন বেলায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া দীর্ঘদিন পর চিন্তায় ভাবনায় দিশেহারা হইয়া ঠাকুরদাস তাহার ভূতপূর্ব্ব অপিসের বড় সাহেবের বাড়ী দেখা করিতে গেল। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। বড় সাহেব তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন। তারপর একটা মাস সে পথ হাঁটিতেছে। সে চলিয়াছিল টাটা-নগরের পথে। মধ্যে এক গৃহস্থবাড়ীতে ছেলে পড়াইয়া সে কিছুদিন কাটাইল। তারপর ধানবাদে আসিয়া ষ্টেশনের রেষ্টুরেণ্টে আবার সে কাজ নিল। কিন্তু কোন কাজই আজকাল সে মন লাগাইয়া করিতে পারে না। যখন-তখন মনটার ভিতর হু হু করিয়া ওঠে। কর্ম্মব্যস্ত থাকিয়াই সে ঘন ঘন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। কর্ম্ম-কর্ত্তা একদিন রীতিমত রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সামান্য কিছু পাথেয় সে যাহা আনিয়াছিল, তাহাও এতদিনে ফুরাইয়া আসিয়াছিল। দীর্ঘদিনের অনশনে, অর্দ্ধাশনে এখন যেমন তাহার চেহারা হইয়াছে, তেমনই মলিন তাহার পরিচ্ছদ, তেমনই সব। দুর্ব্বল, ভগ্নদেহ, অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক। তাহার ক্লান্ত, অবসন্ন চরণদুইটিকে আবার সে পরিচালিত করিল তাহার গন্তব্য স্থান টাটানগরের পথে। কয়েকটা দিন সে পথ চলিল। কিন্তু যাওয়া বুঝি আর তাহার হয় না। তাহার পা দুইটি নিরন্তর তাহাকে নালিশ জানাইয়া ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল—যেন কত সহস্র বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে তবু চলিয়াছে। কতদিন, যেন কত যুগযুগান্তর সে তাহার নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইতে পায় নাই। কেহ তাহাকে ভালবাসিয়া দুটো কথা বলে নাই, কাছে বসাইয়া খাওয়ায় নাই।

চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন এক সময়ে এক স্থানে বসিয়া পড়িয়া ঠাকুরদাস অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—একি পাগলামী আমাকে পাইয়া বসিয়াছে! কি করিয়া মণিকার দিন কাটিতেছে, কে তাহার সংসার দেখিতেছে, এ কথা কি আমার এতদিনও ভাবিতে বাকী আছে!…

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনশ্চক্ষে তাহার ঘর-বাড়ী, এই এতদিন ধরিয়া জীবনের অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার পথ চলা, এক দুরন্ত বর্ষার অপরাহ্নে তাহার গৃহত্যাগের কথা—এই সমস্ত ছবির মত সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ঠাকুরদাস ভাবিল, তাহার এই তুচ্ছ অপদার্থ জীবন, দীনহীন চেহারা বিশ্বের মানুষের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা নাই। লজ্জা কেবল তাহার স্ত্রীর কাছে—যে তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

সমস্ত দিন অস্নাত, অভুক্ত ঠাকুরদাস পরমুহূর্ত্তেই পথ-ঘাট, মাঠ ভাঙ্গিয়া, পথগামী মানুষকে ধাক্কা মারিয়া ধুলি উড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

পরদিন প্রত্যুষে সূর্য্যদেব তখন সবেমাত্র স্বচ্ছ পূর্ব্বাকাশে তাহার রক্তমুখখানি বাহির করিয়াছেন, ঠাকুরদাস ধূলিধূসরিত পদে, রুক্ষ, দীন, মলিন চেহারায় ব্যস্তসমস্ত ভাবে একেবারে তাহার বাটীর বাহির-ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত হানিয়া সে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—মণিকা! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সে, মণিকা নয়, নূতন এক ভাড়াটীয়া। কয়দিন জ্বরে ভুগিয়া, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মণিকা মূর্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং কয়েকজন প্রতিবেশী মিলিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। ঠাকুরদাস ইহার বেশী আর কিছু জানিতে পারে না। তখনও তাহার গতকালের স্বপ্নাচ্ছন্ন মনের ঘোর কাটে নাই, তৃষিত, ক্ষুধিত হৃদয়ের আবেগ, আকুতি মন্দীভূত হয় নাই। সে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িল।

পুস্তক ও আলোচনা

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা: শ্রীমদন মোহন কুমার: দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রাপ্তিস্থান: দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিঃ ও বেঙ্গল পাবলিশার্স: পৃষ্ঠা ৩৫৭, মূল্য সাড়ে চার টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোকসম্পাত করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রকাশ-ভঙ্গি সাবলীল, বিচার-শক্তি সূক্ষ্ম ও নিপুণ। যে সহৃদয়তা বা সহানুভূতি যথার্থ সমালোচকের একটি প্রধান গুণ, লেখক তাঁহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে সেই সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিভিন্ন ধারায় বাংলা সাহিত্য প্রবাহিত হইয়াছে, এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই উহাদের সম্পর্কে পাঠকগণের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থখানি শুধু ছাত্রগণের পক্ষেই সুখপাঠ্য নহে, সাহিত্য-রসিকমাত্রের কাছেই উপভোগ্য।

তথাপি, গ্রন্থখানির দুই একটি স্থানে আমরা সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি, ঐগুলি না থাকিলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। পুস্তকখানির ১২৩ পৃষ্ঠায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যদর্পণ রচনা করিয়াছেন আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য এবং 'সারার্থদর্শিনী' নামক প্রসিদ্ধ টীকার রচয়িতা। দুই এক স্থানে অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থখানিতে ভাষাগত ত্রুটিও রহিয়া গিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের ১৩০ পৃষ্ঠায় অষ্টম হইতে অষ্টাদশ পংক্তি পর্য্যন্ত দীর্ঘ বাক্যটিতে 'এবং' শব্দের প্রাচুর্য্য যে বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তাহা লেখকও স্বীকার করিবেন। 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লেখক বলিতেছেন—'কামুকতার এতখানি বাড়াবাড়ি কখনও চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে সম্ভব হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।' এখানে কিন্তু লেখকের প্রকাশ-ভঙ্গি সুষ্ঠু বা শোভন হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে গ্রন্থখানি এই ধরণের দোষ-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবে। যাহা হউক, 'বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা যে বাংলার সমালোচনা-সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

স্বাধীনতায় মহাজীবন: রবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

স্বাধীনতা-যজ্ঞে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যে সমস্ত মহাপ্রাণ মনীষী ভারতকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে লইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত। মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা রামমোহন রায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। বাংলার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাহাতে স্বাধীনতার সৈনিকদের অমর জীবনেতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লেখক সহজ ও সাবলীল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শিশুমনস্তত্ত্ববিদ হিসাবে শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, শিশুদের প্রতি অকুণ্ঠ দরদই তাঁহাকে এই জাতীয় শিশু-উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থাধ্যয়নের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগের শিশু একদিন হয়ত আগামী যুগের রাষ্ট্রনায়ক হইয়া উঠিবে। 'স্বাধীনতায় মহাজীবন' জাতীয় গ্রন্থের সার্থকতা এইখানেই।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় শাসনতন্ত্র ও সংশোধন

ভারতীয় পার্লেমেণ্টের গত দীর্ঘতম অধিবেশনে ভারতের শাসনতন্ত্রের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে অনেকে মনে করেন—ব্যক্তি স্বাধীনতা, বক্তৃতা দিবার স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইয়াছে, আবার অনেকে মনে করেন শাসনতন্ত্র আরও পুষ্ট করা হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য উহার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। চারি বৎসরের চেষ্টায় সুরচিত শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান পার্লেমেণ্টের আছে কিনা, পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা ছিল কিনা, কি কারণে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, এই পরিবর্ত্তনে বাস্তবিকই ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে কিনা, এবং ইহার ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে—এই সব বিষয়ে আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে সামান্য আলোচনা করিতে চাই।

পরিবর্ত্তনের বৈধতা

এখন দেখা যাউক, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন যাহা সাধিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত কিনা। শাসন তন্ত্রের—

৩৭৯ (১) ধারায় আছে—পার্লেমেণ্টের উভয় ব্যবস্থাপক সভা (Houses) গঠিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব গণপরিষদই অস্থায়ী পার্লেমেণ্টের কাজ করিবে এবং শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

উভয় হাউস এখনও গঠিত হয় নাই, সুতরাং বিধিমতে পার্লেমেণ্টের কর্ত্তৃত্বই এখন স্বীকার্য্য।

কিন্তু বর্ত্তমান পার্লেমেণ্ট অস্থায়ী ব্যবস্থাপক সভা মাত্র। অস্থায়ী সভার শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আছে কিনা, উহা বিশেষ সন্দেহের কথা। বিশেষজ্ঞ অনেকে মনে করেন, অস্থায়ী পার্লেমেণ্টের সেরূপ ক্ষমতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ ধারায় আছে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হইলে পার্লেমেণ্টের উভয় হাউসেই বিলটি উপস্থিত বা পেশ করিতে হইবে। কথাটি আছে 'may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament.

only কথাটি বিবেচনা করা উচিত।

এখন পর্য্যন্ত উভয় হাউস গঠিত হয় নাই। সুতরাং অস্থায়ী পার্লেমেণ্টে শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার অধিকারী হইলেও উভয় হাউস গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সংশোধন করিতে পারেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এবিষয়ে Supreme Court-এর মতামত পাওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসীর সন্দেহ থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৯২ ধারায় আছে প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে অদলবদলের (Adaptations) সম্মতি দিতে পারেন।

সম্মতি দিতে পারিলেও, এই ক্ষেত্রে পারেন কিনা সন্দেহ, কারণ তাহা হইলে তিনি তো সব সময়েই শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে আর গণ-পরিষদ বা গণতন্ত্রের অর্থ কিছু থাকে না। এরূপ একতন্ত্রতা বাঞ্ছনীয়ও নয়—বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যখন ভিন্নরূপ বিধির নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

চতুর্থতঃ, ১৩ (২) ধারায় স্পষ্ট রহিয়াছে যে, কোন State এমন কোন আইন করিবেনা যাহাতে কাহারও ক্ষমতা (Rights) ব্যাহত হইতে পারে।

১২ ধারায় আছে—এই ক্ষেত্রে State বলিতে ভারতের গভর্ণমেণ্ট এবং Parliamentকেও বুঝায়। সুতরাং

Parliament কাহারও (Rights) অধিকার ব্যাহত করিয়া কোন আইন করিলে তাহা বিধিসঙ্গত হইবে না।

অতএব পার্লেমেণ্ট যে শাসনতন্ত্র এবার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ২৪৫ (১) ধারায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, পার্লেমেণ্ট আইন করিতে পারে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রে মূল বজায় রাখিয়া (Subject to the Provisions of the Constitution) করিতে হইবে।

অতএব উপরোক্ত ধারাগুলি সম্যক আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীতি হয় যে, উভয় হাউস গঠিত হয় নাই এবং পার্লেমেণ্ট অস্থায়ী, বিশেষতঃ লোকের অধিকার ব্যাহত করিয়া আইন করিবার এই সময়ে অধিকার পায় নাই, তাই সংবিধানের পরিবর্ত্তন আইনসঙ্গত হয় নাই। তবে ভোটের জোরে সবই হইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও পণ্ডিত জওহরলাল যখন ২২০ : ২৮ ভোটের ক্ষমতার অধিকারী, তখন তিনি শাসনতন্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয়গুলি গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে আমরা Supreme Court-এর নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পরিবর্ত্তনের কি আবশ্যকতা ছিল ?

এখন দেখা যাউক, এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইবার কি আবশ্যকতা ছিল! গত ১৯৫০ জানুয়ারী মাসে শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে, এইতো সবে ষোল সতেরো মাস, কিন্তু এত শীঘ্র হওয়ার কিছু প্রয়োজনীয়তা ছিল কি? পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন আবশ্যক হইলে ষোল মাস কেন, ষোল দিনেও পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যাইতে পারে বটে, কিন্তু এত শীঘ্র শীঘ্র হইলে অস্থিরতা এবং আইনকর্ত্তাদের চিন্তাশীলতার অভাবই প্রমাণিত হয়। যদি চারি বৎসরে বিষয়টি স্থির না হইয়া থাকে, তবে কেবল ডাঃ আম্বেদকারের ব্যাখ্যায় অল্প কয়দিন মধ্যে গ্রহণ করায়ও বিপদ আছে।

বিলাতের পার্লেমেণ্টে শাসনতন্ত্র বলিয়া কোন আলাদা আইন নাই। আমেরিকায় আছে, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা তৈয়ার হইয়াছিল। আমাদের শাসনতন্ত্র আমেরিকার শাসনতন্ত্র ভিত্তি করিয়াই তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু আমেরিকারও সাড়ে তিন বৎসরের পূর্ব্বে কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় নাই। যাহা হউক, ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচন শেষ হইবে। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লেমেণ্টের দুইটি হাউস গঠিত হইবে, তখন আইন প্রণয়নে কোন বাধাই থাকিবে না। তথাপি ছয় মাস অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য না থাকিবার কারণ কিছুই বুঝা গেলে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, কয়েকটি মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট, মান্দ্রাজ হাই-কোর্ট এবং পাটনা হাই-কোর্টের এমন বিরোধীয় রায় হইয়াছে যে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন না করিলে আর চলে না। জমিদারদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে,"তাহাদিগের জমিদারী সত্ত্ব লোপ করিবার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। কিন্তু বিষয়টি সহজ নয়, কারণ সংবিধানের ৩১ ধারায় আছে, "আইনের ক্ষমতার সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। No person shall be deprived of his property save by authority of law. এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় হইয়াছে জমিদারী স্বত্ব লোপ করা যাইবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলাফল খর্ব্ব করা আরও ছয় মাস পরে সহজে হইতে পারে। এত তাড়াতাড়ির কোন আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ জমিদাররা এমন ঘৃণ্য এবং মহাপরাধী জীব নয় যে তাহাদের স্বত্ব লোপ ছয় মাস কি এক বৎসর পরে করিলেই ভারতের শাসনতন্ত্র একেবারে বিকল হইয়া যাইবে। বরং এই সময়ে অসংখ্য প্রজাদিগকে খাদ্য এবং বস্ত্রাদির দ্বারা সাহায্য করিতে ঐরকম এক শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা বিশেষ আবশ্যক। আর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিয়াই এত হঠাৎ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। পণ্ডিত জওহরলাল কি সহস্র এমন কি লক্ষবার বলেন নাই যে, আমরা স্বাধীনতা পাইলে লোকদিগকে অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থানের সুবিধা সর্ব্বাগ্রে করিয়া দিব এবং চোরাকারবারিদিগকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইব? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় সহস্র হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি তো-জোর গলায়ই এই কথা

বলিয়াছিলেন। কই, কোনো সমাধান করিতে পারিয়াছেন কি? অবশ্য তিনি বলিবেন—অনেক কারণ থাকিতে পারে। হয় নাই তো ঠিকই। আর না হওয়াতে দেশবাসীর যাহা লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের শেষ, সেইরূপ তো এই ক্ষেত্রে কিছুই হইবে না। সুতরাং উক্ত কারণ আমাদের কাছে সমীচীন কারণ বলিয়াই মনে হয় না। দ্বিতীয় কারণ, পণ্ডিতজী বলেন, পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ যাহাতে তিক্ত ও ক্ষতিকর না হয় তজ্জন্য সংবিধানের কোন কোন অংশ সংশোধনের আবশ্যক। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ইহাতে এদিকে আমেরিকার তোষণমূলক মনোভাব প্রতীতি হয়। যাহা হউক, এই বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

মুখ্য কারণ সম্বন্ধে বিরোধীয়গণ বলেন, নির্ব্বাচন আসিয়াছে, যাহাতে পণ্ডিতজীর অনুরক্ত বা মনোনীত ব্যক্তিগণের নির্ব্বাচনে সুবিধা হইতে পারে, তজ্জন্য সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করা হইতেছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বক্তৃতার ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় অন্য কারণ যখন প্রবল নয়, আসন্ন নির্ব্বাচন-সংগ্রাম যখন কর্ত্তাদের মনে বিশেষ ভাবনা চিন্তার উদ্রেক করিতেছে, তখন এই কারণটিকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। যাহা হউক, এ বিষয়েও একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

কি কারণে পরিবর্ত্তন হইতেছে?

সংশোধিত ১১৯ ধারায় আছে—প্রত্যেক ভারতবাসীর বাক্-স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু আবার ইহাও আছে যে, কাহারও মানহানিকর কুৎসা করা হইবে না অথবা যাহাতে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় বা ধ্বংসের কারণ হয়, এমন কিছু করা হইবে না। করিলে দণ্ডবিধি আইন অথবা চালু আইনগুলি কার্য্যকরী হইবে। বেশ ভাল কথা, স্বাধীনচিত্ততার সঙ্গে অন্যের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্বও আছে। এবং সেই দায়িত্ব সম্পাদন করিতে প্রচলিত আইন প্রয়োগ হইলে কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই।

কিন্তু সংবিধানে যদিও ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য বুঝাইতে গিয়া শাসনতন্ত্র নির্দ্দেশ দিতেছে যে, উহার পরিপন্থী আইনগুলি বাতিল হইয়া গেল:

13 (1) All laws in force in the territorry of India immediately before the commencement of this Constitution in so far as they are in consistent with the provisions of this part shall to the best of the contravention be void.

আর এই সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা-হানিকর কোন নূতন আইন রচিত হইলে তাহা বাতিল হইবে—

শাসনতন্ত্রের এই উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে (vide Schedule 19) যে পার্লেমেণ্ট বা State আইনও করিতে পারিবে এবং যে সমস্ত আইন নামে রহিয়াছে, সেগুলিকে পূর্ব্ব সময়াবধি (retrospective effect) কার্য্যকরী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ইহার অর্থ এই, ১৯৫০ ১লা জানুয়ারী যে সমস্ত আইনগুলি আমাদের মৌলিক অধিকার বলে নাকচ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, ১৯৫১ জুন মাসে সেগুলিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হইল। প্রধানতঃ সেই আইনগুলি এই—

Press Emergency Powers Act 1931
The Public Safety Laws.

এই আইনগুলি এমন মারাত্মক যে, ইংরাজরাজ যদি ইহা পুনশ্চ প্রবর্ত্তন করিত, তবে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেসনে আপত্তি জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চাহেন, তাই হইয়া গেল। এ বিষয়ে সংবাদপত্র সঙ্ঘের সভাপতি দেশবন্ধু গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেন, সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে না। প্রয়োগ হইবে না কথাটি ছেলেভুলানো মাত্র। প্রয়োগ না হইলে প্রচলিত করিবার অর্থই হয় না। আর ভবিষ্যৎ স্তোকবাক্যেরও কোন অর্থই হয় না। ইহার বলে স্বরাজ্য-মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী যদি কয়েকজন সংবাদপত্র-

সম্পাদককে অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন বা মোটা রকমের জামিন চাহেন, তবে কি পণ্ডিতজী না বলিতে পারিবেন? পুনশ্চ জওহরলাল বলেন, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা ব্যাহত হয়, এরূপভাবে কেহ লিখিতে পারিবেন না। ভাল, কোন লেখায় যদি এমন কিছু যুদ্ধোদ্যোতক ব্যাপার থাকে, তবে তার জন্য তো দণ্ডবিধি আইনে পুরোপুরি ব্যবস্থাই রহিয়াছে। আবার ব্যক্তিস্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী এরূপ আইন প্রচলন করিবার এবং জিয়াইবার আবশ্যক কি, আমরা বুঝিতে পারি না। এখন জিজ্ঞাস্য, যাহারা সকলে ভোট দিয়া স্বাধীনতা হরণকারী অস্ত্রগুলি প্রয়োগের সহায়তা করিল, তাহারা কি বাস্তবিকই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি? আগামী সংগ্রামে উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া, মারামারি ধরাধরি না করিয়া দেশবাসীকে তাহাদের স্বত্ব এবং স্বাধিকার সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেওয়া এবং এই সব প্রতিনিধিগণ যে কেবল ধামাধরা পুত্তলিকা মাত্র, দেশ হিতৈষীগণের সকলকে তাহা অবহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব।

কাশ্মীর সমস্যা

সকলেই অবগত আছেন, উনো (United Nations) কাশ্মীর সম্বন্ধে মিঃ ডিক্সনের রিপোর্ট বাতিল করিয়া মিঃ গ্রাহামকে পাঠাইতেছেন! এবং অল্প কয়েকদিন মধ্যে মিঃ গ্রাহাম আসিয়া ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এ সম্বন্ধে পাকিস্থান সাক্ষীপ্রমাণ উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু ভারতের মুখ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্থির করিয়াছেন—তিনি আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। তবে মিঃ গ্রাহাম ভদ্রলোক, আগন্তুক, তাঁহাকে সেই সম্মান দিবেন এবং কথাবার্ত্তাও বলিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্টই বলিয়াছেন—কাশ্মীর সম্বন্ধে কোনরূপ নষ্টামি আর আমরা সহ্য করিব না। We are dead clear that we will tolerate no non-sense about Kashmir, come what may. পণ্ডিত নেহরু বলেন—ইঙ্গমার্কিণের ষড়যন্ত্রের ফলেই গ্রাহাম আসিতেছেন, নতুবা কথাবার্ত্তাতে ডিক্সনের সঙ্গে সবই হইয়া গিয়াছে। আমাদেরও মনে হয় পণ্ডিতজীর কথাই ঠিক। তিনি অনেক বিষয় ছাড়িতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ডিকসন যে পাকিস্থানকে আক্রমণকারী বলিয়াছেন, এ কথা পাকিস্থান এবং পাকিস্থানের পৃষ্ঠপোষক এঙ্গলো-আমেরিকার মনঃপূত হইতেছে না। পাকিস্থান যে আক্রমণকারী তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হইলেও এঙ্গলো-আমেরিকার এই পক্ষপাতিতায় পণ্ডিতজী এবার যে জবাব দিয়াছেন, আমরা এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আকিঞ্চন করি—পূর্ব্ব পাকিস্থান সম্বন্ধে other methods বলিবার পরেই যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবারেও শেষাশেষি এই অটল ভাব আবার না টলিয়া যায়।

পণ্ডিতজীর উনোর নিরাপত্তা পরিষদে এঙ্গলো-মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে যাওয়াতেই নিজের স্কন্ধে আপদ ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। আর পণ্ডিতজী এই ভুল করেন, যখন জয় একেবারে সুনিশ্চিত ছিল। যাহা হউক, গত অনুশোচনায় ফল নাই। সম্প্রতি পণ্ডিতজী দুইটি বিষয় সম্পাদন করিলেই সমীচীন কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথম, গ্রাহাম আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন আলোচনাই যেন না করেন। এ সম্বন্ধে লর্ড সাইমন (তখন স্যার জন সাইমন) যখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর (১৯২৮) সঙ্গে দেখা করেন, তখন তিনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "স্যার জন, আমি আপনার সঙ্গে সব বিষয়েই আলাপ করিব, কেবল রাজনীতি বিষয়ে নয়।" ভরষা করি, পণ্ডিত জওহরলালও এই বিষয়ে পিতার আদর্শ অনুসরণ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্থান যে সমস্ত স্থানের আক্রমণ ও বেদখলকারী, সেই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল কি করিবেন? আক্রমণকারীকে আত্মরক্ষার জন্য জোর করিয়া নিজ দখলী স্থান হইতে অপসারিত করিলে যুদ্ধ ঘোষণা হয় না। কিন্তু পণ্ডিতজী কি তাহা করিবেন? এদিকে পাকিস্থান তো জেহাদ ঘোষণা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই রহিয়াছে। স্যার জাফরুল্লা ইতিমধ্যেই

other methods এবং শ্রীআলম স্পষ্টই জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের তৃতীয় কথা, কোন কারণেই যেন কাশ্মীরের গণ-পরিষদের কার্য্য বন্ধ না হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতজীর কথায় যেন একটু দ্ব্যর্থকতা রহিয়াছে। ভরষা করি, স্পষ্ট ও ধীরভাবে তিনি গণপরিষদের কার্য্য চালাইবার পথে যেন কোন বাধা না দেন—এরূপ মত প্রকাশ করিবেন।

রঙ্গমঞ্চ-বিশ্বকোষে ভারতের সম্মান

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এবং প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলির মারফত অবগত হইলাম যে, রোম হইতে যে রঙ্গমঞ্চের বিশ্বকোষ প্রস্তুত হইতেছে, তদুদ্দেশে ভারতের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ভারতের ইতিহাস তৈয়ার করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চ-বিশেষজ্ঞ জনৈক ঐতিহাসিকের উপর ভারার্পিত হইয়াছে। ইটালী হইতে যোগ্য লোক ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের সহায়তা চাওয়া হইয়াছিল এবং তত্রস্থ মিডলাণ্ড নিউস্ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্টই উক্ত ঐতিহাসিককে "ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ" অভিনন্দনে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, উক্ত ঐতিহাসিক নিয়োজিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া কাগজ পত্র পাঠাইবার পরে ইটালী হইতে রঙ্গমঞ্চ সংশ্লিষ্ট ভারতের যাবতীয় ব্যক্তি এবং বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আবার দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ভারত সম্বন্ধে উক্ত ঐতিহাসিক যাহা কিছু লিখিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে—তাঁহারা সসম্ভ্রমে অবগত করাইয়াছেন। ভরষা করি, এ বিষয়ে সমগ্র দেশবাসী উক্ত ঐতিহাসিকের সহিত সহযোগিতা করিবেন। কোন্ ব্যক্তিকে এই সম্মান দেওয়া হইল, তাহা এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় নয়। আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় এই যে, বিশ্বসাহিত্য ও নাট্যশালার বিশ্বকোষে ভারতের নাটক এবং নাট্যশালার গৌরব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে জগতের কোন জাতিই ভারতের সমকক্ষ নয়। প্রাচীন ভারতের ন্যায় গ্রীস এবং রোমেও একসময়ে নাট্যশালা এবং নাটক ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নয়। ইস্‌কাইলাস্, সফোক্লিস, ইউরিপিডিসের ন্যায় ভরত, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, শ্রীহর্ষের দান জগতে প্রচারিত। অশোকের সময়ের নাট্যশালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজমীরে এখনও নাটক শিলালিপিতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু গ্রীস এবং ভারতের উভয় স্থানেই নাট্যকলার গতি অতঃপরে স্থগিত হইয়া যায়। গ্রীস আর সে উন্নতির পথে মাথা খাড়া করিতে পারে না। কিন্তু ভারত আবার নাট্যশালা পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হয় এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে নাট্যশালার বিশিষ্ট অবদান যে ভারতের সংস্কৃতি ও জাতীয়তার ইতিহাসে অসামান্য, তাহা প্রমানিত হইয়াছে। অধিক কি, এই ছায়াচিত্রের যুগেও নাট্যশালা অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরন্তু পুরাতন বাদ দিলেও এমন সব নব নব উৎসাহশীল নাট্যানুরাগী যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ সমাসীন হইয়াছেন, তাহাতে নাট্যশালার ভবিষ্যৎ গতি এবং উন্নতি সম্বন্ধে সকলেই আশান্বিত।

নাট্যশালা কেবল আমোদ নিকেতন নয়, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, জাতীয়তা প্রভৃতি শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্রস্থল। সোভিয়েট রুশিয়া কুড়িবৎসরে জাতি-জাগরণে রঙ্গমঞ্চের যেরূপ সহায়তা পাইয়াছে, দুঃখ দৈন্য অনাহারক্লিষ্ট ভারতেরও সেইরূপ সহায়তার প্রয়োজন হইয়াছে। একমাত্র ভারতীয় রঙ্গমঞ্চই যে সেই সুযোগ এবং সুবিধা প্রদান করিতে পারে, সমগ্র ভারতবাসীকে আমরা ভারতের এই দিক্‌টি সম্বন্ধে অবহিত হইতে আকিঞ্চন করি।

উপসংহারে ইটালির বিশ্বকোষ কর্তৃপক্ষ এবং ইংলণ্ডের সহায়কারী ব্যক্তিগণকে ভারতের যোগ্য সম্মান ঘোষণা করায় আমরা সসম্ভ্রমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি

দেশবন্ধু-স্মৃতি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে পঁচিশটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আবার সেই বেদনাময় ১৬ই জুন ফিরিয়া আসিয়াছে—১৯২৫ সালের সেই অশ্রুসিক্ত ১৬ই জুন। পরাধীন ভারতকে যিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের সৈনিকরূপে নতুন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া

তুলিয়াছিলেন, স্কুলে, আদালতে, এ্যাসেম্ব্লিতে যিনি নতুন 'রিফর্ম্ম'-এর সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ স্বরাজ-সংস্কারের অনির্ব্বাণ শিখাটি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, যিনি জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দরবেশী ভারতের ফকির-ব্রত গ্রহণ করিয়া একদিন দধিচীর ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—১৯২৫ সালের ১৬ই জুন ভারতের সেই মহান নেতা দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংয়ের শৈলভূমিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতিফলকে আজও কবিগুরুর অশ্রুসিক্ত বাণী প্রোজ্জ্বল হইয়া আছে—

'এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।'

মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি দেশের মাটিতে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অমর আত্মার প্রাণদায়িনী অমৃত। রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্ত্তনে কংগ্রেসী কর্ম্মনীতি নানা পন্থার মধ্য দিয়া আজ যে অবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বহু ক্লেদ জমিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই; ইহার একটি কারণ বলা যায়—রাষ্ট্রনৈতিক মন্ত্রে কংগ্রেসী জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেশবন্ধুকে অস্বীকৃতি। অথচ তিনি যে রাজনৈতিক চেতনা দিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার উর্দ্ধেও বড় বেশী দূর আগাইয়া আসিতে পারিয়াছে কি কংগ্রেস?

জীবন এবং সাধনার মধ্যে দেশবন্ধুর কোথাও ফাঁক ছিল না। মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনে প্রাণে তিনি দেশের মাটিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহার পিছনে ছিল তাঁহার কবি-চিত্ত। দেশ তাঁহার কাছে ছিল মৃন্ময়ীস্বরূপে চিন্ময়ীরূপ। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনস্বপ্নের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার সব চাইতে বড় মিল ছিল। দেশবন্ধু চাহিয়াছিলেন মাতৃমন্ত্রে প্রেমের দ্বারা মানুষকে জয় করিতে। তিনি বলিলেন— 'সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। কিন্তু আমাদের ওজন করা প্রেম সে পথ খুঁজিয়া পায় নাই। যে প্রেম স্বার্থগন্ধদুষ্ট, তাহা কি প্রকারে কল্যাণের নিয়ামক হইবে! যে ব্যক্তি কেবল অবসর মত দেশকে ভালবাসিবার ভান করে, মায়ের কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য তাহার নাই। শুদ্ধ মনে সংযত চিত্তে প্রেমের বলে বলীয়ান হইয়া জননীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে মাকে ডাকিলে, মা কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন?'

আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখি— সেই শুদ্ধ মন ও সংযত চিত্তের অভাব। স্বার্থ-গন্ধদুষ্ট আবহাওয়া চারিদিকে। এই কারণে ইংরেজের নিকট হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াও আমরা স্বাধীনতার অমৃতস্বাদ হইতে বঞ্চিত। ইহার কারণ এই যে, মাতৃভূমিকে আশ্রয় করিয়া আমরা সেই মাকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে পারি নাই, তাঁহার দুয়ারে অর্ঘ্য সাজাইয়াছি বাহির হইতে।

আজিকার ১৬ই জুনের পবিত্র স্মৃতিবাসরে আমরা যেন সেই প্রেম, শ্রদ্ধা ও শুদ্ধাচারের মন্ত্রই নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে পারি— যে মন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে আমাদের সমষ্টিগত জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

দেশবন্ধুর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু বিজ্ঞানের রহস্যজালের মধ্যেই শুধু তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই,—সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার অনবদ্য দান রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজের মূল ব্যাধিকে উদ্ঘাটন করিয়া দরদী চিকিৎসকের মতই তিনি তাহার নিরাময় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাংলার চির উপেক্ষিত পল্লীসমাজকে জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙালীকে এক নব জীবনের পথে পরি-চালিত করিতে। সে জীবন হবে স্বাবলম্বনের পথে উন্নত, বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত নিয়মানুবর্ত্তীশীল। নিজের চিন্তাধারাকে তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তির সঙ্গে একত্রে যুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যুবক-ভারতের হৃদয়ে তাঁহার আসন ছিল সর্ব্বশীর্ষে। হিন্দুশাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা দ্বারা কুসংস্কারকে জয় করিয়া উঠিতে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন দেশকে। তাঁহার চিন্তাপ্রসূত নবতর বিজ্ঞান-রসে এক অমিয় মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি পাড়ি দিয়াছিলেন দুর্লঙ্ঘতাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অপরিহার্য্য।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই বলিয়াছেন—'...আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই—যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত ক'রেছেন কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে।—বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তাঁর চেয়ে গভীর প্রবেশ ক'রেছেন কত যুবকের মনোলোকে, ব্যক্ত ক'রেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান ক'রতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।...আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জড়াগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় ক'রবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন ক'রেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।'

প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মমুখর জীবন ইতিহাসের মধ্যেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই অমিয় বাক্যের সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে।

আজ তরুণ বাঙ্গালীর চিত্ত প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে কতখানি সচেতন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। শিক্ষিত বেকার ও চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালীকে ব্যবসায়মুখী করিয়াছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। সমাজের নানা সংস্কার ও সংস্কৃতিপূর্ণ কাজের মধ্যে তাঁহার দান ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার রচনা, বক্তৃতাবলী ও সাহিত্যের মধ্যে মনঃসংযোগ করিলেই আজিকার তরুণ বাঙ্গালী তাঁহার অমিয় কীর্ত্তির অমৃত-সাগরে অবগাহন করিবার অবকাশ পাইবেন। ১৬ই জুন আচার্য্যের তিরোধান-স্মৃতি দিবস। এই দিনে সকলে সমবেত হইয়া আচার্য্যের রচনা পাঠ ও তদনুযায়ী নিজদিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হইবে।

পরলোকে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সাহিত্যিক এস্, ওয়াজেদ আলী

গত ১০ই জুন রবিবার বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় বাংলার অন্যতম শক্তিমান সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ এস্. ওয়াজেদ আলী তাঁহার ৪৮ নং ঝাউতলা রোডস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়।

১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে মিঃ ওয়াজেদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবার ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত মৌলবী বিলায়েত আলী সাধুতা এবং ন্যায়পরায়নতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে মিঃ ওয়াজেদ আলীকে মক্তবে পাঠানো হয়, তৎপর গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তাঁহাকে আলীগড় এম্, এ, ও কলেজে প্রেরণ করা হয়। তিনি তথায় কৃতী ছাত্ররূপে খ্যাতি লাভ করেন এবং ১৯১০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি,এ ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতেও তিনি বি, এ ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৫ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত তিনি উক্তপদে বহাল থাকেন। বিচারক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

কিন্তু ইহা গেল তাঁহার শিক্ষালাভ ও চাকুরী জীবনের কথা। ইহার উর্দ্ধে ছিল তাঁহার মনীষা। অবসর মুহূর্ত্তে তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় রত থাকিতেন। সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি মানুষের কাছে বিশেষ ভাবে আত্ম-পরিচয় দিতেন। তিনি বলিতেন, 'সামাজিক বর্ণ হিসাবে আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমরা সাহিত্যিক. ইহাই আমাদের জাতি গত বা বর্ণ-গত পরিচয়।' এ কথা হইতেই তাঁহার উদার মনোভাবের

পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন তিনি তাঁহার জীবনে। তাঁহার রচিত 'জীবনের শিল্প,' 'ভবিষ্যতের বাঙালী,' 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা,' 'ভাঙ্গা বাঁশী,' 'বাদসাহী গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ একদিকে যেমন তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়, তেম্‌নি উক্ত গ্রন্থাবলী বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ। 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা' যখন ধারাবাহিকভাবে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই উহা খ্যাতি লাভ করে। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত পঠনরূপ অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

মিঃ ওয়াজেদ আলী নিরহঙ্কার, দরদীচিত্ত ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এইরূপ কৃতী সজ্জন ব্যক্তির পরলোক গমনে বাংলাদেশ একদিকে যেমন একটী 'মানুষ' হারাইল, তেমনি তাঁহার অভাবে বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

আদর্শনগরী কল্যাণী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদর্শ নগরের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা, পাটলিপুত্রের ন্যায় সুপরিকল্পিত নাগরিক জীবন বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতের অধিবাসীর নিকটেও বিস্ময়ের বস্তু। পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় মৃত্তিকা খননের দ্বারা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে দেখা যায়, সেই সুদূর অতীত যুগেও যে উন্নত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট পরিকল্পিত নগরীকে কেন্দ্র করিয়াই। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিতে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশেরও সুন্দর আয়োজন হইয়াছে নগর সৃষ্টির সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায়। সম্প্রতি কলিকাতার অদূরে কল্যাণী নামে একটি সুপরিকল্পিত নগরী নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই নগরীটি ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনন্য কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। উপরোক্ত শিল্পকার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত সহরগুলির সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, সেগুলির প্রধান লক্ষ্য শিল্পের উন্নতি। কিন্তু কল্যাণী মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকেই বড় স্থান দিয়াছে। ইহার সকল প্রকার পরিকল্পনাই ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিগত জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে

একটি উৎকৃষ্ট নগরী গড়িয়া উঠিবার পক্ষে স্থানটির প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ অনুকূল। কলিকাতার সহিত ইহার আটাশ মাইলের ব্যবধান এবং রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ে মার্কিণ সেনানিবেশ ও হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য সরকার স্থানটি অধিকার করিয়া বাসোপযোগী করিয়া তোলেন। সৈনিকগণের ব্যবহারের জন্য চাঁদমারি নামে একটি নূতন রেল ষ্টেশনও খোলা হয়। যুদ্ধ শেষে প্রায় বারশত হাজার একর পরিমাণ এই বিরাট এলাকাটি সামরিক প্রয়োজনের বহির্ভূত হইয়া যায়। ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং বাংলা গভর্ণমেণ্ট উভয়েই তখন স্থানটির বিভিন্ন অংশ কাজে লাগাইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। ইহার অংশবিশেষে 'ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজি', কিয়দংশে একটি সৈন্যাবাস এবং অবশিষ্টাংশে একটি সুপরিকল্পিত নগর নির্ম্মাণের জন্য সরকার প্রয়াসী হন। কালক্রমে ভারত-সরকার স্থানটির সকল দাবী ত্যাগ করেন। অতঃপর সমগ্র এলাকাটিই পরিকল্পিত নগরী নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করায়ত্ত হয়। এই নগরী পরিকল্পনার সরকারী উদ্যমটি সর্ব্বভাবেই প্রশংসনীয়। কলিকাতা আজ যে ভাবে জনসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মানুষের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই এইরূপ একটি সমৃদ্ধশালিনী নগরীর আবশ্যকতা ছিল। এতদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে অভাব পূর্ণ করিতে ব্রতী হইয়া সুবুদ্ধি এবং মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই সরকারী উদ্যমকে অভিনন্দন জানাই।

বঙ্গশ্রীর নববর্ষ

বর্ত্তমান আষাঢ়ে বঙ্গশ্রী ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পন করিল। এই অবকাশে বঙ্গশ্রী তাহার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা, লেখক, লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং সর্ব্বসাধারণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গশ্রী

[ফোটো—নিশানাথ মজুমদার

উনবিংশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৫৮ | ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

অলঙ্কার-দর্পণ

অধ্যাপক শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

অলঙ্কারের স্বরূপ

আমরা অভিজ্ঞতা হইতে জানি, সুবক্তা তাঁহার শ্রোতাদের করেন বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধ। কথার কৌশলে প্রতিবাদ পথ খুঁজিয়া পায় না, সমর্থন আপনি আসে অন্তর হইতে। যে ভাষা প্রত্যয় জন্মায়, একটি বিশেষ মত ও পক্ষে করে প্ররোচিত, তাহার প্রয়োগকৌশলকেই পাশ্চাত্য দেশে বলে অলঙ্কার বিদ্যা (Rhetoric)। ঈপ্সিত ফল ফলাইতে পটু, পরিপাটি, মর্ম্মস্পর্শী, মৌখিক কি লিখিত জোরালো রচনাকেই তাঁহারা বলেন অলঙ্কৃত ভাষা। ও দেশে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক (Aristotle) আরিস্তোতল। তাঁহার মতে সুবক্তার এমন একটা শক্তি থাকে যাহার সাহায্যে তিনি টের পান কি উপায়ে মিলিবে তাঁহার লক্ষ্য, কেমন করিয়া তিনি করিবেন অবিশ্বাসী শ্রোতার চিত্ত জয়—আলোচ্য বিষয় তাঁহার যাহাই হউক না কেন। সেই শক্তির উদ্বোধনই অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষ্য। বক্তা আপন মনের ভাবকে সঞ্চারিত করেন শ্রোতাদের চিত্তে, আটপৌরে ভাষা এই সঞ্চারের অনুকূল নয়। সুলেখকদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। তাঁহাদের ভাষা সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষার তুলনায় অনেক গুণ বেশী স্বচ্ছ, ওজস্বী ও মধুর। সে ভাষায় থাকে ছলাকলা ও বিন্যাসকৌশল, ফলে যে ভাববহন আটপৌরে ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সে বহন করে হেলায়। সুলেখক ও সুবক্তার ভাষা বিশুদ্ধ,

ঝরঝরে ও প্রত্যায়নপটু ; রচনারীতি (style) তাহার অনবদ্য, বক্রোক্তি, (বাগ্‌ভঙ্গিমা) অর্থাৎ অলঙ্কার জায়গামতো থাকিয়া তাহাকে করে অনুপম।

আমাদের প্রাচীন আচার্য্যদের আলোচ্য ছিল কাব্যালঙ্কার। কাব্য বলিতে তাঁহারা প্রধানতঃ বুঝিতেন রসাত্মক বাক্য। তাঁহারা বলিতেন সুকবির রচনায় এমন কিছু থাকে, যাহা পাইলে সহৃদয়ের মন দ্রব হইয়া যায় ; কঠোরতার খোলস ফেলিয়া বিশ্ব হয় মধুময়। ঐ বস্তুটার আস্বাদকেই তাঁহারা বলিতেন রস। অলঙ্কার অর্থাৎ বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গি করে সেই রসের উপকার। তাঁহারা বলিতেন কবির কাজ ভেল্কির সাহায্যে মন ভোলানো নয়, অমৃত দিয়া বিষ ভোলানো। কাব্যরসাস্বাদের বেলায় রসময় চিত্ত জগৎ ভুলিয়া যায়, আমি তুমি ভুলিয়া যায়, আমার, তোমার, আপন, পর ভুলিয়া যায়। মেকি মাল ভুলানোর কাজে প্রাচ্যমতে অলঙ্কার করে কবি ও কাব্যের উপকার—আমাদের রস অর্থাৎ আস্বাদের উপকার।

উপকুর্বন্তি তং সন্তং যেঽঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারাদিবদলঙ্কারাস্তেঽনুপ্রাসোপমাদয়ঃ॥

ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষার বিশুদ্ধি, অলঙ্কারের লক্ষ্য তাহার শক্তি ও চারুতা বৃদ্ধি। মিস্ত্রী ঘর বানায়, শিল্পী করে তাকে আনন্দনিকেতন। বৈয়াকরণ গালাগালি হইতে রক্ষা করে, অলঙ্কাররসিক আনিয়া দেয় শ্রোতার শ্রদ্ধা ও সোহাগ। ভাষা নিপুণ মজুরের পর্য্যায় হইতে উন্নীত হয় চারুশিল্পীর পর্য্যায়ে আলঙ্কারিকের সহায়তায়।

"চোখ দুটি তার উজ্জল, চুলগুলি তার কালো।" সাধারণ লোকের বর্ণনাত্মক ভাষা। এখানে চোখ দুটিকে উজ্জ্বল বস্তুর ও চুলগুলিকে কালো বস্তুর পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য আছে, বিধেয়ও আছে। ব্যকরণগত রচনারীতির অমর্য্যাদা এখানে করা হয় নাই। এমনধারা কথা বলিলে প্রশংসা না হউক, গালাগালি কুড়াইতে হয় না।

'গোধূলীর তারা সম তার দু'টি আলোভরা আঁখি।
পাশে তার কালো কেশে, আঁধার ঘনায়ে আসে দেখি॥'

এমন করিয়া বলিলে ঠিক ঐ আগের কথাটাই বলা হয়। কিন্তু এ কথায় আমাদের কল্পনার ঘুম ভাঙে ; চেনা মধুর হয় অচেনার মাধুর্য্যে, মন কাজের কথার খোঁজ পায় আনন্দময় খেলার ভিতর ; কথার জোর বাড়িয়া যায়।

"তিন বসন্তকুসুম শুখাল তিন নিদাঘের তাপে" বলাও যা আর 'তিনটি বছর কেটে গেল' বলাও তা। তবু আগের ভঙ্গিতে বলিলে মনের পটে আঁকা হইয়া যায় অভিনব ছবি ; ভাব তার রূপ খুঁজিয়া পায়। ইন্দ্রিয় দুতিয়ালি করে ; বাইরের রূপের জগৎকে করে ভাবের জগৎ। অলঙ্কারকলাকৌশলী মন তাহাকে দেয় সমৃদ্ধতর রূপের জগতে প্রতিষ্ঠা। সাধারণ ভাবে ভাব আদান প্রদান করার জন্য যা বলা প্রয়োজন, আলঙ্কারিক কবি কখনও বলেন তাহার চেয়ে বেশী, কখনও তাহার চেয়ে কম। সামাজিকের মনের দিকে তাঁহার সদা সজাগ দৃষ্টি, তিনি শুধু বলেন না, খোদাই করেন। 'জীবন যৌবন ধন মান কিছুই স্থায়ী নয়' বলিলে মনে তেমন দাগ থাকে না, যেমন থাকে 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান' বলিলে। অলঙ্কারযোজনায় অশরীরী ভাব হইয়া উঠে শরীরী ছবি। কাব্যের অভিনব জগতে মন দেখিতে পায় কালের স্রোত অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাতে জীবন, যৌবন, ধন, মান একবার আসিয়া ভিড়িতেছে আমার কূলে, আমার ঘাটে, আর তখনই স্রোতের দুর্ব্বার টানে কে জানে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিতেন 'এহো বাহ্য'। ইহারও পরে মন আপনাকে হারায় আস্বাদের বিশুদ্ধ আনন্দরূপে। বাগ্‌ভঙ্গি রসের উপকার করিয়াই হয় অলঙ্কার ; অন্যথা ওটা হইত নিছক ভঙ্গি, ভেঙচানি।

উক্তিভঙ্গির ভেদে অলঙ্কারের শ্রেণীভেদ বিভিন্ন রকমে করা যায়। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা দু'টি বড় ভাগের কথা বলিতেন—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যেখানে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য নির্ভর করে শব্দের আকৃতির উপর, শব্দ বদলাইলে যেখানে আর বৈচিত্র্য থাকে না, সেখানে বলা হয় শব্দালঙ্কার। আর যেখানে অর্থই সব, শব্দ বদলাইলেও আস্বাদের যেখানে কোনই তারতম্য হয় না, সেখানে বলা হয় অর্থালঙ্কার। পুনরুক্ত-বদাভাস

নামে একটি অলঙ্কার আছে ; উহা আবার শব্দ ও অর্থ উভয়েরই উপর তুল্যরূপে নির্ভর করে ; দুইটির একটি না থাকিলে আর অলঙ্কার হয় না। তাই উহাকে বলা হয় শব্দার্থালঙ্কার (উভয়ালঙ্কার)।

অর্থালঙ্কারগুলির ভিতর কতকগুলির ভিত্তি (১) সাধর্ম্য, কতকগুলির (২) বিরোধ-পার্থক্য বা বৈধর্ম্য, কতকগুলির (৩) সংসর্গ, কতকগুলির (৪) পরিকল্পনা, কতকগুলির (৫) বাক্‌কৌটিল্য কুটিলতা (Indirectness), কতকগুলির (৬) ভাবাবেগ (Emotion) কতকগুলির রচনারীতি (Construction)। কোন কোনটিকে আবার এই সব শ্রেণীর একটিরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বাঙলা সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলেও এখন তাহার অঙ্গে অঙ্গে দেখি অনেক বিদেশী অলঙ্কার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দালঙ্কার

সঙ্গের স্বরধ্বনিতে সাম্য থাক আর নাই থাক, এক কি একের বেশী ব্যঞ্জনবর্ণের আবৃত্তিকে (repetition) বলে অনুপ্রাস (Alliteration)।

কাব্যপ্রকাশের মতে অবশ্য সাধারণভাবে বর্ণসাম্য-মাত্রেই অনুপ্রাস। তবে আমাদের কাণ কেবল স্বরধ্বনির সাম্যে তেমন কোন বৈচিত্র্য অনুভব করে না। স্বরবর্ণ (vowel) এর অনুপ্রাস ইংরেজীতেও তেমন নাই। ইংরেজীমতেও বিশেষ করিয়া ব্যঞ্জনধ্বনির আবর্তনই, Consonantal sound-এর repetitionই Alliteration. তবে—

'অতি অকরুণ অনল সমান অতিবল অপবাদ
অন্তর দহে মম।'

এমন উদাহরণে কাণ যাঁহার খুসি হয়, তিনি ইহাকে Alliteration বলিলে আপত্তি করার তেমন কারণ নাই। প্রাচীন প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের মতে অনুপ্রাসের পাঁচটী ভেদ ; ছেক, বৃত্তি, শ্রুতি, লাট ও অন্ত্য। অন্ত্যানুপ্রাস আমাদের মিত্রাক্ষর কবিতার অন্ত্যমিল। অনুপ্রাসের বাড়াবাড়িকে কেহ ভাল চোখে দেখেন না সত্য, তবু আমাদের মিত্রাক্ষর কবিতায় ছন্দস্পন্দন আনিবার একটা বড় উপায় এই অন্ত্যমিল অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস। সংস্কৃতছন্দে অন্ত্যমিল অপরিহার্য ত নয়ই বরং কচিৎ উহার সাক্ষাৎ মিলে। তাই উহাকে একটা শব্দালঙ্কারের মর্যাদা প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা দিয়াছেন।

'তোর চুমোতে হয় যে লাল।
খোকাখুকীর হাত পা গাল॥'

—সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে চরণের শেষ অক্ষর আল এর পুনরাবৃত্তি ঘটায় অন্ত্যানুপ্রাস হইয়াছে। ছন্দকে স্পন্দিত করার শক্তি আছে বলিয়াই বাঙলায় ভাবানুযায়ী অনুপ্রাসের উপযোগীতা চিরদিন থাকিবে।

"তোমার নয়নে জ্বলিল দীপ।
আমার কাননে ফুটিল নীপ॥"

এখানে দুইটি চরণের শব্দে শব্দে অন্ত্যমিল অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস একটা শব্দসঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে।

মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।

এখানে 'মরণে' ও 'চরণে'তে অবশ্য অন্ত্যানুপ্রাস, তবে চরণের শেষ শব্দে শব্দে একটু দোলা দেওয়াতেই ইহার সার্থকতা। অন্ত্যানুপ্রাস মিত্রাক্ষর সব কবিতাতেই থাকে। তাই উহাকে অনুপ্রাস বলিতে আমাদের খেয়াল থাকে না।

লাটানুপ্রাস: যাহাদের ভেদ শুধু তাৎপর্য্যে, এমন তুল্যার্থক গোটা শব্দের পুনরুক্তির মত বিন্যাসকে বলে লাটানুপ্রাস। যেখানে শব্দ ও অর্থে পুনরুক্তি, ভেদ কেবল তাৎপর্যে, প্রাচীনেরা সেখানেই বলিতেন লাটানুপ্রাস। সেকালের লাট দেশের লোকেরা নাকি এইরকম অনুপ্রাসের ভক্ত ছিল, তাই এই নাম।

'চাঁদ তার দাবানল, পাশে যার নাই প্রিয়তমা।
চাঁদ তার দাবানল, পাশে যার আছে প্রিয়তমা।'

প্রিয়তমা পাশে না থাকিলে সুধাবর্ষী স্নিগ্ধ চাঁদকেও মনে হয় দাবানলের মত মর্ম্মদাহী ; আর প্রিয়তমা পাশে থাকিলে দাবানলেও দাহজ্বালা থাকে না, সেও দেয় চাঁদের মতই আহ্লাদ। শব্দ ও অর্থ এক হইলেও

তাৎপর্যে ভেদ আছে। এটি তাই লাটানুপ্রাস। তেমনই—

"হরি আরাধন যে করে তাহার কি কাজ তপস্যায় ?
হরি আরাধন যে না করে তার কি কাজ তপস্যায় ?"

শ্রুত্যনুপ্রাস : একই বর্ণের আবৃত্তি না হইয়া যেখানে একই স্থান হইতে উচ্চার্য বর্ণের আবৃত্তি হয় সেখানে প্রাচীনেরা বলিতেন শ্রুত্যনুপ্রাস।

'আজি, ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ ফুটল।'
—করুণানিধান।

প, ফ, ব এই তিনটি বর্ণেরই উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, কবিতার চরণে ইহাদের পর পর বিন্যাসের ফলে কান একরকমের ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদ করে। তেমনই—

"যেদিন তুমি হেথায় এলে নামি,
হনুকে গুণ চড়ায়ে গেলে থামি।"

এই উদাহরণে ত, থ, দ, ধ, ন এই কয়েকটি দন্ত্যবর্ণ আবর্তিত হইয়া শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

এই তিন রকমের অনুপ্রাস নামেই অনুপ্রাস। সেকালের আলোচনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় রাখিবার জন্যই ইহাদের উল্লেখ করা হইল। ছেক ও বৃত্তিই খাঁটি অনুপ্রাস।

ছেকানুপ্রাস : যুক্ত বা অযুক্ত কয়েকটি ব্যঞ্জনের ক্রম (order) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি ঘটিলে হয় ছেকানুপ্রাস।

ছেকানুপ্রাস ছাড়া অপর সবরকমের বর্ণাবৃত্তি (ব্যঞ্জনাবৃত্তি)-কে বলে বৃত্ত্যনুপ্রাস। এই দুই রকমের অনুপ্রাস কাব্যভাষার সৌন্দর্য্য ও ছন্দের মাধুরী বাড়াইতে পারে।

ছেকানুপ্রাসের উদাহরণ : "আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে দিগম্বর।"—রবীন্দ্রনাথ।

সম্বরিতে ও দিগম্বর পর পর এই দুইটি শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন ম্ব-এর ক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি ঘটায় বলিব ছেকানুপ্রাস। এখানে স্বরেরও সাম্য আছে।

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।' —ভারতচন্দ্র।

যুক্ত ব্যঞ্জন 'দ্ধ' এর একবার পুনরাবৃত্তি। এখানে স্বরসাম্য নাই। তেমনই—

(১) 'পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা।'
—রবীন্দ্রনাথ

(২) 'শুধু এ মর্ম্মরহীন বনপথ 'প'রি
তোমারই মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।'—ঐ

(৩) শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।—ঐ

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের ছেকানুপ্রাস :

'হাজার গুণীর চুনীর নূপুর টুকটুকে পায় রয় মিশে,
জৌনপুরী তোড়ির তোড়া বাজায় হাজার মজ্‌লিশে!'
—সত্যেন্দ্রনাথ

তোড়ি ও তোড়ায় অযুক্ত ব্যঞ্জন 'ত' ও 'ড়'-এর পুনরাবৃত্তি ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে। 'ণ' ও 'ন' বাঙলা উচ্চারণে অভিন্ন, তাই গুণীর ও চুনীর এখানেও ছেকানুপ্রাস। তেমনই—

(১) 'যারা গুঞ্জা ফলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে।'—সত্যেন্দ্রনাথ

(২) 'আঁধার ধাঁধার জবাব মেলে না জানো না কি।'
—মোহিতলাল

(৩) তার তরে ভাই বাগিয়ে কলম গল্প লেখো
খালি; —মোহিতলাল

(৪) জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।—অক্ষয়কুমার

(৫) তোমারে তিমিরে যদি দেখি, পাই পথ।
অমনি আমার পূরে সব মনোরথ॥

(৬) 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক॥'—রবীন্দ্রনাথ

(৭) 'পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি
ডাকতে হল তারে।'—রবীন্দ্রনাথ

(৮) 'বাজে পূরবির ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর
বীণ।'—ঐ

(৯) 'দেবের করুণা মানবী আকারে
আনন্দধারা বিশ্বমাঝারে।'—ঐ

বৃত্ত্যনুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাইবে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস :

মঞ্জু কুঞ্জ বনের ছায়ায় গুঞ্জরি ফিরে অলি।
অঞ্জলি ভরি ফুলে,
অঞ্জন আঁখি-কোলে,
অঙ্গনা জন রঙ্গে বিহরে ; ভঙ্গিতে মন ভুলে॥

এখানে দেখা যায় যুক্ত ব্যঞ্জন 'ঞ্জ' ও 'ঙ্গ' এর একের বেশী-বার আবৃত্তি। তাই এটি ছেকানুপ্রাস নয়, বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণ।

"ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কিরে!"—রবীন্দ্রনাথ।
এখানে ক্ত এই যুক্ত ব্যঞ্জনের তিন বার আবৃত্তি।

'অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে।
পরশে জীবন তার আমার জীবনে॥' —রবীন্দ্রনাথ

বাপ বললেন কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে,
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,"—ঐ

এখানে একাধিক ব্যঞ্জনের একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি থাকিলেও ক্রম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তাই ছেকানুপ্রাস নয় বৃত্ত্যনুপ্রাস। আমার মরার স্থলে ছেকানুপ্রাস।

(১) কেটেছে জামার পকেট আমার চামার পকেটকাটা। মার তিনবার থাকায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

(২) কবি কয় কত কথা কি ছলে।
মকরকেতন তার তুন হ'তে তীর নিয়ে
ফেলে দেয় ভুতলে॥

এখানে প্রথম চরণে ক ও দ্বিতীয় চরণে ত (বহুব্যঞ্জন নয়) বার বার আবৃত্ত হইয়াছে। তাই ছেকানুপ্রাস না হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস। তেমনই—

'নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।'—রবীন্দ্রনাথ

বাক্যপ্রকাশ-কার মম্মটভট্টের মতে একটি ব্যঞ্জনের একবার মাত্র আবৃত্তিতে অনুপ্রাস হয় না। উহাতে কোন বৈচিত্র্য বোধ জাগে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। ব্যঞ্জন বর্ণের আগের স্বরধ্বনিটিরও মিল থাকিলে মিষ্টতার একটা আমেজ পাওয়া যায়। যেমন—

(১) 'সাগরকূলে তোমার ফুল বনে
এনেছি শুধু বীণা,
দেখতো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা॥'
—রবীন্দ্রনাথ।

(২) 'যূথি পরিমল আসিছে সজল সমীরে।'—রবীন্দ্রনাথ

মাইকেলের 'মেঘনাদে'র প্রায় প্রতি চরণে আছে অনুপ্রাসের সিঞ্জন। সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে দুলাইয়াছেন অনুপ্রাসের ঝাঁকুনীতে। রবীন্দ্রপ্রমুখ কবিদের কাব্যে ইহার হাজার হাজার উদাহরণ মিলিবে। তেমন কোন চেষ্টা না করিলেও অনুপ্রাস বাঙলায় আপনি আসে। বেশী উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় নিরর্থক।

নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে কত রকমের অনুপ্রাস লক্ষ্য করুন :

(১) 'ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
দেবতার অবতার বসুধার তলে।'—রবীন্দ্রনাথ

(২) 'মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।'
—ঐ

(৩) 'রবিকুল-রবি শূর রাঘবের শরে।'—মধুসূদন

(৪) 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিল শঙ্করে।' —ঐ

(৫) 'আভাময় তার শিরে ভবের ভবন।' —ঐ

একটি সংবাদপত্রের কাহিনী

কাহিনীকার—ও' হেনরী ● অনুবাদ—সবিতা বসু

সকাল আটটার সময় সদ্য-প্রেস-থেকে-আসা কাগজটা গিসেপ্পীর কাগজের দোকানে প'ড়ে ছিল। গিসেপ্পী তখন উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেমালাপ ক'রছিল; কারণ সে তার খদ্দেরদের মনস্তত্ত্ব জান্‌ত। সে দূর থেকে নজর রাখ্‌ছে ভেবে কোন খদ্দেরই পয়সা না দিয়ে কাগজ নিয়ে যেতে সাহস করবে না।

এই বিশিষ্ট কাগজটার রীতি-নীতি অনুযায়ী কাগজটি একাধারে শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, রক্ষক, সাহায্যকারী ও গৃহস্থালী বিষয়ক সর্ব্ববিষয়ে উপদেষ্টার কাজ ক'রে থাকে।

কাগজটির অসংখ্য সদ্‌গুণের মধ্যে তিনটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি, পিতামাতা আর শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া যে অন্যায় সেই কথাটিই সহজ মার্জ্জিত অথচ জাঁকজমকপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি, একজন বিখ্যাত শ্রমিক-নেতার উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী: এই শ্রমিক নেতাটি তখন তাঁর অনুগত শ্রমিকদের এক অশান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট সৃষ্টি ক'রবার জন্যে উত্তেজিত ক'রছিলেন।

তৃতীয়টির লক্ষ্য পুলিশবাহিনী: পুলিশবাহিনীকে সব দিক দিয়ে জনসাধারণের হিতকারীরূপে গঠিত ক'রবার জন্যে যেন কোনরকম চেষ্টার ত্রুটী না করা হয়, প্রবন্ধটিতে বাক্‌চাতুর্য্য বিস্তার ক'রে এই দাবী করা হয়েছে।

নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে এই সমস্ত উপদেশ এবং দাবী-দাওয়া ছাড়াও আর একটি নির্দ্দেশ ছিল। "চুপে চুপে" বিভাগের সম্পাদকের কাছে একটি তরুণ তার প্রণয়িনীর বিমুখতা সম্বন্ধে অনুযোগ ক'রেছিল। কি ক'রে সে তার প্রণয়িনীর হৃদয় জয় করতে পারে তারই নির্দ্দেশ সম্পাদক দিয়েছেন।

এ ছাড়াও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা বিভাগে একটি তরুণীর প্রশ্নের উত্তরে জানান হয়েছে, কি ভাবে উজ্জ্বল চোখ, টুক্‌টুকে লাল গাল এবং সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী হওয়া যেতে পারে।

আর একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে "ব্যক্তিগত" কলমে। তার কথাগুলি এই: প্রিয় জ্যাক্—ক্ষমা করো। তোমার কথাই ঠিক। আজ সকাল সাড়ে আটটার সময় আমার সঙ্গে ম্যাডিসনের মোড়ে দেখা করবে। দুপুরেই আমরা চলে যাব।

সকাল আটটার সময়ে নিদ্রাভাবে উজ্জ্বল অস্থির চক্ষু ও রুক্ষ চেহারার একটি যুবক গিসেপ্পীর দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি পেনি ফেলে দিয়ে সবচেয়ে ওপরের কাগজখানি নিয়ে গেল। বিনিদ্র রাত্রি যাপনের ফলে তার উঠ্‌তে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেছে। নটার সময় অফিসে হাজির হ'তে হবে। তার আগে এই সময়টুকুর মধ্যেই তাকে কামান এবং এক কাপ কফি খাওয়া সেরে নিতে হবে।

নাপিতের দোকানের হাঙ্গামা মিটিয়ে সে তাড়াতাড়ি অফিস মুখো হ'লো। লাঞ্চের সময় দেখা যাবে এই ভেবে কাগজটাকে পকেটস্থ ক'রলো। কিন্তু এর পরেই সে যে মোড়টা ফিরল সেখানে কাগজটি তার পকেট থেকে প'ড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন কেনা দস্তানা জোড়াটিও প'ড়ল। বেশ খানিকটা রাস্তা ছাড়িয়ে যাবার পর সে দস্তানার অন্তর্ধান টের পেল এবং ক্ষিপ্ত মেজাজে ফিরে চল্‌ল।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে সে সেই মোড়ের মাথায় এসে হাজির হ'লো, যেখানে তার দস্তানা আর কাগজ প'ড়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে যে জিনিষের খোঁজে এসেছিল সেদিকে মোটেই নজর দিল না। আনন্দোচ্ছল চিত্তে সে এখন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'টি ছোট

ছোট হাত ধ'রে দু'টি অনুতপ্ত বাদামী চোখের দিকে চেয়ে আছে দেখা গেল

"জ্যাক্, প্রিয়তম," মেয়েটি বলল, "আমি জানতুম তুমি ঠিক সময়েই আসবে।"

"আশ্চর্য্য ত, ও কি বলতে চাইছে ?" সে মনে মনে ভাবল, "যাক্, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, সব হাঙ্গামা চুকে গেছে।"

পশ্চিম দিক থেকে একটা জোর হাওয়ার ঝাপটা এসে কাগজটার ভাঁজ খুলে দিল, তারপর পাশের একটা গলি দিয়ে ওলোট-পালোট খাওয়াতে খাওয়াতে উড়িয়ে নিয়ে চলল। সেই গলি দিয়ে তখন একটি তরুণ একটি ছট্‌ফটে পিঙ্গলবর্ণের ঘোড়ায় টানা বগিগাড়ী চালিয়ে আস্‌ছিল। তরুণটি হচ্ছে সেই লোক, যে "চুপে চুপে"র সম্পাদকের কাছে তার বাঞ্ছিতার হৃদয় জয় করবার ব্যবস্থা-পত্রের জন্যে অনুরোধ ক'রেছিল।

হাওয়াটা যেন মজা দেখবার জন্যে এক ঝটকায় কাগজটাকে সেই চট্‌ফটে ঘোড়াটার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। ঘোড়াটা ক্ষেপে উঠে লাগাম ছাড়িয়ে দৌড় লাগালো। রাস্তার কলের সঙ্গে সংঘর্ষে বগীগাড়ীখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। আর প্রক্ষিপ্ত চালকটী একটী বাদামী রঙের প্রাসাদোপম বাড়ীর সামনে ফুটপাথে নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো।

অট্টালিকার মধ্যে থেকে কয়েকজন লোক ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে এমন একজন ছিল, যে বালিশের পরিবর্ত্তে নিজের কোলের ওপর তার মাথা তুলে নিল। তারপর লোকলজ্জার তোয়াক্কা না রেখে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, ববি, হ্যাঁ, চিরদিন আমি তোমাকেই চেয়েছি। কিন্তু তুমি কি তা বুঝতে পারনি ? আজ যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে আমিও তোমার সাথী হ'ব।"

যাক্, এখন ঐ ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে কাগজটা কোথায় গেল তার খোঁজ করতে হবে।

যানবাহনের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে ওব্রাইন নামে একজন পুলিশ সেটাকে গ্রেপ্তার করল। তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সে কাগজটার কোঁচকান অংশগুলোকে আস্তে আস্তে সোজা করল। তারপর স্ট্যানডন বেল কক্ষের ভেতর দিকের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে বানান ক'রে ক'রে সে একটি হেড লাইন পড়ল : 'পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য প্রয়াসে সংবাদপত্রের প্রচেষ্টা।'

দরজার ফাঁক দিয়ে প্রধান মদ্যপরিবেশক ড্যানির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ওহে, মাইক্, এক চুমুক খেয়ে যাও।"

কাগজটাকে সামনে ধরে তার আড়ালে ওব্রাইন ঝট্‌পট্ এক চুমুক খাঁটি মদ পান করে নিল। এইভাবে শক্তি সংগ্রহ ক'রে নতুন উদ্যমে সে তার কর্ত্তব্য পালন করতে চলে গেল। সম্পাদক তাঁর পরিশ্রমের ফল অবিকল ভাবে হাতে হাতে ফলতে দেখে অর্থাৎ জন-সাধারণ পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করতে কতখানি উন্মুখ দেখে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করতে পারেন।

একটি ছোট ছেলে সেই সময় ওব্রাইনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশটী খেলাচ্ছলে কাগজটীকে পাট ক'রে ছেলেটির হাতে গুঁজে দিল। ছেলেটির নাম জনি। সে কাগজটিকে বাড়ী নিয়ে গেল। তার দিদি গ্ল্যাডিসই সৌন্দর্য্য বিভাগের সম্পাদকের কাছে সুন্দরী হবার প্রণালী জান্‌তে চেয়েছিল। অনেকদিন হ'য়ে যাওয়ার ফলে সে উত্তর পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিল, সেইজন্যে আর কাগজ দেখত না। গ্ল্যাডিসের রং ফ্যাকাশে, চোখ নিষ্প্রভ আর মুখে যেন সব সময় একটা অসন্তুষ্ট ভাব ফুটে আছে। সে টাসল কিনতে যাবে ব'লে কাপড় জামা পরছিল। জনি যে কাগজটা নিয়ে এসেছিল সে তা' থেকে দু'টো পাতা নিয়ে স্কার্টের মধ্যে পিন দিয়ে এঁটে দিল। সে চলার সঙ্গে সঙ্গে কাগজটার খড় খড় শব্দটাকে ঠিক দামী সিল্কের শব্দ ব'লে মনে হ'তে লাগল।

রাস্তায় তার সঙ্গে নীচের ফ্ল্যাটের ব্রাউনদের মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়াল। ব্রাউনদের মেয়েটি হিংসায় কালো হ'য়ে গেল। গ্ল্যাডিসের চলাতে যেরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, একমাত্র ৫ ডলার গজের সিল্কেই সেই রকম আওয়াজ হয়। ব্রাউনদের মেয়েটি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কট্‌ক্তি করল, তারপর নিজের কাজে চ'লে গেল।

গ্ল্যাডিস বড় রাস্তার দিকে চল্‌ল। তার চোখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত জ্বল-জ্বল ক'রে জ্বলছিল। গাল দু'টো গোলাপের মত লাল টক্‌টক্ করছে, জয়ের আনন্দে মুখ তার এক অপূর্ব্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তাকে রীতিমত সুন্দরী লাগছে। সৌন্দর্য্য বিভাগের সম্পাদক যদি এখন তাকে দেখতেন! তার প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদক কাগজের মারফৎ জানিয়েছেন যে সাধারণ চেহারাকে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে হলে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত।

যে শ্রমিক-নেতাটিকে উদ্দেশ্য ক'রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী বর্ষণ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন জনি আর গ্ল্যাডিসের বাবা। গ্ল্যাডিস্ কাগজটা থেকে কয়েকটা পাতা নেবার পর তার যে অবশিষ্ট অংশটুকু ছিল, তার বাবা সেটাকে তুলে নিলেন। সম্পাদকীয় মন্তব্যটি তাঁর চোখে পড়ল না। তার বদলে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটি বড় গোছের প্যাঁচালো শব্দ চৌকীর প্রতি—যে শব্দ চৌকী বোকা বুদ্ধিমান নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান আকৃষ্ট করে।

শ্রমিক নেতাটি কাগজের সেই পাতাটির আধখানা ছিঁড়ে নিলেন, তারপর কাগজ পেন্সিল নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় হ'য়ে গেলেন।

তিনঘণ্টা ধ'রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁর জন্যে বৃথা অপেক্ষা ক'রে থাকবার পর কয়েকজন রক্ষণশীল নেতা ধর্ম্মঘটের পরিবর্ত্তে সালিশির স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই ভাবে ধর্ম্মঘট এবং তার আনুষঙ্গিক অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কাগজটির পরের সংস্করণে বড় বড় অক্ষরে জাহির করা হ'ল, কি ভাবে তাদের ভীতি প্রদর্শনের শুভ ফল স্বরূপ শ্রমিক নেতাটির মতের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে।

কাগজের বাকী পাতাগুলোও বেশ তৎপরতার সঙ্গে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে জনি চুপি চুপি একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে তার পোষাকের মধ্য থেকে কাগজের অবশিষ্ট অংশগুলো বার করল। স্কুলে শাস্তি পাবার সময় সাধারণতঃ শরীরের যে জায়গাগুলো আক্রান্ত হ'য়ে থাকে, সেই জায়গাগুলোতে বেশ কৌশলের সঙ্গে সে কাগজগুলো এঁটে নিয়েছিল যাতে মারটা গায়ে না লাগে। জনি একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়ত আর মাষ্টার মশাই তাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। আগেই জানা গেছে যে কাগজটার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছেলেদের দৈহিক শাস্তির অপকারিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল; অতএব নিঃসন্দেহেই এরও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

এর পরে কি প্রেসের ক্ষমতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে?

তোমাকে

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

আমারি জন্যে দু' চোখে নামেনি ঘুম?
সারারাত তাই দোরখানি খুলে দিয়ে
চাঁদের আলোয় পথ পানে চেয়েছিলে,
কামনার রঙে লেগেছিল মনে ধুম?

রাত শেষ হতে হতাশায় অবশেষে
ঢুলে পড়েছিলে বাতায়নে আন্‌মনে।
কতো রাত তুমি ঘুমাও নি তা কে জানে;
হয়তো জানতে···জাগাবো হঠাৎ এসে।

শুকতারাদের আলোগুলি দেখা দিলে—
এসেছিনু আমি চকিত চরণ ফেলে,
বাতায়নে তব দেখেছি ও-মুখখানি
তুমি হায় তবু তখন ঘুমিয়েছিলে।

রুদ্ধ কখন করেছিলে ভুলে দোর?
জাগাতে তোমারে পারিনিক' কোনো মতে,
ব্যথায় ফিরেছি: আসব আবার: ব'লে;
তবু যে সহজে আসা হয়নিক' মোর।

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও বন্দেমাতরম

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর ছয়মাস ছুটি শেষ হওয়ার পরে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন বাড়ী থাকিয়া বহরমপুর পৌছিয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। বহরমপুরে চুঁচুড়ার গঙ্গাচরণ সরকার তখন মুন্সেফ ছিলেন, তাঁহার ছেলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল পাশ করিয়া ওকালতি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। গঙ্গাচরণবাবু সঞ্জীববাবুর পূর্ব্ব পরিচিত, বঙ্কিমচন্দ্র নূতন যাইতেছেন, সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য সঞ্জীববাবু তাহাকে লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে সেখানেই উঠেন এবং একদিন থাকিয়া পিতাপুত্র-নির্দ্ধারিত বাড়ীতে ঠাকুর চাকর লইয়া গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

মুর্শিদাবাদ জিলা তখন রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল এবং বিভাগীয় কমিশনার বহরমপুরেই থাকিতেন। ল্যান্স সাহেব (C. E. Lance) ছিলেন তখন কমিশনার, আর হ্যাঙ্কে (H. Hankey) জিলার মাজিষ্ট্রেট। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ আর হ্যাণ্ড। রেভারেণ্ড লালবিহারী দেও একজন ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন, হরিচরণ ঘোষ এবং গোলকচন্দ্র রায় নামক দুইজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও এই সময়ে সেখানে ছিলেন।

কমিশনার ল্যান্সের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল না। তবে পূর্ব্ব হইতেই কোন সাহেব তাহার কাণ ভার করিয়া রাখায়, প্রথম হইতেই ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পান নাই, তবে সৌভাগ্যের বিষয় ল্যান্স সাহেব দুই একমাস মধ্যেই বদলী হইয়া যান। তাঁহার স্থানে আসিলেন মলোনি (E. W. Molony); ইনি বঙ্কিমের পূর্ব্ব পরিচিত, অধিকন্তু তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট হ্যাঙ্কে সাহেবেরও সাধু এবং দৃঢ়চিত্ত লোক বলিয়া বিশেষ সুনাম ছিল। জজ সাহেব মিঃ গ্রেও বেশ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে বিশেষ কোন উপদ্রব ভোগ করিতে হয় নাই। তাই সাহিত্য সাধনায় তাঁহার তপস্যারও কোন বিঘ্ন হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস স্থান ছিল ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে। সে সময়ে বহরমপুরের উত্তর প্রান্তে গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ বাস করিতেন, আর দক্ষিণ প্রান্তে গোড়াদের ছাউনি, আদালত, কলেজ ইত্যাদি ছিল। এখানে ভাগীরথী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা, সমুদ্রগামিনী। ভগীরথ এই রাস্তায়ই শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সগরতনয়গণকে উদ্ধার করিবার জন্য সাগরাভিমুখে চলিয়াছিল।

বঙ্কিমের এই বাসা বাড়ীটি একটী পুণ্যক্ষেত্র, এখানেই বিষবৃক্ষ ফলপুষ্পে ভূষিত, এখানেই বন্দেমাতরমের পরিকল্পনা, এখানেই বঙ্গদর্শনের উৎপত্তি আর এখানেই চন্দ্রশেখরের স্তবক রচনা হয়। কত ধ্যান, কত কল্পনা, কত সাধনা ইহার ভূমিখণ্ড পূত করিয়া রাখিয়াছে, কি পবিত্র স্মৃতি এই বাড়ীর সহিত সংজড়িত, কত নির্ম্মল ইহার আশপাশের স্থান সমূহ, আর কি মঙ্গলময় ইহার প্রভাব! ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এখানে আসিয়া এই পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। বহরমপুর-বাসিগণকে বাড়ীটীকেই একটী পৃথক স্মৃতিস্তম্ভরূপে পরিণত করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাতীরে হাসপাতালের উত্তরে লরেটো হাউস্ অবস্থিত, তাহার উত্তরের বাড়ীটিতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। রাস্তার (Strand Road)-এর পূর্ব্বদিকে এই পশ্চিমমুখো বাড়ীটী অবস্থিত এবং ইহার সম্মুখেই রাস্তার পশ্চিমপারে একখানি সিঁড়ি সংযুক্ত ঘাট আর তাহার দুইদিকে দুইটী শিবমন্দির। বঙ্কিমের সময় এই জোড়া মন্দিরের পাদদেশ বিধৌত করিয়াই ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। বঙ্কিম বাসায় বসিয়াই গঙ্গা দেখিতেন, দেখিয়া শ্রান্তিদূর করিতেন, তাঁহার মানসমন্দিরে জন্মভূমি

কাঁঠালপাড়ার স্মৃতি জাগরিত হইত, ভগীরথের সাধনার কথা মনে হইত আর তাঁহারও ভাবতরঙ্গ ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গিমার সহিত তালে তালে নৃত্য করিত।

ভাগীরথীর প্রভাব 'চন্দ্রশেখরের' বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতেছে :

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষার সময়ে* বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"পরামর্শ ঠিক হইলে দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, "আয় শৈবলিনী সাঁতার দিই।" দুইজনেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু, তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলেই পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্র মধ্যে সুন্দর নবীন বপুদ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্ন-যুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

"সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না, চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল, গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল।"

বর্ষার দৃশ্য বঙ্কিমকে এমনি ভাবে বিমোহিত করিয়াছিল। এই বর্ষাকালের গঙ্গার আর একটী উপমাও দিয়াছেন।†

"প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপলোকে দেখিলেন যে, শ্বেত-শয্যার উপর কে নিশ্চল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির-শ্বেত-বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে।"

আবার খরার সময়েও‡ বঙ্কিম ধ্যানস্থ হইয়া অনন্তের গান গাহিতেছেন—

"জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধারণ করিয়াছে; গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তম নীলিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে, নদী অনন্ত, যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্টদৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষ-শ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত, তন্মধ্যে তারকামালা অনন্ত সংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূল, যে বালুকাভূমে তরণীশ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?"

আবার এই অনন্তের ধ্যান করিতে করিতে কতবার বঙ্কিমের সংসার-সমুদ্র, সমুদ্রের তরঙ্গ, তরঙ্গে সন্তরণের কথা মনে হইয়াছে, 'চন্দ্রশেখরে' তাহাও প্রতিভাত হইয়াছে। বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"দুইজনে সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশ-ব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী। নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীল সাগরে দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনইবা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনইবা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার! জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কালসমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি?"

এই সমস্ত উচ্চ চিন্তার তরঙ্গ বিক্ষোভে পাঠকের মন বিভ্রান্ত করিব না। চলুন আবার রাত্রির আরেক শোভা নিরীক্ষণ করি।

"আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণীশ্রেণী অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট

---

* বঙ্গদর্শন ১২৮০, শ্রাবণ।

† বঙ্গদর্শন ১২৫০

‡ বঙ্গদর্শন ১২৮১।

রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্ত প্রবাহিনী গঙ্গা ধাবিত হইতেছে।”

যাহাহউক, বঙ্কিমের নদী তীরস্থ বাটির দক্ষিণ দিক দিয়া ভট্টাচার্য্য গলি পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই গলির দুইদিকে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। সেই পাড়ায়ই অনতিদূরে স্বর্গীয় দীননাথ সান্যাল বাস করিতেন। ইনিও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দীননাথের বাড়ীতে সন্ধ্যায় একটী মজলিস বসিত, সাহিত্য চর্চ্চা হইত, নানারূপ সদালাপ হইত এবং বঙ্কিমও সেখানে প্রায়ই আসিতেন।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরে তখন বহু সাহিত্যিকের বাস ছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় উভয়েই তখন যুবক, অক্ষয়চন্দ্র সবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন আর খাগড়ার চন্দ্রশেখর তখন শিক্ষক। তখনও চন্দ্রশেখরের সহিত বঙ্কিমের আলাপ পরিচয় হয় নাই। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ নাগ, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য তখন উদীয়মান উকীল ও ভাবী জননায়ক। মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ রাজীব লোচন রায় সর্ব্ববিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র সরকারী কার্য্যোপলক্ষে যখনই আসিতেন, হাসির ফোয়ারা ছুটিত। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Sir Gurudas) তখন সরকারী উকীল ও আইন কলেজের অধ্যাপক। গঙ্গাচরণ সরকার ও দিগম্বর বিশ্বাস তখন সবজজ—সাহিত্যালোচনায় উভয়েই আনন্দ পাইতেন। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, অধ্যাপক রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে সুন্দর ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন আর পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন যাঁহার গুণগ্রাম বর্ণণা করিয়া দীনবন্ধু লিখিয়াছেন—

> “লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার
> বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার
> লিখিয়াছে মালতীমাধব সুললিত
> বঙ্গ ব্যাকরণ বঙ্গময় বিচলিত”।

—তখন নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ, সুপণ্ডিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন তখন কলেজের অধ্যাপক। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় সরকারী চাকুরী করিয়াও সাহিত্যচর্চ্চায় আনন্দ পাইতেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখন বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। সর্ব্বোপরি প্রাচ্যকোবিদ ডক্টর রামদাস সেন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্যই বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া নিজ বাড়ীর লাইব্রেরীটী একটি লোভনীয় জিনিষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বহরমপুরে সাহিত্যের আবহাওয়ায় বঙ্কিমের উৎকর্ষ চিন্তাধারা আরও বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০) কলিকাতায় বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অধিবেশনে “Popular Literature of Bengal” “বাঙ্গলার সার্ব্বজনীন বা লোকসাহিত্য” নামে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা এবং কিরূপে উহার প্রচার কার্য্য সাধন করিয়া লোকশিক্ষার মাধ্যমে জাতির মঙ্গল বিধান করা যায়, সেই সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাবেই যে বাঙ্গালী জাতিকে গঠন সম্ভব, ইংরাজী সাহিত্যে নয়—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। সদ্‌গ্রন্থ রচনা এবং নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনারও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। ভাল বহিকে মন্দ বলিলে বা মন্দ বহিকে ভাল বলিলে উন্নত সাহিত্যের যে ক্ষতি হয় তাহাও বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, এই জন্যই অর্থাৎ বিচারশূন্য প্রশংসাবাদে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে।*

এই ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনের উদ্যোগপর্ব্ব।

বহরমপুর যাইবার পরে কয়েক মাস বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বাঙ্গালী সমাজে প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। স্বয়ং চেষ্টা করিয়া জনসমাজে মেলামেশা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি নিজে নিঃসঙ্গবাসে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে ভাল বাসিতেন। যাহারা একাকী থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতে ভাল বাসেন, জনসমাজের সহিত মিশিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহেন না, লোকে স্বভাবতঃ তাহাদিগকে অহঙ্কারী মনে করিয়া থাকে, বঙ্কিমকেও

* Published in the Transactions of the Associations for 1870.

সকলে তাই মনে করিত। তাহার উপর বঙ্কিমের চেহারাই তাঁহার গাম্ভীর্য্যের অনুরূপ ছিল, তিনি অত্যন্ত রাশভারি লোক ছিলেন। সাধারণ লোকে কথা কহিতে ভয় পাইত। সর্ব্বোপরি তিনি খুব কড়া হাকিম ছিলেন। এই সমস্ত কারণে প্রথমতঃ অপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী মনে করিতেন। এবং দূরে দূরে থাকিতেন।

ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সময় লাভ হইত। কিন্তু এই ভাব ছিল তাঁহার চরিত্রের বাহ্যিক আবরণ মাত্র। এই কঠোর আবরণেও তাঁহার চরিত্রের মধুরতা বেশীদিন লুক্কায়িত রহিল না। বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি, জন-হিতৈষণা, দেশপ্রীতি বেশীদিন তিনি গোপনে রাখিতে পারিতেন না, তাই যেখানেই যাইতেন অল্পদিন মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। যখন ছাড়িয়া যাইতেন সকলেই আত্মীয়বিয়োগের ন্যায় কষ্ট অনুভব করিত।

বহরমপুরের প্রথম অবস্থার কথা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরবর্ত্তীকালে রচিত 'আমার জীবনে' কতক আভাষ পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"একদিন কথায় কথায় অক্ষয় সরকার মহাশয় বলিলেন চাটুয্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিম বলিলেন, নবীন, কথাটা ঠিক, এই অহঙ্কারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটী গল্প শুন। বহরমপুরে বদলী হইয়া গেলাম। একেতো রোড্‌সেস ইত্যাদি একরাশি কার্য্যের ভার কালেকটার বেটা জেদ করিয়া আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছে, তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে সে যে হুকা লইয়া বসে, আর উঠে না। আমি দেখিলাম আমার লেখাপড়া বন্ধ হইল; তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিস দিলাম—কেহ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তাহার পরদিনই সমস্ত বহরমপুরে রাষ্ট্র হইল—বটে, বেটার এমন দেমাক! থাক্ তাহার বাড়ীর আশেপাশে কেহ যাইব না। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

দ্বিতীয়টী এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসের সমালোচনা হইতেছিল। এক গুলিখোর বলিল, বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর—তাহা না হইলে বাবা এমন রসিকতা কি যার তার কলম হইতে বাহির হয়? সকলে হাসিলাম, বুঝিলাম এই শেষ গল্পটা অক্ষয়বাবুর উপকারার্থ। অক্ষয় বাবু বলিলেন, আমি গুলিখোর হই আর যা হই, কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশটা যে টলটলায়মান, তাহা আমি একশবার বলিব। —"নবীনচন্দ্র—আমার জীবন দ্বিতীয় ভাগ।"

হাসির কথা ছাড়িয়া অক্ষয়বাবুর জীবনস্মৃতি হইতেও বঙ্কিমের চালচলন সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিই—

"৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ্, বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সব্‌রেজিষ্টার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া, সঞ্জীব বাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারীর নিকট বঙ্কিমবাবুর একটী বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম। জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটা ঠিকা চাকরকেও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণ-পণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দসহকারে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি-এল পাশ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম। বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন, পিতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিষ পত্র চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া

দিলাম। হায়রে হায়, তখনকার কথা মনে পড়িলে এখনও বুক ফাটে! এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটী কথাও কহিলেন না, অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলা-কারের করুণা কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন, আমি ফিরিয়া উঠিয়া গেলে বলিলেন, "বঙ্কিম গেল হে?"

আমি বলিলাম, 'হাঁ', "তোমার সহিত দু'দিনেও একটীও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম, "কথা কি, আমি যে একটা জীব এ বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত তাঁহাতে এখনও পৌছে নাই।" পিতা বলিলেন, "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

"কাছারীর ফেরতা পিতাপুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিম বাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর সেইরূপ তিন-খান কেদারা বাহির করিয়া দিল, বঙ্কিমবাবুর আদেশমতে পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম; বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া নিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে—"কাদা মাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হ'ল না।"

"এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

"কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটী হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটীতে আসিয়া দুইজনের দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টাকাল নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে নয় ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে. কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে অতি শুভক্ষণে বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেণল্ডের কথা। তখন দুইজনে অসিধার রেণল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া বসিয়া বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম, চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন দিন সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড় আমি ছোট, তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর 'বন্ধুবৎসলতার' পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতায় অচিরাৎ এক পরিণতি হইয়াছিল।"

যাহাহউক, বঙ্কিম বহরমপুরে আসিবার দুই তিন মাস মধ্যেই একটী সাহিত্য সভার সৃষ্টি হয়। এবং বঙ্কিম তাহাতে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৬ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে। আমরা ১৮৭০ সালের একটী প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত খবর পাইয়াছি—

"গত মঙ্গলবার রাত্রি ৭টার পরে বহরমপুরে গ্রান্টস হলে সাধারণের উন্নতির জন্য একটী সভা হইয়াছিল। সেই দিবসই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে অন্যত্র অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, ইহারা সকলে একৈক্য হইয়া স্থির করিয়াছেন প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সোমবার দিবস এই সভার অধিবেশন হইবে। এই সভা ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত সকল কার্য্যেরই উন্নতির জন্য হস্তক্ষেপ

করিবে। সভা হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্যামফেলেট বাহির হইবে। সকল সভ্য একত্র হইয়া অত্রত্য সাবরডিনেট জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়কে সভার প্রেসিডেণ্ট পদে অর্পণ করিলেন। এবং অত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ মহোদয়ের প্রতি ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদ অর্পিত হইল। বহরমপুর কলেজের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়কে সেক্রেটারীর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমরা এক্ষণে একচিত্তে ঈশ্বর সন্নিধানে নব সভার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছি।"

— ঢাকা প্রকাশ ৫ বৈশাখ ১২৭৭ রবিবার

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এইরূপ বিবরণী বিশেষ নাই। তারপরে ২।১ জন লেখক সামান্য স্মৃতি এবং লোকশ্রুতির উপর এইরূপ রং ফলাইয়াছেন, বিশেষতঃ নিজের অথবা আত্মীয়ের কাহিনী সবিস্তারে লিখিয়াছেন যে, প্রকৃত ঘটনা বাহির করা আয়াসসাধ্য। সাময়িক ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহারাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনই হইয়াছেন। তবে কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা বিচারের বিষয়। এই সম্বন্ধে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব—

দিগম্বর বাবুর পুত্র তারক বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালে লোকের সহিত বড় মিশিতেন না, সম্ভবতঃ মিশিবার ইচ্ছাও ছিলনা। রেভারেণ্ড লালবিহারী দের সহিত নাকি এক দিন প্রায় চারি ঘণ্টা কাল নলহাটী ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে বসিয়াছিলেন, কিন্তু একটি কথাও কহেন নাই। লালবিহারী দে দুই একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়াছি, এমন ভাবে উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি আর বেশী কথা কহিতে সাহস করেন নাই।"

ইহার কারণও তারক বাবু প্রদান করিয়াছেন—"এই সময়ে বহরমপুরে গ্রাণ্টহলের সৃষ্টি। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহারই যত্ন ও অধ্যবসায়ে অনেক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই গ্রাণ্টহলে প্রায় প্রতিবারে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। অধিকাংশ প্রবন্ধই বঙ্কিমবাবু ও লালবিহারী দে কর্ত্তৃক রচিত হইত। প্রবন্ধ পাঠকালে বঙ্কিম বাবুর কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন জনিত বৈচিত্র্য অনুভূত হইত। কৌতুকপ্রিয় দে সাহেব তাহা লইয়া রঙ্গ করিতেন এবং নানাচ্ছলে তাঁহার পঠিত প্রবন্ধের অপ্রিয় সমালোচনা করিতেন। বঙ্কিমবাবু তাহাতে হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইতেন। এই সকল সামান্য ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, বরং একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিলেই সঙ্গত হয়।"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :

"একটী সভায় বঙ্কিমচন্দ্র Indian Civilization সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বলেন, "বঙ্কিম প্রবন্ধে বাক্‌লের সভ্যতার ইতিহাস হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করেন।" লালবিহারী বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "তিনি বাক্‌লের কথা আপনার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। Sir Gurudas "Abused India vindicated" প্রবন্ধ পড়েন এবং মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'Poligamy' পড়েন"।

সাহিত্য ১৩২৪ পৃঃ ৫৭৩, লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই গ্রাণ্টহলের সভাপতি দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় (১৮৭০ কার্ত্তিক) চলিয়া গেলে, স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার স্থলে সভাপতি অভিষিক্ত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন। বঙ্কিম তখনই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন, "করিলেন কি?" কারণ ইহার পরে লালবিহারী বাবু গ্রাণ্টহলের কোন অধিবেশনেই আর উপস্থিত হয়েন নাই। তিনি ঐ সভার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ স্থানের সভাপতি হইবার যোগ্যতা তাঁহার ন্যায় অপর কাহারও ছিলনা।

[উক্ত "সাহিত্যে"র প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা]

যাহা হউক, বঙ্কিম ১৮৭১ সনের এপ্রিল মাসে একটী সুচিন্তিত সমালোচনা মুলক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির কতকাংশ ইতিপূর্ব্বে মদ্‌প্রণীত Indian Stage II এ

* Calcutta Reveiw No 104, Val 52. April 1871 p p 294 –316.

বাহির হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রভৃতি কবিপ্রতিভার এমন অপূর্ব্ব সমালোচনা আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ইহাতেও শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহার কিছুদিন পরে "Buddhism and Sankhya Philosophy" নামে বঙ্কিমচন্দ্র একটী বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।* এই সব প্রবন্ধ এবং বঙ্গদর্শনে লিখিত মূল্যবান পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং জাতীয়তামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, সে সম্বন্ধে তারক বাবু কথিত লালবিহারী দে মহাশয়ের ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা (যদি এরূপ হইয়া থাকে) তবে বস্তুতঃ তাহা নিতান্তই ঈর্ষাপ্রণোদিত।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক প্রভৃতি ভিন্ন কেবল অপরিচিত সাধারণ ব্যক্তির সহিত মিশিতেন না, তাহা নহে। নবাব রাজার সহিত ব্যবহারেও আত্মসম্ভ্রমের ক্রটী হইত না। এই বিষয়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসবের কাহিনী শচীন্দ্রচন্দ্রকে যেরূপ বলিয়াছেন, তিনি বঙ্কিম জীবনীতে তাঁহার অনুপম ভাষায় নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন :

"...বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ্য—বেরা। বেরা উৎসব খুব ধুমধামের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত—এখনও হয়; তবে সে জাঁকজমক আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ডকায় ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—স্তম্ভে স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমলমণ্ডিত ভেলার উপর, রূপযৌবন প্রফুল্ল নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের ভেলা, তার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই—শুধু কলাগাছ। কলাগাছের গায়ে অসংখ্য আলো! সুন্দর দৃশ্য! মাথার উপর ভাদ্র মাসের নির্ম্মল আকাশ—পদনিম্নে ভরা গাঙ্গের প্রেমময় উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

"সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়—সমারোহ নবাবের প্রাসাদে—ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন, জেলার বড় বড় জমিদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান বড় একটা জুটিত না। সাহেবেরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরির মালা পাইতেন—বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না, দুই একজন পাইত।

বহরমপুরে আসিবার কয়েক মাস পরে নবাবের কর্ম্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—আমি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া। শুনিতে পাই আপনারা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সম্মান প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।"

কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেলেন এবং নবাব ও দেওয়ানের নিকট সকল কথা বলিলেন। তাঁহাদের স্বপন নয়ন উন্মীলিত হইল। নবাবের আজ্ঞানুক্রমে দেওয়ান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিলেন; বলিলেন, 'আমাদের ক্রটী হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর হইবে না, সাহেবেরা যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।"

বাঙ্গালীরা পাইয়াছিলেনও তাই। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, সকল নিমন্ত্রিত হিন্দুই মালা পাইয়াছিলেন এবং সাহেবদের সঙ্গে সমান আদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

১২৭০ সালে কার্ত্তিক মাসে ছোট আদালতের বিচারপতি দিগম্বরবাবু বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান বদলী হন। যাইবার প্রাক্কালে বঙ্কিমের গৃহে ২২শে কার্ত্তিক সন্ধ্যার সময় সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিদায়ভোজে

---

* শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় ১৩২৩ এর সাহিত্য নামক মাসিক পত্রিকায় মাঘ ও ফাল্গুনে আর ১৩২৪ এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে এই চারিটী সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ হইতেই কতকাংশ পূজ্যপাদ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বঙ্কিম জীবনীর তৃতীয় সংস্করণে (২৩০ পৃঃ ৫ লাইন হইতে ২৩৮ পৃঃ ১৬ লাইন পর্য্যন্ত) বাহির করেন।

আপ্যায়িত করিবার জন্য একটী সভা হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যাপারের নেতৃত্ব করেন। ২৮শে কার্ত্তিক রবিবার (১২৭৭) প্রেমনাথ চৌধুরীর বৈঠকখানায় দিগম্বর বাবুকে সম্বর্দ্ধনা ও প্রীতি ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। এতদুপলক্ষে রাণী স্বর্ণময়ী একটী ঘোড়ার গাড়ী পাঠান এবং গুরুদাসবাবু, অক্ষয় সরকার মহাশয় ও তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (ভূদেব বাবুর জামাতা) সেই গাড়ীতে গিয়া দিগম্বর বাবুকে সভাস্থলে লইয়া আসেন।*

১৮৭৮ খৃঃ ২৫শে নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং তাহার বেতন হয় ৬০০৲।

ইতিপূর্ব্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আয়কর সম্বন্ধে একটী নূতন আইন পাশ হয়। উহা সত্তর সালের ১৬ আইন নামে অভিহিত হয় (Act XVI of 1870) ইহার বলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টারদিগকে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আসেসারের কাজ করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকেও ১১ই জুলাই, ১৮৭৪ হইতে আসেসার করা হয়।

১৮৭১ খৃঃ, ১৫ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র একমাসের জন্য কমিশনারের পার্শ্বন্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হন। ১৮৭১ খৃঃ জুন হইতে, কালেক্টারের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

এই সময়ে (১৮৭১) বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয় শ্রাদ্ধের কিছু পূর্ব্বে নলহাটী ষ্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়ায় উঠিয়াছেন, অমনি দেখিলেন—দুইটী পানোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ আরোহী সেই কামড়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মাতৃদশায় তাহার পরিধানে সাদা ধুতি ও গায়ে দেড় গজ কাপড়ের কাছা, পদতল নগ্ন। একে এই পোষাক, তারপর তাঁহার শীর্ণ দেহ, সাহেবরা দেখিয়াই খুব উপহাস ও কটুক্তি করিতে লাগিল। এবং তাঁহার চোখা চোখা কথায়ও কিছুমাত্র নিরস্ত না হইয়া প্রায় গাড়ী হইতে ফেলিয়াই দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু (কৈলাশবাবুর কথায় বলিতেছি) তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রকারিতায় প্রাণ রক্ষা পায়। "His activity, adroitness of movements and his extraordinary intelligence saved his life."†

পরবর্ত্তী ষ্টেশন খুব নিকটেই ছিল, তিনি নামিয়া প্রথম শ্রেণীতে যান। ইতর সাহেবরা দ্বিতীয় শ্রেণীতেই উঠে বলিয়া তিনি অতঃপর আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে কখনও উঠেন না। কৈলাশবাবুর কথায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কৈলাশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সহোদরা নন্দরাণীর পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ীতেই পিতামাতার সঙ্গে থাকিতেন। এবং ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। যাদবচন্দ্র কন্যা নন্দরাণীকে বাড়ীর দক্ষিণে পৃথক বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং পাঠকালে বঙ্কিম, পূর্ণচন্দ্র ও কৈলাশ বাবু অনেক সময় এক সঙ্গে হুগলী কলেজে যাতায়াত করিতেন। ইনি খুব বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ছিলেন। ইনি বলেন—

"বাড়ীতে আসিয়া গল্প বলিতে বলিতে আমার উল্লেখ করিয়া বলেন—

'আমি যদি কৈলাসের মত জোয়ান হ'তাম, তবে এঁদের সঙ্গে খুব জুঝে নিতাম'— ঐ পৃঃ ১২

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে মাতৃশ্রাদ্ধ খুব সমারোহেই সম্পন্ন হয়। যাদবচন্দ্র তখন পেনসন ভোগ করিতেছেন, শ্যামাচরণ, সঞ্জীব ও বঙ্কিমচন্দ্র তিন জনই ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, পূর্ণচন্দ্র তখনও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হন নাই, তবে বেশ ভাল চাকুরী করেন। কৃতী স্বামীর পত্নী, দিগ্বিজয়ী পুত্রের মাতা, শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, অনুমান খরচ হয় দশ হাজার টাকা। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র—"কৃষ্ণকান্তের উইলে" একটু পরিচয় দিয়াছেন—

"দিন কতক বড় হাঙ্গামা গেল। দিন কতক মাছির ভন্‌ভনানিতে তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালীর কোলাহলে নৈয়ায়িকের বিচারে গ্রামে কান পাতা গেলনা। সন্দেশ মিঠায়ের আমদানী, কাঙ্গালীর আমদানী, টিকি নামাবলীর আমদানী। ছেলেগুলো মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল, মাগীগুলা নারিকেল তেল মহার্ঘ্য দেখিয়া মাথায়

* সোমপ্রকাশ ১২৭৭, ১৪ই অগ্রহায়ণ।

† A few sayings and opinions of Late Babu Bankim Chandra Chatterjee by Koylash Chandra Mukherjee, Bhabani Press, Hoogly, 1902.

লুচি ভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল, গুলীর আড্ডা বন্ধ হইল সব গুলিখোর ফলাহারে—"

যাহা হউক, জননীর মৃত্যুর পরে বঙ্কিম একেবারে জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এ পর্য্যন্ত বঙ্কিম তিনখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, প্রত্যেকখানিই তাঁহাকে যশের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। লেখকরূপে তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য নয়। গুপ্ত কবির তীক্ষ্ণধার কথাগুলি সর্ব্বদা তাহাকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করিত—

"দেশের দারুণ দুখ্ দেখিয়া বিদরে বুক
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মশী ছাঁদে
শোক অশ্রু করে বরিষণ,
জাননা কি জীব তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৫, ১লা বৈশাখ

এপর্য্যন্ত বঙ্কিম সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অনেক ব্যাপারই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। দেখিয়াছেন সুবর্ণরেখা হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত, ভৈরব হইতে রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত, সাগরতীর হইতে পদ্মাপার পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণ কি নিদারুণ দুঃখে দিনপাত করিতেছে, কিরূপ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার সকলকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, দেশ নিরন্ন, কৃষক করভার প্রপীড়িত, শিক্ষিত অশিক্ষিতে ধনী নির্ধনে প্রাণের কোন যোগ নাই, মাতৃভাষার প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা নাই, সাহেবীয়ানা চালের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব, অনুকরণপ্রিয়তা মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। এই অবস্থার প্রতীকার কি, তাহাই তাহার প্রধান চিন্তা হইল। এই চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন, কত নৈশ উপাধান অভিষিক্ত করিতেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আনন্দমঠে তিনি ভবানন্দের মুখে এইরূপ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মহেন্দ্র সিং, দেখ সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাটে, তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমিতো দেখি নাই, কিন্তু সাপের ঘারে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে, তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চি, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা?"

কিন্তু যতবার চিন্তা করিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, কাহারও কোন সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা নাই, একাই তাহাকে এই মহাকার্য্য করিতে হইবে, একাই ছয় কোটি নিদ্রিত লোককে জাগাইতে হইবে, জন্মভূমির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে, তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমি একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।"

কিন্তু তিনিতো একা, কি অস্ত্র তাহার আছে? তাহার শক্তি কৈ? তবে তাহার যে শক্তি আছে, তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখাইলেন দেশকে জাগাইতে, দেশবাসীর মোহান্ধকার দূর করিতে সাহিত্যের শক্তি অমোঘ। সেই শক্তিরই সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। অতঃপরে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন—তাহাই খাঁটি জাতীয় সাহিত্য, আর সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীকে তখন বাঙ্গালী হইতে শিখাইয়াছে। এই জাতীয় সাহিত্যই ঋষি প্রদর্শিত পুণ্যপ্রবাহিতা ভাগীরথী—যাহা শঙ্খ ফুকারিয়া বাঙ্গালী জাতির উদ্ধারার্থে বঙ্গভূমে তিনিই প্রবাহিত করিয়াছেন। এই ভাবপ্রসূত 'আমার দুর্গোৎসব', 'বন্দেমাতরম সঙ্গীত' ও পরিকল্পিত আনন্দমঠ কাল্পনিক রচনা নয়, কমলাকান্তও অহিফেনসেবী নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ নয় আর আনন্দমঠের সত্যানন্দও কল্পিত সন্ন্যাসী নহেন। আনন্দমঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই। সাধক ঋষি সকলকে বুঝাইয়া দেন—

"যে মনুষ্য জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতে না পারে—সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য, যে জাতি জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতে না পারে—সে জাতি হতভাগ্য।"

বঙ্কিম সকলকে বুঝাইয়া দেন—এ যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতেও ভয় করিও না—মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনই একমাত্র পণ মনে করেন

না—চাহেন সর্ব্বতোমুখী ভক্তি বা সর্ব্বস্ব। তাই যখন সত্যানন্দ বিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রার্থনা করিলেন, "আমার মনোস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?"

উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, জীবন তুচ্ছ—সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

"আর কি আছে, আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'। এই ভক্তিধারায়ই বঙ্কিম-সৃষ্ট জাতীয় সাহিত্য প্রবাহিত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাহির হয়, আর পত্র সূচনায়ই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন, মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক তাহার সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে সব তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উন্নত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাঁহাদিগের উন্নতি কোথায়? কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন, যতদিন এই ভাব ঘটে নাই, যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণ স্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স ও স্পার্টা দুই-ই প্রতিযোগিনী নগরী, এথেন্সে সকলে সমান, স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যা প্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল, ফ্রান্সে পার্থক্যহেতু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজ-পীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত পদাদি ছেদ করিয়া যেরূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গল সাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন, মিশরদেশ সাধারণের সহিত ধর্ম্মযাজক-দিগের পার্থক্যহেতু অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য, এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল এমত কোন দেশে জন্মে নাই এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

"সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ; সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত না হইলে সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতা-দিগের সহিত সহৃদয়তা লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।"

অতএব আমরা দেখিলাম যে, দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেই দেশের মধ্যে পার্থক্য চাহিতে পারে না।

আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতে প্রভেদ আছে, বর্ণগত পার্থক্য আছে, সম্পত্তিগত পার্থক্য আছে। সুতরাং যদি আমেরিকা, ইংলণ্ড, রোম, এথেন্সের মত উন্নতি করাই কাম্য হয়, তবে পরস্পরে একতাবদ্ধ হইয়া, অসামঞ্জস্য দূর করা এবং যে ভাষায় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় সম্ভব হয়, সেই ভাষায় একে অন্যকে মনোবেদনা জ্ঞাপন করাই বিধেয়।

সেই সময়ের এইরূপ লোকশিক্ষার জন্য লোকের প্রাণে অনুভূতি জাগাইবার জন্য, লোককে দেশের প্রতি সর্ব্বমুখীন করিতে বঙ্কিমের হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহা লইয়াই বঙ্কিম সব্যসাচীর মত শর সন্ধান করিলেন।

কেন ভাষার প্রতি তাহার এত পক্ষপাত? তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে লোকের মন বিগড়াইয়া যাইতেছিল, সাহেবিয়ানায় ভরপুর ছিল, লোকে বাঙ্গলা শিখিতে পড়িতে জানিতে লজ্জিত হইত, তাই বঙ্কিম মনে করিলেন লোকের মন তৈয়ার করান দরকার, এই ভাব পরিবর্ত্তন আবশ্যক, লোককে disanglicise না করিলে কোন মঙ্গলই সম্ভব নয়। তাই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্কিম বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলিতেছেন—

"এখন নব্য সম্প্রদায়ের কোন কাজই বাঙ্গলায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে, সাধারণের কার্য্যে মিটিং লেকচার এড্রেস, প্রসিডিংস সমুদায় ইংরাজীতে; যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীতেই হয়, কখনও ষোল আনা কখনও বার আনা ইংরাজী। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গলায় হয় না। আমরা কখনও দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন সেখানে বাঙ্গলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের এখনও ভরসা আছে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতে পঠিত হইবে।

"বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজী পড়ি যত ইংরাজী কহি বা ইংরাজী লিখিনা কেন, ইংরাজী কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ হইবে মাত্র, ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিনকোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল, প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবন যাত্রার সুসহায় নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজী লেখক ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখনও খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

"একথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না যে, উক্তি ইংরাজীতে হয় তাহা কয়জন বাঙ্গালী হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গলায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত করিতে না পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদেরই বুঝা প্রয়োজন সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই, সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না কস্মিনকালে, বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না কস্মিনকালে, কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্যভাষা করিতে পারে নাই, সুতরাং বাঙ্গলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিনকোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

এই নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বর্দ্ধিত করিবার জন্যই বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের সূচনা।

গুজবের গজাল

শ্রীঅখিল নিয়োগী

প্রচণ্ড কোলাহলে রাজপথের মাঝখানেই ভণ্ডুল থমকে দাঁড়ালো। সবাই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে কথা বলতে চাইছে, ফলে কারো কথাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না—শুধু গোলমালটা উদারা থেকে মুদারা এবং তারো উঁচুতে—তারায় গিয়ে পৌঁছুচ্ছে!

ভাবলে এগুবে—না—পেছুবে?

এমন সময় দেখা গেল একটি লোক মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে আসছে। ভণ্ডুল তাকে জিজ্ঞেস করলে, ম'শাই ওদিকটায় কি হয়েছে বলতে পারেন? সবাই এমন ভাবে একসঙ্গে চীৎকারই বা করছে কেন—আর ছুটে পালাচ্ছেই বা কিসের ভয়ে?

ভদ্রলোকের দাঁড়িয়ে কথা বলবার পর্যান্ত মনের জোর নেই; বল্লেন, পালান ম'শাই, পালান। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কি হয়েছে শুনতে গিয়ে পৈত্রিক প্রাণটা হারাবেন নাকি?

বলেই আবার চোঁ—চাঁ দৌড়!

ভণ্ডুল ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

আরো দু'জন লোক একসঙ্গে দৌড়ে আসছে।

ভদ্রলোক দু'জন যেন প্রশ্ন শুনেও হকচকিয়ে গেলেন। প্রশ্ন কর্ত্তাই এক্ষুণি একটা বিপদে ফেলবেন, এমনি চোখ-মুখের ভাব। তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্লেন, গুলী চলছে ম'শাই, গুলী! ওদিকে পা বাড়িয়েছেন কি অক্কা পেয়েছেন!

— কিন্তু গুলীর ত' কোনো শব্দ পাচ্ছি না? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ভণ্ডুল।

একজন লোক থমকে দাঁড়িয়ে ফোঁড়ন কাটেন, গুলীর শব্দ যখন কাণে পৌঁছুবে, তখন আর জবাব দেওয়ার মতো শক্তি থাকবে না। গরীবের কথা বাসি হ'লে ভালো লাগে, এই কথাটি ভুলবেন না—হুঁ!

ব'লেই দু'জনে আবার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেন।

ভণ্ডুল ভাবলে, আচ্ছা, দু' পা এগিয়েই দেখা যাক্ না! বেশীদূর এগুবার ফুরসৎ কোথায়?

পথের ধারে ধারে যে এত বেশী হিতৈষী লুকিয়ে ছিল—সে কথা কি ভণ্ডুলের আগে জানা ছিল!

একজন সত্যি-সত্যি পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন।

মাথায় পাগড়ী—বিরাট ভুঁড়ি—খাটো বেনিয়ান—গায়ে আঁটোসাঁটো হ'য়ে ব'সে গেছে। একপাটি জুতো যে কোথায় খ'সে প'ড়ে গেছে, সেদিকে ভদ্রলোকের আদপেই খেয়াল নেই!

দু' হাত দিয়ে নিষেধের বেড়া তুলে বল্লেন, ও ধার যাবেন নি মুশা'—ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে, কটা খতম হ'য়ে গেল, কেউ বলতে পারবে না। সব হি ভগবানে হিচ্ছা!

একপাটি জুতো পায়ে দিয়েই বিশাল বপু মারোয়াড়ী ভদ্রলোক আবার প্রাণের দায়ে ছুটতে লাগলেন। তিনি যে পথের মাঝখানে খানিকক্ষণ থেমেছিলেন এবং নেহাৎই বাক্যব্যয় ক'রেছিলেন—সেটা কেবলমাত্র নিছক—পরোপকারপ্রবৃত্তি থেকে!

ইতিমধ্যে ভণ্ডুলের কৌতূহল বেড়ে গেছে!

দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা কি! সঙ্গে ত' আর জেনানা নেই!

গুটি-গুটি পা-পা করে অকুস্থানের দিকে এগিয়ে চলে ভণ্ডুল। কিন্তু পরোপকারী আর হিতৈষীর সংখ্যা ত' আর পৃথিবী থেকে কমে যায়নি!

হুড়মুড় করে জনাকয়েক ব্যক্তি একেবারে যেন তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল! তাদের ভাবটা এমন যে, কারো গায়ে নিদেনপক্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়লে তাদের ভয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস পাবে!

—কি—কি? ব্যাপারটা কি? এবার ভণ্ডুল যেন প্রাণের দায়ে একটু মরিয়া হয়েই প্রশ্ন করে।

জনাকয়েক হাঁফাতে থাকে। ওরই মধ্যে যার দম একটু বেশী সে চোখ দুটো কপালের ওপর তুলে ফিস্

ফিস্ করে উত্তর দেয়, কমিউনিষ্ট মশাই—কমিউনিষ্ট! একেবারে ডাইনে-বাঁয়ে অ্যাসিডের বোতল ছুঁড়ছে। চোখে লাগলে অন্ধ হয়ে সারা জীবন ঘরে বন্ধ থাকতে হবে।

ভণ্ডুল শুধোয়, বলেন কি?

ভদ্রলোক তেমনি রাজ্যের উৎকণ্ঠাকে নিজের চোখে মুখে জমা করে তুলে জবাব দেয়, যদি পৈত্রিক প্রাণের কিছুমাত্র মমতা থাকে তবে ওদিকে আর এক পা-ও এগুবেন না; এখান থেকেই সটান সরে পড়ুন।

যত ভয়ের কথা কানে ঢোকে—ভণ্ডুলের সাহস যেন ততই বেড়ে যায়। কাউকে কোনো প্রশ্ন না ক'রে আরো খানিকটা এগিয়ে চলে ভণ্ডুল।

এইবার একদল গোয়ালা ছুটতে ছুটতে আস্‌ছে—সঙ্গে তাদের এক পাল গাই। ওদের নিজেদের হাতেও লাঠির অভাব নেই! তবু অমনভাবে ওরা পালাচ্ছে কেন?

ভণ্ডুল এবার যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়!

—তা হলে কি সত্যি সাঙ্ঘাতিক কিছু? মৃত্যুর পথে এমন ভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোনো সার্থকতা নেই!

একজন গোয়ালা তাকে টাল-বাহানা করতে দেখে বল্‌লে, বাবু, আর ওদিকে এগুবেন না! হিন্দু-মুসলমানের লড়াই সুরু হয়ে গেছে। ওরা গরু দেখছে আর জবাই করছে! দু' একজনের মুখেও গোস্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই ত' গাইগুলো নিয়ে পালাচ্ছি। একটু দাঁড়ালে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত!

ব্যাপার যে ক্রমশঃ সঙ্গীণ হয়ে উঠ্‌ছে সে কথা বুঝতে ভণ্ডুলের আর অসুবিধে হল না! কিন্তু চোখের সামনে এমন একটা লড়াই হয়ে যাবে—আর সে একটু দেখতে পাবে না? প্রাণভয়ে পালাবে? প্রত্যক্ষদর্শীর আত্ম-গরীমা একটা সব সময়ই থাকে। সেই সুযোগ থেকে ভণ্ডুল কি করে বঞ্চিত হয়?

যাক্, এ্যাদ্দুর যখন এসে পড়েছে তখন আরও একটু না হয় এগিয়ে দেখবে।

গোয়ালার দল লাঠি হাতে গরু তাড়াতে তাড়াতে ছুটে চলে গেল।

সত্যিই ত! গরু যদি জবাই ক'রে দেয় তবে তাদের দুধের ব্যবসা চল্‌বে কি ক'রে?

ভণ্ডুলের মন এখন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। হ্যাঁ—কি-না—না—কি—হ্যাঁ?

ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে সে একটি ছড়া শিখে-ছিল—

খাই কি না খাই—না খাই।

নাই কি না নাই—নাই (স্নান করি)

যা থাকে কপালে—দুর্গা ব'লে ঝাঁপিয়ে প'ড়বে সে।

অবগাহনেরও ত একটা আনন্দ আছে!

পাঁক পাবে কি—নির্ম্মল সলিল মিলবে সে বিচার পরে।

এবার ভণ্ডুলের গতি দ্রুত!

কিন্তু পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো আর একদল লোক।

—খবর্দ্দার, ওদিকে যাবেন না বাবু! একটা দাগী আসামী ধরা প'ড়েছে বাবু! একাই একশ' লোককে দা' দিয়ে ঘায়েল ক'রেছে! পাহাড়াওয়ালারা কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারছে না!

খবর তা' হ'লে সাঙ্ঘাতিকই বল্‌তে হবে।

কিন্তু আচার যতো ঝাল আর টক হয়—তার আকর্ষণ তত বেশী। কাজেই এই দাগী আসামী, যে একা দা' দিয়ে একশ' লোককে ঘায়েল করতে পারে—তাকে চোখে না দেখলে জীবনে বৈচিত্র্য আসবে কোত্থেকে? পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে গল্প করা চলে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা জীবনে খুব কমই ঘটে। সেই রকম একটা ঘটনা যখন নাকের ডগার ওপর এসে পড়েছে—তখন দু' পা এগিয়ে গিয়ে দেখতে দোষ কি?

দ্রুতপদে এগিয়ে চলে ভণ্ডুল।

দু'জন লোক গল্প করতে করতে ওইদিক থেকেই আস্‌ছিল।

ভণ্ডুল থম্‌কে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে খবরটা জিজ্ঞেস করলে। পান চিবুতে চিবুতে একটি লোক বল্লে, আরে ম'শাই, মেয়ে চুরির ব্যাপার! আগে থেকেই যোগ-সাজস ছিল। বুঝতে পাচ্ছেন না?

বাড়ীর লোকে কি ক'রে জানতে পেরে সেই মানুষটাকে আটকাতে যায়, আরে ম'শাই সে হচ্ছে ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া লোক! শরীরে তাগদ্ কতো! দিয়েছে বহু লোককে ঘায়েল ক'রে! ওদিকে মেয়েটার কাণ্ড দেখেছেন? নিজের গয়নাগুলি ত' পুঁটলি বেঁধে নিয়েছেই, উপরন্তু মায়ের গয়নাগুলি নিয়ে ও স'রে প'ড়বার মতলবে ছিল। হুঁ হুঁ ম'শাই, চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—যদি না পড়ে ধরা! ওই হাত-সাফায়ের কাজ ক'রতে গিয়েই ত' শ্রীমতী ধরা প'ড়ে গেল! আরে ছি ছি! একেবারে ঘরের কেলেঙ্কারী ম'শাই, ঘরের কেলেঙ্কারী!

ভণ্ডুল ভয়ানক দমে গেল কথাটা শুনে।

কোথায় এক দারুণ দস্যু সর্দ্দারকে দেখতে পাবে—ইয়া বুকের পাটা, ইয়া ভাটার মতো চোখ, দু'হাতের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে—হিমালয় আর বিন্ধ্য পাহাড়ের মতো···তা নয় কিনা—একেবারে মেয়ে চুরির ব্যাপার। মানুষকে এমন করে হতাশ করে দিতেও পারে এরা!

কি করবে ভণ্ডুল শেষ পর্য্যন্ত!

রাগ করে পাশের পানের দোকান থেকে একটা দোক্তাদেয়া পানই চিবুতে সুরু করে দিলে।

বিড়ি ফুঁক্তে ফুঁক্তে চোখে পড়ল আসল ভীড়ের জায়গাটা! তাইত! ওই খানেই যতরাজ্যের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে!

এতদূরই যখন এসে পড়েছে তখন আসল ব্যাপারটা দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক্।

বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ভণ্ডুল এগিয়ে চলে।

ভীড় ঠেলে ভণ্ডুল পথ করে নেয়।

লড়াই—মারামারি—যুদ্ধ—যা খুশী বলা যেতে পারে।

কিন্তু কোনো দস্যুর ব্যাপার নয়, মেয়ে চুরিও নয়—হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, কমিউনিষ্টের অ্যাসিড্ ছোড়া—তারও কিছু নয়।

দুই ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে এই বিরাট জনতার সমাবেশ!

ষাঁড় দুটিরও দুটি পক্ষ হয়ে গেছে।

একদল লোক উৎসাহিত করছে কালো ষাঁড়টাকে—আর একদল বাহোবা দিচ্ছে শিঙ্ ভাঙা সাদা ষাঁড়টাকে!

ঘড়া-ঘড়া জল ঢালা হয়েছে। কলার পাতা, কলার খোসা, পান ইত্যাদি ছড়ানো রয়েছে দু'ধারেই। ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব মুখরোচক খাদ্য চর্ব্বণ করে, বুকে জোর করে আবার নব উৎসাহে তারা দুটি লড়াইয়ে মেতে উঠুক।

ষাঁড় দুটিও কম যায় না!

এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ।

গুঁতোগুঁতির চোটে সাদা রঙের ষাঁড়টির ত' একটা শিঙই ভেঙে গেছে। কিন্তু তাতে তার বিক্রম কিছু মাত্র কমেনি।

বরং সে আরো মরিয়া হয়ে গায়ের সমস্ত শক্তিতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছে।

একটা ঢাকি যাচ্ছিল ওই অঞ্চল দিয়ে।

বোধ হয় কোনো পূজো-পার্ব্বণে বায়না ছিল।

ভক্তের দল তাকে কিছুতেই ছাড়বে না, এমন কি আশে-পাশের পানওয়ালারা পয়সা কবুল করে তাকে আটকে ফেল্লে।

ঢাকী বুঝলে, পড়েছে মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।'

এম্নি যখন ছাড়ান পাবে না, তখন কিছু পয়সাই কামানো যাক্।

বিপুল উদ্যমে সে ঢাকে কাঠি দিতে সুরু করলে!

ষাঁড় দুটির সমর্থক দুটি বিরুদ্ধ দল ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঢাকের বাদ্যি শুনে তারা নতুন উদ্দীপনা লাভ করলো।

কেউ কেউ কোমরে ও মাথায় গামছা জড়িয়ে ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে নাচ্তে সুরু করে দিলে।

আবার নতুন ক'রে দর্শকদল জমতে লাগলো।

অফিসফেরৎ কেরাণী বাড়ীর কথা ভুলে দাঁড়িয়ে গেল, আমওয়ালারা ঝাঁকা নামিয়ে রগড় দেখতে লাগলো, ঠ্যালাওয়ালারা ঠ্যালা-গাড়ী এক পাশে সরিয়ে রেখে দাঁত বের ক'রে হাস্তে সুরু করলে, চানাচুরওয়ালার দল আরো নতুন গাহেক পেয়ে বিক্রির কাজে তৎপর হয়ে উঠল,—এমন কি হঠাৎ দিলদরিয়া হয়ে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে বিনে পয়সায় প্যাকেট দিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে—

চানাচুর লে যা রে ভাই—
ষাঁড়ে ষাঁড়ে লাগলো লড়াই!

ইস্কুল ফেরৎ ছেলের দলের ভীড় সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল!

এমনি যখন সেখানে একটি নাটকীয় পরিস্থিতি জমে উঠল—হঠাৎ সেই শিঙভাঙা সাদা ষাঁড়টি ছুটে এসে ভণ্ডুলের হাঁটুতে এমন ঢুঁ মারলে যে, সে সঙ্গে সঙ্গে পপাত ধরণীতলে!

এইবার দুই দলেরই লোক সোল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল। এতক্ষণ যেন ষাঁড়ের লড়াইটা একেবারে আলুনি ছিল!

এতবড় একটা যুদ্ধ জমে উঠেছে, লোক এসে দাঁড়িয়েছে কাতারে কাতারে, তবু একটি প্রাণীও জখম হল না—এ যেন কেমন মিয়োনো মুড়ির মতো ঠাণ্ডা খবর।

সবাই দশজনের কাছে গিয়ে রসালো করে গল্প করতে পারে এমন একটি ছিঁটে ফোঁটা কাণ্ডও যদি না হয় ত' এতক্ষণ ধরে বাহবা দেয়া একেবারে বৃথা!

তাই ভণ্ডুলের উরুভঙ্গের ব্যাপার দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে জনতা। পানওয়ালারা ঘটি ঘটি জল এনে উরুতে ঢালতে সুরু করে, একটা লোক ঝাঁকা করে শাকসব্জী ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছিল। তার ভেতর ছিল কিসের পাতা। তাই ছেঁচে উরুতে দিলে খানিকটা থাবড়ে। ভণ্ডুল যত চ্যাঁচায় লোকটা তত থাবড়ায়। বল্লে, বড়ি আচ্ছা দাওয়াই—বিলকুল ঠিক হো যায়েগা!

ততক্ষণে ঝাঁকামুটের দল তৎপর হয়ে উঠেছে। কারো কোনো কথা না শুনে চ্যাং-দোলা ক'রে তুলে ফেলেছে ভণ্ডুলকে।

পরোপকারীর দল যে এত বেশী সচেতন, ভণ্ডুলের আগে জানা ছিল না! সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠ্যালাগাড়ীর গাড়োয়ান তার গাড়ীটাকে নিয়ে এগিয়ে আসে। ঝাঁকামুটের দল তারই ওপর ভণ্ডুলকে চীৎ করে ফেলে।

সমবেদনায় এতক্ষণ যারা উল্লাস করছিল এবং যাদের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—এবং যে সব লোকেরা বত্রিশ পাটি দাঁত এক সঙ্গে বিকশিত করে ফেলেছিল—তারা সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললে—

"কদম কদম বাড়ায়ে যা—
মিটিয়া কলেজ—যা চলি যা

মুক্তি-যজ্ঞানলের আহুতি

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

লৌহ-কারার দুয়ার ভেঙেছি আমরাই একদিন,
আমরা জ্বেলেছি মহাকাল বুকে দীপ্ত অগ্নি-শিখা,
ঊষা দিশাহারা সীমান্ত হ'তে নিমেষে হ'য়েছে লীন,
দিগন্তপটে অন্তহীনের আঁকিয়া রক্ত-টিকা।
ধু ধু মরু-বুকে প্রাণের চিহ্ন করেছি যে সন্ধান,
স্বপ্ন-কাজল ধুয়ে মুছে গেছে অশ্রুজলের স্রোতে;
প্রলয় এনেছে ইসারা প্রাণের, বিপ্লব মহীয়ান,
দুর্জ্জয় বাধা বলীয়ান্ হ'য়ে এসেছে যাত্রাপথে।

তুচ্ছ ক'রেছি সংসার-মায়া বজ্র-আলিঙ্গনে,
করাল ভ্রূকুটি আনেনি চিত্তে বিঘ্নের বিভীষিকা,—
অন্ধ পৃথিবী ছিল আলেয়ার জর্জ্জর বন্ধনে,
আমরাই তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লিখেছি অগ্নি-লিখা।
তাই কি মোদের জীবনের বাণী আজি শুধু কোলাহল,
মুমূর্ষু বুকে ম্লানিমার ছায়া, দৈন্যের সীমা নাই;
যুগান্তরের সংগ্রাম-শেষে এই কি গো প্রতিফল,—
'মুক্তি-যজ্ঞানলের আহুতি',—অঙ্গার আজি তাই?

নিখিল ভারত চারু-কলা প্রদর্শনী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বাঁচিবার স্থান ০ শিল্পী—রথীন মৈত্র

বড়দিনের সময় কলিকাতায় "একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস" কর্ত্তৃক এবার যে 'নিখিল ভারত চারু কলা প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হয়, তাহা সর্ব্বরকমে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ অমৃতসর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, ইন্দোর ও শান্তিনিকেতন প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ২৫০০-এর উপর চিত্র ও ভাস্কর্য্য উদ্যোক্তাগণ পাইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া গঠিত মনোনয়ন কমিটি স্বযত্ন পরীক্ষার পর তাহার মধ্য হইতে ৬৩৬টী শিল্প নিদর্শনকে প্রদর্শনীতে স্থান দেন। এবার সকল দলের এবং সকল মতের শিল্পী-সমাজের একত্র সমাবেশ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের অঙ্কিত তৈল ও জল রং, প্যাষ্টেল ও ফ্রেস্কো চিত্র এবং এচিং, উডকাট্ ও ভাস্কর্য্য-সমূহ দেখিয়া, ভারতে বর্ত্তমান শিল্পের ধারা যে কোন দিকে বহিতেছে, তাহা অনুমান করা শিল্পরসিকদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কলিকাতায় 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও সভাপতি ছিলেন। শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু প্রথম সম্পাদক। কয়েক বৎসর নিয়মিত ভাবে কলিকাতার যাদুঘরে বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যাদুঘর সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকায় ১৯৪১, '৪২ ও '৪৩ সালে প্রদর্শনী সম্ভব-পর হয় নাই। ১৯৪৪ সালে গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল ভবনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তৎপরে সামরিক বিভাগের কবল হইতে যাদুঘর মুক্ত হওয়ায়, পুনরায় উক্ত ভবনেই প্রতি বৎসর প্রদর্শনী হইতেছে।

মহারাজা ঠাকুর পরলোক গমন করিলে, মাননীয়া লেডী রাণু মুখার্জ্জি 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস'-এর সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং ইহার উন্নতি-কল্পে সবিশেষ যত্ন লইতেছেন। বর্ত্তমানে কুমার জে, সি, সিংহ, শ্রী কে, ডি, ঘোষ এবং অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক।

এবারের পঞ্চদশ বার্ষিক চারু-কলা প্রদর্শনী ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ হইতে আরম্ভ হইয়া ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫১ পর্য্যন্ত খোলা ছিল। গড়ে প্রতিদিন ৭।৮ শত করিয়া দর্শকদের সমাগম হয়। রবিবার ও ছুটীর দিনে দর্শকের সংখ্যা দেড় হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

তপোবন শিল্পী—কমলারঞ্জন ঠাকুর

প্রদর্শনীতে শিল্প প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের জন্য এবার শিল্পীগণকে বিভিন্ন বিভাগে চতুর্দ্দশটী সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃতী শিল্পীগণ ১০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আরও দ্বাদশটী পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছেন।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনরূপে বিবেচিত হইয়াছে একটী খোদিত কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি (Affection বা স্নেহ)। ইহার জন্য শিল্পী ধনরাজভগত রাজ্যপাল্ প্রদত্ত সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্র ও শ্রেষ্ঠ জল রং চিত্রের জন্য যথাক্রমে ভি, ডি, চিন্চল্কার ও কানোয়াল কৃষ্ণ সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুরকে সুবর্ণ পদক দেওয়া হইয়াছে। 'মডার্ণ আর্টে' এম, এফ, হোসেন সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। ভাস্কর্য্যে ধনরাজভগত সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন। 'এচিং'-এ শ্রীহরেন দাসকে এবং ভাল চিত্রের জন্য শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে সুবর্ণ-পদক দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরিত চিত্রাদি ব্যতীত খ্যাত-নামা প্রবীণ শিল্পীদের অঙ্কিত বহু চিত্র প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। প্রথমেই বর্ষীয়ান শিল্পী শ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত কয়েকখানি তৈল রং দৃশ্য চিত্র সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের লোকের অধিক দিন কর্ম্মক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ইহা সকলক্ষেত্রে সত্য নহে। ৭৫ বৎসর বয়সেও শিল্পী যামিনীপ্রকাশের সৃজনী প্রতিভার উৎসমুখ আবৃত হয় নাই। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের অঙ্কিত রামায়ণের কয়েকখানি চিত্রও আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। এবার প্রদর্শনীতে দৃশ্য ও প্রতিকৃতি চিত্রেরই বাহুল্য দেখা গিয়াছে। মনে হয়, 'সাবজেক্ট পেন্টিং' হইতে শিল্পীরা ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছেন। ইহা অবশ্য আনন্দের কথা নহে। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কয়েকখানি চিত্র প্রশংসনীয়। কিশোরী রায়, এল, এম, সেন, ভি, ডি, চিন্চলকার, জি, ডি, আরুলরাজ, কে, সি, এস্, পানিকর, হরেন দাস, রথীন্দ্র সেন, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী এবং ইটালিয়ান শিল্পী লসিভিটা নিনোর কাজ আমাদের আনন্দ দান করিয়াছে। অনেকদিন পরে আচার্য্য নন্দলাল বসু প্রদর্শনীতে চিত্র দিয়াছেন! যাহাতে তিনি প্রতি বৎসর দেন, ইহাই আশাকরি। অধ্যক্ষ অসিতকুমার হালদার প্রবীণ বয়সে আবার তৈলচিত্র অঙ্কনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা। কানোয়াল কৃষ্ণের জলরং চিত্রগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুরের 'তপোবন' চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের কৃপাল সিং সেখোয়াৎ

'শ্রীদুর্গা'—অষ্টধাতু ০ শিল্পী—বিভূতিভূষণ সেন

অঙ্কিত 'ম্যারেজ অফ্ পাবুজী রাঠোর' চিত্রখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। এরূপ ধরণের মোগল পদ্ধতিতে অঙ্কিত এত ভাল ছবি সচরাচর দেখা যায় না।

এবার মডার্ণ আর্টের চিত্রের কিছু আধিক্য দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্রশিল্পীরা 'সাবজেক্ট পেন্টিং' হইতে সরিয়া যাইতেছেন। অথচ, এই মডার্ণ আর্টের আধিক্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে গৌরবের কিনা, শিল্পী রসিকদের তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, আমরা মনে করি, পাশ্চাত্য আধুনিকতার মোহে আবিষ্ট তরুণ শিল্পীগণকে দেশের শিল্পের দিকে তাকাইতে এবং তাহা হইতে প্রেরণা লইতে হইবে। তাঁহারা নিজের শক্তিতে দেশের শিল্পকলাকে উন্নত করিতে সক্ষম হইবেন।
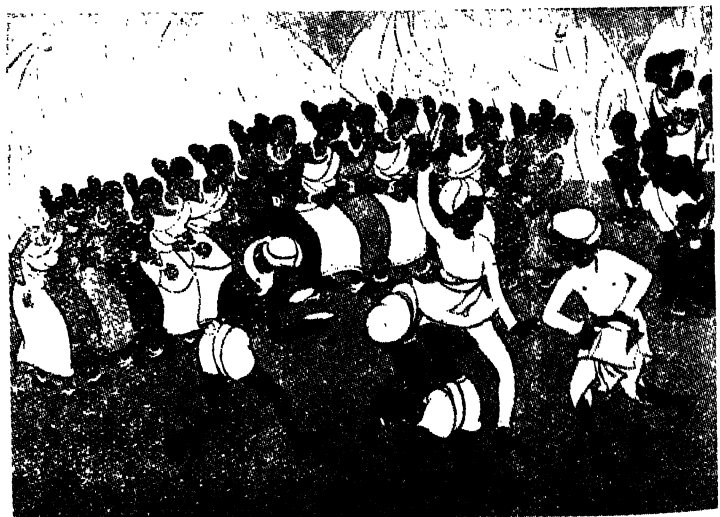
প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্যেরও অনেকগুলি সুন্দর নিদর্শন ছিল। ধনরাজ ভগতের কাজগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। শ্রীদাম সাহার 'ব্রতচারী নৃত্য' ও ইন্দুমতী লাঘেটের কৃত 'ডাঃ কে, এন, কাটজু' আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বিক্রয়ের দিক হইতে এবার ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০,০০০৲ টাকার চিত্রাদি প্রদর্শনী হইতে শিল্প অনুরাগীরা ক্রয় করিয়াছেন। আনন্দের কথা যে, কেবল ধনীরা নহেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও শিল্প সংগ্রহে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ৭০৲ ৮০৲ ও ১০০৲ টাকার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অনেক চিত্র তাঁহাদের গৃহ শোভা বর্দ্ধনের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করা হইল। সাধারণ একজন শিল্পঅনুরাগী দর্শক হিসাবেই স্বীয় কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কয়েকটী শিল্প নিদর্শনের ফটো চিত্র যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। *

* (ফটো সোসাইটি, ১৫৭ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা, চিত্রগুলি তুলিয়াছেন।)

করম্ নৃত্য — শিল্পী—লীলা সুবরওয়াল

রণজিৎ কুমার সেন

আঠার

মেসে ফিরতে বিজনের সেদিন অস্বাভাবিক রাত্রি হ'য়ে গেল। পথের দুর্ভোগ তাকে আপন ইচ্ছাতেই গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল। নির্জ্জন রাত্রির কল্‌কাতার রূপ যে কত রহস্যপূর্ণ, তা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখবার অবকাশ হয়নি বিজনের; দু'চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে আবার নতুন ক'রে দেখ্‌ছিল সে কল্‌কাতাকে, দেখ্‌ছিল আর ভাবছিল নিজের আগামী মুহূর্ত্তগুলোর ইতিহাস।

মেসের সঙ্কীর্ণ ঘরে ব'সে অরুণ আর মহেন্দ্র কিন্তু ততক্ষণে নানা জল্পনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে।

—'দেবে নাকি থানায় একটা ফোন ক'রে? কোথাও কিছু একটা এ্যাক্সিডেন্ট্ ঘ'টে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। হাজার হোক্ ক'ল্‌কাতায় নতুন অভিজ্ঞতা বিজনের।'—বিশেষ একটা আন্তরিকতার সুর ফেটে প'ড়লো মহেন্দ্রের কণ্ঠ থেকে।

অরুণ বল্‌লো, 'এ্যাক্সিডেন্ট্ হ'লে আর থানা কেন, সোজা হাসপাতাল। কিন্তু হারা-উদ্দেশ্যে ক'টা হাস-পাতালেই বা ফোন্ করা চলে! আপনিও যেমন মানুষ, কাল ভোরে উঠেই দেখ্‌বেন আপনার কবি-সাক্ষাৎ ঘটেছে। আসলে এত বেশী ভাবরাজ্যের মানুষ নয় বিজন যে, এ্যাক্সিডেন্ট্ ঘটিয়ে বস্‌বে। তার চাইতে আসুন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ি।' ওয়াড় দেওয়া দামী র‍্যাগটাকে এবারে সারা শরীরের উপর দিয়ে টেনে নিল অরুণ।

গরমের দিনে স্বভাবতঃই এ সময়টা মেসের বোর্ডার-দের অনেকেই তাস-পাশা নিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলে, শীতের প্রাবল্যে তাদের সেই সৌখীন খেলাটা ইদানিং একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। রাত এগারোটার পর মেসের কোনো ঘরে এখন আর আলো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই চাক্‌রীজীবী, খেয়ে উঠতে উঠতেই ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা বুজে আসে, বালিশে মাথা দিয়ে স্বপ্ন দেখে তারা আগামী প্রভাত-সূর্য্যের। আপ্‌নি থেকেই ঘরে ঘরে বাতি নিভে যায়।—মহেন্দ্রও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সুইসটাকে অফ্ ক'রে দিয়ে এবারে শুয়ে প'ড়লো। শুয়ে প'ড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না।

কবি সাক্ষাৎ তার যথার্থই ঘ'টে গেল। কিন্তু তাই ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠলো না মহেন্দ্র। ঘুমের ভান ক'রে একইভাবে সে প'ড়ে রইল। দামী র‍্যাগের আরাম থেকে উঠে এসে আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিক্ অরুণ, উদ্দেশ্যটা হ'চ্ছে এই। আসলে অরুণের আরাম-প্রিয়তার উপরে কিছুটা আঘাত হান্‌তে চাইল মহেন্দ্র।

সে আঘাত যথাস্থানে গিয়েই লাগলো। বিরক্ত হ'য়ে অরুণ আধো ঘুমে উঠে দরজা খুলে দিয়ে আবার এসে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়লো। এত রাত্রি ক'রে ফেরার কারণ সম্পর্কে একটা কথাও সে বিজনকে জিজ্ঞেস ক'রলো না।

ভোরে উঠে কি একটা জরুরী কাজে হঠাৎ বেরিয়ে প'ড়তে হ'য়েছিল অরুণকে।

চা খেতে খেতে একসময় মহেন্দ্র বল্‌লো, 'বেশ তো রাত-বিরেতে ফিরতে সুরু ক'রেছ ইদানিং, রসের জগতে কবিতার নতুন উৎস পেলে নাকি কিছু?'

হাতে সে ধরা পড়িয়াছে। কথাটা যে অবিশ্বাস করিব, তাই বা পারিতেছি কৈ? অতসী নিজের মুখেও আমাকে মাঝে মাঝে বলিত—সন্ধ্যার দিকে খিড়কি-দুয়ারে কিম্বা ঘাটের পথে কাহার যেন স্পষ্ট আভাষ লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝেই সে চমকিয়া উঠিত। আমি বলিতাম—'দূর পাগলি, ও তোর চোখের ভুল।' কিন্তু যেদিন হইতে সত্যি সত্যিই অতসীকে আর পাওয়া গেল না, সেদিন তাহার কথার গুরুত্ব বুঝিলাম। মেয়েমানুষ হইয়া এই বয়সে আমি একা কি করিতে পারি? তসর আলীকে ডাকাইয়া আনিয়া নানা জায়গায় খোঁজ-খবর করিলাম, কিন্তু কাজ হইল না। সবাই বলিল, কোর্টে জানাইয়া পুলিশে খবর দিতে, তসর আলী গিয়া তাহাই করিল। কিন্তু অতসীকে আর উদ্ধার করা গেল না। কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোনো গুণ্ডাই হয়ত তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। মেয়েটার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কেবল দুঃখ হয়। নড়াইলের ঐদিকে কোথায় বাড়ী ছিল, একদিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিয়া পথে দাঁড়ায়। বলিতে বলিতে একদিন কাঁদিয়া দিল অতসী; কহিল, 'বিজু ভাইটি সত্যি সত্যিই হয়ত আমার পূর্ব্ব জন্মের ভাই ছিল, এ জন্মে তাই এমন করিয়া ভাইয়ের স্নেহ পাইলাম।' সংসারের দিক হইতে বড় দুঃখিনী ছিল অতসী। ও আজ এইভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া আমাদেরও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গেল।

তুমি পারো তো খুব শীঘ্র করিয়া একবার বাড়ী আসিও। কিছুদিন হইল ছন্দা এখানে আসিয়াছে। জীবনে একটি দিনের জন্যও ওকে শান্তি দিলেন না ভগবান। পত্রপাঠ তোমার সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। ইতি— আশীর্ব্বাদিকা—মা।

পড়া শেষ ক'রতে গিয়ে অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বিজনের বুক থেকে।

মহেন্দ্র এতক্ষণ একই ভাবে নীরবে ব'সে ছিল। এবারে পুনরায় জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'খবর কি বাড়ীর?'

কিছু না ব'লে চিঠিখানি শুধু এগিয়ে দিল বিজন মহেন্দ্রের হাতের কাছে।

প'ড়ে মহেন্দ্র অবধি স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বিজনের সংসারের দিক থেকে অতসীর কথা পর্য্যন্ত তার কাছে ঢাকা ছিল না। ব'ল্‌লো, 'অতসীর অপরাধ নেই, অপরাধ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার। সামাজিক দুর্নীতি যতদিন না বন্ধ হ'চ্ছে, ততদিন এ অবস্থা চ'ল্‌বেই। এ শুধু অতসী নয়, অতসীর মতো হাজার হাজার মেয়ে আজ দুর্ব্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত। এজন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই বিজন। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ভিন্ন এ সমস্যার কোনো প্রতিকার নেই।'

ক্রমেই সূর্য্যের আলো প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কাজে বেরোবার তাগিদ র'য়েছে। আর অপেক্ষা না ক'রে তাই উঠে প'ড়তে এবারে উদ্যোগ ক'রলো মহেন্দ্র।

ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'জানি প্রতিকার নেই, কিন্তু আমি ভাব্‌চি শুধু অতসীদির কথা। এরপর প্রাণে বেঁচে থেকে অতসীদি কি ক'রবে?'

—'সমাজ যদি ঠাঁই দেয়, তবে আবার কোথাও অবলম্বন পেয়ে তিলে তিলে জীবনের পাপক্ষয় ক'রবে। আর—' ব'লতে গিয়ে একবার থাম্‌লো মহেন্দ্র, তারপর কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি লঘু ক'রে ব'ললো, 'আর যদি ঠাঁই না পায়, তবে হয়ত নিকৃষ্ট জীবনের পথে জীবিকার জন্যে এসে দাঁড়াতে হবে কোনো নোংরা বস্তিতে। এই তো আমাদের সমাজের রূপ!'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না মহেন্দ্র। কাঁধের উপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে প'ড়লো।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ যে একই ভাবে ব'সে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। অতসীর কথাই অনবরত তার মনে হ'তে লাগ্‌লো। তার প্রথম দিনের প্রথম কথা থেকে শেষ চিঠি পর্য্যন্ত কোথাও যেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি অতসীদি। আজও তার শেষ চিঠিটা বাক্সে তোলা র'য়েছে।—'অভাগিনী দিদিটাকে যে ইতিমধ্যেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি।—' সংসারের দিক থেকে জীবনে কিছু পায়নি ব'লেই দুঃখ আর অভিমান এসে স্নেহের রাজ্যে এমন ক'রে এক হ'য়ে গিয়েছিল।

সংসার, জীবন, স্নেহ, অভিমান। কথাগুলো মনে প'ড়তেই অতসীকে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালো ছন্দা। মা লিখেছেন—ছন্দা মাগুরায় এসেছে। শ্যামলকান্তি তবে হয়ত ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছে! নিরোগ, নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যকর সুখে জীবনের সর্ব্বদিক ভ'রে উঠুক ছন্দার—এ কামনা প্রতিদিনের মতো আজও সে করে। কিন্তু মা যেমন ক'রে লিখেছেন, তার পক্ষে এখন বাড়ী যাওয়া কেমন ক'রে সম্ভব? সামনে তার ভাগ্যাকাশে অফুরন্ত আশা জোনাকীর মতো ঝিকমিক ক'রে জ্ব'লছে। অফুরন্ত কাজ তার সামনে। এসব ফেলে একটা দিনও কি তার বাড়ী গিয়ে থাকা চলে?

মন স্থির ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটার জবাব লিখ্‌বার জন্য কাগজ কলম টেনে নিয়ে বস্‌লো বিজন।

সূর্য্য তখন আকাশের অনের দূর অবধি ঠেলে উঠেছে।

উনিশ

দাশরথী দত্তের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার দিন থেকে যে জিনিষটি সবচাইতে বেশী আকর্ষণ ক'রছিল মিঃ মল্লিককে, তা হ'চ্ছে দত্ত পরিবারের ঐতিহ্য। আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ সংসার, শিক্ষিত পরিবেশে প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ একটা জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শের ধারা উপনিষদের পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে এখানে। তার সাথে সমন্বিত হ'য়েছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি। সেই ঐতিহ্যে মানুষ হ'য়ে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে দিলীপ। দাশরথী দত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। তার সাথে রেবাকে মিশ্‌বার অবাধ সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি দত্ত পরিবারের এই ঐতিহ্যকে জয় ক'রে নেবার উদ্দেশ্যেই। দিনে দিনে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে রেবার, এ কথা জানতেন মিঃ মল্লিক; জান্‌তেন ব'লেই এমন সুন্দর সার্থক ক'রে তৈরী করে তুলেছিলেন তিনি রেবাকে। দিলীপকে প্রথম দর্শনেই তাঁর ভালো লেগেছিল, ক্রমে এই ভালোলাগা কিছু স্বার্থের রূপ নিয়ে দেখা দিল। সুযোগ্য পাত্র দিলীপ, তাকে জামাই হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। মিসেস্ মল্লিকও অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত ক'রেছিলেন। দাশরথী দত্তের কাছে নিভৃতে তাই একদিন কথাটা উল্লেখ ক'রে ব'স্‌লেন মিঃ মল্লিক।

উত্তরে দাশরথী দত্ত ব'ল্‌লেন, 'বলেন কি, এ তো আমার সৌভাগ্য। ভেবেছিলাম—দু'দিন বাদে দিলীপের জন্য আমিই মেয়ে দেখ্‌তে বেরোবো। তা—এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া।'

সলজ্জ-কণ্ঠে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'না, না, চাঁদ কেন হবে, তবে মা'র আমার গুণের সঙ্গে রূপও আছে, এ কথা অস্বীকার ক'রবার নয়। দিলীপের পাশে ও অন্ততঃ দাঁড়াতে পারবে, এ বিশ্বাস রাখি।'

সহাস্যে দাশরথী দত্ত ব'ল্‌লেন, 'তা হলে আজ থেকে আমরা বেয়াই হলেম, বলুন!'

—'তাই তো আশা রাখি।' ব'লে খানিকটা বিনয় প্রকাশ ক'রলেন মিঃ মল্লিক।

—'আশা কি ব'ল্‌ছেন, নিশ্চয়ই এবং নিশ্চিত।' ব'লে উচ্ছ্বাসের মুখে একবার থাম্‌লেন দাশরথী দত্ত। তারপর ব'ল্‌লেন, 'তবে একটা বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। স্থির ক'রেছিলাম, দিলীপ হাইকোর্টে জয়েন করবার আগে ওকে বিয়ে দেবো না। আপনি ইচ্ছে করেন তো রেজিষ্ট্রেশন হ'য়ে থাকতে পারে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের যা কিছু কাজ, তা দিলীপের বারে জয়েন ক'রবার পরেই হবে। মত আছে তো আপনার?'

—'বিলক্ষণ, এতে অমতের কি কারন থাক্‌তে পারে!' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ততদিনে ওরা বরং দু'জনে দু'জনকে আরও ভালো ক'রে চিনুক। জীবনের সেতু রচনা ক'রতে গেলে তার বনিয়াদ আগে থেকে পাকা ক'রে তুলবার দরকার। ওরা নিজেদের যতটুকু চিনতে পেরেছে,—সেই চেনাকে দু'জনে চিরন্তন ব'লে জান্‌তে শিখুক। দিলীপের বারে জয়েন করতে ক'দিনই বা আর বাকী আছে!'

—'না, বাকী কোথায়? প্রায়ই তো ও কোর্টে বেরোচ্ছে, ব্যারিষ্টার উইলিয়াম হ্যারী এবং বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল প্রাক্‌টিস সম্পর্কে দিলীপকে খুব সাহায্য করছেন। আশা ক'রছি ভগবানের ইচ্ছায় ও দাঁড়িয়ে যাবে।'

—'দিলীপ নিজে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল ক'রবে, সেই স্বপ্নই তো দেখ্‌চি।' ভাবাবেগে একবার কেঁপে উঠলো মিঃ মল্লিকের কণ্ঠ।

অন্দরের আড়াল থেকে মিসেস্ দত্ত এতক্ষণ সবই শুনছিলেন, এবারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের কাজে গেলেন। দু'পরিবারের ঘনিষ্ঠতায় রেবাকে মনে মনে তিনিও একদিন পুত্রবধূরূপে কল্পনা ক'রেছিলেন, স্বামীকে আভাষ দিয়েও রেখেছিলেন একদিন। কিন্তু দিলীপের প্র্যাক্‌টিশে বহাল হবার অপেক্ষায় এতদিন তা প্রকাশ্য রূপ নিয়ে দাঁড়ায়নি। এবারে বিষয়টা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ায় মনে মনে খুসী বোধ ক'রলেন মিসেস দত্ত।

মিঃ মল্লিক আর অপেক্ষা ক'রলেন না, বিদায় নিয়ে বললেন, 'তা হ'লে একসঙ্গে ব'সে দু'টি খাবার ব্যবস্থা করি কাল?'

হেসে দাশরথী দত্ত বল্‌লেন, 'এখনই এত খাবার কি হ'লো! নির্ব্বিঘ্নে আগে কাজটা চুকে যাক্, খাবার দিন সাম্‌নে কত প'ড়ে র'য়েছে! দত্তপুকুরের ছানা, পাংশার মর্ত্তমান, গোপালগঞ্জের ক্ষীর, যশোহরের কই, এ যদি তখন আনিয়ে না খাওয়ান তো আপনারই একদিন কি আমারই একদিন।' সোৎসাহে হাসির বেগ বেড়ে গেল দাশরথী দত্তের।

মিঃ মল্লিকও না হেসে পারলেন না, বল্‌লেন, 'সে তো আমার সৌভাগ্য। লোক পাঠিয়ে আনাবো, তাতে আর অসুবিধে কি! কিন্তু পাল্টা যদি জনাইর মনোহরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, আর চিটাগাংয়ের সেরা বাখরখানি না খাওয়ান্ তো দেখে নেবো না কেমন বেয়াই আপনি!'

আবার একটা হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। হাস্‌তে হাস্‌তেই বিদায় নিয়ে এলেন মিঃ মল্লিক।

সমস্ত বিষয় শুনে মিসেস্ মল্লিকের আনন্দ আর ধরে না। মানুষকে খাওয়াতে তিনি চিরকাল ভালোবাসেন। স্বামীর প্রস্তাব অনুযায়ী নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে এবারে তিনি নিজের হাতে রান্নার ব্যবস্থা ক'রে পরদিন সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন দত্ত দম্পতিকে; দিলীপও বাদ গেল না।

রেবা-দিলীপের পরিণয়ের ব্যাপারটা আপাতত জানাজানি হ'য়ে প'ড়বার কথা ছিল না, কিন্তু খাবার টেব্‌লে আনন্দোচ্ছ্বাসে কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না।

শুনে আড়ালে রেবার লজ্জারক্ত মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠলো, আর আকস্মিক একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়ায় দিলীপের মুখখানি কেমন অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাতে লাগ্‌লো।

এরপর বোধ করি দিন দুয়েকও কাট্‌লো না।

বিকেলে টেনিশ-লন্ হ'য়ে রেবাকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো দিলীপ ইডেন গার্ডেনের দিকে। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি এক অদ্ভুত মায়া দিলীপের। বিলেতে এমন একটি নির্জ্জন নিবিড় সবুজতা খুঁজে পায়নি সে ব্যারিষ্টারী প'ড়তে গিয়ে। সেখানে চেকোস্লাভিয়ান থেকে সুরু ক'রে আইরিশদের পদধ্বনির সঙ্গে বৃটিশের ম্যাণ্ডোলিন বেজে চ'লেছে দ্রুতলয়ে; সেখানে জীবনের দ্রুততা আছে, এমন নির্জ্জন নিবিড় সবুজতায় বিশ্রামের স্থিরতা সেখানে কম। ইডেন গার্ডেনকে তাই ভালো-লাগে দিলীপের। একদিকে কর্ম্মমুখর জীবনের যান-বহুলতা, অন্যদিকে গঙ্গার বুকে জাহাজের মাস্তুলের আড়ালে সূর্য্যাস্তের নমনীয়তা, মাঝখানে ঘন তরুরাজী-শোভিত প্রশস্ত সবুজ দ্বীপ। নাগরিক জীবনের কোলা-হলের বাইরে এসে মনটা কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে।

এসে প্যাগোডার পাশ ঘেঁষে তারা বস্‌লো দু'জনে। রেবা আর দিলীপ।

—'আমাদের জীবনটা তা হ'লে পাকাপাকি হ'য়ে গেল, কি বলো?'

সহসা এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন হ'লো রেবার পক্ষে। মনে মনে ভালো লেগেছিল, ভালোবেসেছিল সে দিলীপকে। কিন্তু তাই ব'লে বিজনকেও অস্বীকার ক'রতে পারেনি। বিজনের আবেদনে সেদিন তাই আশার পথের ইঙ্গিত ক'রেছিল সে। তখনও এতটা ভাবতে পারেনি রেবা, আশা ক'রতে পারেনি এতটা। দিলীপের সাংসারিক পরিবেশের সঙ্গে বিজনের সাংসারিক পরিবেশ একেবারেই তুলনার বাইরে। একদিকে ঐশ্বর্য্য,

আর একদিকে জীর্ণতা, একদিকে নাগরিক আভিজাত্য, আর একদিকে পল্লীর অন্ধতা। দিলীপের সঙ্গে বিজনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু হৃদয় কি সর্ব্বত্র পরিবেশেই আবদ্ধ? বিজনকে তাই অস্বীকার ক'রতে পারেনি রেবা। পারেনি ব'লেই দিলীপের প্রশ্নের উত্তর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দিতে পারলো না সে। কিন্তু নীরবে চুপ ক'রেও গেল না রেবা। আকস্মিক এই অদৃষ্টের সার্থক পরিবর্ত্তনকে স্বীকার ক'রে নিতে গিয়ে মনে মনে সে বরং ভালোবাসার সাদর অভিনন্দনই জানালো দিলীপকে। স্বল্পক্ষণ থেমে পরে বল্‌লো, 'সুন্দর হ'লো কি?'

—'মানে?' খানিকটা কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে ধ'রলো দিলীপ রেবার মুখের দিকে।

—'মানে—পাকাপাকি হওয়া আর সুন্দর হওয়া কি এক! আমার চাইতে অনেক বেশী ভালো মেয়েকেই তো ইচ্ছে ক'রলে তুমি পেতে পারতে! তুমি কি, তা তুমি জানো না, তাই এমন ক'রে ঠ'কৃতে চাচ্ছ।' ব'লে চোখ নামিয়ে নিল রেবা।

—'যদি বলি, তুমি কি—তা তুমি জানো না ব'লেই এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে পারলে!' সহাস্যে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'বাবা মা আমাকে যখন কিছু না জিজ্ঞেস্ ক'রেই তোমার ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেল্‌বার জাল রচনা ক'রলেন, তখন সুবোধ বালকের মতো দেখিই না ঠ'কে, কি দাঁড়ায়!'

আড়ালে মুখ টিপে হাস্‌ছিল রেবা। এবারে চোখ তুলে ব'ল্‌লো, 'একবার ঠ'কৃলে আর কি নিজেকে শুধরে নিতে পারবে?'

—'তুমি তো অন্ততঃ শুধরে দেবার জন্যে থাক্‌বে।' ব'লে পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়ক বার ক'রলো দিলীপ। মিনা করা প্যাগোডা প্যাটার্ণের একটি সুদৃশ্য আংটি বেরিয়ে এলো সেই মোড়ক থেকে। রেবার বাঁ হাতখানি টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই আংটিটি তার অনামিকায় পরিয়ে দিল দিলীপ। ব'ল্‌লো, 'জীবনের ভিৎ প্রতিষ্ঠায় সূর্য্য সাক্ষি ক'রে মঙ্গলগ্রহের আরাধনার রীতি আছে আমাদের ভারতীয় সমাজে। চেয়ে দেখ, গঙ্গার ওপারে সূর্য্য ক্রমে অস্তমিত হ'চ্ছে; সূর্য্যের সাক্ষি তাই ঠিকই ঘ'টে গেল। এ আংটিটা সারা জীবন তোমার আঙুলে আমাদের ভালোবাসার অটুট্ প্রতীক হ'য়ে বেঁচে থাক্।'

অস্তমিত সূর্য্যের লাল আভা এসে ঠিক্‌রে প'ড়ে রেবার মুখখানি তখন অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত ক্যামেলিয়ার মতই সুন্দর ও শোভাময়ী দেখাচ্ছে। আঙুলের দিকে লক্ষ্য ক'রে দিলীপের মুখের দিকে একবার নরম দৃষ্টি তুলে ধ'রলো রেবা। সেই দৃষ্টিতে শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, 'আমি, আমি যে কিছু দিতে পারলুম না তোমাকে?' গলার মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট শব্দে একবার আলোড়িত হ'য়ে উঠলো কথাটা।

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'তুমি যে তোমার নিজেকেই দিলে, এর চাইতে আরও কিছু কি শ্রেষ্ঠ দান খুঁজে পেতে তুমি? ব'ল্‌ছিলে—ঠ'কেছি, কিন্তু পৃথিবীতে বোধ করি আমার মতো খুব কম লোকই জিত্‌বার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে।'

গঙ্গায় বোধ হয় অনেকক্ষণই জোয়ার এসেছিল। অলক্ষ্যে সে-জোয়ার এবারে রেবার বুকের মধ্য দিয়ে ব'য়ে গেল। আর একটি কথাও তার মুখে এলো না।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন্ গার্ডেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। [ক্রমশঃ

প্রাপ্তি-যোগ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এক

জ্যৈষ্ঠের বেলা কেবল "গড়াইয়া যাইতেছে"—বেলা প্রায় একটা। রৌদ্রতপ্ত ও উজ্জ্বল আকাশ আলোকে বহুবার স্নাত বস্ত্রের মত বিবর্ণ; কলিকাতার পিচঢালা, সিমেণ্টকরা রাজপথ ও গৃহ-প্রাচীর হইতে যেন তপ্ত শ্বাস বাহির হইতেছে। একখানি ছোট পরিচ্ছন্ন গৃহের দ্বিতলস্থ একটি কক্ষে বসিয়া প্রৌঢ় কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত মনোযোগ সহকারে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মুন্সেফ ছিলেন। বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া সরকারই তাঁহার কার্য্যকাল দুই বৎসর বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সরকার তাঁহার কার্য্যকাল আবার এক বৎসর বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহাকে পেন্সন ও "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়া বিদায় দেওয়া হয়। তিনি বলিয়া থাকেন, চাকরী করিয়াছেন, সাতঘাটের জল পান করিতে হইয়াছে, চাকরীর সর্ত্তে পেন্সন পাইবেন, ভাল কথা; কিন্তু উপাধিটি "উপরি পাওনা"—সুতরাং অব্যবহার্য্য। তাঁহার স্বাস্থ্য, বয়সের অনুপাতে, এত অক্ষুণ্ণ যে বন্ধুরা তাঁহাকে বলিতেন—"তুমি পুরুষকুন্তী"।

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তিনি যে সরকারের কার্য্যকাল আবার বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি মনে করিতেন—আর চাকরীর প্রয়োজন নাই; যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে ও পেন্সনের টাকায় স্বামী-স্ত্রীর স্বচ্ছন্দে দিন কাটিত।

সংসারে কেবল তিনি আর তাঁহার স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে নাই। পৈত্রিক বাস মেদিনীপুরের কোন গ্রামে। পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি বালক; মাতা, পুত্রের চাকরী হইবার পরে, তাঁহার কাছেই থাকিতেন, তাঁহার কাছেই মরিয়াছেন। অবসর লইয়া কৈলাসচন্দ্র আর গ্রামে পূর্ব্বপুরুষের জীর্ণ গৃহের যে দুইখানি ঘর ও বাগানে যে পাঁচ সাতটি ফলের গাছ তাঁহার অংশে প্রাপ্য, তাহা অধিকার করিবার কল্পনাও করেন নাই—চেষ্টা করা ত পরের কথা। তিনি একাধিকবার কলিকাতায় একখানি বাড়ী কিনিবার বা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, স্ত্রী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কা'র জন্য বাড়ী করবে? —কে ভোগ করবে?"—বন্ধ্যা নারীর হৃদয়ের বেদনাব্যঞ্জক সেই কথায় স্বামী একবার বলিয়াছিলেন, "আমি যদি আগে মরি, মাথা গুঁজবার স্থান থাকবে।" স্ত্রী তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দেবতা যদি এ জন্মে সেই দুর্ভাগ্য দেন—তবে কোন দেবস্থানে গিয়ে তাঁর চরণে এই প্রার্থনাই জানাব—পরজন্মে যেন আর তা' না হয়।"

কৈলাসচন্দ্র মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সেইজন্য মূল্য দিয়া যাহা কিনিতেন, তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তিনি সংবাদপত্রের সংবাদ ও প্রবন্ধগুলির শিরোনামা পাঠ করিয়াই নিরস্ত হইতেন না—মনোযোগ সহকারে সমগ্র পত্র পাঠ করিতেন। আজও তিনি তাহাই করিতেছিলেন। শেষ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তিনি ছবিখানি দেখিলেন এবং তাহার বর্ণনা পাঠ করিলেন। ছবি দেখিয়া ও তাহার সঙ্গীয় বিবরণ পাঠ করিয়া কৈলাসচন্দ্র কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন—ভাবিয়া আবার ছবি দেখিলেন ও বিবরণ পাঠ করিলেন; তাহার পরে আসন হইতে উঠিয়া কাগজখানি লইয়া নিঃশব্দে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দিকে গমন করিলেন। দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের কপাট বন্ধ ছিল না—বোধ হয় ভেজান ছিল—বাতাসে খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দুই

পার্শ্বস্থ কক্ষটি শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। সেই কক্ষে কৈলাসচন্দ্রের পত্নী সুজাতা ঘুমাইতেছিলেন। সুজাতার নামের একটা ইতিহাস আছে। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম—মন্দাকিনী, মা কন্যাকে "মন্দা" বলিয়াই ডাকিতেন—বৃদ্ধা আত্মীয়ারা দন্তহীন মুখে উচ্চারণ করিতেন—"মন্দ্রা"। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল; কারণ, কৈলাসচন্দ্রের মাতার নাম ছিল—মনোমোহিণী এবং শ্বাশুড়ীর নামের সহিত বধূর নামের সাদৃশ্য অদূর না হইয়া সুদূর হইলেও তাহা পল্লীর বৃদ্ধাদিগের বিবেচনায় আপত্তিকর হইয়াছিল। তখন কৈলাসচন্দ্রই স্ত্রীর নাম দিয়াছিলেন—সুজাতা। নামটি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল; কারণ, তাহাতে যুক্তাক্ষরের বলাই ছিল না।

এখনও কৈলাসচন্দ্র পত্নীকে সুজাতা বলিয়াই সম্বোধন করেন। সাধারণতঃ স্ত্রী "গিন্নিবান্নি"—পুত্রকন্যার জননী, পুত্রবধূর ও জামাতার শাশুড়ী হইলে অল্প বয়সের সম্বোধন—"ওগো," "হ্যাঁ গো" "গিন্নী" অথবা প্রথম সন্তানের মা হইয়া দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই; সংসারে স্বামী আর স্ত্রী—কাহারও মনোযোগের অন্য উপকরণ জুটে নাই। সেই জন্য তরুণ বয়সের সেই সম্বোধনই রহিয়া গিয়াছিল।

সুজাতা সংসারের অধিকাংশ কাযই আপনি করিতেন;—বলিতেন, "অনেক ঝী-চাকরের সঙ্গে বকাবকি করা অপেক্ষা আপনি কায করায় আমার শ্রমলাঘব হয়।" সংসারের কাযও অধিক ছিল না—একটি শিশুর জন্য যে কাজ করিতে হয়, পাঁচজন প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য তাহা করিতে হয় না। তাঁহার অভ্যাস প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া স্বামী আদালতে না যাওয়া পর্য্যন্ত সব কায সারিয়া—তাহার পরে দাসদাসীর আহারের ব্যবস্থা করিয়া—আপনি আহার সারিয়া তিনি মধ্যাহ্নে একটু শয়ন করিয়া সংবাদপত্রে একটু দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে একটু ঘুমাইতেন। সে ঘুম "কাক নিদ্রা"—বিশ্রাম মাত্র। তাহার পরে উঠিয়া তিনি মাসিকপত্র বা কোন পুস্তক পড়িতেন—বা সেলাই করিতেন—ইত্যাদি।

স্বামী কখনও তাঁহার সেই অভ্যস্ত বিশ্রামে বাধা দিতেন না। সেই জন্য "অসময়ে" স্বামীর—সুজাতা! আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গে সুজাতা বিস্ময়ানুভব করিলেন—ব্যস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "ব্যস্ত হ'বার কোন কারণ নাই, সুজাতা। এই দেখ—"

তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ ত কোন্‌টি পছন্দ?"

স্বামীর কথায় সুজাতা বেদনানুভব করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইল। তাহা দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র বলিলেন,"প'ড়ে দেখ—পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে যে সব হিন্দু ছেলেমেয়ের বাপমা'র সন্ধান পাওয়া যায় নাই—সেবাশ্রম তা'দের সংগ্রহ করে এনেছেন। পক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁ'রা তা'দের ছবি সংবাদপত্রে ছাপিয়েছিলেন—যদি তা'দের আত্মীয়-স্বজন কেহ আসেন। যা'দের আত্মীয় স্বজন কেহ আসেন নাই—তাঁ'রা তা'দের যাঁ'রা দয়া করে পালন করতে চান, তাঁ'দের দিবেন। এ ছবি তাদের।"

নিঃসন্তান দম্পতিকে তাঁহাদিগের কোন কোন আত্মীয়-কুটুম্ব সন্তান দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র তাহা দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই—কারণ, অর্থের আশায় সন্তান দান তিনি ব্যবসায়ীর কায—স্নেহের অপমান মনে করেন। এ ক্ষেত্রে সে ভাব ছিল না; সেই জন্য—সুজাতার স্বভাবজ স্নেহ প্রকাশের উপায় না থাকায় যে বেদনা তাহা বুঝিয়া কৈলাসচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, সুজাতা সম্মত হইলে তিনি এই সকল অনাথের একটিকে পালন করিবার ভার লইবেন।

তিনি সে কথা সুজাতাকে বুঝাইয়া বলিলে সুজাতা ভাল করিয়া ছবি দেখিলেন এবং একটি ছেলের ছবিতে আঙ্গুলী দিয়া বলিলেন,"কি চমৎকার ছেলে! আহা—বাপ-মা'র সন্ধান নাই! মানুষ কি পশু না হ'লে এমন ছেলেকে পিতৃমাতৃহীন করতে পারে?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "তা' হলে কাল সকালে ৯টার সময় দু'জনে সেবাশ্রমে যা'ব; যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, ঐ ছেলেটিকে নিয়ে আসব। তাই-ই ঠিক থাকল।"

তিন

সে রাত্রিতে সুজাতার সুনিদ্রা হইল না; আশঙ্কা ও আশা, বেদনা ও আনন্দ—মেঘ ও রৌদ্রের মত—তাঁহার মনে দেখা দিতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন, এই বয়সে তিনি কি পরের ছেলেকে আনিয়া আপনার সন্তানের মত লালন-পালন করিতে পারিবেন? আবার তখনই আশা তাহার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে প্রবোধ দিল—কেন পারিবেন না?—তিনি নারী···মাতার জাতি—অপত্য-স্নেহ নারীর পক্ষে স্বভাবজ; তিনি নিশ্চয়ই তাহা পারিবেন—যদি প্রথমে কিছু ত্রুটি অনুভূত হয়, তাহা সহজেই সংশোধন করা সম্ভব হইবে। একবার তাঁহার মনে হইল, ভগবান যাহাকে সন্তানে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃত্বের বিকাশ কীটদষ্ট কুসুমের বিকাশের মত অসম্ভব করিয়াছেন, সে কেন অপরের সন্তানকে লইয়া তাহার অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে? বেদনায় তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই তিনি যখন মনে করিলেন, শিশুর আগমনে তাঁহার মন ও সংসার নূতন শ্রীমণ্ডিত হইবে—যে গৃহে ছিদ্র নাই সে গৃহ বাতায়নহীন কক্ষেরই মত—তখন তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন; মনে করিলেন, এ ত দেবতার দান!

কৈলাসচন্দ্র কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি কোন কায করিবেন স্থির করিলে সে সম্বন্ধে আর দ্বিধায় বিচলিত হইতেন না।

স্বামীর সেই বৈশিষ্ট্য সুজাতা অবগত ছিলেন। সেই জন্যই তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরদিন স্বামী তাঁহাকে লইয়া সেবাশ্রমে যাইবেন। একবার তাহার ভয় হইল, যদি তাঁহারা যাইবার পূর্ব্বেই কেহ তাঁহাদিগের মনোনীত শিশুটিকে লইয়া যায়? কিন্তু তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য কয় জনের আছে যে, আর কেহ ঐ ছেলেটিকেই লইতে ব্যস্ত হইবেন?

পরদিন প্রাতে ৮টা বাজিলেই সুজাতা—সংসারের কার্য্যভার ভৃত্যকে বুঝাইয়া দিয়া স্বামীর বসিবার ঘরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যা'বে না?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "নিশ্চয়ই যা'ব। কিন্তু এখন যে বেলা ৮টা—৯টা বাজতে যে এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে।"

"সেবাশ্রমে যা'ব, অনাথ বালক-বালিকাগুলির জন্য জামা, কাপড়, বিস্কুট, লজেঞ্জেস আর মিষ্টান্ন লয়ে যা'ব। আহা তা'রা আপনার মা'র স্নেহযত্নে বঞ্চিত।"

"এই জন্যই ত স্ত্রীকে শ্রী বলে। এসব কথা আমার মনেই হয় নাই। চল, যাই।"

তিনি কয় মিনিটের মধ্যেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভৃত্যকে ভাড়া মোটর গাড়ী আনিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

গাড়ী আসিলে স্বামী-স্ত্রী তাহাতে উঠিয়া চালককে কোথায় যাইতে হইবে, সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দিলেন। পথে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহারা অনাথদিগের জন্য সুজাতার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। সেগুলি পাইয়া অনাথরা কত আনন্দ লাভ করিবে, তাহা কল্পনা করিয়া সুজাতার মন আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল।

গাড়ী যখন সেবাশ্রমের পথে প্রবেশ করিল, তখন কৈলাসচন্দ্র আপনার ঘড়ী দেখিলেন···তখন ৯টা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তিনি মোটর চালককে একটু ধীরে যান চালাইতে বলিয়া বাড়ীগুলির নম্বর লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিলেন, সেবাশ্রমে উপনীত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন, লক্ষ্য রাখিয়া, সেবাশ্রমের দ্বারে গাড়ী দাঁড় করাইলেন।

স্বামী-স্ত্রী যান হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে মুক্ত স্থানে অনেকগুলি বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। সুজাতার মনে হইল, যেন পবনে কুসুম-কাননে প্রস্ফুটিত ফুলগুলি হেলিতেছে—দুলিতেছে।

আনীত দ্রব্যগুলি দ্বারবানকে আনিতে বলিয়া স্বামী স্ত্রী আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

চার

কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতাকে দেখিয়া আশ্রমের এক জন কর্ম্মকর্ত্তা আসিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যালয়ে লইয়া যাইলেন—তাঁহাদিগকে আসনে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। ততক্ষণে দ্বারবান দুই জন ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাদিগের আনীত দ্রব্যগুলি তথায় আনিয়া দিল।

কর্ম্মকর্ত্তা কৈলাশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "আপনারা যে মহৎ কায করছেন, তা'তে সাহায্য করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। সেই কারণে অনাথদের জন্য এই সব এনেছি—গ্রহণ করুন।"

কর্ম্মকর্ত্তা একজন সহকারীকে ডাকিয়া জিনিষগুলি জমা করিয়া রসিদ দিতে বলিলেন এবং মিষ্টান্ন দিবার জন্য অনাথদিগকে ডাকিলেন। তাহারা ছুটিয়া আসিল—মিষ্টান্ন পাইয়া তাহাদিগের মুখে ও চক্ষুতে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, তাহা কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতা তাঁহাদিগের আশাতিরিক্ত পুরস্কার মনে করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কৈলাসচন্দ্র যে উত্তর দিলেন, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার প্রতি আরও সম্ভ্রম দেখাইলেন।

কৈলাসচন্দ্র সংবাদপত্রখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখে আমরা এসেছি।"

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন, "আরও দু'জন আসবেন, লিখেছেন।"

সুজাতা স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিলেন—আর কেহ পূর্ব্বেই আসিয়া তাঁহার মনোনীত বালকটিকে লইয়া যায়েন নাই।

কর্ম্মকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি একটি অনাথের লালন-পালন ভার নিবেন?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "তাই ত' মনে করেছি।"

তিনি ছবিতে তাঁহাদিগের মনোনীত বালককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটিকে কি পাওয়া যাইবে?"

"অশোক! চমৎকার ছেলে—আশ্রম যেন গুলজার করে রেখেছে; যেমন দেখতে তেমনই বুদ্ধিমান—চালাক।"

তিনি ডাকিলে অশোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার নাম কি, বল।"

বালক বলিল, "অশোক দত্ত।" দত্ত কথাটি সে একটু জোর দিয়া বলিল।

"তোমার বাবার নাম?"

"প্রমোদ দত্ত।"

"মা'র নাম?"

"সুনন্দা।"

বালকের বয়স, বোধ হয়, চারি বৎসর হইবে। সুজাতা তাহাকে আপনার কাছে আনিয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে যা'বে?"

অশোক বলিল, "না। আমি আমার বাবার আর মা'র কাছে যা'ব।"

"সে ত' ভাল কথা। এখন তুমি যেমন এই আশ্রমে আছ, তেমনই আমার কাছে থাকবে।"

"সেখানে কা'র সঙ্গে খেলা করব?"

"আমরা তোমার সঙ্গে খেলা করব।"

"সে হয় না—তোমরা বড়; বাবার আর মা'র চাইতেও বড়।"

অনন্যোপায় হইয়া সুজাতা বলিলেন, "যদি ভাল না লাগে, তখন ফিরে আসবে।"

শেষে কর্ম্মকর্ত্তার কথায় ও সুজাতার খেলানা প্রভৃতি প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে অশোক যাইতে সম্মত হইল।

"লক্ষ্মী ছেলে!" বলিয়া সুজাতা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন

কৈলাসচন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তাকে বলিলেন, "এ কাযে ত' অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়!"

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন, "তা হয়। কিন্তু ভাল কাযে ভগবান সহায়, সেই বিশ্বাসে আমরা ভিক্ষা ক'রে কায চালাই।"

"আমার সামান্য দান আজ দিচ্ছি—আর মাসে মাসে যথাসাধ্য দিয়ে যা'ব"—বলিয়া কৈলাসচন্দ্র ব্যাগ হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে দিয়া বিদায় লইতে চাহিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন—রসিদ আনি। এ জনসাধারণের টাকা—হিসাব সম্বন্ধে সাবধান থাকাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য।"

পাঁচ

অশোককে লইয়া কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতা গৃহে ফিরিলেন। তাহার আগমনে তাঁহাদিগের গৃহে ও মনে

যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের মত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। যে গৃহ গাম্ভীর্য্যে লোককে বিস্মিত করিত, সে গৃহে সাধারণ গৃহস্থ-গৃহের চাঞ্চল্য দেখা দিল—সহসা তপন-কিরণে তুষারের আবরণ বিগলিত হইয়া নির্ঝরের জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সর্ব্বদাই—"ধর! ধর! পড়ে যা'বে।"—"কি নিয়ে গেল?"—"কোথায় গেল?"—এই সব কথা সুজাতার মুখে শুনা যাইতে লাগিল। অশোকের ব্যবহারে ও কথায় কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না—সুজাতা বার বার তাহাকে বুকে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেন। একটি শিশুর কায যে মানুষকে এত ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখিতে পারে, তাহা সুজাতা কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। আর এই দুরন্ত শিশু যেন সুজাতার বুকের পুঞ্জীভূত বেদনা ও কাঠিন্য দূর করিয়া দিল।

এক একদিন অশোকের এক একটি কার্য্যে স্বামী-স্ত্রীর নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ও আনন্দের কারণ ঘটিত। একদিন সহসা কৈলাসচন্দ্রের বসিবার ঘরের টেবল হইতে তাঁহার চশমা অন্তর্হিত হইল। যে জিনিষটি যে স্থানে রাখা তাঁহার অভ্যাস তাহা তথায় না থাকিলেই তিনি অস্বস্তি অনুভব করিতেন—পাছে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সেই জন্য তিনি কখন ভৃত্যকে সে কাযের ভার না দিয়া প্রতিদিন আপনি টেবল ঝাড়িতেন—জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতেন। অশোক সময় সময় সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া দিত—কোন কোন জিনিষ তুলিয়া লইত এবং যেমন ইচ্ছামত তুলিয়া লইত, তেমনই ইচ্ছামত স্থানে রাখিত। চশমার অন্তর্দ্ধানে কৈলাসচন্দ্র বিব্রত হইলেন এবং তাঁহার বিব্রতভাব সুজাতায় প্রতিফলিত হইল। যেমন বাতাস নহিলে জীবের চলে না, তেমনই চশমা ব্যতীত পরিণত বয়স্কের চলে না। স্বামী ও স্ত্রী তন্ন তন্ন করিয়া ঘরগুলিতে চশমার সন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "হারান জিনিষের সন্ধান লোকে সম্ভব স্থানেই করে, কিন্তু তাহা অসম্ভব স্থানে পাওয়া যায়।" সম্ভব ও অসম্ভব সব স্থানে সন্ধানে যখন চশমা পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হইয়া কৈলাশচন্দ্র বলিলেন, "আজই নূতন চশমা করতে দিতে হ'বে; কিন্তু দিন দুই যে কি করব তা'ই ভাবছি।"

তাঁহারা যখন হতাশ হইয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়াছেন, তখন অশোক টলিতে টলিতে কক্ষে প্রবেশ করিল—সে চশমা পরিয়াছে—কিন্তু তাহা বড় বলিয়া এক হাতে তাহা যথাস্থানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়া কৈলাশচন্দ্র ও সুজাতা উচ্চ হাস্যে কক্ষ মুখরিত করিলেন—কৈলাসচন্দ্র চশমা পাইয়া দুশ্চিন্তা-মুক্ত হইলেন; সুজাতা অশোককে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "দস্যি ছেলে।"

অশোকের দৌরাত্ম্য নিঃসন্তান দম্পতির নিকট অতি মিষ্ট বোধ হইত। তাহাকে নানা খেলানা দিয়া, নানা বেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহারা যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না।

অশোক সেই নিঃসন্তান দম্পতির গৃহে ও জীবনে অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটাইল; যেন বসন্তের বাতাস আসিয়া শীতের স্পর্শে রিক্ত তরুলতায় নূতন পল্লব ও পুষ্প অবির্ভূত করিল—নূতন রূপ দিল।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল—ক্রমে তিন মাস কাটিল। কিন্তু অশোক তখনও মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিত, "আমার মা কোথায়?" সুজাতা যদি বলিতেন, "আমি ত তোমার মা"—তবে সে বলিত, "সুনন্দা মা?" সে কখন কখন জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা কখন আফিস থেকে আসবেন?"

মানুষের পক্ষে হাসি যে ফুলের পক্ষে রবিকরের মত কায করে, তাহা কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতা পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই—এতদিনে করিলেন। মানুষের জীবন-পথে যদি শিশুর হাসি এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত থাকে, তবে তাহা কত সুখের হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন।

অপরাহ্নে উভয়েই প্রায়ই অশোককে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। কোন দিন পশুশালায়, কোন দিন বোট্যানিকাল বাগানে, কোন দিন জৈন মন্দিরে, কোন দিন ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে তাঁহারা অশোককে লইয়া যাইতেন। অশোক কত কথা জিজ্ঞাসা করিত;
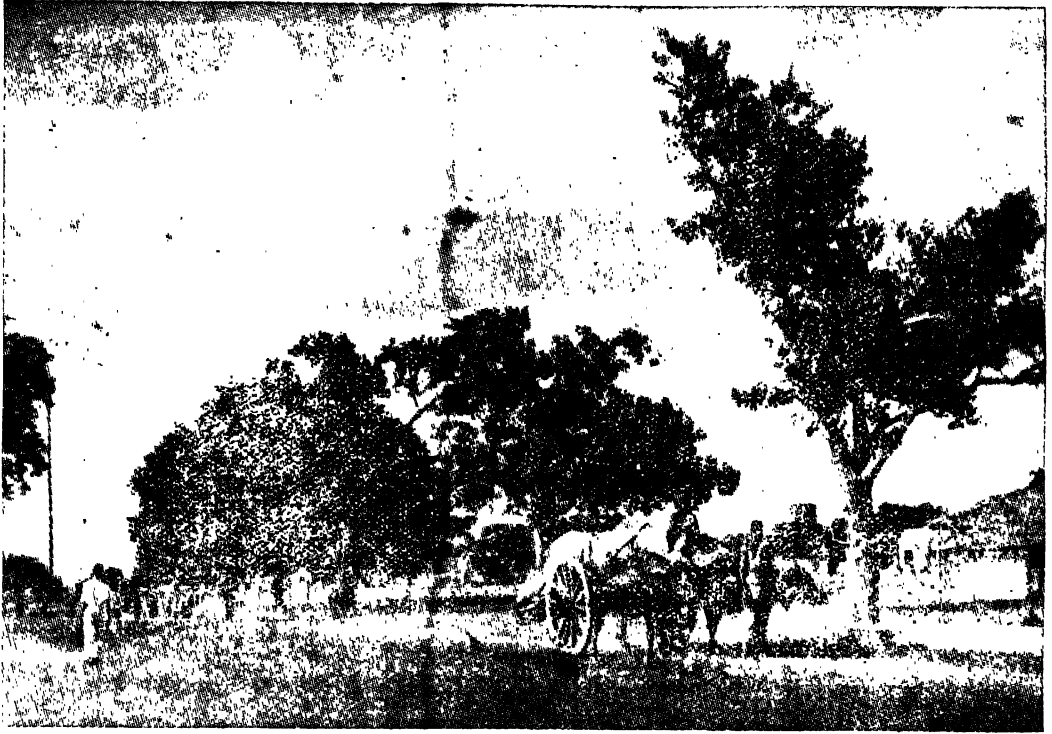
কৌতূহলই শিক্ষার ভিত্তি জানিয়া কৈলাশচন্দ্র তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে কৈলাশচন্দ্রকে পুস্তক পাঠ করিতে হইত। তিনি সানন্দে তাহা করিতেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান অশোক সব কথা শুনিত এবং শুনিয়া বুঝিবার ও মনে রাখিবার চেষ্টা করিত।

ছয়

তিন মাস অতিবাহিত হইবার পরে চতুর্থ মাসের শেষ ভাগে কৈলাসচন্দ্র একদিন সুজাতাকে বলিলেন, তিনি কি চলচ্চিত্র দেখিতে যাইবেন? এরূপ প্রস্তাব স্বামী পূর্ব্বে কখন করেন নাই বলিলেই হয়, সেই জন্য সুজাতা তাহাতে বিস্মিতা হইলেন। বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, তিনি যে চিত্র দেখিবার কথা বলিতেছেন, তাহার বৈশিষ্ট্যর ইতিহাস আছে; পূর্ব্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের উৎপীড়নকে কেন্দ্র করিয়া চিত্রখানি রচিত; পাছে পাকিস্তানের কর্ত্তারা সত্য সহ্য করিতে না পারেন এবং চিত্রে আপত্তি করেন, সেই শঙ্কায় ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সরকার ছবিখানিকে বিশেষভাবে রাজনীতিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তাহার বহু অংশ বর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; যাহাকে অঙ্গহীন বলে, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও ছবিখানিতে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নারীর অবস্থা বুঝা যায়; বিশেষতঃ যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া গল্পের আখ্যানবস্তু রচিত, তাহার সর্ব্ব-প্রধান চরিত্রে—নারী চরিত্রে যিনি অভিনয় করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে—বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কোন রূপে পলাইয়া আসিয়াছেন, চরিত্রে তিনি ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতার বেদনা ঢালিয়া দিয়াছেন।

শুনিয়া সুজাতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, "যাব"—তাহার পরেই তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক কা'র কাছে থাকবে?"

অশোক তাঁহাদিগের গৃহ ও হৃদয় অধিকার করার পর হইতে সেদিন পর্য্যন্ত এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কোন কারণ ঘটে নাই; কারণ, তাঁহারা কোনদিন তাহাকে গৃহে রাখিয়া কোথাও গমন করেন নাই।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "অশোকও যাবে।"

এত সহজে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল যে, সুজাতা স্বস্তি অনুভব করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র সুজাতাকে যাত্রার সময় জানাইয়া মোটর যান-চালককে ডাকিবার জন্য ভৃত্যকে বলিলেন। অশোকের আগমনের পরে—প্রধানতঃ তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য—মিতব্যয়ী কৈলাসচন্দ্র, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, মোটর গাড়ী কিনিয়াছিলেন।

যথাকালে সুজাতা আপনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তদপেক্ষা দুষ্কর কার্য্য—অশোককে প্রস্তুত করিলেন। এ সময়ে কেন, কোথায়, কতক্ষণের জন্য যাইতে হইবে—সে সকল সম্বন্ধে অশোকের জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁহাকে দিতে হইল। অশোক সেই পরিবারভুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতায় অভ্যস্ত হইয়াছিল।

ঠিক সময়ে কৈলাসচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, অশোককে লইয়া সুজাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

সাত

চলচ্চিত্র প্রদর্শন আরম্ভ হইল।

অশোক কিছুক্ষণ ছবি দেখিয়া—যেন শ্রান্তিতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কৈলাসচন্দ্র ও সুজাতা ছবি দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারিলেন, রাজনীতিক কারণে যে ভাবে ছবিখানির অঙ্গহানি করা হইয়াছে, তাহাতে শিল্পের অপমানই করা হইয়াছে এবং কতকগুলি অংশ বর্জ্জনে নির্দ্দেশ-দাতাদিগের শিল্প সম্বন্ধে ধারণার অভাবই সপ্রকাশ।

কৈলাসচন্দ্র ছবিখানির বিবরণ-পত্রে দেখিলেন, লিখিত হইয়াছে:

"যিনি এই চিত্রে নায়িকার অংশ অভিনয় করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভুক্তভোগী—এই সংবাদ সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় অনেকে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কল্পনা চিত্র শেষ হইলে একবার মঞ্চে আসিয়া দর্শকদিগকে নমস্কার করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

কৈলাসচন্দ্র সুজাতাকে সেই ঘোষণা দেখাইলেন।

চিত্রে নায়িকার অভিনয়ে সকলকেই মুগ্ধ করিল। কৈলাসচন্দ্রের মনে হইল, ভুক্তভোগী না হইলে কি কেহ অমনভাবে চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারে? অনুভূতিই ভাববিকাশের কারণ। ছবিখানিকে তিনিই বাস্তবের রূপে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

চিত্রের শেষাংশে যখন সজ্জার পরিবর্ত্তনে কল্পনাকে বিধবার বেশে দেখা গেল, তখন সুজাতার নয়ন অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

অশোক এক একবার জাগিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছিল—যখনই চিত্রখানি দেখিতেছিল, তখনই যেন কেমন অন্যমনস্ক হইতেছিল—কয়বার নায়িকার চিত্র দেখিয়া সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ও কে?"

চিত্র শেষ হইল। নির্ব্বাপিত আলোক জ্বলিয়া উঠিল। চিত্রগৃহ দর্শকে পূর্ণ। সকলেই স্থির—কল্পনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা আলোকপাতে অশোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। সে মঞ্চের দিকে চাহিল।

তখন ধীর পদক্ষেপে কল্পনা মঞ্চের উপর উপনীত হইল। বিধবার যে বেশে তাহাকে চিত্রের শেষাংশে দেখা গিয়াছিল, তাহার সেই বেশ। তাহার মুখে প্রফুল্ল ভাবের স্থান বিষাদের গাম্ভীর্য্য অধিকার করিয়াছে। সে আসিয়া দর্শকদিগকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুজাতার অঙ্ক হইতে অশোকের বালকণ্ঠে চীৎকার শ্রুত হইল—"মা! মা! সুনন্দা মা!"

কল্পনা ফিরিয়া যে স্থান হইতে সেই আহ্বান আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিল—অশোককে দেখিতে পাইল। সহসা তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে মঞ্চ হইতে অশোকের নিকটে যাইতে ব্যস্ত হইল। চিত্রগৃহের কর্ত্তারা তাহাকে পথ দেখাইয়া কৈলাসচন্দ্র ও

সুজাতা যে স্থানে অশোককে লইয়া বসিয়া ছিলেন, তথায় লইয়া চলিলেন। সে মন্থর গতি ত্যাগ করিয়া চঞ্চল চরণে তথায় আসিল—মনের চাঞ্চল্য তাহার দেহে চাঞ্চল্যের উদ্ভব করিয়াছিল।

কল্পনা আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিতেই অশোক তাহার বক্ষে গেল—তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, "মা! মা! দুষ্টু মা! তুমি কোথায় ছিলে, মা?"

কল্পনা উত্তর দিতে পারিল না; কেবল অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পুত্রের মুখ-চুম্বন করিতে লাগিল।

সুজাতা লক্ষ্য করিলেন, কল্পনার দেহ কম্পিত হইতেছে। কৈলাসচন্দ্রও তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার কথায় সুজাতা কল্পনাকে ধরিয়া আসনে বসাইয়া দিলেন। দুঃখের আঘাতে অভ্যস্ত কল্পনা অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার উচ্ছ্বসিত আবেগ সংযত করিতে পারিল।

আট

মাতাপুত্রের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মিলন অজ্ঞ দর্শকরা অভিনয়মাত্র মনে করিল। যাহাদিগের কাযের সময় হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা পরস্পরের সহিত কথা বলিতে বলিতে চিত্রগৃহ ত্যাগ করিতে লাগিল—বহুলোকের কথায় যেন গোলমাল উদ্ভূত হইল। আর কতকগুলি দর্শক কৌতূহল অনুভব করিলেন—তাঁহারা যে স্থানে কৈলাসচন্দ্র, সুজাতা, কল্পনা ও অশোক ছিলেন, সেই স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সে দিকে কল্পনার (অর্থাৎ সুনন্দার) লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। তিনি সুজাতাকে বলিলেন, "এখানে বিলম্ব করলে কেবল ভীড় বাড়বে; চল আমরা সব বাড়ী যাই।"

সুজাতা সুনন্দাকে বলিলেন, "চল বাড়ী যাই।"

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

"সে অশোকের বাড়ী। চল—তা'র পরে সব কথা হ'বে।"

কৈলাসচন্দ্র অগ্রসর হইলেন; সুজাতা সুনন্দাকে লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন—অশোক সুনন্দার বক্ষে। জনতা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। সমস্ত ঘটনা তাহাদিগের নিকট যেন রহস্যাচ্ছন্ন মনে হইল। যাহা রহস্যাচ্ছন্ন, তাহাই লোককে আকৃষ্ট করে; লোক তাহা লইয়া নানা জনরবের সৃষ্টি করে।

সকলে যানে আরোহণ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র চালককে নির্দ্দেশ দিলেন—"বাড়ী চল।"

জনতাকে পশ্চাতে রাখিয়া কৈলাসচন্দ্রের যান অগ্রসর হইল।

বাড়ীর কাছে আসিয়া অশোক তাহার মাতাকে বলিল—"ঐ বাড়ী।"

তাহার পরে সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কখন আসবেন?"—তখন সুনন্দার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। গাড়ী গৃহদ্বারে আসিল। সুজাতা অবতরণ করিয় অশোককে লইলেন এবং সুনন্দাকে বলিলেন, "এই বাড়ী।"

নয়

গৃহে উপনীত হইবার কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র স্ত্রীকে সুনন্দাকে তাঁহার বসিবার ঘরে আসিতে বলিলেন। অশোক তখন বারান্দায় ছবি দেখিয়া খেলনায় বাড়ী রচনা করিতেছিল।

কৈলাসচন্দ্র তাঁহার চাকরী-জীবনে মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভের অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি সে সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, বিশ্বাস পাইতে হইলে বিশ্বাস পাইবার উপযুক্ত হইতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়। তিনি প্রথমেই সুনন্দার নিকট আপনাদিগের পরিচয় দিলেন—নিঃসন্তানের মনে সর্ব্বদা যে অভাব অনুভূত হয়, তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাকুলতা ও তাহার ব্যর্থতা জানাইলেন: বলিলেন, সেই অবস্থায় সংবাদপত্রে প্রাপ্ত সংবাদ যেন দেবতার ইঙ্গিতরূপে আসিল এবং তাঁহারা সেবাশ্রমে যাইয়া অশোককে আনিলেন। তাহার আগমন গ্রীষ্মের তাপতপ্ত ভূমিতে বর্ষণের মত হইল।

তাহার পরে তিনি সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন ক'রে অশোককে হারিয়েছিলে?"

সুনন্দা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, সে বলিল, তাহার স্বামী তাহার ভ্রাতার সতীর্থ ছিলেন—উভয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই সূত্রে তাঁহার সহিত তাহার পরিচয় হয়। সে তখন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি যখন তাহার দাদার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন কাহারও তাহাতে আপত্তি হইল না। তিনি তখন অধ্যয়ন শেষ করিয়া একটি বড় ব্যবসায়ী কারবারে চাকরী লইয়াছেন। তিনি তখন পাটনায়। স্বামীকে পাটনা হইতে তিন বৎসর পরে ঢাকায় আফিসের কার্য্যভার দিয়া পাঠান হয়। তখন দেশ-বিভাগের কথা হইতেছে। ঢাকায় উপনীত হইয়া স্বামী তথায় বাস-ব্যবস্থা দেখিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে তথায় লইয়া যায়েন। ঢাকায় তাহার সর্ব্বনাশ হয়। সে বলিল:

—"দেশ বিভক্ত হ'ল; যা' কল্পনা ক'রতেও কষ্ট হয়, তা'-ই হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পাঞ্জাবে নরকের আগুন জ্বলে উঠল। যে ক'দিন পাকিস্তান সরকার ইসমালিক রাষ্ট্রে ক'লকাতার সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন নাই, সে ক'দিন পঞ্জাবের ঘটনার—বর্ণনা পাঠ ক'রে মনে ক'রতাম, মানুষ কি এমন পশু—পশুরও অধম হ'তে পারে? তখনও মনে ক'রতে পারি নাই, সেই বর্ব্বরতার বিকাশ আমাদেরও প্রত্যক্ষ ক'রতে হ'বে।

"কিন্তু তা'-ই হ'ল। বোধ হয়, পঞ্জাবের ব্যাপার আর পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়—একই নীতির অনিবার্য্য ফল। ঢাকা হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠল; সর্ব্বত্র হিন্দু-নির্য্যাতন—হত্যা, বাড়ীতে আগুন লাগান, লুঠ—আর সর্ব্বাগ্রে নারীর লাঞ্ছনা।

"স্বামী আমাকে ক'লকাতায় পাঠাতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু আমি তাঁ'কে সেই অগ্নিকুণ্ডে রেখে আসতে সম্মত হ'তে পারলাম না। ক'লকাতায় যা'বার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না বটে, তবুও তথায় মান আর প্রাণ নিরাপদ। তিনি ছুটীর জন্য প্রধান আফিসে 'তার' ক'রলেন; কোন উত্তর পাওয়া গেল না। হয়ত পাকিস্তান সরকার সে 'তার' পাঠাতে দেয় নাই।

"অবস্থা দিন দিন অধিক শোচনীয় হ'তে লাগল। আমরা যে পল্লীতে বাস করতাম, সে পল্লীও বার বার আক্রান্ত হ'ল। তখন আমার আর অশোকের জন্য স্বামী আমাদের ক'লকাতায় নিয়ে যেতে সম্মত হ'লেন। তা'র দু'দিন পূর্ব্ব হ'তে আমি লক্ষ্য ক'রছিলাম—মুসলমানের দল আমাদের বাড়ী লক্ষ্য করছে—বাড়ীর কোন স্ত্রী-লোকের পক্ষে বারান্দায় আসাও বিপজ্জনক। তা'দের দৃষ্টিতে কি নারকীয় ভাব!

"ট্রেণে পথে—পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কথা গোপন ছিল না। তাই স্থির হ'ল, আমরা বিমানে যাব।

"যেদিন আমরা বিমানে ঢাকা ত্যাগ করব, সেদিন—কি দুর্দ্দিন। আমরা যে চ'লে যাব, তা' মুসলমান দুর্বৃত্তরা হয় বুঝতে পেরেছিল, নয়ত বিমান অফিস হ'তে জান্‌তে পেরেছিল। তা'রা বাড়ী প্রায় ঘিরে ফেলেছিল।

"তা'র পরে তা'রা বাড়ী আক্রমণ করল—সম্মুখের দ্বার ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকল। স্বামী আমাদের রক্ষা করবার জন্য সহজাত-সংস্কারবশে বাধা দিতে অগ্রসর হ'লেন। দুর্বৃত্তদের আঘাতে তার রক্তাক্ত দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। তবু আমাদের—"

সুনন্দার কণ্ঠ রোদনোচ্ছাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কাঁদিতে লাগিল।

সুজাতাও কাঁদিতে লাগিলেন। কৈলাসচন্দ্রের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন, "আর এ কথা ব'লে কায নাই।"

সুনন্দা বলিল, "কিন্তু সে দৃশ্য যে জাগ্রত অবস্থায় যেমন—নিদ্রায় স্বপ্নেও তেমনই আমার নিত্য সহচর।" সে বলিল—

—"শিকার-লোলুপ বাঘ যেমন বাধা অতিক্রম ক'রে শিকারের দিকে অগ্রসর হয়, দুর্বৃত্তরা তেমনই আমার সন্ধানে অগ্রসর হ'ল—'বিবি কোথায়?' সহসা সংস্কারবশে আমি গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথে বা'র হয়ে ছুটতে লাগলাম। স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রইল—অশোকের কথাও আমি—তা'র মা—ভুলে গেলাম।

"বিমান ঘাঁটি দূরপথ—লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে—তার জন্য অলঙ্কার দিয়ে—আমি যে কিরূপে বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হ'লাম, তা' আমিই জানি না। বিমান

ঘাঁটিতে আরও অলঙ্কার ঘুষ দিয়ে বিমানে স্থান পেলাম—স্থান স্বামীই ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন।

বিমান ঢাকা ত্যাগ করল। যে আতঙ্ক আমার নিশ্বাস রোধ করতেছিল, তা দূর হ'ল; আমি যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু তখন বুঝলাম, আমি একা—আমার কেউ নাই! দুর্ব্বৃত্তরা যে অশোককে উপেক্ষা ক'রে রেখে গিয়েছিল, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নাই। স্বামীকে ত আমার চক্ষুর সম্মুখেই তা'রা হত্যা—"

বেদনার উচ্ছ্বাস-সমুদ্রের তরঙ্গের মত সুনন্দার মনে আঘাত করিল। সে আবার কাঁদিতে লাগিল

সেই সময় অশোক সে ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঝড়ের মতই আসিয়াছিল; কিন্তু মা'কে ও সুজাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া সহসা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে মা'র কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমরা এত কান্দছ কেন?"

সুনন্দা সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া ধরিল—যদি তপ্ত হৃদয় শীতল হয়।

একটু শান্ত হইয়া সুনন্দা বলিল:

—"বিমান দমদমায় উপস্থিত হ'ল। তথা হ'তে আমাদের শিয়ালদহে আনা হ'ল। যেন আগুনের কুণ্ড হ'তে নরকে পড়লাম। আশ্রয়প্রার্থীদের জনতা—শৃঙ্খলা নাই, ব্যবস্থা নাই, যে যাহা ইচ্ছা করিতেছে—শালীনতা নাই, শিষ্টাচার নাই। মানুষ কি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে!

"সন্ধ্যা না হ'তেই বুঝতে পারলাম, সেখানেও বিপদের অভাব নাই। কতগুলি স্ত্রীলোকের গতিবিধি দেখে আমার সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। একটু লক্ষ্য ক'রেই বুঝলাম, তা'দের উদ্দেশ্য ভাল নয়। তা'রা তরুণীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাবার অভিনয় করতে লাগল—তা'দের ভাল আশ্রয়ে নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখা'তে লাগল,—যেন তা'রা সেবা করতেই এসেছে। লক্ষ্য করে বুঝলাম, তা'রা চর—যা'রা তা'দের সে কাযে নিযুক্ত করেছে, সে সব পুরুষ অদূরে দাঁড়িয়ে তা'দের কায লক্ষ্য করছে, ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ দিচ্ছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্ত্রীলোকের ও পুরুষের সংখ্যা—দুষ্ট কীটের মত—বাড়তে লাগল। তা'দের এক জন পশ্চাতে অবস্থিত এক জন পুরুষের ইঙ্গিতে আমার কাছে এসে আমার অবস্থার সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে আমাকে তা'র বাড়ীতে যেতে বলল। তখন আমি বললাম, পুলিসকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে যেতে পারি। প্রহৃত হ'লে কুকুর যেমন পলায়, সে তেমনই সরে গেল।

"আমি ভাবতে লাগলাম, যাই কোথায়? আমরা পাটনা থেকে ঢাকায় যাবার পথে ক'লকাতায় যে হোটেলে উঠেছিলাম, সে হোটেলের নাম আর ঠিকানা আমার মনে ছিল—সেবাব্রতীদের মধ্যে একটি বালককে অনুরোধ করলে সে তা'র দলের নায়ককে জিজ্ঞাসা ক'রে গাড়ী ভাড়া ক'রে আমাকে সেই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এল। আমি হোটেলের ম্যানেজারকে পূর্ব্বে আমাদের সেই হোটেলে অবস্থানের কথা জানিয়ে থাকতে চাইলাম; ব'ললাম, হোটেলের যা প্রাপ্য তা' আমি দিব। তিনি, বোধ হয়, আমার দুঃখে দয়ার্দ্র হ'লেন; জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আহার কি হয় নাই? আমি তখন ক্ষুধায় কাতর, চিন্তায় অধীর। নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ ক'রে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। দেহ ও মন উভয়ই যেন আর কায করতে চাচ্ছিল না। বড় দুঃখে—দারুণ দুশ্চিন্তায়ও সে রাত্রিতে আমার গাঢ় নিদ্রা হ'ল। আশ্রয় যে পেয়েছি, তা'ই যথেষ্ট ব'লে মনে হ'ল। সমস্ত ঘটনায় আশঙ্কা হয়েছিল—বোধ হয় অদৃষ্টে তা'ও জুটবে না।'

দশ

ঘড়ীতে ছয়টা বাজিল।

সুজাতা অশোককে বলিলেন, "তোমার খাবার সময় হয়েছে। চল।" তিনি সুনন্দার নিকট হইতে অশোককে লইয়া যাইয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া খেলায় প্রবৃত্ত করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সুজাতা আসিয়া সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'র পরে কি হ'ল?"

সুনন্দা বলিতে লাগিল:

"রাত শেষ হ'ল। আবার ভাবনা—সে ভাবনার ত শেষ নাই। সর্ব্বপ্রধান ভাবনা, কি করি, কোথায় যাই?

গহনা প্রায় সবই ঘুষ দিতে শেষ হয়েছিল; সামান্য যা' কিছু অঙ্গে ছিল, তা'—সোনার দর বেশী ব'লে—বেচলে কিছু টাকা পা'ব। কিন্তু তা'তে ক'দিন চলবে?"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাপের বাড়ীতে কে আছেন?"

সুনন্দা বলিল:

"বাবার দুই সন্তান—দাদা আর আমি। বাবা ডাক্তার ছিলেন; দাদাও ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—ব্যবস্থা হ'ল, আরও অধ্যয়নের জন্য য়ুরোপে যা'বেন। মা জিদ করলেন, যা'বার আগে দাদাকে বিয়ে করতে হ'বে। বাবা তা'তে আপত্তি করলেন না। একটি মেয়ে গঙ্গার ঘাটে দেখা হ'বে, স্থির হ'ল। মা দেখ্‌তে গেলেন—মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে গঙ্গাস্নান করতে জলে নামলেন—পা পিছলে গেল। মা'কে আর পাওয়া গেল না। সেই ঘটনায় বাবার মস্তিষ্কবিকৃতি হ'ল। চিকিৎসায় যখন কোন সুফল ফলল না, তখন আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দাদা বাবাকে রাঁচী বাতুলাশ্রমে রেখে বিদেশে গেলেন।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদাকে সব কথা লিখেছ?"

সুনন্দা বলিল, "না। দাদার শেষ পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পাছে আমার বিষয় জানতে পারলে তিনি চ'লে আসেন, সেই ভয়ে আমি তাঁ'কে কেবল লিখেছি—আমি ক'লকাতায় এসেছি। আমার যা হ'বার হয়েছে—দাদার ক্ষতি করব কেন?"

শুনিয়া কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় সুনন্দার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল। সত্যই নারী ত্যাগের প্রতীক।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্বশুর বাড়ীতে আর কেউ নাই?"

সুনন্দা বলিল:

"আমার শ্বশুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—সামরিক চাকরীতে ইরাকে গিয়েছিলেন। যখন তথায় তাঁ'র মৃত্যু হয়, তখন শাশুড়ী বিপন্ন হ'ন। অর্থের অভাব ছিল না, কেন না শ্বশুরের মোটা টাকার জীবনবীমা ছিল। অভাব আশ্রয়ের। তিনি ছেলে দু'টিকে নিয়ে ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। আমার বিবাহের প্রায় পাঁচ বৎসর আগে তাঁ'র মৃত্যু হয়। আমার স্বামী ছোট ছেলে। বড়টি এখানে ওখানে চাকরী ক'রে শেষে আবাদানে পেট্রল কোম্পানীর কায লয়ে যান। তিনি সেখানেই আছেন—আর দেশে আসেন নাই। মামার ইচ্ছা ছিল, তাঁ'র এক বন্ধুর মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত কন্যার সঙ্গে ছোট ভাগিনেয়ের বিবাহ দেন। তা' না হওয়ায় তিনি ভাগিনেয়কে ব'লেছিলেন—'এখন খুঁটে খেতে শিখেছ—আর দুর্দ্দিনের কথা মনে করবে কেন? অকৃতজ্ঞতার মত পাপ কি আর আছে?' কি জানি, তাঁ'র অভিসম্পাতই ফল্‌ল কি না। তিনি আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।"

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া সুনন্দা বলিল:

"তা'র পরে চলচ্চিত্রে অভিনয়। হোটেলের অধ্যক্ষের পরিবারস্থ সকলে হোটেল বাড়ীর তৃতীয় তলে থাকেন। তাঁ'রা আমার কাছে আস্‌তেন—আমার সব কথা শুনেছিলেন। তাঁ'দের কাছে সে কথা শুনে অধ্যক্ষ তাঁ'র এক বন্ধুকে তা' ব'লেছিলেন। বন্ধু একটি চিত্র প্রতিষ্ঠানের অধিকারী। তিনি সব শুনে তাঁ'র স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠান। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর নরমেধ যজ্ঞের বিষয় নিয়ে একখানি চিত্র রচনা করা তাঁ'র অভিপ্রেত ছিল। তিনি ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ঘটনার চিত্রও সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। আমাকে চিত্রের কেন্দ্র করবার প্রস্তাব তিনি ক'রলেন। আমি প্রথমে সম্মত হ'তে পারলাম না। কিন্তু গহনা বিক্রয়ের টাকাও ফুরিয়ে আস্‌ছিল। আর তাঁ'র প্রস্তাবও অসঙ্গত মনে হ'ল না। তাই অনেক ভেবে আমি সম্মতি দিলাম।"

কৈলাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাযটি কি তোমার ভাল লেগেছে?"

সুনন্দা বলিল, "না। কারণ—আমার মনের অবস্থা অভিনয় করবার অনুকূল নয়; আর—যদিও চিত্র প্রতিষ্ঠানের অধিকারীর ব্যবস্থায় আমার অভিযোগ করবার কোন কারণ ঘটে নাই, তবুও যে স্থানে বহু অপরিচিতের সঙ্গে কায কর্‌তে হয়, সেখানে সঙ্গও ভাল না হ'তে পারে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"ইংরেজীতে যে কথা আছে—যে ভিখারী, তা'র পক্ষে বাছাই করা সম্ভব হয় না—এ তা'-ই।"

"কেন ?"

"অন্ততঃ দাদা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সৎপথে থেকে অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে হ'বে। আপনি স্বাবলম্বী হয়ে থাকৃতে হবে। আর—এখন যখন অশোককে পেয়েছি, তা'কে স্বামীর অভিপ্রায়মত শিক্ষা দিতে হ'বে—পালন ক'রতে হ'বে। সে জন্যও টাকার প্রয়োজন।"

সুজাতার বুকের মধ্যে আশঙ্কাজনিত বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল- তবে কি সুনন্দা অশোককে লইয়া যাইবে ?

কৈলাসচন্দ্রও, বোধ হয়, সেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না। আমরা অশোককে ছেড়ে থাকৃতে পারব না। বুঝেছ ত, ভগবান যে অভাব পূর্ণ করেন নাই, সেই অভাব পূর্ণ ক'রবার আশায় আমরা অশোককে এনেছি—ভগবানের দান ব'লে মনে ক'রেছি—সে-ই আমাদের সর্ব্বস্ব। আর তুমি আমাদের অশোকের মা—তোমাকে আমরা অভিভাবকহীন অবস্থায় বাস করতে দিতে পারি না—পদে পদে কত বিপদের আশঙ্কা তা' ত তুমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছ। তোমাকেও আমরা ছাড়ব না।"

সুনন্দা বলিল, "আপনাদের অসীম অনুগ্রহ—যে অনুগ্রহ আমাকে অভিভূত ক'রছে। কিন্তু আমি কি নিগ্রহের কারণ হব না ?"

"না, মা, আমাদের কায অনুগ্রহ নয়- স্নেহসঞ্জাত স্বার্থপরতা। তুমি আমাদের 'না' বল্‌তে পারবে না।"

সুনন্দা ভাবিতে লাগিল।

কৈলাসচন্দ্র সুজাতাকে বলিলেন, "পঞ্জিকাখানা আন ত!"

সুজাতা বিস্মিতভাবে স্বামীর দিকে চাহিলে কৈলাস চন্দ্র বলিলেন, "আজ যোগটা দেখব। আমাদের ত আজ প্রাপ্তিযোগ—অশোক তা'র মাকে পেয়েছে, সুনন্দা তা'র ছেলেকে পেয়েছে—আর আমরা আজ আমাদের মেয়ে পেয়েছি।"

আমার সৃষ্টির মাঝে তব সিংহাসন

শ্রীসরোজনাথ সরকার

আমি রচি গান সে তো তোমা লাগি'
প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে সারা রাত জাগি।
মোর কথা তোমার কণ্ঠেতে প্রিয়া
কত শতবার আঘাত হানিয়া
দেবে এনে স্বরগের অপূর্ব্ব আভাস,
তাই তো আমার এই সৃষ্টির প্রয়াস।

আমি রচি গান, আর তুমি দাও সুর ঃ
তাই তো জীবন মম অনন্ত মধুর,
ছন্দে ছন্দে নেচে ওঠে লাস্যের দুয়ারে,
তোমার ও মুখপানে চাহি বারে বারে।

বিশ্ব আমি ভুলে যাই, বিশ্ব মোরে ভোলে,
শুধু হয় একাকার আনন্দের দোলে ;
বুঝি সব মিশে যায় প্রাণের মাঝারে
অনন্ত আকাশ আলো গাঢ় অন্ধকারে ;
প্রাণের অনন্ত চাওয়া ভাষা আনে ব'য়ে
তোমারে পাওয়ার তরে, তব মুখ চেয়ে,
আমার চলার পথে ডাকে বারে বার
তোমার ও-নাম ধরে হে প্রিয়া আমার।
আমার বীণার তারে তোমার পরশ
জাগায় এ ভরা বুকে অনন্ত হরষ,
আমার সৃষ্টির মাঝে তুমি অনুক্ষণ
পেতেছ হে মোর রাণী নিজ সিংহাসন।
আমার এ সফলতা সে তো তোমা লাগি',
তাই রচি গান আমি সারা রাত্রি জাগি।

এডিনবরায় আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন

নরেন্দ্র দেব

মাত্র তিনটে হরফ P. E. N. ইংরাজী বর্ণমালার মধ্যে এরা পৃথক বাস করে। কিন্তু, যখন এরা একত্র হয়, তখন একটি শব্দ গ'ড়ে ওঠে—PEN. 'পেন' বা 'কলম' বস্তুটি আমাদের আশৈশবের পরিচিত।

লেখনীর সঙ্গে লেখকের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। লেখকের ভাব কল্পনা ও চিন্তাধারাকে রূপ দেয় তার লেখনী। চিত্রকরের তুলিকা ও ভাস্করের তক্ষণীর তুলনায় লেখনীর মর্য্যাদা বেশী, কারণ লেখকের লেখাকেই চিত্রকর রেখা ও রঙে ফোটায় এবং ভাস্কর তাকে মূর্ত্ত ক'রে তোলে।

'পেন' মানে এখানে কিন্তু শুধু কলম নয়। (P. E. N.) 'পি' অক্ষরটি 'পোয়েট' ও 'প্লেরাইট'দের আদ্যক্ষর। অধুনা পাবলিশাররাও এই হরফটিতে তাঁদের অধিকার দাবী ক'রেছেন। 'ই' অক্ষরটি 'এসেয়িষ্ট' ও 'এডিটারদের' পরিচয় জ্ঞাপক আদ্যক্ষর এবং 'এন' হরফটি হ'ল 'নভেলিষ্ট'-দের আদ্যক্ষর। সুতরাং 'পেন' ক্লাব ব'লতে বোঝাচ্চে কবি, নাট্যকার, প্রকাশক, প্রবন্ধকার, সম্পাদক এবং কথা-শিল্পীদের সম্মিলিত সংসদ।

পঁচিশ বছর আগে একদিন এ হেন জনকয়েক লেখক মিলে লণ্ডনে ব'সে স্থির করেন যে, যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত লেখক সম্প্রদায়ই প্রায় এক জাতীয় মানুষ অর্থাৎ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অতএব তাদের সকলকে নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক লেখক সমিতি গঠন করা হোক, তা হ'লে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদানে সুবিধা হবে।

ওরা উৎসাহী লেখক। অবস্থাপন্নও বটে। কেউ অনাহারী সাহিত্যিক নয়। অলস বিলাসীও নয়। জনে জনে অক্লান্ত কর্ম্মী। সুতরাং অবিলম্বে গ'ড়ে উঠলো এই 'পেন ক্লাব'। শক্তিশালী লেখক স্বর্গগত জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি যিনি ছিলেন একাধারে কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার ও সমালোচক তাঁরই নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম এই 'পেন ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গলস্‌ওয়ার্দ্দির স্বর্গা-রোহণের পর বিশ্ববিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত এইচ্, জি, ওয়েলস্ এর অধিনায়কত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন। উপস্থিত আন্তর্জাতিক পেন ক্লাবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক, সমালোচক ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত ক্রোচে (Benedetto Croce)।

পৃথিবীর সকল দেশেই এই 'পেন ক্লাবের' শাখা আছে। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'পেন ক্লাব' প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন বোম্বাইয়ের কর্ম্মকুশলা সাহিত্য-রসিকা সুন্দরী মহিলা শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া। এঁর ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ভারতীয় 'পেন' ক্লাবের দিন দিন প্রসার ও উন্নতি লাভ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সু-কবি সরোজিনী নাইডু এর নেতৃত্বভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। তিনিও আজ পরলোকে। বর্ত্তমানে ভারতের তথা এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ভারতীয় পি-ই-এন ক্লাবের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন।

বাংলা দেশে 'পেন ক্লাব' স্থাপিত হ'য়েছিল প্রায় বোম্বাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা শাখার পরিচালকগণ কিছুদিন পরেই বোম্বাইয়ের মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের স্বাধীন ও পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। কিন্তু 'পেন' ক্লাবের আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠান তাঁদের এ বিদ্রোহ স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। ফলে বাংলার একঘরে 'পেন ক্লাবের' শীঘ্রই অকাল মৃত্যু ঘটে।

বহুদিন পরে স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং বোম্বাইয়ের শ্রীমতী ওয়াদিয়ার অকুণ্ঠ সহ-যোগিতায় বাংলার পি-ই-এন শাখা পুনরুজ্জীবিত হয়। সস্ত্রীক রায় বোলপুরে বসবাসের জন্য কলিকাতা ছেড়ে

চ'লে যাবেন ব'লে উপস্থিত, উদীয়মানা ও যশস্বিনী লেখিকা শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার এর পরিচালনা ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

এই আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর নানা দেশে বসে। এবার স্কটল্যাণ্ডের আহ্বানে গত আগষ্ট মাসে এডিনবরা নগরে এই পেন কংগ্রেসের দ্বাবিংশ সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। ১৮ই থেকে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাত দিন ধ'রে চ'লেছিল এই বিরাট অধিবেশন। আমার ও আমার পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর এই আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনে ভারতীয় পেন ক্লাবের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল।

এবার এই 'আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসের' একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, জাতি-সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক বিভাগ (U. N. E. S. C. O.) ও পেন পরিষদের প্রতিনিধিরা একটি গোলটেবিল বৈঠকে একত্রে মিলিত হ'য়ে "লেখক ও স্বাধীনতার স্বরূপ" সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছিলেন।

আমরা য়ুরোপ যাচ্ছি শুনে শ্রীমতী ওয়াদিয়া বিশেষ প্রীত হন। তাঁর কাছে আমরা য়ুরোপের সমস্ত পি-ই-এন সেণ্টারের প্রধানগণের নিকট পেশ করবার মতো পরিচয়পত্র পেয়েছিলুম। লণ্ডন থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাবার আগে আমরা একদিন আন্তর্জাতিক 'পেন'ক্লাবের সম্পাদক ও একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক শ্রীযুক্ত হার্মান আউল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। তিনি বিশেষ সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে চা ও বিলাতী মিষ্টান্নের দ্বারা আমাদের পরিতুষ্ট করেছিলেন। আমরা যখন তাঁকে বললাম যে বার্ণার্ড শ', আল্ডুস্ হাক্স্লে, সোমারসেট মম্, টী এস্ এলিয়ট প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাই। তিনি যেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন, তাঁদের সময় বড় অল্প। নিজেদের লেখাপড়ার কাজ নিয়েই তাঁরা বড় ব্যস্ত থাকেন। অবকাশ পেলেই ছুটি উপভোগের জন্য বাইরে পালান। এখন লণ্ডনে কেউ নেই। যাইহোক, আমি এই আগামী ৩রা আগষ্ট তাঁদের সকলকে ডেকেছি পি-ই-এন কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। আপনাদেরও সেদিন উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তা'হলেই অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে পারবেন। আমরা সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজি হ'য়ে চ'লে এলুম এবং পাছে 'দুপুররাতেরসূর্যোদয়' দেখাটা আমাদের ফস্‌কে যায় এজন্য তাড়াহুড়ো ক'রে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় রওনা হয়ে গেলুম জুলাই মাসের গোড়াতেই। ১৪ই জুলাইয়ের পর নাকি এই 'মিড নাইট সান্' আর ওখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুত হার্মান আউল্ড আমাদের ইণ্টারন্যাশান্যাল পি-ই-এন ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড দিলেন দু'খানা। এতে পাশপোর্টের মতো সদস্যের আলোকচিত্র আঁটা

কবিপত্নী রাধারাণী দেবী সহ কবি নরেন্দ্র দেব

থাকে এবং তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে। এডিনবরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে আমরা যেন অতি অবশ্য যোগ দিই বলে মিঃ আউল্ড আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন এবং উক্ত কংগ্রেসের যিনি স্থানীয় সেক্রেটারী তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে তাঁকে আমাদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার কথা জানাতে বললেন। এবং কংগ্রেসের বিধি বিধান ও ডেলিগেশান ফর্ম ইত্যাদি অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাবার জন্য লিখতে বললেন।

আমরা এডিনবরা 'পেন কংগ্রেসের' স্থানীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জন ওয়াটসনকে একখানি পত্র এবং ভারতীয় পি-ই-এন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা প্রিয়বান্ধবী শ্রীযুক্তা সোফিয়া ওয়াদিয়াকে সকল বিবরণ জানিয়ে একখানা পত্র দিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া রওনা হয়ে গেলুম।

সোয়েডেনের ভিতর দিয়ে আমরা বরাবর নার্ভিক চলে যাই এবং নর্থ কেপ থেকে দুপুর রাতের সূর্য্যোদয় দেখে ষ্টকহোমে ফিরে আসি। এখানকার কাগজওয়ালারা খুব তৎপর। ভারতীয় এক লেখক-দম্পতী ওদের দেশে এসেছে জানতে পেরে রিপোর্টাররা হোটেলে এসে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কীয় বিবরণ ও ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কাগজে ছেপেছিলেন। ষ্টকহোমের ইণ্ডিয়ান লিগেশান মারফৎ আমরা শ্রীমতী ওয়াদিয়ার 'তার' এবং পত্র পেলুম যে আমরা উভয়েই ভারতীয় পি-ই-এন ক্লাবের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছি।

ইণ্ডোসুইডিশ এশোসিয়েশানের সেক্রেটারী মিঃ ষ্ট্রমগ্রেন এবং সুইডিশ 'পেন' ক্লাবের সভাপতি ডাঃ পল ব্যোয়র্কম্যানের আনুকুল্যে আমরা সপ্তাহকাল সুইডেনে পরম আনন্দে কাটিয়েছিলুম। ইণ্ডিয়ান লিগেশান অফিসের শ্রীযুক্ত মিত্র, মিঃ খান্না, মিঃ নির্ম্মল প্রভৃতি ভারতীয় বন্ধুরা এবং তাঁদের সহকর্ম্মী সুইডিশ বন্ধু ও বান্ধবীরা আমাদের ক'দিনই পালা করে ডিনার ও ল্যঞ্চ খাইয়ে এবং সমস্ত ষ্টকহোম ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি এই অবকাশে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখান থেকে আমরা নরওয়ে ঘুরতে যাই। ওস্লো ও বার্গেন হয়ে ৩রা আগষ্টের মধ্যে লণ্ডন পি-ই-এন মিটিংয়ে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েও আমরা সময় মতো জাহাজের টিকিট পেলুম না। বহু ট্যুরিষ্ট তখন ঘরে ফিরছেন। ২রা ৩রা দু'দিন অপেক্ষা করে ৪ঠা তারিখে আমরা 'নর্থসি' পার হবার জাহাজ পেলুম। অগত্যা বার্গেন থেকে শ্রীযুক্ত হার্ম্মন আউল্ডকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে সভায় যোগ দেবার অক্ষমতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করে একখানি টেলিগ্রাম করে দিলুম। সেই টেলিগ্রামেই লণ্ডনের সাহিত্যিক বন্ধুদের—ভারতের তথা বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা পাঠালুম।

লণ্ডনের ইয়র্ক হোটেলে ফিরেই আমরা এডিনবরা থেকে লেখা পেন কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জন ওয়াট্‌সনের পত্র পেলুম। তিনি আমাদের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহি করে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে আমাদের এডিনবরায় রাত্রিবাস ও প্রাতরাশের জন্য প্রিন্‌সেস্ ষ্ট্রীটস্থ 'ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে' ব্যবস্থা করেছেন।

পত্রখানি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। প্রিন্‌সেস্ ষ্ট্রীট এডিনবরার শ্রেষ্ঠ সুন্দর রাজপথ এবং ক্যালিডোনিয়ান হোটেল একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেল। কাগজপত্রগুলি খুলে দেখি তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রোগ্রাম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ছাড়া একখানি মুদ্রিত ফর্ম্ম রয়েছে যেখানি পূরণ করে নাম স্বাক্ষরান্তে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে। ব্যথিত চিত্তে দেখলুম যে সে নির্দিষ্ট তারিখ আমরা সোয়েডেনে থাকতেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবু, সেই যাকে বলে hoping against hopo, ফর্ম্মখানি পূরণ করে পাঠালুম এবং বিলম্বের কারণ জানিয়ে পত্র দিলুম।

ফর্ম্মের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা রয়েছে দেখা গেল - "আপনি হোটেলে থাকতে চান, না বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকতে চান, না কোনও গৃহস্থ পরিবারের অতিথি হ'য়ে যাপন করতে ইচ্ছা করেন? আমরা সেখানে লিখে দিলুম, 'গৃহস্থের গৃহে অতিথি হতে চাই।' যথাসময়ে পত্রোত্তর এল—'নির্দিষ্ট তারিখের

মধ্যে আপনাদের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে আপনাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা দুঃখের সঙ্গে অন্যকে বিলি করতে হয়েছে। এখন আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীমতী বার্ণের গৃহে আপনাদের সপ্তাহকাল বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হল।"

কংগ্রেসের প্রবেশমূল্য মাথাপিছু 'আড়াই পাউণ্ড' দেয় দেখে আমরা পূর্ব্বোক্ত ফর্ম্মের সঙ্গে দু'জনের পাঁচ পাউণ্ড পাঠিয়েছিলুম। কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ্যাণ্ডার্সন সে টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে লিখলেন যে, "ডেলিগেটদের প্রবেশমূল্য লাগবে না বরং পাথেয় হিসাবে আপনারা আমাদের কাছে কিছু পাবেন।"

হাতে হাতে পাঁচ পাউণ্ড ফেরত পাওয়ায় মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। পূর্ব্বোক্ত ফর্ম্মের মধ্যে আরও একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে, আপনি এডিনবরায় কোন্ পথে আসছেন? স্থল পথে—না জল পথে—না আকাশ পথে? এবার বুঝলুম যে, যিনি যে পথে আসবেন তিনি সেই পথের পাথেয় পাবেন। আমরা ট্রেনে যাবো লিখেছিলুম। সুতরাং ট্রেনভাড়াটা ফেরত পাবো জেনে পেন কংগ্রেসের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করলুম।

ফর্ম্মের মধ্যে আরও একটা বড় ফাঁক ছিল ভরাবার। সেটা হ'চ্ছে লেখকের রচিত গ্রন্থের পরিচয়; অর্থাৎ, গ্রন্থের নাম, কোন্ বিষয় নিয়ে লেখা, কোন্ ভাষায় রচিত এবং কোন্ কোন্ ভাষায় অনূদিত হয়েছে জানাতে হবে। এ ছাড়া গ্রন্থকারের নিজের নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, উপাধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের দেওয়া খেতাব, জন্মস্থান, বাসস্থান, কর্ম্মস্থল, বিবাহিত না অবিবাহিত, সঙ্গে স্ত্রী, স্বামী, সন্তানাদি বা আত্মীয় বন্ধু কেউ আসছেন কিনা-ইত্যাদি। সবই জানাতে হবে। 'পেনকংগ্রেসের' একখানি 'পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ' কর্ম্মসূচীও পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। তাতে দেখলুম ১৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের কাজ শুরু হবে। কিন্তু সেদিন সকালের দিকে এবং বিকেলের দিকেও আন্তর্জ্জাতিক পেনক্লাবের শুধু কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন বসবে। কেবল রাত্রি ৮টা থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সেখানে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের 'ইনফরম্যাল রিসেপশান' অর্থাৎ 'কি তা দুরন্ত নয়' এমন ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে এবং 'যে যার ইচ্ছা মতো তুলে নিয়ে ও ঢেলে নিয়ে পান ভোজনের' ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ Buffet-Dinner and Drinks· কাজেই, আমরা ১৭ই রাত্রের গাড়ীতে রওনা না হ'য়ে পরদিন ১৮ই তারিখে সকালের ট্রেনে লণ্ডন থেকে রওনা হলুম এবং সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে এডিনবরায় গিয়ে পৌছলুম।

এডিনবরা ষ্টেশনে পৌছে দেখি ডেলিগেটদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য কোনও ভলান্টিয়ার অথবা পেন-কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদেরও কেউ সেখানে উপস্থিত নেই। আমাদের ট্রেনেই লণ্ডন থেকে আরও কয়েকজন ডেলিগেট এসেছিলেন। তাঁরা যে যার গাড়ী থেকে নেমে এক একখানি ট্যাক্সী নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন। অগত্যা আমরাও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একখানি ট্যাক্সী নিয়ে শ্রীমতী বার্ণসের গৃহাভিমুখে রওনা হলুম।

শ্রীমতী হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় জামা বদলে একটু চা পান ক'রে ফ্রেশ হ'য়ে নিলুম। শ্রীমতী বার্ণস বললেন, পেন কংগ্রেসের সেক্রেটারী ওয়াটসন সাহেব একাধিকবার ফোন ক'রে আমরা এসে পৌছেছি কিনা খবর নিয়েছেন। শ্রীমতী আমাদের নামে তাঁর ঠিকানায় আসা একখানি চিঠি আমাদের দিলেন। বললেন, কাল রাত্রে এ চিঠিখানি এসেছে। খুলে দেখি সেদিন সকালের ও বিকেলের আন্তর্জ্জাতিক 'পেন ক্লাবের' কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভায় যোগ দেবার সাদর আমন্ত্রণ লিপি! আগের দিন না আসার জন্য আফসোস হ'ল। আমরা পি-ই-এন্-এর অভ্যর্থনায় যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম। শ্রীমতী ফোন ক'রে তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্য একখানি ট্যাক্সী আনিয়ে দিলেন! শ্রীমতী বার্ণসের বাড়ী হ'ল ১০নং গ্রীন পার্ক। পেন কংগ্রেস যেখানে ব'সছে সে স্থান এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে!

আমরা ট্যাক্সীতে উঠে চালককে ব'লে দিলুম আমাদের ল্যারিষ্টন প্লেসে জর্জ্জ হেরিয়ট স্কুলে নিয়ে চলুন।

ট্যাক্সী চালক স্মিতহাস্যে বললে, 'জানি, আপনারা ইণ্টারন্যাশনাল পেন কংগ্রেসে যাবেন তো? চলুন পৌঁছে দিচ্ছি। বেশী দূর নয়। পৃথিবীশুদ্ধ লোক এসেছেন সেখ'নে!'

ট্যাক্সী চালক স্কটল্যাণ্ডের একটি প্রিয়-দর্শন ও প্রিয়-ভাষী যুবক! কথায় কথায় জানা গেল সে পাবলিক স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছিল! পরে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রেছে! গাড়ীখানি তার নিজের সম্পত্তি! এই গাড়ীই নাকি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করে। যুবকের নাম মিঃ গেম্মার!

[ক্রমশঃ

ইতিহাস

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব্ব সকাল!
রোদ নামে পূর্ব্ব কোণ থেকে।
অলস চোখের কোণে চেয়ে চেয়ে দেখা আর ভাবা,
এই ঠিক, এই ভালো,
এম্‌নিই থেমে থেকে যদি পার হওয়া যায়
জীবনের সমস্ত সময়
দেব-কল্প সে কল্পনা!

ছিলো তাই! অতীতের গর্ভ গৃহ থেকে
যে-সব স্মৃতির কণা মাঝে মাঝে আজো
বাতাসেতে ওড়ে,
জানি আমি তারাই স্বাক্ষর তার!
তারই লোভে এ-সব প্রাণের শিরা
স্ফীত হ'য়ে ওঠে!
মদোদ্ধত শরীরের অনুপরমাণু
অসীম ভোগের বীর্য্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে
সেই রক্তে জাগায় জোয়ার :
—তপ্ত তাম্র বর্ণ হোক্, অথবা অংগার
অন্ধকারে সে বিচার নিরর্থক তাই
—চাই শুধু সুস্থ আর সবলার দেহ!

কেটে গেছে দিন,
দুর্দ্দান্ত ঝড়ের বেগে আজ তার স্মৃতিও মলিন!
লক্ষ্যহীন লক্ষ্মীছাড়া ঘরে
ঝর্ঝরিয়া ঝরে গেছে যৌবনের উদ্দাম পাতারা
আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে জ্বলেছে সাহারা!

তার পরে,
পার হ'ওয়া গেলো সাত সমুদ্রের জল,
পেলাম লক্ষ্মীরে
—খুলে খ'সে গেছে তারো কবরী নিবিড়,
জুঁয়ের স্তবকে হাসে কঠিন প্লাষ্টিক্!

অপূর্ব্ব সকাল,
চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি,
এখনো এখানে—
রোদ নামে পূর্ব্ব কোণ থেকে!

আঁখি

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

—তখন আমার বয়েস ছিল দশ আর আজ তেইশ। তেরো বছর হল। তবু কি মনে হয় জান দিদি, সব স্বপ্ন!

রাণীর পুকুরের কালো জল ছলছলিয়ে উঠল। জনশূন্য তার চারিদিক আম-কাঁঠালের কালো ছায়ায় মৌন রাত্রির বুকে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল! আকাশে একটি দুটি তারা। আর থেকে থেকে বইছে বাতাস—কখনও জোরে কখনও ধীরে—অতি ধীরে।

রাণীর পুকুরের কালো জল ছল ছল করে ওঠে।

রাধা যেন উথলিত হয়ে পড়েছে একটু। ওর তেইশ বছরের ঘুমিয়ে পড়া যৌবন আর পাথরের মতো বোবা প্রাণ আজ সহসা যেন মুখর হয়ে উঠল।

—আমি কিন্তু ভুলিনি আজও সেই দিনগুলোর কথা। আমায় কত আদর করত—ভয় দেখাত—মেলা থেকে খাবার এনে খাওয়াত। তারপর কী হল—কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল ও। আপন মনে কী ভাবে—কেবলই ভাবে।

তিনদিন কিছু খেল না—কোনো কথা বল্‌লে না। আমি কত কাঁদলাম—কত বোঝালাম কী অপরাধ আমার? তবু বুঝলাম না। তারপর একদিন রাত্রে আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

রাধা থামল। ওর চোখের কোন দুটো চিক্ চিক্ করছে।

রাধা কাঁদছে।

—তোমার স্বামীর চেহারাটা মনে পড়ে স্পষ্ট?

—হ্যাঁ। বিশেষ করে তার চোখ দুটি।

সন্তর্পণে রাধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হঠাৎ যেন থিতিয়ে গেল ও; চুপ হয়ে গেল ওর সবল হৃৎপিণ্ড।

একটু পরে কথা বল্‌লে আবার—তোমরা আছ তো এখন?

সুজাতা বুঝল—প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে রাধা। বল্‌লে উত্তরে—ওঁর ছুটি পর্য্যন্ত।

সুজিতের ছুটি পনেরো দিনের। তার সঙ্গে আরও পনেরো দিনের পাওনা ছুটি। একটি মাসের অবসরে এসেছে বিশ্রাম নিতে 'পলাশ-ডাঙ্গায়'।

সুজিতের ইচ্ছা ছিল না। ছিল না এই কারণে যে, হাওয়া বদলাবার বা রুচি পরিবর্ত্তনের মতো ঐশ্বর্য্য নেই পলাশ-ডাঙ্গার। যা ছিল তা গিয়েছে—পিতৃ-পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই। যা আছে—তা ঐ পোড়ো বাড়িখানা এক গলা আম কাঁঠালের ভিড়ের মাঝখানে।

দিনে সূর্য্যের আলো নেই—রাত্রে অন্ধকারের তুলনা নেই। থম্‌থমে ঘুঁটঘুটে এই প্রেতপুরী—বিরাট অতীতের নিঃশব্দ পদচিহ্ন বুকে করে রয়েছে। আর রয়েছে ঐ রাণীর পুকুর—যার কালো জল চিরদিনই টলটলে—ভিজে চোখের পাতার মতো করুণ ছলছলে। ওরই বুকে কত ইতিহাস—কত আত্মহত্যা—কত পাপ ডুবে আছে—মিশিয়ে আছে কালোয় কালো হয়ে। সুজিত তা জানে তার দাদুমণির যুগ থেকে।

সেই থেকেই একটা সংশয়—একটা যুক্তিহীন প্রেজুডিশ আর একটা অব্যক্ত কুহেলিকায় ঢাকা—এই পলাশ-ডাঙ্গা আর ঐ রাণীর পুকুর।

সুজাতার জিদ্—ঐ পলাশ-ডাঙ্গায় থাক্‌তে হবে তাকে একটি মাস।

কী রোমাঞ্চ আছে—কত অঘটন ঘটে গেছে—তারই তথ্য সংগ্রহে ব্যাকুল ওর কবি-মন।

প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগেছিল সুজাতার। বেশ হাসি-খুসী মেয়েটি। কথায়-বার্ত্তায় একটা মায়ামরা ভঙ্গী আছে। লোভীর মতো সুজাতা তাই দেখছিল।

মেয়েটি সলজ্জ হেসে প্রণাম করতে গেল। সুজাতা জড়িয়ে ধরল তাড়াতাড়ি—তোমার নাম কি ভাই?

—রাধা।

—রাধা—ও বিনোদের মেয়ে তুমি? তোমার কথা

শুনেছি, খুব ছোটো বেলায়—তোমার বর বুঝি তোমায় ফেলে --

সুজাতা সামলে নিল নিজেকে। রাধার মুখের রঙ বদলেছে। মাথাটা নীচু হয়ে গেছে। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে অনবরত মাটি খুঁড়ছে।

সামলে নিল সুজাতা নিজেকে। এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল—বাড়ীর ভেতর নিয়ে চলো আমায়।

এ সেই রাধা।

আজ এই সাতটি দিনের মধ্যে কেমন অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে সুজাতার। রাণীর পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে গল্প করে ওরা এমনি ক'রে পাশাপাশি—রোজ সন্ধ্যায়।

আকাশের গায়ে ঝিকিমিকি তারা। আর বড়ো তেঁতুল গাছটার ওপরে চিক্‌চিকে জোনাকীর আলো। তারই পাশে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকে রাধা।

সুজাতা বলে—কি ভাবছ এত ?

—তুমি চলে গেলে আমার কি হবে ? তারপর একটু থেমে বলে, আচ্ছা দিদি, তুমি তো এখানে থাক্‌তে পার—স্বচ্ছন্দে।

হাসল একটু রাধা—উনি না হয় আস্‌বেন সপ্তাহে সপ্তাহে ?

—দূর পাগোল! যা আপন ভোলা মানুষ। ওখানে ওঁকে দেখবে কে ? তা ছাড়া এখুনি উনি নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এখানে নাকি বড্ড ম্যালেরিয়ার ভয়। আমার শরীরে নাকি সইবে না এখানকার জল। যা ভীতু মানুষ ভাই

রাধা উত্তর দিল না কিছু। শুধু তাকিয়ে রইল পুকুরের কালো জলের পানে। অন্ধকারের বুকে ছোট ছোট স্রোত আঘাত করছে—সিমেন্টে বাঁধানো সিঁড়িগুলোকে ছলাৎ—ছল - ছল···।

···যাওয়া কিন্তু সে যাত্রায় হয়ে উঠল না সুজাতার। হঠাৎ সুজিত পড়ল অসুখে, ম্যালেরিয়া—সেই ম্যালেরিয়া যার ভয় সুজিত করছিল প্রতিমুহূর্ত্তে

পাড়াগাঁয়ের ঘরে ঘরে এই অতি পরিচিত শত্রুটির আক্রমণ কিন্তু এবার হল বড়ো অপরিচিত ভাবে। তিনটে দিন তিনটে রাত কোনো হুঁস রইল না সুজিতের। গাঁ সুদ্ধু লোকে ভেঙ্গে পড়ল। ভেঙে পড়ল তাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা আর উপদেশ নিয়ে।

—এমনি ভয়ানক অসুখ হয় না বড়ো একটা। যাদের হয়েছে—তাদের বাঁচেনি কেউ এ গাঁয়ে। পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও মা, এখনও সময় আছে।

সুজাতা ঘাবড়ে গেল। একা কি করবে ? একটা টেলিগ্রাম করে দেবার যোগ্যতাও যে নেই কারও। তা ছাড়া এই কাদা ভেঙে কে যাবে সাত মাইল দূরে—ডাকঘরে—কার এত মাথাব্যথা ? ভয়ে মুখ শুকালো।

এমনি সময় এল রাধা।

নির্ভয় দিয়ে বল্‌লে—তুমি কোলকাতায় চলে যাও দিদি, আমি রইলাম সব দায়িত্ব নিয়ে।

সুজাতার মন সরেনি প্রথমে। কি জানি—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো। কি খাওয়াতে কি খাওয়াবে—টেম্‌পারেচার ঠিক মতো নিতে পারবে কি না! কিম্বা হয়ত যদিই বা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে খোঁজ করেন—আর যদি কাছে না পায়, তা হলে তো রক্ষে নেই। একেতো জিদি মানুষ, তার ওপর রোগী।

সুজাতা বাতিল করলো যাওয়া।

কিন্তু রাধা বল্‌লে—দিদি, তুমি এমন ভুল কোরো না। তাড়াতাড়ি সহর থেকে যদি ডাক্তার আনতে না পার তা হলে—

সুজাতা ভাবছিল টেলিগ্রামের কথা।

কিন্তু টেলিগ্রাম করবেই বা কোথায় ? বাবা তো পুরী গিয়েছেন। ফেরবার সময় হয়েছে বটে—কিন্তু যদি ফিরে না এসে থাকেন ? আর দাদা ? দাদার পাত্তা কি এক জায়গায় পাওয়া যাবে ছুটির বাজারে ? তার চেয়ে রাধার কথাই ঠিক।

সুজাতা মনস্থ করল যাবে।

ভলো করে ওষুধ পত্তর বুঝিয়ে দিল সুজাতা দেখিয়ে দিল টেম্‌পারেচারের চার্ট। আর বুঝিয়ে দিল কেমন করে ঘড়ির কাটার সঙ্গে গুণতে হয় পাল্‌সের বীট।

বল্‌তে বল্‌তে হাত থেকে খুলে রাখল দামী রোলেক্স-খানা।—সকাল সাতটায় দম দিও রোজ। দেখো আবার

স্প্রিং কেটে গেলে এ সময়ে বড়ো মুস্কিলে পড়তে হবে। বুঝেছ ?

রাধা মাথা নেড়ে সায় দিল।

সুজাতা চলে গেল সেই দিনই। জ্বরে অচৈতন্য সুজিত। রাধা বসে রইল মাথার কাছে পাখা হাতে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। এক একটা মিনিট যায় আর চমকে ওঠে রাধা—ওষুধ খাওয়াতে হবে নাকি? কিম্বা টেম্পারেচারটা আবার নেবে ? কে জানে হয়ত প্রথমবার ভালো করে নেওয়া হয়নি। আবার তার কর্ম্মব্যস্ততা। এবার আরও তীক্ষ্ণ—আরও সূক্ষ্ম।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রোগীর ঘরে ম্লান হ্যারিকেনের আলো জ্বলে উঠল। পূর্ব্বদিকের জানালাটা খোলা। একটা ধূসর অন্ধকার ভিড় করে আছে। তারই ছায়ায় আত্মগোপন করে রাধা। বাতাস করে সন্তর্পণে—আলগোছে।

পরের দিন সকালে জ্বর কমে এল। সুজিত চোখ মেলে তাকাল একবার। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—সুজাতা!

উত্তর এল না।

আন্দাজেই হাত বাড়াল সুজিত সুজাতাকে স্পর্শ করতে।

এটুকু দুষ্টুমি যায়নি এখনও। সুজিত ধ'রে ফেলল হাতখানা। খুব ভোগালাম না ?

রাধা শিউরে উঠল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—আমি রাধা।

দুপুরের দিকে জ্বর ছেড়ে গেল একেবারে। দুর্ব্বল রোগী ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রান্তির বুকে। রাধার প্রাণে আজ জোয়ার বইছে। একটা মস্ত সার্থকতা—একটা অচিন্ত্যনীয় সাফল্য আজ তাকে বিজয়িনী করেছে।

কত ভয় ছিল ওর মনে--যদি অসুখ যেত বেড়ে—কিম্বা যদি ঘটত কোনো বিপদ ? এ মুখ কি দেখাতে পারত সে কোনোদিন সুজাতাদির কাছে ?

সেই মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে কেমন। শিশুর মতো অসহায়—শান্ত। এরই গলায় সযত্নে তোয়ালে ভাঁজ করে এই রাধাই ওষুধ খাইয়েছে কতবার। কতবার নিজের আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়েছে। সার্টের বোতাম খুলে কত যত্নে থার্ম্মোমিটারে টেম্পারেচার নিয়েছে। সেই মানুষটি ঘুমোচ্ছে কেমন নির্ব্বিকারে। মুখটা সত্যিই সুন্দর—দেখলে মায়া হয়। সব মানুষকেই বুঝি এমনি লাগে রোগ শয্যায়।

কিন্তু বুঝি সকলেরই থাকে না এমনি দুটি চোখ। আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে রাধা মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত। ঠিক এমনি দুটি আঁখি তার গভীর অন্তরে আজও যে প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে!

এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলো রাধার কতবার ধরা প'ড়েছে সুজিতের কাছে।

সুজিত হেসে জিজ্ঞেস ক'রেছে—কী দেখ রাধা এমনি ক'রে ? লজ্জায় রাঙিয়ে যায় রাধার মুখ।

—বলো না, দেখেছ নাকি এর আগে আমায় ?

--না কখনও দেখিনি।

—তবে ?

রাধা চুপ ক'রে থাকে। মাথাটা নুয়ে পড়ে শুধু। একটা লঘু শ্বাস অতি নিঃশব্দে বাতাসের গায়ে আঘাত দিয়ে মিলিয়ে যায়।

সুজিত জিদ্ ধরে—তবে কি দেখ ?

রাধা উঠে যায় ব্যস্ত হয়ে। যেন তার কত জরুরী কাজ প'ড়ে রয়েছে নীচে।

···দু' দিনের দিন বিকেল বেলায় সুজাতা ফিরে এল ডাক্তার নিয়ে। ঘরে ঢুকেই আনন্দে ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুজিত দুটো বালিশে পিঠ লাগিয়ে শুয়ে আছে। হাতে একখানা ইংরেজী নভেল। খাটের ধারে টুলের ওপর ব'সে রাধা টেম্পারেচার দেখছে

সুজাতাকে দেখে রাধা উঠে দাঁড়াল। সারা মুখে ওর হাসি। বল্‌লে—এবার তোমার রুগী নিয়ে যাও দিদি, দেখো—কেমন সারিয়ে দিয়েছি।

সুজাতা গিয়ে জড়িয়ে ধরল রাধাকে—ভাগ্যি তুই ছিলি বোন্!

দুটো দিন বিশ্রামের পর সুজাতা বললে--আর না। এইবার চলো।

সুজিত বললে—আমি তো পা বাড়িয়ে। তোমাদেরই যে ফুরসৎ নেই।

ঠিক হ'ল বিকেলের গাড়ীতেই যাওয়া হবে। রাধা বড়ো ব্যস্ত। সব কিছুই গুছিয়ে দিচ্ছে ওই।

যাবার সময় সুজিত ডাকল রাধাকে—শোনো, এদিকে এসো। রাধা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ভীরু দৃষ্টিতে তাকাল একবার। সুজিত বল্‌লে—তোমার সেবার কথা ভুলব না কোনো দিন। টাকা দিয়ে বা পুরস্কার দিয়ে এ ঋণ শোধ করা যায় না। তবু কিছু একটা দিয়ে যেতে চাই। বলো কি নেবে? লজ্জায় রাধা মাথা তুলতে পারল না। তিন জোড়া করুণামাখা দৃষ্টি বিদ্ধ ক'রছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। রাধা ঘেমে উঠেছে।

সুজাতা বল্‌লে—বল্ না ভাই রাধা কি নিবি? সত্যি—তোর ঋণ—

রাধা চোখ মেলে তাকাল। বাঁকা বাঁকা ঘন কালো চোখের পাতার অন্তরালে দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টি-প্রদীপ—কী করুণ—কী বেদনাতুর!

সেই দৃষ্টি বিস্তার করল রাধা সুজিতের চোখের 'পরে। স্থির মূর্ত্তির মতো স্থির হয়ে গেল রাধা। শুধু দু' ফোঁটা জল চিক্ চিক্ করছে ওর কালো চোখের দুই প্রান্তে।

রাধার কণ্ঠস্বর কাঁপছে—আমায় নিয়ে চলুন আপনাদের সঙ্গে। আমি কিচ্ছু চাই না। আমি দুটি বেলা আপনাদের ঘরের সমস্ত কাজ করে দেব—একটি পয়সা পর্য্যন্ত নেব না। শুধু একটি ভিক্ষে—আপনাদের কাছ থেকে আমায় দূরে ফেলে দেবেন না।

সুজাতা শিউরে উঠল। সুজিতের চোখের মায়ায় মাখামাখি হয়ে গেছে রাধার চোখের সর্ব্বনাশা ভাষা!

সুজিত হাসল। বল্‌লে—তা হয় না রাধা।

একমুহূর্ত্তে রাধার মুখের রং বদলাল। সেটুকু ঐ মুহূর্ত্তটির জন্যে।

রাধার মুখে ফুটে উঠল হাসি,—তবে আমার আর একটা কথা রাখুন। আস্‌ছে বার পূজোয় আবার আসবেন আপনারা?

সুজিত বল্‌লে—তা আসতে পারি।

রাধা এবার এগিয়ে এল। খপ্ করে সুজাতার হাতটা ধরে বল্‌লে—দিব্যি করো তোমরা দুজনে আমার গা ছুঁয়ে।

সুজিত হাসল আবার,—এই নাও দিব্যি করলাম—আসব—আসব—আসব। কিন্তু আমাদের হঠাৎ এত তোমার ভালো লাগল কেন?

রাধা তার কোন উত্তর দিল না।

* * *

একটি বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। সুজাতাই মনে করিয়ে দিলে রাধার কথা। ওর কবি-মনে আবার নতুন খোরাকের সন্ধান মিলেছে।

পলাশডাঙ্গার পথের ধুলোয় আবার পুরণো দুই পথিকের পদধ্বনি বেজে উঠল। সেই পুরণো ভাঙা বাড়ী। ঠেলা দিতেই পুরণো দরজা খুলে গেল মৃদু আর্ত্তনাদে।

একটি মূর্ত্তি—ঘন কালো মূর্ত্তি ছায়ার মতো অন্ধকারে ওৎ পেতে।

—কে? শিউরে উঠল সুজাতা।

মূর্ত্তি চঞ্চল হয়ে উঠল। নড়ছে—মৃদু পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে।

ঐযে কাশলো চাপা কাশি—খুক্ খুক্ খুক্!

—কে?

সুজিতের হাতের পাঁচ বেটারীর টর্চ ঝিলিক মেরে উঠল।—এ-কি, বিনোদ!

বিনোদ এসে নতমাথায় নমস্কার করল। কোনো কথা বল্ল না।

সুজাতা জিজ্ঞেস করল—রাধা কোথায়? নেমন্তন্ন করেছিল যে!

বিনোদ সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার। নিঃশব্দ ইসারায় দেখিয়ে দিল রাণীর পুকুর। দু'জনে ফিরে দেখল। কেউ কিছু বুঝল না। চারিদিকে আম-কাঠালের ঘন বনের ছায়া কালো রাত্রির অন্ধকারে মিলে গেছে। রাণীর পুকুরের কালো জল ছলছলিয়ে উঠছে, যেমন উঠেছিল একটি বছর আগে।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

পনের

তখনও বছর ঘোরেনি নতুন মা ঘরে এসেছেন। সময়ের অসীম প্রসারণের কাছে এইটুকু সময় তুচ্ছ হলেও এর-ই মধ্যে আমাদের বাড়ীর অন্দর-বাহিরে একটা বিস্ময়কর বিপ্লব এসেছিল। বাড়ীতে যা-কিছু পুরনো ও সেকেলে জিনিস-পত্র ছিল সে-সবই যেন ভানুমতীর ভেল্কিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। মা'র আমলের খাট-পালং টেবিল, চেয়ার, আয়না-ছবি, সবই নূতন মা'র তাড়া খেয়ে' পুরনো আস্‌বাবের দোকানে গিয়ে আত্মবিক্রয় করল! তাদের শূন্যস্থান দখল করল হাল-ফ্যাশানের নতুন-নতুন গৃহ সজ্জা।

যে আমলের কথা বলছি তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে বিদ্যুৎ-আলো ও পাখার তেমন চলন ছিলনা। আমাদের বাড়ীতেও সে সময় বিদ্যুতের যোগান ছিল না। এর আর একটা কারণ হতে পারে বিদ্যুৎ-আলো, পাখা, ট্রামের যুগেও আমাদের বাড়ীর হাল-চাল অনেকটা সেকেলে ধরণের ছিল। আমাদের নীচের বসবার ঘরে, আর সদর দুয়ারে ছিল গ্যাসের বাতি, অন্য সব ঘরে জ্বলত পিলসুজে রেড়ি-তেলের পিদীম। হারিকেন লণ্ঠন দু'তিনটা ছিল বাড়ীতে। নীচের বসবার ঘরে একখানা টানা-পাখা ছিল, উপর-নীচে আর কোন ঘরেরই সে সৌভাগ্য ছিল না। তা' না থাকলেও দক্ষিণে প্রশস্ত রাজ-পথ আর পূবে প্রকাণ্ড একটা পড়ো জমি থাকায় বাড়ীতে আলো-বাতাসের কোন অভাব ছিলনা।

অভাব না থাকলেও এই সেকেলে ব্যবস্থায় নতুন মা একটুও সুখ-শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন তাঁর ছোট মাসীর বাড়ীতে যেমন ঘরে ঘরে বিজলী-বাতি ও পাখা, তাঁর বাড়ীতেও ঠিক তেমনটি হয়। লোকের ইচ্ছার অন্ত নাই; নতুন মা'রও ছিল না। তিনি চাইলেন সাহেবী কায়দায় তাঁর বাড়ীতে ও দুয়ার জানালায় পর্দ্দা, ফুলদানিতে ফুলের বাহার, দেয়ালের গায়ে বিদেশী ছবি; আর সোফা-আর্শি-কার্পেটে তাঁর বাড়ীখানি যেন ইন্দ্র-পুরীর শোভা ধারণ করে। অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর তুলনায় তাঁর ছোট মাসীর বাড়ীর সাজ-সজ্জা, শোভা-সৌন্দর্য্য যেন হীন হয়ে পড়ে। শুধু কি এই? ছোট মাসীর মত তাঁরও অন্ততঃ দু'খানা মোটর থাকা চাই। অহো! আশাবন্ধিং কোগতঃ?

মানুষের মত ভগবানও হয়ত দুরাশা-দুর্দ্দদের ভয় করেন! নতুন মার ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ডতায় ভয় পেয়ে ভগবান সরে দাঁড়ালেন। যেখানে সৃষ্টি-কর্ত্তা শঙ্কিত, সেখানে বাবা ভয় পাবেন সে আর বিচিত্র কি! ফলে অনতিবিলম্বেই আমাদের দু'খানা মোটর হল, বিজলীর আলো ও পাখা বাড়ীতে এল। বাড়ীখানি নতুন সাজে ঝলমল করল।

নতুন মা যেমন অষ্টপ্রহরই অদলবদল ক'রে নতুন নতুন ভূষণে, আভরণে, ও প্রসাধনে, সুসজ্জিত থাকতে ভালবাসতেন, তেমনি মাসের মধ্যে পাঁচ-সাতবার গৃহ-সজ্জাদির পরিবর্ত্তন করতেন; ঘরগুলি একই ধরণে, একই সজ্জায় নিত্য সজ্জিত দেখতে তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জাগত। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্যের বাহ্য প্রকাশে অনুরক্ত, প্রগতির পরম ভক্ত।

যারা ধন-গর্ব্বিত স্বানুরাগে তন্ময়, তারা সর্ব্বদাই চায় তাদের সৌভাগ্য-সূর্য্যের গৌরব গীতি গেয়ে ভুবন ভরে দেয় লোকে। তারা চায় সেই ভুবন-ভরা প্রশস্তি শুনে' শত্রুরা যেন জ্বলে মরে। নতুন মাও চাইলেন তাঁর সমুন্নত সৌভাগ্য-সূর্য্যের কণক কিরণে স্বজন-বন্ধু, শত্রু-পর সকলেই সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে তাঁর সম্পদের পদে; যারা একদিন তাঁর পিতার আর্থিক দুর্দ্দিনে

আনন্দে আত্ম-হারা হয়েছিল, আজ তারাই তাঁর ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে।

নতুন মা গৃহস্থালীর কাজে তেমন ভিড়লেন না। নিজের ও ঘরের সাজ-গোজে, দোকানে-দোকানে কেনা কাটায়, সিনেমায়-রেঁস্তরায়, পার্কে, ময়দানে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। তা' ছাড়া মাসী বাড়ী, পিসি বাড়ী ইত্যাদি যাওয়া-আসা ত লেগেই ছিল। গৃহস্থালী দেখবার সময় কই তাঁর? তিনি যেখানেই যেতেন একা-একা যেতেন না। কোন কারণে বাবা সঙ্গে যেতে না পারলে, হয় বেহারী মামা, না হয় দরোয়ানকে সঙ্গে যেতে হত। একা-একা কোথাও গেলে নাকি তাঁর মর্য্যাদা হানি হত! নিজের বাড়ীতেও তিনি একলাই থাকতে হাঁপিয়ে উঠতেন। বড় বড় ঘরগুলি নিলামী-বাজারের মত আসবাবে ঠাসা হলেও তাঁর কাছে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হত। কি ঘরে কি বাইরে সর্ব্বত্রই তিনি সাম্রাজ্ঞীরই মত পারিষদ-পরিকর পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। তাই বাড়ীতেও উৎসব-আনন্দ লেগেই থাকত নিত্য। তাঁর আত্মীয়-স্বজন নদীর জোয়ার ভাঁটার মতই আসা-যাওয়া করে, গল্প-গুজবে তাঁর মনকে সুস্থ ও সরস রাখত। যেদিন কোন কারণে বাইরের লোকের আমদানি না হত সে দিনটি তাঁর মেজাজ অসম্ভব রকম খাপছাড়া হয়ে পড়ত এবং বাড়ীর লোকজন শঙ্কিত হয়ে উঠত। তবে এমন ঘটনা ন' মাসে ছ' মাসে বড় জোর দু' তিন বার ঘটত।

বাড়ীতে কারা যে আসা-যাওয়া করত, ঠাকুমা কি আমার জানবার বড় উপায় ছিল না। যারা আসত তাদের মধ্যে পনেরো আনাই সোজা চলে যেত নতুন মা'র ঘরে। যদি হঠাৎ কারো সঙ্গে আমাদের চোখো-চোখি হয়ে যেত তা' হলেই শুধু এক টুকরো ফিকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেত তাদের অভীষ্ট স্থানে নতুন মার ঘরে। আসর জমাট বাঁধত, হাসির হুল্লোড় ছুটে আসত, বাড়ী-ঘর কেঁপে উঠত উচ্চ ভাষণের ভূমিকম্পে। ঠাকুমার প্রতি সমাগতদের এই তুচ্ছতা অল্প দিনের মধ্যেই তার গা-সওয়া হয়ে এসেছিল; শুধু ক্ষেমী পিসি এসে যখন—কই গো লতু, বলে হাঁক দিয়েই উপরে চলে যেত, আর একটু বাদেই যখন তার জন্য চা-জলখাবারের তাগিদ আসত, তখন আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারতেন না—তাঁর চোখের কোলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা শিশিরের মত চিকচিক করে উঠত।

ভগবানকে লোকে যতটা এক চোখো মনে করে, তিনি হয়ত ততটা নন। যদি তাই হতেন তা হলে মরুভূমে তৃণাচ্ছাদিত শস্পখণ্ড, মানুষের মনে শোকদুঃখের বিস্মৃতি, কঠোর হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব কখনই স্থান পেত না। তিনি যে এক দিকে টেনে কিছু করেন না, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল মেজ-মাসী ও বড় মামার ব্যবহারে। তারা খুবই কম আসতেন, তা' হলেও যখনই আসতেন ঠাকমার সঙ্গে ত বটেই, এমন কি আমার সঙ্গে দেখা করতেন, ডেকে ভাল-মন্দ দু'চারটে কথা-বার্ত্তা কইতেন। আমার খুবই ভাল লাগত তাদের। ঠাকুমাও প্রায়ই বলতেন—সতু ও দীপুর মত ছেলে-মেয়ে মা-বাপের গৌরব, পুণ্যের ফল। ওদের গুণের অন্ত নেই। বড় মামা বেশী সময়ই কালনায় থাকতেন; কিন্তু যখনই শিবতলায় আসতেন, তখনই আমাদের বাড়ী এসে নতুন-মা, ঠাকমা ও বাবার সঙ্গে দেখা করতেন। আমাকেও কত আদর করতেন, কত কি কথা জিজ্ঞেস করতেন।

নতুন মা সংসারের কাছে বিশেষ ভিড়লেন না দেখে ঠাকমাও তাঁকে কোন কাজকর্ম্মে বড় ডাকতেন না। নিজে যা পারতেন, যা ভাল মনে করতেন, তাই করে যেতেন। এজন্য আমাদের তরফের কোন আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-পড়শীদের মধ্যে কেউ কিছু নতুন মাকে দোষা-রোপ করলে নতুন মার পক্ষ টেনে তিনি বলতেন—আহা ক'দিনইবা এসেছে! হলোই বা বয়সে একটু ডাগর, বাড়ীর নতুন বউই-ত। দু'দিন নিক না একটু বেড়িয়ে-খেলিয়ে! ঘরের কাজ ত আর পালাচ্ছে না। বয়েস হয়েছে, লেখা-পড়া জানে, যখন কাজ করতে ইচ্ছে হবে আমাদের চেয়ে বেশ ভাল করেই গুছিয়ে করতে পারবে।

নতুন মা ও ঠাকমার কাছে এই দরদটুকু পেয়ে খুশিই ছিলেন তাঁর উপর। তিনি বাইরের লোকের কথায় কাণ না দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতই চলতে লাগলেন। তা বলে সমাজের দৃষ্টিতে যে-সব কাজ বাড়ীর বউদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলে মনে হয়, সে-সব কাজে কখনই

অবহেলা করতেন না। শাশুড়ীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, সমীহ করতেন; তাঁর কি দরকার না-দরকার সে-সবের খোঁজ-খবর নিতেন। কি খাবেন না-খাবেন ঠাকমা, প্রত্যহই জিজ্ঞেস করতেন এবং খাওয়ার সময় কাছে এসে বসতেন, দ্বাদশীর দিন রান্না-বান্নার ও ঘরকন্নার কিছুটা ভার নিজে নিয়ে ঠাকুমাকে সকাল-সকাল স্নান-আহারের সুযোগ দিতেন। ঠাকুমাও ছুটি পেয়ে খুশি হয়ে গঙ্গা-নাইতে ছুটতেন।

নতুন মা আমাকেও খুব আদর যত্ন করতেন; যখনই যা দরকার হত কিনে দিতেন; কোন দিনই বড় চাইতে হত না। কোন কোন দিন 'শো'তে কি মামা-বাড়ীও নিয়ে যেতেন। যেদিন কোন দোকানে কি হগ-মার্কেটে নিয়ে যেতেন, সেদিন আমার দরকার থাক বা না থাক কিছু-না-কিছু দিতেনই কিনে। মায়ের জন্য সময় সময় মন কাঁদলেও নতুন মাকেও আমার খুবই ভাল লাগত। ঠাকমাও তাঁর আলাপি লোকদের কাছে নতুন মা'র খুব সুখ্যাতি করতেন। কেবল ক্ষেমী পিসির সঙ্গে দিন-রাত অত মাখা-মাখি আর মোটর নিয়ে যখন তখন ছুটাছুটি করাটা পছন্দ করতেন না।

নতুন মা'র এই নরম ব্যবহার কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হল না। কয়েক মাসের মধ্যেই একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। আগের মত আর ঠাকমার খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ নিতেন না, খাওয়ার সময় উপস্থিতও থাকতেন না; দ্বাদশীতেও আর গঙ্গা-নাওয়ার ছুটি পেতেন না ঠাকমা। তাঁর কোন কাজেই নতুন মা'র মন উঠত না; প্রতি কাজেই একটা না একটা খুঁৎ বেরুত।

আমার উপরও তাঁর স্নেহ-যত্নে ভাঁটার টান পড়ল; আমার অনেক দরকারী জিনিসের অভাবই তার নজরে ধরা পড়ত না। সে-সবের জন্য বাবার কাছে গিয়ে দরবার করতে হত আমাকে। আর সে জন্য বাবাও দিন দিনই আমার উপর বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি সাতে-পাঁচে কোনটায়ই থাকতে ভালবাসতেন না। ঠাকমা ও নতুন মা যা দিয়ে যা করতেন তিনি তাই নির্ব্বিকারে মেনে নিতেন। হঠাৎ কেন যে নতুন মার মন আমাদের উপর বিষিয়ে উঠল ভেবে-ভেবে আমরা কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না।

ষোল

মাস খানেক পরে একদিন 'সরকারী' বেড়াতে এলে বিষয়টা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্য্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে 'সরকারী' এসে উদয় হল বাড়ীতে। উঠানে পা দিয়েই অন্যান্য দিনের মত সেদিনও উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল—কইরে বিধু আছিস্ কেমন?

—এই যে 'সরকারী', এসো ভাই দিদি; আনাজ কুটছিলাম।

—তা তুই উঠে এলি কেন? চ' আনাজ কুটতে-কুটতে গল্প করবি। বউমা বাড়ী আছে, চখাচখী দু'টিতে বেড়িয়েছে?

বাবা সেদিন নতুন মাকে তাঁর ছোট মাসীর বাড়ী বেড়াতে নিয়ে গেছ্‌লেন। ঠাকমা বল্লেন—না গো দিদি, বউমা বাড়ী নেই। তার ছোটমাসীর বাড়ী গেছে। মধুও সঙ্গে গেছে।

'সরকারী'র আর বসবার তর সইল না। কোন রকম ভণিতার ভড়ং না করেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরু করলে—ক্ষেমীর যে বড় পদ বেড়েছে তোদের বাড়ী! মাসের মধ্যে ক'দিন আসে না বল ত, বিধু?

—বউমার মামী হয়; রোজই কেন না আসে?

—তা আসে আসুক না, কে বারণ করেছে? এমন লাগানো-ভাঙ্গানোর স্বভাব কেন?

ঠাকমা বললেন—সে ত ওর চিরকেলে স্বভাব। নতুন কি? কার নামে কি লাগালো শুনি?

ঠাকমার কৌতুহলে উৎসাহ পেয়ে 'সরকারী' সুরু করল—তবে শোন বলি। পরশু পালপাড়া থেকে রেখা এসেছিল; তার মুখে শুনলাম ক্ষেমী পাড়ায়-পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে—তোর মত দজ্জাল ঝগড়াটে লোক নাকি ভূভারতে আর নেই।

ঠাকমা হেসে বল্‌লেন—ওঃ এই! আমি ভাবলাম আর জানি কি!

—বলেছে বই কি আরো তোর জ্বালায় খোকনের মা বিষ খেয়ে মরে' বেঁচেছে ; এখন আবার তাদের লতুকে জ্বালিয়ে খাচ্ছিস। কবে না জানি তাদের লতুও বিষ খায়!

বাজীকরের মেয়ের মত ক্ষেমী হয়কে নয়, আর নয়কে হয় করতে পারে তা' জানতাম ; কিন্তু য়্যাদ্দূর যে পারে তা' জানতাম না 'সরকারী'।—অতি আর্ত্তির সঙ্গে ঠাকমা বললেন।

ঠাকমা তার শোনা-কথাটা বিশ্বাস করায় 'সরকারী' প্রসন্ন হয়ে বল্‌লে—শুধু কি এই, বিধু? তোকে নরম পেয়ে যার যা ইচ্ছে বলে বেড়াচ্ছে। ক্ষেমীর কি কিছুতেই ক্ষান্তি আছে? যেখানে-সেখানে ঢাক পিটিয়ে বলছে—অমন কাঠের পুতুল তাদের লতু, তার নামে নাকি তোর ছোট জায়ের কাছে বলেছিস—বউর মুখে মধু, হৃদে বিষ! খোকনকে কখন কি খাইয়ে মেরে ফেলে তার ঠিক কি? ক্ষেমীর এ-সব অন্যায় বলত ?

ঠাকমার চোখ দিয়ে জল ঝরল। আঁচলে মুছে ধরা গলায় বললেন—এ-সব কি কথা বলত ভাই 'সরকারী?' মধুর ফুলশয্যার পরের দিন সেই যে চলে গেছে অনু, তারপর কি আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে? আমি কি করে বউর নামে লাগালাম তার কাছে? ক্ষেমী যে আমায় দু' চোখে দেখতে পারে না তা জানি ; কিন্তু সে যে এমন করে আমার বিরুদ্ধে লোকের মনে বিষ ছড়াতে পারে তা কিন্তু ভাই স্বপ্নেও ভাবি নি।

সরকারী সহানুভূতির সঙ্গে বললে—ওকে আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দিস নে বিধু ; বাবা! কী ভীষণ মেয়ে!

ঠাকমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বললেন—ঢুকতে না দেওয়ার মালিক কি আমি ভাই 'সরকারী'?

'সরকারী' আর জবাব দেবার সুযোগ পেল না। ঐ সময় তার বাড়ী থেকে ঝি এসে খবর দিল—করা নাকি দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

'সরকারী' ঝির সঙ্গে চলে গেল। ক্ষেমীপিসি বাবার বিয়ের ব্যাপারেই ঠাকমার বুকে দগদগে ঘা করেছিল তুচ্ছ ও অবজ্ঞার প্রকাশ্য ছোরা মেরে। আবার ইচ্ছা করে তাঁকে জব্দ করার জন্য, যন্ত্রণায় দগ্ধ করার জন্য নিন্দা, কুৎসা ও অপবাদের নুনের ছিটা ছড়িয়ে দিল তাতে। এই যন্ত্রণাদায়ক অপমান সহ্য করতে পারলেন না ঠাকমা—তিনি ফুকরে কেঁদে উঠলেন।

এই সময় সদরে মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। বাবা ও নতুন মা বাড়ী এলেন। ঠাকমা কান্না থামাতে গিয়েও থামাতে পারলেন না। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। নতুন মা তাঁকে কাঁদতে দেখেও ভাল-মন্দ কিছু না বলে সোজা উপরে চলে গেলেন। বাবা অনিচ্ছা সত্বে কাছে এসে জিগ্‌গেস করলেন—ওকি, অমন করে কাঁদছো কেন—কি হয়েছে তোমার?

ঠাকমা কিছু বল্‌ছিলেন না দেখে' আমি বল্‌লাম—'সরকারী' এসে এক্ষুণি বলে গেল—ক্ষেমী পিসি নাকি বলে বেড়াচ্ছে ঠাকমা নতুন মাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে ; কবে জানি তিনি বিষ খেয়ে মরেন।

বাবা 'সরকারীর' উপর বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—যত সব বাজে কথা! ক্ষেমীর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ঠাকমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—তোমার যেন দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ক্ষেমী অমন ডাহা মিছে কথা বলতে পারে না। এ-সব ঐ 'সরকারীর'ই কারসাজি, আর কেঁদো না—এখন থামো। এই সন্ধ্যার সময় চোখের জল ফেলে বাড়ীর অমঙ্গল ডেকে এনো না।—এই কথা বলেই বাবা চলে গেলেন।

বাবার কথা শুনে ঠাকমা যেন মরমে মরে গেলেন। কোথায় ক্ষেমীকে শাসাবেন, সাবধান করে দেবেন, না উল্টে 'সরকারী'কে দুষে গেলেন! ক্ষেমীর স্বভাব কে না জানে! 'সরকারী' পেটে কথা রাখতে পারে না তা সত্য, কিন্তু সে মিছে কথা কয়, লোকের নামে লাগায়-ভাঙ্গায়, এ অপবাদ তার শত্রুরাও তার নামে দিতে পারে না।

ঠাকমা খুব বেশী রকম চেষ্টা করে আত্মসংবরণ করলেন। আঁচলে চোখের জল মুছে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে উঠে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে অস্ফুটভাবে—হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই, বেরিয়ে পড়ল—আমি ডেকে আনবো অকল্যাণ!

[ক্রমশঃ

মহাকবি হেমচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

বৃক্ষ-জগতে বনস্পতির যে ঐশ্বর্য্য, যে মহিমা, যে বিরাটত্ব, কাব্য জগতে মহাকাব্যেরও তাই। বনস্পতির মূল ভূগর্ভে প্রোথিত কিন্তু শীর্ষ উর্দ্ধে আকাশের দিকে উত্থিত,—ইহা শাখা-প্রশাখায়-পত্রে পল্লবে বিচিত্র, অথচ আপন অখণ্ড গৌরবে অধিষ্ঠিত। 'অপুষ্পা ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ' এই সংজ্ঞাটির মধ্যে বনস্পতির আসল পরিচয় পাই না, 'বনস্পতি' বা 'বনের পতি' এই নামটির মধ্যেই আছে ইহার যথার্থ পরিচিতি। মহাকাব্যে বর্ণনার যে গাম্ভীর্য্য ও বিষয়-বস্তুর যে বিরাটত্ব থাকে, উহা পাঠকের চিত্ত-সমুন্নতি ঘটায়। মহাকবির কল্পনা সুদূর-প্রসারিণী, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-বিহারিণী, নিরঙ্কুশ। নাটকীয় অখণ্ড ঐক্যসূত্রে ইহার আখ্যান-বস্তু গ্রথিত,—রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ইহা উপভোগ্য, কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ইহা সমৃদ্ধ, সর্গগুলির ধারাবাহিকতায় ইহা সংহত ও গাঢ়বন্ধ। বিশ্বনাথ প্রভৃতি ভারতীয় ও এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের ও এপিকের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহার তুলনা করিলে আমরা কয়েকটি সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইহার নিতান্ত অসদ্ভাব। বাংলা পদ্যে গ্রথিত রামায়ণ, মহাভারত বা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত আখ্যান কাব্যগুলি যে মহাকাব্য নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত,—মধুসূদনের কবি-প্রতিভা যে মহাকাব্য রচনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী ছিল তাঁহার রচিত প্রথম কাব্যখানি পাঠ করিলেও সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মধুসূদনের নিরঙ্কুশ কবি-প্রতিভা দণ্ডী, বিশ্বনাথ বা এরিষ্টটলের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া না লইলেও তাঁহার 'মেঘনাদ বধ'ই যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, এ বিষয়ে কোন সাহিত্য-রসিকেরই মনে কোন সন্দেহ নাই। 'বৃত্র সংহারের' ছন্দো-বৈচিত্র্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অনুমোদিত হইলেও ইহার দ্বারা যে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে, মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন! তাহা ছাড়া, হেমচন্দ্র অনেক স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা, ধ্বনি গাম্ভীর্য্য ও ছন্দঃস্পন্দ রক্ষা করিতে পারেন নাই,—তিনি অনেক স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের নামে মিলহীন পয়ারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তথাপি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বৃত্রসংহারের ন্যায় দৃঢ়বন্ধ ও সুসংহত মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নাই। অন্ধ, নির্ম্মম নিয়তির হস্তে মহামহিমান্বিত পুরুষ রাবণের পরাভবই মেঘনাদ বধের প্রধান বিষয়-বস্তু, কিন্তু বৃত্রসংহারে নিয়তির মহিমা কীর্ত্তিত হইলেও স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ-স্থাপনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। মেঘনাদবধে যে গ্রীক নিয়তিবাদ অনুসৃত, উহার সহিত ভারতীয় আদর্শের কোন যোগ নাই; কিন্তু বৃত্রসংহারে যে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত, উহার মূলে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রেরণা থাকিলেও ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে ইহার তেমন কোন বিরোধ নাই। সে যুগে বৃত্রসংহার যে শিক্ষিত যুবকগণের চিত্ত প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, উহার কারণ এই যে, তদানীন্তন শিক্ষিত জন-মানসের নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত পাতালপুরাশ্রিত ক্ষুব্ধ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া দেব-সেনাপতি স্কন্দ বলিতেছেন—

'ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।'

এখানে সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অগ্নির কণ্ঠে আমরা যে অগ্নিময়ী বাণী শুনিতে পাই, উহা যেন হেমচন্দ্রেরই ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বাণী—

'প্রকাশি অমর বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।'

আবার দেবগণের কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া হেমচন্দ্র যেন যুগপৎ স্বদেশপ্রেম ও মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। দধীচির আদর্শ পৌরাণিক, কিন্তু হেমচন্দ্রের দধীচি যেন প্রতীচীর Nationalism ও Humanism-এর প্রতিনিধি। যোগবলে তনুত্যাগের পূর্ব্বে দধীচি ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।'

(দ্বিতীয় খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ)

সুতরাং সে যুগে বৃত্রসংহার যে আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং অনেক সমালোচকের মতে বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আমরা হেমচন্দ্রের উপর শ্রীমধুসূদনের প্রভাবসম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় হেমচন্দ্রের উপর অবিচার করিয়া থাকি। বৃত্রসংহারে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভবের এবং বিশেষ ভাবে মেঘনাদবধের প্রভাব আছে, এ কথা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু ইহাতে মহাকবি হেমচন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিলোত্তমাসম্ভবের ন্যায় বৃত্রসংহারেও প্রচেতা, সূর্য্য, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণের উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। বৃত্রসংহারের ইন্দ্র-চরিত্র কিয়দংশে তিলোত্তমাসম্ভবের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের উনবিংশ সর্গে কবি হেমচন্দ্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালার যে বর্ণনা দিয়াছেন, উহাতে তিলোত্তমাসম্ভবের ছায়াপাত হইলেও ভীষণ-গম্ভীর দৃশ্যের বর্ণনায় এই স্বর্গ অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই সর্গ বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তবে হেমচন্দ্রের প্রধান দোষ এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না বলিয়া তিনি ইহাতে প্রাণ-বেগের সঞ্চার করিতে পারেন নাই,—বরং ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের মধ্য দিয়া সংগীত-ঝঙ্কার সৃষ্টি করিতে তিনি অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের স্থানে স্থানে ভাষা-গত নানা দোষও সমালোচকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তথাপি খণ্ড কবিতাগুলি বাদ দিলে বৃত্রসংহারই যে হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি, তাহাতে সন্দেহ নেই। অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের অমর কাব্য আমাদিগকে সহজেই মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত করে বলিয়া আমরা অনেক সময়ে হেমচন্দ্রকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব দান করিতেও কুণ্ঠিত হই। হেমচন্দ্রের প্রতিভার যেখানে স্বকীয়তা, সেখানেও সহজে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। হেমচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে যে একটা 'গথিক' স্থাপত্যশিল্পের অখণ্ড মহিমা বিরাজ করিতেছে, সেদিকে আমরা অনেকেই অন্ধ বা উদাসীন। মহাকবি ভারবির সম্পর্কে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'নারিকেলফলসম্মিতং ভারবের্ব্বচঃ'। এ কথা হেমচন্দ্র সম্পর্কেও হয়তো কিয়দংশে সত্য।

মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার মেঘনাদ-বধের প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ হওয়াতে সহজেই আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে। কিন্তু তাঁহার রচিত প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব'-সম্পর্কে একথা বলা চলে না। হেমচন্দ্র চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের নিকট অনেকখানি ঋণী হইলেও তাঁহার চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ-রূপে রক্তমাংসের নরনারী হইতে পারে নাই। তথাপি হেমচন্দ্র চরিত্র সৃষ্টিতে শুধু প্রাক্তন কবির অনু-সরণ করেন নাই, মৌলিক কল্পনারও পরিচয় দিয়াছেন। রাবণের সঙ্গে বৃত্রাসুরের, মেঘনাদের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের, প্রমীলার সঙ্গে ইন্দুবালার, বন্দিনী সীতার সঙ্গে বন্দিনী শচীর, সরমার সঙ্গে চপলার সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যও কম

গুরুতর নয়। অবশ্য লক্ষ্মণ-কর্তৃক মেঘনাদবধের পরে রাবণের আচরণের সঙ্গে রুদ্রপীড়-বধের পর বৃত্রের আচরণে যে সাদৃশ্য, তাহাও অতি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। তথাপি, হেমচন্দ্র যে চরিত্র-সৃষ্টিতে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

বৃত্রসংহারে তিনটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান নারী-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইন্দ্রাণী শচী, বৃত্রাসুর-পত্নী ঐন্দ্রিলা ও রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা,— এই তিনটি মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র, আর রতি ও চপলা এই দুইটি অপ্রধান চরিত্র। হেমচন্দ্রের প্রধান নারী-চরিত্রগুলি যে অনেকাংশে মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ, বৃত্রসংহারের পাঠকমাত্রেই সে কথা স্বীকার করিবেন। শচীর চরিত্র মহিম-মণ্ডিত,— অভিমান, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, দৃঢ়তা ও করুণাই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐন্দ্রিলা ছলনাময়ী, কুটিলা, গর্ব্বিতা, নিষ্ঠুরা। ইন্দুবালা কুসুম কোমলা, প্রেমময়ী, পতিপ্রাণা। শচী ও ইন্দুবালা উভয়েরই করুণা-ধারা শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমভাবে উৎসারিত। তাঁহারা নারী-চরিত্রের দুইটি বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধি। কিন্তু যে মেঘ স্নিগ্ধচ্ছায়া-দানে ও বারিধারা-বর্ষণে পৃথিবীকে শীতল, শ্যামল, উর্ব্বর করিয়া তোলে, সেই মেঘের কোলে যেমন বজ্রের চোখ-ঝলসান খর দীপ্তি লুকান থাকে, সেইরূপ নারী-চরিত্রের স্নেহ-মমতার অন্তরালে যে অনেক সময় অভিমান ও দৃপ্ত তেজঃ-পুঞ্জ লুক্কায়িত থাকিয়া এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকট হইয়া তাহার চরিত্রকে অসাধারণ মহিমা দান করিতে পারে, শচীর চরিত্র তাহারই দৃষ্টান্তস্থল।

চপলা যখন শচীকে কমলা, গৌরী অথবা ব্রহ্মাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন মনস্বিনী শচী বলিয়াছেন—

> 'স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
> স্বাধীন বিরাম চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস;
> সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর
> দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
> ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে নাহি ভেদ,
> যেই খানে পরবশ সেই খানে খেদ'।

শচীর অন্তর হইতে যে সন্তান-বাৎসল্য স্তন্য-পীযূষ-ধারার ন্যায় স্বত-উৎসারিত, উহা শুধু পুত্র জয়ন্তকে প্লাবিত করে নাই, দানব-বধূ ইন্দুবালাকেও সিক্ত করিয়াছে। শচীর মাতৃ-হৃদয়ের যে দ্বন্দ্বের ছবি হেমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। রুদ্রপীড়ের সঙ্গে সমরে জয়ন্ত অসীম শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাই শচীর জননী-হৃদয় চঞ্চল আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে, চপলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

> তনয়ে স্মরি এখানে,
> শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
> সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া।
> পুত্রমুখ যতক্ষণ,
> না করিনু নিরীক্ষণ,
> দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক;
> আগে না ভাবিয়া, সখি,
> ও চারু মুখ নিরখি
> বিবশা হয়েছে এবে হারায়ে বিবেক।
> অন্তরে আশঙ্কা হেন,
> বিপদ নিকট যেন,
> সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?
> সখি, অন্য কোন দেবে,
> স্মরণ করিব এবে,
> সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার'।

(প্রথম খণ্ড, নবম সর্গ)

আবার মন্দাকিনী তীরে পাষাণময় মন্দিরের নিভৃত আলয়ে বন্দিনী শচী স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং নিজ জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করিতেছেন,—এই উপলক্ষ্যে কবি স্বদেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, কোন প্রবাসী যেন দীর্ঘকাল পরে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার আজন্ম পরিচিত দৃশ্যাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন এবং মাতৃভূমি শত্রু কবলিত দেখিয়া ক্ষোভে, বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। কবি বলিতেছেন—

'কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন,
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাবে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম"। কে আছেরে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শক্র-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ'!

এখানে-পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত কবির রচনায় যে স্কটের কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। স্কট্ বলিয়াছেন—

'Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land'! ইত্যাদি

শচী যেদিন কামবধূর নিকট শুনিতে পাইলেন,— ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর মহেশ্বরের তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহার বন্ধন-মোচনের সংকল্প করিয়াছেন, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন—

'না রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতিহস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম'।
(দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪শ সর্গ)

আমরা বলিয়াছি, শচীর মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহধারা ইন্দুবালা-কেও অভিষিক্ত করিয়াছে, তাই ইন্দুবালার অমঙ্গল শঙ্কায় শচী ভীত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

'অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণী,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর'?
(দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮শ সর্গ)

শচীর মাতৃ-স্নেহের আর একটি ছবি দেখিতে পাই এই খণ্ডের বিংশ সর্গে। দেবাসুরগণ যখন ভীষণ সংগ্রামে মত্ত, দেবগণ যখন অসুর বলের দ্বারা পরাভূত এবং জয়ন্ত রুদ্র-পীড়ের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্যত, তখন শচী চপলার মুখে জয়ন্তকে রণে ক্ষান্ত হইবার অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্তু রুদ্রপীড়-বধের পর শচীর শোকাশ্রু-ধারা আর বাধা মানে নাই,—ইন্দুবালা যখন বাতাহতা কদলীর মত বা ছিন্নমূল লতার মত শচীর কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার হৃদয় যেন কন্যাবিয়োগে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধের প্রমীলা-চরিত্রে বজ্রের কাঠিন্য ও কুসুমের পেলবতা এক অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইন্দুবালা কালিদাসের শকুন্তলার মতই নব-মালিকা কুসুম-কোমলা। আমরা মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্রে যে দৃপ্ত মহিমা দেখিতে পাই, সীতা বা সাবিত্রীর মধ্যে তাহা না দেখিলেও তাঁহাদের অন্তরে অগ্নিগর্ভা শমীর মতই তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা ইন্দুবালা যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণজাল যে আলো বিতরণ করে, উহার জন্য সে সূর্য্যের দীপ্ত রশ্মির কাছে ঋণী। রুদ্রপীড়ের মধ্যে আমরা মধ্যাহ্ন তপনের দীপ্তি ও ইন্দুবালার মধ্যে শুভ্র কৌমুদীর কমনীয়তা দেখিতে পাই, এখানেও ইন্দুসমা ইন্দুবালা রুদ্রতেজা রুদ্র-পীড়ের ছায়া। কিন্তু নির্ম্মম রুদ্রপীড় যে সময়ে শক্রসংহার করে, ইহা তাঁহার পরদুঃখকাতর চিত্তে বেদনা জন্মায়। আবার শচীর দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া ইন্দুবালা রতিকে জিজ্ঞাসা করে—

'নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ'?

পক্ষিণী যেমন পক্ষপুট বিস্তার করিয়া আপন শাবককে আশ্রয় দেয়, শচীও একদিন তেমনি ইন্দুবালাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল,—শিশু যেমন পিতামহীর নিকট আকুল আগ্রহে নানা গল্প শ্রবণ করে, ইন্দুবালাও তেমনি মুগ্ধ চিত্তে শচীর নিকট অমরগণের পূর্ব্ব গৌরবের কথা শুনিত। এই জন্য ঐন্দ্রিলার চোখে সে ছিল 'বধূরূপে কালভুজঙ্গিনী'।

ঐন্দ্রিলা স্বার্থান্ধ, কুটিল, গর্ব্বোদ্ধত, পরশ্রীকাতর, প্রতিহিংসাপরায়ণ;— তাহার অবিমৃষ্যকারিতাই বৃত্র-সংহারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

ঐন্দ্রিলা ও ইন্দুবালার মধ্যে আমরা নারীর দুই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই। বৃত্রসংহার কাব্যের প্রথম খণ্ডের একাদশ সর্গে দেখি, পুত্র রুদ্রপীড়ের মুখে শচীর রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া ঈর্ষাবিষে জর্জ্জর ঐন্দ্রিলা বলিতেছেন—

'সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী ?
আমার এ কেশ তার কুন্তল-তুলায়,
চারুতায় মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায় ?
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলন তার আমি সে শৃগালী ?
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায়,
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমনে জানে অঙ্গের সংস্কার'।

প্রভাতের শশিকলারূপিণী ইন্দুবালাকে শচীর পদতলে উপবিষ্ট দেখিয়া ঐন্দ্রিলা যে ক্রোধ ও ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, তাহার একটি চমৎকার চিত্র হেমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঐন্দ্রিলার চাতুরী ও কপটতার কাছে আমরা বৃত্রাসুরকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইতে দেখিতে পাই। বৃত্র সংহারের পরে ঐন্দ্রিলার জীবনে যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, লেখক অত্যন্ত কলাকৌশলের সঙ্গে মাত্র তিনটি ছত্রে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

দুর্জ্জয় দানবের মৃত্যুর পর—

'দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা। ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।'

বাস্তবিক, পুরুষ-চরিত্রের চেয়ে নারী-চরিত্র অঙ্কনেই হেমচন্দ্র অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 'বৃত্র সংহারের' পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে—বৃত্রাসুর, রুদ্রপীড় ও জয়ন্ত প্রধান। বৃত্রাসুর শ্রেষ্ঠ বীর, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নানা গুণে মণ্ডিত হইলেও ঐন্দ্রিলার সমক্ষে তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে,—তাঁহার পৌরুষ সেখানে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত। রুদ্রপীড় দৈত্য গৌরব-রবি, কিন্তু সে নিজ জননীর অনুরোধ রক্ষার জন্য বীর-জননী শচীকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে দ্বিধা করে নাই। ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক।

রুদ্রপীড়ের চরিত্র মেঘনাদের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও কবি তাঁহাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে যশোলিপ্সা অতি প্রবল। মহাকবি মিল্টন যাহাকে মহৎ মনের শেষ দুর্ব্বলতা (the last infirmity of a noble mind) বলিয়াছেন, উহা সংসারে মানুষকে অনেক সময় অনেক মহৎ কার্য্যের প্রেরণা দেয়। বীর শ্রেষ্ঠ পিতা বিত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া রুদ্রপীড় বলিতেছেন—

'বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন,
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ ওই পদরেণু।'

(প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ)

রুদ্রপীড়ের প্রচণ্ড তেজের নিকট দেবগণকে কেমন করিয়া পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে, সে চিত্র হেমচন্দ্র অতি নিপুণ ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

বৃত্রসংহারে দেবরাজের চরিত্র যেমন মহনীয়, দেবরাজ-পুত্র জয়ন্তের চরিত্রও তেমনি। যে অবস্থায় দেবরাজ শিবের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে অবস্থার কথা স্মরণ করিলে আমরা তাঁহার আচরণ সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে করি। (প্রথম খণ্ড, দশম সর্গ)

বৃত্রসংহার কাব্যে জয়ন্তের মাতৃভক্তির চিত্রটি অতি মনোরম। জননীর অপমানের কথা শুনিয়া বীর জয়ন্তের চোখ দু'টি দীপ্ত হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জননীর আশীর্ব্বাদ তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, জননীর বন্ধন-মোচন তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, জননীর আদেশ তাঁহার নিকট বেদবাক্য। শচীদেবীর আদেশে একবার তিনি সমর হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, অতি দুঃখের সহিত তাহাকে শস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথ ফিরাইয়া লইতে হইয়াছিল। এরূপ চরিত্র সহজেই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

হেমচন্দ্রের বিষয়-বস্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। মধুসূদনের কাব্যের প্রধান বিষয় অন্ধ ক্রুর, নির্ম্মম নিয়তির হস্তে মহামহিমান্বিত পুরুষের পরাভব,—তাই গ্রীক নিয়তিবাদের সূত্রে মেঘনাদবধ কাব্য গ্রথিত। কিন্তু হেমচন্দ্রের বিষয়বস্তু দেবশক্তির কাছে বলদৃপ্ত অসুরশক্তির পরাভব। হেমচন্দ্রের কাব্যে দেবমাতা শচীদেবীর লাঞ্ছনা ও অপমান, মর্ম্মভেদী ক্ষোভ ও দীর্ঘশ্বাসই দানবশক্তি বিনাশের প্রধান উপলক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের বিষয়বস্তু প্রধানত ভারতীয়,—তবে, ইহারই মধ্যে তিনি কৌশলে জাতীয়তা ও মানবতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা ভারতের জাতীয় মহাকাব্যদ্বয়ে দেখিতে পাই,—শক্তিরূপিণী নারীর লাঞ্ছনা ও অপমানে একদিকে বিপুল রাবণ বংশ ধ্বংস হইয়াছে, অপরদিকে কুরুক্ষেত্রের ভৈরব আহবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানেও, দেবমাতা শচীর লাঞ্ছনা ও অপমানেই মহাদেবের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং যাঁহার বরে দৃপ্ত হইয়া বৃত্রাসুর স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তিনিই অসুর নিধনের আয়োজনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং মধুসূদন যদি বিপ্লবী কবি হন, তাহা হইলে হেমচন্দ্র ভারতীয় আদর্শের কবি

হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহারে' আমরা যুগপৎ কবির শক্তি ও অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া থাকি। ইহাতে আমরা নিরঙ্কুশ কল্পনার নিদর্শন, যুদ্ধ বিগ্রহাদির বর্ণনা, অতিলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ, বিষয়-বস্তুর মধ্যে নাটকীয় ঐক্য প্রভৃতি 'এপিক'-লক্ষণ দেখিতে পাই। আবার, ছন্দোবৈচিত্র্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রাণবেগ-সঞ্চারে অক্ষমতা, ভাব ও ভাষার অস্পষ্টতা প্রভৃতি যে এই মহাকাব্যের প্রধান দোষ রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহা কাব্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই মহাকাব্যের স্থানে স্থানে বর্ণনার যে গাম্ভীর্য্য আমরা লক্ষ্য করি, তাহাতে হেমচন্দ্র যে একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বৃত্রসংহারের পরিসর (canvas) যেমন বিরাট, ইহার বিষয়-বস্তুও তেমনই গম্ভীর ও চিত্তসমুন্নতিজনক;—হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রতীচ্যের সমালোচকগণ মহাকাব্যকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ধরণের মহাকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা' এবং পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ বলিয়াছেন Authentic Epic, কোন জাতির হৃন্মর্ম্মমূল হইতে যাহা উদ্ভূত হয়,—বাল্মীকি, বেদব্যাস ও হোমার তাহার কবি। এইরূপ মহাকাব্যের যুগের অবসান ঘটিয়াছে কোন্ স্মরণাতীত কালে। কিন্তু যে মহাকাব্যে একটা সমগ্র যুগ বা জাতির আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় না, সাহিত্যিক রস বা আনন্দসৃষ্টিই যে মহাকাব্যের প্রধান লক্ষ্য এবং যাহাতে কবির ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা কামনা-বাসনা প্রতিবিম্বিত হয়, সমালোচকগণ উহাকে বলিয়াছেন Literary Epic. মিল্টনের Paradise Lost, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী এইরূপ এপিকের দৃষ্টান্ত স্থল। অবশ্য, এরূপ ক্ষেত্রেও কবি তাঁহার যুগ বা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, বরং তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইজন্যই হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ —স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার আদর্শ এবং মানবতা-বোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হেমচন্দ্রের স্বাজাত্য-বোধ কত প্রবল ছিল, 'প্রিন্স অব্ ওয়েলসের' ভারতাগমন-উপলক্ষ্যে রচিত 'ভারত ভিক্ষা' কবিতায় আমরা তাহার নিদর্শন পাই। তাঁহার মধ্যে যে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্খা ছিল, তাহার স্ফুরণ হয় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ও 'বীরবাহু' কাব্যে; 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় আমরা উহারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাই। এই শেষোক্ত কবিতায় ভারতবাসীর অতীত গৌরব ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কবি উদাত্ত কণ্ঠে তাহাদিগকে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিঙ্গাধ্বনি একদিন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনে একটা বিপুল উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সত্যই বলিয়াছেন, হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম জাতি-বৈরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলতঃ,

হেমচন্দ্রের মধ্যে জাতি-বৈরের সঙ্গে উদগ্র স্বাজাত্যাভিমানের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং ইহার মূলে ছিল প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রেরণা। অবশ্য, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র-চন্দ্রনাথ-অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে আমরা যে স্বাজাত্যাভিমান দেখিতে পাই, তাহা অনেকটা পরিমাণে 'ইয়ং বেঙ্গলের' আতিশয্য ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার স্পৃহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। বৃত্রসংহারে দেবগণের স্বর্গ-রাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্পের মূলেও ছিল এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও দেবত্বের অভিমান। কিন্তু এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহত্তর ও উদারতর আদর্শের স্থাপনাও বৃত্রসংহার কাব্যরচনার অন্যতম প্রেরণা ছিল—ইহা মানব-কল্যাণে আত্মত্যাগের আদর্শ। দধীচির আত্মদানের মধ্যে হেমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন ভারতীয় মৈত্রীর আদর্শ এবং প্রতীচীর philanthropy বা মানব কল্যাণের আদর্শ।

বাস্তবিক, বৃত্রসংহার কাব্য নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি, কিন্তু শুধু তাহাই নহে,—তিনি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন, এই কাব্যের মধ্যে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

অপেক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যেখানে কলম শুধু হিসেবের ছক কেটে ছোটে,
কথা শুধু অপরের ছুঁড়ে দেওয়া জবানী সওয়াল;
সেখানে আখর দিয়ে মালা গাঁথা মিথ্যের খেয়াল;
সেখানে কলম শুধু অকথার ভোঁতানো হাতুড়ি।

আগুন সেখানে কই, সে লেখায় ঢেউ জাগে না'ক।
সে লেখা কলমী-দামে পচে ওঠা বদ্ধ-বায়ু-জলা।
সেখানে বাঁধানো পথে কোনও মতে গুটিসুটি মেরে,
কোনও মতে পথ চলা একেবেঁকে সরে একধারে।

যে হাত জোরালো চাপে চেপে ধরে কলম চালাবে,
যে লেখনী চলবেই টাকার আড়ালও যদি আসে,
যে বাঁধুনী এ বুকের সবখানি কেড়ে নিয়ে যাবে,
সে লেখা এখানে কই এ ত শুধু কলে বাজা ভেরী,

তবু এই এ হাতেও একদিন (জানি নয় দূরে)
আগুনের লাল লেখা এঁকে যাব পৃথিবীর বুকে।
হাতিয়ার দিয়ে তার বুক চিরে জোরে বলে যাব,
আমিও পেয়েছি ঢের, আমিও শুধেছি ঋণ তব।

সে লেখা আমারই লেখা, সে কথা আমারই কথা হ'বে,
সেদিনের জয়োল্লাসে আমারও আওয়াজ যাবে শোনা,
হাজারো জনের মাঝে এদিনের হারানো নিজেকে,
সেদিনের লাখে মিলে খুঁড়ে নেব ধ্বংসস্তূপ চিরে।

সেদিনের অপেক্ষায় আজ তাই নির্নিমেষ বসে,
সেদিনের যুগ-ছন্দ মানুষ বলেই দেবে ডাক।
টাকার চিতায় তোলা জীবন যে ডাকে দেবে সাড়া;
পলতোলা ঠুনকোমি ধুলোয় লুটোবে একধারে।

বৈদ্যনাথে সাতদিন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

চার

ইহার গান শুনিয়া যখন আমরা তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইলাম—তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব তখন মধ্যাকাশে আসিয়াছেন; রৌদ্রের প্রখরতায় ধরিত্রী তখন তাতিয়া উঠিয়াছে—সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হেমেন্দ্র বাবুর আবার হাঁটিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। আমি দু-একবার দুপুর বেলা হাঁটিতে তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া নিষেধ করিলাম—কিন্তু তিনি তখন আমার কথা শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহার সহিত আমাকেও হাঁটিতে হইল। ষ্টেশনের কাছ হইতে আমাদের বাড়ী প্রায় দেড় মাইল রাস্তা—সেই রাস্তা অতিক্রম করিতে তখন আমার বেশ একটু কষ্ট হইল, কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু দেখিলাম হাসি-গল্প করিতে করিতে অনায়াসেই বাড়ী আসিলেন।

পথে তিনি ইহার গানের খুব সুখ্যাতি করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, গানের কথাগুলি বড় মধুর। তিনি আমাকে গানের কথাগুলি আমার ঠিক স্মরণ আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য গানটি পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিলেন—আমি বলিলাম যে প্রথম লাইনের কয়েকটি কথা ছাড়া আমি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি তখন গানখানির প্রথম চার লাইন মুখস্থ বলিলেন এবং আমাকেও মুখস্থ করাইলেন।

রৌদ্রের মধ্যে পথ হাঁটা এক ভীষণ ক্লান্তিকর ব্যাপার —তাহার উপর আবার গান মুখস্থ করা—মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম—কিন্তু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, সমীহ করি, সম্মান করি, সুতরাং গানখানি তাঁহার কথামত মুখস্থ করিলাম। আজ এই কাহিনী লিখিবার সময় মনে হইতেছে যে, ভাগ্যি তিনি গানের কথাগুলি আমায় মুখস্থ করাইয়াছিলেন—তাই আজ উহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম।

গানখানি কাহার রচনা তাহা জানি না—তবে তাহার কথাগুলি ছিল এইরূপ :

এই ঘরে আছে তোমার স্মৃতিটি
প্রতিটি জিনিষে ছড়ানো।
কত হাসি খেলা হয়েছে এখানে
কত আঁখি-জল ঝরানো॥

যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। চাঁদমোহন বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; সুতরাং আর কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট না করিয়া আমরা স্নান করিবার জন্য চলিয়া গেলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তাড়াতাড়ি করিয়া স্নান শেষ করিয়া আমরা সকলে ভোজনে বসিলাম। ভোজনের সময় আমি চাঁদমোহন বাবুকে সমস্ত প্রাতের গল্প করিতে লাগিলাম। আমাদের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে খাওয়ার পর্ব্ব শেষ করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় গেল। তারপর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য আমি চলিয়া গেলাম।

একটু বিশ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি—এমন সময় চাঁদমোহন বাবুর ছোট ছেলে কেষ্ট আসিয়া বলিল যে দাদা অর্থাৎ চাঁদমোহন বাবুর বড় ছেলে আসিয়াছে। তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। এই বৎসর সে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছে; তাহার নাম শ্রীসত্যেন চক্রবর্ত্তী। খুব মিশুক এবং শিল্পানুরাগী। থিয়েটারের অনেক কথা তাহার সহিত হইল এবং সে যে ভাল অভিনয় করিতে পারে, তাহা শুনিয়া আমি তাহাকে দু-একটি পাঠ আবৃত্তি করিতে বলিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সহিত আমার বেশ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে—সে কোন প্রকার সঙ্কোচ না করিয়া সাজাহান, সিরাজদ্দৌলা, আলমগীর, বঙ্গেবর্গী প্রভৃতি নাটক হইতে বেশ সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে লাগিল। কখনও সে অহীন্দ্র চৌধুরীর গলার স্বর

যেরূপ ঠিক সেইরূপ ভাবে অভিনয় করিতেছে, কখনও শিশির ভাদুড়ী, কখনও নরেশ মিত্র, কখনও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, কখনও ছবি বিশ্বাস এইভাবে এমন সুন্দর ভাবে গলার স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল যে আমি তাহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; আমার প্রাতের ক্লান্তি তখন অনেক দূর হইয়া গেল।

এমন সময় হেমেন্দ্র বাবু আসিলেন। তাঁহাকে সত্যেনের আবৃত্তি করিবার বিষয় বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া সত্যেনকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। সত্যেন একটু লজ্জিত হইল—এই অভিনয়ের বিষয় চাঁদমোহন বাবুর কানে হয়ত যাইবে ভাবিয়া সত্যেন না না করিতে লাগিল। কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু নিজে একজন অভিনেতা, সুতরাং তিনি ইহার মধ্যে কোন দোষ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহার কথায় সত্যেন রাত্রে পুনরায় আবৃত্তি করিবে বলিল। আমরা তাহাতেই রাজী হইলাম।

রোহিনী রোডের উপর মিসনারীদের একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। হেমেন্দ্র বাবুর বৈকাল বেলা সেই বিদ্যালয় দেখিবার ইচ্ছা হইল। অবশ্য তাঁহার ইচ্ছাটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি বালিকাদের শিক্ষালয়ের সহিত বহু দিন হইতে সংশ্লিষ্ট আছেন।

অপরাহ্ণে জলযোগ করিয়া আমরা বিদ্যালয় দর্শনার্থে গেলাম। বিদ্যালয়টির নাম চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল; কিন্তু সংক্ষেপে সকলে সি-এম-এস স্কুল বলিয়া ইহাকে অভিহিত করে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ পারফেক্ট নাম্নী এক মহিলা এই বিদ্যালয়টি খৃষ্ট ধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য বালিকাদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ইহা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়।

বৈদ্যনাথ ধাম ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বিদ্যালয় অবস্থিত। প্রায় পাঁচশত বিঘা জমির উপর বিদ্যালয়ের তিনটি ভবন, ছাত্রীদের হোষ্টেল, উপাসনার জন্য গীর্জ্জা, ব্যাডমিণ্টন, নেটবল, বাস্কেট বল প্রভৃতি খেলিবার জন্য বিস্তৃত মাঠ আছে।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ইংরাজ মহিলা আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন। আমরা কলিকাতা হইতে তাঁহাদের বিদ্যালয় দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি খুব প্রীত হইলেন এবং বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের নিকট আমাদের লইয়া গেলেন।

প্রিন্সিপালের নাম মিস্ ওরম (Miss Orme) স্কচ্ মহিলা, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। আমাদের তিনি বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতীক হইতেছে Love, Serve এবং Obey, অর্থাৎ ভালবাসা, সেবা ও ভগবানের আদেশ পালন করা। অতঃপর তিনি প্রতিটি ঘর আমাদিকে যত্নের সহিত দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

যুগল মন্দিরের একটি দৃশ্য
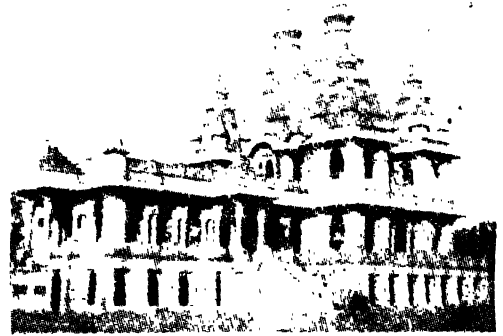
তাঁহার নিকট হইতে শুনিলাম যে দুইশত ছাত্রী এই স্থানে থাকিয়া পড়াশুনা করে। তন্মধ্যে বাঙ্গালী ছাত্রীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক প্রায়, একশতের কাছাকাছি; তারপর আছে সাঁওতালী, বেহারী, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির বহু মেয়ে। কয়েকজন নেপালী ছাত্রীও তথায় পড়াশুনা করে। বিদ্যালয়টি দুইটি ভাগে বিভক্ত—প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী। প্রাইমারী বিভাগে ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী এবং সেকেণ্ডারী বিভাগে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১১শ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হয়। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে ইহা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলিতেছে।

এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে কোন বেতন লওয়া হয় না; মাধ্যমিক বিভাগে বেতনের হার খুবই কম। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বেতন মাত্র দেড় টাকা এবং একাদশম শ্রেণীর বেতন ৩৮৯/০। এইরূপ অল্প বেতনের জন্য স্থানীয় সমস্ত বালিকাই এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি হইবে। ছাত্রী নিবাসে থাকিবার খরচ মাত্র ১৪৲ টাকা।

আমরা তাঁহাদের শিক্ষা পদ্ধতি দেখিয়া কেবল যে প্রীত হইলাম তাহা নহে—আমরা তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় লইলাম। তিনি বহু ছাত্রীকে ডাকিয়া আমাদের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদের বিদ্যালয়ে কোন অসুবিধা হয় কি-না জিজ্ঞাসা করায়—তাহারা সমস্বরে বলিল যে তাহারা এই বিদ্যালয়ে খুব সুখে থাকিয়া পড়াশুনা করে। প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, যাঁহারা খৃষ্টান হইয়াছে তাহারাই বোধহয় এই স্থানে পড়িবার সুযোগ পায়। কিন্তু ছাত্রীদের সহিত আলাপ পরিচয়ে আমার সে ধারণা ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম যে, হিন্দুর সংখ্যাই বিদ্যালয়ে ও ছাত্রী নিবাসে বেশী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিসেস্ ওরমের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আমরা বিদ্যালয় ভবন পরিত্যাগ করিলাম। তিনি আমাদের চা খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহার অনুরোধ আর একদিন আসিয়া রক্ষা করিব বলায় তিনি তাহাতে রাজী হইলেন।

বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া হেমেন্দ্রবাবু আমাদের দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় কিভাবে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আমায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। কথা বলিতে বলিতে আমরা পুরানদহের নিকট আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কুমারী চারুলতা সেন বাস করেন। তিনি এখন অবসর গ্রহণ করিয়া বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন; প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ আই, বি, সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কুমারী সেনের সহিত হেমেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল; নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু শুনিবার জন্য আমরা তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাড়ির কড়া নাড়িতেই চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল; ঘরের মধ্যে কুমারী সেন বসিয়াছিলেন, হেমেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন এবং আমাদের উভয়কে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলেন।

কুমারী সেনের বয়স প্রায় ষাট হইবে, ত্রিশ বৎসরের অধিককাল চাকুরী করিয়া তিনি এখন অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। হেমেন্দ্রবাবু কুমারী সেনের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন যে ইনি দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের যুগ্ম-সম্পাদক এবং বহু গ্রন্থের লেখক; ইহাকে আপনার কাছে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু শুনাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছি।

তিনি হেমেন্দ্রবাবুর কথায় একটু হাসিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন "দেশে কত পণ্ডিত ব্যক্তি রহিয়াছেন—তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মূল্য আছে—আমার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা এমন কি হইয়াছে যে তাহার দ্বারা আবার জনসাধারণের উপকার হইবে?"

হেমেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার এবং তাঁহাদের প্রসিদ্ধ বংশের অন্যান্য ব্যক্তিদের শিক্ষানুরাগের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি সমস্ত কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত মিস্ ওরমের সম্বন্ধে কথা হইল; তিনিও তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিলেন।

কুমারী সেনের নিকট হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি অনেক নূতন কথা শুনিলাম। তিনি সামান্য জলযোগে আমাদের আপ্যায়িত করিলেন। এবং পুনরায় তাঁহার বাড়ি যাইবার জন্য আমাদের অনুরোধ জানাইলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, দেওঘরে নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তাঁহার ভগিনীর সহিত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। দুইজন বর্ষীয়সী মহিলার পক্ষে বর্ত্তমানে বিদেশে পুরুষ ব্যতীত বাস করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা চিন্তা করিয়া আমি মনে মনে একটু দুঃখ অনুভব করিলাম। মনের যখন জোর থাকে, দেহের রক্ত যখন থাকে তাজা তখন যাহা সহজ, সরল বলিয়া মনে হয়—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু যখন শিথিল হইয়া আসে

তখন সেই সহজ ও সরল জিনিষগুলি মানুষের কাছে শক্ত ও কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কুমারী সেনের কথায় সেই চিরন্তন সত্যের আভাস পাইলাম। তিনি বিদুষী, বুদ্ধিমতী বলিয়া নিজের দুঃখের দিকটা তাহার জীবন-সায়াহ্নে এমনভাবে প্রকাশ করিলেন, যাহা বুঝিতে হইলে নর নারীর অন্তরের গুঢ়স্থলে যে সূক্ষ্ম পদার্থটি আছে তাহার সন্ধান করিতে হয়। আমার কেবল মনে হইতে লাগিল যে আজ যদি তাঁহার পুত্র কন্যা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার 'একলা আর পেরে উঠিনা—তাই কিছু ভাল লাগে না' এই কথা শুনিতে হইত না। যাহা হউক তাঁহার আচরণে, কথায় বার্ত্তায় ও মধুর ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। আসিবার সময় আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব, কিন্তু তিনি পায়ে হাত দিতে, আমায় প্রণাম করিতে দিবেন না। আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না, প্রণাম করিলাম; তিনি আমায় খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাণী মস্তকে লইয়া আমরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পাঁচ

কুমারী সেনের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আমরা বাজারের নিকট গেলাম, তথায় হেমেন্দ্রবাবুর সহিত মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দেওঘর শাখার অর্গানিজেসন্ অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি হেমেন্দ্র-বাবুকে তাঁহার অফিসে যাইবার জন্য পরদিন আমন্ত্রণ করিলেন; কারণ হেমেন্দ্রবাবু উক্ত কোম্পানীর কলিকাতাস্থ প্রধান কার্য্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (এজেন্সী ম্যানেজার)। হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার কথায় রাজী হইলেন এবং স্থির হইল যে, পরদিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে হরিধনবাবু আমাদিগকে তাঁহার নব কার্য্যালয় দেখাইতে লইয়া যাইবেন।

সেদিন রাত্রি অনেক হইয়া গেল বলিয়া আর বিশেষ বেড়ান হইল না। আমরা একখানি সাইকেল-রিক্সা করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম।

গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম যে, চাঁদমোহনবাবুর বড় জামাতা আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। চাঁদমোহনবাবু ও হেমেন্দ্র বাবু কোথায় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কোথায় কি হইল তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমি চা পান করিয়া সত্যেন ও জামাইবাবুর সহিত পাশের বাড়িতে চলিয়া গেলাম।

তথায় সত্যেনের সহিত সিনেমা, থিয়েটার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। অতঃপর আমার অনুরোধে সত্যেন পুনরায় নির্ব্বাচিত অভিনয়ের দ্বারা আমাকে বেশ আনন্দ দিতে লাগিল। এমন সময় হেমেন্দ্রবাবু আসিলেন; তিনিও
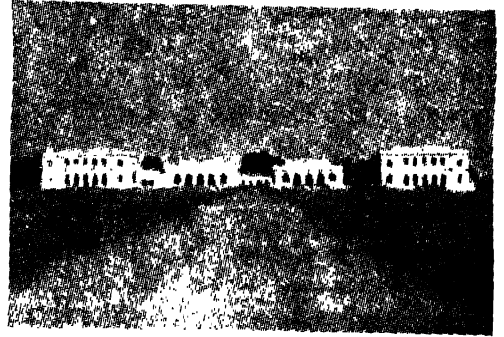
দেওঘর বিদ্যাপীঠ

সত্যেনের মুখে বিভিন্ন অভিনেতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া খুব আমোদ পাইতে লাগিলেন। এই ভাবে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চলিল; তার পর কেষ্ট আসিয়া আমাদের খাওয়ার জন্য ডাক দিল। আমরা সকলে খাইতে চলিয়া গেলাম; খাওয়ার পর আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ দেখিতে গেলাম। চাঁদমোহনবাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কেষ্ট আমাদের সাথী হইল। সকালবেলা চারজনে বেশ গল্প করিতে করিতে দুই তিন মাইল পথ হাঁটিয়া আমরা যখন বিদ্যাপীঠে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার বিঘা জমির পা ইহার প্রতিষ্ঠা; বিদ্যাপীঠ বর্ত্তমানে একটি ছোট

শহরে পরিণত হইয়াছে। স্থানটির আবেষ্টনী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম; বিদ্যালয়ের জন্য এরূপ সুন্দর স্বাস্থ্যকর ও যোগ্যতর স্থান ভারতে আর কোথাও আছে কি না আমি জানি না। স্বামী বিবেকানন্দের 'সেবা ধর্ম্ম' এই মূল মন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ইহা পরিচালনা করিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, আমাদের শৈশব হইতে এমন গুরুর সহিত সঙ্গ করা উচিত যাঁহার চরিত্র জলন্ত পাবক সদৃশ এবং যাঁহার সমগ্র জীবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ। বিদ্যাপীঠের পরিচালকগণ সেই আদর্শে যে ভাবে জাতিগঠনের কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম।

বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ আমাদিগকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারের জন্য দুইখানি পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম- তাঁহার হাতে পুস্তক দুইখানি দিলে তিনি বিশেষভাবে আমায় ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। চাঁদমোহন বাবু মহেন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত "ভারত সংস্কৃতি" পুস্তকখানি তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন।

আমরা বিদ্যাপীঠ দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি একটি ছাত্রকে ডাকিয়া আমাদের সমস্ত বিভাগ ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। বালকটি আমাদের লইয়া সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান খুব ভাল করিয়া দেখাইতে লাগিল এবং সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

প্রাতঃকাল হইতে নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত বিদ্যাপীঠের বালক ও সন্ন্যাসিগণ যে ভাবে কাজকর্ম্ম করেন—তাহা না দেখিলে ঠিক বুঝা যাইবে না। নিয়মিত পড়াশুনা ছাড়া চারুকলা ও কার্য্যকরী শিক্ষা এবং সাহিত্যিক কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা সকলে মুগ্ধ হইলাম।

ছাত্রগণ যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে চিত্রাঙ্কণ ও ফুল বাগানের কাজ নিয়মিতভাবে করিতেছে দেখিলাম। উহাদের সহিত ক্লে-মডেলিং ও চর্ম্মশিল্প বিভাগও রহিয়াছে। 'বিদ্যাপীঠ' ও 'কিশলয়' বলিয়া দুইখানি হস্ত-লিখিত মাসিক পত্র দেখিলাম; এইগুলি মুদ্রিত হইলে যে কোন শিশুদের মাসিক পত্রের চেয়ে যে সুন্দর হইবে তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পাঠাগারে দেখিলাম প্রায় ছয় হাজার পুস্তক সাজান রহিয়াছে। ফুলবাগান, সব্জীবাগান, গোশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ফুলবাগানে ছাত্রগণের চেষ্টায় সারা বছর ফুল হয় এবং সব্জীবাগানে উৎপন্ন সব্জী দ্বারা বিদ্যাপীঠের সারা বৎসরের প্রয়োজন প্রায় সমস্তই মিটিয়া যায়।

গো-শালায় প্রায় ৫০টি গরু রহিয়াছে। শুনিলাম গোশালা হইতে দৈনিক প্রায় দুইমণ দুধ পাওয়া যায় এবং ছাত্রগণের প্রয়োজন তাহাতে বেশ মিটিয়া যায়। বিদ্যাপীঠে খেলাধুলার খুব সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেট বল, ব্যাডমিণ্টন, জিমনাষ্টিক ক্লাব প্রভৃতিতে প্রত্যেক ছাত্রকেই যোগদান করিতে হয়। শুনিলাম রেসিডেন্সিয়াল বিভাগে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এবং লেখাপড়া ও আহার বাসস্থান বাবদ প্রতি ছাত্রের নিকট হইতে চল্লিশ টাকা করিয়া লওয়া হয়। স্বাস্থ্যকর স্থানে ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে প্রত্যেক ছাত্র ব্যায়াম চর্চ্চা করে বলিয়া দেখিলাম যে প্রতি ছাত্রের স্বাস্থ্য খুবই ভাল।

আমরা ছাত্রদের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। ছাত্রদের খেলার সময়, পড়ার সময় ও ভজনের সময় যে আনন্দময় মুর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি তাহা কখনও আমরা বিস্মৃত হইব না। ছেলেদের প্রফুল্লতা ও নিয়মশৃঙ্খলা এবং সন্ন্যাসী কর্ম্মীদের উৎসাহ আমাদের সমানভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিদ্যা-পীঠের কার্য্যপ্রণালী যিনি একবার দেখিবেন, তিনিই ইহার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই প্রতিষ্ঠানের মহান আদর্শে শিক্ষাদান পদ্ধতি অন্যত্র অনুসরণ করিলে জাতির যে যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

বিদ্যাপীঠের সমস্ত দর্শন করিতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। ছাত্রটি যে ভাবে জিনিষগুলি আমাদের দেখাইল—তাহাতে আমরা ছাত্রটির বিশেষ প্রশংসা করিয়া স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি পুনরায় আমাদের আসিবার জন্য বলিলেন। চাঁদমোহন বাবু তাঁহার পুত্রকে বিদ্যা-পীঠে ভর্ত্তি করাইবার জন্য একখানি আবেদন পত্র লইলেন; অতঃপর আমাদের নমস্কার জানাইয়া বিদ্যাপীঠ হইতে বেলা চারটার সময় আমরা বাহির হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দুইখানি রিক্সায় করিয়া আমরা বাড়ীর দিকে চলিলাম। কেষ্ট ও আমি যে রিক্সায় উঠিলাম তাহা বেশ নুতন ছিল, তাই আমাদের রিক্সাখানি হেমেন্দ্র বাবু ও চাঁদমোহন বাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া খুব দ্রুতবেগে চলিল।

[আগামী বারে সমাপ্য

ভারতীয় কুটির শিল্পের ঐতিহ্য

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেন-শিল্পবিপ্লবের ঝড় ভারতীয় কুটির শিল্পের ভাগ্যাকাশকে সেই যে ধূলিমণ্ডিত করেছিল, পুরো এক শতাব্দী কিংবা আরও বেশী সময়ের মধ্যে আজও তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নাই অবস্থা-বৈগুণ্যের পরিপ্রেক্ষায়—যার ফলে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি শিল্পী আজ উদ্‌ভ্রান্ত এবং দিশেহারা। যুগের সাথে তাল বজায় রেখে চলার দৈন্য তাকে নিরুৎসাহিত ক'রে তা'র শিল্পী-মনটিকে চিরদিনের জন্য ক'রে দিয়েছে পঙ্গু।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা যান্ত্রিক সভ্যতা উৎকর্ষ মণ্ডিত হোয়ে যন্ত্র-যুগের ছদ্মনামে প্রবেশ করে ভারতবর্ষে। বৃটেনের এতে লাভ হয়েছিল প্রচুর। কারণ এ দেশেও পুঁজিপতিদল ভারতের গৌরব-জনক কুটির শিল্পের সুমহান্ ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে পতংগের মত ছুটেছিলেন এই যান্ত্রিক সভ্যতার পশ্চাতে। ফলে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কারিগর সব কিছুরই জন্য তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল বিদেশীদের উপর। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় এই পুঁজিপতির দল নির্ম্মাণ করেন বড় বড় কল-কারখানা এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ সহরের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে গ্রামগুলি হ'তে থাকে শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত।

বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে অবধি যন্ত্রযুগের নবসূচনায় কুটির শিল্পের ধ্বংস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা যখন অন্ন-বস্ত্র-জীবিকা হীন হ'য়ে শোকের সাগরে ভাসছিলো, তখন ভারতের বুকে উদিত হলেন মহাত্মা গান্ধী। সেটা উনিশশো সতেরো সাল। এর পর মোটামুটি উনিশশো একুশ সাল হ'তে পুনরায় গ্রাম-শিল্প এবং কুটিরশিল্পের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। উনিশশো একুশ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের তরফ থেকে কুটির শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হ'ত না। কারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা বোঝা-পড়ার ফলে রাজনৈতিক দিকটা সামলাতেই হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছিলেন তৎকালীন কর্মীবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ত্তন ক'রে গঠনমূলক কার্য্যের পানে নজর দিলেন এবং এরই পরিণতি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হল 'শ্রী-নিকেতন'। রবীন্দ্রোত্তর যুগেও এই শ্রী-নিকেতনের কাজ বেশ সাফল্যের সংগে অগ্রসর হচ্ছে এবং এর বিভাগীয় কর্ম্মকেন্দ্রগুলি ভারতীয় কুটির শিল্পের চেহারা দিয়েছে বদ্‌লে।

শ্রী-নিকেতনের কার্য্যপ্রণালী এবং নিকটস্থ গ্রাম-বাসীদের সাথে শিল্পীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আজ ভারতের কুটির-শিল্প-জগতে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে বল্‌লেও অত্যুক্তি করা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যন্ত্রদাসে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক শিল্পকেন্দ্রের গতি এবং ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্প-প্রগতি পরস্পর অংগাগীভাবে জড়িত না হলেও পরিপন্থী নয়। কারণ প্রথমটাতে মুনাফার অংশ রাষ্ট্রের দখলে আসে আর দ্বিতীয় দফায় আসে পুঁজিপতি বা পুঁজিপতিবর্গের দখলে। গণতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র বসিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হ'তে পারে, কিন্তু তাতেও থেকে যায় অসমাধিত বেকার সমস্যা। কারণ গান্ধিজী নিজেই বলে গেছেন যে, "...গ্রামে দশজন কর্ম্মী যে কাজ করে, একা কারখানার একজন কর্ম্মীই সেই কাজ করছে। অর্থাৎ, গ্রামে বসে একজন কারখানা-কর্ম্মী পূর্ব্বে যা রোজগার করতো, এখানে গ্রামের দশজন সহকর্ম্মীর স্থানে সে একা বসে তার অধিক রোজগার করছে।"

গ্রাম-শিল্পের উন্নতি সাধন করে এবং উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের দ্বারা লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর জীবিকা অর্জনের পন্থা পরিষ্কৃত করাই শুধু গান্ধীজীর মূল দৃষ্টি ছিল না। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য এবং ধর্ম্ম-কৃষ্টি-অব্যাহত রেখে কোন সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে উঠতে পারে এই দৃষ্টিভংগীই ছিল গান্ধীজীর গঠনমূলক কুটির শিল্প-সংগঠনের প্রধান অনুপ্রেরণা। কারণ চাকচিক্যমণ্ডিত বিদেশী জিনিষের মোহ তাঁকে

ভুলাতে পারে নাই। একটানা শোষণের ফলে ভারতের সম্পদ আজ অন্তর্হিত, এবং দর্শন, বিজ্ঞান আজ বিদেশীর সেবায় নিয়োজিত। কাজেই কুটির শিল্পের সর্বাংগীন উন্নতি সাধন করে এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন করার উদ্দেশ্যে উনিশশো চৌত্রিশ সালে গান্ধিজী গঠনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিলেন কংগ্রেসের কার্য্যসূচীর মধ্যে—যার ফলে প্রবর্ত্তিত হ'ল 'অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইন্ডাসট্রীজ্ এসোসিয়েসন'।

মহাত্মা গান্ধী জানতেন—ভারতের সুমহান্ ঐতিহ্যের মূলে আছে এই সাতলক্ষ গ্রাম। গ্রামবাসীদের বুভুক্ষা, তাদের কর্ম্ম-অভাবহেতু অলস জীবনযাপন তথা গ্রাম-শিল্পের লুপ্তপ্রায় অবস্থা দেখে তিনি বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় তিনি যেন পথ খুঁজে পেলেন এবং কংগ্রেসের কার্য্য-সূচীর মধ্যে গঠনমূলক প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করালেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসও উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আনারও উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা যতখানি—দেশের শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বও তার চাইতে কিছু কম নয়। সমাজের প্রয়োজনে যন্ত্র-শিল্পের যে স্থান কুটীর শিল্পেরও সেই স্থান এবং সেই গুরুত্ব। এরই চেষ্টায় ১৯৩৮ সালে 'ন্যাশানাল প্লানিং কমিটির' সৃষ্টি হয়।

যন্ত্র-শিল্পের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতাতেও যে কুটির-শিল্প সমানভাবে অগ্রসর হয়ে চলতে পারে তার উদাহরণ আজকের চীন ও জাপান। যন্ত্রের সামান্য সাহায্য নিয়ে এ দেশের কুটির-শিল্প-জাত দ্রব্য বিদেশের যন্ত্র-শিল্পের সংগে সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে।

ভারতীয় কুটির-শিল্পের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাঁত। ভারতের বুকে এর অস্তিত্ব বহু যুগের। এর উৎপাদনশক্তি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকারভেদ মোঘল সাম্রাজ্যের আমলে এবং আধুনিক যন্ত্রযুগের পুরোধ্যায়েও বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে এসেছে—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর নিকটেই।

এ দেশীয় পশম ও রেশম শিল্প শুধু যে ভারতীয়দেরই চাহিদা মিটিয়েছে তা' নয়। ভারতীয় রেশমের চাহিদা ছিল পৃথিবীব্যাপী। কাশ্মীর, ইলোরা প্রভৃতি পশমের জন্য যেমন ছিল বিখ্যাত—বাংলা, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ তেমনই বিখ্যাত ছিল রেশম শিল্পের নিপুণতায়।

এছাড়া কাঁচশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প এবং কাঠের কাজ, পাথরের কাজ ইত্যাদির জন্য ভারতবর্ষ সর্ব্বদাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। চারুকলা ও নৈপুণ্যের দিক থেকে মাটির কাজ বিশেষ করে রং-করা মাটির কাজ এবং কাঁচের গহনা ইত্যাদি এক কালে ভারত এবং ভারতবাসীর সৌন্দর্য্যবহন করে এসেছে। কাঁসার বাসন, পিতলের ও তামার পাত্রাধার এবং লোহার কড়াই, খুন্তী ইত্যাদি কুটির শিল্পেরই অঙ্গীভূত; এবং ভারতবর্ষ এগুলির সহায়তা চির-কালই নিয়ে এসেছে।

প্রাসাদোপম অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধনকারী পাথর এবং পাথরের ওপর খোদাইএর কাজ একদিকে যেমন দর্শককে বিমুগ্ধ করে—কারুকার্য্যমণ্ডিত রুচিসম্মত সুদৃশ্য আসবাবপত্র এবং দেব-দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণকার্য্যে কাষ্ঠশিল্পীর খোদাই নৈপুণ্য দেখে তেমনি অবাক হতে হয়। তা'ছাড়া জাহাজ তৈয়ারীর কাজেও কাষ্ঠশিল্পীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

যান্ত্রিক সভ্যতা এবং যন্ত্রযুগের পরিপ্রেক্ষায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয় কুটিরশিল্পের অধোগতি দেখে একদিকে মন যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, অন্যদিকে পরবর্ত্তী কালে কুটির-শিল্পের উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা আমাদের মনে আশার আলোক সঞ্চার করে। তবে রাষ্ট্রের আনুগত্য এবং বৃহৎশিল্পজাত দ্রব্যগুলির ওপর শুল্ক ধার্য্য করে কুটিরজাত শিল্পসম্ভারের প্রচারকার্য্যে সুবিধা না করে দিলে অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

সর্ব্বজনস্বীকৃত এবং সর্ব্বজনানুমোদিত এই কুটিরশিল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টিদানই ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন-শিল্পীর প্রাণের মুমূর্ষাকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবে। জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে জন-কল্যাণকর এই কুটির-শিল্প-উন্নয়ন-পরিকল্পনা উৎকর্ষমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক সাফল্যের গরিমায় ইহাই কোটি কোটি শান্তি-কামী দেশবাসীর আন্তরিক ইচ্ছা।

ভারতের সভ্যতা আজ পাশ্চাত্যের অনুকরণে নগর-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। ভারতের গণতন্ত্র একটা অর্থহীন ফাকাবুলির মতই শোনাবে যদি না আজকের ভারতীয় সভ্যতা গ্রাম-কেন্দ্রিক হয়, এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, কুটির-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার করতে অভ্যাস করার মধ্যেই আমরা ফিরে পাবো আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যগত গ্রামীণ পরিবেশ।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[শোণ-নদের তীরবর্ত্তী জঙ্গল ও বালির টিলা
দূরে একটি বনপথ— সূর্য্যাস্ত]

(কতকগুলি বন্য স্ত্রী পুরুষ শুক্‌নো কাঠের বোঝা নিয়া প্রবেশ করিল। অপর দিক দিয়া কালু সর্দ্দারের প্রবেশ)

কালু—আরে তুরা ঘরকে যারে। আঁধার ঘোনায়ে আসতিছে। জানোয়ারগুলো বাইরিবে—আর একটিকে লিয়ে চল্লে যাবে। আরে কাঠকা লাগি জান খুয়াবি।

বুনো রমণী—সর্দ্দার! শঙ্করী ঠাক্‌রাণ কি আর বাঘ চিতা সব জানোয়ার রাখিয়েছেন। সব-মারে শেষ করছেন।

১ম পুরুষ—আরে সর্দ্দার তু আছিস মোদের রাজা। ভয় কারে রে। এই দেখনা কেও কাঠ আনছি। আর সর্দ্দার বনটির যত ভিতর যাবো কাঠটি তেমন শুকনো পাবো। আমাদের হাতে টাঙ্গী থাকলে আর ভয় কি বল?

(কালু সর্দ্দার একটু হাসিল)

২য় রমণী—আরে অমনটি কে আসে রে?

(দূরে—একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখা গেল। অপূর্ব্ব তার বেশ—দৌড়াইয়া আসিতেছে—হাতে তার তীর-ধনুক—সকলের দৃষ্টিপাত)

(বালিয়াড়ীর-পারেয়ে নৃত্য করিতে করিতে কুনালের প্রবেশ)

সর্দ্দার—আরে ছেলিয়া তু আবার উধারকে গিয়েছিলি কেন রে? তুর মরণের ডর লাগে না?

কুনাল—(হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং হাতের তীর-ধনুক দেখাইয়া) আরে সর্দ্দার—ঐত আমার ঘর—আমার ঘরকে যাবে সর্দ্দার। জানোয়ার এলে তীর মারবো না হয় গাছে উঠবো। তোমরা গাছে চড়তে জানো না?

সর্দ্দার—জানিরে—জানি—আরে চল ঘরকে যাই—সাঝ হয়ে আসল।

সকলে—চল সর্দ্দার ঘরকে যাই। আয় রে কুনাল তু চল।

(কুনালের নৃত্য করিতে করিতে অপর দিকে গমন)

(দূরে জঙ্গলের ভিতর অশ্বারোহণে ভবশঙ্করীর প্রবেশ ; পরিধানে রক্তবস্ত্র—হস্তধৃত বল্লম—ঢাল—কটিদেশে ভীষণ তরবারি। বর্শার আঘাতে একটি হরিণকে বিদ্ধ করিলেন। দূরে শঙ্করী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া দেখিতে গেলে—বন্য মহিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বধ, পরে অগ্রসর—অপর দিকে নদবক্ষে ছিপ—রাজা ও মন্ত্রী উহাতে উপবিষ্ট—উহা দেখিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া প্রথমে দুর্ল্লভের প্রবেশ)

দুর্ল্লভ—তুমি একলাই মহিষগুলোকে কায়দা করলে! কে তুমি মহিষমর্দ্দিনী—

শঙ্করী—হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে? (দৃপ্তভাবে দাঁড়াইল)

দুর্ল্লভ—এমন সুন্দর! অথচ এত নিষ্ঠুর।

শঙ্করী—আপনি কে? কি চান? চলে যান এখান থেকে। (তরবারি স্পর্শ করিল)

(একদিক দিয়া রাজার ও অপর দিক দিয়া কুনালের প্রবেশ, হাতে তীর-ধনুক—নিকটে আগমন)

কুনাল—আরে এই নে তীর, মার—তরোয়াল কেন রক্ত বেরুবে ঘাল হবে না—নে নে মার—

(দুর্ল্লভ রাজার পশ্চাতে আশ্রয় লইল)

রুদ্রনারায়ণ—দেবী! কে তুমি? তোমার অপূর্ব্ব সাহস—তোমার শক্তি-বীর্য্য অতুলনীয়। আমার মন্ত্রী কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছে? বল, আমি ভুরসুটের রাজা—আমরা শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

(শঙ্করীর মুখ গোধূলির রাগে রাঙিয়ে দিল—জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে উভয়ের দৃষ্টিবিনিময়, প্রকৃতির মিলন, শঙ্করীর শিথিল মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল এবং তীর-ধনুকসহ কুনালের হাত সরাইয়া দিলেন।)

দুর্লভ—(ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া) মারুন না শাস্তি দিন। এই ত মুস্কিল—আপনাদের শাস্ত্রের—সব উল্টো। যে ভয় পায়, তাকে তেড়ে মারেন আর যে সাহসে এগিয়ে যায়, তাকে দেখে অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথা হেঁট করেন। দেবী! মারুন! হয় তরবারি না হয় তীর-মারুন।

রুদ্রনারায়ণ—মন্ত্রি! দেবী! তোমার অপূর্ব্ব সাহস—আমরা দুজনেই আমাদের ছিপ থেকে দেখেছি। একাধিক বন্য মহিষ তোমাকে আক্রমণ করেছে দেখে সাহায্য করবার জন্য আমরা ছিপ তীরে লাগাতে আদেশ দিলাম। কিন্তু আসার পূর্ব্বেই তুমি নিজেই আত্মরক্ষা করেছ। দেবী! তুমি ভুরসুটের কোন বংশ গৌরবান্বিত করেছ জানতে পারি কি?

শঙ্করী—(লজ্জায় রক্তিমাভা মুখখানিকে গোধূলিরাগে রাঙিয়ে দিয়েছে-সে কোনরূপে সংযত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং কুনাল পশ্চাত হইতে দু'জনকে প্রণাম করিল) মহারাজ! আমি আপনারই রাজ্যের প্রজা—সর্দ্দার দীননাথ চৌধুরী আমার পিতা—আমার নাম ভবশঙ্করী দেবী—

রুদ্র—যাও দেবী তোমার পিতাকে আমার প্রণাম দিও। আর বীর সর্দ্দারকে বলো—অস্ত্রবিদ্যায় ও সাহসিকতায় ভুরসুটে সর্দ্দারজী আর হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আসন পার্শ্বে দাঁড়াবার যোগ্য সাধক হয়েছে।

শঙ্করী—আমায় অপরাধিনী করবেন না। মহাজ্ঞানী পূজনীয় হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার গুরুদেব।

রুদ্র—ভাল—ভাল—আমি তাই আশা করেছিলাম। দেবী! তোমাকে কোন সাহায্য করার আবশ্যকতা আছে মনে করি না—তবুও কর্ত্তব্য ও সৌজন্যের খাতিরে বলি—আমরা কোনও সাহায্য করিতে পারি কি?

শঙ্করী—আমার ঘোড়া আছে।

(প্রণামান্তে কুনালসহ প্রস্থান)

(রাজা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল)

দুর্লভ—চল মহারাজ। এদিকেও যে অন্ধকার হয়ে এলো

রুদ্র—(চিন্তিত লজ্জিত হইয়া) হ্যাঁ চল যাই।

[ক্রমশঃ]

●

"বিদ্যা, যশঃ, ধন, মান, পরোপকার এ সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর-মনের উন্নতি হইয়া, নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক, পরিশ্রম দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া, ধন লইয়া, শক্তি লইয়া, স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।" —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কালিদাসের কাব্য-প্রতিভা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কবি 'শেষ কথা' নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

আমি বাঙ্গালীর কবি বাঙ্গালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গালার আশা-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
দেশ-দেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।
যুগ যুগান্তর-পথে যাত্রা তার নহে কোন' দিন,
কুণ্ঠিত তাহার কণ্ঠ, বক্ষ ভীরু, পক্ষ তার ক্ষীণ।
আমি বাঙ্গালীর কবি বিশ্ব ভরি' কত না বিপ্লব,
ভাঙ্গা গড়া বিপর্য্যয় হ'য়ে গেল শুনিয়াছি সব।
সিন্ধুর ওপার হ'তে কত তত্ত্ব, কত মতবাদ
আসিয়াছে খাণ্ডা হাতে ঝাণ্ডা সাথে তুলি জয়নাদ,—
পরশে নি চিত্ত মোর। কারো চোখে হানিয়া অঙ্গুলি'
সত্য দেখাইতে মোর কাব্যলক্ষ্মী তুলে না আকুলি'।
চেতাইতে অরসজ্ঞে হাতে তার নাহিক হাতুড়ি,
শাণিত বাক্যের ছটা, ছন্দোঘটা, বচন-চাতুরী
সে যে বড় লজ্জাবতী, সজ্জাহীনা, তাহার চরণ
কণ্ঠে কণ্ঠে কোনদিন করিবে না নৃত্যে বিহরণ।
যাদের বিজাতি শিক্ষা হরিয়াছে বিধিদত্ত মন,
যাহারা জাতীয় ধর্ম্ম হেলাভরে দিল বিসর্জ্জন,
তাহাদের জন্য নয়, পশ্চিমের ঝঞ্ঝার মাঝারে
যাহারা বাঙ্গালী মর্ম্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
তুলসীর দীপসম, তাহাদেরি তরে গাই গান;
বিম্বিত আমার গানে তাহাদেরি অমার্জ্জিত প্রাণ।

কবিতাগুলিতে সত্য সত্যই বাঙ্গালার আশা তৃষ্ণা, স্মৃতি স্বপ্ন চিরন্তন ব্যথাই পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়াছে।

কবিতার প্রথম দুই চরণ—

সংসারে কি মন লাগে এই পাগ্‌লা দেশে?
ঘর ছাড়া ডাক কেবল শুনি সর্ব্বনেশে।

এই দুই চরণেই কবির কল্পিত বাংলার রূপ ফুটিয়াছে, নিজের কবি-চরিত্রটিও ফুটিয়াছে। বাংলার বৈরাগীর গোপীযন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

তব সঙ্গীতে সহজিয়া মিতে শুনি বঙ্গের মর্ম্মবাণী।
বিগলিত তার স্বচ্ছ তরল মুগ্ধ সরল হৃদয় খানি।

বাংলার দেবতার কথায় কবি বলিয়াছেন—

ভিন্ন ক'রে আয়োজনের নেইক দাবি-দাওয়া,
এক থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।

বাংলার পাঁচজন প্রাচীন কবির উদ্দেশে কবি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন—জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ও রামপ্রসাদ। ইঁহাদের উদ্দেশে কবি যে কথা-গুলি বলিয়াছেন—সেইগুলিতেই বঙ্গের মর্ম্মবাণী পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত।

বাংলার ধর্ম্মসাধনার দুইটি ধারা—একটি বৈষ্ণবী ধারা আর একটি শাক্ত ধারা। শাক্ত-ধারাতেও বৈষ্ণবী ছায়া-পাত হইয়াছে। শাক্তধারার কথা কবি গুরুগোরক্ষনাথ ও রামপ্রসাদ কবিতায় বলিয়াছেন—

বিরূপা শক্তির

পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।
মা ব'লে শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে,
বামারে দক্ষিণা তুমি করেছিলে সাধনার ধামে।

রামপ্রসাদ কবিতায় বলিয়াছেন—

ভবগঙ্গার এপারে ওপারে সন্ন্যাসে আর ইহসংসারে
ভক্তির সাথে ভুক্তি মিলায়ে শক্তির সেতু রেখেছ গড়ি।

মেনকা কবিতায় কবি বলিয়াছেন—হিমালয়-জায়ার অশ্রুনীরেই এই বঙ্গের মাতৃদেহ গঠিত—

আহরণ—শ্রীকালিদাস রায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৷৹। কালিদাসবাবুর বাছাই কবিতার সংকলন। এই সংকলনখানির ভিত্তিতেই আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত।

উমার মাগো সদাই জাগো আমার দেশের গেহে গেহে
বৎসলতার উৎস রচি প্রসূতিদের দেহে দেহে।

কবির চোখে বাংলার শিবের রূপ—

কাঙাল মোরা মোদের চেয়েও কাঙাল তুমি আরো।
ভিক্ষা ছাড়ো মোদের সাথেই খাটতে তুমি পারো।
অবসরের সহায় সাথী, তোমায় ভালবাসি
পাও নাকো কাজ? মোদের সাথে হও না কেন চাষী।
তোমার দুঃখ ভাবলে মোদের দুঃখ ভুলে যাই,
তোমার তরে বড়ই ব্যথা পাই।

বৈষ্ণব ভাবধারার রচনাই বেশী। এজন্য কালিদাস বাবুকে শেষ বৈষ্ণব-কবি বলা যাইতে পারে। কালিদাস বাবুর বৈষ্ণবতা বর্ত্তমান যুগেরই উপযোগী, কারণ কালিদাসবাবু রবীন্দ্র-শিষ্য। সেজন্য সবগুলিতেই রাধাকৃষ্ণের Symbolism-এর দ্বারা Spiritualism যেমন ব্যক্ত করা হইয়াছে—ব্রজলীলার নামে তেমনি বিশ্বজনীন তত্ত্বেরই ইঙ্গিত আছে—কোনটিই একেবারে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ নয়। কবির গোপীযন্ত্র, চাঁদসদাগর, বেহুলা, মেনকা, অশোক, কদম্ব, জবা, তুলসী ইত্যাদি বহু কবিতাই Symbolical.

প্রেমের কবিতাগুলিতে বাংলার আদর্শ বধূ এবং গার্হস্থ্য জীবনের কবিতাগুলিতে বাংলার চিরবৎসলা জননীর রূপই ফুটিয়াছে। বাংলার স্নেহশীলা বৌদিদির আদর্শ রূপটি ফুটিয়াছে বৌদিদি কবিতায়। বাঙ্গালী সংসারের কুমারী বালার আশা আকাঙ্ক্ষা, চকিত হরিণ-হৃদয়া বাংলার বধূ, বাংলার কর্ম্মক্লান্ত আত্মত্যাগী পিতা, বাংলার কৃচ্ছ্রব্রতচারিণী পিতামহী সবারই রূপ ফুটিয়াছে গার্হস্থ্য কবিতাগুলিতে।

শিবায়ণের "হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভ.ত" ও অন্নদামঙ্গলের "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এই চরণ দুটি কবির মনে অতীত বাংলার যে রূপটি ফুটাইয়াছে তাহাই বাংলার আসল রূপ—তাঁহার সপ্ত ডিঙ্গার বঙ্গদেশ কবিতায় যেরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহা সাহিত্যের কাল্পনিক রূপ।

বাংলার পল্লী প্রকৃতির ও পল্লীজীবনের কয়েকটি চিত্র আছে। এই পর্য্যায়ের চিত্র কবির পর্ণপুটে প্রেম কবিতার মত অনেকই আছে, এই গ্রন্থে অল্প ২।৪টিই পাওয়া গেল। ব্রজবেণু রও বেশী কবিতা ইহাতে নাই—কেবল নিদর্শন স্বরূপ ২।৪টি গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই যে সকল কবিতার আমি উল্লেখ করিলাম, সেগুলিতে কবিতার অপূর্ব্বতা অনুভূতির গভীরতায়—স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছ সরল প্রকাশভঙ্গীতে। —ভাবের তুঙ্গতার মৌলিকতা ফুটিয়াছে আর এক শ্রেণীর কবিতায়। আমাদের মনে হয় কবি কালিদাসের বিশেষত্ব ও মৌলিকতা এই খানেই। এ বিষয়ে কবির প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে কেহই নাই। এইগুলির ভাব-গৌরব বাঙ্গালার গণ্ডি ছাড়াইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিবেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কবিতাগুলির নাম—অশ্বত্থ, গঙ্গা, হিমাদ্রি, আদিত্য, বরুণ, বেদ, বৈশ্বানর, সোম, ইন্দ্র, শঙ্খ। কবির বৈকালী কাব্য-গ্রন্থে এই শ্রেণীর কবিতা অনেক আছে। এইগুলি আমাদের চিত্তকে অতীত ভারতের সংস্কৃতি-মণ্ডলে লইয়া যায়। এ গুলিতে পূর্ব্ব সূরিদের অনুকৃতির লক্ষণ কোথাও নাই। এইগুলিও Symbol বৃহত্তর ভাবের। Cosmic Comprehension-এর একটা কলা-শ্রীসঙ্গত ব্যাখ্যা এইগুলিতে আছে। এইগুলি classical ভঙ্গীতে লেখা হইলেও এইগুলিতে Romance কম নাই। এইগুলির পাঠক অল্প, কারণ অতীত ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অতি অল্প লোকেরই পরিচয় আছে। কবি বোধ হয় ভয়ে ভয়ে এ গ্রন্থে ঐ শ্রেণীর কবিতা সবগুলি দেন নাই। আমরা স্বজাতিবৎসল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিদগ্ধগণের দৃষ্টি এই কবিতাগুলির দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কয়েকটি কবিতা হইতে ২।৪ চরণ করিয়া দিই—

১। চিতাই জীবের নয় শেষ গতি—
শিবপদ লভে সে পর-লোকে,
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান, তাই
অনধীরা রও সবার শোকে।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে
অব্যয় ধ্রুবধনের সাথে,
মূঢ় শিশু হায় সংশয়ে চায়
খেলনাটি সঁপি মায়েরো হাতে।

তার দশা দেখে হেসে কেঁদে ডেকে
কলনাদে বলো (অবিশ্বাসি)
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে রে
হরিচরণবাসী।'
অজ্ঞান তারা, দিব্য বেবিন
বিশ্বাস-বল কোথায় পাবে ?
যাদুকরে ধার দিয়া অঙ্গুরী
চিরতরে গেল কেবলি ভাবে। (গঙ্গা)

২। কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরল চিত,
কোন্ ভাবাবেগে ?
সেই আদিকাল হ'তে কেবলি করিছে প্রশ্ন
শুধু মেঘে মেঘে।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর স্রোতে
সদুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর
আচার্য্যের মত।
যুগ যুগ হ'তে চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা,
প্রশ্ন না ফুরায়,
সিন্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা
তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মুল তথ্য যারে জেনে ধ্রুব সত্য
তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ, সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে
প্রশ্নই কেবল।

(হিমাদ্রি)

৩। চূর্ণ করো দুর্দ্দম উন্মদে
অবিদ্যার সমারোহ দুর্গসৌধ পুরজন পদে,
কল্পান্ত-প্রলয় সম ত্রস্ত ধ্বস্ত করি সৃষ্টি-লীলা
নক্রধ্বজ রথচক্রে, গলাইয়া শৈল মনঃশিলা।
বিজ্ঞানের বালুবন্ধ ভেঙ্গে ছুটে প্লাবনের স্রোত,
দুর্ব্বাদর্ভ খণ্ড সম ডুবে তায় কত শত পোত।
তব বলি-পুষ্প প্রায় ভাসি মোরা উল্লোল কল্লোলে,
এ বিশ্ব প্রহ্লাদ সম মত্ত দন্তিশুণ্ডে যেন দোলে।
তোমার দিঙ্‌নাগ শিরে মগ্নপ্রায় মিহির-সংঘাতে
ধ্বক ধ্বক গজমুক্তা পিঙ্গোজ্জল ময়ূখ সন্ধ্যাতে,
জ্বালায় নূতন সূর্য্য। অভ্র ভেদি' বাড়বাগ্নি জ্বলে,
দ্বীপ ব্যূহ, সেতু স্তম্ভ, জতুগৃহ সম তায় গলে।
অবিচ্ছিন্ন সিন্ধুব্যোম যায় ধূম্র তমিস্রায় ঢেকে,
বারুণী-সেবন মত্ত গ্রহ তারা চলে কক্ষ থেকে।
(বরুণ)

৪। দগ্ধ করিয়া জীর্ণ এ দেহ
দিবে মোরে ইহ মুক্তি যবে,
স্বদেহ ভস্ম মাখিয়া আমার
সূক্ষ্ম শরীর বিরাগী হবে।
তাও হয় যেন আহুতি তোমার,
জন্মবন্ধ দহন লাগি'
নির্ব্বাণ তরে হে মার-বৈরী
বিশ্ব পাবক শরণ মাগি॥
(বৈশ্বানর)

৫। ইষ্টক-শিলায় নর রচে তুঙ্গ মন্দির সুন্দর,
অন্ধকারে বন্ধ দ্বারে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর;
তুমি রচ শ্রীমন্দির বিদারি' সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি অঙ্কে তব লভে শান্তি-সুখ।
যুগে যুগে মূঢ় নর রচে তবু দেব কারাগার,
চূর্ণ জীর্ণ করি তায় দেবতারে করিছ উদ্ধার॥

৬। শম্ভুর শিরে গঙ্গার নীরে
শত শত প্রতিবিম্ব হানি'
চন্দ্রমালায় ভূষিয়াছ তায়।
গৌরীর তুমি মুকুরখানি।
নারিকেল তরু, বট, দেবদারু
চিক্কণ চারু তোমার স্নেহে,
মুদিত নলিন সরোবর ধরে
অযুত রজত নলিন দেহে।
দ্রব-হেমময়ী শোভে নদী-তনু
লক্ষ হীরার চন্দ্র হারে,
সানুমান নৈবেদ্য সমান
শোভে যেন তব ভোজ্য-ভারে।
যা কিছু ধ্বস্ত জীর্ণ দগ্ধ
যা কিছু কুশ্রী ধ্বংস শেষ,
সবি শোভমান, ছিন্নবিতান
তরী ধরে রাজহংস বেশ।

৩৩টি গান এই সংকলনে আছে—এইগুলিতে নানা ভাবের রসাভিব্যক্তি হইয়াছে। এইগুলি কবির ছন্দের সূক্ষ্ম চাতুর্য্যের নিদর্শন।

শেষ পর্য্যায়—বেলা শেষে এইগুলিই আদর্শ লিরিক। এই গুলিতে দিন ফুরানোর বেদনাই প্রধান উপজীব্য। ব্যক্তিগত বেদনার কথাত অনেক কবিতাতেই কবি প্রকাশ করিয়াছেন। এইযে দিন ফুরানোর বেদনা—ইহা কবির নিজের শুধু নয়—ইহা সকল কবিরই প্রাণের কথা। যৌবন চলিয়া যায়—তাহার সঙ্গে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রীতি মান যশ সবই যায়—আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া পড়ে জীবনে—কল্পনার রঙ হইয়া পড়ে গেরুয়া—স্মৃতিই হয় সম্বল। ইহা বিশ্বজনীন বেদনা হইলেও কবি-জীবনের Tragedy এখানেই। শেষাংশের কবিতাগুলি তরুণদের চিত্তও উদাসী করিবে। কবি Cynic নহেন, Pessimist নহেন, তিনি নম্রশিরে শান্তচিত্তে তৃপ্ত হৃদয়ে নূতনকে পথ ছাড়িয়া দিয়া অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

স্বর্গমর্ত্ত্য

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

স্বরগের সিঁড়িগুলো মর্ত্ত্যের হাড়ে গড়া,
মানুষ বাদে দেবতার কোথা আছে স্থান!
উপরে যতই উঠি নীচে রহে ধরা,
ধাপে ধাপে নীচে নেমে হারাই সম্মান।

এ নহে স্বপন শুধু মায়ামরীচিকাময়,
শুধু ছেলেখেলা আর ঝকমারী মেলা—
কঠিন পাষাণে আছে সত্য জ্যোতির্ম্ময়,
প্রেমের শান্তিতে করে জীবনের খেলা।

হার-জিত থাকে যার সে নহে পাষাণ,
উপরে নীচেতে চলে নিত্য অভিযান,
উঠিতে পড়ে না কভু সদা রহে ধীর,
পড়িয়া উঠিতে পারে বিপদেতে বীর।

সোনার চশমা পরে দেখে না বাহির,
সব দিকে খোলা পথে চোখ আছে তার;
জীবন তরীতে বাঁধা এপার ওপার,
ইহকাল পরকাল দুই রাখি স্থির।

মর্ত্ত্যে যে মানুষ নাই কোথায় স্বরগ
সিঁড়ি বেয়ে নাহি চায় উঠিতে উপরে,
বিমানের পথ ধরে কতদিন পরে
মানুষের মৃত্যু হানে পিশাচ মড়ক।

সব দিকে সিঁড়িভাঙা বিমান অচল
অপমানে অহংকারে ওঠে হলাহল;
অধিকার নাহি মর্ত্ত্যে লোভী মানবের,
দানবের মিলে হায় মিথ্যা হেরফের।

কিশোর কবি সুকান্ত

শ্রীপ্রণবকুমার মজুমদার

সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবি-প্রতিভা আজ আর বাংলা দেশের পাঠক পাঠিকাদের কাছে অবিদিত নেই। অবশ্য কোনদিনই তার কবিতা অনাদৃত হয় নি। বরং ঠিক এর উল্টোটাও বলা যেতে পারে। গোড়া থেকেই সুকান্ত সমাদর পেয়ে এসেছে বাঙালী সাহিত্যানুরাগীদের কাছ থেকে তার যুগোপযোগী কবিতাগুলির জন্য। সুকান্ত মারা গেছে মাত্র আঠার বছর বয়সে। কিন্তু এই কিশোর বয়সেই এতটা কবিখ্যাতি আর কোন কবির ভাগ্যে জুটেছিল কি না সন্দেহ। তার অকাল-মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যাকাশ হ'তে নিশ্চিতরূপে একটা বিরাট প্রতিভার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গেল।

সুকান্তের অধিকাংশ কবিতারই রচনাকাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে। এই কটা বছর ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনে এনেছিল একটা মস্ত বড় বিপর্য্যয়। মারী-মন্বন্তর, যুদ্ধ-বিগ্রহ এ সব যেন ঈশ্বরের চূড়ান্ত অভিশাপের মত বর্ষিত হয়েছিল এ দেশের উপর। তারপরে ত' ছিলই দুর্ব্বলের উপর সবলের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, অর্থলোলুপ হীন মুনাফাখোরদের ততোধিক হীন বৃত্তি। একটা দুঃস্বপ্নের মত যেন কেটে গেছে ওই কটা বছর। (দুঃস্বপ্নের ঘোর কি আজও কেটেছে ?) তাই হাজার হাজার উৎপীড়িত ক্রন্দনরত নরনারীর মহৎ আশা দৃপ্তভঙ্গীতে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছে দরদী কবি সুকান্ত। "ওরা কাজ করে" এদের সার্থক কবি সে। স্পষ্টভাষায় নিজের সম্বন্ধে সে লিখেছে—

"তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"

'প্রার্থী' কবিতায় সুকান্ত সর্ব্বহারাদের হয়ে শীতের সূর্য্যের কাছে প্রার্থনা করেছে অকৃপণ উত্তাপের। এরা অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়, সর্ব্বাঙ্গ ভাল করে ঢাকতেও পায় না কাপড় জোটে না বলে। তাই (শীতকালের)

"সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোণার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিকে ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের আশায়।
হে সূর্য্য,
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

সুকান্তর অনেকগুলি কবিতাতেই বিদ্রোহের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যায়। বিদ্রোহী কবি-মানস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এই সব কবিতাতে—যেমন 'সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', ইত্যাদি। তাই 'অনুভব' কবিতায় সুকান্ত বলছে—

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।"

কিন্তু তারি সঙ্গে রয়েছে একটা গভীর আশা এবং জ্বলন্ত উৎসাহ ও বিশ্বাসের বাণী। এদিক দিয়ে তার 'ঐতিহাসিক' কবিতা সত্যই ঐতিহাসিক।

এ কথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য যে আধুনিক কবি সুকান্ত ছিল রূঢ় বাস্তববাদী। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যে দেশের অধিকাংশ লোকের দিন অতিক্রান্ত হয়, কি অদ্ভুত সংগ্রাম চালিয়ে যায় কঠিন বাস্তবের সংগে এই

সব জীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট লোকগুলো, সেখানে কোথায় বা আনন্দ, কোথায়ই বা রোমান্টিসিজম্‌ আর মিষ্টিসিজম্‌। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--

"জানো ত' মা বাণী, সুরের খাদ্যে নরের মিটে না ক্ষুধা"
(পুরস্কার)

তাই ত' আধুনিক কবি সুকান্ত বল্‌ছে—

"প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা,
কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটী,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটী।"

সেই কালিদাসের কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পূর্ণিমা-চাঁদ কাব্যজগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাকে সে স্থান হতে বিচ্যুত করা সুকান্তর প্রতিভার একটা উজ্জ্বল নিদর্শন, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে নিশ্চয়ই এই প্রেরণা পেয়েছিল সেই সব ক্ষুধার্ত্ত নরের কাছে—যাদের কাছে পূর্ণিমা-চাঁদের চেয়ে একটুকরো সেঁকা রুটী ঢের বেশী দামী। পৃথিবী গদ্যময়—বাঃ, অপূর্ব্ব, অদ্ভুত। কোন শ্যামল স্নিগ্ধতা, দূর-বিসর্পিত তালিবনরাজি, সুদূর দিকচক্রবালরেখায় আকাশ আর পৃথিবীর স্নেহালিঙ্গন, একপাল; দিকহস্তীর মত ঘন হয়ে আসা গাঢ় কাল মেঘ, গোধূলি আর উষায় বালার্করক্তিমচ্ছটা, পর্ব্বতের উদাস গাম্ভীর্য্য, সমুদ্রের অসীম উচ্ছ্বলতা, স্রোতস্বতীর নৃত্যের ছন্দে বয়ে চলে যাওয়া, ঝরণার চটুল চঞ্চলতা, প্রিয়ার 'কালো হরিণ-চোখ' কবির চোখে মায়া অঞ্জন পরাতে পারবে না। বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্‌ শব্দে বরষণ, পত্রের মর্ম্মর, নাম-না-জানা পাখীর কাকলি, বঁধূর মধুর প্রিয়সম্ভাষণ কবির কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে না। সুকান্ত বোধহয় এতটা চায়নি। ও কথাটা হয়ত তার লেখার তাগিদেই বেরিয়ে পড়েছে। বাস্তবকে অতিক্রম করে যে নৈরাশ্যজনিত সুর এই কবিতাতে অনুরণিত হচ্ছে, অন্তত: আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, তার জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে সুকান্তকে দায়ী করা অসঙ্গত হবে। তা হলে সেটা হবে আংশিক বিচার, সামগ্রিক নয়। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সুকান্তর কবিতায় আছে এক মহৎ পরিণতির অভ্যগ্র পদধ্বনি।

অবস্থাভেদে

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ধার দিয়ে না চাহিলে তুমি লোক ভালো,
প্রেমিকের চোখে প্রিয়া দেখায় না কালো;
পেয়াদায় বলো যদি দারোগা সাহেব,
তখনই ব'লে সে যায় তব মোসাহেব।

উজ্জীবন

শ্রীকল্যাণী সরকার

পূরব গগনে দীপ্ত অরুণোদয়,
স্বর্ণ-পাত্রে গলিত নীহার-কণা;
আঁধার অতীতে ভেঙ্গে কর কর লয়,
তোল নতশীর ক্লান্ত পথিকজনা।
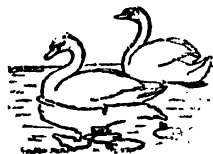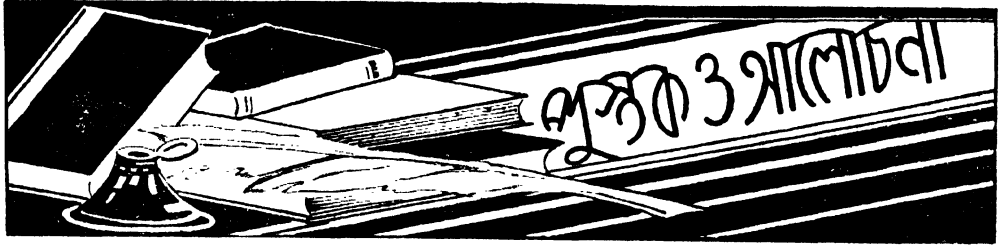
ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা:
কে, এল্, এম্, পুস্তিকা।

বিমান যাত্রীকে কত বিভিন্ন নয়নাভিরাম সহরেই না কাল কাটাইতে হয়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে হয়ত ইউরোপীয় কোনো হোটেলের আবহাওয়ায় ঘণ্টাকয়েক অতিবাহিত করিতে হয়, কারণ নতুন স্থানে অপরিচিত পরিবেশে যাত্রীটি স্থির করিতেই পারে না—কোথায় সে যাইবে বা সহরের দর্শনীয়ই বা কি আছে?

কে, এল্, এম্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ওয়েলকাম টু ক্যাল্কাটা' (স্বাগত কলিকাতা) পুস্তিকাটি এদিক হইতে একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছে। কলিকাতার বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সহরের উৎপত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়া সুরু করিয়া আধুনিককালের সুখসুবিধার বিভিন্ন চিত্র পর্য্যন্ত ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

সহরের প্রধান অংশের একটি মানচিত্র, ডাক বিভাগের তথ্য, বিনিময় হার, বানিজ্য দূতদের পরিচয় এবং অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানাদি ও বিপনীর পরিচয় পুস্তিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। বহু চিত্রে শোভিত করিয়া বহু বর্ণে মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত করায় পুস্তিকাটি বিশেষ আকর্ষনীয় হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কেবল সমাগত বাহিরের লোকের জন্য নয়, কলিকাতাবাসীদেরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য বহু বিষয় রহিয়াছে। আমরা আনন্দের সঙ্গেই বলি—কে, এল্, এম্, পুস্তিকাটি নূতন ধরনের প্রচার কার্য্যের একটি স্মরনীয় দৃষ্টান্ত।

স্বয়ংসিদ্ধা:—উপন্যাস: ২য় খণ্ড। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—৪৷৷০ টাকা মাত্র।

মণিবাবু বাংলার খ্যাতিমান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও মণিবাবুর দান অসামান্য। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'স্বয়ংসিদ্ধা' ইতিপূর্ব্বে চিত্রে অভিনীত হইয়া চিত্রনাট্যজগতে বিশেষ সাড়া জাগায়। ইহার অসামান্য সাফল্যের উপরেই আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড রচনার প্রয়াস। জমিদার হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ চণ্ডীর চরিত্রে আধুনিক নারীসমাজের উপর অসামান্য আলোকসম্পাত করিয়াছে। মণিবাবুর দৃষ্টি ভারতীয় দৃষ্টি; ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের তিনি সাধক। ভারতীয় নারীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; সেই আদর্শেরই উত্তরসাধিকা চণ্ডী। চণ্ডীকে বাদ দিয়া স্বয়ংসিদ্ধা রামহীন রামায়ণের মতই। বোকা ও হাবা স্বামীকে সত্যিকারের জীবনধর্ম্মে উন্নীত করিয়াই সে জমিদার হরিনারায়ণের যাবতীয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণাভার নিজের হাতে পাইল এবং সুচারু দক্ষতার সঙ্গে আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। দ্বিতীয় খণ্ডে চণ্ডীকে আরও বহুতর সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু ভগবান যাহাকে দিয়া নিজের কার্য্য সাধন করান, কোনো প্রতিকূলতাই তাহার পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে না; চণ্ডীর কাছেও পারিল না। এমন কি দুর্দ্দণ্ড পুলিশ অফিসারকেও সে নিজের বুদ্ধির বলে পরাভব স্বীকার করাইতে বাধ্য করিল। গ্রন্থের উপসংহারে ইহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের

ইঙ্গিত আছে। চণ্ডীকে তবে জীবনের বহুতর বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অপরাজিতা নারীরূপে দেখা যাইবে। কিন্তু আমরা বলিব, তৃতীয় খণ্ডে ইহার জের না টানিয়া আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেই স্বয়ংসিদ্ধার সম্পূর্ণ আখ্যায়িকাটি সমাপ্ত করিলে পাঠকচিত্ত অধিকতর তৃপ্ত হইত। মণি বাবুকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সোনা রূপা:—কিশোর উপন্যাস। শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা। কেতাব ভবন, কলিকাতা। মূল্য—সাত সিকি—মাত্র।

লেখিকা আধুনিক বাংলা ছোট গল্পে বিশেষ সুনাম র্জ্জনও করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ১নং ও ২নং গল্প-গ্রন্থখানি আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহাই লেখিকার সেরা পরিচয় নয়। বাংলার বালক বালিকা-দিগকে আনন্দের মধ্য দিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দানই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে তিনি বহু দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন বলা চলে। রূপক ও সোনা নামে দুইটি ছেলেমেয়েকে লইয়া আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন এ্যাড্‌ভেঞ্চার জাতীয় রহস্য আছে, অন্যদিকে আদর্শ ও প্রাণঃশীলতারও অভাব নাই। সব মিলিয়া সোনা রূপা একখানি মনোজ্ঞ উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানি রচিত, তাহারা ইহাতে আনন্দ পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মাধুকরী: কাব্যগ্রন্থ। শ্রীসুধীর গুপ্ত। এম্, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে 'মাধুকরী'র কবির 'যাযাবর' কাব্যগ্রন্থখানি আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। 'মাধুকরী' 'যাযাবরের' পরবর্ত্তী কাব্য। যাযাবরে যেমন একটি শান্ত দীপালোকের মধুর স্পর্শ পাওয়া গিয়াছিল, 'মাধুকরী'তেও তেম্‌নি একটি উজ্জ্বলন্ত শুকতারার মাধুর্য্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 'কল্পনার রসঘন অমৃত-লোকের সহজ সুষমা এ যুগের বৈশ্যবুড়োর বস্তুস্ফীতিতে বিনষ্ট প্রায়; তাই আজকাল হৃদয়রসের কবিতা একান্তই উপেক্ষিত।' গ্রন্থ-সূচনায় এই কবিভাষ্য হইতেই মাধুকরীর কবিতাগুলি সম্পর্কে পাঠকের মন সচেতন হইয়া ওঠে। যন্ত্রবিক্ষুব্ধ এই কোলাহল-মুখরতার যুগে এমন একখানি বিশুদ্ধ হৃদয়রসে সঞ্জাত কাব্যগ্রন্থ বিভ্রান্ত পাঠকচিত্তকে অনেকখানি প্রশমিত করিবে বলিয়াই মনে করি।

'দেয়ালপঞ্জী' ও 'বাঙালীর পাঁজি'

আমরা আনন্দের সঙ্গে কিরীট এ্যাড্‌ভারটাইজিং এজেন্সী ও ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের ১৩৫৮ সালের বাংলা দেয়ালপঞ্জী ও বাঙালীর পাঁজির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। পরিচ্ছন্ন ছাপা ও মনোরম প্রচ্ছদশিল্পের জন্য 'দেয়ালপঞ্জী' ও 'বাঙালীর পাঁজি' বিশেষ আকর্ষনীয় হইয়াছে। কিরীট এ্যাড্‌ভারটাইজিং-এর কিরীটবাবু জন্মের পর হইতেই অন্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনধর্ম্মে তিনি নিষ্ক্রিয় নন্। একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচার বিভাগীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই উদ্যম ও নিষ্ঠাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী সম্পর্কে আজ আর নতুন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্য দেশের শিল্প ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইটি প্রতিষ্ঠানই দেশের গৌরবস্বরূপ। আমরা তাঁহাদের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড ও সংস্কৃত পরীক্ষা

ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গের নিকট মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের পরিবর্ত্তে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া বোর্ড স্থির করিয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন কর্ত্তৃত্ব বা দায়িত্ব থাকিবে না, বোর্ডই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে।

সম্প্রতি বোর্ড স্থির করিয়াছে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বাঙ্গালায় ২০০, ইংরাজীতে ১০০, ইতিহাসে ১০০, ভূগোলে ৫০, বিজ্ঞানে ৫০, এই ৫০০ নম্বর এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে ৩০০ নম্বর নির্দ্ধারিত হইবে। এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃতও আছে, অর্থাৎ সংস্কৃত বিষয়টি থাকিবে ইচ্ছাধীন।

সংস্কৃত স্থায়ী বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত না হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আমরা বোর্ডকে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া সংস্কৃতকে স্থায়ী বিষয়ে পরিণত করিতে অনুরোধ করি। সংস্কৃতের ঐতিহ্য বিশ্ববিশ্রুত—সংস্কৃত মন্ত্রে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়, সংস্কৃত স্তব এবং মন্ত্রে পূজাদি হিন্দুর যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, চারু দত্ত, মৃচ্ছকটিকা জগতের ইতিহাসে প্রশংসিত, বর্ত্তমান যুগের নাট্যশালার বিশ্বকোষও কালিদাসকে ভারতের নাট্যকলার ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়াছে, সর্ব্বোপরি সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী। বাঙ্গলা ভাষার সমৃদ্ধিই সংস্কৃত ভাষার জন্য—

"দেব ভাষা পৃষ্ঠে যার
কিসের অভাব তার—
কোন্ ভাষে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন?"

এক সময়ে সংস্কৃতের গৌরব খুবই ছিল, কিন্তু ক্রমে খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। মধ্যযুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও গুরুপনেয় অপরাধ ছিল, তাহারা বাঙ্গলা ভাষাকে নিতান্ত অস্পৃশ্য মনে করিতেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও মেকলের চেষ্টায় সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার স্থানে ইংরাজীই রাজভাষারূপে প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল—ভারতের সমস্ত জাতি ঐক্য বন্ধনের সুযোগ পাইয়াছিল এবং তারতম্যে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষারও প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিবার সক্ষমতা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় আমাদের মাতৃভাষা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আবশ্যকীয় ইংরাজী ভাষাও ন্যায়সঙ্গত ভাবেই পরীক্ষায় স্থায়ী বিষয়রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আজ বিশেষতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে সময় আসিয়াছে অত্যাবশ্যকীয় দেবভাষাকে ইহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদান করিতে। এই সময়ে যদি সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করি অথবা নিকৃষ্ট স্থান দেই, তবে কেবল ঐতিহ্যের দিক্ হইতে নহে, সংস্কৃতির দিক হইতে, ধর্ম্মচর্চ্চার দিক হইতে এবং অত্যাবশ্যকতার দিক হইতেও অন্যায় হইবে। সুতরাং আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি মনোযোগী হইতে পুনর্ব্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। গণিত সম্বন্ধেও আমাদের মত অনুরূপ।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

এবার বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশের বৃহত্তর কল্যাণকল্পে যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহা উক্ত অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের

সমানাধিকার, সকলের জীবিকার্জ্জনে সমান ও পূর্ণ সুযোগ প্রদান, দেশের ধনাগম ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক কথা এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে, ভাষা এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্যে প্রদেশের পুনর্গঠনের ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ শাসনের কথাও আছে।

এই পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই। ইহা যেমন ভাল, সোসিয়ালিষ্ট পার্টির পরিকল্পনাটিও তুল্যরূপ উৎসাহ সঞ্চারী। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, পরিকল্পনায়ই কেবল কাজ হয় না। গত নির্ব্বাচনের সময়ের (১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে) পরিকল্পনায় সংস্কৃতি ও ভাষার পার্থক্যে প্রদেশের গঠনের কথা স্পষ্টাক্ষরে ছিল। কিন্তু কোন চেষ্টা হয় নাই। যদি সেরূপ ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকিত তবে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে অবাধে যাওয়ার সুবিধা হইত এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে সমাগত উদ্বাস্তুদের এত লাঞ্ছনা হইত না। কিন্তু কোনরূপ চেষ্টা পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি কোন উচ্চ পদস্থ কর্ত্তৃপক্ষই করেন নাই। পশ্চিম বাঙ্গালার কংগ্রেস হইতেও কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যদি হইত—তবে এত বিলম্বে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বক্ষণে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মানভূম প্রভৃতির বাঙ্গলা দেশের সহিত অন্তর্ভুক্তির কথা তুলিতেন না। তিনি পূর্ব্বে কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন, এখন সম্প্রতি সভাপতি হইয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে বহুপূর্ব্ব হইতেই এরূপ প্রস্তাব আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। যাহা হউক, এখনও যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে এবিষয়ে কাজ হইতে পারে, কারণ প্রস্তাবটি নূতন না হইলেও খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত জওহরলাল বরাবর বলিতেন—স্বাধীনতা পাইলে আমরা অন্ন বস্ত্র এবং বাসস্থানের সংস্থান ও ব্যবস্থা করিব। কিন্তু কিছুই তিনি করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমেরিকা ও চীন হইতে চাউল আনিবার চেষ্টা হইতেছে সুখের কথা। কিন্তু চাউলের অভাবে,উৎপাদনের অভাবে, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ চাউলের মূল্য এত বাড়িয়াছে যে দেশ আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এবিষয়ে অনেকে মনে করেন—কণ্ট্রোলই এই শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ, ইহাতে চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বস্ত্রের অবস্থাও প্রায় সেইরূপই। আর বাসস্থানের কথা না তোলাই ভাল। মহাত্মাজী বরাবর কণ্ট্রোল উঠাইবার পক্ষেই ছিলেন। এদিকে গভর্ণমেণ্ট মনে করেন—কণ্টোল কিছুতেই তোলা যাইতে পারেনা। সকলের কাছে বলা হয় বস্ত্র এবং চিনির কণ্ট্রোল তোলার ফলে ঐ সব জিনিষের মহার্ঘ্যতা আরও বাড়িয়াছে। তাই যদি চাউলের কণ্ট্রোলও তোলা হয়, চাউলেরও সেই অবস্থা হইবে। সামান্য তর্ক বিতর্কের পরে বাঙ্গালোরে পণ্ডিত জওহরলালের কণ্ট্রোল রাখিবার প্রস্তাবই অনুমোদিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে আমাদের মত এই, কন্‌ট্রোল তুলিয়াও গভর্ণমেণ্ট যদি চাউল, বস্ত্র, চিনি যাহারা গোপন করিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেইসব ব্যক্তিদিগের উপর খড়্গহস্ত হইতেন, যেমন তিনি বলিয়াছিলেন—চোরাকারবারী-দিগকে ফাঁসি দিবেন, তবে জিনিষের অভাব হইত না, মূল্যও বৃদ্ধি পাইত না। সে শক্তি বা সাহস গভর্ণমেণ্টের যখন নাই, তখন কণ্ট্রোল না রাখিয়া উপায় কি? কিন্তু অবস্থা যে ক্রমেই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইবে—আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।

ধর্ম্মনিরপেক্ষ শাসন কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াও পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ কর্ত্তাগণ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতে ধর্ম্ম নিরপেক্ষতাই প্রধান কাম্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে পাকিস্থান আমাদের উপরে কেবল হুমকী দিয়াই যাইবে আর আমরা কেবল ধর্ম্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া নীরবে আপোষমূলক ভাবে তাহা কেবল সহ্য করিয়াই যাইব। দিল্লী চুক্তি প্রতিপালিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাণে জোর নাই। আপত্তি জানাইয়াই খালাস। এ বিষয়ে জনাব লিয়াকত আলীকে আবার আহ্বান করিয়া একটা হেস্তনেস্ত না করিলে অর্থাৎ অনাচার চলিতে থাকিলে, যাহারা মরিয়া হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বা মুসলমানদের দাসের

স্থায় থাকিবেন, এমন হিন্দু ব্যতীত অপর সকলেই পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। আর যাহারা অনিচ্ছুক নয় এমন মুসলমানদিগকে পাকিস্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থায় পাঠাইতে আমরা কোনরূপ চেষ্টা করিব না, ইহা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়।

যাহা হউক, এইসব বড় বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না তুলিয়া বা বাক্যব্যয় না করিয়া কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সহিত যে কয়েকটি বিষয়ে বাঙ্গালোরে পণ্ডিতজীর মতদ্বৈধ হইয়াছে, সে বিষয়েই কিছু উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ, ওয়ার্কিং কমিটির পুনর্গঠন প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট টেণ্ডনের সহিত নেহরুজীর মতদ্বৈধ হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রেসিডেন্টের মতটিকেই সমর্থন করি। তিনি বলেন, "আমি চ'লে গেলে যদি অবস্থা ভাল হয়, আমি চ'লে যেতে প্রস্তুত," কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সমর্থন পান নাই। অর্থাৎ তিনিই সভাপতি থাকিবেন স্থির রহিল। তবে ওয়ার্কিং কমিটি ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠনের তিনি বিরোধী। এ বিষয়ে জওহরলালজী পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি পদত্যাগের ভয় প্রদর্শন করেন। তৎপরে আর বিষয়টি অগ্রসর হয় নাই। তবে ওয়ার্কিং কমিটি হইতে যে দুইজন পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থলে পণ্ডিতজী-মনোনীত দুইজনকে গ্রহণ করিতে টেণ্ডনজী প্রস্তুত আছেন। আমাদের মতে টেণ্ডনজীর মতই সমর্থনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে জনাব কিদোয়াই যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, আমরা তাহা মোটেই সমর্থন করি না। তিনি দুধও খাইতে চাহেন, তামাকও খাইতে চাহেন। প্রজা পার্টিতেও যান, আবার কংগ্রেসেও থাকিতে চাহেন। যদি প্রজা পার্টির সভ্য হইতে আপত্তি ছিল, তবে পাটনা গিয়াছিলেন কেন? তিনি যে বলেন, কংগ্রেস চাহেন কিন্তু হাইকম্যাণ্ড চাহেন না, ইহাতেও আমাদের আপত্তি আছে। কংগ্রেস মানিলেই কংগ্রেসের বিধি-নিয়ম মানিতে হয়। এই হাইকমাণ্ড নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দ্বারাই অনুমোদিত হয়। যদি তাহারা অন্যরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে উহাও মানিতেই হইবে। আমাদের মনে হয় জনাব কিদোয়াইকে ওয়ার্কিং কমিটিতে না নিয়া টেণ্ডনজী বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। কারণ যে ব্যক্তি সব দিকেই আছে—যে ভয়ঙ্কর লোক—তাহাকে পরিবর্জ্জন করাই বিধেয়। কিন্তু তাঁহাকে লওয়ার জন্য নেহরুজী যে পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন বা প্রশংসা কিছুই আমরা করিতে পারি না।

মোট কথা, যত অধিবেশন বা সভাই হোক না কেন—কংগ্রেস আজ অবহেলিত। সরকার যাহা করেন কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিয়াই করেন, পরে তাহা অনুমোদন করাইয়া লয়েন। কংগ্রেসও ভয়ে ভয়ে অনুমোদন না করিয়া পারেন না, কারণ নির্ব্বাচন-সময়ে সরকারের সাহায্য একান্ত আবশ্যকীয় হইবে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ কংগ্রেসের এই দুরবস্থায় বা দুর্ব্বলতার অবস্থায় বিশেষতঃ সমস্ত বদনামের অংশী যখন কংগ্রেস, তখন আমাদের উপদেশ—কংগ্রেস যদি মাথা তুলিয়া জাতির রক্ষাকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠা চাহেন, তবে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইবে নির্ব্বাচনের ভার পণ্ডিতজীর উপরে ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্ববিধ গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা। কারণ নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিলে কংগ্রেসের যাহা কিছু সুনাম অবশিষ্ট আছে, তাহাও একেবারে যাইবে। আর যদি গঠনমূলক কার্য্যে কংগ্রেস সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারে, তবে এমন গভর্ণমেণ্ট নাই যে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ কোনরূপ উপেক্ষা বা অবহেলা করিতে পারে! কংগ্রেসের কি সেইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হইবে? আমরা ভারতীয় কংগ্রেসের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই কংগ্রেসকে নির্ব্বাচন ছাড়িয়া গঠনমূলক পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিতেছি। কিন্তু কংগ্রেস কি তাহাতে কর্ণপাত করিবে?

বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা

সম্প্রতি কলিকাতায় আবার উদ্বাস্তুর ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বপাকিস্থান-আগত। এতদ্ব্যতীত বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যাও কম নয়। ইতিপূর্ব্বে যখন বাংলা দেশ হইতে একটি বৃহত্তর সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে ভারতের স্বতন্ত্র প্রদেশগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম—বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রদেশে গিয়া বেশী দিন তাঁহারা টিকিতে পারিবেন বলিয়া

ভরসা কম। আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে চলিয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বসতি সচিব বলিয়াছেন—বিহার ও উড়িষ্যার জলবায়ু তাঁহাদের সহ্য না হইবার ফলেই এই উদ্বাস্তুবৃন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। কেবল জলবায়ু নয়, রাজনৈতিক আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক দুর্গতি বলিলেই বরং ঠিক হইত। বিভিন্ন প্রদেশের পুনর্ব্বসতিকেন্দ্রে পাঠাইয়াও কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বাস্তু পরিবারদের যথোপযোগী দৈনন্দিন প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। এদিকে খাদ্য ও বস্ত্রসংকট সারা ভারতে আজ দুর্ভিক্ষের আকারে দেখা দিয়াছে।

এদিকে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায় বহু সংখ্যক পরিবার পূর্ব্বপাকিস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নিরাপত্তার আভাষ তাঁহারা কোথাও দেখিতে পান নাই। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলিয়াছেন—নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি পূর্ব্ববঙ্গে এক্ষণে যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবোধের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সম্পর্কে পশ্চিম বাঙ্গলার প্রদেশপাল, ডক্টর কাটজু এবং ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস হওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ঘুরিয়া উদ্বাস্তু পরিবারদের মুখ হইতেও এই নিরাপত্তার অভাবের কথাই শুনিয়াছেন। অতএব ইহাকে আর চাপিয়া রাখিবার উপায় নাই।

নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির সময়েই আমরা ইহার অসারতা সম্পর্কে সরকার এবং জনসাধারণকে সচেতন করিয়া বলিয়াছিলাম—ইহা দুষ্টক্ষতে সাময়িক প্রলেপ মাত্র, ইহা দ্বারা শান্তি আসিতে পারে না, এ পথ শান্তির পথ নয়। কিন্তু সরকারী মহল সে-কথার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। চুক্তির দ্বারা পাকিস্থানই বরং লাভবান হইয়াছে; ভারতকে পাকিস্থানের নিকট অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা দ্বারা পাকিস্থান সরকার কাশ্মীরকে ভোলেন নাই, অথবা পূর্ব্ব পাকিস্থানের অবস্থাও সন্তোষজনক করিয়া তোলেন নাই। লিয়াকৎ আলী প্রতি মুহূর্ত্তেই তারস্বরে কাশ্মীর লাভের ধ্বনি তুলিয়া আসিতেছেন, যে ধ্বনিকে জাফরুল্লা খাঁ বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিধ্বনিত করিয়া বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ যতই কাশ্মীরে গণভোটের প্রস্তুতি চলিয়াছে, পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের মন ততই বিপদাশঙ্কায় বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। তেমন কিছু একটা সমরাত্মক সমস্যা উপস্থিত হইলে (যদিচ ভারতের মোটেই সেরূপ ইচ্ছা নাই) পাকিস্থানে যে পুনরায় সংখ্যালঘুদের উপর নারকীয় লালা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে-ইহাতে আজ আর সন্দেহ রাখিবার কারণ নাই। যদিও নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফলে নরহত্যার ব্যাপারটা আপাততঃ বন্ধ আছে, কিন্তু লুণ্ঠন ও নির্য্যাতনের অভাব ঘটে নাই। ইহার উপর রহিয়াছে অর্থনৈতিক দুর্গতি, সর্ব্বোপরি স্ত্রীলোকগণের মনের আতঙ্ক। নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বলিয়া আজ আর কিছু নাই। পণ্ডিত জওহরলালও স্বীকার করিয়াছেন—দিল্লীচুক্তি সংখ্যালঘুদের মনে শান্তি আনিতে পারে নাই। অতএব কোন্ ভরষায় এবং প্রাণের কোন্ শক্তিতে সেখানে মাটি কামড়াইয়া থাকা সম্ভব? বাধ্য হইয়া তাই আবার দলে দলে লোক আসিয়া জমায়েৎ হইতেছেন শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনে। ভারতীয় পুনর্ব্বসতি সচিব ও সংখ্যালঘু মন্ত্রীও এই সত্যের প্রচ্ছন্ন আভাষ দিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত জৈনের একটি উক্তি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার আছে। গত ৮ই জুলাই কলিকাতা কংগ্রেস অফিসে কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক সভায় তিনি বলেন—

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বসতি দপ্তর নীতি গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোনো উদ্বাস্তু যদি সরকারী শিবির বা পুনর্ব্বসতি কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় অথবা পুনর্ব্বসতির সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে ঐ উদ্বাস্তু সম্বন্ধে পুনর্ব্বসতি দপ্তর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

অনুরূপ একাধিক ঘটনা পূর্ব্বে ঘটিবার ফলেই হয়ত তিনি পুনর্ব্বসতি দপ্তরের এই নীতিটি ঘোষণা করিয়া থাকিবেন! কিন্তু ঘটিবার কারণ কি, তাহা তিনি সংবেদনশীল চিত্তে অনুসন্ধান করিতে যান নাই। আশাহীন ভরষাহীন উদ্বাস্তু পরিবারেরা যে আশ্রয় ও সাশ্রয়ের প্রত্যাশায় প্রাণ লইয়া এখানে আসিয়াছেন, সে আশ্রয়

এবং সাশ্রয় হইতে তাঁহারা এখনও প্রায় বঞ্চিতই বলা চলে। প্রয়োজনের এক সহস্রাংশও তাঁহাদের মেটানো হয় নাই। ইহা তাঁহাদের অপরাধ না কর্ত্তাদের অক্ষমতা? স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। প্রয়োজনীয় কার্য্য-ব্যবস্থার পক্ষে ইহা কি যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু কার্য্যকরী কোনো ব্যবস্থাই সার্থক হইয়া ওঠে নাই। একাধিক উদ্বাস্তু পরিবারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার প্রতি সরকার দণ্ডবিধানও করিয়াছেন; কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। বাংলায় এখনও এত জমি খালি পড়িয়া আছে—যেখানে উদ্বাস্তু পরিবারদের স্বচ্ছন্দ পুনর্ব্বসতি হইতে পারে। বাংলা সরকার এবং প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায় তাঁহাদের সাধ্যমত সমস্যা সমাধানের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিলেও এখনও তাহা যথেষ্ট নয়। আর ভারত সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় না।

কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝিয়াছি, ভারত সরকার মনে করেন—উদ্বাস্তু সমস্যা একটা কণ্টক বিশেষ। যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন ইহা মিটাইতে চেষ্টা করিতে হইতেছে, আর ইহাতেই ভারতবাসীর নানাদিক হইতে সমুত্থিত অভাব দূর হইতেছে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ এবং ইহাতেই সাফল্যের পথে পদে পদে বাধা জন্মিতেছে। প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত ছিল—দেশবিভাগ যখন রাজনৈতিক কারণে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল, তখন ইহার ফলে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের যে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা হইবে, তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখা। তাহা না করিয়া একটু দয়া দেখাইয়া কিছু কিছু করিয়া অথচ সমস্যার সমাধানে সক্ষম না হইয়া যে অপারগতা এবং ব্যর্থতা অর্জ্জন তাহারা করিয়াছেন, তাহা কেবল উপরোক্ত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই। কংগ্রেস কর্ম্মীদেরও সম্মুখে অগ্নি পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। যদি গভর্ণমেন্টের অর্থে গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের পরার্থপরায়ণ সেবকবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায়মনোপ্রাণে উদ্বাস্তুদের অভাব অভিযোগ দূরীভূত করায় আত্মনিয়োগ করিতেন, তবে সরকারের এবং কংগ্রেস কর্ম্মী ও দেশ-সেবকগণের প্রশংসার অবধি থাকিত না। এবং ভিন্ন ভিন্ন সহানুভূতিকারী উপদলেরও উদ্ভব হইত না। পরন্তু এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেসের যে সুনাম অৰ্জ্জিত হইত, তাহার জোরে আজ আর তাহাকে বিবিধ অসম্ভব পরিকল্পনাও দিতে হইত না বা নিজেদের মধ্যে এত মতভেদেরও উদ্ভব হইত না।

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানকল্পে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ যে মানভূম প্রভৃতি স্থান বাঙ্গলায় অন্তর্ভুক্ত করিতে এতদিন পরে একটী পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় ভাল, আর যদি না হয় বা হইতে বিলম্ব হয়, তবে কি কংগ্রেস ও সরকার চুপ করিয়া বসিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিবে? কাজতো করিতেই হইবে! হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এখনও এত জমি আছে যে, সরকার তাহা রিকুইজিসন বা একুইজিসন করিয়া উদ্বাস্তুদের বাসোপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কৃষিজীবি, বারুজীবি, শাঁখাড়ী পাটীকার প্রভৃতি কিছুদিন সহায়তা পাইলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারিবে। আমরা দেখিয়াছি—বংশবাটী, ত্রিবেণী, দেবানন্দপুর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থানের সাত আটটি গ্রামেই বহু সহস্র লোকের বাসোপযোগী স্থান হইতে পারে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়ায়ও যথেষ্ট জমি আছে। এখনও যদি ছয়মাসকাল কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এ বিষয়ে তৎপর হইয়া এক-প্রাণতার সহিত আত্মনিয়োগ করেন, কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের সম্পূর্ণ সহযোগিতাকল্পে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেন তবে কংগ্রেস একটা প্রকাণ্ড গঠনমূলক কাজে সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

এ বৎসরের আই-এ ও আই-এস্‌-সি পরীক্ষার ফল

বর্ত্তমান বৎসরে আই, এ পরীক্ষায় শতকরা ২৬·৫ এবং আই, এস্‌-সি পরীক্ষায় শতকরা ৩২·৬ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর এই দুই পরীক্ষায় শতকরা উত্তীর্ণের হার ছিল যথাক্রমে ২৯·২ ও ৩১·৬ জন। এ

বৎসর আই, এ পরীক্ষায় মোট ১০৬৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২১ জন প্রথম বিভাগে, ১৭০১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৫৩৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুত্তীর্ণদের মধ্যে ৮১০ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। অপর পক্ষে এ বৎসর আই, এস্-সি পরীক্ষায় মোট ১২৪১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৮৫ জন প্রথম বিভাগে, ১৮২৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২৩৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ১১৭৮ জন ছাত্র কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারিবে।

গত বৎসরই উত্তীর্ণ হারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা দেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা ক'রয়াছিলাম। এ বৎসরের হার তদপেক্ষাও ন্যূন। পরীক্ষা বিষয়টিকে কঠিন করিয়া পাঠ্য বস্তুর মান উন্নত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাছাই বাছাই কৃতী সন্তানকেই মাত্র প্রতি বৎসর পাশের সুযোগ দেওয়া যদি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে শিক্ষা ও উত্তীর্ণের হার সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই ; কিন্তু আর একটি জরুরী দিক আছে— যাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে যদি হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় কেবল অকৃতকার্য্যই হইতে থাকে, তবে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে কতজনের আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে, ছাত্রছাত্রীদের অনেকে আজ নানা আন্দোলনে যুক্ত হইয়া অধীত বিষয়ের প্রতি ক্ষীণ মনোযোগসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং অনেকের মধ্যেই অনেক সময় বিদ্যাভবন-বিরাগ লক্ষ্য করা যায়। তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন কলেজ সমূহকে চাপ দেওয়া। কলেজগুলিও তবে নিজেদেব এবং অভিভাবকদের মাধ্যমে ছাত্রদের চিত্তবৃত্তি সংশোধনে উদ্যোগী হইতে পারে।

যে ছেলে পড়াশুনা করে নাই, সে পাশ করিতে পারে না, ইহা সাধারণ কথা, কিন্তু এইভাবে একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাও চলিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া পাশের হার বাড়ান, একথা আমরা বলিতে চাই না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহকে চাপ দিয়া, একমাত্র উপযুক্ত ছাত্রদিগকেই যাহাতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়, এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। অন্যথায় শুধু বেকার সংখ্যারই বৃদ্ধি নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও ব্যাপকতর সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য। সেই সঙ্কটকে রোধ করা শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও সম্ভব হইবে না। আমরা এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং বাংলার বিভিন্ন কলেজগুলিকেও এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

কায়েসং বৈঠক

কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কিত বহুতর অগ্নুদ্গার ও তিক্ত আলোচনার পর 'কায়েসং বৈঠক' লক্ষ্য করা গেল। কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির আলোচনা সম্পর্কেই এই বৈঠক। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রণাঙ্গনে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায়, তবে অষ্টম আর্মির ইস্তাহারে টহলদারী তৎপরতা অব্যাহত থাকে বলিয়া জানা যায়। কায়েসং-এ যুদ্ধবিরতি আলোচনায় উত্তর কোরিয়গণ তিনটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন বলিয়া মস্কো বেতার ঘোষনা করেন। প্রস্তাব তিনটি এই : (১) সমগ্র রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে, (২) ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী অপসরণ করিতে হইবে, এবং (৩) কোরিয়া হইতে বৈদেশিক বাহিনী সরাইয়া লইতে হইবে।

প্রস্তাব তিনটি ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উপরেই ভিত্তিশীল।

উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিষ্টদের প্রধান প্রতিনিধি জেঃ নাম ইল কোরিয়ার জনসাধারনের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন : (১) উভয় পক্ষের মধ্যে মূল বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার সামরিক কার্য্যাবলী বন্ধ রাখার জন্য যুগপৎ আদেশ দিতে হইবে ; এবং (২) উভয় পক্ষের সেনাদল বোমাবর্ষণ, অবরোধ এবং অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য বন্ধ রাখিবে।

এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিক গত ২৩শে জুন যখন যুদ্ধবিরতি ও শান্তি-

জন্য উভয় যুদ্ধমান পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার এবং ৩৮° অক্ষরেখা হইতে উভয় পক্ষের সৈন্য সরাইয়া আনার প্রস্তাব করেন, জেনারেল নাম ইল

তখনই ইহাতে সাড়া দেন। কিন্তু মিঃ জ্যাকবের বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতির ইঙ্গিত বোধ করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য বহু সদস্য কটু মন্তব্যে তৎপর হইয়া ওঠেন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম এবং পরেও দেখিলাম। আরও একটি বিষয় লইয়া ঈষৎ তিক্ততার কারণ উপস্থিত হইতে দেখা গেল। তাহা হইতেছে ভাইস্ এ্যাড্‌মিরাল জয়ের মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রপুঞ্জ-নির্দ্ধারিত ২০ জন সাংবাদিককে লইয়া। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্টরা তাঁহাদের কায়েসং প্রবেশে আপত্তি জানাইলেও পরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈঠকে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন নাই। ইহার পিছনে যে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রিয় কারণ রহিয়াছে, উহা একেবারে উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়।

এদিকে টোকিওর একটি সংবাদও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। উত্তর কোরিয়ার জেনারেল নাম ইলের যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট্ সীংম্যান রীর মনঃপূত হয় নাই। তিনি স্পষ্টই ঘোষনা করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিতরূপ যুদ্ধবিরতি কার্য্যে পরিণত হইলেও তাহা তাহার পরামর্শের ব্যতিক্রমে এবং তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেই হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

অর্থাৎ সরাসরি উপেক্ষা না করিয়া প্রস্তাবের প্রতি নেপথ্যে থাকিয়া একটি ঢিল নিক্ষেপ করিয়াছেন সীংম্যান রী। যুদ্ধবিরতি আন্দোলনে তাঁহার খুব বেশীকিছু আসে যায় বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। সমগ্র কোরিয়ার প্রতি তাঁহার আগাগোড়াই পূর্ণগ্রাসের লক্ষ্য। পিছনে রহিয়াছে মার্কিণী শক্তি। কিন্তু ৩৮° অক্ষরেখা ভেদ করিয়া উত্তর কোরিয় বাহিনী যখন তাঁহার শেষ ভূমিখণ্ডকে সাঁড়াসীর মতো ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন তিনি কিছু বিচলিত না হইয়া পারিলেন না। সাহায্য-কামী মার্কিণ-শক্তি প্রমাদ গণিয়া একটা কিছু অনুকূল নিষ্পত্তির যন্ত্র আবিষ্কারে তৎপর হইয়া উঠিল। কারণ কোরিয়ার এই সামান্য যুদ্ধের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী শান্তি আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর কোনো মানুষই যে যুদ্ধ চায় না, যুদ্ধমান জাতিগুলির পক্ষে আজ ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করা লইয়া এ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়া গেল। সেই চীনই আজ উত্তর কোরিয় বাহিনীর একটি বড় শক্তি। চীনা সেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল তুং হুয়া জেনারেল নাম ইলের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলেন যে, তিনি জেনারেল পেংতে হুয়েই-এর নির্দ্দেশে যুদ্ধ বিরতি আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। এবং তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষনা করেন যে, কোরিয়ার শান্তি স্থাপন ও চীনের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই চীনা গণস্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কোরিয় গণফৌজের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে।

ইহার পিছনে যে কারণ না রহিয়াছে, তাহা নয়। চীনে চিয়াং কাইসেককে অবলম্বন করিয়া মার্কিনী শক্তি সমগ্র চীনের উপর দিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী রোলার চালাইতে কসুর করে নাই। তাহার বিরুদ্ধে 'নিউ ডিমোক্রাটিক্' শক্তি জাগিয়া না উঠিলে এতদিনে সমগ্র মহাচীনকে আমেরিকার দাসত্ব করিতে হইত। চীনের এই নিউ ডিমোক্রাসির সঙ্গে উত্তর কোরিয় ডিমোক্রাসির নীতিগত মিল রহিয়াছে। মার্কিন শক্তি তাই যখন দক্ষিণ কোরিয়ার মস্তকে ছাতা ধরিয়া উত্তর কোরিয়-ঝঞ্ঝা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে তাহার যথাশক্তি নিয়োগ করিল, চীনা গণস্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে তাহারা অগ্রসর হইল। ক্রমে যুদ্ধ আরও দানা বাঁধিয়া উঠিল।

কায়েসং বৈঠকের সাফল্যের উপরেই আজ ইহার নিবৃত্তি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। সীংম্যান রীর রাজন্যজনোচিত উক্তি শেষ পর্য্যন্ত কতখানি আত্মমর্য্যাদায় টিকিবে, জানি না; কিন্তু জেনারেল নাম ইলের প্রস্তাবে যে উভয় পক্ষের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, তাহাতে বোধ করি কাহারও সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। রাষ্ট্রপুঞ্জকে আমরা ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া অবিলম্বে যাহাতে কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হইয়া বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করি।

পরলোকে স্যার হরিশঙ্কর পাল

বাংলার খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল গত ৩রা আষাঢ় সোমবার সকালে তাঁহার শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

স্যার হরিশঙ্কর চিরকাল অমায়িক, মিতভাষী ও বন্ধু বৎসল ব্যক্তি ছিলেন। গত দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি আমাদের অন্যতম বীমা প্রতিষ্ঠান 'দি মেট্রোপলিটান ইনস্যুরেন্স্ কম্পানী লিঃ'-এর সহিত ইহার একজন অন্যতম ডিরেক্টর রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার ধীর-চিত্ততা, কর্ম্মোদ্যম ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে মেট্রোপলিটান কম্পানী হইতে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

স্যার হরিশঙ্কর ছিলেন কলিকাতার প্রখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী ৺বটকৃষ্ণ পালের তৃতীয় পুত্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বানিজ্য বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়া ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা ২নং ওয়ার্ড হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি 'নাইট্' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি কলিকাতার মেয়র পদ লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত স্যার হরিশঙ্কর কলিকাতার পোর্টকমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল ন্যাশ্নাল চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতা কেমিষ্ট্ এ্যাণ্ড্ ড্রাগিষ্ট্ এ্যাসোসিয়েশনের তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন।

এই ভাবে সমাজ-জীবনের নানা স্তরের সঙ্গে তাঁহার সংশ্লিষ্টতা ও অনবদ্য দান রহিয়া গিয়াছে। দানশীল

ব্যক্তি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর। বহু ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠানকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। এই জাতীয় ব্যক্তি এই যুগে সহজে মেলেনা। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কীর্ত্তিমান পুরুষকে হারাইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। প্রারম্ভ হইতেই স্যার হরিশঙ্কর মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়াই আফিস বসিলে মেট্রোপলিটানে ৭, চৌরঙ্গী রোডের নূতন বাড়ীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সমগ্র কর্ম্মীবৃন্দ এবং অফিসারগণের এক সভা হয়, ইহাতেও সভাপতি মহাশয় এইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সান্ত্বনাসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই শ্রদ্ধাপূর্ণ কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ একমত।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব

সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে আন্তর্জ্জাতিক অতিথিশালায় রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল কর্ত্তৃক মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১০৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীযুক্ত হরিসাধন ঘোষচৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং মহাকবির জীবনীকার ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার ভাষণে গিরিশ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা আলোচনা করিয়া বলেন—ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে মহাকবির দান অসামান্য। তাঁহার অনবদ্য নাট্যসাহিত্য এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং দুর্গম বন্ধুর যাত্রাপথকে কুসুমাস্তীর্ণ করিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এবং আত্মনির্ভরতার জন্য গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানবত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘোষচৌধুরী প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন,—ঠাকুরের কৃপায় মহাকবি গিরিশচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবন ও ধর্ম্মজীবনের যে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশবাসী স্মরণ করিবে। তিনি বলেন, ঠাকুর যে কালীমাতার সঙ্গে কথা বলিতেন বা মা'র কাছে চাহিয়া খাইতেন—একথা পূর্ব্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই ঠাকুরের জন্মতিথিতে মাদারীপুরে একবার সভাপতি হইতে অমত করেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ঠাকুরের অসাধারণ ভক্তি ও প্রেম বলে তিনি সবই করিতে পারিতেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিলেই জাতির মঙ্গল হইবে।—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ প্রভৃতি মহাকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' হইতে উৎকৃষ্ট আবৃত্তি করেন।

এইরূপ একটি সুচারু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ রায়বাহাদুর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত সুশীল মুখার্জ্জি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

চেতলা রামকৃষ্ণ মণ্ডপেও সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুরূপ একটি সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন নাট্যশালার বিশ্বকোষে ভারতীয় নাট্যকলার লেখক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং প্রধান অথিতির আসন গ্রহণ করেন অন্যতম গিরিশ অধ্যাপক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকিয়া মহাকবির অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক ঃ

মহিলাদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় জানাইয়াছেন যে, এই বৎসর বঙ্গ-মহিলাদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য ৪৫৲ টাকার দুইটি মোট ৯০৲ টাকার 'ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক' দেওয়া হইবে। যে কোন মহিলা বাংলা বা সংস্কৃত ভাষাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবেন: (১) 'ভারত রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান' (২) 'মানব চরিত্রে মায়ের প্রভাব'।

প্রবন্ধ আগামী ১৯৫২ সনের জানুয়ারী মাসের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে লেখিকার অভিভাবক কিংবা অভিভাবিকার একখানি সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে, প্রবন্ধ লেখিকার নিজের রচনা। গত বৎসরের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাতে "স্বাধীন ভারতে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার" সম্বন্ধে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য শ্রীমতী বিজন ভট্টাচার্য্য ৪৫৲ টাকা ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক পাইয়াছেন।

এইরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করায় পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৃক্ষ-দেবতা

[শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা
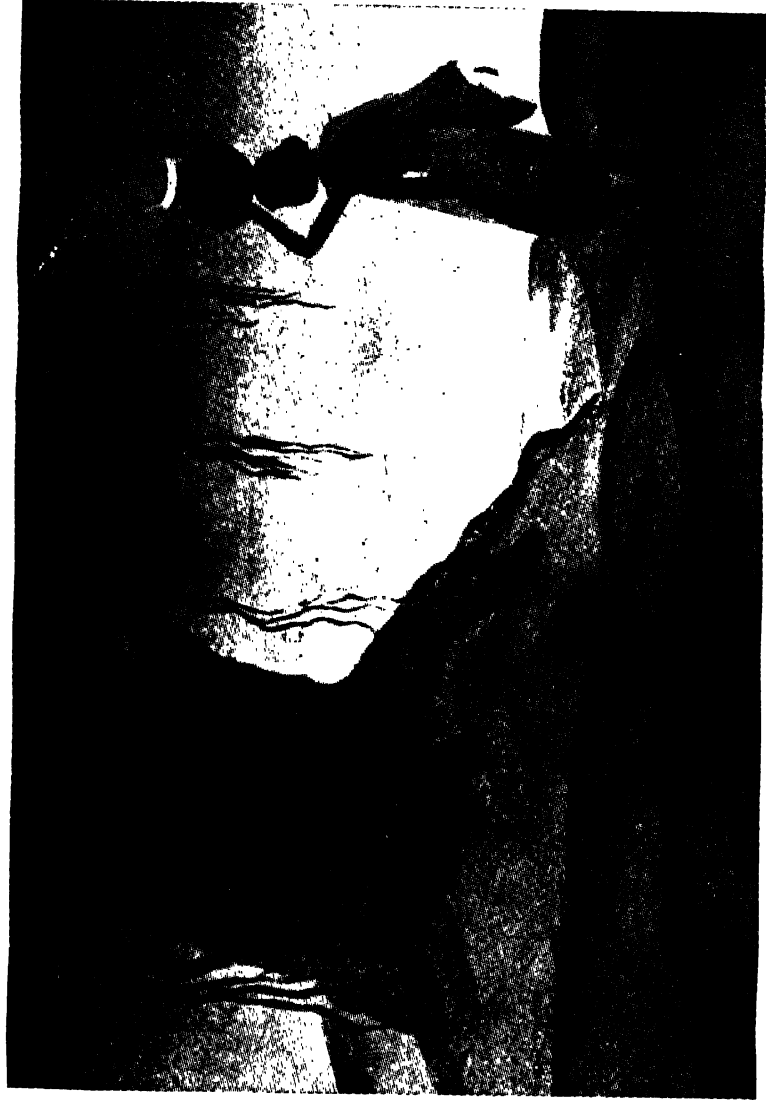
উনবিংশ বর্ষ ভাদ্র—১৩৫৮ ১ম খণ্ড-৩য় সংখ্যা

কবির গান

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাহিত্যে কবির গানের স্থান সুপ্রশস্ত নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই গান বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে গীত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা নগরেও খুব আদৃত হইয়াছিল। সাহিত্যের দিক হইতে ইহা প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যকার ফাঁক ভরিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল—ইহার কাজ ও কাল ফুরাইয়া গেলে ইহা বিদায় লইয়াছে।

এদেশে ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পল্লীসমাজে একটা নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততার ভাব আসে এবং সুশাসনগুণে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দতারও সঞ্চার হয়। পল্লীবাসীরা দেশের নব দশান্তরে একটা উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। তাহারা ঢোল-কাঁসি বাজাইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া যেমন তেমন করিয়া ছন্দ মিলাইয়া গান রচনা করিয়া গাহিতে থাকে। ইহাই কবির গান। এই গানে মৌলিকতা কিছু নাই।

বহুদিন হইতে মঙ্গল কাব্য গান, বৈষ্ণবপদাবলী এবং কিছুকাল হইতে পাঁচালী ও শাক্তসঙ্গীত প্রবাহের যে অমার্জ্জিত ও স্থূলাংশ পল্লীর অশিক্ষিত লোকদের মনে তলানীরূপে জমিতেছিল—সেই উপাদানেই এই গানগুলি রচিত। প্রাচীন কবিদের রচনার টুকরা টুকরা অংশ পল্লীর প্রচলিত ভাষার সহিত মিলিয়া এই গানের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। কবির গান ছন্দ ও শব্দালঙ্কার প্রয়োগের রীতি পাইয়াছে পাঁচালী গান হইতে এবং রাগ-রাগিণীর রীতি-প্রকৃতি পাইয়াছে সেকালে প্রচলিত লোকসঙ্গীত হইতে। রাধাকৃষ্ণ ও হর-গৌরীর লীলাবর্ণনাই এই গানের প্রধান উপজীব্য। গৌণ ও অবান্তর উপজীব্য

সেকালের লোকযাত্রা, মূলগায়ন ও পৃষ্ঠপোষকের ব্যক্তিগত চরিতকথা ইত্যাদি।

"ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্ত্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রবর্ত্তন করেন।"

(রবীন্দ্রনাথ)

কবির গান শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত—তিন শ্রেণীর লোকের রচিত। উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইতে নিরক্ষর মুচি পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর গান রচনা করিত এবং দল বাঁধিয়া গাহিত। কবির গানগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক শ্রেণী ভবানী-বিষয়ক। এই শ্রেণীর মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত ও উমাসঙ্গীত দুইই পড়ে। সাধারণতঃ আগমনী বিজয়ার গানই এই শ্রেণীর অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়—রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বা সখীসংবাদ—এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, মাথুরসঙ্গীত ও গোষ্ঠ-সঙ্গীত। সাধারণ প্রাকৃত প্রেমের গীতও এই শ্রেণীতে পড়ে। তৃতীয়—লহর, এই শ্রেণীতে নানা বিষয়ক শ্লেষাত্মক গীত পড়ে। চতুর্থ—খেউড়—ইহাতেই দাঁড়াকবির গানের পালা সমাপ্ত হয়। ইহা নিছক গালাগালি—দুইদল কবিওয়ালা থাকিলে একদল অন্য দলকে গান গাহিয়া আক্রমণ করে—অন্য দল তাহার উত্তর দেয়। যাত্রার শেষে যেমন সঙ, কবিগানের শেষে তেমনি খেউড়। খেউড়ের রুচি অতি জঘন্য। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কবির গান করিত। তাহাদের আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের ভাষা যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক তেমনি হইত। ভোলা ময়রা ও এণ্টুনি সাহেবের খেউড় গান প্রসিদ্ধ। অপেক্ষাকৃত অল্প কদর্য্য গানগুলি খেউড়ের নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঝগড়াই উদ্দেশ্য নয়—সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে মুখের মত জবাব তৈয়ারী করিয়া উত্তর দেওয়ায় যে বাহাদুরি—তাহাই দেখানোর জন্য খেউড় গাওয়ানো হইত।

তাহা ছাড়া, সেকালের লোকের রুচিতে উহা বাধিত না—অশ্লীলতা বা কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ তখনকার দিনে রসিকতার প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রোতারা রস উপভোগ করিত বলিয়াই খেউড়ের প্রচলন হইয়াছিল। ইউরোপে প্রাচীনকালে ষাঁড়ের লড়াই বাধাইয়া বা মুরগীর লড়াই বাধাইয়া যেমন আমোদ পাইত, বাঙ্গালা দেশের জমিদারেরা আমোদ পাইত কবির লড়াই-এ।

কবির গানের তিনটি ভাগ—মহড়া, চিতেন ও অন্তরা। কবির গানের একটি বিশেষত্ব—চাপান ও উতোর। শুধু খেউড়ে নয়—সকল প্রকার কবিগানেই দুই দলে লড়াই বাধিলে এক দল একটি গান গাহিয়া চাপান দিত—অন্য দল তাহার বিপরীত ভাবের কিছু গাহিয়া তাহার উতোর দিত। এই উতোর মুখে মুখে রচনা করিয়া গাহিতে হইত। যে কবিওয়ালা মুখে মুখে চমৎকার জবাব দিত—সেই কবিওয়ালাই বাহাদুর—পুরস্কারের যোগ্য। এক দল হয়ত শ্যামের গুণগান করিয়া চাপান দিল—আর এক দল শ্যামা বা রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া উতোর দিল—আবার প্রথম দল তাহার উতোর দিল। এইভাবে কবির গানের রস জমিয়া উঠিত। গুপ্ত কবি কবির গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তিনি বহু কবির গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কবির গানের কবিত্ব উচ্চশ্রেণীর নয়—কবির গান জনসাধারণের রুচির অনুগত করিয়া লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ইহাতে ভাবের গাঢ়তা বা গঠনের পারিপাট্য নাই। সে-কালের লোকে শব্দ-ঝঙ্কারের চাতুর্য্যকে উচ্চ শ্রেণীর কবিত্ব মনে করিত—সেজন্য কবির গানে শব্দ-ঝঙ্কারের ঘটাছটার সৃষ্টি-চেষ্টাই বেশী দেখা যায়। কবির গানের অনুপ্রাসকে 'অনুপ্রয়াস' বলা যাইতে পারে।

কবির গান সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা কিংবা হর-গৌরীর কথা লইয়া রচিত হইত। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে প্রচলিত টুকরা টুকরা কথা বা গর্ভবাক্য কবির গানে ছড়ানো আছে। অনেক সময় এই লীলার কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতার ভাব নষ্ট করিয়া গ্রাম্যতার দ্বারা তাহাকে বিকৃত করা হইয়াছে।

যে সকল গান লৌকিক জীবন, ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনা বিশেষ লইয়া রচিত—সে গুলিতে কিছু মৌলিকতা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন অপূর্ব্বতা নাই।

কবির লড়াইএ মুখে মুখে ছন্দ রচনা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হইত। তাহাতে কবি গায়কদের অদ্ভুত

শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত সত্য, কিন্তু কাব্যাংশে তাহা অপকৃষ্ট হইত, মিল ইত্যাদি ভালো হইত না, ছন্দও সব সময়ে ঠিক থাকিত না এবং রচনা সাধারণতঃ তালিকা-মূলক হইত। স্থান, ব্যক্তি, বস্তু, কীর্ত্তি, অকীর্ত্তির তালিকাই প্রবল হইয়া উঠিত।

কবির গানে ভাবের গাঢ়তা, গঠনের পারিপাট্য ও রুচির পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কবিগুরু বলিয়াছেন—"দেবতার কাছে অথবা বিদগ্ধ রাজা ও রাজ-সভাসদ্‌গণের সম্মুখে যে রচনা পঠিত বা গীত হয় তাহাতে লেখকের যত্ন, সতর্কতা, শালীনতার সংকোচ থাকে, শ্রোতারাও অপরিচ্ছন্ন ভাষা, ছন্দ বা রুচিতে তুষ্ট হয় না। পল্লীর জন-সাধারণ অথবা নগরের ভুঁইফোড় ধনীলোক সওদাগর অথবা ভোগবিলাসী জমিদারদের সম্মুখে গাওয়ার জন্য রচনায় কোন সতর্কতা, শৃঙ্খলা সংকোচ বা সুরুচির বালাই থাকেনা।"

কবির লড়াইকে এক প্রকারের রস কলহ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে ধামালী গানে এইরূপ রস-কলহ থাকিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা-শ্যামের মুখে এই রস-কলহ বসানো হইয়াছে। শুক ও সারীর মারফতে ও জবানীতে কৃষ্ণ রাধা লইয়া এক প্রকার রস-কলহ প্রচলিত ছিল। কবির লড়াই অনেক সময় এইরূপ কৃত্রিম রস কলহের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের আমোদ বিধান করিত। "স্ত্রীলোক ও পুরুষ পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশসূচিক দোষারোপ" রস কলহের একটি অঙ্গ।

কৃত্রিম কলহ অনেক সময় আসল কলহে পরিণত হইত, তখন কবিগান হইত তরজা। ইহাতে যে যত পারে ছন্দে ও সুরে গালাগালি করিত পরস্পরকে। ইহাতে শ্রোতাদের আরও আনন্দ হইত।

ভোলা ময়রা ও এন্টুনি সাহেবের রস-কলহ রীতিমত আসল কলহে পরিণত হইত।

আসল কবির গান ইহা নয়—আসল কবির গান লিখিয়াছিলেন—হরু ঠাকুর, রাম বসু ইত্যাদি। এগুলি —উনবিংশ শতাব্দীর পদাবলী।

কবি-শক্তি বেশী লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে না, ইহা একটি দেবদত্ত শক্তি। কবির গানের কবিদের প্রতিভা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু ছন্দোরচনায় শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ইহারাও একশ্রেণীর আর্টিষ্ট। সাজাইয়া গুছাইয়া কথাকে গানের অঙ্গীভূত করিবার এবং অসামান্য সুর জ্ঞানের পরিচয় ইহারা দিয়াছে। ইহা প্রতিভা না হইলেও অসামান্য শক্তি, এই শক্তি ভদ্রশিক্ষিতেরই এক চেটিয়া নয়। অনেক অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কবির গানের মধ্য দিয়া। সরস্বতীর কৃপালাভ করিলে ইহাদের অনেকেই বড় কবি হইয়া উঠিতে পারিত—শিল্পিদৃষ্টি ইহাদের ছিল —সূক্ষ্ম রসবোধও ছিল। বাংলার এই সকল Inglorious Miltonদের দানই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গীতি-সাহিত্যের একমাত্র অবদান। প্রাচীন সাহিত্যের ভাবধারা ইহারাই রক্ষা করিয়া আনিয়া নব যুগের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজ সভা ত্যাগ করিয়া পৌর জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহার পথপ্রদর্শিকা।"

নিম্নে কতকগুলি বিখ্যাত কবিওয়ালার পরিচয় দেওয়া হইতেছে :

১। হরু ঠাকুর (১৭০৮—১৮২৩)—ইঁহার পুরা নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। প্রথমে ইনি সখের দল করেন, পরে তাহাকে পেশাদারী দলে পরিবর্ত্তন করেন। ইনি কবির লড়াইয়ে বিচারকের কাজও করিতেন। ইঁহার একটি গান—

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ ছেরে ভাসি অকূলে।
অক্রূর সহিতে কৃষ্ণ রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে।
রাধার চরণ ত্যজিলে।
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।

নাই অন্যভাব শুনহে মাধব তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
অন্ধকার নিশি যথা বাজে বাঁশী তথা আসি গোপী সকলে।
দিয়ে বিসর্জ্জন কুলশীলে,

এতেই হ'লাম দোষী তাই তোমা জিজ্ঞাসি
এই দোষে শশী ডুবিবে,
শ্যাম, যাও মধুপুরী নিষেধ না করি থাক
যথা হরি সুখ পাও।
একবার, হাস্যবদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥
জনমের মত চরণ দুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব সে আশা না করি।
হৃদয়ের ধন হে গোপীরমণ হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥

এই সকল গানে কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও উত্থান-পতনস্বরের অনুসারে খাদ, চিতেন পাড়ন, ফুঁকা, মেলতা, অন্তরা ইত্যাদি ভাগ আছে।

ইহা একটি মাথুর সঙ্গীত। এইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া তিনি খণ্ডিতা রাধার সখীদের সঙ্গে শ্যামের রস-কলহটাকে রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান করিয়াছিলেন।

ইঁহার কোন কোন গানের বাঁধুনী এমনই চমৎকার যে ছন্দের একটু পরিবর্ত্তন এবং বাক্যবিন্যাস একটু বদলাইয়া লইলে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান যুগের গীতিকবিতায় পরিণত হইতে পারে। ইনি লৌকিক প্রেম অবলম্বনেও গান রচনা করিয়াছেন। ইঁহার গুরু ছিলেন রঘুনাথ নামে একজন নিম্নজাতীয় গায়ক গুরুভক্তি প্রদর্শনের জন্য কোন কোন গানে গুরুর নামে ইনি ভণিতা দিয়াছেন।

২। রাম বসু (১৭৮৭—১৮২৯) ইনি হাওড়ার লোক। কবির গান রচনায় রাম বসু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি কবির গানে লহর অংশের প্রবর্ত্তক—চাপান ও উত্তর প্রত্যুত্তর দানের প্রথা ও কবির লড়াই রাম বসু হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রামবসু বিরহের কবি। নায়িকার গভীর মর্ম্মবেদনা—নায়কের প্রতি নিষ্ঠুরতার অনুযোগ ইঁহার গানে অতি সরস ও মর্ম্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত হইত। প্রথমে তিনি অপরের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, পরে নিজেই দল করেন। বৃন্দাবনলীলার পূর্ব্বরাগ, বিরহ ও মাথুর, আগমনী বিজয়া ও লৌকিক প্রেম বিরহ তাঁহার গানের উপজীব্য ছিল। রাম বসুর গানগুলিকে অশিক্ষিত সমাজের গান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, কারণ, তাঁহার গানে প্রকৃত কবিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। রঘুনাথ দাস—ইনি হরু ঠাকুরের ওস্তাদ ছিলেন। ইনি দাঁড়া কবির প্রবর্ত্তক। হরুঠাকুরের অনেক গানে ইহার ভণিতা আছে।

৪। রাসু—নৃসিংহ (১৭৩৪-১৮০৭)—রাসু ও নৃসিংহ দুই ভাই। ইঁহাদের গানে দুইজনেরই ভণিতা আছে। ইঁহাদের কোন কোন গানের ছন্দ একেবারে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ছন্দের মতই। ইঁহাদের সখীসংবাদ গানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

৫। নিত্যানন্দ বৈরাগী বা নিতাই দাস (১৭৫১—১৮২১)—ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন—ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভবানী বেণে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।" একথা অত্যুক্তি নয়, কারণ ইহাদের গানে অনুভূতির যে গাঢ়তা, গভীরতা ও অকৃত্রিমতা ফুটিয়াছে—শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্র তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। নিত্যানন্দের লৌকিক প্রেমের বিষয়েও অনেক গান আছে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন—"একদিবস দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতাই ভবানীর লড়াই শুনিতে আসিত। যাহার বাড়ীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত লোক ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিতাই দাস জয় লাভ করিলে তাঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন, এমনি জ্ঞান করিতেন।" এখনকার দিনে মোহনবাগানের খেলায় হারার মত।

ইহা হইতে নিত্যানন্দের লোক-বল্লভতা প্রমাণিত হয়। লোকে যে নিতাই বিরাগীকে এত ভালবাসিত তাহার কি কোন হেতু নাই? নিতাই সকলের হৃদয় বিগলিত করিতে পারিত।

৬। সাতু রায়—সাতকড়ি রায় চাকরি ও পরে মোক্তারি করিতেন, ইঁহার নিজের দল ছিল না—অন্যের দলের গান লিখিয়া দিতেন। ইহার রচিত মাথুর সঙ্গীতগুলি চমৎকার। ইঁহার—

"কথা কও বদন তুলে হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
তোমারও কংসরাজ্যের অংশ নিতে আসি নাই।"

ইত্যাদি গান বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী।

৭। গদাধর মুখোপাধ্যায়—ইনি বহুদলের গান বাঁধনদার ছিলেন। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধিয়া দেওয়ার শক্তি ইহার মত কাহারও ছিল না। ইনি যে দলের বাঁধনদার থাকিতেন—সেদলের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যাইত—সেদল অপরাজেয় হইয়া উঠিত। ইহার রচিত উমা সঙ্গীত—

পুরবাসী বলে উমার মা তোর হারা তারা এল অই।
শুনে—পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায়
বলে কৈমা উমা কই।

ইত্যাদি গানটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

৮। কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্য—ইনি কবির দলে বাঁধনদারি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নীলুঠাকুর ভোলা ময়রা ইত্যাদির দলে ইনি গান বাঁধিয়া দিতেন। ইহার রচিত মাথুর সঙ্গীতগুলি চমৎকার।

১। তোমার কমলিনী কালো মেঘ দেখে
কৃষ্ণ বলে ধরতে চায়।

২। কৃষ্ণ, দেখ হে একবার দেখে যাও বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।—এইগানগুলি বড়ই কবিত্বময়।

৯। ভোলা ময়রা—ভোলা ছিল হরুঠাকুরের চেলা। কবির লহর ও খেউড় অঙ্গের গান রচনা করিয়া ভোলা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভোলা মুখে মুখে খুব সরস গান রচনা করিতে পারিত। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পোর্ত্তুগীজ এণ্টুনী সাহেব। সেকালের লোকের যেরূপ রুচি ছিল—ভোলার গান তদুপযোগীই হইয়াছিল। সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল ছন্দে অকথ্য গালাগালি দিলে এবং মুখে মুখে অশ্লীল পদ্য রচনা করিতে পারিলে রসিকতার চরম হইল। ভোলা এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিল। ভোলার যে সকল গান প্রসিদ্ধ সেগুলি এণ্টুনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলার সময়ে কবির লড়াই চরমে উঠিয়াছিল। ভোলার নির্ভীকতার বা প্রগল্‌ভতার সীমা ছিল না। দেশের বড়বড় ভূস্বামীদের সম্মুখে অম্লান বদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড় গাহিত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকেও দুইকথা শুনাইয়া দিত। রসের আবহাওয়ায় সবই চলিত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোলা আদর করিয়া শালা সম্বোধন করিত।

১০। এণ্টুনি সাহেব—পোর্ত্তুগীজ হেন্‌স্‌ম্যান এণ্টনি এদেশে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাংলা শিখিয়া কবির দল খুলিয়াছিলেন। তিনি ভোলা, ঠাকুর সিংহ ইত্যাদি কবিওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভোলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া এণ্টনিকেও কুরুচির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনিও মুখে মুখে উত্তর দিতে পারিতেন। এণ্টনি ভোলার মত অশ্লীল হইতে পারিতেন না—ভোলার মত অত সাহসও তাঁহার ছিল না—কাজেই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হইত। এণ্টনির উদারতাও ছিল, এণ্টনির গানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ভাবের ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হইলেও হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন।

এণ্টনির একটি গান—

জানি তোমার চরণ সাধন করি
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী।
দেখ—সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী
ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী—
শিবকে সাজিয়ে সন্ন্যাসী করলে তারে শ্মশানচারী।

এণ্টনি ও ভোলানাথের রস-কলহের একটি দৃষ্টান্ত—

এণ্টনি একবার স্বয়ং দুর্গা সাজিয়া ও ভোলানাথকে শিব কল্পনা করিয়া এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে বলিলেন :

"যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি,
সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ?
কহ দেখি, ভোলানাথ, এর বিশেষ বিবরণ।
জান না কি শিব! আমি তোমার গৃহিণী,
তোমায় গর্ভে ধ'রে আমি,
এখন হ'লেম তোমার রমণী॥

সমুদ্র-মন্থন-কালে, বিষ-পান ক'রেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে, রক্ষা কর আপনি ॥
ঢ'লেছিলে বিষ-পানে, বাঁচালেম স্তন্য-দানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় ব'লেছিলে জননী ॥

ভোলানাথ শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে পৌরাণিক উক্তির উত্তর দিতে না পারিয়া গাহিল :

ওরে আমি সে ভোলানাথ নই,
(আমি সে ভোলানাথ নই)
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই ;
চিন্তামণির চরণ চিন্তি ভাজনা খোলায় ভাজি খই ॥
আমি যদি সেই ভোলানাথ হই,

* * *

নে যা আমার খই, নে যা খাঁটালের দই,
পেরিং-এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই,
(কাচে) বাগবাজারের খাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল,
দড়ি কলসী নিয়ে ব্যাটা হোগে জল-সই ॥

বলাবাহুল্য, ইহাতে কবিত্বের বালাই নাই, কিন্তু সেকালের লোকে এই সমস্ত উপভোগ করিত।

১১। বলহরি রায়—(১৭৪৩-১৮৪৯) ইনি ছিলেন রাজপুতবংশীয়। বীরভূমে বরুল গ্রামে ইঁহার জন্ম—১০৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ইনি বীরভূম জেলার কবিওয়ালাদের গুরু ছিলেন। ইঁহার সমসাময়িক কবিওয়ালা ছিলেন—রামাই ঠাকুর, রাজারাম, গণক কৈলাস যোগী, বনওয়ারি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। নিতাই দাস, রাইচরণ ইত্যাদি ইঁহার শিষ্য।

'এ-কি শুনি বংশীধ্বনি বাজে গহন কাননে'—ইত্যাদি ইহার গান খুব প্রসিদ্ধ।

১২। কৈলাস ঘটক (১৭৯৮-১৮৭৩)—ইনি বীরভূম জেলার লোক। আগমনী, বিজয়া ও গোষ্ঠ গানে ইহার দক্ষতা ছিল।

১৩। সৃষ্টিঠাকুর—ইনি একজন জবরদস্ত কবিওয়ালা ছিলেন। ইনি বলহরির শিষ্য ছিলেন। বিরহিণী হৃদয়ে প্রকৃতির প্রভাব অবলম্বনে ইনি বৃন্দাবনলীলার গান রচনা করিতেন। ইহার সমসাময়িকদের মধ্যে রামাই ঠাকুরের গোষ্ঠ গান—

বল রামরে এ কি দেখি রঙ্গ
গোচারণে লয়ে গেলি নীলরতনে এনে দিলি ধূলিধূসর অঙ্গ।

এই গানটি বড়ই প্রসিদ্ধ।

উপরিলিখিত কবিওয়ালা ছাড়া—ভবানী বেণে, (ভবাণী বেণের কথা নিতাই দাসের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে) ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, নীলমনি পাটুনী, নীলুঠাকুর, গোঁজলা-গুঁই, লালুনন্দলাল, রাধানাথ দাস, বনওয়ারি চক্রবর্ত্তী, রাজারাম, যজ্ঞেশ্বর ধোপা, ঠাকুর সিংহ, রামপ্রসাদ ঠাকুর ইত্যাদি বহু কবিওয়ালার রচিত গান পাওয়া যায়। মাধবীলতা, যজ্ঞেশ্বরী, মোহিনী দাসী ইত্যাদি অনেক রমণীরও কবির দল ছিল—তাঁহারাও গান বাঁধিতে পারিতেন।

কবির গানে লহর অঙ্গে সমস্যাপূরণের ও হেঁয়ালি সমাধানের চাপান দেওয়া হইত। লহরের রুচি খেউড় অপেক্ষা অনেকটা ভাল। এই অঙ্গ ক্রমে কবির গান হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। তাহাতে কোন পৌরাণিক চরিত্রের জবানী অভিনয়ের ভঙ্গীতে চাপান দেওয়া হইত ; অন্য একটি পৌরাণিক চরিত্রের জবানীতে মুখে মুখে জবাব দিতে হইত। এই প্রশ্নোত্তরের গানকে তর্জা গান বলে। হোসেন খাঁ এই তর্জা গানের প্রবর্ত্তক। পৌরাণিক চরিত্র ছাড়া অন্য লৌকিক চরিত্রেরও অভিনয় করা হইত—ইহা একপ্রকার রসকলহ। ইহাও ক্রমে গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতায় পরিণত হইয়াছিল।

দাংগা

অমরেন্দ্র ঘোষ

'বাবা!' আমিনা এসে কপালে হাত দিয়ে ডাকল।

উনিশশ' পঞ্চাশের একটি মর্মান্তিক রাত্রি—

থমথম করছে সারা সহর। বিশেষ ক'রে মুসলমান পল্লীগুলি ভয়ে লজ্জায় এবং আশংকায় যেন মুহ্যমান। কী করছে পূর্ব বাঙলার আনছারবাহিনী! তারা কি বুঝতে পারছেনা এর জবাব এখানে হবে কী প্রচণ্ড!

কারফিউ জারি হয়েছে। মিলিটারী ট্রাক ঘুরছে মরিয়া হয়ে। সংখ্যালঘিষ্ঠের জীবন রক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় বসেছে পুলিশের ছোট ছোট ঘাঁটি।

তবু আমিনার রুগ্ন পিতার চোখে নিভে আসছে যেন বড় রাস্তার বিজলী বাতি। তীব্র আলো ঘোলাটে হয়ে আসছে মাঝে মাঝে।

কেউ বলছে, দাংগার জন্য দায়ী ওপরওয়ালা হিন্দু মুসলিম নেতারা···

কেউ বলছে, না, না, ইংরেজ ও মার্কিণ আছে পর্দার আড়ালে—তাদের সুতোর টানে টানে লড়ছে পুতল হাতি···

কিন্তু আমিনার বাপ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে যে তাদের মত যত নলখাগড়া ভেঙে পয়মাল হয়ে যাচ্ছে অনবরত। সে ছিল একজন দপ্তরী। কাজ কারবার তার বন্ধ হল। তারপর তার চোখের আলো ক্রমে টিমিয়ে এল বয়স্থা মেয়ের চিন্তায়। আবার মেয়েটা নাকি পরমা সুন্দরী—বয়স তার ষোল কি সতেরো।

আমিনার জন্মের পর কি কৃতজ্ঞতাই না জানিয়েছিল তার বাপ খোদাকে। আজ ডাগর হয়েছে মেয়ে, সাদি হয়েছে ভাল ঘরে। বর চাকরী করছে পাকিস্তানে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা নাকি তুলে নিয়ে যাবে সোমত্ত বৌ একটু খরচপত্তর ক'রে।

সব ভেস্তে গেল দাংগায়।

বড় মিঞারা পাট আটক করল, কয়লা দিল না হিন্দুস্থান। আনছারেরা জবাবে টানছে হিন্দু মেয়েদের হাত ধ'রে। আর আমিনার বাপ—নিরপরাধ এক দপ্তরী রয়েছে কৈ মাছের মত হাঁড়িতে জিয়ানো। এক এক সময় আমিনার বাপের বাহবা দিতে ইচ্ছা হয় এই রাজনীতিকে।

কিন্তু আজ আর তারিফ করার অবস্থা নেই বুড়োর। মৃত্যুর চেয়ে আশংকা যে কত বড় গুরুদণ্ড তা সে বুঝেছে হাড়ে হাড়ে। পরিস্থিতিও নাকি হয়েছে পূর্বের তুলনায় অনেক জটিল।

পাকিস্তানী ডাকুদের 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি যে কী ভয়ংকর তা কখনও বুড়ো কানে শোনে নি, কিন্তু মাঝে মাঝে এখানের যে কোনও একটা সামান্য হৈ-চৈতে খাবি খাচ্ছে তার অন্তর। শুধু নিজের কথা ভাবছে না বাপ—শয্যা গ্রহণ করেছে মেয়েটার পরিণাম চিন্তা করে।

আমিনা আবার ডাকল, 'বাজান!'

উত্তর দিল না বুড়ো।

আমিনার গালের টোলটি হঠাৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল—বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারা মুখে। দূর থেকে একটা তাণ্ডব চীৎকার ও গোলমাল ভেসে আসছে এই বস্তির দিকে। আমিনা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে···

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও রূপ!

'হারামজাদী কালি মাখ গালে···' তারপর যে খোদাকে ওর পিতা একদিন হৃদয় ভরে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, প্রবল উত্তেজনায় উঠে বসে তাকেই সে গালমন্দ করতে লাগল।

গণ্ডগোল কাছে এল ক্রমে। সহসা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল আমিনার বাপ। তার চোখ দুটো ঊর্দ্ধমুখী হল। আমিনা একটা বোরখা হাতে নিয়ে চটি খুঁজতে লাগল। জুতা কই? জান যাবে, মান যাবে—ইজ্জৎ

তার বিপন্ন, কিন্তু চটি জোড়া তো সে পাচ্ছে না। জীবনের জন্য তার এমন একটা পাশবিক মমতা জন্মাল যে সে বাপের মুর্দার দিকেও ফিরে তাকাল না।

চটি, চটি···সারা মগজে তার শুধু জুতোর জন্য তীব্র কামনা।

গোলমালটা আরও কাছে এল। বড় হওয়ার পর যে আমিনা কখনও একা একা বাড়ীর বাইরে বের হয়নি, সে এখন নিঃসংগ অবস্থায়ই ভিন্ন-কোন আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তাই পর্দানশিনা মেয়ের চাই চটি···

'জুতো ঐ আমিনা, বোরখা রাখ—তোমার বাবাকে সেলাম জানিয়ে সোজা আমার সংগে চলে এস।' যে এ কথাগুলো বলল তার নাম বিজয়, পূর্ববাঙলার মানুষ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, থাকে পাশের পল্লীতে। বিজয় কাজ করত আমিনার বাপের সংগেই এক দোকানে। আমিনাকে বিজয় দেখেছে অনেকবার, তার সংগে নেপথ্যে কথাও বলেছে অনেক কিন্তু আজ মুখোমুখি দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

বিজয় ঠিক করতে পারল না কে সুন্দরী বেশী—এই দপ্তরীর মেয়ে আমিনা না মল্লিকা? এমন ভীত সন্ত্রস্ত কয়েকটি মুহূর্তও যেন মহা বিস্ময়ে ভরে ওঠে। একটা ভাঙা চোরা বস্তির আড়ালে লুকান ছিল এত রূপ!

'ও চটি পায়ে দিও না আমিনা, খালি পায়েই চল, লোকে সন্দেহ করতে পারে।'

বিজয়ের অন্যমনস্ক ভাব দেখে রীতিমত কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল আমিনা। দ্বিধা এবং সন্দেহে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল যেন।

'কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? শুনছ না বন্দুকের শব্দ? আর দেরী করলে যে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।'

'না আমি যাব না, তুমি চলে যাও বিজয়বাবু।'

'পাগল হলে নাকি? কেন সংকোচ করছ আমিনা? ···ঐ শোন।'

একটা তুমুল হট্টগোল শোনা গেল কয়েকখানা বাড়ীর ওপাশে।

তবু আমিনা দাঁড়িয়ে রইল এমন সহজে ফিরল কেন আমিনার মন?

যুবক বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল। সে একখানা হাত ধরল আমিনার।

'ছাড়ো কাফের ছাড়ো হাত। আমার বাপ না তোমাকে চাকরী করে দিয়েছিল, বেগার যখন, তখন বসিয়ে খাইয়েছিল তিন মাস?'

'সেই দায়িত্বেই তো···'

'চাইছ অমন শয়তানের মত!'

হেসে ফেলল বিজয়—হাসল এমন অস্বাভাবিক আবহাওয়ার ভিতরও। 'ও এই কথা!' বিজয় একপ্রকার কোলে তুলেই নিয়ে গেল ওকে।

অলিগলি বেয়ে, অন্ধকার এবং আলোতে চ'লে আমিনাকে এনে ধপ করে ছেড়ে দিল বিজয় একখানা ঘরের মেঝেতে।

'ও দিকের বস্তিতে আগুন দিয়েছে, এখনও যদি ফোঁস ফোঁস করতে হয় কর, কিন্তু কেউ এলে বলো যে তুমি আমার বৌ।'

'কি বললে বেইমান, কি?'

'যা বলার তা তো বললাম—বারবার এককথা বলার সময় নেই। নিজের ভাল তো পাগলেও বোঝে!'

বিজয় একটা বাক্স খুলে একখানা শাড়ী বের করল, সিঁদুরের কৌটা জোগাড় করল একটা।—'আমিনা তর্ক না করে লক্ষ্মী মেয়ের মত এই শাড়ীখানা পর, সিঁদুরের টিপ দাও কপালে।'

'আমি!' কেঁদে ফেলল আমিনা। 'সুযোগ পেয়ে বিজয়বাবু···' সে আর কিছু বলতে পারল না। সে কান্না জুড়ে দিল সজোরে।

এ কি বিপদ! বাইরে ঘনায়মান অরাজকতা, ভিতরে অবুঝের উৎপাত!

'তুমি যদি কান্না না থামাও, আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার মুখ চেপে ধরতে হবে। যদি শাড়ী না বদলাও তবে জোর করে তোমার মুসলমানী ছাপার কাপড় ছাড়িয়ে দিতে হবে। আর···'

কে যেন ঘনঘন কড়া নাড়তে লাগল দোরের।

বিজয় ও আমিনা সচকিত হয়ে উঠল। এমন সময় এল কে? অন্য ঘরে যে পালাবে আমিনা তেমন দ্বিতীয় কোন কোঠা নেই।

'সর্ব্বনাশ, আমিনা শীগগির শাড়ী বদলাও।' ফিস ফিস করে কিন্তু তীব্র স্বরে বলল বিজয়। 'অনুগ্রহ করে আমাকে আর অবিশ্বাস কর না—তোমার বাপের দোহাই, দোহাই তোমাদের কোরাণ কেতাবের।'

ঘেমে আরও রাঙা হয়ে উঠল আমিনা। ঘরের ভিতর বিজলি বাতির যে আলো জ্বলছে তাতে মনে হল এই পরমা সুন্দরী বুঝি বা নিজের রূপের আঁচে নিজেই জ্বলে যাবে।

মল্লিকারও এমনি রূপের শিখা মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে অসাধারণ মুহূর্তে। তবে তার চেয়েও কিছুটা তীক্ষ্ণ বোধহয় এই দপ্তরীর মেয়ের রূপ।

কড়ার শব্দ আরও ঘন হ'য়ে এল।

'আমিনা তুমি এই উপস্থিত বিপদটুকু এড়াবার জন্য আমাকে সাময়িকভাবে শুধু স্বীকার করে নেও—নইলে যে আমি তোমার বাপের দেনা শোধ করতে পারিনে। আমার কোন বদ মতলব নেই, তুমি একটু সাহায্য কর বোন।' বিজয় আমিনার হাত দুখানা ধরে নতজানু হয়ে পড়ল।

'তোমার মিষ্টি কথায় আর ভুলছিনে বিজয়বাবু। উঃ কি বেইমান!' বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল আমিনা।

বিজয় স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল একটা বিছানায়।

'দোর খোল বিজয়, আমি, আমি, ভয় নেই...'

পাশাপাশি বস্তিতে উন্মত্ত চীৎকার—মর্ম্মভেদী হাহাকার—আগুনের লকলকে শিখা—দুয়ারে বিশৃঙ্খল শব্দ—সকল ভুলে গিয়ে বিজয় ভাবতে লাগল এখন উপায় করা উচিৎ কি?

গোটা দুয়েক শক্ত লাথিতে দোরের খিলটা ভেঙে গেল।

বাইরের হাওয়ার সংগে যেন একটা পাগলা মানুষ ভিতরে ঢুকল। চুলগুলো তার উসকো-খুসকো। জামাটা ছেঁড়া খানিকটা। ঘরের ঝুলান বাতিটা তখন কাঁপছে হাওয়ায়। এ ছেলেটি বিজয়ের এক গাঁয়ের লোক, সহকর্ম্মীও বটে।

'গৌর, সংবাদ কি দেশের?'

'আমাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছে—তোমার স্ত্রীকে নাকি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে...'

'কে খবর নিয়ে এল?'

'আমার ভাইপো মধু।'

'মল্লিকাকে সত্যি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?'

'এখনও বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'কে নিয়ে গেল গৌর?'

'বাড়ীর পাশের হাওলাদার।'

'উঃ! বাবার বন্ধুর এই কাজ!'

'পাহারা দিচ্ছিল হাওলাদার লোকলস্কর নিয়ে তোমাদের বাড়ী। বাইরের গোলমাল যখন চরম হয়ে উঠল তখন বুড়ো শয়তান বোরখা পরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে নাকি ভুলিয়ে।'

'উঃ! কেন যেতে দিলাম এই ক'দিন আগে বাপের বাড়ী—উঃ!' চুলগুলো টানতে লাগল বিজয় দুহাতে।

এবার এতটুকু হয়ে একটা যেন স্থির বিন্দুতে পরিণত হল আমিনা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন বইছে না তার। এখনই হয়ত অস্তিত্ব লোপ হবে মেয়েটার।

এই ঘরের তিনটি মানুষের কাছে মুহূর্ত্তগুলি যেন প্রলয় ঝাপটায় সরে যেতে লাগলো। কে কি করবে তাই স্থির করতে পারছে না কিছুই। কিন্তু করণীয় কাজ যেন বুকে চেপে শ্বাস রোধ করে ফেলতে চাচ্ছে। দেরী আর মোটেই সইছে না। শুকিয়ে যাচ্ছে জিহ্বা ও তালু।

'এখন তুমি কি করতে চাও বিজয়?'

'তুমি?'

'দেশে যাব।'

'কি করে? ট্রেন তো বন্ধ।'

চেঁচিয়ে উঠল গৌর। 'হেঁটে। তুমি?'

'আমিও যাব তোমার সংগে।'

ক্ষণকাল ঘরের দিকে নজর করে গৌর বলল, 'তবে আর দেরী করে লাভ কি, বেরিয়ে এস।'

একটু স্থির হয়ে রইল বিজয়। একটু ভাবল কি যেন। তারপর জবাব দিল, 'না, না, দাঁড়াও…কিন্তু ভাই গৌর…উঃ মল্লিকা…'

'ও কে? ঐ যে ঐ কোণে?' গৌর এগিয়ে এল।

'দপ্তরীর মেয়ে আমিনা।' বিজয় জবাব দিল।

'মুসলমানের মেয়ে!' একটা অদ্ভুত শব্দ করল গৌর। সে চিনত আমিনা ও তার বাপকে। চাকরী তো করত বুড়োর সংগেই। গৌর একখানা ছোরা বের করল। 'না, না, ওকে টেনে হিঁচরে আন…তারপর… এরা আমাদের হত্যা করেছে লুট করেছে…যবন…হিন্দুর শত্রু…'

'গৌর তুমি প্রতিশোধ নেও' নিমিষে মল্লিকার যত স্মৃতি ভেসে চলে গেল বিজয়ের চোখের সুমুখ দিয়ে। সুখ ও সোহাগের সংগীতগুলি যেন—কিন্তু বাজল' মর্মঘাতী বেহাগে।

গৌর এগিয়ে চলল যেন একটা জিঘাংসু বাঘের মত।

হঠাৎ গিয়ে তার হাত চেপে ধরল বিজয়—ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল গৌরকে। 'কি করছ পাষণ্ড? তুমি আর এক পা এগুলে তোমাকে আমিই খুন করব।'

'তার মানে?' আশ্চর্য হয়ে রইল গৌর।

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে আমিনা ঘরের আর এক কোণে সরে গিয়ে চুপ করে রইল।

'ভাই গৌর তুমিও একজন মজুর, আমিও একজন মজুর—মজুর ছিল ঐ আমিনার বাপও। আমরা যখন সম্পূর্ণ বেকার, তখন এ সহরে আমাদের কেউ সাহায্য করেনি, ভাই বলে কেউ হাত বাড়িয়ে দেয়নি ঐ আমিনার বাপ ছাড়া। তখন তো তার মনে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন জাগেনি।'

'এ রকম প্রশ্ন পূর্ব্বে বাঙলায়ও ছিল না—তুমি নতুন একটা বললে কি? ছাড়ো আমার হাত। যদি হিন্দু হও সরে দাঁড়াও - যদি ক্লীব না হও তবে স্ত্রীর প্রতিশোধ নেও।'

'একটা অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর? ছিঃ! ছিঃ! তুমি না দাংগা-বিরোধী ফ্রণ্টে যোগ দিয়েছিলে? তখন শপথ করেছিলে কি?'

'তা আজ ভুলে গেছি বিজয়, তা' একেবারে ভুলে গেছি।'

'সবাই ভুলতে পারে, কিন্তু শ্রমিক তো এ কথা ভুলতে পারে না। গৌর, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিত্য দু' মুঠো অন্ন যোগায়, সে কি কখনও অশান্তি চায়? চায় বিনা বিচারে ছুরি চালাতে?'

'ঠিক বলেছ বিজয়, ঠিক—আমি হিন্দু নই মুসলমান নই, আমার আসল পরিচয় আমি প্রথম শ্রমিক।' হু হু ক'রে কেঁদে ফেলল গৌর—কাঁদল এই ব'লে যে সে সব জানে, শত্রু মিত্র সবাইকে চেনে, কিন্তু পোড়া প্রতি-হিংসার আগুন যে নেভে না! এ হ'ল কি? তার হাতের মুঠো ঢিলে হ'য়ে যায়, খ'সে পড়ে ছুরিখান। সঙ্গে সঙ্গে সেও নেতিয়ে পড়ে। বিজয় তাকে দাঙ্গা-বিরোধী মন্ত্রে ধীরে ধীরে চাংগা ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে। আবার বোঝায় সত্যিকারের শত্রু কে! দাংগার মূলে রয়েছে কাদের হাত!

আবার শক্ত ক'রে গৌর চেপে ধরে ছুরি।

পরের দিনের সংবাদ—

ট্রেন আবার চলতে সুরু ক'রেছে। একটি হিন্দু মেয়ে ও একটি যুবক চলেছে পাকিস্তানে। কামরার যাত্রীরা অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। এদের সাহস তো দুর্জ্জয়! কেউ কেউ তর্ক তুলেছে—ওরা কিছুতেই হিন্দু নয়। এক ব্যক্তি উৎসুক হয়ে এগিয়েই এল।

'ম'শাই, আপনারা চলেছেন কোথায়? সংবাদ জানেন ও'দিকের? আসছেন কোত্থেকে?…ওটি আপনার…'

আমিনা একেবারে রাঙা হয়ে উঠল। সে মাথার কাপড়টা একটু টেনে বিজয়ের কাছে ঘেঁষে বসল। চেয়ে দেখল তার কোন ভুল হয়েছে নাকি কাপড় জামা পরায়। মাথা ঘুরতে লাগল তার গাড়ীর চাকার শব্দে। কামরা সমেত লোক তার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে।

গত রাত্রে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে আমিনা অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছিল। মুসলমান বস্তির অবস্থা যখন অত্যন্ত সাংঘাতিক তখন বিজয় ও গৌর ওকে নিয়ে একখানা

ট্যাক্সিতে উঠে সোজা চ'লে এসেছিল আর এক মহল্লায়—যেখানে হিন্দু শ্রমিক বেশী, আছে দাংগা বিরোধী ফ্রণ্ট।

আমিনা—বিজয় ও গৌরের মধ্যে যে বচসা হয়েছিল কাল, তার খানিকটা শুনেছিল। তাই আজ সে সেজেছে হিন্দু মহিলার মত। কিন্তু অক্ষমতা তার ধরলে ধরা কঠিন নয়। ত্রুটি রয়েছে যথেষ্ট।

ঠিক হয়েছে গৌর সোজা এই ট্রেনে চ'লে যাবে খুলনা, বিজয় যাবে হাটতে হাটতে পাকিস্তানে আমিনাকে নামিয়ে দিয়ে, মল্লিকাকে খুঁজতে খুঁজতে। কে যেন আবার সংবাদ এনেছে মল্লিকা নাকি পালিয়ে পাকিস্তানের শেষ চৌহদ্দি পর্য্যন্ত এসেছে।...

বিজয় একটু পরুষকণ্ঠে জবাব দিল, 'ওটি আমার কে এবং যাচ্ছি কোথায়—তা বোধকরি আপনার জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই।'

কামরা শুদ্ধু লোক থ' মেরে যায় বিজয়ের দৃঢ়তা দেখে—সবাই বলে ওঠে, 'সত্যি, সত্যি।' মনে মনে ভাবে লোকটা হিন্দু নিশ্চয়, নইলে কি হয় এত বড় বুকের পাটা! এবার সবাই প্রশ্নকারীকে নাজেহাল ক'রে ছাড়ে। 'বলুন তো আপনি কেমন ভদ্রলোক, সামান্য শিষ্টাচার পর্য্যন্ত জানেন না। সরে বসুন।'

রাত্রে ট্রেন পাকিস্তানের ভিতর এসে ঢোকে।

একটা হাফ ছাড়ে আমিনা। সে মুখ ঘুরিয়ে মুছে ফেলে দেয় সিঁথির সিন্দুর।

বিজয় এ সব লক্ষ্য করে না। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে মল্লিকার চিন্তায়। রূপসী অল্প বয়সী মল্লিকা, শংকা তার পদে পদে। কোথায় যে কার আওতায় আছে কে জানে! এত বড় দেশের ভিতর বিজয় খোঁজ করবে কোনখানে? যদি মল্লিকাকে সে না পায় তবে আর ফিরবে না লোকালয়ে। মল্লিকা! মল্লিকা! শুভ্র সুগন্ধি ফুলের মত তার মল্লিকা হারিয়ে গেল কোন আবর্ত্তে, কাদের চক্রান্তে? ক্রোধে জ্বলে ওঠে বিজয়। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কাছে না পেয়ে শুধু আক্রোশে ফুলতে থাকে। আসে আশংকা ও চিন্তা মৌমাছির মত ঝাঁক বেঁধে।

'আমার অবস্থা তো বুঝতে পারছ, এখন তুমি কোথায় যাবে?' ট্রেন থেকে নেমে প্রশ্ন করল বিজয় আমিনাকে।

'তাই তো ভাবছি বিজয়বাবু, ভরসা তো পাচ্ছিনে এখানে নেমেও। এই কি পাকিস্তান, এত আঁধার, শেয়াল ডাকে অমন করে?'

'তুমি সহরের মেয়ে, পল্লীগ্রাম তো কখনও দেখনি, এই তোমাদের পাকিস্তান।'

'যেন গোরস্তানে নিয়ে এলে তুমি।'...

'চুপ কর আমিনা; কেউ শুনে ফেললে রক্ষা থাকবে না আর। অমনি কোন পল্লীবাসী রায়টের মুখে কলকাতা গিয়ে পড়লেও মহা শ্মশান বলে ভ্রম হয় তার। তুমি নিশ্চয় তোমার স্বামীর ঠিকানা জান।'

'কিন্তু তার যে বদলী হওয়ার কথা ছিল—পত্র পাইনে অনেকদিন।'

'মুস্কিল!'

একে পাকিস্তান, তার ওপর সংগে সুন্দরী স্ত্রীলোক,—কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তিতে অধীর হয়ে পড়ল বিজয়। দেখল প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে বহু যাত্রী অপেক্ষা করছে। এরা নাকি সব উদ্বাস্তু, যাবে কলকাতা। কিন্তু দেখাচ্ছিল সবাইকে যাহান্নামের যাত্রীর মত। দু'জন স্ত্রীলোককে নাকি ধরে নিয়ে গেছে নিকটে কোথায় কোন এক স্থানে তল্লাসী করতে।

'শুনলে তো আমিনা?'

'আমার স্বামী তো একজন কাষ্টম অফিসার।'

'তবে তো আরও চমৎকার!'

নাকের ওপর একহাত জল হলেও যা চোদ্দ হাত হলেও তাই। বিজয় সাহসে ভর করে একজন রেলের কর্ম্মচারীর কাছে সব খুলে বলল। সে আবার কয়েকজনকে ডেকে আনল। সকলে শুনে তো অবাক! হিন্দুর মধ্যে এমন বন্ধুও আছে! ঐখানেই খোঁজ পাওয়া গেল আমিনার স্বামীর। সে নাকি নিকটেই থাকে এক ক্যাম্পে। এসেছে সদ্য বদলী হয়ে।

একখানা গাড়ী ঠিক করে দিল সবাই একত্র হয়ে।

গাড়ীতে উঠে বিজয় প্রশ্ন করল, 'কত দূর?'

'ব্যস্ত হইলা বাবু—দূর আছে, দেড় ক্রোড়শ।'

বিজয় বিরক্ত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আর আমিনা টাল সামলাতে না পেরে ফুটবলের মত ছৈয়ের দু'

পাশে ঘা খেতে লাগল। গোযান চলল ঢিমিয়ে। পথের দু'পাশে জোনাকী জ্বলছে, পোকামাকড় ডাকছে প্রাণপণে। কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই—এই দিগন্ত-বিসারী অন্ধকারে ওরা চলেছে মাত্র তিনজনে। এ গতি, না মৃত্যু—ঠিক বুঝতে পারে না আমিনা।

'মিঞা সাহেবের নাম?' বিজয় জিজ্ঞাসা করে।

'কেরামত আলী।'

'বাড়ী?'

'এই তো হোথা।'

'দেশের অবস্থা কি?'

'ভাল।' সে বলে যে খেটে যারা খায় তারা চায় না অশান্তির আগুন জ্বালাতে। তাতে সত্য কিছু লাভ হতে পারে লুট হট্টগোল ক'রে, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্ধকার। সে নিন্দা করে গুণ্ডাষণ্ডাদের—আর গল্প বলে রাজহাঁসের, যে হাঁসটা নিত্য পাড়ত সোনার ডিম। 'দুষ্ট আশায় পেট চিইর‍্যা লাভ হইল কি? মশয় আমি ছিলাম এক ডাকুর দলের সরদার, খুন করছি কমছে কম বাহান্নডা—কিন্তু মাইয়ালোক টানি নাই কক্ষণো।'

'ও!' সভয়ে উঠে বসল বিজয়—এগিয়ে এল আমিনা।

আর কথা জমল না, গাড়ী চলতে লাগল যেমন করে চিরদিন চলে টক্কর খেয়ে খেয়ে।

কেরামত আলী আরও বলল যে, সে এ কাজে হাতে খড়ি দিয়েই টের পেল যে, ব্যাপার বড় অশান্ত। একদিন পাঁচ টাকা হল-কি হল-না আবার তিনদিন যায় শুকনা। এর জন্য এই সামান্য গাড়োয়ানও দায়ী করে যত লীগের পাণ্ডা ও আনছারদের।

তবে এদেরও চোখ খুলেছে। বিজয় আনন্দে হাতে হাত মিলায় এই বুড়ো বান্ধবের সংগে।

'শেষটায় তুমিও বুঝেছ যে চুরি ডাকাতি লুট—যা-ই করনা কেন, মেহনতের তুল্য কিছু নেই, কেমন মিঞা?

'হ্যাঁ।'

বিজয় আবার কড়া ঝাঁকানি দেয় বৃদ্ধের হাতে।

'তারা ভাগ বাটারার ধার ধারে না।'

'না।' অতি উৎসাহে বৃদ্ধ জবাব দেয়, 'তারা যে ভাই ভাই।'

'এই তো চাই মিঞা, এই তো চাই।'

অস্পষ্ট তারার আলোতে আমিনা বুড়োর মুখে দেখে যেন তার মরা বাপের মুখের ছাপ।

রাত্রে গাড়ী গিয়ে থামল যেখানে সেটা অস্থায়ী শুল্ক-বিভাগের ক্যাম্প। প্রায় বুড়ো গাড়োয়ানের দেশের কাছে।

ওরা গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে একটা তাঁবুর সুমুখে এল। ভিতরে উজ্জ্বল একটা আলো। আলোর সুমুখে দুটি নয়, একটি মাত্র মেয়ে বসে, যেন পাথরের প্রতিমা। হাত দুখানা তার একটা খুঁটিতে বাঁধা।

আমিনা ভাবল, একি বেহেস্তের পরী?

বিজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'মল্লিকা, মল্লিকা!'

'কে, বিজয়? রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

ফল হল উল্টা! তিন চারজন এসে বেঁধে ফেলল বিজয়কে। আর বুড়ো মিঞাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমিনাকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁবুর পিছনের খোপে। আমিনার স্বামী মীর্জ্জা সত্যই এখানে বদলী হয়ে এসেছে। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হল গরুর গাড়ীর।

বিজয়কে শক্ত করে বেঁধে রেখে যে যার চলে গেল। এবার বিজয় সহজেই বুঝতে পারল যে তার পিতার বন্ধু হওলাদার অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি দুশমনদের জ্বালায়।

একটি আত্মীয় নেই, একটি দরদী মানুষ নেই, হাত পা বেঁধে স্বামী স্ত্রীকে যেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুনের চাকার ভিতর।

এমনি সময় রংগমঞ্চে উদয় হল যে, তাকে মল্লিকা তো চিনতই, বিজয় চিনে ফেলল নিমেষে—এই মির্জ্জা।

ঢুলু ঢুলু চোখে মীর্জ্জা এসে দাঁড়াল মল্লিকার সুমুখে। 'শুধু তল্লাসী করব আইন মাফিক জান।'

'সাবধান কুকুর।' বিজয় গর্জে ওঠে।

'ঘেউ ঘেউ করে কে?'

'উনি ওর স্বামী, তুমি ছেড়ে দাও ওদের।' আমিনা ছুটে এসে হাত দুখানা জড়িয়ে ধরল মীর্জার। বিজয়বাবু না থাকলে আজ আমাকে আর কিছুতেই দেখতে পেতে না। আর কি হাল যে হতো আমার!'

'তবু ছেড়ে দিতে বলছ কাফেরকে?'

'উনি কাফের নন্—পয়গম্বর।'

'ইস, বড় দরদ তো দপ্তরীর মেয়ের। তবে আর এখানে না এসে হিন্দুস্থানেই থাকলে পারতে! বাপ ছিল মজুর, মেয়েরও টান মজুরের ওপর।'

'তুমি যা খুশি তা আমাকে বল, ওদের কেবল রেহাই দাও।'

মীর্জা তাঁবুর এ পাশ ও পাশ পায়চারী করল ক'বার। মল্লিকাকে আড় চোখে দেখল ঘুরে ঘুরে।

'তবে বিজয়বাবুকে ছেড়ে দেই···'

'আর তার স্ত্রী?'

'সে থাক, তুমি যাও বিজয়বাবুকে নিয়ে হিন্দুস্থান—কেমন পিয়ারী!'

'ওঃ! তোমার জান কি কঠিন। ঠাট্টা করছ কাকে নিয়ে? তুমি কি অভিশাপের ভয় কর না? আমি তোমার সাদীকরা পরিবার, আমাকে তো অসম্মান করছই, রেহাই দিচ্ছ না তার স্ত্রীকেও, যে জান কবুল করে ইজ্জৎ বাঁচাল তোমার হারেমের।'

'মজুরের আবার মান! দপ্তরীর মেয়ের মুখে বড় বড় কথা!'

'হায় খোদা!' অজ্ঞান হয়ে পড়ল আমিনা।

পিছন থেকে সহসা একটা মোটা লাঠি পড়ল মীর্জার মাথায়। যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন···'

সকলে চেয়ে দেখল—সেই বুড়ো গাড়োয়ান।

●

"দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উর্দ্ধশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক আনন্দ লাভ হোলো। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ? বিষয়কে বড়ো ক'রে পায় ব'লে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো ক'রে সত্য ক'রে পায় ব'লে আনন্দ।"

* * *

আপন সীমার বাধা যে ভাঙ্তে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য্যকে জানতে হ'লে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি, তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাবো ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। —রবীন্দ্রনাথ

আত্মার এ অভিসার যুগে যুগে চলিয়াছে মোর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্বপ্নসম শূন্য সব, জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি জানি,
তবু চলে জন্ম মৃত্যু মায়া মোহ আবরণ টানি
তবু ভ্রান্ত চিত্ত কহে আমিত্বের বাণী।
দিগন্তের ইন্দ্রজালে আলোক-রশ্মির কণা ঝরে
নয়নের দৃষ্টিপথ 'পরে
ভূতাবিষ্ট হয়ে
সূর্য্যালোক পান করি প্রতিদিন পরম বিস্ময়ে।
উন্মুখ জীবন যাহা আপনারে করিছে বিকাশ
নিখিলের দুঃখে সুখে ভাবাশ্রয়ে জৈব বেদনায়
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আবেদনে জড় চেতনায়
সে কি নহে ভ্রান্তির বিলাস ?
তড়িৎ প্রবাহসম ক্ষণতরে জাগরণ তার।
কে কাহার প্রিয়তম ! কার লাগি অশ্রু হাহাকার !
কার জন্মতিথি করি ! কার করি মৃত্যু শোক সভা !
আমি জানি যারা আত্মতপা
তারা জানে, শূন্য সবি, বদ্ধ কেবা ! মুক্তি কেবা লভে !
গতি স্থিতি তবু বর্ত্তমান,
তবু ওঠে সূর্য্য চন্দ্র নভে।
সাম্য হোতে বৈষম্যের খর-স্রোতে ভেসে যায় জীব,
শব হয়ে যায় শিব
অবিদ্যার ঘন অন্ধকারে·;
যে ধরণীরে ভালোবাসি সন্ধ্যা প্রাতে স্তব করি যারে
আত্মার মুকুরে তারে
হেরিলাম সে যে মোর ছায়া,
আত্মগত বহুত্বের মাঝে মিথ্যা মায়া !

তবু তারে কেন ভালোবাসি,
তার সুরে কেন তবু মোর বাজে বাঁশী !
আমার কল্পনালয়ে আমারে যে করেছি রচনা,
দৃষ্টির বিভ্রমে রহি করিয়াছি আত্ম-প্রবঞ্চনা।
আত্মার এ অভিসার যুগে যুগে চলিয়াছে মোর
আজ দেখি নহে অভিসার।
বহুতে রয়েছি আমি, আমাতে যে বহুর আকার
প্রকার ভেদেতে মোহ ঘোর
মুগ্ধ ক'রে রাখে মিছে সদা
সেই কথা
কে শুনালো মোরে !
অনন্তকালের গীতা ব্যক্ত করে'
তুরীয় আলোকে !
মোর চোখে
এ পৃথিবী পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে শ্যাম আচ্ছাদনে
সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে প্রহেলিকাময়ী :
কঠিন বাঁধনে
আছে বাঁধা : নহে কালজয়ী !
বাসনায় বদ্ধ জীব করে আর্ত্তনাদ,
দিনে দিনে পুঞ্জীভূত আনন্দে বিষাদ।
তবু চলে উত্তরণ
অবতরণের পরে নিখিলের বিবর্ত্তন সাথে,
চেতনার স্তর হ'তে প্রচেতনে যে আত্মমগন
সেই জানে ধ্যান দৃষ্টিপাতে
অনন্ত সঙ্গীত কোথা ওঠে বেজে,
নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ রসশূন্য সত্য পূর্ণ কে যে !

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও বন্দেমাতরম্

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি—শিক্ষাভিমানী নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বর্দ্ধিত করিবার জন্যই বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনের" সূচনা। বস্তুতঃ সকলে যাহাতে বাঙ্গালী-হৃদয় দর্শন করিতে পারে, এবং দেখিয়া চিনিতে পারে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বঙ্কিম দেশের অবস্থা প্রকৃতই জানিতেন বলিয়াই পূর্ব্বাহ্নে পত্র-সূচনায়ই লিখিয়াছিলেন—

"কালস্রোতে সকলই জলবুদ্বুদ মাত্র। এই 'বঙ্গ দর্শন' কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়ম বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইবনা। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবেনা। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

এই সময়কার সাময়িক পত্রিকার মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু', অক্ষয় কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'পরিদর্শক' বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বগামী সাময়িক পত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী বান্ধব ১২৮১, ভ্রমর ১২৮১, আর্য্য-দর্শন, ভারতী, নব্য ভারত, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দেশ ও জাতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুরাগের কথা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি ইংরাজী শিক্ষার বা ইংরাজী প্রচলনের বিরোধী ছিলেন। যাহা হিতকারী তাহার বিরোধ তিনি করিতে পারেন না। সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বরং ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজি শিক্ষার সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের জন্য এবং ইউরোপীয় জাতি সমূহের সহিত সংশ্রব রাখিতে ইংরাজীর প্রয়োজন, কিন্তু বাঙ্গালীকে বঙ্গবাসী করিয়া গড়িতে একমাত্র বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি ব্যতীত তাহা কখনও সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি:

"আমরা ইংরাজী বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতা ইংরাজী ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল। আরও বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত, সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত এক পরামর্শী একোদ্যম না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক পরামর্শীত্ব একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রী, তেলিঙ্গি পাঞ্জাবী—ইহাদের সাধারণ মিলন ভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে, অতএব যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।"

এই সময়ে স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় তাঁহার 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' নামক ইংরাজী মাসিক (কখনও দ্বৈমাসিক বা ত্রৈমাসিক) পত্র আবার পুনরুদ্ধৃত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। এবং বঙ্কিমের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন। বঙ্কিম এই

পত্রখানির পুনরাবির্ভাবের আশায় বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করেন। এবং সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। শম্ভুচন্দ্রের নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেইখানিতে তাঁহার উদ্দেশ্য আরও বিষদ্‌ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা সমগ্র পত্রখানিই এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—

Berhampur
The 14th March, 1872.

My dear Sir,

I am very happy to acknowledge your favour of the 11th. You are mistaken in considering me a stranger; I claim the honour of being acquainted with you; we have met more than once.

I scarcely know how to thank you for the many fine things you are kind enough to say of me. But as I know that my obligations to you in this respect are of long standing, I will not seek to diminish their weight by a tardy return of thanks.

I wish you every success in your project.* I have myself projected a Bengali† Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy, between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or fo evil has become our vernacular but this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali Society. This, I think, is not exactly what it ought to be; I think that we ought to disanglicise ourselves, so to speak, to a certain extent and to speak to the masses in the language which they understand. I therefore project a Bengali Magazine. But thus only half the work we have to do. No purely vernacular can completely represent the Bengali culture of the day. Just as we ought to address ourselves to the masses of our own race and country we have also to make ourselves intelligible to the other Indian races and to the governing race. There is no hope for India until the Bengali and the Punjabi understand and influence each other, and can bring their joint influence to bear upon the Englishman. This can be done only through medium of the English and I gladly welcome your projected periodical. But I have thought it necessary to give you my ideas on the subject of an Anglo Bengali Literature at length, because you will find me singing to a different tune on other occasions, on the principle that each side of a question must be put in its strongest light, specially when we have to fight against a popular one.

After that I need not tell you that I shall not want in inclination to co-operate with you and if my literary services are worth enlisting your side, they are at your disposal. It is true I am likely to be a little overworked at present, owing, not to my literary engagements, but to a reduction in the number of officers at our station but I will nevertheless make time both for your magazine and mine. And if it be worthwhile to insert my name in your list of contributors, I have no objection to your doing so.

Hoping this will find you all serene.

I am,
My dear sir,
Yours truly
Bankim Chandra Chatterjee.

অতঃপরে উত্তর পাইয়াই, শম্ভুচন্দ্র সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বঙ্কিম উক্ত পত্র সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান সদুপদেশ দিয়া উত্তর লেখেন। উপন্যাস রচনার কাজটী যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, এই বিষয়েও বঙ্কিম ইঙ্গিত করিতে শৈথিল্য করেন নাই। রৌদ্রতাপ বঙ্কিম মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া গ্রীষ্মের

* In 1872 Dr. Shambhoo Chandra Mookherjee revived his Mookerjee's Magazine and asked Bankim Chandra to help him with contribution. The first series of Mookerjee's Magazine had contained only five numbers and were published from Jan. to May 1861.

† "The Bangadarshan."

সময় তিনি বহরমপুর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, পত্রখানিতে এ কথারও ইঙ্গিত আছে। সমস্ত পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :

Berhampore
March 27—'72

My dear Sir,

Many thanks for your kind offer of assistance in regard to my journal.* Such a co-adjutor as yourself would be invaluable, and if men like you took an interest in it, there can be no doubt that I shall succeed.

For the English Magazine†, I can undertake to supply you with *novels, talks, sketches and squibs.* I can also take up political questions, as you wish. Malicious Fortune has made me a sort of jack of all trades and I can turn up any kind of work, from transcendental metaphysics to verse-making. The quality of course you can't expect to be superior, but I will do all I can for you. The novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good-deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.

I do not approve of Tara Prosad's‡ suggestion that the Magazine† should be a quarterly, I prefer monthly publication.

* Banga-Darshan is here referred to. It was going to be published in April, 1872,

† Babu Taraprosad Chatterji was one of Bankim Chandra's collaborators of the Banga-Darsana. He was an able writer both in English and Bengalee and a reputed member of the Provincial Executive Service.

‡ Mukherjee's Magazine (second series) was neither monthly nor quarterly. Only ten numbers used to appear in a year. It was stopped by the end of 1876, when Dr. Mukherjee was called away by His Highness the Maharaja Bir Chandra Deb Manikya Bahadur of Independent Tipperah to be his Minister-Associate. [M. N. Ghosh.]

I don't think of going to *Calcutta till the rains or till at least it is a little cooler and Railway travelling becomes possible. When I do go however I will make it a point to call upon you.*

Hoping this will find you all serene. I am
yours truly.
Bankim Chandra Chatterji.

সাহিত্যের সহায়তায় জাতি গঠনই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। এই জন্যই বঙ্গদর্শনের সূচনা। অতঃপরে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রজমাধব বসুকে প্রকাশকরূপে প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইল। লেখকগণের নাম, যথা—

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
লেখক—শ্রীদীনবন্ধু মিত্র
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ জগদীশনাথ রায়
„ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
„ রামদাস সেন
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার

এই সমস্ত মহারথিগণের পরিচয় অত্যাবশ্যক। বাঙ্গলা দেশে ইহাদের নাম সর্ব্বজন পরিচিত। দীনবন্ধু তখন বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে তিনি "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" লিখিয়া পাঠকের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। দ্বিতীয় বৎসরে দীনবন্ধু বন্ধুবান্ধব, পাঠক, অনুরাগী সকলকেই শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

জগদীশনাথ বঙ্কিমের অন্যতম সুহৃদ। এই জগদীশ বাবুই "বিষবৃক্ষে" হরদেব ঘোষালে কল্পিত হইয়াছেন নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশ বাবুর মধ্যে চিঠিপত্র চলিত। *

কবিবর হেমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার মধ্যে কামিনী কুসুম, মনুষ্য জাতির মহত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ) ইন্দ্রালয়ে

* দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতকুমারের প্রবন্ধ "বঙ্কিমবাবু"। চিঠি পত্রের কথা ললিতবাবু জগদীশবাবুর পুত্র খগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট শুনিয়াছেন।

সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব, ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার, এই কি আমার সেই জীবন তোষিণী, সুহৃৎসঙ্গম প্রভৃতি কবিতা খুবই সুন্দর। অক্ষয় সরকার মহাশয়ের 'গ্রাবু' ও 'উদ্দীপনা' খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আর রামদাস সেন মহাশয়ের সুখ্যাতি ছিল ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত, কালিদাস, হেমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, গৌড়ীয় ও বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, বেদপ্রচার, ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র, বাণভট্ট, জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহসাঙ্কচরিত প্রবন্ধ যেমন সারগর্ভ তেমনি বহুতত্ত্ব সম্বলিত। পণ্ডিতাগ্রগণ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে কিছু লেখেন নাই। তবে কবিবর নবীনচন্দ্রের অনেক খণ্ড কবিতা, লালমোহন বিদ্যানিধির আদিম অবস্থা শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, কোমৎশিষ্য যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের 'কোমৎদর্শন' ও 'জাতিভেদ' এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী ভারত মহিমা, বিদ্যাপতি, শ্রীহর্ষ, দেবদত্ত, ঐতিহাসিক ভ্রম, প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রতিভা, সভ্যতা, মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ, "জ্ঞান ও নীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ ও অত্যাদৃত করিয়াছিল।

১২৭৯ বৈশাখ মাসের সংখ্যাদৃষ্টে বুঝা যাইবে বঙ্কিমের স্বরচিত পত্র সূচনা, ভারতকলঙ্ক, বিষবৃক্ষ, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ও সমালোচনা ব্যতীত আর মোটে দুইটি প্রবন্ধ ছিল, একটী জগদীশ নাথ রায়ের সঙ্গীত, আরেকটি অক্ষয় চন্দ্র সরকারের উদ্দীপনা। প্রায় মাসেই বঙ্কিমের এরূপ অধিক লেখা থাকিত।

বস্তুতঃ সকলে লিখিলেও তিনি একাই পত্রখানি আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রবন্ধাদি দেখিবার পরেও প্রথম চারিবৎসরের বঙ্গদর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহার উপন্যাস বাহির হয়—

(১) বিষবৃক্ষ - ১২৭৯ বৈশাখ হইতে ফাল্গুন
(২) ইন্দিরা—ছোট গল্প চৈত্র (১২৭৯)
(৩) যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ বৈশাখ
(৪) চন্দ্রশেখর—১২৮০ শ্রাবণ হইতে
(৫) রাধারাণী—১২৮২ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ
(৬) কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ পৌষ হইতে

সব উপন্যাসই খুব অদ্ভুত হইলেও, কেবল চিত্তবিনোদন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। জাতি গঠনই ছিল প্রধান কাম্য। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিই এখানে সমধিক ভাবে আলোচনার বিষয়ীভূত। কারণ ইহাতে জাতিগঠনের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

প্রথম বৎসরে পূর্ব্বোক্ত পত্র সূচনা ব্যতীত, ভারতকলঙ্ক ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, উত্তর চরিত, বঙ্গদেশের কৃষক, রামায়ণের সমালোচনা, বাঙ্গলা ভাষা, বাবু—ইত্যাদি প্রবন্ধ বাহির হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে কমলাকান্তের দপ্তর আরম্ভ করেন এবং একা, মনুষ্য ফল, পতঙ্গ, আমার মন, বসন্তের কোকিল, ১২৮১ (কার্ত্তিক) আমার দুর্গোৎসব, একটী গীত, বিড়াল, মশক (১২৮১ বৈশাখ) প্রভৃতি অদ্ভুত প্রবন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এতদ্ব্যতীত সাম্য, সুবর্ণগোলক, প্রাচীনা নবীনা, বাঙ্গালীর বাহুবল, ভারত মহিমা, দেবতত্ত্ব, কোন স্পেসিয়ালেরপত্র, ইউনিটি প্রভৃতিও আলোচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদনের পরলোকগমনান্তে আলোচনা—শিশির কুমার ঘোষের নয়শো রূপেয়া, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, রাজ নারায়ণ বসুর সেকাল ও একাল প্রভৃতিরও খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা হয়।

এখন প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ভারতকলঙ্কে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন কাপুরুষতার জন্য ভারত পরাধীন—এরূপ কারণ নয়। ভারতবর্ষের চিরকলঙ্কের তিনটী কারণ আছে:—(১) হিন্দুর ইতিবৃত্তি নাই (২) ভারত সাধারণতঃ আত্মরক্ষায় সন্তুষ্ট, পররাজ্য লাভের ইচ্ছা করে নাই (৩) হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। এই পরাধীতার সাধারণতঃ দুইটী কারণ (ক) ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃ স্বাধীনতার আকাঙ্খা রহিত। তাহারা বিবেচনা করে—যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা পরজাতীয় রাজা উভয়েই সমান। রাজ্য রাজার সম্পত্তি, তিনি রাখিতে পারেন

রাখুন, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিবনা। এই নিরপেক্ষতার কারণ দুর্ব্বলতা নয়, অনভিলাষ। সাধারণতঃ হিন্দু সমাজ কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। ইহার কারণ এদেশের জলবায়ু ও খাদ্যপ্রাচুর্য্য নিয়ত তাহাদিগকে অতীন্দ্রিয় বিষয় লাভে সহায়তা করিত। দ্বিতীয় বাহ্যসুখে অনাস্থায় তাহাদের নিশ্চেষ্টতা জন্মিত। নিষ্কামতাই তাহারা পুণ্য জ্ঞান করিত, এমনকি বৌদ্ধধর্ম্মেরও নির্ব্বানেই মুক্তিলাভ হইত।

(খ) দ্বিতীয় কারণ—হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজ মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি হিতৈষণার অভাব। আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য, সকলেরই এইরূপ কর্ত্তব্য। সকলের যদি একই কার্য্য তবে সকলেরই এক মতাবলম্বী একত্র মিশ্রিত হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ—অর্দ্ধাংশ মাত্র।

জাতি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ভাগ—হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে আরও অনেক জাতি আছে, সকলের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নয়, তাই পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়াও আত্মমঙ্গল সাধন করিব। এই জ্ঞানেই ইটালী একরাজ্যভুক্ত হইয়াছে, প্রবল প্রতাপশালী নূতন জার্ম্মান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্কিম বলেন, এই মনোবৃত্তির গুরুতর দোষ আছে।

আর্য্যদিগের পূর্ব্বে যে জাতি-প্রতিষ্ঠা ছিল, বংশ বিস্তৃতিতে তাহা আর সম্ভব হইলনা, ভারতবর্ষ খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল;—সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আবার ধর্ম্মভেদ জন্মিল। পরে আবার মুসলমান আসিল, ভারতবর্ষ এখন মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্রে কর্ম্ম করিতে লাগিল, ঐক্যজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেবল তাহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম এক ভাষা, এক জাতি, একদেশ তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির একতা বোধ নাই, শিখের মধ্যে শিখ জাতির একতা বোধ নাই। তবে বহুকাল যাবৎ বহুসংখ্যক ভিন্নজাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন নদীর মুখ নির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণেরও সেইরূপ ঘটে। তাহাদের পার্থক্য যায়, কিন্তু ঐক্য জন্মে না। ভারতবর্ষেও জাতি প্রতিষ্ঠা লোপ পাইয়াছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বন্ধন কি সম্ভব নয়?

ইতিহাস কীর্ত্তিত কাল মধ্যে কেবল দুইবার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্র শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল, তখন মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অর্জ্জিত পূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদয় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদানত হইল। অদ্যাপি মারহাট্টা ইংরাজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ। ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসের হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিনিয়ানওয়ালা লেখা রহিল।"

এই দুইটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বঙ্কিম বলিতেছেন, "যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

এই জাতি বন্ধন স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠারই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় মহাসম্মিলনের বহুপূর্ব্বে, ইলবার্ট বিল আন্দোলনের পূর্ব্বে এমন কি লর্ড লিটনের Vernacular Press Act-এরও পূর্ব্বে ভারতবাসীর প্রাণে অনুভূতি জাগাইয়া যাবতীয় হিন্দু মুসলমান, মারহাটা, শিখ, রাজপুত, জাট তেলেগু, তামিল, আসামী, উড়িয়াকে সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতেছেন, "সমুদায় ভারত একজাতির বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারে!"

এই জাতীয় বন্ধন ও জাতি প্রতিষ্ঠার কথাই বহরমপুরে থাকিয়া বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালীকে প্রথম শুনাইয়াছেন, আর সেই জাতির সিদ্ধমন্ত্র হইল "বন্দেমাতরম্।"

কিন্তু বঙ্কিম অকৃতজ্ঞ নহেন। কে এই জাতি প্রতিষ্ঠার আভাষ দিয়াছে? বঙ্কিম বলিলেন ইংরাজ আমাদিগকে এই নূতন কথা শিখাইয়াছেন। হিন্দু যাহা পারে নাই, ইংরাজ তাহা শিখাইয়াছে। ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী, আর আমরা শিখিয়াছি স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। এই জাতি প্রতিষ্ঠারই নাম Nation, Nationality বা Nationalism.

কিন্তু বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি চাহিয়াছিলেন, কিসের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন? বঙ্কিমের কাম্য কি ছিল বর্ত্তমানে আমরা যে স্বরাজ পাইয়াছি—সেরূপ কিছু? না, তাহাপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে, অনেক বেশী। বস্তুতঃ তিনি চাহিয়াছিলেন আমাদের এই দেশ যেন সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য। তাই তিনি বলেন—

"আর বঙ্গভূমি তুমিইবা কেন মণিমানিক্য হইলেনা, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতনা। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম, ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে চীনে দেখিত তুমি আমার

"আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ -
"একটি গীত", বঙ্গদর্শন ১২৮১, ফাল্গুন।

তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"গণি, আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরষা আছে —১২০৩ হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি, যেদিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছেন, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি, কই অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ, এক জাতীয়ত্ব মিলিল কৈ, ঐক্য কই, বিদ্যা কই, গৌরব কই, শ্রীহর্ষ কই, ভট্টনারায়ণ কই, হলায়ুধ কই, লক্ষ্মণ সেন কই, আর কি মিলিবেনা? হায়, সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের কি মিলিবেনা?

"মণি নও, মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি! বসন্তের কোকিলেও (১২৮০, চৈত্র) বলিয়াছেন—

"কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে বলা হইলনা—যদি কোকিলের কণ্ঠপাই, অমানুষী ভাষা পাই, নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।" এই মনের কথা, এই ঈপ্সিতের কথাই মূর্ত্ত হইয়াছে "আমার দুর্গোৎসবে" ১২৮১ কার্ত্তিক, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে, আনন্দমঠে ১২৮৭—১২৮৯। এই দীর্ঘ আট বৎসর কাল বঙ্কিম সকলকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন - মা যাহা হইবেন—অমিত প্রভাবশালিনী, বিদ্যা, অর্থ, শক্তি সমন্বিতা, শত্রু সংহারিণী। তাই কমলাকান্ত মাতৃমূর্ত্তির স্বরূপ বলিতেছেন—

"রত্ন মণ্ডিত দশভুজা দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।"

তিনি বলেন, এই মূর্ত্তি নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইবে— দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞান

সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় কার্য্য সিদ্ধিরূপী গণেশ—

এই মূর্ত্তিই বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন চীন, আমেরিকা, ইউরোপ, মিশর প্রভৃতিকে দেখাইতে।

'বন্দেমাতরমের' পরিকল্পনাই এই দশভুজা মাতৃমূর্ত্তি —যাহা আমার দুর্গোৎসবে আছে, আনন্দমঠে আছে, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতেও আছে—

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী,
অমলা কমল দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং"

কিন্তু কখন মা প্রকাশিত হইবেন? সত্যানন্দ বলিতেছেন, "যখন মায়ের সকল সন্তান মা বলিয়া ডাকিবেন।" বন্দেমাতরমও নির্দ্দেশ দিতেছে, প্রতিহৃদয়ে মাতৃমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে হইবে—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণা শরীরে —
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

যেমন সত্যানন্দ আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদিগকে কামজয়ী সেবাপরায়ণ, ধর্ম্মশীল করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বন্দেমাতরমই আনন্দমঠের ধ্যানমন্ত্র. পূর্ব্বে কমলাকান্তও ডাকিয়াছেন—

"উঠ মা হিরন্ময়ী বঙ্গভূমি, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব, উঠমা দেবী দেবানুগৃহীতে, এবার আপন ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয় ভক্তি ত্যাগ করিব।"

ভবানন্দ যেমন বলিতেছে—"আমরা অন্য মা মানিনা, জননী জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের জননী "জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।" কমলাকান্তও বলিতেছেন, "এই ছয়কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয়কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, ছয়কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব।"

কিন্তু মায়ের প্রতিষ্ঠা ইহাতেই সম্ভব নয়—ত্যাগ চাই। ছয়কোটি সন্তানকে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মায়ের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যেমন সঙ্গীতে আছে—

"সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভূজৈ ধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে?"

কমলাকান্তও 'আমার দুর্গোৎসবে' বলিতেছেন—

এসো ভাই সকল, আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয়কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রগণ উঠিতেছে, নিবিতেছে, আবার উঠিতেছে, উহারাই পথ দেখাইয়া দিবে, চল চল অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে ঐ কালসমুদ্র তাড়িত ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'আনন্দমঠে' যে মাতৃমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে—মা যা হইবেন, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটিতেও সেই ভাবটিই মূর্ত্ত হইয়াছে—মা হইবেন সুজলা, সুফলা শস্যশালিনী, সুখদাং বরদাং কমলাং বিদ্যাদায়িনী ত্বাং, অমলাং কমলাং, বরদাং।

আমার দুর্গোৎসবে বঙ্কিম বলিতেছেন—

"বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তিখড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে। "কত নাচ গো" বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচিমণ্ডার লোভে বঙ্গ পূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশবিদেশী, ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে—কত দীনদুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে! কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গাইবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা, মা, মা!"

বন্দেমাতরম গানটিতেও সেই পূর্ণভাবই প্রকট হইয়াছে—

"নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্।

আমার মা ধরণীম্ ভরণীম সুস্মিতাং ভূষিতাং হইবেন। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, মিশর ও সমগ্র পৃথিবীতে পূজিত হইবেন।

বন্দেমাতরমের এই মহত্তম কল্পনাই 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'আনন্দ মঠে'। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায় বন্দেমাতরম্ সহসা সৃষ্ট হয় নাই—ইহা বহু সাধনা-প্রসূত ঋষির জন্মভূমি-প্রেমোত্থিত সমগ্র হৃদয়তন্ত্রী-মথিত ভারতের বাঁচিবার সঙ্গীত, ঐক্যের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠার সঙ্গীত! এই সঙ্গীত বুঝিয়াছিলেন জাতীয়তার সাধক মাতৃমন্ত্রের উপাসক অরবিন্দ। তাই তিনিই ইহার খাঁটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, খাঁটি জাতীয়তার উপাসকই এই মন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবে, আর কেহ নয়। অরবিন্দের মতে—

"The song is not only a National anthem as the European Nations look upon their own, but one replete with mighty power, being a sacred 'Mantra' revealed to us by the author of the Anandamath who might be called an inspired Rishi. The Mantra is not an invention but a revivication of the old Mantra which became extinct so to speak by the treachery of one Nava Kissen. The meaning of the song was not understood then because there was no patriotism except such as consisted in making India the shadow of England and other countries. The so-called patriots of that time might have been well-wishers of India but not certainly ones who loved her as Mother."

আর এ সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—যিনি ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের মৃত্যুহীন প্রাণখানিও বিসর্জ্জন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। আজ এই সঙ্গীত যে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত তাহাতে আর কি বিচিত্রতা আছে?

"বন্দেমাতরম্" বহরমপুর, কি কাঁঠালপাড়া কোথায় প্রথমে পরিকল্পিত, আমরা সঠিক বলিতে না পারিলেও উহা যে আনন্দ মঠের পূর্ব্বে রচিত এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পূর্ণচন্দ্রও বলেন—

"বন্দে মাতরম" গীতটি আনন্দমঠের বহু পূর্ব্বে রচিত হয়। বঙ্কিম তখন সম্পাদক ছিলেন"। বঙ্কিম সম্পাদক ছিলেন ১২৭৯-১২৮২ পর্য্যন্ত, ১৮৭২-১৮৭৫—সুতরাং ইহা আমার দুর্গোৎসবের অল্প পরেই রচিত হয়।

সাধক বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতের শক্তি জানিতেন। তাঁহার স্ত্রী কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রীদের কাছে বলিতেন—

"একদিন এ গানে ধূলো থেকে গাছের মাথা পর্য্যন্ত অগ্নিকণার মত গরম হয়ে উঠবে।"

এই গানটীর সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যৎ বাক্য আরও পাই। পূর্ণচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে এই একপাত matter কম পড়িলে রামপণ্ডিত মহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন, তিনি ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটী 'লোকরহস্যে' প্রকাশিত হইয়াছে,কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই।" বন্দেমাতরম্" গীতটী রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আজই পাবে।" একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়া ছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে "বন্দেমাতরম্" গীতটী লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলেন, বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটী লেখা আছে—উহা মন্দ নয়ত—ঐটা দিন না কেন? সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, "উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।"

নারায়ণ ১৩২২ বৈশাখ "বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা"।

সুতরাং উহা ১৮৭২-৭ মধ্যে রচিত হয়, এবং কাঁঠালপাড়ায় প্রথমে দৃষ্ট হয়।

এই গীতটির একটী সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন। পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটী সুর বসাইয়াছিলেন বেহাগ সুরে ইহা ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম জীবনী"তে বলেন—"কাঁটালপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মহাশয় ত্রিশ বৎসর আগেকার একটী কথা বলিয়াছেন, তিনি সে সময় বঙ্গদর্শনে কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা প্রুফ রিডার অথবা এমনই একটা কাজ লইয়া বঙ্গদর্শনের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা তিনি বঙ্গদর্শনের কাপি চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "কাপি লেখা নাই।"

রামবাবু বলেন, "কাপির অভাবে কাজ বন্ধ আছে।" ঝটিতি "বন্দেমাতরম" গানটী লিখিয়া দিলেন।

শচীশবাবুর এই কথাটি প্রমাণ বিরোধী। পূর্ণবাবুর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

স্বর্গীয় তারক বিশ্বাস মহাশয়ও 'বঙ্কিম স্মৃতি' লিখিবার জন্য বহু স্থানে ঘুরিয়াছেন। বিশেষতঃ রাম পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আনন্দমঠ" বা'হর হইবার পূর্ব্বেই "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটী রচিত হয়। গানটি পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সেটি ছাপিবার বলবতী ইচ্ছা হওয়ায় তিনি ঐ কথা বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে বলেন, "এ গান ছাপিবার ও বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই। এ গানের গৌরব এখন হইবে না। যদি বাঁচিয়া থাক আর ত্রিশ বৎসর পরে এ গানের কি আদর হয় তাহা বুঝিবে।"

আমরা পূর্ণচন্দ্র এবং তারক বিশ্বাস মহাশয়ের কথাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,"আমার দুর্গোৎসব" প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮০ (১২৮৭), সুতরাং এই দুই-এর মধ্যবর্ত্তীকালে "বন্দেমাতরম" রচিত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ হইতে ১৮৭৯ মে পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তিনি বাড়ী থাকিতেন। উক্ত দুইটির কোনটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত সময়টা ঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলেও, একই ভাবধারাই যে তিনটি পূত ধারায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের কথা—"একদিন এ গানে ধুলো থেকে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকবে—গরম হ'য়ে উঠবে।"—এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকটা সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিমের ঈপ্সিত লাভের জন্য কোনরূপ চেষ্টা কই ? ছেলেদিগকে "আমার দুর্গোৎসব" মুখস্থ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না—সভাসমিতিতে দেখিতে পাই 'বন্দেমাতরম' তোতার মত গীত হয়, লোকে ভ্রাতৃবৎসল হইতে শিক্ষা পায় না, পরের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয় না—অধর্ম্ম আলস্য ইন্দ্রিয় ভক্তি বর্জ্জন করে না। হায়, কবে তাহারা মানুষ হইয়া ঋষি বঙ্কিমের সাধনা সফল করিবে ?

আমার দুর্গোৎসব এবং আনন্দমঠের পরিকল্পনা সম্বন্ধে লালগোলার রাজা স্যার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র Road Cess * এবং অন্যান্য জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপার মীমাংসার জন্য তিন মাস লালগোলায় ক্যাম্প করিয়াছিলেন। আমার বাড়ীর কালীবাড়ীর পেছনে দোতলা একটী বাড়ী ছিল, তাহাতে তিনি থাকিতেন। ঐ সময়ে রোজ কালীবাড়ীতে আসিয়া অনেক সময় কাটাইতেন ও সময় সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। কথাবার্ত্তায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কালীবাড়ীর সংস্রবেই 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'আনন্দমঠ' রচিত হয়।"

বঙ্কিম লালগোলায় ক্যাম্প করিয়াছিলেন বর্ষার সময়ে। আর এই সময় পদ্মার দুই পারের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত চর ডুবিয়া স্থানটীকে এক পারকুলহীন সমুদ্রাকারে পরিণত করে। কালসমুদ্রের ন্যায়ই ভীষণ পদ্মা ভয়াবহ হইয়া উঠে। বহরমপুর ও নৈহাটীর ভাগীরথী (গঙ্গা) আর লালগোলার বর্ষার ভীষণ পদ্মায় অনেক পার্থক্য।

* ১৮৭১, ১০ই জুন তিনি কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

'ইংরাজ স্তোত্রে'র কথাগুলি (১২৭৯ অগ্রহায়ণ) পড়িতে পড়িতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠে বটে, কিন্তু সে হাসি নিজেরই দোষচিত্রনে চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে। দুই একটী কথার উল্লেখ করিব—

"হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে বরদ! আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরী দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমাকে খোসামুদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মন-রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমায় প্রণাম করি।

হে মানদ! আমায় টাইটেল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও, আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে মহা-মানাস্পদ হইতে বাসনা করি। তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সারী করিব, তোমার প্রীত্যর্থে স্কুল করিব, তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব—

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত আমি তাহাই করিব, আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চশমা দিব, কাঁটা চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব—

হে মিষ্টভাষিণ! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব, পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টার লেখাইব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে ভগবন! আমি অকিঞ্চন, আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও, আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি মনে রাখিও।...

ফাল্গুণের ১২৭৯ সংখ্যায় 'বাবু'তেও এই ভাবের কথা আছে—

"যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশ গুণ, পৃষ্ঠে শত গুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু। যাহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্ম ধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাসনেল থিয়েটার'* তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকটে খ্রীষ্টীয়ান, কেশব চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহার কালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা তিনিই বাবু। যাহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারীতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।

হে নরনাথ আমি যাহাদিগের কথা বলিলাম তাঁহা-দিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।"

এই সমস্ত প্রবন্ধই অদ্ভুত জাতীয়তাপূর্ণ, এ পর্য্যন্ত ঐরূপ জাতীয় শিক্ষা আর কোনও গ্রন্থে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমের সমস্ত প্রবন্ধ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অবসর সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে খুবই ভালবাসিতেন।

'রামায়ণ সমালোচনায়'ও তুল্যরূপ জাতীয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য লেখকগণ এ দেশের মহাকাব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কিরূপ অদ্ভুত সমালোচনা করে, তাহাদিগকে এই প্রবন্ধে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। বঙ্কিম দেখাইতেছেন যে, জনৈক বিলাতী সমালোচক নিম্ন-লিখিতভাবে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন—

* ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর (১২৭৯, অগ্রহায়ণ মাসে) ন্যাসনাল থিয়েটার, পাবলিক থিয়েটারে পরিণত হয়।

"রামায়ণ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। ইহার রচনা নিম্ন-শ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। ইহা হিন্দু কবির পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নয়।

"ইহার তাৎপর্য্য বানরদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরেরা বোধহয় আধুনিক Boerwal নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। রামায়ণে কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে—বুদ্ধিহীনতার যে দোষ তাহা কবি দেখাইয়াছেন। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার চারিটী ভার্য্যা ছিল। বহু বিবাহের বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। স্বভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বুড়া বাপের কথায় বনে গেল·

"ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতঃই সতী এই সীতার ব্যবহারেই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিন্দুরা এইজন্যই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে না।

"...লক্ষ্মণ যে রামের পিছু পিছু বেড়াইল, ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের নিশ্চেষ্টতার ফল।

"রামায়ণ অকর্ম্মা লোকের ইতিহাসে পূর্ণ—ভরত আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। বানরেরা দয়া করিয়া সীতাকে রাবণের হাত হইতে কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে! রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সেদিন রক্ষা পাইল, পরে ক্রোধ বশতঃ একদিন তাড়াইয়া দিল...কিছু দিন পরে সীতা খাইতে না পাইয়া রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম দেখিয়া রাগ করিয়া তাহাকে মাটীতে পুতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে।

"গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অশ্লীলতা-ঘটিত; সীতার বিবাহ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ—এ সকল অশ্লীলতাঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণ রস বিরল, বানর কর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন কেবল এটীই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়......

"রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত অশুদ্ধ। রামায়ণের একটী কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে 'অযোধ্যাকাণ্ড'। গ্রন্থকার তাহা অযোদ্ধাকাণ্ড না লিখিয়া অযোধ্যাকাণ্ড লিখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।"

এইরূপ জাতীয়তামূলক প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের পত্রে পত্রে। যাহা হউক ১৮৭২ জুলাই মাসে Mukerjee's Magazine বাহির হইলে বঙ্কিম যে সমস্ত পত্র লেখেন পাঠকের গোচরার্থ এইগুলি উদ্ধৃত করিলাম। অবিরত পরিশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ভাদ্র মাস হইতেই অসুস্থ হইয়া অনেক দিন কষ্ট পান। আশ্বিন মাসেও পুনরায় জ্বর হইয়া কষ্ট পান। এই সব কারণে এবং বঙ্গদর্শনের জন্য অবিরত পরিশ্রমে তিনি মুখার্জ্জির ম্যাগাজিনে কোন প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমের এই পত্রগুলিতেও তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন—

Berhampur
Sept. 4-72.

My dear Shambhu,

Kindly excuse the long delay which has taken place in replying to you. At first some thing or other made me put off the reply and then came a long and serious illness, from which I have just been freed.

I would have redeemed my promise and contributed my humble mite to your Magazine but for my illness. All brain work is prohibited to me at Maga[zine] to a friend protem.

By the way is your second issue out? I fancy not, if so you are sadly wanting in punctuality. Of course you never promised punctuality but restricted your engagements to ten issues in the year. But still you are lagging behind.

I assure you I do not deserve—at least have long ceased to deserve your compliments

on my gallantry. I see you have not forgiven my transgressions.1 I yet hope you will.

The 'Observer' is hard upon you. As you are able to hold your own against the Observer, I wish you won't waste breath on the subject.

I never read the Bengal Times ?2 What did he say ? Trusting this will find you all hale.

I am
Yours Sincerely
Bankim Ch. Chatterji.

যাহা হউক, এখন উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি—বিষবৃক্ষের নাম ছিল পূর্ব্বে "উভয়ের দোষ," দুই ভ্রাতা মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হয়। বিষবৃক্ষের ঘটনা অনেকটা মজিলপুরের দত্ত পরিবারের ঘটনাবলম্বনে রচিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমরা মজিলপুরে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলাম, বড় ভাল মানুষ এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সুন্দরী ছিলেন। নাম সূর্য্যমুখী, ইঁহারই স্বামী নাকি ছিলেন নগেন্দ্র দত্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারুইপুর থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকবার মজিলপুর গিয়া দত্তবাবুদের বাড়ী থাকিতেন এবং এই পরিবারই নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ক্ষেত্র হইয়াছিল।

'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে সাহিত্যরথী অক্ষয় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিষবৃক্ষ' বহরমপুরে লিখিত হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল উভয়েরই দোষ। নগেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রের বিপুল একটা মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমস্ত উভয়ের দোষ পাল্টাইয়া লেখা হইয়াছে 'বিষবৃক্ষ'। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পরিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্থ হইলে—সূর্য্যমুখীর নিতান্তই দুর্দ্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্ত্রস্ত হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা, এই প্রতিভাতেই বঙ্কিম বাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।"

নব পর্য্যায়ে বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৯।

যাহা হউক, 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইবার পরেই সোমপ্রকাশে (১১ই বৈশাখ ১২৭৯) এক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হয়। ইহার কিয়দংশ প্রয়োজন বিধায় নিম্নে প্রদান করিলাম—

...ঈদৃশ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমবেত চেষ্টাবদ্ধ হইয়া যে মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ অগ্রসর, এটী নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ক্ষোভের বিষয় প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আশানুরূপ পরিতৃপ্তি হইল না। রচনাগত দোষ সংশোধন কর্ত্তব্য। আমরা বিদ্বেষ বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ লিখি নাই। বঙ্গদর্শনে বর্ণবিন্যাস দোষ দৃষ্ট হইল। সাবধানতা অবলম্বন বিধেয়—কারণ

(১) রয়েল ৮ পেজী ৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে, অবয়ব বর্দ্ধিত করা উচিত ছিল।

(২) অনেকগুলি প্রবন্ধ পত্রিকানুরূপ হয় নাই। পত্র সূচনাটি যুক্তিপূর্ণ। আর্য্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক গুণগান আছে।

(৩) বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট বোধ হয় দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

(৪) বিষবৃক্ষের স্থানে স্থানে "গুরু সাহেবী বাঙ্গলা ব্যবহৃত।" হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে, ঠেঙ্গাইতেছে পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এবম্বিধ পদ্ধতি অবলম্বন—মাতৃভাষার হত্যা ভিন্ন আর সম্ভব কোথায় ?

এই আলোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিম বুঝিলেন ইহা তাঁহার বন্ধু নফর ভট্ট মহাশয়ের লিখিত। তিনি তখন বহরমপুরে মুন্সেফ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন এক মজলিসে আলোচনা প্রসঙ্গে নফরবাবুর বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইবার কারণ হইয়াছিল*। বঙ্কিমবাবু

1. The well-known Anglo Indian Weekly of Calcutta, The Indian Observer, which was started by Mr. Charles Tawney, Sir Alfred Croft, Sir Henry Cotton R. H. Willson, Lt-Col. R. D. Osborne and others in February 1871.

2 The Bengal Times of Dacca, edited by Mr. E. C. Kemp. After the Partition of Bengal it took the name of Eastern Bengal and Assam Era.

* নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণ এবং একতরফা বলিয়া আমি এখানে দিতে বিরত হইলাম। শচীশবাবু বঙ্কিম জীবনী তৃতীয় সংস্করণ ৯৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

নিজেই নফরবাবুর বাসায় গিয়া সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নফর, সোমপ্রকাশের সমালোচনাটি নাকি তুমি লিখিয়াছ ?"

নফরবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, "হাঁ"।

একটু হাসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সরল উচ্চহাসি হাসিলেন। নফরবাবুও তাহার কাষ্ঠহাসি সেই হাসির সহিত মিশাইয়া স্বীকার করিলেন। এইবার উভয়ে উচ্চহাসি হাসিয়া অন্তরের সরলতা প্রকাশ করিলেন। সেই অকপট হাসিতেই দুই বন্ধুর পুনর্ম্মিলন হইল। অতঃপর উভয়ের সৌহার্দ্দ্যের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তবে এই সামান্য ঘটনাটিও বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মৃত হন নাই। 'রজনী' উপন্যাসে উল্লেখ করিয়াছেন। 'রজনীর' লবঙ্গলতা বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাঙ্গিয়া গেল। যেন জলের উপর মেঘের ছায়া সরিয়া গেল।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে একটি রঙ্গকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :

"বঙ্গদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বর খানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরাণী সদর পৃষ্ঠায় যে বড় বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নীচে কখন একটী শূন্য বসাইয়া দিয়াছেন সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা সবেমাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন, তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিলেন, "বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে বঙ্গদর্শন, এযে রঙ্গদর্শন ?"

বঙ্কিম হাসিতে হাসিতে উত্তর করেন, "আমি তো বঙ্গদর্শনই লিখিয়াছিলাম, তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রঙ্গদর্শন হইয়াছে, আমি কি করিব, মা ?"

নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৪।

এইখানে শচীশবাবু প্রদত্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটী স্মৃতিকথা পাঠককে উপহার দিতেছি—

"তখনকার দিনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরা বাকী খাজনার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন, পরে মুন্সেফদের উপর সে ভার অর্পিত হয়। উক্ত মোকদ্দমা কয়টী কিছুদিন হইতে পড়িয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই ধনশালী জমিদার। একপক্ষের উকীল ছিলেন মাননীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অপরপক্ষে ছিলেন গুরুদাসবাবু। এই প্রথিতনামা উকীলদ্বয়—মিটমাটের আশা আছে—একসঙ্গে দরখাস্ত করিয়া এক শুনানীর তারিখে সময় লইলেন। দ্বিতীয় দিনেও উভয়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "আবার সময় কেন ?"

উকীলদ্বয়—মোকদ্দমা মিটাইয়া উঠিতে পারি নাই—আরও কিছু সময় পাইলে মিটাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।"

বঙ্কিম—সময় দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কমিশনার সাহেবের বিশেষ আপত্তি আছে। গতবারে আপনাদের প্রার্থনামত সময় দিয়াছিলাম, তজ্জন্য কমিশনার আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যটা শুনুন।

বঙ্কিম পড়িলেন। মন্তব্যে কটাক্ষপাত ও ভয়প্রদর্শন উভয়ই ছিল। পাঠান্তে তিনি বলিলেন, "কমিশনারের আদেশ চুলোয় যাক্, আপনাদের যাহাতে সুবিধা হয় আমি তাহা করিব—প্রার্থনামত সময় দিলাম।"

দ্বিতীয়টী এই, তদানীন্তন ছোটলাট (১৮৭১—৭৪) স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বহরমপুর পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজকর্ম্ম দেখিয়া ছোটলাট সাতিশয় তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, "আপনি ষ্টিমারে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছুপূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। লাটসাহেবের জাহাজ 'রোটাস' তখন মাঝগাঙ্গে। তথায় পঁহুছিতে হইলে নৌকা ভিন্ন উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনিও লাটদর্শনে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের নৌকায় উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকায় যান। বঙ্কিম তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "আপনাকে রাখিয়া নৌকা ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া

যাইবে—আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোটলাটের নিকট পঁহুছিতে পারিব না।"

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব আর আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি আগে ছোটলাটের কাছে কার্ড পাঠাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা অচিরে 'রোটাসে' গিয়া লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্ড পাঠাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিশ্রুতি মত কার্ড পাঠাইতে বিরত থাকিলেন।

ছোটলাট সম্ভবতঃ জাহাজের গবাক্ষ-পথ দিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া থাকিবেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্ড পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর—ডিপুটি বঙ্কিমবাবুকে আগে পাঠাইয়া দাও।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমবাবুকে হুকুম দেখাইলেন।

এই সমস্ত ছোটখাটো কথায় বঙ্কিমের স্বাধীন মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সম্মান রাখিতে জানিতেন বলিয়া ডেপুটী অবস্থায়ও তাঁহার সম্মান ও স্বাধীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যাহাহউক, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল নিজেই জাতীয় শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইলেন না—তিনি তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত একদল লেখকও তৈয়ার করিলেন। সাহিত্যরথী অক্ষয় সরকার মহাশয় প্রথম হইতেই বঙ্গদর্শনের লেখক ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাই বলিতেছি।

"মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা প্রচারের সূচনা হইতেই বঙ্গদর্শন প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালীবাবু বাংলা পড়িতে শিক্ষা করেন।"

তাঁহার অন্যতম বন্ধু ও সহকর্ম্মী চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে বাংলাভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়, আর বুঝিয়াছিলাম ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে কিরূপ প্রভাবান্বিত হন, কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছেন :

"যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটা নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগত কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? ইউরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসরকাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত। বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহ, আমাদের সমাজ, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙ্গালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল। বঙ্গদর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত লোকে বাঙ্গলাভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিল, বুঝিল স্থায়ী সাহিত্য একমাত্র বাঙ্গলাভাষায়ই সম্ভব।" বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনিঃ" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

আধুনিক সাহিত্য—দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"সকলেই 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত··· স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা প্রভাবে, সর্ব্বোপরি

পক্ষপাতশূণ্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনা বশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন এইরূপই রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিল।"

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ছাড়াও রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর কর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু লেখক তাঁহার প্রভাব ও স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমের উদ্দেশ্যই ছিল লেখকগোষ্ঠী তৈয়ার করিয়া জাতীয় সাহিত্যের চিরপ্রতিষ্ঠা করা। লেখকগণ তাঁহাকে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা করিতেন, কয়েকটি স্মৃতিকথায়ই স্পষ্ট হইবে:

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন--আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলীপুরে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন "বঙ্গদর্শন" বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন

ভবানীপুরে একটী ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়*। তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল। আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—

"যদি বাঙ্গলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা থাকে তবে তুমি বাঙ্গলা লিখ না কেন?"

আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—

"আমি যে বাঙ্গলা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি। ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখি নাই। কখনও বাঙ্গলা রচনা পদ্ধতি জানি না।"

"গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন।—"রচনা পদ্ধতি আবার কি? তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা যাহা লিখিবে, তাই রচনা পদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।"

"এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত হইল। তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম উদ্যম "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশ করিলাম*।" নব্য ভারত—১৩০১ বৈশাখ...

এই কথোপকথন যে ভবানীপুরেই হইয়াছিল, এই স্মৃতিকথাই প্রমাণ, বিশেষতঃ রমেশ দত্ত মহাশয়কে সে সময়ে বহরমপুরে চাকুরী করিতে যাইতে হয় নাই। এ সম্বন্ধে শচীশবাবুর উক্তি যে—এই সাক্ষাৎ বহরমপুরে হয় তাহা ভ্রমাত্মক। শচীশবাবুকে অনেকেই অনুসরণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, ঋগ্বেদ অনুবাদেও বঙ্কিম চন্দ্র রমেশবাবুকে যে বিশেষ উৎসাহ দেন, নব্য ভারত পত্রিকায় রমেশবাবু তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বঙ্গদর্শনের ক্রমিক কার্য্য সম্বন্ধে একটী চমৎকার আখ্যান প্রদান করিয়াছেন

"বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে ইংরাজীওয়ালারা পড়িতেন সেক্সপিয়র, পড়িতেন মিলটন, পড়িতেন বায়রন, পড়িতেন শেলি, দেখিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য্য, ভালবাসিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য চোখে দেখিতে পাইতেন না, কল্পনায় তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিত। দেশে যে কবিরা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, সে কবিদের তাঁহাদের পছন্দই হইত না। কবি বেচারারা মাঠে মারা যাইত। বঙ্কিমবাবু ইংরাজীওয়ালা-দের চোখ ফিরাইয়া দিলেন। সারথী যেমন লাগাম টানিয়া ঘোড়ার চোখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিয়া অন্য পথে চালাইয়া দিলেন। সে পথ আর কিছু নয়,—দেশপ্রীতি।

"বঙ্কিমবাবু কি প্রথম হইতেই এই মতলবে বই লিখিতে আরম্ভ করেন? না ইহা তাঁহার সর্ব্বব্যাপী চিন্তার ফল? আমার বোধহয় অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি

* ভবানীপুর ১ নম্বর পিপলপটি লেন হইতে।

* "বঙ্গবিজেতা" প্রথমে "জ্ঞানাঙ্কুর" কাগজে বাহির হয়।

'স্বদেশতত্ত্ব' পাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করিতেন—কিসে পাত্রগুলির চরিত্র ফুটিয়া উঠে। অনেকগুলি পাত্রকে কি ভাবে সাজাইলে নভেলখানি জমে, কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে তাহা লোকের প্রিয় হয়, কোন্ রীতিতে লিখিলে লোকের পড়িতে ভাল লাগে, কোন্ কোন্ জিনিষ বর্ণনা করিলে নভেলখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। প্রথম প্রথম তাঁহার এইগুলিই লক্ষ্য ছিল। সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—কিসে সুন্দর হয়?

"...ক্রমে লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামানন্দ স্বামী যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার নাম পরহিতব্রত...এই পরহিতব্রত বঙ্কিমবাবু প্রচার করিলেন বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে। কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন—পরহিত বা ভূতদয়া বড় ফিকা, জমেনা। বুদ্ধদেব ভূতদয়া প্রচার করিয়াছিলেন, বেশীদিন টিকে নাই। ইউরোপে অনেকে পরহিতব্রত প্রচার করিয়াছিলেন, ফল ভাল হয় নাই।...তাই তিনি পরহিতের বদলে দেশহিত আশ্রয় করিলেন। সকলকে বঙ্গদেশকে ভাল বাসিতে শিখাইতে লাগিলেন, জন্মভূমিকে 'মা' বলিতে শিখাইলেন।... এই যে কার্য্য তিনি করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'।

"আমরা তাঁহার কি ছিলাম? যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায়না, কারণ তিনি উপদেশ দিতেন না; তাঁহাকে সখা বলিবেন সে স্পর্দ্ধা কেহ রাখিতেন না, অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত, তাঁহার একটা ভালকথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভাল বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন চর্চ্চা তাঁহার বাটীতে, অন্ততঃ দরবারে হইতে পারিতনা। আর সে চর্চ্চার মধ্যে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান অপমানের কিছু ছিলনা।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"আমি তখন সবে বি-এ পাশ হইয়া খাগড়াতে এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারী করিতেছিলাম। "জ্ঞানাঙ্কুরে" আমার নাম দিয়া "বিদ্যাবিড়ম্বনা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, একদিন কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন আসিয়া বলেন, "বঙ্কিমবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন।"

সাক্ষাতের সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রবন্ধটি মৌলিক কি অনুবাদ?"

"আমি—প্রবন্ধটির পরিকল্পনা আমার, কেবল উপাদান প্রথমতঃ Disreillির Curiosities of Literature হইতে গৃহীত।

"বঙ্কিমচন্দ্র আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বঙ্গদর্শনের জন্য কোন প্রবন্ধ লিখিলে তিনি সানন্দে প্রকাশ করিবেন উৎসাহ দেন।

দুর্গোৎসবের পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি পুরা ইংরাজী নবিস, আমিও যুবক। আমি সেকহাণ্ডের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলাম। বঙ্কিম বলিলেন—এব্যাপারটা তাঁহার কাছে বড় insincere মনে হয়। তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। এরূপ ব্যবহারের দরুণ লেখক যে তাঁহার অনুরক্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"আমার "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রকাশিত হইলে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই! তিনি তখন কাঁটালপাড়ায়, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে, আমি তাহার ভূমিকা লিখিয়াছি। আপনি বঙ্গদর্শনের জন্য উক্ত গ্রন্থাবলীর একটা সমালোচনা লিখিয়া দিউন। আমি বিস্মিত হইলাম। বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় বঙ্কিম ব্যতীত আর কাহার অধিকার থাকিতে পারে? আমি বলিলাম "সে কি কখন হয়!

আপনি লিখুন।" তিনি বলিলেন, আমি ভূমিকা লিখিয়াছি, সমালোচনা করিব না। আপনি লিখিলে আরও ভাল হইবে। বলাবাহুল্য আমি সে অনুগ্রহ ভোগ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি নাই। কিন্তু এই অনুরোধে তাঁহার নেতৃত্বগুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র যে লেখককে এরূপ অনুরোধ করেন সে লেখক তাঁহার ভক্ত-না হইয়া থাকিতে পারে না।

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন উঠিবার মত হইল। কাগজ প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল, শুনা গেল বঙ্গদর্শন আর প্রকাশিত হইবে না। এ সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহাতে তিনি অন্ততঃ আরব্ধ খণ্ডটি শেষ করেন সেই জন্য অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি সে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সকলে সাহায্য করুন, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।' আমি সে অনুরোধ আদেশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

"একটা ঘটনার কথা বলি—আমার কোনও প্রবন্ধে আমি কৌতূহল না লিখিয়া কৌতুহল লিখিয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি কৌতুহল লিখিয়াছি, তিনি সেটার সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে জানান। প্রয়োজন বোধে জানাইলেন, সেই কথা শুনিয়া আমি নির্ব্বাক হইলাম আমি লিখিবার সময় অনবধানবশতঃ একটা বানান ভুল করিয়াছি আর তাহাই সংশোধিত করিয়া আবার সেকথা বলিতেছেন, কিন্তু এই কথা বলাতে তাঁহার নেতৃত্বগুণ লোককে বশীভূত করিবার ক্ষমতা কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। বঙ্কিম Republic of Letters এর উপযুক্ত নেতা ছিলেন।

"আমার শ্মশানে" জ্ঞানাঙ্কুর সত্বাধিকারী শ্রীকৃষ্ণদাসকে লইয়া গিয়া আমার অজ্ঞাতসারে ছাপাখানা হইতে লইয়া যান। বলিয়া যান যে তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনিলে আমি অস্বীকার করিবনা—শ্রীকৃষ্ণকেও আমি এইরূপ উত্তর দিই।*

যাহাহউক, মুখার্জ্জি ম্যাগাজিনে কোন্ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবেন এই সম্পর্কে যথেষ্ট কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল নিম্নলিখিত পত্রে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে—

Berhampur,
28th December, 1872.

My dear Shambhu.

Really you take me by surprise, were you my debtor? That is a lucky discovery. I thought it was I who had lagged behind in the matter of correspondence. Now that you confess yourself to be in the wrong. I hold myself entitled to read you a lecture. That intellectual treat I reserve for a future occasion.

Ashu of Choon has been detaining me. In the first place *I don't keep good health*, though I always did justice to the sweetmeats and other not-eatables manufactured at Choon. In the second place I have been doing right loyal service to the state by trying to fill its coffers, so that it may rebuild the Jagur barracks and indulge in other magnificent pastimes, to the edification of the tax-paying public. What the devil do niggers want their money for? They had better pay in their all at the Government Treasuries, and Government will do them an immense deal of good by erecting uninhibitable barracks and by abolishing slavery in Zanziber. You see my working in genuine philanthrophy. The luxury of (taxing the) people for their own good! I am afraid you outsiders don't appriciate it.

Mukherjee is getting on so splendidly that I thought such little assistance as I could render was not needed. But since you wish that even the course and scentless Dhutura should bloom in your Nandana (excuse poetical flights) by the side of the Mandara and the Parijata. why, you shall be satisfied. Now let me know what I shall write, stories? But you seem to have enough of them, and one serial story like Bhubaneswari* is enough for

* শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা, "সাহিত্য পত্রিকা", ১৩২৪ পৃঃ ৫৭৩।

* This refers to the serial article on "Bhubonеswari or the Fair Hindu widow" by Rashbihary Bose which commenced in the October number of Mookherjee of 1872.

one Maga(zine) ; shall it be a review ? I won't take up politics, because then I would be *sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonia against "Mukherjee". That is why Banga Darsana has so little of politics in it.* Shall I send you light skekchy things which shall be neither flesh nor fish nor red herring ? Do you want non-sense ? I can manufacture that precious commodity *add libitum.*

One should think from the lengthy apology you talk to your note that you have been falsely accusing me of murder, robbery and rape. You only said wise and good things, and I don't see that needed an apology.

When do you issue your next ? By the end of January I suppose. Trusting this will find (you) as jolly as ever.

I am,
Yours sincerely.
Bankim Chandra Chatterji

মুখার্জ্জি ম্যাগাজিনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধ এবং নিজ ইচ্ছা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত বঙ্কিম কিছু লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অবশেষে বঙ্কিম ১৮৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে Confessions of a Young man নামক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরের সংখ্যার কাগজ তখনও বাহির হয় নাই, শম্ভুবাবু ঐ সংখ্যায়ই প্রবন্ধটী মুদ্রাঙ্কিত করেন।* বঙ্কিম ইহাতে আমাদের চাল-চলন হাব-ভাব পোষাক পরিচ্ছদ যে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে বেশ গাম্ভীর্য্য ও রহস্য মিশ্রিত ভাষায় আলোচনা করেন। ছোটলাট Sir George Campbell রাজসাহী বিভাগ পরিদর্শন করিয়া আমাদের ইংরাজী চালচলনের ইঙ্গিত করিয়া যে বিস্ময় প্রকাশ করেন, সেই কথাটী প্রবন্ধে থাকায়ই বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধটী পড়িয়া ছোটলাট সাহেবের অথবা তাঁহার সেক্রেটারীর লেখকের সনাক্তকরণ সম্বন্ধে কোন কষ্ট হইবেনা। ইহার পরে তিনি Study of Hindu Philosophy লিখিয়া পাঠান, উহা ১৮৭৩, এর মে মাসের সংখ্যায় বাহির হয়। নিম্ন পত্র কয়খানি সে সম্বন্ধে লিখিত হয়। প্রবন্ধটীর দ্বিতীয় ভাগ আর তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।*

Berhampur,
The 5th January, '73

My dear Shambhu,

A happy new year to you and to your Maga[zine].

I am engaged in writing something for you. Indeed it is ready, and it should have gone before this, but I am obliged to wait a little for one or two books I find it necessary to refer to.

If you are issuing your next in the middle of Junuary, why I must wait for your next issue,............

Pray don't insert that bit of Confession† anywhere. Campbell and Bernard‡ know enough of me to be able to identify this penitent at once. Not that they would hang me if they did, but it would not be all agreeable.

My story (the one intended for Mukherji) shall wait till Bhubaneswari chooses to leave the coast clear, though I certainly don't wish for such a consummation.

Trusting this will find you all serene.

I am,
Yours sincerely,
Bankim Chandra Chatterji

* এই প্রবন্ধটী বাঙ্গলা ভাষায় অনুদিত হয় বন্ধুবর শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সাহিত্য পত্রিকায়, ১৩২৩ পৌষে—আর একটী প্রবন্ধ "নব্য বাঙ্গালীর স্বীকারোক্তি

* "হিন্দু দর্শনের আলোক" মন্মথনাথ ঘোষ 'সাহিত্য পত্রিকা' ১৩২৩ অগ্রহায়ণ।

† The refers to the article on the Confessions of a Young Bengal by Bankim Chandra Chatterji published in the December number of Mukherji's Magazine of 1872. The publication, it seems, took place, notwithstanding the author's unwillingness to see his article in print.

‡ Sir George Campbell, then Lieutinant-Governor of Bengal and his Secretary, Mr. (afterwards knighted) Charles Bernard.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপরোক্ত প্রবন্ধ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি ম্যাগাজিনে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন, উহার নাম The Study of Hindu Philosophy, ইহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে মাসে বাহির হয়। এই সম্পর্কে বঙ্কিম বাবুর অনেক পত্র আছে, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আবশ্যকতা সত্ত্বেও পত্রগুলি সম্পূর্ণ দিতে অক্ষম হইলাম, অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক Bengal Past and Present তালাস করিতে পারেন*।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩, ১৯ জানুয়ারীর চিঠিতে লেখেন—

There are three good libraries in Berhampur and I have got the books I wanted but have been unable to make use of them I intended from want of time. I have been busy writing the Banga Darshan for Falgoon.

I am afraid I must ask you to send me a proof, if you admit the article.

প্রুফ পাইয়া কিরূপ মতামত প্রকাশ করেন নিম্নলিখিত পত্রে পাওয়া যায়।

এই পত্রখানি কিছু প্রুফ পাইবার পরে লেখেন।

Berhampur.
The 16th March, 1873.

My dear Shambhu,

I have received only the letter, half of the prooft and this I recieved only yesterday evening. The other half I have not yet received. The post is very regular with me, so pray don't abuse it. I will send you the proof back as soon as I recieve the whole. I see the printer has made glorious work out of my delicate caligraphy. It is lost labour to ask me to write legibly. You may as well preach to the winds.

More hereafter, I am rather fidgetting just now.

Yours' sincerely,
Bankim Chandra Chatterji.

নিম্নলিখিত পত্রখানিতে বেশ আমোদপূর্ণ কথা আছে বলিয়া পত্রখানি উদ্ধৃত হইল। বঙ্কিমের তীব্র সমালোচনায় অনেক লেখক তাঁহার উপর চটিয়া যান। একটু সামান্য অসুখে হালিসহর পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যুর পর্য্যন্ত রটনা হয়। হালিসহর নিবাসী কোন ব্যক্তি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মাসিক পত্র হিসাবে এই পত্রখানি বাহির করেন। ১৮৭৩ খৃঃ ইহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়—

BANGADARSAN
Editor's Office, Berhampur.
The (not dated) 187...

My dear Mirza Shambhu Chandra,

The story about my illness was a pure fiction. The gentlemen who gave it out in the papers managed also to send news of my death to my house at Kantalpara.* The anouncement in the Haleeshahar Patrica† of my illness was intended merely to create belief in the report of my death sent to my relatives, this being supposed an excellent way of punishing a man for his literary openion.‡

I wish there were the same amount of truth in the news of your illness which you yourself give. But as you have got nil of it. we will not discuss the question further.

* পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় এই চিঠিগুলি বাহির করিয়াছেন ও টিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

† This refers to the proof of Bankim Chandra's article on the study of Hindu Philosophy referred already.

* Near Naihati station, Eastern Bengal State railway, where Bankimchandra was born and where his ancestral house is situated.

† The Halishahar Patrika was started in Calcutta in 1870 as a monthly by a resident of Halisahar, a village in the twenty-four Parganas. In 1873 it became weekly.

‡ In the Bangadarsana Bankimchandra used to review critically, and often severely, to correct literature of Bengal. By this he offended some people,

"Shawkari Jawlpan"1 (am I right in the orthograply ?) is a capital fellow, and I wish I could "emulet" not only his orthograply, but also his great good sense and his exquisite English. And I am greatful to the naughty fellow for making room for poor "Baukim" in the same para with yourself and that deaf "Sabhaung". May the shadow of that orthographical prodigy never grow less !

I ought to have told you that your *last double number*2 *was the best you have issued* the best so far as I know which the "Head-eater"3 of any magazine has succeeded issuing in India—almost all the articles were very good. the bride of Shambhu Das4 exquisite. The article on commerce5 I read with evidity. Is Bholanath Chunder the writer ? The design of the Avatar6 was well conceived—but it is easily seen that your engrayer is not first-rate.

Mr. De's6 review of বিষবৃক্ষ is rather of the faint praise and civil sneer type. The reviewer is evidently the editor himself, who grossly contradicts some statements he made in an article he contributed to the Calcutta Review a few years ago. R. C. Dutt* writes to me that he intends reviewing the book in the Patriot. Will your Head-Eatership condescend to eat my head in Mookherjee ? An exquisite critic in the Som Prokash†—Pot Belly himself for aught I know pronounces the book unreadable and the author an unmitigated dunce. This is high praise. Praise from such a quarter would have damned the book.

That promised second part of Hindu Philosophy is a Frankenstien which would kill me. To make it worthy of your Maga (Zine) I must go through a fearful amount of tough reading, which to an indifferent Sanskrit Scholar and hard-worked man like myself would be dreadful. Besides I have exhausted what I had to say about the Sankhya in an article in the Calcutta review and a series of articles in the Banga Darsan—and the Sankhya is the only system which I have made anything like a study. What I intend to give you—if you will take it is a sketch of Sankaracharya's influence on Hindu thought as an illustration. Even for this, you must give me time. In the mean time, if a sketch or a squib be not unacceptable to you, I will send you some after the holidays. I don't suppose I will show my sweet face to your longing eyes during holidays, for I have got another lover here to attend to the glorious Road cess. I am too fond of him to leave him even for a fortnight, especially in this his lingering old age. But this is spinning a fearfully long yarn —and I must close.

Yours' very sincerely
Bankim Chandra Chatterji.

1 This refers to the correspondence headed what he should not be by Shankare Jaulpwan published in the June number of Mukherjee's Magazine of 1873.

2 That is number IX and X published togather as a double number in June 1873.

3 Head eater is a pun for Editor.

4 This refers to the poem on the Bride of Shambhu Das. A late of Aingal begun by Ram sharma (Babu Nabagopal Ghose who is still living at Baranagar) in the June number of Mukherjee's Magazine of 1873.

5 This refers to the serial article on A voice for the Commerce and Manufactures of India by Babu Bholanath Chandra, the wellknown author of 'Travels of a Hindu', in the same number of the jonrnal.

6 The refers to the review of Bisha Briksha published by the Reverend Lalbehari De in his monthly journal called the Bengal Magazine.

* Mr. Ramesh Chandra Dutt of the Indian civil service, the well-known author.

† The well-known Bengalee-weekly, Som Prokash, edited by Pandit Dwarkanath Vidyabhusan.

Berhampur,
The 27th Nov. (1873)

My dear Shambhu,

I just drop a line to give my thanks to the Amateur Homeapath*—who I know is no other than "Head-Eater" himself. By the bye ..why don't we see more of that "Great geneus" the Shankari jawlpawn.

I cannot congratulate you on your frontispiece† this time. I am no admirer of Sir George Campbell, but I think it was due to yourself that you should not descend to "George Baba" and "George Pir" though I don't object to "George Natu". It is folly in me—your junior both in years and in reputation,—to attempt to dictate to you in matters of taste, but it seems to my humble judgment that caricatures like "George Baba", etc, though good for my friend of Amrita Bazar (Patrika). suit ill the taste and breeding of our best literary magazine. But a truce to preaching.

I am growing very fond of the Kerani‡ His sketches are exquisite.

Trusting this will find you in the full swiny of enjoyment in this enjoying season. I am

Yours' Sincerely
Bankim Chandra Chatterjee.

---

* In number XIIII (october 1873) of Mukherjee's Magazine, a correspondent—An Amateur Homeopath who is no other than Dr. Mukherjee - reviewed Bankimchandra's Novel, Bisha Briksha It was a satire on those critics of Bankimchandra's who did not like his writing.

† Published in the October number of Mukherjee's Magazine of 1873 and called a Phantasmagoria.

‡ This refers other frontpiece illustration called Modern Avatar published in the same issue of the journal. This was a caricature of an incident of Sir George Gambell's Lt. Governship of Bengal. The Modern Avatar was of cource Sir George himself.

১৮৭৩ সালের অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চুঁচুড়া হইতে "সাধারণী" সম্পাদন করেন। বঙ্কিমের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে প্রথম দুই পৃষ্ঠা ইংরাজীতে লিখিত হয়। এবং কয়েক সপ্তাহ বঙ্কিম নিজেই উহা লিখিয়াছিলেন। ৮ই মার্চ্চ সাময়িক লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন :

...As it is, Sir George Campbell remains the ablest and Sir John Peter Grant the best of Lieutenant Governors. Sir Cecil Beadon's gigantic failure in Orissa discussed—yet we speak with greater respect. Sir Edward Grey was the weakest but most popular, He was used to flattery...we have faith in Campbell, whatever his failings might be, he alone of all Englishmen can save the land.*

এইরূপ একটী প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনেও আছে।

সাধারণী সম্পাদকীয় ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪, বঙ্কিম লেখেন :

But Government must not forget that unpledged covenanted assistants have no knowledge of the country no acquaintance with the habits, customs and peculiar feelings of the people whom they are employed to save.

Native agency both superior and subordinary must be more exclusively employed in famine operations if the country is to be saved.

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংরাজ কালেক্টররা মফঃস্বলে গিয়া যে কিরূপ অজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন, বঙ্কিম অতঃপরে "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে" তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাহাহউক, বঙ্কিম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে কয়েক মাসের ছুটী লইয়া বহরমপুর হইতে চিরবিদায়

* This refers to the serial article called Reminiscenes of a Karani life by Rai Bahadur Sashichandra Dutt. It created sensation in the official world and almost deprived its author of his pension.

গ্রহণ করেন। এই সময় বহরমপুরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। এবং বঙ্কিম প্রায়ই জ্বরে ভুগিতে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে চারি বৎসরের অধিককাল এখানে ছিলেন, সপরিবারে বারংবার জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে কিছুদিন পূর্ব্বেই ছুটী প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কমিশনার ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছুটী দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা উভয়েই বঙ্কিম-চন্দ্রের কার্য্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কমিশনার বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি আবশ্যক হইলে Casual leave লইবেন—আমি বিনা আপত্তিতে আপনার ঐ ছুটি মঞ্জুর করিব। আপনি যখন ইচ্ছা তখন বাড়ী যাইতে পারিবেন, কিন্তু আপনাকে সুদীর্ঘকালের জন্য ছুটী দেওয়া হইবে না। তবে আপনি ছুটীর পরে যদি বহরমপুরে আসিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

সাহেবের একান্ত অনিচ্ছায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছুটী পাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল।

অবশেষে বঙ্কিম ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ অবকাশ গ্রহণের আবেদন করিতে বাধ্য হইলেন। এরূপ আবেদন মঞ্জুর হইতে দেরী হয় না, কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার চারিমাসকাল নানারূপ অজুহাতে উহা চাপিয়া রাখিয়া-ছিলেন। অগত্যা বঙ্কিমচন্দ্র ছোটলাটের নিয়োগ বিভাগের সেক্রেটারীকে পত্র লিখিলেন। ডাম্‌পিয়ার সাহেব (Mr. Henry Lucius Dampier C. I. E.) তখন নিয়োগ বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বঙ্কিমবাবুকে খুব ভাল চিনিতেন ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। অবিলম্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ছুটী মঞ্জুর করিলেন।* বঙ্কিমবাবুও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন

বহরমপুর ছাড়িবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বহরমপুরে কাছারী যাইবার পথে বর্ত্তমান ফৌজদারী কাছারীর পশ্চিমদিকে ও ডাক-বাঙ্গলার দক্ষিণে যে বৃহদায়তন খালি একটী চতুষ্কোণ মাঠ আছে, ইহার নাম স্কোয়ার ল্যাণ্ড (Square Land)। পূর্ব্বে এই স্কোয়ার ল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে ও উত্তরদিকে ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যগণের ব্যারাক ছিল। পাঠক বোধ হয় জানেন যে বহরমপুরেই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল*; তাই এই স্থানের জন্য সাহেবদের একটু ভয় ছিল। এই চতুষ্কোণ মাঠটীর চারিদিক ধরিলে প্রায় একমাইল। বঙ্কিমের সময় এই সেনানিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডাফিন (Commander of the Fourth Regiment)।

আজকাল যেখানে বহরমপুরের ফৌজদারী কাছারী, সে সময়ে উহা এখানে ছিল না, আরও দক্ষিণে জজকোটের নিকটে ছিল। বঙ্কিম নদীর পার দিয়া পাকা রাস্তায় প্রত্যহ পাল্কী করিয়া আসিয়া কোণাকুণি একটী পায়ে-চলা রাস্তা দিয়া স্কোয়ারল্যাণ্ড পার হইতেন। একদিন ডিসেম্বর মাসে বৈকালে ফিরিবার সময় কর্ণেল ডাফিন প্রমুখ কয়েকজন সাহেব ক্রিকেট খেলিতেছিলেন। জজ বেনব্রিজ, রেভারেণ্ড বার্লো, প্রিন্সিপাল রবার্ট হ্যাণ্ড, রাও (পরে রাজারাও) যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (লাল-গোলা), দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দূর হইতে পাল্কী আসিতে দেখিয়া কর্ণেল ডাফিন কাছে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। বঙ্কিম অস্বীকার করেন, সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে পাল্কী হইতে নামাইয়া অপমান ও আক্রমণ করেন। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ সাহেবদের জানাইয়া রাখিলেন। বেনব্রিজ বলিলেন আমি চোখে কম দেখি, অতোদূর দৃষ্টি যায়নি।" রবার্ট হ্যাণ্ড বলিলেন—তিনি ঘটনাটি দেখিয়াছেন। রেভারেণ্ড বার্লো রাজারাও যোগেন্দ্রনারায়ণ, দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যও অধ্যক্ষ হ্যাণ্ডকে সমর্থন করিলেন।

পরদিন C. D. C. Winter জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র আক্রমণ ও অপমানের জন্য নালিস রুজু

* Leave from afternoon of 2nd Feb. for four months on Medical certificate. Vide Gazette April 8, 1874.

Part of this leave was cancelled at Bankim's request, Vide Gazette 29th April 1874.

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনটী দাউ দাউ করিয়া আগুনে জ্বলিয়া উঠে। সেনাপতি মিচেল একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া বারাকপুর রওনা হন।

করেন। এই ঘটনায় বহরমপুরে এতই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে সমস্ত উকীল মোক্তার বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় সহি করেন, সাহেবকে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী উকীলের খোঁজ করিতে হয়। নানাভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র মোকদ্দমা উঠাইলেন না। মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল

১২ই জানুয়ারী সোমবার ১৮৭৪ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারে বসিয়াছেন—আদালত ঘর লোকে লোকারণ্য, ছাত্রেরাও দলে দলে আসিয়া আদালতে প্রতীক্ষা করিতেছেন, আদালত কক্ষ স্থির। যেমন উইনটার সাহেব মোকদ্দমাটি ধরিয়াছেন, হঠাৎ জজ সাহেব ব্রেনব্রিজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "Mr. Winter, will you mind coming to your chamber" বলিয়া তাহাকে খাসকামড়ায় লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বঙ্কিমকেও ডাকিলেন। আলোচনার পরে প্রকাশ্য আদালতে ডাফিন ক্ষমা চাহিলেই তিনি মোকদ্দমা উঠাইতে রাজী হইবেন নতুবা নয়,এইরূপ প্রকাশ করেন।

কর্ণেল রাজী নয়। এদিকে রবার্ট হাণ্ড প্রমুখ সাক্ষীরাও সত্য কথা বলিবেন বরাবর বলেন এবং সাক্ষী দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। নেটিভের কাছে অতোটা হীনতা স্বীকার করিতে প্রথমে রাজী না হইলেও পরে তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। ব্রেনব্রিজ চলিয়া গেলেন। উইন্টার সাহেব পুনরায় আদালতে আসিয়া মোকদ্দমাটি ধরিলেন। কর্ণেল ডাফিন দোষ স্বীকার করিয়া বঙ্কিমের নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন। হঠাৎ কথাগুলি একটু এলোমেলো হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত যুবকের দল হাসিয়া ফেলিল, ভাগ্যে 'বন্দেমাতরম্' তখনও রচিত হয় নাই। রায় হইয়া গেল, কিন্তু ডাফিন চটিয়া বলিল—

"এইরূপ অপমান হইবে জানিলে মার্জ্জনা চাহিতাম না, দোষ স্বীকার করিয়া দশটাকা জরিমানা দিতাম—"

কিন্তু ডাফিন তখনও বুঝেন নাই, নাছোরবান্দা বঙ্কিম হাইকোর্টে ড্যামেজ সুট (Suit) করিয়া সাহেবকে অতিষ্ঠ করিয়া ফেলিতেন। যাহা হউক, আদালত প্রাঙ্গনে সর্ব্বত্র আনন্দোল্লাসে মুখরিত হইল, আর সমগ্র বহরমপুরবাসীদের আনন্দের পরিসীমা রহিলনা।

এই ঘটনাটি নানাভাবে শত্রুমিত্র মধ্যে পল্লবিত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করায়, বহরমপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রাচীন উকীলদের নিকটে বিশেষতঃ লালগোলার রাজা স্যার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাওর কাছে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ বিবৃত করিলাম। ভরষা করি, পাঠক অতিরঞ্জিত স্বপক্ষীয় বিপক্ষীয় কোন উক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন না, কারণ সাময়িক পত্রগুলিও আমার সংগৃহীত উপরোক্ত আখ্যানই সমর্থন করিতেছে। হিন্দু পেট্রিয়টে (১৯শে জানুয়ারী ১৮৭৪) বর্ণিত আছে-

"Sometime ago we received a letter stating that Babu Bankim Chandra Chatterjee Deputy Magistrate was assaulted by Lt Colonel Duffin of that City. Soon after we were requested not to publish the letter which we consequently withheld. It is now stated that the gallant son of Mars has since made an apology to the Babu."

স্বর্গীয় মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও লেখেন—

"বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন পাল্কী করিয়া সাহেবদের ক্রিকেট খেলার জমির উপর দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাতে কর্ণেল ডাফিন নামক একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে বিনাদোষে অপমান করে। বঙ্কিম বাবু উক্ত সাহেবের নামে অভিযোগ উপস্থিত করায় সাহেব এখন স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে এই প্রকার বিনা অপরাধে অপমান করার কথা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের শোণিত এখন ক্রমে শীতল হইয়া আসিয়াছে।"

সুলভ সমাচার, ৮ই মাঘ, ১২৮০, মঙ্গলবার।

বঙ্কিমের বিদায় মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া মুর্শিদাবাদবাসী সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহারা তাঁহাকে যে প্রকার অভিনন্দন ও বিদায় ভোজ দেন, সেরূপ ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। এক সপ্তাহকাল ক্রমাগত যেন একটা ধারাবাহিক মহোৎসব চলিয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদায় দিতে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বহরমপুরে অনেকবার জ্বরে পড়িয়াছেন, এবার তিন মাস বাড়ীতে বিশ্রাম করিলেন (১৮৭৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে)।

বঙ্কিমের বয়স তখন সবে ছত্রিশ বৎসর, কিন্তু ইতিমধ্যে মস্তকের চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

প্রাচীন ভারতে চিত্রশিল্পানুশীলন বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া আপনাদের বিশ্বাস। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২০ হইতে ১৮৫অব্দ পর্য্যন্ত প্রসারিত মর্য্যযুগে চিত্রকলা প্রধান অষ্টাদশ কলার অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত এবং শুধু ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা নয়, বংশবিশেষের দ্বারা পুরুষানুক্রমে সম্পাদিত হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্" এবং "কামসূত্রম্" নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, সুকুমার শিল্পকলা রূপে চিত্রাঙ্কন কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে ইহাও বুঝা যায়, সুচিত্রিত সুন্দর আলেখ্যসমূহ ভারতবাসীর পক্ষে কিরূপ প্রীতিপ্রদ পদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরপটে কবিবর ভবভূতির উত্তররামচরিতে বর্ণিত সীতার আলেখ্য দর্শন দৃশ্য অঙ্কিত থাকা স্বাভাবিক। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপী নির্ব্বাসিত জীবনের বিচিত্র চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত সীতার অন্তরে অপূর্ব্ব হর্ষ সঞ্চারিত হইতেছিল। ভবভূতির আবির্ভূতির যুগে ভারতবর্ষে চিত্রশিল্প যে বিকশিত ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত অজন্তাদি গুহাগুলির গাত্রে অঙ্কিত প্রাচীর চিত্রাবলী ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন আলেখ্য আমরা দেখিতে পাই না কেন, এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। ইহার কারণ সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়। চিত্রশিল্পীর রচনা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পীর রচনার ন্যায় দীর্ঘ স্থায়িত্বের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। মানুষের অত্যাচার বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া সুপ্রাচীন সৌধমন্দিরাদির পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকা—সেরূপ সম্ভাবনা কোথায়? বিধর্ম্মী বিজেতৃগণের নৃশংস ধ্বংস লীলার ফলে ভারতবর্ষের বহু সৌধমন্দির বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও বহু সংখ্যক প্রাচীন চিত্র বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। অজন্তার প্রাচীর চিত্রাবলী দেখিলে এই সত্য সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ভারতবর্ষে চিত্রাঙ্কন কলার বিকাশ ও বিস্তার এই সকল চিত্র রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই সংগঠিত হইয়াছিল। এইরূপ চমৎকার চিত্র অকস্মাৎ অঙ্কিত হইতে পারে না। বহু পূর্ব্ব হইতে অনুষ্ঠিত সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী অক্লান্ত সাধনা ভিন্ন এইরূপ সমুৎকর্ষ অসম্ভব।

তবে ইহাই দুঃখের বিষয় যে, অজন্তাপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোন চিত্রই আমরা এখন দেখিতে পাই না। কোন কোন মন্দিরে বা গুহায় চিত্র অঙ্কিত থাকার চিহ্নরাজি রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে চিত্রের অবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এত বিকৃত এবং প্রায় অবলুপ্ত যে, তাহাদের প্রকৃতি বা বিষয়বস্তু নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদের অভিমত—এক সময় দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মন্দির ও গুহার অভ্যন্তরভাগে চিত্রাবলী বিদ্যমান ছিল।

বহুসংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক এসিয়া-সমালোচক পণ্ডিতের অভিমত, প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ সুকুমার শিল্পকলার বিশেষ অনুশীলন ও উৎকর্ষ উত্তরভারতে নয়, দক্ষিণাপথে বা দ্রাবিড় দেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। এবিষয়ে দ্রাবিড়ী শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির নিকট আমাদের ঋণ অপরিসীম। আর্য্যজাতির চিত্তের প্রবণতা প্রাধানতঃ জ্ঞান ও বিচারের দিকে, ভাব বা আবেগের দিকে নয়। আর্য্যজাতির প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত বিচারপ্রবণ মন হইতে দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি প্রভৃতি যেরূপ সহজে সঞ্জাত হইয়াছিল, ভাব-প্রবণতা বা ভাবাবেগের অভাবে সুকুমার শিল্পকলা সেরূপ সহজে জন্মলাভ করে নাই। প্রবল ভাব বা ইমোশন, আবেগ বা অনুরাগ ভিন্ন শিল্প সৃষ্টি বা শিল্পানুশীলন সম্ভব নয়। অবশ্য পরে এই সৃষ্টিস্রোত বা অনুশীলন

চৈতন্যদেবের জন্ম —শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

প্রবাহ দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে! মোটের উপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে চিত্রশিল্পে উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের শিষ্য, অনুগামী, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় গুরু বা পূর্ব্বগ নয়। কোন মনোরম দৃশ্য, মূর্ত্তি বা বর্ণরাগ দেখিলে বা শ্রুতি রসায়ন শব্দ বা সঙ্গীত শুনিলে যে ভাবাবেগ বা ইমোশন ভাবপ্রবণ মানুষের মনে জাগ্রত হয়, তাহাই তাহাকে শিল্প সাধনায় উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করে। বিচারশীল দার্শনিক মানুষ অনেক সময় এই আবেগকে জ্ঞানের সাহায্যে দমন করিয়া ফেলে বলিয়া তাহার পক্ষে শিল্পসৃষ্টি তত সহজ হয় না। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যেও দ্রাবিড়ী জাতিরা যে আশ্চর্য্য উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। উত্তরের আর্য্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে দক্ষিণের আর্য্যেতর দ্রাবিড়ী জাতিদের ক্রমিক শোণিতগত সম্মেলনের ফলে শিল্পসম্পর্কিত এই অনুশীলন ও উৎকর্ষ ক্রমশঃ উত্তর ভারতেও অভিব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ সকল পণ্ডিতের ধারণা।

অজন্তা, বাঘ, সিগিরিয়া ও পিথাপুরম্‌, এই স্থানগুলিতে আমরা ভারতীয় প্রাচীন চিত্রাবলীর অবশেষ বা নিদর্শন প্রধানতঃ দেখিতে পাই। উহা গুহ বা কন্দর মন্দিরসমূহের প্রাচীর, স্তম্ভশ্রেণী ও ছাদনিম্ন এই অংশগুলি এই সকল চিত্রের দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক লরেন্স বিনিয়ন অজন্তাকে এশিয়ার শিল্প-সাধনা সম্পর্কিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ সমূহের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অজন্তা ও ইলোরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিখ্যাতির তিমিরগর্ভে নিহিত ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক বৃটিশ সামরিক (ভারত

বাহিনীর কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত) অফিসার এই অঞ্চলে পশুপক্ষী শিকারে আসিয়া অকস্মাৎ অজন্তার গুহা-গৃহগুলি আবিষ্কার করিয়া পুরাতত্ত্ব জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন।

অজন্তার প্রায় সমস্ত গুহাগুলির প্রাচীরে ছাদনিম্নে ও স্তম্ভগাত্রেই চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল, পরে কালস্রোতের প্রভাব বা মানুষের অত্যাচার যে কারণেই হউক, কতকগুলি গুহার চিত্র প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অজন্তায় ১, ২. ৯, ১০, ১৬, ও ১৭ এই সংখ্যার গুহাগুলির গাত্রে চিত্রাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে ৯ ও ১০ সখ্যার গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহারা খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সন্দেহ নাই। ২০ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত সংখ্যায় চিহ্নিত গুহাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ইহাদিগকে খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্য্যন্ত সময়ের বলিয়া মনে করা হয়। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রাচীনতম গুহার চিত্রাবলী সহজেই উপলব্ধি হয়। চিত্রশিল্পানুশীলনে ভারতবর্ষ খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বে বা খৃষ্টিয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কিরূপ বিস্ময়কর উৎকর্ষের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল, অজন্তায় আমরা যে সকল বিচিত্র চিত্রাবলী ও অদৃশ্য ভাস্কর্য্য কারুকার্য্য দেখিতে পাই—উহাদিগকে ভারতবাসীর সুদীর্ঘ সহস্র বৎসরব্যাপী শিল্প সাধনার অনবদ্য নিদর্শন বলা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক কুমার স্বামীর মতে, কোন প্রকার ছাঁচের সহায়তা না লইয়া অজন্তার প্রাচীর চিত্র প্রস্তুতকারী শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তুলি বানাইয়া স্বহস্তে এই সকল বিস্ময়কর বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি ছাঁচ কখনও ব্যবহার করিয়া থাকে, শিল্পী তখনও ছাঁচপৃষ্ট ছবির উপর তুলি বুলাইয়া উহাকে পরিস্ফুটতর করিয়া তুলিতে বিস্মৃত হন নাই। চতুর্দ্দিকে বিরাজিত নানা প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট উপলখণ্ড সমূহ হইতে রঙ সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা এই সকল চিত্র স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে কেবল কল্পনার সাহায্যে উপলব্ধি করা অসম্ভব—প্রাচীন ভারতের ঐ সকল শিল্পীরা কিরূপ বিরাট ও বলিষ্ঠ চিত্র এই সকল গিরিগুহাগাত্রে অঙ্কিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেখানে রবিরশ্মি প্রায়ই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অত্যন্ত অল্পালোকিত গুহাগাত্রে এরূপ চিত্র কিরূপে অঙ্কিত করা হইল ভাবিয়া কুমার স্বামীও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গুহার অভ্যন্তরে বহুক্ষণ থাকার পর শিল্পীদের চক্ষু ক্রমশঃ সেই স্বল্পালোকেও দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ার জন্যই এইরূপ চিত্রাঙ্কন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্পীদের শুধু অঙ্কন নৈপুণ্য নয়, তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাও আমাদিগকে বিস্মিত করে। এই সকল চিত্র দেখিতে দেখিতে সৌন্দর্য্যপিপাসু দর্শকের অন্তরে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। একটা বিস্মৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও গুপ্তধনের আসায় অনুসন্ধান করিতে করিতে অকস্মাৎ রম্যতম রত্নরাজির একটা আকর আবিষ্কার করিলে মানুষের মনের যে ভাব হয়, এই সকল চিত্রদর্শনে অনেকটা সেই ভাব দর্শকের মনে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে।

অজন্তার অধিকাংশ প্রাচীরচিত্র বুদ্ধদেবের সুবিচিত্র জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে অঙ্কিত। দৃশ্যগুলি ধর্ম্ম-সম্পর্কিত হইলেও অসামাজিক নয়। বুদ্ধদেব যে সকল আনন্দ-বেদনা অনুভব করিয়াছেন, যে সকল প্রলোভন জয় করিয়া সন্তোষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন চিত্রশিল্পী সমস্তই সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। কোন আলেখ্যই কেবল "আইডিয়ালিষ্টিক" বা আদর্শসর্ব্বস্ব নয়, প্রত্যেকটির মধ্যেই গভীর বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের পরিচয় আছে। আদর্শ ও বাস্তব উভয়ের সুমধুর সমন্বয় প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা সম্পাদন করিয়াছেন বলা চলে। বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নী এবং পুত্রের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন—এই চিত্রে শিল্পী যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য,যে কোমলতা ও কারুণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে অতুলনীয় বলিয়া অভিহিত করা যায়। গ্রিফিথ্‌স ও লেডী হেরিংহামের (অজন্তা হইতে) অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে ১৭নং গুহায় এই মনোরম চিত্রখানি

মোগলযুগে অঙ্কিত একখানি আলেখ্য (পোলো-খেলার দৃশ্য)

দেখিতে পাই না, পরে সুবিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে ইহার প্রতিলিপি অঙ্কিত করেন এবং ঐ চিত্র বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্যবিভাগে রক্ষিত হয়।

ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা পার্থিব ব্যাপার বা সাংসারিক বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মসম্পর্কিত বা আধ্যাত্মিক আলেখ্য আঁকিয়াছেন, ইহা আদৌ সত্য নহে। প্রাচীন ভারতে পার্থিব ও অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যস্থলে কোন বিপুল ব্যবধান ছিল না। পার্থিবকে অপার্থিব আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত করিবার এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু বা ব্যাপারকে পার্থিব বা মানবিক মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়া আমাদের উপলব্ধির অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। চিত্রগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই পার্থিব ও অপার্থিবের বিচিত্র সম্মেলন। অজন্তার ন্যায় বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিতে না পারিলেও, 'বাঘ' গুহাবলীর গাত্রে অঙ্কিত প্রাচীরচিত্রগুলিও সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে প্রায়ই অজন্তার অনুরূপ। বাঘের আলেখ্যগুলি দেখিলে মনে হয় অঙ্কন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যে কারণেই হউক এই কন্দরমন্দিরাবলী পরিত্যক্ত হয়। বর্ণ-রাগ ও রূপ-রেখায় 'বাঘ'শিল্পী অজন্তাশিল্পীর মতই দক্ষতা দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধশ্রমণদের মধ্যে অনেকেরই চিত্রাঙ্কননৈপুণ্য ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য তাঁহারা বুদ্ধদেবের জীবন বা চরিত্র চিত্রই আঁকিতেন। শ্রমণগণ ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে ভারতীয় চিত্রের প্রভাব ঐসকল স্থানেও প্রসারিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্ত্তী সিংহলে ও নেপালে এই প্রভাব প্রবলতম হওয়া স্বাভাবিক। সিংহলের সিগিরিয়া গিরিগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি ভারতীয় চিত্রশিল্পেরই অপূর্ব্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই। গিরিগাত্র উৎকীর্ণ করিয়া রচিত দুইটি কক্ষের প্রাচীরগাত্রে যে চিত্র প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা আঁকিয়াছেন তাহা আজও বিন্দুমাত্রও বিমলিন হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সকল আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছিল। সিংহলাধিপতি রাজা কশ্যপের সময়ে এবং তাঁহার আদেশে ইহারা অঙ্কিত। সহচরীবৃন্দসহ দেববালাগণ স্বর্গ হইতে স্বর্গীয় পুষ্পরাজি পৃথিবীর বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছেন—ইহাই সিগিরিয়ার গিরিগুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রধান বিষয়বস্তু। চিত্রশিল্পী নারীমূর্ত্তিগুলির মুখমণ্ডলে ও দেহকাণ্ডে যে কমনীয়তা ও মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। সিংহলের অন্যান্য কয়েক স্থানে ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রভাবের পরিচায়ক চিত্রাবলী বিদ্যমান থাকিলেও তেমন অঙ্কন-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া আলোচনার যোগ্য নহে। সিত্তান্নবাসল নামক স্থানে অজন্তার অনুরূপ প্রাচীন চিত্রাবলী অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা জৈনধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত সময়কে আমরা মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। প্রাচীন বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিশেষ সমুৎকর্ষ সম্পাদিত হইয়াছিল এবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। বৌদ্ধযুগের অবসান এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিত্রশিল্পবিভাগেও পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্ত্তনের ভিতর ভারতীয় চিত্রশিল্প অপেক্ষা অন্যান্য চারুকলার উৎকর্ষই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সে হিসাবে অজন্তা ও বাঘে প্রাচীর চিত্রাবলীকে প্রাচীন চিত্রশিল্পের চরম পরিণতি বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়যুগের শিল্পীরা চিত্রকলার দিকে সেরূপ মনোনিবেশ করেন নাই কেন, এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। প্রকৃত কথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা প্রচারক বা শিল্পীরা যাহা অধিকতর ব্যাপক, বলিষ্ঠ ও স্থায়ী, সেইরূপ শিল্পসাধনার দিকে আকৃষ্ট হন। ঐ যুগের শিল্পীরা তাঁহাদের প্রতিভা বা প্রেরণাকে চিত্র অপেক্ষা স্থাপত্য ও ভাস্কার্য্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করিয়া তুলাই অধিক সাফল্যপ্রদ বলিয়া মনে করেন। ফলে আশ্চর্য্যজনক ভাস্কার্য্যভূষিত সুন্দরতম মন্দিরাবলী এই সময় ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হয়। বিধর্ম্মী শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচারের জন্য উত্তরভারতের বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যাস্থ জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের মন্দির এবং কোনার্কের সূর্য্যমন্দির, মধ্যভারতস্থ খাজুরাহোর মন্দিরাবলী, এবং দ্রাবিড় বা দক্ষিণাপথের বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরসমূহ ব্রাহ্মণ্য পুনরভ্যুদয়যুগে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কার্য্যের বিস্ময়কর সমুৎকর্ষ বা বিকাশের বার্ত্তা তারস্বরে বিজ্ঞাপিত করে।

এলোরার প্রাচীরচিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহারা অজন্তার চিত্রাবলীর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর নয়। এলোরার চিত্রগুলির মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। তথাকার পরবর্ত্তী চিত্রগুলি খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত সময়ে প্রস্তুত বলিয়া পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের অভিমত। কলাকৌশলের দিক দিয়া পরবর্ত্তী চিত্রগুলি আরও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত বলিয়া বিবেচিত। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর চিত্র বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল এবং জৈনসম্প্রদায়দের দ্বারাও ঐ সময় এক প্রকার ধর্ম্মাত্মক আলেখ্য অঙ্কিত হইবার বিষয় আমাদের জানা আছে। চিত্তাকর্ষক হইলেও এই সকল চিত্র অজন্তা ও বাঘের প্রাচীরচিত্রাবলীর মত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের পরিচয় প্রদান করে না। প্রসারণের পরিবর্ত্তে সঙ্কোচনই ইহাদের স্বভাব।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত সময়কে 'রাজপুত' ও 'মোগল' চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। রাজপুত চিত্রাঙ্কণপ্রনালীকে অজন্তাদি গুহাগাত্র অভিব্যক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রাচীর চিত্রশিল্পধারার বংশধর বলিলে অন্যায় হয় না। এই প্রণালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজপুতানার রাণাগণ।

ইসলামের আবির্ভাবের পর উত্তর ভারতে যে প্রবল পরিবর্ত্তন প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, আশ্চর্য্য শৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়বীরবর্গ শাসিত মরুময়ী রাজপুতানায় উহা প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব এই চিত্রাঙ্কনধারা তথায় অবাধে প্রকাশিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রাজপুতানার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর কোন বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীর প্রভাব সঞ্চারিত হইলে এইরূপ বিকাশ কখনও সম্ভব হইত না। যে ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব ভাবধারা না থাকিলে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নহে, এই অঙ্কন প্রণালীর অনুবর্ত্তী প্রত্যেক শিল্পীর তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা।

রাজপুতচিত্রাবলীর বিষয়বস্তু বহুবিধ বা বৈচিত্র্যময়। বস্তুতান্ত্রিক ও আদর্শতান্ত্রিক উভয় প্রকার চিত্রাঙ্কনেই রাজপুতশিল্পীরা দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক আলেখ্যগুলির ভিতর প্রাসাদবাসী রাজা ও রাণী এবং কুটিরবাসী দরিদ্র নরনারী দুইই অতীব নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। আদর্শপ্রধান চিত্রগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ হইতে গৃহীত। রাজপুত শিল্পীরা রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা লইয়াই অধিক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন; অনেকের অভিমত প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিবর্গের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় রাজপুত শিল্পীরা মোগল-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই অভিমত প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

পাশাপাশি প্রবাহিত দুইটি নদীর মত 'রাজপুত' ও 'মোগল' অঙ্কনধারা বহিয়া গিয়াছিল বলিলে সত্যই বলা হয়। যেমন রাজপুত রাণারা 'রাজপুত' চিত্রশিল্পের, তেমনই দিল্লীর মোগলবাদশাহরা 'মোগল' চিত্রকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কোন কোন শিল্পসমালোচক রাজপুতচিত্রগুলিকে সুললিতস্বরে গীত সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শিল্পী যেন কোন অপূর্ব্ব শক্তি বলে সুর ও ছন্দকে রূপ ও রেখায় পরিণত করিয়াছেন। গাথা বা গীতিকবিতাকে যেন চিত্রাবলীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। নারীচিত্রাঙ্কনে রাজপুতচিত্রশিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অজন্তাদি গুহার প্রাচীন প্রাচীরচিত্র যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহাদের পক্ষে এই দক্ষতাই স্বাভাবিক। মোগল চিত্রশিল্পীরা নারীচিত্রে

বুদ্ধদেবের জন্ম —এন্ আর চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

রাজপুত শিল্পীদের ন্যায় লালিত্য আদৌ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মোগল চিত্রকরেরা নারীচিত্র অতি অল্পই আঁকিয়াছেন। বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহদের শুদ্ধান্তঃপুরের অধিবাসিনী মহিলারা সম্পূর্ণরূপে পর্দ্দার অন্তরালে থাকার জন্য তাঁহাদের আলেখ্য অঙ্কিত করার সুযোগ মোগল শিল্পীদের ছিল না, সুতরাং যাঁহারা প্রধানতঃ বাদশাহ বা আমীর ওমরাহদের চিত্রই আঁকিয়াছেন সেই মোগলশিল্পীরা নারীচিত্রাঙ্কনে অনিপুণ বা অনভ্যস্ত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়। মহিলাবর্গের মধ্যে নুরজাহান এবং মমতাজের চিত্র মোগলচিত্রাবলীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ইহারা সত্য

সত্যই ঐ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাজ্ঞীদ্বয়ের আলেখ্য – এবিষয়ে অনেকেই নিঃসংশয় নহেন।

সুপ্রসিদ্ধ শিল্প সমালোচক ডক্টর কুমার স্বামী 'রাজপুত' ও 'মোগল' চিত্রপদ্ধতির তুলনা করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কুমার স্বামীর মতে, উহাদের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য এত পরিস্ফুট যে, দেখিবামাত্র বুঝা যায় কোনটা রাজপুত-চিত্র, কোনটা মোগল আলেখ্য। তিনি মোগল চিত্রকে পাণ্ডিত্য প্রকাশপ্রবণ, নাটকীয় ভাবাপন্ন, বস্তুতান্ত্রিক এবং গ্রহণশীল আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, এবং রাজপুত চিত্রকে সকলের পক্ষে সমভাবে চিত্তাকর্ষক হইলেও সম্ভ্রান্ত সমাজের লোকশিল্প এবং রক্ষণশীল ও সহিতধর্ম্মী বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। উভয়ের অঙ্কন প্রণালী ও আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য সহজেই ধরা যায়। পারস্য দেশে প্রচলিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া মোগল চিত্রশিল্পীরা প্রধানতঃ পাণ্ডুলিপি বা হস্তলিখিত পুস্তকসমূহকে সচিত্র করিবার জন্য চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন। তৎকালীন ইতিহাসের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রজমনামাহ, নিজামী, বাবরনামাহ ও আকবর নামাহ এই পাঁচখানি পাণ্ডুলিপির বক্ষেই অধিকাংশ মোগল আলেখ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল হস্তলিখিত সচিত্র পুস্তক বৃটিশ মিউজিয়াম বা ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট মিউজিয়ামে রাখা হইয়াছিল। রাজপুত চিত্রগুলিকে বৃহত্তর করিলে উহারা অজন্তায় অনুরূপ প্রাচীর চিত্র হইয়া পড়িবে বলিয়া কুমার স্বামীর অভিমত।

মোগল চিত্রকলা মহামতি আকবরের সময়ে চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার আদেশে এমন কতকগুলি আলেখ্য অঙ্কিত হয় যাহাদিগকে রাজপুত ও মোগল চিত্রাঙ্কণ প্রণালীর সুমধুর সমন্বয় বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হয় না। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি সম্রাট আকবরের অনুরাগের কথা সকলে জানেন। তাঁহাদের দরবারে যে সকল চিত্রকর বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। মোগল অঙ্কনপ্রণালীর অনুবর্ত্তী প্রায় একশত চিত্রকরের কথা কুমার স্বামী কহিয়াছেন। রাজপুত চিত্র-শিল্পীরা অঙ্কিত আলেখ্যগুলির পারস্য দেশে মোগল শিল্পীদের ন্যায় স্বাক্ষর প্রায়ই করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের অনেকেরই নাম জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কুমার স্বামী তারিখ ও স্বাক্ষর বিশিষ্ট দুইখানি মাত্র রাজপুত আলেখ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আকবরের দরবারে যে সকল চিত্রশিল্পী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রসায়ন ও দশবন্ত সর্ব্বপ্রধান বা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। দশবন্ত একজন শিবিকা বাহকের পুত্র। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের দিকে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং সুযোগ পাইলেই প্রাচীর-গাত্রে চিত্র অঙ্কিত করিতেন। কালে দশবন্ত মহামতি আকবরের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শুধু ভারতবর্ষের নয়, ঐ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হন। প্রবল পরিতাপের বিষয় যখন তাঁহার অঙ্কনশক্তি ও কীর্ত্তি চরম সীমায় উপনীত, তখন অকস্মাৎ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আত্মহত্যার দ্বারা জীবনাবসান ঘটান। আইন-ই-আকবরীতে ঐ দুইজন ছাড়া লাল, মধু, মুকুন্দ, মুসকিন, তারা, মহেশ, ক্ষেম, করণ, জগন, সনওয়ালাহ, হরিবংশ এবং রাম নামক দরবারী চিত্রকরের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে মুসকিন এবং সনওয়ালাহ ছাড়া আর সকলেই হিন্দু। ইহাতে বুঝা যায় শিল্প সাধনার পক্ষে এক সময় সেই গুরুত্বপূর্ণ সুমধুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে যাহার একান্ত অভাব আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে।

বিশুদ্ধ 'রাজস্থানী' চিত্রাঙ্কন-প্রণালী পাঞ্জাবের উত্তরস্থিত হিমাদ্রিবক্ষস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। ডগ্রা সম্প্রদায়ের বাসস্থান জম্মু প্রভৃতি গিরিরাজ্যে 'পাহাড়া প্রণালী' আখ্যায় অভিহিত এক শ্রেণীর অঙ্কনপদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে এই ধারার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পাহাড়ী চিত্রগুলির পরিকল্পনা এবং বর্ণসম্পদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পাহাড়ী পদ্ধতিতে অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই শ্রেণীর শিল্পীরা তাঁহাদের বিষয়বস্তু শুধু রামায়ণ মহাভারতাদি সর্ব্বজনাদৃত পৌরাণিক মহাকাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা

তৎকালীন প্রসিদ্ধ নানা নৃপতি বা বীরবর্গের আলেখ্যও অঙ্কিত করিয়াছেন। পাহাড়ী চিত্রশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত রাগ ও রাগিণীর চিত্রগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রধান রাগ ও রাগিণীগণকে সঙ্গীত শাস্ত্রীয় উক্তি অনুসারে পুরুষ বা নারী কল্পনা করিয়া সেই কল্পনাকে শিল্পী অনন্য সাধারণ দক্ষতার সহিত নটের বক্ষে মূর্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন। সমগ্র রাগমালাই চিত্তচমৎকারী চিত্রাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কাংরা উপত্যকায় পাহাড়ী প্রণালীর একটি শাখা দেখা যায়। ইহাকে 'কাংরা অঙ্কন ধারা' আখ্যাতেও অভিহিত করা হয়। অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত এই পদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা সামসের বন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় বলা যায়। অল্পকাল স্থায়ী হইলেও "কাংরা প্রণালী" বহু উৎকৃষ্ট আলেখ্য প্রসব করিয়া চিত্রজগতে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'রাজস্থানী' 'পাহাড়ী', 'কাংরা' ইহাদিগকে রাজপুত চিত্রাঙ্কন প্রণালী-রূপ মহান মহীরুহের শাখা-প্রশাখা বলিয়া অভিহিত করা যায়। শিল্পসমালোচকগণ কাংরা পদ্ধতিতে প্রস্তুত কতিপয় আলেখ্যকে রাজপুত চিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। 'রাজপুত' ধারার মন ও বৈশিষ্ট্যই আমরা রাজস্থানী, পাহাড়ী ও কাংরা পদ্ধতির ভিতর দেখিতে পাই। কোন কোন কাংরা শিল্পী নারী চিত্রাঙ্কণে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন কামিনীসুলভ কমনীয়তা বা লালিত্য চিত্রের গাত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা এ বিষয়ে খাস রাজপুত শিল্পীদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

প্রত্যেক চারুশিল্প বা ললিতকলায় প্রবল বিরোধী ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মোগল অঙ্কন প্রণালীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এই পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অঙ্কন পদ্ধতি জয় লাভ করে। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে মোগল প্রণালীর উপর কিছুটা ইউরোপীয় প্রভাব পতিত হয়, ইহা ত অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে জাহাঙ্গীরের দরবারে যাঁহারা দূতরূপে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ইউরোপের প্রসিদ্ধনামা চিত্রশিল্পীদের বহু সংখ্যক চিত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সুতরাং মোগল প্রণালীর পক্ষে ইউরোপীয় প্রভাব সঞ্চারিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়। 'রাজপুত' প্রণালী

অজন্তা গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত
(চিত্রটি মহাহংস জাতকে উল্লিখিত ঘটনা)

এবং উহা হইতে সঞ্জাত রাজস্থানী পাহাড়ী ও কাংরা পদ্ধতির উপর পাশ্চাত্য বা বিজাতীয় প্রভাব বিন্দুমাত্রও সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। উহারা স্বধর্ম্মানুগ নিজস্ব ভাবধারায় ও পরিকল্পনায় বরাবর সুপ্রতিষ্ঠ ছিল।

মোগল শাসনের ক্রমিক অবসান এবং বৃটিশ শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শুধু চিত্রকলা নয়, সর্ব্ব-প্রকার ললিতকলাই ক্রমশঃ অপকর্ষতা লাভ করে। মোগল যুগের শেষভাগে ইউরোপীয় প্রভাব প্রবেশের কথা আমরা বলিয়াছি। যখন এই প্রভাব প্রবেশ করে তখন অভিনব সৃষ্টি-শক্তির অভাব মোগলচিত্রশিল্প প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত বৃটিশশাসনের প্রথমাংশে এমন কতকগুলি

চিত্রকরের আবির্ভাব ঘটে, যাহাদের প্রচেষ্টার মধ্যে মৌলিকতা বা নিজস্ব পরিকল্পনা অপেক্ষা ইউরোপীয় অঙ্কন প্রণালীর এক প্রকার অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণই অধিক দৃষ্ট হয়।

ভারতের চিত্রজগতে যে নূতন জীবন বা জাগরণ, যে অভিনব অনুপ্রেরণা পরে সঞ্চারিত হয়, তাহার অভিনয়-ভূমি যে বাঙ্গালাই, সে বিষয়ে সংশয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন যুগ সাহিত্যজগতে আবিভূর্ত হয়, তাহারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অঙ্কন কলাজগতেও অভিনব যুগের আবির্ভাব ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী চিত্রশিল্পিগণ বৈদেশিক বা বিজাতীয় অনুকরণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারতের নিজস্ব অজন্তা ও রাজপুতধারায় এক যুগোচিত অভিনব অভিব্যক্তি ঘটাইতে প্রযত্ন করেন বলা যায়। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রাচীন ভারতের মহিম মূর্ত্তিই আমাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত করে। অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত অনেকে উপহাস করেন। চারিদিক হইতে প্রতিকূল সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হয়। অবশেষে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সত্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, তাঁহারা প্রকৃষ্ট পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন, পরানুকরণ বা বিজাতীয় আদর্শ অনুবর্ত্তন অপেক্ষা ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রাচীন পদ্ধতি আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ এই শিল্পীরা তাঁহাদের বিষয়বস্তুও ভারতের পৌরাণিক আখ্যায়িকা বা প্রাচীন সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করেন।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিনব বা আধুনিক প্রণালীর প্রবর্ত্তক বা অনুবর্ত্তক এই সকল শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের পর নন্দলাল বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী হইলেও ইঁহার অঙ্কন-প্রণালীর মধ্যে একপ্রকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট বা পরিস্ফুট পরিচয় বিদ্যমান আছে। জাপানের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক ওকাকুরার সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গের জন্য জাপান ও চীনের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের রচনার সহিত ইঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের কিঞ্চিৎ প্রভাব শিল্পিশিরোমণি বসুর রচনাবলীর মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল প্রমুখ নবযুগ প্রবর্ত্তক শিল্পিগণ 'অজন্তা' ও 'রাজপুত' আদর্শ ব্যতিরেকে যদি অন্য কোন দেশের আদর্শ যৎকিঞ্চিৎ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেরই করিয়াছেন, আদৌ পাশ্চাত্য দেশের অনুবর্ত্তী হন নাই। যাঁহারা পরিকল্পনা ও প্রেরণার জন্য স্বদেশের লোকসাহিত্যে বা লোকশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্রশিল্প সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চিত্রকলাবিদ যামিনী রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধান্তরে আধুনিক যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা শিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

কুঁড়ি

মাগুরার পল্লবগ্রাহী জীবনে ছন্দা ক্রমেই আবার তিক্ততার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। অঞ্জনার তীক্ষ্ণ জিহ্বা আবার লেলিহান হ'য়ে উঠতে দেরী হ'লো না। নীরবে নির্ব্বিবাদে ক্ষীণপক্ষ পতঙ্গের মতো সেই লেলিহান শিখায় পুড়তে হ'লো ছন্দাকে। তবু এই আশ্রয় তাকে শান্তির আশ্রয় ব'লেই মেনে নিতে হ'য়েছে; না নিয়ে উপায় নেই। তার নিজের গৃহ ব'লতে একদিন যা স্বর্গ-রাজ্য হ'য়ে উঠেছিল তার কাছে, আজ তা শ্মশান। শ্মশানচারিণী যোগিনীর মতো চোখ বুজে শব-সাধনা ক'রতে গিয়ে ত্রাসে চিৎকার ক'রে উঠতো তার অন্তরাত্মা। স্বর্গরাজ্য তার কাছে ভূষণ্ডীর লীলাভূমি হ'য়ে দেখা দিল, পারলো না তারিনীমোহনকে আশ্রয় ক'রে ইন্দ্রলোকের শচী-সুলভ মর্য্যাদা নিয়ে সুখী হ'তে ছন্দা, জীবনের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এসে দাঁড়ালো এই অগ্নি-গোলার্দ্ধে। কিন্তু তবু কি ভুলতে পারলো সে শ্যামলকান্তিকে? বিধাতার যে অমোঘ বিধানে একদিন তার সাথে ভাগ্য গাথা হ'য়ে গিয়েছিল, তাকে কি এত সত্বর আর এত সহজেই ভোলা সম্ভব! কিন্তু কাকিমা অঞ্জনার স্বভাবগত চিৎকারে মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ড এমনভাবে চমকে ওঠে যে, কোনো চিন্তাই তখন আর মাথায় থাকেনা, সমস্ত মাথাটা তখন কেমন এক অদ্ভুতভাবে ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে থাকে।

এই দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে মাঝখানে তবু কয়েকটা দিনের জন্য সবিতা এসে গৃহের আভ্যন্তরীণ সুরটাকে ঈষৎ নরম ক'রে দিয়ে গেছে। রংপুরে তার শ্বশুরবাড়ী। স্বামী অনিলকুমার চাকরীজীবী মানুষ। কথা ছিল—প্রথম সন্তানের ব্যাপারে মাগুরায় এসেই সবিতার প্রসব হবে, কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তিতে তা আর হ'য়ে ওঠে নি। কিছুদিন পর মাস দু'য়েকের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে হাসিমুখে এসে উপস্থিত হ'লো সবিতা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা গেল—মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-সমুদ্রে অতীতের জঞ্জাল অলক্ষ্যে কখন্ ধুয়ে মুছে সব একাকার হ'য়ে গেছে। অনুমান মিথ্যে নয় ছন্দার। মাগুরার মেয়ে সবিতা আর রংপুরের বউ সবিতার মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল পার্থক্য, সেই পার্থক্যকে আরও সুদূর-প্রসারি ক'রেছে তার মাতৃত্ব। ছেলের নাম রেখেছে গৌর, গৌরাঙ্গের মতই দেবকান্তি। গৌরাঙ্গ-জননী সবিতা আজ একেবারেই স্বতন্ত্র মানুষ।

বাড়ীর উঠোনে এসে পা দিতেই তার বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সারা বুকখানির মধ্যে জড়িয়ে ধ'রলো ছন্দা, ব'ল্‌লো, 'বাঃ, এমন সুন্দর না হ'লে কি গৌরবাবু আমাদের গৌরাঙ্গ হয়! নিশ্চয়ই ও ওর বাবার মতো হ'য়েছে, তাই না সবি?'

—'হ্যাঁ, বাবার মতো না আরও কিছু, মুখের আদোল দেখে মনে হ'চ্ছে মাতুলের ধারা পেয়েছে। গৌরের ঠাকুমা বলেন—ঠিক্ মিণ্টুর মতো হ'য়েছে দেখতে।' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো সবিতা।

মিণ্টু এবং জিতু ততক্ষণে দিদিকে এসে ঘিরে ধ'রেছিল। মিণ্টুর চিবুক স্পর্শ ক'রে গৌরাঙ্গকে একবার মিলিয়ে

দেখ্‌লো ছন্দা, তারপর ব'ল্‌লো, 'খুব মেলাতে শিখেছিস্ যা-হোক্, গৌরের কোন্ যায়গাটা মিণ্টুর মতো, দেখা দিকি? মাঐমাকে আমাদের নিশ্চয়ই বাহাত্তরে পেয়েছে, নইলে এমন ভুল ক'রবেন কেন! গৌরের বাবাকে আমার দেখার সুযোগ হয়নি বটে, কিন্তু ওর চেহারার মধ্য দিয়ে তাকে বেশ কল্পনা ক'রে নিতে পারছি। গৌর নিশ্চয়ই তার বাবার মতো হ'য়েছে।'

—'গৌরের দাদুও অবিশ্যি এই কথাই বলেন।'

—'দৃষ্টিশক্তিতে তিনি তবে মাঐমার চাইতে এখনও সক্ষম আছেন ব'ল্‌তে হবে।' ব'লে মুখ টিপে একবার কৌতুকের হাসি হাস্‌লো ছন্দা।

সবিতা ব'ল্‌লো, 'তা আছেন, এখনও চশ্‌মা নেন্‌নি; গৌরের ঠাকুমাকে অবিশ্যি আমি গিয়ে অবধিই চশ্‌মা ব্যবহার ক'রতে দেখেছি।' তারপর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ছন্দার কোল থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে মার কাছে ব'স্‌লো সে।

ইচ্ছে ছিল না নিজের বুক থেকে গৌরকে নামিয়ে দেয় ছন্দা। কিন্তু অধিকার নেই কেড়ে রাখার। একদিন এম্‌নি একটি অনিন্দ্যকান্তি শিশুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সারা হৃদয় তার উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌তো। বিধাতা সে-প্রতীক্ষা তার পূর্ণ করেন নি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে কি তাই ব'লে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে সে, পারেনি। আজও তার সমস্ত হৃদয় হাহাকার ক'রে ওঠে, হাহাকার ক'রে ওঠে তার সমস্ত যৌবন—সমস্ত জীবন-সত্তা। গৌরকে বুকে পেয়ে ক্ষণিকের একটা অনুপম আনন্দে সারা বুক তার নেচে উঠ্‌লো, কেঁদে উঠ্‌লোও সেই সঙ্গে। এই হাসি-কান্নার দ্বন্দ্ব-দোলায় অতীত ভবিষ্যৎ সব যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একাকার হ'য়ে গেল তার কাছে।…

অবকাশ মতো একসময় কাছে ব'সে আক্ষেপের সুর তুলে ধ'রলো সবিতা: 'শ্যামলবাবু হঠাৎ এম্‌নি ক'রে আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন, একথা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি। তোর অদৃষ্টের কথা ভাব্‌তে গেলে দুঃখে বুক ভেঙে যায় ছন্দা।'

—'আমার নিজের অদৃষ্টের কথা আজ আর আমি ভাবিনা, শুধু তাঁর কথাই মনে হয়।' রুদ্ধকণ্ঠে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'জীবনে যখন সব চাইতে বেশী উন্নতির সময়, সেই সময়ই পৃথিবী থেকে তাঁকে চ'লে যেতে হ'লো। পরিশ্রমকে গায়ে মাখ্‌তেন না কখনও, কিন্তু সেই পরিশ্রমই কাল হ'য়ে দাঁড়ালো।'

সমবেদনার কণ্ঠে সবিতা ব'ল্‌লো, 'সবই অদৃষ্ট বোন, তার জন্যে মিথ্যে ভেবে লাভ নেই। তুই বরং মাঝে মাঝে তোর শ্বশুরের কাছে গিয়ে থেকে আসিস্; সংসারে তিনিও তো কম নিঃস্ব ন'ন্! শ্বশুর শাশুড়ীর ঘর ক'রে আজ আমি সব বুঝ্‌তে শিখেছি। একদিন ছোট বেলায় অবুঝের মতো কি অত্যাচারটাই না তোর উপর ক'রতাম! সে কথা ভাবতে গেলে আজ লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তুই যেন সেদিনের কথা কিছু মনে ক'রে রাখিস্‌নে ভাই!' একবার চল্, কিছুদিন রংপুরে কাটিয়ে আস্‌বি; দু'জনে তবু ক'টা দিন কাছে থাক্‌তে পারবো। গৌরের বাবাও খুশী হবেন।'

কথা চাপা দিয়ে ছন্দা ব'ললো, 'কেমন লোক আমাদের অনিল বাবু, কৈ কিছু ব'ল্‌লি না তো?'

—'ব'লে কি তার রূপ দেওয়া যায়, গিয়েই না হয় দেখ্‌বি!'

—'তাঁরই কি আস্‌তে নেই নাকি? শ্বশুর শাশুড়িকে দেখ্‌তেও তো মানুষ আসে!'

—'সে আর এসেছে, ব'লতে গেলেই শুনি—আপিস নাকি তাকে ছুটি দেয় না! বিশ্ব-সংসারে কাজ যেন সে একাই করে!' ব'লে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রলো সবিতা।

বোঝা গেল—এখানে আসার সময় ঝুলোঝুলি ক'রেও তাকে সঙ্গে আন্‌তে পারে নি সবিতা, এই নিয়ে কিছু একটা মনকষাকষিও হ'য়ে থাক্‌বে। বেশ লাগে শুন্‌তে এই ধরণের কথাগুলো ছন্দার। পারিবারিক জীবনের সুন্দর একটি ছবি, একটি মনোরম দৃশ্য যেন চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

ঠাট্টা ক'রে ছন্দা ব'ললো, 'আমি কিন্তু ইচ্ছে ক'রলেই তাঁকে এখানে টেনে আনতে পারি। আজই যদি তোর কিছু একটা অসুখের কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে দিই,

দেখবি—কালই সুর-সুর ক'রে উপস্থিত হ'য়েছেন। আন্‌তে জানিস নে, তাই আসেন না

শুনে আত্মতৃপ্তিতে একবার মুগ্ধ হাসি হাসলো সবিতা : 'বেশ তো, পাঠিয়েই দেখ না টেলিগ্রাম!'

কিন্তু ততদূর অগ্রসর হ'তে সাহস পেলো না ছন্দা। বল্‌লো, 'থাক্, শেষে সত্যি সত্যিই তোর কিছু একটা হ'য়ে বসুক্, তাই নিয়ে বিপদে পড়ি আমি আর কি!' তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'অনিল বাবুকে কেমন লাগ্‌ছে তোর, বল দিকি?'

—'গৌর কোলে এলো, তাতেও বুঝলি নে কেমন লাগছে?' ব'লে হেসে ফেল্‌লো সবিতা; তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'ভীষণ রসিক লোক, বানিয়ে বানিয়ে এমন সব আজগুবি গল্প বলে যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায়।'

শুন্‌তে শুন্‌তে শ্যামলকান্তির কথাই বার বার ক'রে মনে প'ড়ছিল ছন্দার। আজগুবি গল্প তাঁর মুখে ছিল না, কিন্তু যা ছিল—প্রাণরসে তা পরিপূর্ণ। কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন ক'রে! ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লো ছন্দা।

ভেবেছিলো—আরও কয়েকটা দিন সবিতা কাছে থেকে কিছু শান্তি দিয়ে যাবে, কিন্তু হ'লো না। রংপুরে তার স্বামীকে টেলিগ্রাম করা দূরে থাক্, তাঁরই বরং উল্টো টেলিগ্রাম এসে একদিন উপস্থিত : সবিতা যেন দুই একদিনের মধ্যেই রংপুরে রওনা হ'য়ে যায় আশ্চর্য্য মানুষ যা হোক্!

কোনো ওজর আপত্তিই টিক্‌লো না; এ সংসারে তার আপত্তির মূল্যই বা কতটুকু! মাত্র কয়েকটা দিন থেকেই আবার রওনা হ'য়ে গেল সবিতা। এ ক'টা দিন মেজাজ অপেক্ষাকৃত কিছু শান্ত ছিল কাকিমার, নিজের মনেও কিছু সুস্থতা বোধ ক'রেছিল ছন্দা। কিন্তু আত্মভোলা হ'য়ে বেশীদিন থাক্‌তে পারলেন না অঞ্জনা, যা নয় তাই ব'লে আবার গজ্ গজ্ ক'রতে সুরু ক'রে দিলেন। সেই সুরের সঙ্গে তাল রেখে না চ'ল্‌তে পারলেই বানচাল হ'য়ে যেতে বসে অদৃষ্ট।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এলো—তারিণীমোহন বিশেষ রোগাক্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন, ছন্দাকে দেখ্‌বার জন্য বড় উতলা হ'য়ে উঠেছেন তিনি। রসিকলাল একসময় কাছে ডেকে ব'ল্‌লেন, 'এ সময়ে তোমার আর মোটেই দেরী করা উচিৎ নয় মা। চলো, আমিও বরং দু'দিন ঘুরে আসি। সংসারে ক'দিন আছি, কবে নেই—কিছুই তো বলা যায় না, সময় থাক্‌তে থাক্‌তে তবু একবার বেয়াই মশাইর কাছ থেকে দু'দিন কাটিয়ে আসি।'

ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এ বয়সে আপনার পায়ে ব্যথা নিয়ে ঘুরে আস্‌তে কষ্ট হবে না তো, কাকাবাবু?'

—'না, না, কষ্ট কি! সায়টিকা, রিউমেটিক, গাউট,—এসবে বরং হাঁটা-চলাই কিছু দরকার।' থেমে রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'তুমি তৈরী হ'য়ে নাও মা, খেয়ে দেয়ে অম্‌নি রওনা হ'য়ে পড়বো।'

শুনে নেপথ্যে থেকে অঞ্জনা কিছুটা কটাক্ষপাত ক'রলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ক'রলেন না তাতে রসিকলাল। যথাসময়ে তিনি রওনা হ'য়ে প'ড়লেন।

কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! এমন দেখাও মানুষকে মানুষ কখনও দেখতে যায়! গাড়ী এসে যখন তারিণীমোহনের দরজায় দাঁড়ালো, তারিণীমোহনের নশ্বর দেহকে সৎকার ক'রে তখন সকলে ফিরুচে। স্তম্ভিত নেত্রে তাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিলেন রসিকলাল। ছন্দা ততক্ষণে কেঁদে লুটিয়ে প'ড়েছে। ইতিপূর্ব্বে মাগুরা থেকে শ্বশুর-মশাইকে সে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিল, উত্তরে অসুস্থতার এমন কিছু কোথাও লেখা ছিল না—যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া চলে। শুধু তাকে দেখবার আগ্রহটাই বিশেষ ভাবে ফুটে উঠতো তারিণীমোহনের প্রতি চিঠিতে। আজ এমনভাবে তিনিও হঠাৎ সংসার থেকে চ'লে যাবেন—এ কথা কল্পনাও ক'রতে পারে নি ছন্দা!

স্বতন্ত্র হিসাবে জ্ঞাতিসম্পর্কে পরেশ কাকার সংসারের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল তার। উপস্থিত বেলাটা তাঁর ঘরেই কাটাতে হ'লো। বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পরেশ বাবু ব'ললেন, 'অসুখ হ'য়েই যে হঠাৎ এমন বেড়ে যাবে, কেউই আমরা ভাবতে পারি নি। কিছুদিন থেকে দাদা যে সুস্থ ছিলেন না, তা বেশ বুঝতে পারতাম। ডাক্তার ক'ব্‌রেজ এসে তাঁকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুক, তা

তিনি চাইতেন না। তবু চিকিৎসার আমরা ত্রুটি রাখিনি। কখনও 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস ক'রলেই ব'লতেন—'মন্দ কি, ভালই তো আছি।' এমন ভাবে যে মৃত্যু আসবে, বোধ করি তিনিও ভাবতে পারেন নি। কাল সকাল থেকেই হঠাৎ ঘন ঘন ফিট হ'তে সুরু করে; সারাদিনই ডাক্তার বাড়ীতে ছিল, ইন্‌জেকশন চ'ললো, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পথ্য। কিন্তু বিকেলের দিকে ডাক্তারও হাল ছেড়ে দিল। তারপর রাত্রেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো।'

ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'বাবার আগে কাউকে কিছু ব'লে যেতে পেরেছেন? শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ জ্ঞানটুকুও আর ছিল না?'

—'শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বার আগে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল। ব'ল্‌লেন—হাতবাক্সে উইলের কাগজ আছে, তুমি এলে তোমার হাতে যেন তুলে দিই। বিষয় সম্পত্তি এমন কিছু নেই—যা দেবার মতো, তবু এখানকার হিস্যাগত অংশ—তাই বা একেবারে কম কি! তোমার জীবন এতেই কেটে যাবে মা।'

ছন্দার চোখ দু'টি বেদনায় আর-একবার ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠলো। আর্দ্রকণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'বিষয়সম্পত্তি দিয়ে আমি কি ক'র্‌বো কাকা? নতুন বউ হ'য়ে এ সংসারে এসে ঢুকেছিলাম, এর কোথায় কি আছে, তাই-ই ভালো ক'রে জানি না, সম্পত্তি তো দূরের কথা। ও দিয়ে আমার কাজ নেই।'

পরেশ বাবু ব'ল্‌লেন, 'তোমার জিনিষ তুমি বুঝে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কোরো। এ সম্বন্ধে আমি কি ব'ল্‌বো মা?'

রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'অন্যায্য কিছু বলেননি পরেশ বাবু। শ্যামলের হ'য়ে এ সম্পত্তি যে আজ তোমাকেই রক্ষা ক'রতে হ'বে মা! নইলে স্বর্গে থেকে বেয়াই মশাই'র আত্মা কি শান্তি পাবে?'

আইনজীবী রসিকলাল, এতক্ষণ নীরবে সর্ব্ববিষয় শুনে বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে পুনরায় চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তিনি যদি বুঝতেন—এ পোড়া যক্ষপুরী আগ্‌লে একটা দিনও বাঁচতে পারবে না ছন্দা, এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে আজ তার, একটা মুহূর্ত্তও পারবে না সে নিজেকে নিয়ে স্থির থাক্‌তে এখানে,—তা হ'লে হয়ত নিজের মত ব্যক্ত ক'রতে গিয়ে একবার ইতস্ততঃ ক'রতেন রসিকলাল। কিন্তু ছন্দার ভবিষ্যতের দিক চিন্তা ক'রেই তার ভাবপ্রবণ চিত্তকে এ ভাবে আঘাত ক'রতে হ'য়েছে তাঁকে। না ক'রে তাঁর পক্ষে উপায় ছিল না। নিজের সংসারের প্রতি তাঁর আস্থা নেই ব'লেই ছন্দার অদৃষ্ট নিয়ে এ ভাবে আজ তাঁকে ভাবতে হয়।

কাকাবাবুর কথার উত্তরে ছন্দা এতটুকুও প্রতিবাদ জানালো না। বরং নির্ব্বিবাদে তা মেনে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল।

পরেশবাবু একসময় চাবির গোছা এনে তার হাতে তুলে দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'এবারে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম মা। নিজের ঘরে গিয়ে এবারে জিনিষপত্র সব বুঝে শুনে নাও।'

কিন্তু তিনি যত সহজে কথাটা ব'ললেন, তত সহজেই কিন্তু কাজ মিটলো না। নিশ্চিন্ত হ'তে গিয়ে তাঁকে বরং আরও কঠিন দায়িত্বে জড়িয়ে প'ড়তে হ'লো।

রসিকলাল ব'ললেন, 'জ্ঞাতি সম্পর্কে আপনিও তো আমার বেয়াই, আপনাকে অনুরোধ ক'রতে তাই লজ্জা নেই। আপাতত উপস্থিত থেকে এসব আপনাকেই দেখাশোনা ক'রতে হবে। আজ আপনারা ভিন্ন ছন্দার আপনার ব'লতে আর কে রইল! সুবিধে মতো যখন এসে ও এখানে থাক্‌বে, তখন বরং দেখে শুনে সব বুঝে নিতে পারবে। এখন মনের এই অবস্থায় ওকে কিছু ব'লে লাভ নেই।'

একটা দুশ্চিন্তা থেকে যেন এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে মনে মনে অনেকখানি বেঁচে গেল ছন্দা।

রসিকলাল এমন ভাবে কথাটা ব'ল্‌লেন যে, ইচ্ছে ক'রেও আপত্তি ক'রতে পারলেন না পরেশ বাবু। ব'ললেন, 'বেশ, আমি তবে ছন্দা মার ট্রাষ্টি হিসেবেই এসব কিছু আগ্‌লে রাখবো। তাই ব'লে এদিকটা যেন একেবারেই ভুলে থেকো না মা। এখানে এসে তোমাকে কোনো অসুবিধেই পোয়াতে হবে না।'

উত্তরে রসিকলাল কিছু একটাও আর ব'ল্লেন না।

ছন্দা মনে মনে একবার কথাটা উচ্চারণ ক'রলো: 'অসুবিধে!' এতকাল এত সুবিধে থাকতেই যার ভাগ্যে সুখ ব'লে কিছু রইল না, আজ প্রেতপুরীতে ব'সে কোন্ সুখে সে সংসারের সহস্র সুবিধে ভোগ ক'রবে? কিন্তু মুখ ফুটে সে একটি কথাও আর ব'ল্তে পারলো না। শুধু বিদায় নিয়ে আসার সময় পরেশ কাকার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে নীরবে চোখের জলে তাঁর পা দু'খানি ভিজিয়ে দিয়ে এলো ছন্দা।

একুশ

দিলীপ দত্তের পরিচয় জেনেও রেবার সঙ্গে তার পরমাত্মিয়তার সম্পর্কটা একেবারেই অনাবিষ্কৃত ছিল বিজনের কাছে। এই অনাবিষ্কৃততাই বার বার তার কাঙাল হৃদয়কে টেনে নিয়েছে রেবার সমুখে।—ক'ল্কাতার আশ্চর্য্য জীবন! এখানে পাশাপাশি বাস ক'রেও পাশের বাড়ীকে মনে হয় কত দীর্ঘ যোজন দূরের। এমনি প্রচ্ছন্নতা, এমনি আবরণ আর আচ্ছাদন ছড়িয়ে র'য়েছে ক'ল্কাতার নিশ্বাসে। এম্নি একটা আচ্ছাদনে আবৃত হ'য়েই হৃদয়কে তুলে ধ'রেছিল বিজন রেবার কাছে—যেম্'ন ক'রে মুগ্ধ ভ্রমর নিজেকে তুলে ধরে ফুলের পাঁপড়িগুচ্ছে। অবশেষে নিজের অপেক্ষমান ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্থির ক'রে ফেল্লো সে মনে মনে। বস্তুবাদী মহেন্দ্রের কোনো যুক্তিই শেষ পর্য্যন্ত আর তার কানে এসে পৌছালো না। নিজের আত্ম-বিশ্বাসের কাছে মহেন্দ্রের কোনো যুক্তিকেই সে আমল দিতে চায়নি। কয়েকটা দিন এই নিয়ে সে অনেক ভেবে দেখেছে, ভেবে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছেচে যে —রেবাকে না পেলে তার জীবন-স্বপ্ন মিথ্যা হ'য়ে যাবে, মিথ্যা হ'য়ে যাবে তার মানুষের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়ের চাইতে তাই সমাজগড়া ধর্ম্মের কৃত্রিমতাকে সে বড় ক'রে দেখেনি। ছন্দা চ'লে গিয়ে তার হৃদয়ের একটা দিককে মরুভূমি ক'রে দিয়ে গেছে, রেবা তার আর-একদিকের সম্পূর্ণতা। জীবনকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে তার যেমন ভাঙ্গা গড়া আছে, ভেঙে আর-একদিককে যেমন সৃষ্টি করে সে, তেম্নি বিজনের জীবনেও একদিকের ভাঙনের উপর নতুন সৃষ্টির লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে আর-একদিকের সম্পূর্ণতা দিয়ে। নইলে বাঁচবে কি নিয়ে সে, কি নিয়ে এগিয়ে যাবে সাম্নের পথে?

মহেন্দ্রের অগোচরে একদিন সমাজ-মন্দিরে গিয়ে আচার্য্যের কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে এলো বিজন। মায়ের বুকে গিয়ে অলক্ষ্যে তার এই ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ প্রকৃতই আঘাত ক'রলো কি না, কিম্বা মাগুরার পল্লী-সমাজ ভবিষ্যতে তাকে গ্রহণ ক'রবে কি না, এ চিন্তা আজ অবান্তর। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভেই নিমজ্জিত থাক্। তা নিয়ে আপাতত চিন্তাসূত্রে জড়তা আন্তে রাজী নয় বিজন।

প্রশান্ত মনেই একসময় গিয়ে উপস্থিত হ'লো সে মিঃ মল্লিকের বাড়ীতে। সন্ধ্যা সবে তখন উত্তীর্ণ হ'য়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠতে গিয়ে কানে বাজলো তার অর্গানের একটা মিষ্টি সুর। ব্যর্থ হ'লো না তবে আজকের এই সন্ধ্যাটা। উপরে আস্তেই লক্ষ্যে প'ড়লো—ত্রস্তে পাশ কাটিয়ে নীচের পথে নেমে গেল দিলীপ, ব'ললো, 'এই যে, ভাল তো?' কিন্তু জবাবের প্রত্যাশা রেখে হয়ত প্রশ্ন করেনি সে, তাই বিজন মুখ ফুটে 'হ্যাঁ' ব'লবার আগেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল দিলীপ, নীচে নেমে সোজা একেবারে পথে। সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যেই কখন্ অর্গানের সুর হঠাৎ থেমে গেল। কাছে এসে বিজন ব'ল্লো, 'আস্তে না আস্তেই গানটা থামিয়ে দিলে তো?'

নিজের কাছেই আজ নিজে সঙ্কোচে ম'রে যাচ্ছিল রেবা। ভাল ক'রে তাই বিজনের মুখের দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকাতে পারলো না সে। কেমন একটা দ্বিধা, দ্বিধার সঙ্গে কেমন একটা আত্মগ্লানি এসে তাকে পীড়া দিতে লাগ্লো। কিন্তু মনের এ অবস্থাকে বেশীক্ষণ সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে সহজ ক'রে নিল'।—'থামিয়ে কেন দেবো, গান তো গাইনি, অর্গানের রিড্গুলোই শুধু বাজছিল। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ ভালো লাগ্লো না।'

বিজন একথা জোর ক'রে ব'লতে পারলো না যে, সিঁড়ি বেয়ে আস্‌তে আস্‌তে গান গাইতেই সে শুনেছিল তাকে; থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, শরীর কোনরকম খারাপ বোধ ক'রছো?'

—'না, শরীর ভালোই আছে; এম্‌নিই কেন যেন গাইতে মন ব'স্‌ছিল না।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'চলো, নীচে গিয়ে তোমাকে চা ক'রে দিই, তারপর ব'সে ব'সে গল্প ক'রবো।'

—'চায়ে এখন প্রয়োজন নেই, কিছুক্ষণ আগেই মেস থেকে খেয়ে বেড়িয়েছি।' বিজন ব'ল্‌লো, 'তা ছাড়া নীচে গেলেই কি গল্পে মন ব'স্‌বে? যে কারণে গান ভালো লাগেনি, হয়ত সেই একই কারণে গল্প ক'রতেও মন সায় দেবে না। আজ হয়ত তোমার মনের বিহঙ্গ কোনো নতুন আকাশে ডানা মেলেছে।'

স্মিতহাস্যে মুখখানি এবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো রেবার। বিজনের কথার ঠিক যথাযথ উত্তর না দিয়ে ব'ল্‌লো, 'কাব্যের উৎকর্ষতায় ভাব তোমার গভীরে পৌঁছেচে, বেশ লাগে শুন্‌তে তোমার কথাগুলো, বিজুদা।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'কথা শোনাতে আসি নি, শুন্‌তে এসেছি। তার সাথে নিজের কথাকে কিছু যোগ ক'রে দেবো,—এইটুকু।'

—'আজ তোমার তবে মাথা খারাপ হ'য়েছে বিজুদা; আমি কি কথার জাহাজ, না তোমার মতো কথা নিয়ে চর্চ্চা করি যে,শুন্‌তে এসেছ, শোনাতে আসনি! চলো, চা না খাও তো অন্য কিছু খাবে, নিচে যাই চলো।'

—'এখানেই বা এমন কি ক্ষতি হ'লো! প্লেট সাজানো ভিন্ন আর কি সংসারে কিছু খাবার নেই, আরও সুন্দর, আরও মধুর, আরও মিষ্টি!'

কথাটা বুঝে নিতে দেরী হ'লো না রেবার। দেখতে দেখতে সারা মুখখানি তার লাল হ'য়ে উঠলো, সেই সাথে সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কে গেল সহসা। এই মুহূর্ত্তে যে ইঙ্গিত ক'রলো বিজুদা, অন্য কোনোকালের কোনো একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা হয়ত প্রাণদায়িনী ব'লে মনে হ'তে পারতো তার কাছে। কিন্তু আজ একথা শুন্‌তে শুধু ধিক্কারই আসে না, এ কথা কানে শুন্‌তেও পাপ। যে দেহ, যে মন আপন ইচ্ছায় সে তুলে দিয়েছে দিলীপকে, সেই দেহ আর সেই মনের উপর অন্য কারুর ছায়াসম্পাত ঘ'টতে পারে না। তা নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তার মতো পাপ বুঝি এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই! কী একটা ব'লতে গিয়ে হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেল্‌লো রেবা।

নিজের আসল বক্তব্যে এসে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত বিজনও বড় কম অস্বস্তি বোধ ক'রছিল না এতক্ষণ। খাবারের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে নিজের কথায় এবারে নেমে আস্‌তে চেষ্টা ক'রলো সে।—

—'জানো রেবা?'

কথা না ব'লে মুখখানিকে শুধু একবার তুলে ধ'রলো রেবা। মনের বিরক্তিকে বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না সে এতটুকুও।

কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রেই বিজন ব'ললো, 'আজ আমার সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তোমার কাছে। শুধু এইজন্যেই আজ ছুটে আস্‌তে হ'য়েছে আমাকে। সেদিন যে কথার ইঙ্গিত ক'রেছিলে তুমি, আজ তার বাস্তব স্বীকৃতিটাই শুধু তোমাকে জানাতে এলাম রেবা। সমাজ-মন্দিরে গিয়ে আচার্য্যের কাছ থেকে আমি তোমাদেরই ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে এসেছি। আজ আর নিশ্চয়ই কোনো প্রতিবন্ধন নেই আমাদের মধ্যে।'

মনে হ'লো—সারা বুকের মধ্যে হয়ত একবার ঝড় বইবে, পারবে না নিজেকে নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে রেবা। কিন্তু তার সমস্ত লক্ষণ চাপা প'ড়ে কেমন ধীর অথচ আভিজাত্য-কঠোর হ'য়ে উঠলো রেবার কণ্ঠ। ব'ললো, 'পারলে তুমি নিজের সনাতন ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে আস্‌তে? এমন ক'রে তুমি ছেলেমানুষি ক'রবে বিজুদা, এ কল্পনাও ক'রতে পারিনি।'

—'ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকে আর যা-ই করো, মিথ্যে হেয়ালীতে ছেলেমানুষী ব'লে উড়িয়ে দিওনা, ধর্ম্ম তা শুনবে না।' বিজন ব'ললো, 'যিনি সকল ধর্ম্মের তীর্থ-পুরুষ, তাঁর কাছে আত্ম-নিবেদনে কোনো গ্লানি নেই।

বলো, কথা দাও, এবারে মেশোমশাইকে মত করাবে তুমি, আমার ব্যথাদীর্ণ জীবনে শান্তির স্পর্শ হ'য়ে এসে দাঁড়াবে তুমি, রেবা ?'

—'কিন্তু—বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছ তুমি।' ব'লতে গিয়ে গলার স্বর একবারও কেঁপে উঠলো না রেবার, একবারও ইতস্ততঃ ক'রলো না সে শব্দগুলো উচ্চারণ ক'রতে গিয়ে। ব'ললো, 'বাবা তার সমস্ত ব্যবস্থাই আগে থেকে পাকা ক'রে ফেলেছেন। আমি আজ ব্যারিষ্টার দত্তের বাক্‌দত্তা।'

—'হাউ সিলি ইউ আর আটারিং।' আকস্মিক ঝড়ে যেমন ডালপালা আলুথালু হ'য়ে যায়, বিজনের মাথাটাও ঠিক তেম্‌নি ক'রেই সহসা আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো—কে যেন সহসা ব্রহ্মতালুতে ঘা মেরে তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাট একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রছে। ব'ললো, 'দু'দিন আগে এতবড় বিষয়টাকে তবে তুমি ইচ্ছে ক'রেই চেপে গিয়েছিলে ?'

এতক্ষণে সমস্ত সঙ্কোচ জয় ক'রে উঠেছে রেবা। আর তার কিছুমাত্র সংশয় বা দ্বিধা নেই। ব'ললো, 'যদি বিশ্বাস করো, তবে ব'লবো—ইতিপূর্ব্বে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার দিন পর্য্যন্ত এ প্রশ্ন আমার জীবনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়নি।'

—'অন্তরে থেকে তবে পরোক্ষে কাজ ক'রে চলেছিল! আজ তাই নিভৃত আলাপের বিঘ্ন এড়িয়ে এমন দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারলেন তোমার ব্যারিষ্টার!' আসন ত্যাগ ক'রে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো বিজন।

রেবা ব'ললো, 'তাঁকে ও সময়ে উঠে না গিয়ে উপায় ছিলনা। ইলিয়েট রোডে ব্যারিষ্টার উইলিয়ম হ্যারীর বাড়ীতে তার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট র'য়েছে সাতটায়। নইলে হয়ত অপেক্ষা ক'রে তোমার সঙ্গেও গল্প ক'রে যেতে পারতেন।'

—'থাক্, নগণ্য লোকের সঙ্গে গল্প ক'রে সময় নষ্ট না করাই উচিৎ।' থেমে বিজন ব'ললো, 'সাহেব সুবোর সংশ্রবে তুমি তবে নাগরিক জীবনে বেশ বড় নদীতেই পাড়ি জমিয়েছ! ভালো, কিন্তু মিথ্যে আশা দিয়ে মানুষের কাছে আজ আমাকে হাস্যাস্পদ ক'রবার কী প্রয়োজন ছিল তোমার? এ অভিনয় না ক'রলেই কি পারতে না রেবা ?'

—'অভিনয়? এ তুমি কি ব'লছো বিজুদা ?'

পাশের দেয়ালে রেবার জন্মদিনে উপহার দেওয়া বিজনের ফ্রেম-বাঁধানো কবিতাটা হয়ত একবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে বিজন ব'ললো, 'অভিনয় ভিন্ন কি? অভিনয় না ক'রলে কি ব'লে আজ ভালোবাসাকে অস্বীকার ক'রতে পারছো? জন্মদিনের কবিতাকে কাঁচপাত্রে ফ্রেম-বাঁধাই ক'রে মাথার কাছে টাঙিয়ে রেখে প্রতিদিন কি অন্ততঃ একটিবারও ভালোবাসার স্বীকৃতি জানাও নি মনে মনে? পারো তুমি অস্বীকার ক'রতে প্রতিদিনের সেই নিরুদ্ধ অনুভূতিকে? পারো রেবা?' উচ্ছ্বসিত আবেগে অধীর হ'য়ে উঠলো বিজন।

দু'চোখ ছাপিয়ে হয়ত অলক্ষ্যে একবার জল এলো রেবার। কিন্তু সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না তাকে। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই সে আত্ম-আভিজাত্যে পুনরায় কঠোর হ'য়ে উঠলো। ব'ললো, 'না, একটি দিনের জন্যেও তোমার কবিতার মধ্য দিয়ে তোমাকে চিন্তা করিনি। ঘরে পাঁচখানা ছবির মতো ওটাও আমার সখের জিনিষ। দেয়াল জুড়ে থাক্‌লেও তা মন জুড়ে নেই। হয়ত খুসী হ'লে না কথাটা শুনে, তাই না?'

বিজনের কণ্ঠস্বরেও বিন্দুমাত্র নম্রতা ছিল না! এবারে একরকম জোর গলাতেই চেঁচিয়ে উঠলো সে: 'মিরাকি-উলাস্‌লি বিউটিফুল, সঙ্গীত তোমাকে চমৎকার অভিনয় শিখিয়েছে রেবা। যে উক্তি ক'রে এইমাত্র অহমিকা প্রকাশ ক'রলে, তাই-যদি তোমার হৃদয়ের সত্য হয়, তবে সেই সত্যই তোমার চিরন্তন হ'য়ে থাক্। সখের জিনিষকে নির্ব্বিবাদে দেয়াল থেকে স'রে যেতে দাও। মুছে যাক্ অতীতের ইতিহাস।'

সহসা দেয়াল থেকে ফ্রেম-বাঁধানো কবিতাটিকে টেনে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিজন মেঝের উপর। একটা ঝনাৎকার শব্দ তুলে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে গেল কাঁচপাত্রখানি, ফ্রেমগুলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তার-কাঁটার বন্ধনী থেকে।

থেমে বিজন ব'ল্লো, 'তোমার বাবাকে বোলো—তা'র যশোহরের নতুন মাইকেলকে তাঁর মেয়ে গলা টিপে মেরেছে।'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। ভূমিকম্প যেমন ক'রে সমস্ত বসুধাকে কাঁপিয়ে তোলে, তেম্‌নি ক'রে কী এক অধীর উত্তেজনায় বিজনের সারা দেহ থর-থর ক'রে কাঁপছিল। মুহূর্ত্তমাত্র আর বিলম্ব না ক'রে সোজা সে সিঁড়ি গলিয়ে নীচে নেমে গেল, তার-পর সুবিস্তৃত রাসবিহারী এভিন্যু।

যে কঠোরতায় এতক্ষণ নিজেকে ধ'রে রেখে'ছিল রেবা, দেখতে দেখতে সেই কঠোরতা কখন্ তার আভি-জাত্যের দুয়ার ভেঙে দূরে মিলিয়ে গেল। কেমন একটা বিষণ্নতায় আর নির্জ্জীব দুর্ব্বলতায় সারা দেহ তার ভেঙে প'ড়লো। উৎসারিত অশ্রুতে ভেসে গেল তার সারা মুখখানি। উঠে এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে কতক্ষণ যে নিজের মনে কাঁদলো সে, তা সে নিজেই জানে না।

কিন্তু অশ্রুর পরিবর্ত্তে বিজনের দু'চোখে জেগে উঠলো প্রখর দিনের তীব্রতা। নারী ছলনাময়ী: কথাটা অজানা ছিল না তার। তবু বিশ্বাস ক'রতে চেয়েছিল সে শেষ পর্য্যন্ত একটি নারীকে। মহেন্দ্রের জীবনের ট্রাজেডির কথা শুনেও তার সঙ্গে তর্ক ক'রে সে ব'লেছিল —'হৃদয়ের ব্যাপারে আমি অন্ততঃ ঠক্‌তে রাজি নই।' কথাটা শুনে হয়ত অদৃষ্টদেবতা আড়ালে ব'সে হেসে-ছিলেন। নইলে আজ তার প্রেমের ঐশ্বর্য্য এমন ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে কেন? রেবার প্রতি সমস্ত মন তার ঘৃণায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। ঠিক ক'রলো—ক'ল্‌কাতা ছেড়ে আবার মাগুরাতেই ফিরে যাবে সে। আর একটি দিনও এখানে নয়, একটি দিনও আর এখানে তিষ্ঠোতে পারবে না সে। মহানগরী ক'ল্‌কাতা যত ঐশ্বর্য্যেই ঐশ্বর্য্যময়ী হ'য়ে থাক্, অন্তরে সে একেবারে নিঃস্ব; বাইরের ঐশ্বর্য্যে আভিজাত্যের ডালা সাজানো চলে, হৃদয়ের জগতে তার সাড়া মেলে না। একদিন মোহে প'ড়ে জয় ক'রে নিতে চেয়েছিল সে রূপের রাংতা পরা এই শোভাময়ী মহানগরীকে, আজ তার সে ভুল ভেঙেছে। শুধু জ্বালা, শুধু দাহ এখানে; মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দিনের দেখা কেওড়াতলার শ্মশান-চিতার মতো ধিকি ধিকি চিতা জ্ব'ল্‌ছে এখানে সূর্য্যের তাপে। আর একটা দিনও নয় এই বদ্ধ চিতাভূমে। এর চাইতে ছায়াসুশীতল সেই পল্লীর অঙ্গনে অনেক শান্তি, অনেক শান্তি মায়ের মমতামাখা কোলের আশ্রয়ে।

পরাজিত সৈনিকের মতো একসময় সে আত্মসমর্পণ ক'রলো মহেন্দ্রের কাছে।

শুনে মহেন্দ্র সকৌতুকে হো হো ক'রে হেসে উঠলো—'প্রেমের ব্যাপারে তা হ'লে সত্যিই স্কোরার হ'তে পারলে না?'

মহেন্দ্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল বিজন।

হাসি থামিয়ে এবারে সমবেদনার কণ্ঠে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'খুব ভেঙে প'ড়েছ, তাই না? কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে ভেঙে প'ড়বার মতো মুর্খতাও বোধ করি নেই। কোনো বিশেষ নারীর হৃদয় জয় করা গেল না ব'লে ভালোবাসারও অমর্য্যাদা হয় না, জীবনও ব্যর্থ যায় না। তুমি কবি, লোক থেকে লোকান্তরে তোমার ভালোবাসা ছড়িয়ে প'ড়বে; যার কথা তুমি কোনোদিন কল্পনাও করোনি—এমন মানুষও তোমার সেই ভালোবাসার পেলব শিখায় প্রাণ পেয়ে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে। জীবনের পথে চ'ল্‌তে গিয়ে এমন বহু ঘটনাই ঘটে—যাকে দীর্ঘকাল স্মৃতিপাত্রে ধ'রে রাখা যায় না। এঘটনাও একদিন মুছে যাবে, সেদিন নিজের কাছেই এটা অতীতের ছেলেখেলা ব'লে মনে হবে। বি চিয়ারফুল, স্বচ্ছন্দ হ'তে চেষ্টা করো ব্রাদার। দেখ্‌ছো তো আমাকে? আজ্‌কের যন্ত্রসভ্যতার যুগে আসলে ভালোবাসা-টাসা ব'লে কিছু নেই, ওগুলো ফাইন আর্টসের সংগৃহীত শব্দ মাত্র। প্রয়োজনকে ভালোবাসা নাম দিয়ে এতকাল হৃদয়ের কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করা গেছে, আজকের যন্ত্রসভ্যতার কাছে সে ফাঁকি একেবারে হাতে হাতে ধরা প'ড়েছে। ভেঙে না প'ড়ে, নারীর সংস্পর্শ থেকে অব্যাহতি পেয়েছ ব'লে আনন্দ করো বিজু, দেখবে অনেক শান্তি পাবে, অনেক কাজ ক'রতে পারবে দেশের।'

একটানা একটা অভিভাষণ পাঠের মতো কথা শেষ ক'রে থামলো মহেন্দ্র।

কিন্তু তার এতগুলো কথার কোনো একটিরও জবাব দিলনা বিজন। স্বল্পক্ষণ থেমে শুধু ব'ল্‌লো, 'আমি ঠিক ক'রেছি, মেসের পাট উঠিয়ে দিয়ে বাড়ীতেই রওনা হ'য়ে প'ড়বো।'

—'সে কি, বাড়ী যাবে মানে কি? তোমার ট্যুইশনি, পরীক্ষা—এগুলোর তবে কি হবে?'

—'অন্ততঃ স্কুল-মাষ্টারী যখন ক'রবো না, তখন আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না হ'লেও চ'লবে,' আর—বিজন ব'ল্‌লো, 'আর মেসের ম্যানেজারকেও যখন মাসে মাসে টাকা গুণে দিতে হ'চ্চে না, তখন ট্যুইশনিটাও আপাতত বাদই রইল। আপনি আমার জন্যে যা ক'রেছেন মহিনদা, তার তুলনা নেই! যদি কোনোদিন আপনার কিছুমাত্রও উপকারে আস্‌তে পারি, তবে ধন্য মনে ক'রবো নিজেকে

হেসে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'থাক্, হ'য়েছে; আমিও যথেষ্টই ক'রেছি তোমার জন্যে আর তুমিও ধন্য হ'য়েছ। এত বিনয় কেন, বলো তো?'

—'বিনয় নয়, যা সত্য—তার স্বীকৃতি, কৃতজ্ঞতা।'

—'হয় তুমি পাগলের মতো ছেলেমানুষ, নয়তো ছেলেমানুষের মতো উন্মাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর যায়গা পেলেনা, পাগল ছাড়া কি!'

এবারে আর এমন শক্তি রইলনা বিজনের যে, মহেন্দ্রের কথার জবাব দিতে পারে।

একটু বাদেই মহেন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য কি একটা কাজে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে সমস্ত দিনটাই কাটিয়ে দিল সে বিজনকে নিয়ে। ট্রামে বাসে পার্কে ময়দানে—নানা যানবাহনে নানা যায়গায় ঘুরে বেড়ালো তারা, পথে বড় হোটেল থেকে খাবার খেলো, রেস্তোরাঁ থেকে চা খেল, সোডা-ফাউণ্টেনে গিয়ে অর্ডার দিল কেক্ আর সরবতের। একটা দিনের তবু যদি বিশেষ স্মৃতি কিছু আনন্দের ধারা হ'য়ে ভবিষ্যতের অজানা সাগরে গিয়ে কূল পায়, জীবনের এই খণ্ড ছিন্ন যাযাবর-বৃত্তিতে সেটুকুও বা কম পরিতৃপ্তির বিষয় কি!

এরপর দু'টো দিনও কাটলো না। একসময় মাগুরার উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন। পিছনে প'ড়ে রইল সভ্যতার রাজকুমারী ক'ল্‌কাতা, ট্রেন এগিয়ে চ'ল্‌লো সরীসৃপ-গতিতে। ষ্টেশনে 'সি-অফ' ক'রতে এসেছিল মহেন্দ্র; বিদায়ের শেষ সম্ভাষণে একটি কথাও উৎসারিত হ'য়ে ওঠেনি বিজনের কণ্ঠে, শুধু কৃতজ্ঞতার একবিন্দু অশ্রুই কেবল টল্‌মল্ ক'রছিল দু'চোখের কোণে। [ক্রমশঃ

বাদল

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্
জলধারা নামিল।
হৃদয়ের মেঘদূত
কোথা গিয়ে থামিল?
বাদলের মেঘ-সুরে
যক্ষের ব্যথা ঝুরে
বেদনার যুঁই হেনা
অলকায় ফুটিল।

জলভরা আঁখিপাতে
অলকার আঙিনাতে
এলোকেশী ম্লানবেশী
বিরহিণী লুটিল।
জলভরা মেঘ-সমা
বিরহিনী প্রিয়তমা
মোর ব্যথা-গন্ধিত
হৃদয়েতে নামিল

রবীন্দ্রনাথের নাটক

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি তাঁহার সঙ্গীতের সঞ্চয়ন। এক একটি কাব্যরচনার অবসর সময়ে কবির যে সব গান জমা হইত, নাটকগুলি যেন সেইগুলিরই গাঁথা মালিকা। কবির খ্যাতি ছিল বাল্যকাল হইতেই সুর সৃষ্টির, গানের পর গান করিয়া কবির দিন গিয়াছে, বিশ্বের কাছে সুরস্রষ্টা রূপে তাই তাঁহার পরিচয়ও।

সংসারের দুঃখ সঙ্কটের হিংসা গ্লানির মধ্যে তিনি সাধ্যপক্ষে অবতরণ করিতে চাহেন নাই; একমাত্র তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে ছাড়া কোথাও তাঁহার বাস্তব জীবনের সমাজ-সচেতন মনের পরিচয়ও নাই। কাব্যের রস অনাবশ্যকের, অপ্রয়োজনের আনন্দের; কবি ছিলেন সেই কাব্যের সাধক; তাই তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যেই গানের র সুবাজিয়া উঠিতেছে।

নাটকের আবেদন বাস্তবের, জীবনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র নাটকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। কল্পনার রেশ যতই থাকুক না কেন জীবন সংগ্রামের, কর্ম্মের actionএর সংঘাত না থাকিলে নাটক হয় প্রাণহীন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত - নাটক পড়িয়া রস গ্রহণের জন্য লেখা হয় না, সংস্কৃতে ইহার নাম 'দৃশ্যকাব্য'- দর্শন ছাড়া, দর্শকের চোখ ছাড়া নাটকের গতি নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখিলে সম্পূর্ণ হয় না; এমন কি না দেখিয়া কেবল কানে শুনিলেই যেন সার্থক হইয়া উঠে। এই কারণে তাঁহার কোন নাটকই কোনদিন জনসমাদৃত stage successএ পরিণত হয় নাই, বোধ হয় সাধারণ দর্শক তাহার কাব্য ভাষার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। একমাত্র তাঁহার নামের, সেই সঙ্গে গানগুলির জোরেই নাটকের খ্যাতি হইয়া আসিতেছে। তাঁহার নাটক রঙ্গমঞ্চের জন্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-মঞ্চেরই উপযুক্ত।

কবি এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার কাজ গান গাওয়া, তোমাদের গান শোনান, আমাকে কেন তোমাদের জীবনের ছবি আঁকার মধ্যে টেনে আন?" সত্যই কবি তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির মধ্যেও অযথা গানের দ্বারা গতি মন্থর করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কবি নন, তিনি যে ভারতীয় সংস্কৃতির, বৈদিক ঐতিহ্যের ঋষিকল্প প্রতিনিধিও। তাঁহার বহু দার্শনিক চিন্তাধারাকে কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এক শ্রেণীর নাটকের জটিল ঘটনা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তাঁহার সেই চিন্তাসূত্রকে প্রবাহ করিয়াছেন। তাঁহার রূপক নাট্যগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীতের সুরই সেই দার্শনিক চিন্তাকে সুসংবদ্ধ আকার দান করিয়াছে।

একমাত্র তাঁহার হাস্যকৌতুক ও প্রহসনগুলি ছাড়া কবির প্রায় সমস্ত নাটকই অতিরিক্ত কাব্যভাষাশ্রিত এবং সঙ্গীত সজ্জিত।

নাটক রচনার আদর্শ তিনি পাইয়াছিলেন জোড়াসাঁকে, ঠাকুর বাড়ীর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের নিকট হইতে—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কবির অগ্রজ এবং অগ্রগামী সুরগুরু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন সুর-রসিক, তাঁহার নাটকের অধিকাংশ গানের কথা রচনা করিয়া দিতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের বহু গানের সুরসজ্জা আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই করা। কবির প্রথম গান—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা॥

—সরোজিনী নাটকের জন্য রচনা।

গীতিনাট্যের কাঠামোটা কবি পাইয়াছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই কাছে। ভারত সঙ্গীত সমাজের অভিনয়ার্থে রচিত 'ধ্যানভঙ্গ ও পুনর্ব্বসন্ত' গীতিনাট্য

দুইটি এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি একই প্রথায় রচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রচিত হয় বাল্মীকি প্রতিভা এবং কাল মৃগয়া। এই নাটক দুইটির আবেদন রূপসজ্জার অভিনয়ে নয়, গানের সুরের ভিতর দিয়া ইহাদের আবেদন। বাংলার প্রাচীন যাত্রাগানের অনুকরণে এগুলির রচনা। যাত্রার পালায় যেমন সুরই মুখ্য, সুরের দ্বারাই ভাব প্রকাশ—এখানেও ঠিক তাই। এমন কি বাংলার প্রাচীন যাত্রারই দুইটি গল্পের রূপ এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া একই পালার নামান্তর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোয় আইরিশ গৎ বাজিত, কবি সেই সুরে কথা বসাইয়া এই পালাগানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কবির কথায় –

"বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুইটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়ের একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্থর গতিতে দস্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্য্যস্ত ভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। …এইরূপ একটা দস্তরভাঙাগীতি বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুইটি নাটক লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই।"

ঐ দুইটি ছাড়াও কবির সেই বয়সে লেখা আর একটি গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' এই যাত্রার প্রথায় রচিত। তবে 'মায়ার খেলা'য় নাটকীয় অংশ নাই বলিলেই চলে, গানই ইহার সমস্ত অংশ জুড়িয়া আছে। এই নাটকের বিষয়বস্তু তাঁহার একটি কাব্যনাট্য 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে রচিত। সুখের জন্য দুঃখের সাধনার প্রয়োজন, কোন কিছু লাভ করিতে হইলে কিছু ত্যাগ করিতে হয়। প্রেমের পথেও দুঃখ চাই। প্রেমের মোহই সেই দুঃখকে আনায়, দুঃখের অনলযজ্ঞে সেই প্রেম সুন্দর হইয়া উঠে।

দুখের মিলন টুটিবার নয়
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়॥

'মায়ার খেলা'য় স্ত্রীলোকেরাই সমস্ত চরিত্রের অভিনয় করিত, এ জন্যে সমস্ত নাটকটিই স্ত্রীজনসুলভ কোমলতায় পূর্ণ।

'মায়ার খেলা'র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রগীতিনাট্যের প্রথম পালা শেষ, বহুদিন পরে শেষজীবনে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকায় আবার কবির সে যুগ ফিরিয়া আসে। এই মধ্যবর্ত্তী কালে তাঁহার অন্যান্য নাটকের পালা।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বড় কবিতা নাট্যাকারে রচিত —চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তী সংবাদ এবং লক্ষ্মীর পরীক্ষা। প্রথম বয়সের লেখা রুদ্রচণ্ড, নলিনী প্রভৃতিকে এই পর্য্যায়ের হাতে খড়ি বলা যাইতে পারে। ভগ্ন-হৃদয়কে কবি নাটক বলিতে মানা করিয়াছেন—"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক না মনে করেন।" এই নাটকগুলিতে ঘটনা-সংস্থান নাই, নেপথ্যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে; এগুলিতে সেই সব ঘটনারই পরিণতি দেখান হইতেছে। কাজেই এই কাব্যনাট্যগুলিকে নাটক বলিতে দ্বিধা হয়। নাটকের মধ্যে চরিত্রের যে ক্রমবিকাশ, ঘটনার যে ক্রমপরিণতি তাহা এখানে মোটেই নাই।

'বিদায় অভিশাপে'র বিষয় বস্তুঃ—"দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্য গীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার

পরে বিবৃত হইতেছে।"—ইহাই বিদায় অভিশাপের মুখবন্ধ।

গান্ধারীর আবেদন এবং সতী উভয় নাটকে একই আদর্শের সংঘর্ষ দেখান হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য দুর্জ্জন পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে মাতার আবেদন পিতার স্নেহের নিকট ব্যর্থ হইয়া গেল।

কবির কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। আমাদের অন্তরাত্মার কোমল প্রবৃত্তিগুলি কর্ণের প্রতিটি কথায় ধ্বনিত হইয়া উঠে—

তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে, নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, মিথ্যা মনে হয়
রণ হিংসা বীর খ্যাতি, জয় পরাজয়॥

কবির কাব্যনাট্যগুলির প্রতিটিই এক একটি বিরাট আদর্শকে রূপ দিয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে সমাজের, মনুষ্যত্বের যে নিত্য সংঘর্ষ—এগুলিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করেন তাঁহার আদর্শই জয়ী হোক—কিন্তু প্রচলিত নিত্যকালীন ধর্ম্মের আদর্শের নিকট তাঁহাদের বারবার পরাজয় ঘটে। সেই পরাজয় তাঁহাদের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিয়া ধর্ম্মের আদর্শের পথে টানিয়া লইয়া চলে—মহাভারতীয় নানা উপাখ্যান হইতে কবি সেই নাটকীয় দ্বন্দ্বটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সমাজই ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রক, ধর্ম্মকে আঘাত করিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে রিলিজন নহে, সমাজিক কর্ত্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন' পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্ম্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোন আশ্রয় নাই।"

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য এবং মালিনীর মধ্যে নাটকীয় সংঘাত সংহত হইয়া আছে। মালিনী বিসর্জ্জন নাটকের স্বশ্রেণীর, বিসর্জ্জনের সঙ্গে ইহার চরিত্রগত এবং ভাবগত যথেষ্ট মিল আছে।

রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগিনী; রাজ্যশুদ্ধ সবাই হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্ম্মের অভ্যস্ত। রাজা, রাণী, পৌরজন সবাই মালিনীর বিরুদ্ধে, সবার দাবীতে মালিনীর নির্ব্বাসন হইল। ক্ষেমঙ্কর এবং তাঁহার বন্ধু সুপ্রিয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষক; রাজকন্যার নির্ব্বাসনের দাবী তাঁহাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল উচ্চস্বরে। কিন্তু মালিনীকে দেখিবার পর তাহাদের তিনজনের চরিত্রে এক সঙ্কট সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুপ্রিয়ের অন্তরে হঠাৎ সুন্দরের আবির্ভাব হইল—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমঙ্কর-ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোন তৃপ্তি কোন শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম্ম মোর হৃদয়ের বড় কাছাকাছি।
... ... এতদিন পরে
এ মর্ত্ত্য ধরণী মাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর॥

বিসর্জ্জন রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। রাজর্ষি উপন্যাসের গল্প অবলম্বনে বিসর্জ্জনের রচনা। রঘুপতির আজন্মার্জ্জিত অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে গোবিন্দ মাণিক্যের নবজাগ্রত সংস্কারমুক্তির সংঘর্ষে জয়সিংহের আত্মবলিদান—নাটকের কাহিনী। বিসর্জ্জনের প্রধান চরিত্র রঘুপতি, রঘুপতিরই স্নেহের, সেই সঙ্গে সংস্কারের বিসর্জ্জন—কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রাবণের শেষ দুই দিনই ঘটনার পট, শরতের প্রথম প্রত্যূষে ট্রাজেডির যবনিকা পতন—

আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড় ক'রে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে, চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

'রাজা ও রাণী' নাটকও অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্যে রচিত। 'রাজা ও রাণী'র কাহিনী লইয়াই পরে কবি 'তপতী' নাটক রচনা করেন। কবি বলিতেছেন—

"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তিপূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল—এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।"

সমাজচিত্র অবলম্বনে রচিত নাটকই দর্শকদের মন হরণ করে অতি সহজে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গল্প কাহিনী নাট্যের মধ্যে শোধবোধ, গৃহপ্রবেশ, এবং বাঁশরীর নাম করিতে হয়। গল্পগুচ্ছের দুইটি গল্প 'কর্ম্মফল' এবং 'শেষের রাত্রি'কে অবলম্বন করিয়া শোধবোধ এবং গৃহপ্রবেশের সৃষ্টি। 'বাঁশরী' শেষের কবিতা উপন্যাসের স্বশ্রেণীর। অভিজাত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কয়েকটি চিত্রকে জোড়াতালি দিয়া বাঁশরীর নাট্যরূপ, গতিতে স্বাভাবিকতার অভাব আছে। তবে চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পরিত্রাণ এবং প্রায়শ্চিত্ত বৌ ঠাকুরাণীর হাটের নাট্যরূপ। সামান্য একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও ইহাতে আছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর Passive Resistance অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিরোধ—ইহাদের কেন্দ্রগত ঘটনা।

কবির প্রহসনগুলির বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ সহজবোধ্য নয়। সে জন্য ঐগুলি অভিনয়ে সাফল্য অর্জ্জন কখনও করে নাই। সহজ অনাবিল আনন্দ তাঁহার মার্জ্জিত রুচির প্রহসনে নাই, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদের কিংবা চিরকুমার সভার হাসি কোথাও প্রাণখোলা হইতে পারে নাই। তাঁহার গীতিমাধুর্য্যময় ভাষাই যেন হাস্যরস উপভোগে বাধা দেয়। তিনজন চিরকুমার ব্রতচারী যুবকের বিবাহই 'চিরকুমার সভা'র বিষয়বস্তু,—এই ঘটনা সংস্থানের ক্রমবিকাশ কিন্তু নাটকের প্রধান উপজীব্য নয়। বাতিকগ্রস্ত চন্দ্রবাবুর কীর্ত্তিকলাপই কিছুটা হাস্যরসের জোগান দেয়।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে বৈকুণ্ঠের লেখার বাতিক এবং সেই লেখা অপরকে শোনানোর প্রবল আগ্রহ হাস্যরসের সঙ্গে কারুণ্যেরও সঞ্চার করে। গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা'র মধ্যে চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা রসের সৃষ্টি না করিয়া ঘটনার পরিণতির মধ্যে কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে নাটকীয়তা থাকিলেও কৌতুকহাস্যের যথেষ্ট অভাব আছে। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজজনোচিত মনোভাব সাবলীল হাস্যকে ভাষায় প্রকাশে যেন কুণ্ঠিতই ছিল। একমাত্র 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নামে ছোট নক্সাটি ছাড়া অন্য কোথাও তাঁহার হাসি স্বতঃউৎসারিত ধারায় উছলিয়া পড়ে নাই, পাঠক অথবা দর্শকগণকে ভাবিয়া চিন্তিয়া হাসিতে হয়।

শেষজীবনে কবির তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। কবি এগুলিতে সুরের উপর আসন দিয়াছেন নৃত্যের, দেহভঙ্গীর ভিতর দিয়া এই নাটক তিনটির ক্রমবিকাশ। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র বিষয়বস্তু কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা হইতেই গৃহীত। নারীর একটি বলিষ্ঠ মনোভাব চিত্রাঙ্গদার মধ্যেই প্রকাশিত, চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের মানসী—"সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হোলো সুন্দরী যুবতী। যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তবে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথেষ্ট চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।...এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এলো: সেই সঙ্গেই মনে পড়লো মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।" নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা জীবননাট্যটি অধিকতর সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে।

'নৃত্যনাট্য শ্যামা' কবির 'পরিশোধ' কবিতার নাট্যরূপ। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম প্রেম পরিকল্পনার রূপের মধ্যে শ্যামার স্থান আছে। শ্যামা নৃত্যনাট্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী গানগুলি

নাটকের অবগানের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত মনকে সুদূর বিরহলোকে লইয়া যায়। অবশ্য কেবল শ্যামা কেন, রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি নাটকেই গানের সুরই নাট্যাংশের রস সঙ্কেতের অধিকাংশই করিয়া রাখে। শ্যামা নাটকের মূল ভাবটি—

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানিগো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন-শরণ প্রভু॥

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'ও বৌদ্ধযুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তবে এটিতে গল্পাংশ কিছু নাই বলিলেই চলে, গানগুলির সূত্ররক্ষার জন্যই সূক্ষ্ম কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর এক শ্রেণীর গীতিচয়নিকা আছে; সেগুলিতে কথার আশ্রয়ে গানের চয়ন করা হইয়াছে। কথোপকথনে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে গান ইহাদের বৈশিষ্ট্য। এই গুলির নাম দেওয়া চলে 'গানের পালা।' এক একটি ঋতুকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য এক এক ঋতু-উপযোগী গানের সঙ্কলন করা হইয়াছে। গানগুলির গতি যাহাতে মন্থর হয়, শ্রোতারা যাহাতে গীতিরস সুসঙ্গত ভাবে উপভোগ করিতে পারে—সেইজন্যই কিছু কিছু ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার দ্বারা পালাগুলিকে নাটকীয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফাল্গুনী, শারদোৎসব প্রভৃতি ঋতু-নাট্যগুলির মধ্যে কবি আসলে গান গাহিবারই পথ খুঁজিয়াছেন। এই গান গাহিবার জন্যই আসিয়াছে ঠাকুর্দ্দা এবং তাহার দলবল। এই ঠাকুর্দ্দা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনের ছায়া আছে। সেইজন্যই এই চরিত্রটি কোথাও দাঠাকুর, কোথাও অন্ধ বাউল, কোথাও ধনঞ্জয় বৈরাগী রূপে প্রায় সকল নাটকেই আছে, গ্রীক্ নাটকের কোরাসের অনুকরণে ঠাকুর্দ্দা ও দলবলের সৃষ্টি।

শেষবর্ষণ, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত, নবীন, সুন্দর, গীতোৎসব, নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা, শ্রাবণগাথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর গানের পালা। এইগুলিতে রাজা, সভাকবি, সভাসদগণের সঙ্গে নটরাজ এবং তাঁহার পারিষদ দল নদী, দখিন হাওয়া, বেণুবন, শালবীথি, আম্রকুঞ্জ এবং ফুলের দল আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে ইহাদের এত বেশী দেখা হইয়াছে যে ইহারা আমাদের অতি পরিচিত।

কবির রূপক নাট্যগুলি তাঁহার অন্যান্য সকল নাটক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এইগুলিতে কাহিনী অথবা সঙ্গীত মুখ্য নয়, দার্শনিক রাজনৈতিক চিন্তাধরাকে Concrete রূপ দেবার জন্যই এখানে নাট্যরসের অবলম্বন।

রূপকনাট্য বা Symbolic Dramaর সৃষ্টি আমাদের দেশে প্রথম তিনিই করেন। Allegory এবং Symbolic দুই প্রকার রূপক নাটকের উল্লেখ আছে, কবির নাটকগুলি ইহাদের কোন একটি মাত্র বিশিষ্ট রূপের অনুবর্ত্তী নয়, ঐ দুইটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে। কবির বন্ধু ডব্লিউ, বি, ইয়েটস্ বলিয়াছেন—

The one thing gave dumb things voices and bodiless things bodies, while the other read a meaning—which had never lacked its body or its voice into something heard or seen—and loved less for the meaning than for its own sake.

ইয়েট্সের কথানুসারে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই সাঙ্কেতিক ধর্ম্মাবলম্বী। অচলায়তন, রক্তকরবী, রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা—এই পাঁচটি প্রধান সাঙ্কেতিক নাটক। শারদোৎসব, ঋণশোধ এবং ফাল্গুনীর মধ্যেও কিছু কিছু গভীর তত্ত্বের উল্লেখ আছে।

রাজা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক। ইহাতে কবি নিরাকার ব্রহ্মের অরূপ রতনের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ, বিশ্বসংসারে শত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শাসন সংযত ঐক্য বিধায়ক বিধাতার

প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা এবং ভগবানের "নিত্য সিদ্ধ" অনুচরদলের বিশ্বাস এবং ভক্তির সুন্দর রূপ রাজা নাটকের ঘটনাবহুল কাহিনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। অরূপরতন রাজারই ভিন্ন সংস্করণ।

অচলায়তনে আর একটি সুদূরপ্রসারী রূপকের ইঙ্গিত আছে। রক্ষণশীল সমাজ অনার্য্য এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতিকে দূরে রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া নিজেদের চারিপাশে দুর্গম অচল প্রাচীরের সৃষ্টি করিতেছে—তাহারই রূপক অচলায়তনে আছে। গুরু—এই নাটকের ভিন্ন সংস্করণ।

ডাকঘরে কবির রূপকল্পনা সুদূরের পিয়াস। এই চির পরিচিত সংস্কারের সংসার হইতে কল্পলোকের আহ্বান—ডাকঘরের রূপক। ইয়েট্স্ বলিতেছেন—

"The deliverance sought and own by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said when once in the early dawn he heard amid the noise of a crowd returning from some festival, this line out of an old village song, "Ferryman, take me to the other shore of the river." It may come at any moment, though the child discovers it in death, for it always comes at the moment when the 'I seeking no longer for gains that cannot be assimilated with its works' is able to say, "All my work is thine."

মুক্তধারায় কবি একটি রাজনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা এবং বৈষয়িক জগত মানুষকে সঙ্কীর্ণ পেষণযন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে হত্যা করিতেছে, কিন্তু একদিন ইহারই মধ্য হইতে মানুষের শুভবুদ্ধি এবং শান্তি কামনা জগতকে উদ্ধার করিবে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ইহাতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর রহস্য নাটক। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা লোভের এবং ক্ষুধার প্রতীক, রক্তকরবীর রাজা সেই সভ্যতার প্রতিনিধি, জালের অন্তরাল হইতে তিনি মানুষকে পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার ক্ষমতা প্রচুর হইলেও নিজে তিনি ব্যর্থতার নিরানন্দের অতৃপ্তির প্রতীক। বাইরের আনন্দ উৎসবের, কল্যাণ সৃষ্টির, সুন্দরের মহোৎসবের আহ্বানে তাঁহার যোগ দেবার উপায় নাই। দিগন্তপ্রসারী সবুজ ক্ষেতের পৌষের পাকা ধানের কর্ম্মের আনন্দের সঙ্গে যোগদানের উপায় তাঁহার নাই, তিনি জালের অন্ধকারে ধনের ভাণ্ডারের উপর বসিয়া কেবল তাকাইয়া থাকেন, আর শোনেন—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয় রে চলে আয় আয় আয়।

ইসারা

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

যে নিয়েছে বুকে তুলে দশের ভাবনা,
দশে মিলে করে তার কল্যাণ কামনা;
সবার মঙ্গল তরে ব্যগ্র প্রাণ যার,
সকলের ভালোবাসা তার-ই অধিকার

*

গান নয়, মান নয়, নয় নাম, যশ;
প্রাণ খোঁজে ঘুরে ফিরে প্রাণের পরশ।

আঁধারের দেশে একেবারে মিছে
নয় আলেয়ার আলো;
না-পাওয়ার চেয়ে নিমেষের তরে
পেয়ে হারানোও ভালো

*

শেষের কথা অ-শেষ হয়ে থাকে,
এলোমেলো কথার ফাঁকে ফাঁকে।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

সতের

সরকারীর কথা শুনে অবধি ঠাকুমা মুষড়ে পড়েছিলেন। অমন থুরথুরে গঙ্গাজলী বুড়ী 'সরকারী' যে খামকা-খামকা ক্ষেমী পিসির নামে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলে গেল, তাঁর মন তা মেনে নিতে পারল না। তাই সত্য মিথ্যা সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করতে চাইলেন।

দিন দু'তিন পরে একদিন সকালে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—খোকন, তোর ছোট ঠাকমার বাড়ী বেড়াতে যাবি?

আমি খুশির সঙ্গে বললাম—যাবো; কবে যাচ্ছো ঠাকমা?

—কাল শনিবার, তুই ইস্কুল থেকে ফিরে এলে—আড়াইটে তিনটেয়।

—তা হলে আজই মোটরের কথা বলে রাখিগে নতুন মাকে।

—না, না, সে-সব কিছু করতে হবে না তোকে।

—নতুন মা যদি আগেই বেড়িয়ে পড়েন মোটরে?

—আর একখানা ত রয়েছে।

—তা ত রয়েছে, কিন্তু ক'দিন বাড়ী থাকে?

—না থাকে, ভাড়া গাড়ীতে যাবো।

আমি একটু জিদের সঙ্গেই বললাম না, তা হবে না। সবাই মোটরে আসে যায়, তুমি কেন ছকরে যাবে? পাড়ার লোক হাসে, ঠাট্টা করে, আমার লজ্জা করে।

ঠাকমা বললেন—ও তোর বাজে লজ্জা। মধুর দু'খানা মোটর; তার মা-ছেলে যদি হঠাৎ কখনও ভাড়াটে গাড়ীতে যাতায়াত করে তাতে কেউ মনে করবে না অভাবে পড়ে করছে। নিজেদের সুবিধে-অসুবিধে মত যাতে হচ্ছে তাতে যাবো। তাতে কে কি বলবে দেখতে গেলে সংসার চলে না।

নতুন মার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসত, তাদের বারো-আনাই আমাদের মোটরে আসা যাওয়া করত। বাকী চার আনা আসত ভারাটে যানে বা পদব্রজে। ঠাকমা ও আমার মা ছিলেন গরীবের ঘরের মেয়ে, তাঁদের আত্মীয়রা হেঁটেই আসতেন, হেঁটেই যেতেন—যেমনটি ধনীর দরিদ্র আত্মীয়রা সর্ব্বত্র করেন। অনেক সময় আবার এঁদের হুকুমে আসতে এবং হুকুমে যেতে হয়। ধনীর বাড়ী ঝি চাকরে এতটুকু খাতির যত্ন পায়, এঁদের ভাগ্যে অনেক সময় ততটুকুও জোটে না।

আমাদের বাড়ীতে ক্ষেমীপিসিরই খাতির ইজ্জৎ বেশী, সে নিত্য মোটরে আসে, মোটরে যায়, হাঁটলে নাকি তার হাঁটু ব্যথা করে, তার মেয়ে সুরমা 'মা কা বেটী' হলেও সে বড় মোটরে চলে না। সে আসত শেয়ারের গাড়ীতে, তা নইলে হেঁটে। সে ছিল বেশীরকম জন-সঙ্গ প্রিয়। মোটরে চুপটি করে মুখটি বুজে একা একা চলে সে কোন আরাম আনন্দ পেত না। সে মোটরে আসতে চাইলে নিশ্চয়ই তার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটত মোটর। নতুন মার সুখ সৌভাগ্যের মূলেই যে ক্ষেমীপিসির ঘটকালী সেটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারতেন না।

যে বাড়ীতে ক্ষেমীপিসিদের অত আদর সে বাড়ীতে দিদিমাদের যে কত খাতির, কত যত্ন—তা সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন দেবতা তেমন নৈবেদ্য—এই নীতি অনুসরণ করেই সর্ব্বত্র ছোট বড় ধনী নির্ধনের মান সম্ভ্রমের তারতম্য করে লোকে। কাজেই রাজদুয়ারে বাঁধা হাতীর মত দিদিমাদের দুয়ারে যদি মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই আমাদের একখানা মোটর উদয়-অস্ত হাজির থাকে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। দিদিমারা ত নতুন মারই মা-ভাই বোন। কোন মুহূর্ত্তে বেড়াবার সখ মাথায় চাপবে তার ঠিক কি! তাদের নতুন বাড়ী খবর পাঠিয়ে মোটর আনাতে গিয়ে যে দেরীটুকু হওয়ার সম্ভাবনা, ততক্ষণে হয়ত তাদের সখটার ঘুমিয়ে পড়বার ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল। কাজেই সারাক্ষণই দুয়ারে একখানা মোটর হাজির থাকা প্রয়োজন ছিল এবং থাকতও।

তাদের নতুর বিয়ের দু তিন মাসের মধ্যেই দিদিমারা চাল-চলন আগাগোড়া বদলে ফেলেছেন। তাঁরা আর ঘরের মোটরে ছাড়া সাধারণের ব্যবহার্য্য যান-বাহনে চলাচল করতেন না। হাটে, বাজারে, ব্যাঙ্কে, ইষ্টিশানে, জ্ঞাত-কুটুমের বাড়ী তাদের নতুর মোটরই ছিল একমাত্র গতি। মোট কথা তারা ভাড়াটে যান-বাহনে আর পায়-হাঁটা taboo (নিষিদ্ধ) করছিলেন। তাদের নতুন হাল-চাল দেখে পাড়ার লোকের মনে চমক লাগত, তাঁরা পরস্পরের মুখে জিজ্ঞাসুভাবে চাইত—যা'র সরল অর্থ ছিল—এদের এ হ'ল কি? আত্মীয় স্বজনদের মনেও এই সন্দেহই জাগত, তারাও অবাক হয়ে ভাবত—মধুবাবুর সংসার কি ভূতে চালায়? বাড়ীতে কি নোট জাল করবার কল আছে? শুধু কি মোটরের বেলাই মেয়ের দৌলতে বড়মানুষী। তাদের নতুর বাড়ীর ধোপা কাপড় কাচে ভাল, জামাই বাবুর মুহুরী কিনে কাটে সস্তায়—এই নজীরে তাদের এক গুষ্ঠির কাপড় জামা ধুইয়ে নেয়, যার যা দরকার তাই কিনিয়ে নেয়। নতুন মা কি এজন্য তাঁর মা-বোনদের কাছে মজুরী কি দাম চাইতে পারেন? ফন্দিটা কিন্তু মন্দ নয়।

কী আবান্তর কথা নিয়ে পড়েছি! কোথায় ছোট-ঠাকমার বাড়ী যাবার কথা হচ্ছিল, না তার মধ্যে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত দিদিমাদের অর্থশূন্য আড়ম্বরের কথা পেড়ে বসেছি! যা বলছিলাম তাই বলি এখন। বাড়ীতে দু'খানা মটর থাকলেও পরের দিন এক-খানাও পেলাম না আমরা। ইস্কুল থেকে এসে দেখলাম একখানায় নতুন মা ও বাবা বেরিয়েছেন আর দ্বিতীয় খানাও তখন গ্যারাজে ছিল না। ঠাকমা সবে চান করে খেতে যাচ্ছিলেন দেখে আমি গিয়ে দারোয়ানকে একখানা ছক্কর আনতে বললাম। ঠাকমার খাওয়া হতে হতেই গাড়ী এসে গেল এবং তিনিও মুখে দু'টুকরো হরতুকী ফেলে একটা বিছানার চাদর টেনে নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে গাড়ীতে উঠলেন। তখন নীচেকার ঘড়িতে আড়াইটে বেজে গেছ্‌ল।

ছোট ঠাকমা বাড়ীতেই ছিলেন। ভাই-পোর ছেলে-মেয়েদের জন্য ইজের শেমী কেটে নিয়েছেন সেলাইয়ের জন্য; সুমুখেই 'সজারের হাতীকল'। আমাদের দেখেই হাসি মুখে উঠে পড়লেন। কে কেমন আছে না-আছে জিজ্ঞেস করার পর ছোট ঠাকমা বল্‌লেন-রোজই তোমাদের কথা ভাবি দিদি। মধুর বিয়ের পর এই প্রথম পা দিলে আমার বাড়ী।

এই অভিযোগের কৈফিয়তে ঠাকমা বললেন—ক'দ্দিন থেকেই ত আসব-আসব করছি, পেরে উঠলাম না। শনি-রবিবার ছাড়া যে আমার ছুটি নেই জানিস ত?

তা ত বটেই দিদি! তোমাকে ইস্কুল-কলেজে যেতে হয়, আপিস-আদালতে ছুটতে হয়!—বলেই ছোট ঠাকমা একটুকরো হাসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—নে খোকন, এই ছবির বই দ্যাখ।

ছোট ঠাকমার চোস্ত জবাবে ঠাকমাও একটু ইঙ্গিত-পূর্ণ ভাবে বললেন—কলেজ-আদালতে না হয় নাই ছুটতে হয়, যারা ছোটে তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগার করে দিতে হয় ত!

—কেন বউমা কি করে? কাজে ভেড়েনা বুঝি?

—ভেড়ে, যেদিন তার সখ হয়। যেদিন তার খেয়াল চাপে দুমদাম ক'রে হাতা-খুন্তি নেড়ে, বাসন-পত্তর নয়-ছয় করে' রান্না-বান্নাও করে। ধরা-বাঁধা ভাবে কাজ করতে চায় না।

—তুমি ডেকে-ডুকে নেবে; নইলে কি ঘরের কাজে মন বসবে, না রান্না-বান্না শিখবে!

ঠাকমা হেসে বললেন—আজকালকার বউ-ঝিকে কি কিছু শিখোবার আছেরে অমু? তারাই আমাদের কত শিখুতে পারে। শুনি ত মাঝে মাঝে বউকে বলতে—আমাদের আর কাউকে রান্না শিখুতে হয় না মা। যা শিখিয়েছেন তাতে আমরাই দশজনকে শিখুতে পারি।

ছোট ঠাকমা হেসে বল্‌লেন—আমাদের বিকাশের বউর মুখেও যে দিদি ঐ কথা! দেখছি সব ঘরেই ঐ এক নমুনা।

বিকাশ ছোট ঠাকমার ভাই-পো; তার মামার সঙ্গে ছোট ঠাকমার আমদানী কারবার দেখে।

ঠাকমা—যা বলেছিস অমু। আজকাল ঘরে ঘরে বউ-ঝিদের ঐ এক ধরন—তাদের মা'র মত আর মা নেই

জগতে, আর তাদের মতও কাজে কর্ম্মে পণ্ডিতও আর নেই কেউ। তা বিকাশের বউ রাঁধে-বাড়ে কেমন?

ছোট ঠাকমা—তা শুনে কি করবে, তবে জাঁক আছে জানি বলে। মধুর বউর সুনাম ত সহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন লেখা-পড়ায়, তেমনি কাজে-কর্ম্মে; রান্না-বান্নায়ও ভাল। অমন শাশুড়ীভক্ত বউ হাজারেও নাকি একটি মিলে না।

ঠাকমা শ্লেষের হাসির সহিত জিজ্ঞেস করলেন—কে ছড়াচ্ছে এ-সব গাঁজাখুরি গল্প শুনি?

—কে আবার ক্ষেমঙ্করী ছাড়া?

—ক্ষেমীর কি আক্কেল, অমু! এমনি করে ঢাক পিটুলে নাকি কালো রং সাদা হয়?

—হয় বই কি দিদি! বিজ্ঞাপনের জোরে জুতার সুখতলিকেও আমসত্ত্ব বলে চালিয়ে দিতে পারে—কে নাকি জাঁক করেছিল।

—ক্ষেমীও হয়ত তা পারে। ভানুমতীর মেয়ে, কত ভেলকিই জানে ও।

—নতুন কিছু শুনেছ নাকি দিদি?

ঠাকমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—কত কিছুই ত শুনছি। তাই ত তোর কাছে ছুটে এলাম জানতে। আমি নাকি তোকে বলেছি—মধুর বউর মুখে মধু, হৃদে বিষ, খোকনকে কখন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে ঠিক কি?

মহা বিস্ময়ে ছোট ঠাকমা জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষেমী এ-সব কথা বলছে?

—'সরকারী'র মুখে ত তাই শুনলাম।

ছোট ঠাকমা গালের উপর হাত রেখে—ওমা, বলো কি দিদি! মধুর ফুলশয্যার পর তোমার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হয়েছে?

ঠাকমা সখেদে বললেন—সে কথা না হয় আমি বুঝলাম। বাইরের লোকে বুঝবে কি? শুধু কি এই, অমু? পাড়ায়-পাড়ায় নাকি বলে বেড়াচ্ছে ক্ষেমী—আমি ভীষণ বদরাগী, ঝগড়াটে, আমার জ্বালায় খোকনের মা নাকি বিষ খেয়ে মরেছে। তাদের লতু যে কবে বিষ খেয়ে বসে তার ঠিক কি!

ঠাকমার কথা শুনে ছোট ঠাকমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ক্ষেমী যে কত বড় বজ্জাত, তুমি দিদি চেনো না। কি করবো শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কের একটু গন্ধ আছে, নইলে দিতাম ওর হাঁড়ির খবর হাটে ছড়িয়ে। নিজেও যেমন মেয়েটাকে গড়ে তুলছে ঠিক তেমনি।

এখন কি করি বলত ভাই, অমু? ক্ষেমী যে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।

কি আর বলব দিদি? যে সরষে দিয়ে লোকে ভুত ছাড়ায়, তোমার সে সরষেকেই ভুতে পেয়েছে। তোমার ছেলে আর বউর আস্কারা পেয়েই ক্ষেমী ধেই-ধেই করে নাচছে। পড়ত আমার পাল্লায়, দিতাম নোড়া দিয়ে দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে।

ঠাকমা বল্‌লেন—তা ত দিতিস; এখন আমি কি করি তাই বল, ভাই।

কি আবার করবে? তুমি নরম মাটী, কেঁচোতে খুঁড়বেই। সহ্যি করা ছাড়া আর কি করবে? খোকনের মা বেঁচে থাকতেই খাল কেটে কুমীর এনেছিলে; এখন সেই পাপের কর্ম্মভোগ তোমাকেই করতে হবে।

ঠাকমা প্রতিবাদের সুরে বল্‌লেন—আমিও আনিনি, খোকনের মাও আনেনি। ক্ষেমী আসত খাবার শিখতে, খাবার খেতে, নিয়ে যেতে, চেয়ে যেতে।

ছোট ঠাকমা—খোকোনের মা গরীবের ঘরের মেয়ে হলেও দরাজ ছিল তার হাত।

—তা সত্যি; কিন্তু বেহিসেবী ছিল না। এখন যেমন জিনিসের ছড়া-ছড়ি, ফেলা-ফেলি হচ্ছে তার সময় এমনটি ছিল না। বাড়ীতে এখন নিত্যি মহচ্ছোব।—ঠাকমা দুঃখের সঙ্গে বললেন।

ছোট ঠাকমা—শিবতলার ডাকাতরা বুঝি খুব লুটছে দু'হাতে।

ঠাকমা-ছিঃ ওকথা বলিসনে। লুটছে ক্ষেমী। বউ নিজের হাতে দিলে লুটবে না ত কি? চাক না চাক শেমিজ-শাড়ি, শাল-দোশালা পাচ্ছে, সোনা-রূপোর জিনিস পত্তরও কত গিয়ে ঢুকছে ক্ষেমীর ঘরে।

ছোট ঠাকমা-বলো কি—এত খাতির ক্ষেমীর?

—তা হবে না, সে বউমার মামী, তার ওপর সে ছিল তার বিয়ের ঘটকী।

ছোট ঠাকমা একটু সন্দেহের সুর ভেঁজে বললেন—তা হোকগে, শিবতলার ওরা অমন দিলদরিয়া মেয়ে নয় যে ক্ষেমীকে দু'হাতে বিলিয়ে দেবে সোনা-রূপোর জিনিস। বড় জোর ক্ষেমীকে হয়ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটা হাতে মজুরী দিবে।

ঠাকমা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—ঐত তোর দোষ অমু। যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। তুই যাইই বলিস, আমার বউয়ের সত্যি দরাজ হাত। এইত সেদিন মধুর অমন দামী বর্ষাতীটা দিয়ে দিলে ক্ষেমীর জামাইকে।

—নিতে লজ্জা করল না?

ঠাকমা—তা কেন করবে? কত টুকি-টাকি তুচ্ছ জিনিস ত না-বলে কয়েই নিয়ে যাচ্ছে। যা যেচে দিচ্ছে তা নিতে লজ্জা কি? তা যা দিতে ইচ্ছে যায় দিক; কিন্তু যখন আমার নিজের হাতে তৈরী অমন মেহনতের আমচুর, আমসত্ব আর ডেলের বড়িগুলো আমার চোখের সামনে ক্ষেমীকে বিলিয়ে দেয়, তখন বাপু সত্যি আমার বুকে লাগে।

ছোটঠাকমা—বেশ শুনলাম দিদি, প্রাণ ওর হয়ে গেলো! সবে ত সুরু, কয়েক মাস যেতে দাও, তখন দেখবে তোমার বাড়ীর ইট-কাঠ উধাও হয়েছে, আর শিবতলার পড়ো বাড়ী নতুন হয়েছে। চাই কি শিবতলার বারো ভূতে তোমার কপালের গঙ্গামাটির ফোটাটিও চেটে খাবে। ক্ষেমী নেয় না, শিবতলায় বয়ে দিয়ে আসে।

কি যে বলিস!

ছোট ঠাকমা—ঠিকই বলছি দিদি। কথায় বলে পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে। ক্ষেমী এখন শিখণ্ডী। তার দরকার ফুরিয়ে গেলেই তাকে দূর করে দেবে। সে সুদিনের আশায় পার ত বেঁচে থেকো।

—নারে অমু, ক্ষেমীর খাতির বরাবরই থাকবে, দেখিস। তারই চেষ্টায় বিনি পয়সায় মেয়ে পার করলো সে কথা কি কখনও ভুলতে পারে?

—খুব পারে। দু'দিন সবুর কর তখন দেখবে আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ঠাকমা বললেন—আজ উঠি অমু। পরলে শীগ্‌গিরই আর একদিন আসবো।

—একটু বসো দিদি, খোকন একটু কিছু মুখে দিয়ে নিক।

বাড়ী ফিরে এলাম পোনে ছ'টায়। দেখলাম শিবুর মা বাসন মেজে-ধুয়ে সবে উনানে আঁচ দিচ্ছে। [ক্রমশঃ

এডিনবরায় আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

জর্জ্জ হেরিয়ট স্কুল প্রাসাদতুল্য এক বিরাট বিদ্যাভবন। বিশাল তার অঙ্গন এবং বিশালতর তার বহিঃপ্রাঙ্গন। আমাদের গাড়ী তোরণদ্বারে প্রবেশ করে প্রাঙ্গনের মধ্যস্থ প্রস্তর ও কংকরময় বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করে মূল বিদ্যাভবনের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। স্কটিশ পি-ই-এন ক্লাবের সেক্রেটারী প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক শ্রীযুক্ত ডাগলাস্ ইয়ং আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নামিয়ে নিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পেন কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জন ওয়াট্সন। ডাগলাস্ ইয়ংকে দেখা গেল আপাদমস্তক একেবারে স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের পোষাকে সজ্জিত। কোমরে কিল্‌ট বা ঘাগরাপরা, কাঁধে টোগা, পালক আঁটা টুপি মাথায়, ফুলকাটা ফুলমোজা পায়ে, তাতে দামী ঝালর ঝুলছে। কোমর পর্য্যন্ত কাটা হাইল্যাণ্ড-কোট। সামনের দিকে ঝুলছে দীর্ঘ পশুলোম ঘেরা চক্‌চকে ঢাল। ওয়াট্সনও স্কচ, কিন্তু তিনি উগ্রপন্থী নন। দিব্যি চাঁচাছোলা ভদ্রলোকের মতো ইভনিং-ড্রেস পরে এসেছেন। এখানে বলে রাখা উচিত মনে করি যে কিছুদিন থেকে স্কটিশ যুবকদের মধ্যে বেশ একটা বড়দল ইংরেজের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ ক'রে স্কটল্যাণ্ডে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন। তাঁরা বলেন ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভাব, সামাজিক প্রভাব, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব স্কটল্যাণ্ডকে তার নিজস্ব সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে নকল ইংরেজ করে তুলছে। এরই প্রতিবাদে তারা স্কটল্যাণ্ডের যা কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সে গুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা ট্রাউজার ফেলে আবার সেই ঘরে বোনা পশমের চৌখুপি ঘাগরা আর চেককাটা উত্তরিয় ধারণ করতে শুরু করেছে। প্রাচীন স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের এই ছিল জাতীয় পোষাক। বর্ত্তমান সভ্যযুগে কোনও শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে এ রকম মেয়েলী সাজ পরে ঘুরে বেড়ানো শুধু লজ্জাজনকই নয়, চক্ষু পীড়াদায়কও। কিন্তু ইংরাজ-বিদ্বেষ এদের বে-পরোয়া করে তুলেছে। ইংরাজীভাষা ভুলে যাবার জন্য এরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। স্কচেদের যে প্রাচীন কেল্‌টিক ভাষা সেই ভাষাতেই আজকাল স্কট-ল্যাণ্ডের নবীন সাহিত্য সাধকেরা তাঁদের কাব্য ও সাহিত্য রচনা করছেন। নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার এই যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এটা অবশ্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু, অতীতের পুরাতন যুগে ফিরে যাওয়াটা বর্ত্তমানযুগে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পক্ষে কল্যাণকর কিনা সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এর ফলে স্কচেরা ধীরে ধীরে আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সকল সম্পর্ক হারিয়ে একঘরে হ'য়ে পড়বে নাকি?

যাক্ সে কথা, ডাগলাস ইয়ং ও ওয়াটসন সাহেব নিজেরাই আমাদের কাছে স্ব স্ব পরিচয় দিয়ে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ট্যাক্সীচালক মিঃ গেয়ার জানতে চাইলেন, আমরা কখন বাসায় ফিরবো। আমাদের গাড়ী দরকার হবে কিনা! আমরা বলে দিলুম, হ্যাঁ, আপনি আমাদের জন্য গাড়ী নিয়ে আসবেন, প্রোগ্রামে তো দেখছি রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত এখানে হৈ-হল্লা চলবে। আপনি রাত্রি দশটা নাগাদ আসবেন।' O.K. বলে তিনি গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন।

ওয়াট্সন ইয়ং কোম্পানী আমাদের জর্জ্জ হেরিয়ট স্কুলের উপরতলায় কংগ্রেসের অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের নাম লেখা প্রতিনিধিদের ব্যাজ এবং আমাদের নাম লেখা এক একখানি সুন্দর 'পোর্টফোলিও' দিলেন। পোর্টফোলিও খুলে দেখা গেল যে পেন কংগ্রেসের অফিশিয়াল ও ফাইনাল প্রোগ্রাম এবং প্রতিনিধিদের এ্যাডমিশন কার্ড ছাড়া তার মধ্যে এই কদিনের সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র, যেখানে যেখানে এঁরা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন সেখানকার রেল ও

ষ্টীমারের টিকেট, থিয়েটার, অপেরা, কনসার্ট ও নাচের আসরে যাবার প্রবেশপত্র এবং তাদের আনুষঙ্গিক প্রোগ্রাম, আর্ট এক্জিবিশান, জু' মিউজিয়ম, রাজপ্রাসাদ, কেল্লা ইত্যাদি দেখতে যাবার অনুমতি পত্র, স্বর্গীয় লুই ষ্টিভেনসনের রচিত 'স্কটল্যাণ্ড' সম্বন্ধে একখানি বই, একখানি এডিনবরা শহরের মানচিত্র ও 'অফিশিয়াল গাইড', একখানি ষ্ট্রীট ডিরেক্টরী এবং ১৯৫০ সালের এডিনবরা ফেষ্টিভ্যালের প্রমোদ স্থচী রয়েছে। মনে মনে এঁদের কাজের রীতি শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না।

গ্লাসগোর লর্ড প্রোভোষ্ট মিঃ ভিক্টর ডি ওয়ারেন

তারপর এঁরা আমাদের ডাইনিং হলে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারমধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান অতিথি সার সি, পি, রামস্বামী আইয়ার, পাকিস্থানের প্রতিনিধি বেগম শায়েস্তা ইক্রামউল্লা, কবি জসিমুদ্দীন সাহেব, লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় শ্রীযুক্ত অয়নদেব অন্দী। আন্তর্জ্জাতিক পেন ক্লাবের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সোরা (Dennis Saurat) স্কটিশ পি-ই-এন সেণ্টারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত লিংকলেটার (Eric Linklater) পেন কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রসেন (J. N. Anderson) আন্তর্জ্জাতিক পেনক্লাবের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত হার্ম্মণ আউল্ড, পেনক্লাবের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যা রাইট আনারেবল্ শ্রীযুক্তা কাউণ্টেস্ অফ রোজবেরী এবং মার্কিন নাট্যকার ও এবারের পেন-কংগ্রেসের প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত রবার্ট শেরউডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য আমাদের এই আলাপ পরিচয়ের মধ্যে পান ও ভোজনের ব্যাপারটা সমানেই চলছিল। যাঁরা লাজুক অতিথি, ঢেলে নিতে বা তুলে নিতে সংকোচ বোধ করছিলেন, তাঁদের হাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা খাদ্য ও পানীয় পৌছে দিচ্ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করলে যে ঠকতে হয় এ অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কাজেই টেবিলের উপর সাজানো বিবিধ খাদ্য বস্তুর মধ্যে যে যে বস্তু আমার রসনাকে আকৃষ্ট করছিল অকুণ্ঠ অঙ্গুলি চালনায় সেগুলি আমার প্লেটে তুলে নিয়ে সদ্ব্যবহার করছিলুম। পত্নী আমার লাজুক। একজন সেবা পরায়ণ আইরিশ যুবক এগিয়ে এসে শ্রীমতীর পরিচর্য্যার ভার নিয়েছেন দেখে আমি বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে আহারে মন দিয়েছিলুম। পরে ধন্যবাদ দেবার জন্য আলাপ করতে গিয়ে জানতে পারলুম ছেলেটির নাম জে, ওকোনোর। কিন্তু 'জিমি' নামেই সে সমধিক খ্যাত। এডিনবরা য়ুনিভার্সিটির ছাত্র সে। সাহিত্য-রোগ আছে। য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখে।

সেই 'দাঁড়াভোগ' ও 'খাড়াপানের' আসরে আমাদের পরিহিত ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সমাগত সুধী বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তাঁরা অনেকেই বেশ সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে আলাপ শুরু করছিলেন। How do you do, very glad to meet you. Are you coming from Pakistan? No? India? I see. Republic of India? Ah, yes! We know. বলছিলেন বটে we know কিন্তু ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু জানেন না তাঁরা এটা বেশ বুঝতে পারছিলুম। মেয়েরা ঘিরে দাঁড়ালো। ঝুঁকে পড়ে শ্রীমতীর সাড়ীখানিতে হাত বুলিয়ে বলছিলেন very nice? How lovely! এ সাড়ী ভারতীয় সিল্কে
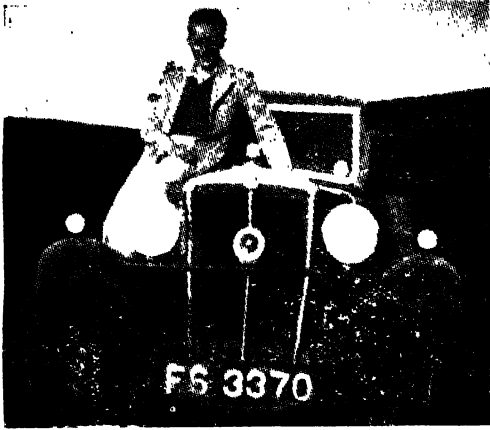
মিঃ গেয়ার ও তাহার মোটরগাড়ী

ভারতবর্ষেই তৈরী এবং ভারতীয় রেশম ও জরীর সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যকরা নক্সা পাড় আমার স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে তাঁরা বললেন—ওরিয়েণ্টাল আর্টের চরম নিদর্শন এই বস্ত্র! ভারতীয় শিল্পীদের হাতে-বোনা-শুনে ভারতীয় শিল্পকলার জয়গান করতে লাগলেন তাঁরা। এক সাড়ীতেই আসর মাৎ!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কানাডার মিঃ ও মিসেস জ্যাকবসন, আইরিশ সুলেখিকা শ্রীমতী ডোরেথি ডে, (এঁর আসল নাম Mrs. McAuliffe), জার্ম্মানীর দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলফ্রেড য়ুঙ্গার (Alfred Unger) ও তাঁর বিদুষী পত্নী, আমসটার্ডাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টিলরুই ও শ্রীমতী টিলরুই (Prof. Dr. J. Tielrooy), নরওয়ের বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী লিজি (Mrs. Lizzie Juvkam) স্কটল্যাণ্ডের প্রথিতযশা কবি ও নাট্যকার জেমস ব্রাইডি (James Bridie) খ্যাতনামা নবীন কবি ল্যামণ্ট (Dr. Archie Lamont) ও ম্যাক ডায়ার্মিড্ (Hugh Mac Diarmid) এস্থোনিয়ার নোবেলে প্রাইজ প্রাপ্ত কবি ও নাট্যকার র‍্যানিট্ (Prof. Aleksis Rannit) ও শ্রীমতী র‍্যানিট, তুর্কীর স্বনামখ্যাতা মহিয়সী মহিলা মাদাম হ্যালিদে এদিব্ (Halide Edib), অষ্ট্রিয়ার শ্রীযুক্ত রোচোওয়ানস্কী (L. W. Rochowanski) ও তাঁর পত্নী এবং সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত ফ্রাইস্‌বার্গার (Dr. K. Friesberger) এঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয়ে সুখী হলুম। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। কেউ কেউ তাঁদের রচিত পুস্তক আমাদের উপহার দিলেন। রাত্রি ৯টার মধ্যেই মিলনোৎসব শেষ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলেটার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সমবেত সকল অভ্যাগতদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীযুক্ত ডাগলাস ইয়াংও কবিজনোচিত কিছু ভাল কথা শোনালেন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কিন্তু কেউ কিছুই বললেন না।

স্কটল্যাণ্ডের দারুণ ঠাণ্ডায় অতিষ্ঠ হয়ে সকাল সকাল যে যার ডেরায় পালালেন। আমরা পড়ে রইলুম সেই স্কুলে আটকে, কারণ গেয়ার সাহেবকে বলে দেওয়া হয়েছে রাত্রি ১০টা—১০৷৷টার মধ্যে যেন মোটর নিয়ে আসেন। সুতরাং গাড়ী আসতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরী আছে। স্কুলবাড়ী প্রায় জনশূন্য হয়ে এল। আমরা একবার বাইরে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, আবার ঠাণ্ডার ধাক্কায় ভিতরে পালিয়ে আসি। শ্রীযুক্ত ওয়াটসনের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল আমাদের অসহায় অবস্থা। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনাদের বাড়ী যাবার। সে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবার কোনও প্রয়োজন নেই সে গাড়ী এলে আমাদের কাজে লেগে যাবে।

রাইট অনারেবল শ্রীযুক্তা কাউনটেস্ অফ্ রোজবেরী তখনও আসেননি বাইরে। তাঁর প্রকাণ্ড রোলস রয়ইস্ দাঁড়িয়েছিল দরজায়। মিঃ ওয়াট্‌সন বিনা দ্বিধায় আমাদের সেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে ছুটলেন কাউণ্টেস্‌কে ডাকতে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন—'কাউনটেস্‌কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।' উত্তরে হেসে বললুম Perhaps

she eloped with some count of Literature. There were so many of them here tonight!

কাউন্টেস হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, I wish I would if I could!

ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে বেশ। যৌবনের 38th Parallel line তিনি অনেকদিন আগেই পার হয়ে গেছেন। গাড়ীতে উঠেই বললেন—কোথায় নামিয়ে দিতে হবে বলুন অনুগ্রহ করে। বললুম মিসেস বার্নসের ঠিকানা। কাউন্টেস্ খুশী হয়ে জানালেন—তিনি ঐ দিকেরই যাত্রী। সারাটা পথ গল্প করতে করতে তিনি আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।···গল্প ভারতবর্ষ ও সাহিত্য। রামায়ণ মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত।

পেনকংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রতিনিধিদের শুধু রাত্রিবাস ও প্রাতরাশের (Bed and Breakfast) ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বলে এনেছেন। মধ্যাহ্নভোজন, বৈকালীন চা ও জলযোগ এবং রাত্রিভোজের ব্যবস্থা প্রতিনিধিদের নিজব্যয়ে করে নিতে হবে। মধ্যাহ্নভোজ ও বৈকালীন চা জলযোগের আয়োজন একটা রেখেছিলেন তাঁরা স্কুল প্রাঙ্গনে। প্রতিনিধিরা ও কর্ম্মীরা ইচ্ছা করলে সেখানে মূল্য দিয়ে খেতে পারেন। বাইরে যেতে হবে না।

এছাড়া উপায় ছিল না। কারণ, বিশ্বের এই আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলন একটি আধুনিক কালের রাজসূয় যজ্ঞ বিশেষ। পৃথিবীর তিরিশটি বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪২৫ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগ দিতে। সাত আটদিন ধরে এই সম্মেলন চলবে। আজকের দিনে সপ্তাহকাল্ ধরে এত লোকের চারবেলা পান ভোজনের ব্যবস্থা করা যে সম্ভব নয় একথা বলাই বাহুল্য। প্রতিনিধি এসেছিলেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে ২ জন। অষ্ট্রিয়া থেকে ১২ জন। বেলজিয়ম থেকে ৩৩ জন। ব্রেজিল থেকে ৬ জন, কানাডা থেকে ৫ জন, ডেনমার্ক থেকে ৫ জন, আয়র্লাণ্ড থেকে ১০ জন, ইংলণ্ড থেকে ৮৩ জন, এস্তোনিয়া থেকে ৪ জন, ফিনল্যাণ্ড থেকে ২ জন, ফ্রান্স থেকে ৩০ জন, জার্ম্মানী থেকে ১০ জন, হল্যাণ্ড থেকে ১৭ জন, ভারতবর্ষ থেকে ৩ জন, ইরাক থেকে ১ জন, ইজরায়েল থেকে ১ জন, ইটালী থেকে ১৩ জন, জামাইকা থেকে ২ জন, জাপান থেকে ২ জন, ল্যাটভিয়া থেকে ২ জন, নরওয়ে থেকে ৮ জন, পাকিস্থান থেকে ৩ জন, স্কটল্যাণ্ড থেকে ১০৯ জন, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৫ জন, সোয়েডেন থেকে ৭ জন, নিউজিল্যাণ্ড থেকে ১ জন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বা আলষ্টার থেকে ২২ জন, সুইজারল্যাণ্ড থেকে ৯ জন, আমেরিকা যুক্তরাজ্য থেকে ১১ জন, যেডিশ থেকে ২ জন এবং য়ুনেস্কোর (U. N. E. S. C. O.) প্রতিনিধি ৪ জন।

[ক্রমশঃ

সংশয়বাদ ও অর্ব্বাক একাডেমি

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিবাদরূপে সংশয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার প্রধান কথা এই যে, বহির্জ্জগতের সত্যজ্ঞান অসম্ভব; সুতরাং বিজ্ঞানও অসম্ভব। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বাহ্যবস্তু হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

সংশয়বাদের তিনটি ক্রম ছিল :

(১) প্রাচীন সংশয়বাদ—ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাইরো (Pyrrho)—পিলপনিসাসের অন্তর্গত এলিস নগরের অধিবাসী। তিনি আরিষ্টটলের সমসাময়িক ছিলেন। পাইরো আলেকজান্দারের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি এলিস নগরেই অতিবাহিত করেন। ২৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাইরো প্রাচীন সংশয়বাদে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন, কোনও নূতন মত তিনি প্রকাশ করেন নাই। অক্ষজ জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রাচীন দার্শনিকদিগেরও ছিল; পারমেনিদিস এবং প্লেটো প্রত্যক্ষের মূল্য একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। সোফিষ্টগণও বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিয়া প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানকে তাহার পক্ষে সত্যের মানদণ্ড বলিয়াছিলেন। পাইরো চরিত্রনীতির ক্ষেত্রেও সংশয়কে প্রসারিত করিয়াছিলেন। চরিত্র-নীতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, এক প্রকারের কার্য্যকে অন্য প্রকারের কার্য্য হইতে ভাল বলিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে এই মতের ফল এই দাঁড়ায়, দেশের প্রচলিত প্রথার ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া সকলে তাহারই অনুসরণ করে। সংশয়বাদিগণ ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত আচারই মানিয়া চলিতেন; তাহাদের মধ্যে পুরোহিতও কেহ কেহ ছিলেন। যখন কোন্ প্রথা ভাল, কোন্‌টি মন্দ জানিবার উপায় নাই, তখন প্রচলিত প্রথাকে মন্দ বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং তাহার অনুসরণ করা অন্যায় হইতে পারে না।

সংশয়বাদীদিগের মতে জীবনের উদ্দেশ্য সুখ। সুখ অর্জ্জন করিতে হইলে বাহ্যদ্রব্যের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ এবং তাহাদের স্বরূপ কি, তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু সংশয়বাদিগণের মতে বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা জানা অসম্ভব। আমাদের ইন্দ্রিয়ই হউক, অথবা বুদ্ধিই হউক, সত্যের জ্ঞান কিছুতেই দিতে পারে না। আমরা কোনও বিষয়ে যে মীমাংসাই করি না কেন, তাহার বিপরীত মত পোষণ করাও সম্ভব। সুতরাং কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ না করাই উচিত, এবং কোনও বিষয়ে স্থির মত পোষণ না করাতেই সুখ।

সোফিষ্টদিগের মতো সংশয়বাদিগণও মানুষকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু ষ্টোয়িকদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ ছিল গুরুতর। ষ্টোয়িকগণ মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর তাহার প্রাধান্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত ছিলেন। সংশয়বাদিগণ মানুষের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন; মানুষের যে কোনও বিষয়েই সত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন। "আমাদের সঙ্গে কোনও বস্তুর যে-সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সেই বস্তুর স্বরূপ কি? আমাদের যে-সমস্ত জ্ঞানের বৃত্তি আছে, সে-সম্বন্ধে তাহারা কি আমাদিগকে কোনও নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পাইরো উত্তর দিয়াছিলেন, "না, আমাদিগের বৃত্তির সে ক্ষমতা নাই। বস্তুর সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহাই আমাদের জ্ঞান-বৃত্তি-দ্বারা আমরা অবগত হই। এর বৃত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে কোনও বস্তু

স্বরূপতঃ কি তাহা জানা অসম্ভব। প্রতিভাসই (phenomena) কেবল আমরা জানিতে পারি; কিন্তু তাহার অন্তরালে যে পরমার্থ আছে, তাহা জানা অসম্ভব।" সুতরাং কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সময় সংশয়বাদিগণ সন্দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতেন, যেমন—"সম্ভবতঃ", "হয়তো" "এইরূপ হইতে পারে", "আমার মনে হয় এই রূপ"; "আমি নিশ্চিত জানি না, তবে" "আমি নিশ্চিত জানি না—আমি যে নিশ্চিত জানি না, তাহাও নিশ্চিত জানি না, তবে।" তাহারা বিশ্বাস করিতেন, এই ভাবে নিশ্চিত মত প্রকাশ না করার ফলে সুখ পাওয়া যায়, কেননা কোনও বিষয়ে স্থির মত যদি পোষণ না করা যায়, তাহা হইলে চিত্ত বিচলিত হয় না। যিনি সংশয়বাদির মত চিন্তা করেন, তিনি চিরকাল শান্তি উপভোগ করেন, তাঁহার কামনাও নাই, ভাবনাও নাই; মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি তিনি উদাসীন। স্বাস্থ্য ও রোগ, জীবন ও মৃত্যু ইহাদের মধ্যে ভেদ কিছুই নাই। উহাই সংশয়বাদীদিগের ঔদাসিন্য।

সংশয়বাদিগণ প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডনের জন্যই তাঁহাদের তর্কশক্তির প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহাদিগের মতের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া আপনাদের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু স্বমতের পক্ষে তাহাদের যুক্তি ছিল হেত্বাভাসযুক্ত ও বাক্‌চাতুর্য্যপূর্ণ।

পাইরোর শিষ্য টাইমন। তিনি বলিতেন অবরোহিক তর্কের ভিত্তি সাধারণ-প্রতিজ্ঞা। যাবতীয় সাধারণ প্রতিজ্ঞার মূলে থাকে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। যেমন ইউক্লিড কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য তত্ত্বের সাহায্যে তাহার প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা সাধারণ তত্ত্বের আবিষ্কার অসম্ভব। সুতরাং কোনও বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে অন্য বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। ইহার ফলে সমস্ত যুক্তিই চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, অথবা অন্তহীন শৃঙ্খলে পরিণত হয়। ২৩৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে টাইমনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে পাইরোর সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু পাইরোর মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে একাডেমী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

(২) অর্ব্বাক্ একাডেমিঃ—প্লেটোর একাডেমি কর্ত্তৃক পাইরোর মত-গ্রহণ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই অদ্‌ভুত কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন যিনি তাঁহার নাম আরকেসিলস (Arcesilans)। তিনি টাইমনের সমসাময়িক ছিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত এক জগৎ ও অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব, এই দুইটিই প্লেটোর দর্শনের বিশেষত্ব, কিন্তু প্লেটোর মত ছিল বহুমুখী, এবং তাঁহাকে সংশয়বাদীরূপে গ্রহণ করাও অসম্ভব ছিল না। প্লেটোর গ্রন্থের সক্রেতিস বলিতেন তিনি কিছুই জানেন না। ইহা সাধারণতঃ ব্যঙ্গোক্তি-রূপেই গৃহীত হয়। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্লেটোর অনেক গ্রন্থে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠকের চিত্তকে সন্দেহের মধ্যে রাখাই ঐ ভাবে গ্রন্থশেষ করার উদ্দেশ্য, ইহা মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। Parmenides গ্রন্থের যে ভাবে পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে যে, বিচার্য্য প্রশ্নের উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ যুক্তি আছে। এই ভাবে আরকেসিলস প্লেটোর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। Bertrand Russel এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "আরকেসিলাস প্লেটোর শিরশ্ছেদ করিয়া ছিলেন। কিন্তু বিগত-শির দেহটা (যাহা তিনি রাখিয়াদিয়াছিলেন) তাহা প্লেটোরই।" আরকেসিলাস যদি শিষ্যদিগেকে বুঝাইতে না পারিতেন যে, তাহার মতের সহিত সক্রেতিস ও প্লেটোর মতের বিরোধ নাই, তাহা হইলে তাহার পক্ষে একাডেমির অধ্যক্ষের পদ অধিকার করিয়া থাকা সম্ভব-পর হইত না।

আরকেসিলাস (৩১৬-২৪০ B.C) অকপট চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তিও ছিল। ষ্টোয়িক জেনোর তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ষ্টোয়িক প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, মিথ্যা প্রত্যক্ষজ্ঞানও আমাদের মনকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়া সত্যের প্রতীতি উৎপাদন করিতে পারে। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা "মত" (opinion), জ্ঞান নয়। সুতরাং সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিবার কোনও প্রমাণ (creteria) আমাদের নাই। আমাদের

মতের মধ্যে সত্য থাকিলেও, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিছুই যে জানিতে পারি না, তাহাও জানিতে পারিনা। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, তিনি বলেন, আমাদের উচিত সম্ভাবনার অনুসরণ করা—যে পন্থার পক্ষে অধিকতম এবং উৎকৃষ্টতম যুক্তি আছে, তাহা অবলম্বন করা। তাহা করিলেই আমরা ঠিক কাজ করিতেছি বলা যায়! কারণ তাহাই প্রজ্ঞা-ও-বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ। চিত্তের যে উপরতি ও শান্তি ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয়দিগের কাম্য, তাহা কেবল যুক্তিবর্জ্জিত দৃঢ়বিশ্বাস স্থায়ীভাবে বর্জ্জন করিলেই পাওয়া যায়। ২৪১ পৃঃ খৃষ্টাব্দে আরকেলিসাসের মৃত্যু হয়।

কার্নিয়াদিস — (২১৩ ১২৮ B.C.) — কার্ণিয়াদিস আরকেলিসাসের শিষ্য ছিলেন। গুরুর মত তিনিও ষ্টোয়িকদিগের সহিত বিতণ্ডায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। একবার এথেনসের দূতরূপে রোমে গমন করিয়া তিনি এক বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এক জনসভায় তিনি প্লেটো ও আরিষ্টটলের "সুবিচার"-সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রথম দিনে তাহাদের মত ব্যাখ্যা করিয়া, দ্বিতীয় দিনে পূর্ব্বদিনে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যুক্তিদ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহা প্রমাণ করা যে, কোনও মীমাংসারই স্থির ভিত্তি নাই। প্লেটোর সক্রেতিস বলিয়াছিলেন, যে যে অন্যায় করে, তাহার অকল্যাণ হয়—যে অন্যায় সহ্য করে তাহার অপেক্ষা অধিক। প্রথম দিন কার্নিয়াদিস যুক্তি দিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনি সক্রেতিসের উক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,"বড় বড় রাষ্ট্র পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় করিয়াই বড় হয়। জাহাজ জলমগ্ন হইবার সময় যদি স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রথমে রক্ষা করিতে চাও, তুমি নিজে বাঁচিতে পারিবে না। রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়নের সময় যদি একজন আহত অশ্বারোহী সৈনিককে পলায়নপর দেখ, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া নামাইয়া নিজে বাঁচিবার উপায় করিবে।"

একাডেমির অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ ছিলেন একজন কার্থেজবাসী। তাহার নাম ছিল হাসড্রুবাল, কিন্তু তিনি আপনাকে ক্লিটোম্যাকাস নামে অভিহিত করিতেন। তিনি চারিশতের উপর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ফিনিসীয় ভাষায়। কার্ণিয়াদিসের সহিত তাহার মতের অমিল ছিল না। তাহারা উভয়েই ম্যাজিক, ফলিত জ্যোতিষ ও ভবিষ্যৎ গণনার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারা দুইজনে "সম্ভাবনার পরিমাণ" (degree of proba bility) সম্বন্ধে একটি মতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যদিও কোনও বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা সম্ভবপর নহে, তথাপি কোনও কোনও বিষয়ের সত্য হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য বিষয় হইতে অধিক। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভাবনার পরিমাণ দ্বারাই আমাদের পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য।—যে পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবার সম্ভাবনা, তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে এই-সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাওয়া যায় নাই।

ক্লিটোম্যাকাসের পরে একাডেমি সংশয়বাদ বর্জ্জন করিয়াছিল, এবং এন্টিওকাসের সময় (মৃত্যু ৬৯ B.C) হইতে ইহার মতের সহিত ষ্টোয়িক দর্শনের কোনও পার্থক্য উপলব্ধ হইত না।

(৩) অর্ব্বাক সংশয়বাদ

গ্রীক দর্শনের আত্যন্তিক পতনের সময় সংশয়বাদের পুনরুত্থান ঘটে। এই সময়ের প্রসিদ্ধ সংশয়বাদীদিগের নাম—ইনিসিডেমাস (Ænesedemus),এগ্রিপা (Agrippa) এবং সেক্সটাস্ এমপিরিকাস (Sextus Empricus)। এমপিরিকাসের লিখিত দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে সংশয়বাদের পক্ষে প্রাচীনকালের যাবতীয় যুক্তি সংগৃহীত হইয়াছে।

ইনিসিডেমাস সংশয়বাদীদিগের দশটি যুক্তি একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারা এই:

(১) প্রাণীদিগের মধ্যে সংবেদন ও অনুভূতির (Feelings and sensations) বিভিন্নতা।

(২) মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিভিন্নতা। ইহার জন্য একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণের নিকট বস্তুসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণ সত্য জ্ঞানলাভের উপযুক্ত কি না, সে-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা।

(৪) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

(৫) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের সম্বন্ধে দ্রব্যের বিভিন্ন অবস্থান ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

(৬) আমরা সাক্ষাৎভাবে কিছুই জানিতে পারি না; আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যবর্ত্তী দ্রব্যের (বায়ু প্রভৃতি) ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

(৭) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের পরিমাণ, তাপ, বর্ণ, গতি প্রভৃতি-ভেদে একই দ্রব্য আমাদের মনে বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপাদন করে।

(৮) প্রচলিত প্রথার উপর আমাদের প্রত্যয় নির্ভরশীল। আমাদের মনের উপর সুপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া নূতন অপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে ভিন্ন।

(৯) সামান্য প্রত্যয়ের (notion) আপেক্ষিকতা; দ্রব্যসকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অথবা আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই তাহাদ্বারা ব্যক্ত হয়।

(১০) মানুষের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, রীতি, আইন, ধর্ম্মীয় মত এবং বিশ্বাসের বিভিন্নতা।

এই দশটি যুক্তি বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কিত, এবং "জ্ঞানের আপেক্ষিকতা"র অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বর্ত্তমানে দর্শনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বন্যটীয়া

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হায় লো প্রিয়া বন্যটীয়া
পোষ মানো না পক্ষী অচিন্
শীষ দিয়ে কি শস্য দিয়ে
মনটী পাওয়া বড্ড কঠিন!
যখন তোমায় বক্ষে চাহি
তখন দেখি কোথাও নাহি
এক পলকে উদয় হয়ে
কোথায় জানি হও উধাও।
মন ভুলানো বন্য পাখী
মন ভুলিয়ে কোথায় যাও!
হায়লো প্রিয়া—পথ চাহিয়া
চক্ষে হল দৃষ্টি মৃদু
মন নিয়ে তো মন দিলে না
অপূর্ণ পূর্ণিমার বিধু।
বুঝতে পারি মনেই আছো
আনমনেরি অন্তরালে
অবয়বের আবছায়াটী
অমনি মিলায় হাত বাড়ালে,
অন্তরেতে উদয় হয়ে
গায়েব হলে মন্তরেতে
তোমার মত লাজুক মেয়ে
আর দেখিনি সংসারেতে।

আঁচল ভরা দমকা হাওয়া
সহজ গতি পিছল পথে
পরশ ভয়ে পালিয়ে যাওয়া
তড়িদ্গতি চিত্ত রথে।
না চাহিলে হয়তো আসো
আসোই নাকো চাইলে পরে
আস্তে যেতে ব্যস্ত সদাই
অন্তরেরি বাইরে ঘরে।
সবাই বলে পরের ভুলে
সকল কিছু পণ্ড হল
কেউ ধরে না নিজের ত্রুটি
কি আর কারে বলব বল?
যখন তোমার বিস্মরণে
যত্ন করি পরাণপণে
তখন তুমি আমার মনে
আসন পেতে হও আসীন,
ডুবলো তরী ডুবলো ভরা
শূন্য আমার বসুন্ধরা
পালিয়ে গেলে অমনি ফেলে
গহীন জলে জলের মীন,
হায়লো প্রিয়া বন্যটীয়া
পোষ-না-মানা পক্ষী অচিন্।

সমস্যা

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

সেদিন যখন জরিপের কাজ পরিদর্শন করিতে করিতে আলিপুর ডুয়ার্সের গয়েরকাটা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন বেলা অনুমান একটা। মাঠের কাজ শেষ করিয়া আমিন গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া সে টেবিল না গুটাইয়া তর্ক করিতে লাগিল একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সহিত, আমি প্রথমে তর্কের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতেই আমিন বলিল—"হুজুর এই বিধবা স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর নাম বলছে জ্যাক হ্যামিলটন, দেখুন দেখি পাগল না ক্ষ্যাপা।"

আমি স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম—"বেশ, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি সব ঠিক করে দেবো।"

সে আমার আশ্বাস পাইয়া তর্ক হইতে নিরস্ত হইল। স্ত্রীলোকটির খতিয়ান দৃষ্টে দেখিলাম আমিন রেকর্ড করিয়াছে "দখলকার জোবি ছত্রি, স্বামী অজ্ঞাত", এই স্বামী অজ্ঞাত লিখিতেই ঝগড়ার সূত্রপাত। স্ত্রীলোকটী পীড়াপীড়ি করিতেছিল যে তাহার স্বামীর নাম জ্যাক হ্যামিলটন আর আমিন বলিতেছিল তা কি করে হবে, এমন আজগুবি রেকর্ড সে কিছুতেই করিবে না। মাঠের কাজ শেষ করিয়া আমিন চলিয়া গেল আর আমি গেলাম জোবি ছত্রির গৃহে তাহার সহিত।

সুন্দর কাঠের বাড়ী, পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে বনান্তের শ্যামলতায় ঘেরা। স্থানটি নির্জ্জন এবং চতুর্দ্দিকের পরিবেশ মুগ্ধকর, দূরে চা-বাগানের ফ্যাক্টরীর বাড়ী, সাহেবদের বাংলোর ধবধবে সাদা রং আর তাহার পার্শ্বের কুলি বস্তিগুলিকে যেন আরও ম্লান দেখাইতেছিল। প্রাচুর্য্য এবং অভাব যেন এক সঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেটা যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছিল।

রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়া বাড়ীর পার্শ্বের ঝরনাটী ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ীর পাদধৌত করিয়া যাইতেছিল। চতুর্দ্দিকে ফুল ফুটিয়া আছে, দেখিলেই মনে হয় যেন একটি সযত্নে রক্ষিত নিভৃতের কুঞ্জ। মনে হইতেছিল কে সেই ব্যক্তি যিনি এই স্থানটিতে এই মনোরম কুঞ্জ গড়িয়াছিলেন?

স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে যাইতেই গৃহের অভ্যন্তরে চোখে পড়িল এক সাহেবের ফটো মালা এবং তাজা ফুলে সজ্জিত। সে আমাকে একখানা চেয়ারে বসিতে দিল। ডুয়ার্সে এরূপ ব্যবস্থা দেখি নাই। বড় বড় দেওয়ানিয়া অথবা মোড়লদের গৃহের আসবাবও মোড়া এবং পাটের চট ব্যতীত আর কিছুই কখনও চোখে পড়ে নাই। স্ত্রীলোকটি বলিল—"বাবু চা খাবে?"

আমি আপত্তি না করিতে সে সুন্দর পরিষ্কার পেয়ালাতে আমাকে চা দিল। মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়াছিলাম, চা পান করিয়া বলিলাম—"এখন বলো, জ্যাক হ্যামিলটন তোমার স্বামী, সে কি রকম!"

স্ত্রীলোকটির চোখ জলে ভরিয়া গেল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সে বলিতে লাগিল—"আমার বাড়ী ছিল হাজারিবাগ জেলার মহুয়া গ্রামে। আমরা জাতিতে ক্ষত্রিয়। ২০ বছর বয়সে স্বামী মারা গেলে আমার আর স্বামীর গৃহে স্থান হইল না, আমি গেলাম পিত্রালয়ে। সেখানে সংসারের অভাব দরিদ্রতা দেখিয়া বুঝিলাম যে ওখানেও থাকা সম্ভব হইবে না। তখন একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম, ভাবিলাম কলিকাতা যাইয়া মাড়োয়ারীদের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করিব। হাজারিবাগ ষ্টেশনে দেখা হইল এক কুলিসংগ্রহকারী আরকাঠির সহিত এবং সে আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া নিয়া আসিল এই চাবাগানে। হইলাম চা বাগানের কুলি। আমি রোজকার বরাদ্দ মত চা পাতা তুলিয়া আনিতে পারিতাম না, কুলিদের সর্দ্দার যথেচ্ছ গালাগাল এবং তিরস্কার করিত। ঠিক সেই সময় একদিন তথায় উপস্থিত হইলেন বাগানের সাহেব,

ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তিনি আদেশ দিলেন যে আমি যতটুকু পাতা কুড়াইতে পারিব উহাতেই যেন আমাকে সম্পূর্ণ হপ্তা দেওয়া হয়। পরের দিন হইতে সাহেব রোজই ঠিক ঐ সময়ে আসিতেন পাতা বুঝ দিবার ঘরে। আমার নামটী জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোন বস্তীতে থাকি তাহাও অনুসন্ধান করিয়া লইলেন।

পরে একদিন আমার হইল খুব জ্বর। এক সপ্তাহ আর পাতা তুলিতে যাইতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন দেখি সাহেব নিজেই আমার সেই স্যাঁতসেতে, মলিন অপরিষ্কার গৃহে আসিয়া হাজির, সঙ্গে ডাক্তার। বাগানের হাসপাতালে আমাকে স্থানান্তরিত করা হইল। —এই পর্য্যন্ত আমার হুঁস ছিল। পরে কতদিন পরে তাহা আজও জানিনা যেদিন আমার হুঁস হইল, দেখিলাম আমি সাহেবের বাংলোয়, লোহার খাটে ধবধবে বিছানায় শুইয়া আছি এবং নিকটে একটী আয়া। অতিকষ্টে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সাহেব নিজে আমাকে বাংলোয় নিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। বিশেষ ব্যবস্থা এবং যত্নে আমি সুস্থ হইলাম। সাহেব আর আমাকে বাংলোর বাহিরে যাইতে দিলেন না। সুস্থ হইয়া আমি যেদিন চলিয়া যাইতে চাহিলাম, তিনি বাংলা এবং হিন্দুস্থানী দুই বলিতে পারিতেন, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"জোবি, তুমি এখানেই থাকো, কুলির কাজ তুমি করতে পারবে না, আমি তোমার সব ব্যবস্থাই করে দেব।" আমি উত্তর করিতে পারিলাম না। মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সাহেব আমার মুখটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি এখানে একা, তুমি যতটুকু পারো আমার যত্ন কর্ব্বে, আর আমি তোমাকে সব সময় দেখবো, আদর করবো।" আমি বলিলাম—"সাহেব লোকে যে নিন্দা করবে।" সাহেব হাসিয়া উত্তর করিল "কে নিন্দা করবে, কার সাহস হবে! না, তুমি যেতে পারবে না।" সেই অবধি থেকে গেলাম সাহেবের বাংলোয়। বাবু বুঝলে, সাহেব আমাকে গাউন পরাতো ইংরাজী শেখাতো কাঁটা চামুচে খেতে শেখালো। সাহেব যেদিন খুব বেশী মদ খেতে সুরু করতো সেদিন সব লুকিয়ে রেখে দিতাম। অনেক সময় রাগ করতো, কিন্তু কখনও আমাকে অপমান করেনি। পরের দিন প্রাতে খুসী হয়ে আমাকে বেশী করে আদর করতো। আমি শাড়ী পরতে পছন্দ করতাম—সাহেব কখনও বাধা দিত না—ভাল ভাল নানারকমের শাড়ী আমার জন্য এনে দিত। কত গহনা সাহেব আমাকে দিয়েছে তুমি দেখবে? সাহেব যখন শীকারে যেত আমাকে নিয়ে যেতো সঙ্গে। তাঁবু পড়ত পাহাড়ের ভিতর, ঝরণা, নালা, পাহাড়, পর্ব্বত, জঙ্গল কত কি আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি, তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম যে সাহেব চলে যাবে বিলেত, আর আসবে না, আমার চোখের জলের বিরাম ছিল না—কত যত্নে, আদর করে সে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আমাকে বারংবার চুম্বন করল।

সে বলিল—"তোমাকে ফেলে নিজের দেশে যাবো বটে, কিন্তু সে যাওয়াতে আমার আনন্দ নাই। সামাজিক বিধি নিষেধ অন্তরায়, তাই তোমাকে আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করে সঙ্গে নিতে পারি না।"

আমি সাহেবের বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিলাম—"আমি কালো বটে, কিন্তু আমার প্রাণটাতো আর কালো নয়। তুমি যে আমার সবকিছু নানা রংএ ছুপিয়ে দিয়েছো আর আজ পনেরোটা বছর আমি যে তোমাকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছি, আমি থাকবো কি নিয়ে, আমি যে আর এই চা-বাগানে কুলির কাজ করতে পারবো না।"

জ্যাক তখন একখানা দলিল আমার হাতে দিয়া বলিল—"এই দেখ, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, এই জমি থেকে তোমার বছরে ১০০০৲ আয় হবে নিশ্চয়ই, তোমায় আর চা-বাগানের কুলির কাজ করতে হবে না—আর এই নাও ২০০০৲ টাকা, আর ঐ যে ঝরণার ধারের বাংলোটি ঐটিও আমি তোমাকে দান করে দিয়েছি, এই নাও তার দলিল। কেমন জোবি, এবারে আর তোমার দুঃখ নেই।" আমি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া সাহেবের গলা জড়াইয়া ধরিতেই তিনিও রুমালে চোখ মুছিলেন। এখন বুঝ বাবু, জ্যাক হ্যামিলটন আমার স্বামী লিখলে কি অন্যায় হবে?

আমি নির্ব্বাক ভাবে এতক্ষণ বসিয়া সব শুনিতেছিলাম। তখন দিনের আলো আর নাই বলিলেও চলে। আমি উঠিবার সময় বলিয়া আসিলাম—"তুমি ভেবো না, আমি আমিনকে তোমার স্বামী জ্যাক হ্যামিলটন লিখতেই বলে দেবো।" নিকটস্থ গাছে একটা কাঠঠোকরা অনবরত ঠক ঠক করিয়া যেন বলিতেছিল—সব সত্য, সব সত্য।

বৈদ্যনাথে সাতদিন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর দেওঘরের কার্য্যালয় দেখাইবার জন্য স্বয়ং মোটর গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলেন। হেমেন্দ্র বাবু ও আমি প্রস্তুত ছিলাম; দুই জনে তাঁহার গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; গাড়ি ষ্টেশনের নিকট একটি বাড়ির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেই বাড়িটির দ্বিতলে মেট্রোপলিটানের অর্গানিজেসন অফিস—দুইখানি ছোট ঘর, সুন্দরভাবে সাজান। এক জন ভদ্রলোক কার্য্য করিতেছেন—হেমেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হরিধন বাবু আমাদের দুইজনের বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

হেমেন্দ্র বাবু হরিধন বাবুকে ইন্‌সিওরেন্স সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন—যাহাতে দেওঘর হইতে অনেক কাজ করা যায় তদ্বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা হইল। হরিধন বাবু তাঁহার কয়েকটি অভাবের কথা বলিলেন- হেমেন্দ্র বাবু তাহা মন দিয়া শুনিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার যে সকল অভাব অভিযোগ আছে তাহা পূরণ করিতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দেওঘর সেন্‌ট্রাল সার্কেল পাটনার অধীন বলিয়া কলিকাতা হইতে সড়াসরি কিছু করা হয়ত সম্ভব হইবে না।

হরিধন বাবু আমাদের চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন। হরিধন বাবুর পুত্র আসিল, তিনিও ইন্‌সিও-রেন্সের কাজ করেন—হেমেন্দ্র বাবু তাহাকেও খুব উৎসাহ দিলেন। তাহার নিকট হইতে শুনিলাম যে দেওঘরে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স ব্যতীত আর কোন ইন্‌সিওর কোম্পানীর কোন অফিস নাই। হেমেন্দ্র বাবু তাহা-দিগকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মেট্রোপলিটানের অফিস হইতে বিদায় লইলাম।

মাথার উপরে আকাশে দূর অদৃশ্য-লোকে রাত্রি তখন দিবসের সঙ্গে মিশিতেছে আর ঝিঁঝিঁর ক্লান্ত সুরে মনে হইল সমস্ত তীর্থভূমি যেন অনুরণিত হইতেছে। আমরা বাজারের কাছে উপস্থিত হইলাম। এখানে ঝিঁঝিঁর সুর জনকলরোলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। বাজারে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিতেছি, এমন সময় ক্লক টাওয়ারের নিকট মেট্রোপলিটানের ডাক্তার শঙ্কর বাবুর সহিত হেমেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের দুই জনকে তাঁহার ডাক্তারখানার মধ্যে লইয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু সু-অভিনেতা এবং কিছুদিন পূর্ব্বে বরাহনগরে হরিধন বাবুর সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়িতে হেমেন্দ্রবাবুর সহিত "কর্ণার্জ্জুন" নাটকের অভিনয়ে সহযোগীতা করেন।

হেমেন্দ্র বাবুও সু-অভিনেতা; উক্ত অভিনয়ে দেবেন্দ্র বাবুর মাতৃ দেবী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী হেমেন্দ্র বাবুর অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং হেমেন্দ্র বাবুকে একখানি স্বর্ণপদক উপহার দেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এই সমস্ত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। হেমেন্দ্র বাবু আমার সহিত তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে এরূপ ভাবে আমার কথা বলিতে লাগিলেন যে, আমি বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক, হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের যুগ্ম সম্পাদক, গিরিশ পরিষদের সম্পাদক এবং অভিনেতা, যে, আমি তাহাতে খুব লজ্জিত হইলাম। তিনি হেমেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া আমাকে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি মনে করিয়া এরূপ ভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন যে আমি বেশ একটু মুস্কিলে পড়িলাম।

ডাক্তারখানার সম্মুখেই দ্বারিক ঘোষের দোকান, তিনি ভাল ভাল সন্দেশ আনাইয়া আমাদিগকে

জলযোগ করাইলেন। সেই সময় কয়েকজন রোগী আসিল ; কিন্তু তিনি তাহাদের বসাইয়া রাখিলেন, কারণ আমাদের ছাড়িয়া তিনি তখন কোন মতেই স্থান ত্যাগ করিবেন না।

অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা হইল। হরিধন বাবু পূজার সময় বৈদ্যনাথে দুইখানি নাটক অভিনয় করাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা শুনিলাম। এইবার তাহাদের 'বিজয়া সম্মিলনী' হইবে বলিয়া ব্যবস্থা হইতেছে এবং হেমেন্দ্র বাবুকে তাহা দেখিতে যাইবার জন্য তিনি সেই রাত্রেই আমাদের অনুরোধ জানাইলেন। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজে ; আমি হেমেন্দ্র বাবুকে কাল আসিবেন, আজ এত রাত্রে আর যাওয়া ঠিক নয় বলিয়া কোন মতে সম্মত করাইলাম। তিনিও রাজী হইলেন ; তার পর যথারীতি নমস্কার প্রতিনমস্কারান্তে উভয়ে ডাক্তারখানা ত্যাগ করিলাম এবং রাস্তা হইতে একখানি রিক্সা ভাড়া করিয়া বাড়ী চলিলাম।

পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়ী পৌছিলাম, বাড়ীতে গিয়া দেখি যে চাঁদমোহন বাবু বাহিরের প্রশস্ত দালানে চেয়ারে বসিয়া এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছেন। আমরা যাইবামাত্র তিনি বলিলেন যে, ইনি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন—ইনি 'বাহান্ন বিঘার' সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য্য। তাঁহার নাম পূর্ব্বেই চাঁদমোহন বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম, কারণ তিনি বৈদ্যনাথের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার বাগান দেওঘরের একটি দেখিবার জিনিষ। শুনা যায় যে, বাহান্ন বিঘা জমি লইয়া তাহার বাগান বলিয়া তাঁহার বাড়ির নামও 'বাহান্ন বিঘা' বলিয়া পরিচিত। তবে চাঁদমোহন বাবু বলিলেন যে বাহান্ন বিঘা বলিয়া তাহার বাগান কথিত হইলেও দেওঘরের জমির মাপের সহিত বাঙ্গলা দেশের জমির মাপ করিলে দেখা যাইবে যে বাঙ্গলা দেশের তিন বিঘা পরিমিত জমি দেওঘরের এক বিঘার সামিল। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বাবুর বাগান প্রায় দেড়শত বিঘার কম হইবে না। তিনি আরও বলিলেন যে, ভারতের বহু বড়লাট পর্য্যন্ত এই বাগান দেখিতে আসিয়াছিলেন।

বামে—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দক্ষিণে—শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী, মধ্যে—লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র।

চাঁদমোহন বাবু আমাদের উভয়ের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তিনি পরদিন শুক্রবার প্রাতে তাহার বাগান দেখিবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। শুনিলাম করণীবাদে তাহার বাগান এবং তার ঠিক পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর

আশ্রম। এই আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা আমার পূর্ব্বেই ছিল, এখন বোধিসত্ত্ব বাবুর আমন্ত্রণে সেই সুযোগ হইল বলিয়া মনে বেশ একটু আনন্দ হইল। বোধিসত্ত্ব বাবু চাঁদমোহন বাবুর মক্কেল বলিয়া তিনি তাঁহাকে খুবই সম্মান করেন এবং প্রত্যহ তাঁহার মোটর গাড়ি চাঁদমোহন বাবুর ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। সেই গাড়ি করিয়া চাঁদমোহন বাবুর ছেলেপুলেরা প্রায়ই বেড়াইতে যায়, তাহা আমরা জানি। স্থির হইল যে কাল আটটার সময় গাড়ি আসিয়া আমাদের সকলকে তাঁহার বাগানে লইয়া যাইবে।

সেই রাত্রে চা ও কিছু জলখাবার আসিল; জলযোগ শেষ করিয়া বোধিসত্ত্ব বাবু চলিয়া গেলেন আর আমি তখন চাঁদমোহন বাবুকে হেমেন্দ্র বাবুর সেইদিনের বেড়ান ও কোথায় কি হইয়াছে তাহার বিশদ বর্ণনা করিতে আর করিলাম। সেইদিন রাত্রে আমাদের যাইতে প্রায় এগারটা বাজিল···কারণ গল্প করিতে করিতে বেশ কিছু সময় কাটিল, তার পর হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, আজ গ্রামোফোন রেকর্ডে "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ" অভিনয় শুনিব। ঠাকুরের জীবনী কীর্ত্তিত হইবে, তাহা বারণইবা কি করিয়া করি—আর না শুনিয়াই বা যাই কোথায়? কেষ্ট গ্রামোফোন বাজাইবার জন্য ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল—দুই মিনিটের মধ্যেই পালা সুরু হইল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ" পালা শেষ হইবার পর যথারীতি ভোজন পর্ব্ব সমাধা করিয়া আমরা শয়ন করিবার জন্য পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমি হেমেন্দ্রবাবুকে দু'একদিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব চাঁদমোহন বাবুকে করিবার জন্য বলিলাম। কারণ কলিকাতায় সত্বর না ফিরিলে আমার আবার অফিস কামাই হইবে। তিনিও আর বেশী দিন বৈদ্যনাথে থাকিতে ইচ্ছুক নন বুঝিলাম, কিন্তু চাঁদমোহন বাবু এবং তাঁহার পুত্র সত্যেনের নিকট হইতে ছাড়ান পাওয়া বেশ মুস্কিল হইবে অনুমান করিলাম। চাঁদমোহন বাবুর বাড়ি এখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তিনি কলিকাতায় সব সময়েই কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, এখানে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর দিনগুলি তিনি আমাদের লইয়া বেশ আরামেই কাটাইতেছেন—এখন হঠাৎ আমাদের কলিকাতায় যাওয়ার কথা শুনিয়া তিনি যে কি বলিবেন তাহা আমরা উভয়েই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সাত

শুক্রবার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে; দেখিলাম যে হেমেন্দ্রবাবু ইতিমধ্যেই একাকী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। প্রথম কার্ত্তিকের লতায় পাতায় হেমন্তের শিশির কণা তখন সূর্য্যকিরণে ঝিকমিক করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির সম্মুখে প্রশস্ত বাগানে অগণিত ফুল ফুটিয়াছে। আমি একখানি চেয়ার লইয়া বাগানের মধ্যে বসিলাম—তখন পাশের 'বড়াল বাংলো' হইতে সৎসঙ্গের সভ্যবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীঅনুকুলচন্দ্রকে প্রথম দিনই দূর হইতে দেখিয়াছি—তাঁহার আশ্রমের বিষয়ে ভাল এবং মন্দ অনেক কথাই শুনিয়াছি; কিন্তু আজ তাঁহার ভক্ত নরনারীগণের 'ভজন' আমায় মুগ্ধ করিল। মনে মনে ভাবিলাম এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষে আমাদের ঋষিদের 'অবদান' পৃথিবীর ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রসক্ত জীবনের বহু উচ্চে অনাদি কাল হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাই অন্যান্য দেশ অধিভূতের ভূমি হইলেও, আমাদের ভারতবর্ষ অধ্যাত্মভূমি আর ভারতবাসীর স্বরূপ সেই জন্যই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠ। ভারতের সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা-উপদেশ সব যেন হিমগিরির ন্যায় ধর্ম্মের অটল ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া তখন মনে হইতে লাগিল।

আমি সাধারণ বুদ্ধিজীবি মানুষ হঠাৎ ভোর হইতেই 'ভজন' শুনিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া নিজেই আলোচনা করিতেছি দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম। কিন্তু চিন্তার গতিকে ফিরাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম এই সংসারে পথভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাইতে, সাংসারিক জীবনের উর্দ্ধে অবস্থিত দিব্য-জীবন লাভ করিবার নির্দ্দেশ দিতে সকল দেশে সকল সমাজে যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। এইরূপ মহাপুরুষের চরণে অতুল ধনৈশ্বর্য্য গর্ব্বান্বিত মানুষও যখন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে

সমুদ্ভূত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে পৃথিবীর বাহ্যধন শান্তিহারা জীবকে কখনই আহার্য্য দিতে পারে না। তাই বোধ হয় শান্তি অন্বেষী জীবগণ মহাপুরুষদের চরণে নিজেদের সমর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।

এইরূপ আবোল-তাবোল চিন্তা করিতেছি এমন সময় সত্যেন দুই কাপ চা লইয়া উপস্থিত হইল। দুই জনে চা খাইতে খাইতে অভিনয়ের প্রসঙ্গ আনিয়া, তাহাকে একটু শিশির ভাদুড়ীর ন্যায় অভিনয় করিতে বলিলাম ইচ্ছা ছিল যে তাহার অভিনয় শুনিয়া ধর্ম্মের চক্রবাল হইতে মুক্ত হইব; কিন্তু তাহা আর হইল না। সত্যেন যেমন আলমগীরের অভিনয় সুরু করিল, অমনি কেষ্ট আসিয়া খবর দিল যে বোধিসত্ত্ববাবুর গাড়ি আসিয়াছে এবং চাঁদমোহন বাবু আমায় সেইজন্য ডাকিতেছেন।

আমি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলাইয়া পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম; দেখিলাম যে, হেমেন্দ্র বাবু তখন ভ্রমণ ও জলযোগ শেষ করিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি যাইতেই তিনি বলিলেন যে এতক্ষণ ধরিয়া ঘুমান তোমার শরীরের পক্ষে খারাপ, ভোর বেলা একটু উঠিতে পার না? এই দেখ আমি এর মধ্যে এই স্থান হ'তে 'তিন মাইল দূরে' ধারওয়া নদীর তীরে রোহিণী গ্রামে বেড়াইয়া আসিলাম।"

আমি মুখে আর কিছু বলিলাম না--চাঁদমোহন বাবু তাহার পুত্রেরও বেলায় নিদ্রাভঙ্গের বিষয় বলিতে লাগিলেন; আমি কেবল মনে মনে একটু দেরীতে ঘুম ভাঙ্গার জন্য 'তিন মাইল' পথ হাঁটা হইতে রেহাই পাইয়াছি বলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে একটু কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

বিমলা আমাকে জলখাবার আনিয়া দিল; সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা আর সন্দেশ—সমস্তই খাইলাম। তারপর চাঁদমোহন বাবু, আমি, হেমেন্দ্র বাবু আর কেষ্ট মোটরে উঠিলাম। গাড়ি বাহান্ন-বিঘা আর বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দিকে চলিল। পথে চাঁদমোহন বাবু বোধিসত্ত্ব বাবুর ফুলের ব্যবসায়ের কথা বলিতে লাগিলেন।

গাড়ির মধ্যে হেমেন্দ্র বাবু আমাদের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা চাঁদমোহন বাবুর নিকট তুলিলেন-- কিন্তু চাঁদমোহন বাবু তাঁহার কথায় রাজী হইলেন না। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে কালী পূজার পর আমাদের কলিকাতায় যাওয়া হইবে। কারণ তিনি প্রতিবৎসর কালীপূজা করেন—এ বারে বৈত্তনাথেই সেই কালীপূজা
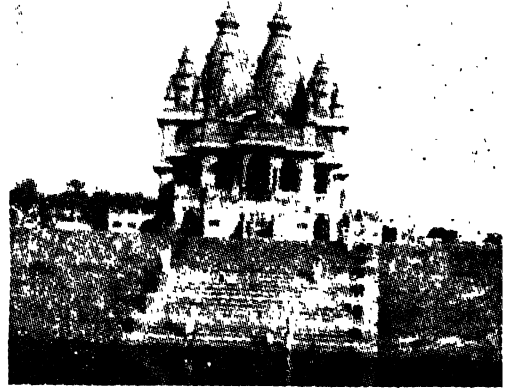
যুগলমন্দির করণীবাদ

হইবে—তজ্জন্য আমরা তাঁহার পূজায় যাহাতে এবার যোগদান করিতে পারি, সেই জন্যই তিনি আমাদের ছাড়িতে নারাজ হইতে লাগিলেন। এই বিষয়ে অনেক কথা হইল—এবং ঠিক হইল যে, পরে আমাদের যাওয়ার দিনটি সকলে মিলিয়া করা হইবে।

'বাহান্ন-বিঘার' সম্মুখে গাড়ি পৌছিল; চাঁদমোহন বাবু আমাদের প্রথমে আশ্রম দেখিয়া পরে বোধিসত্ত্ব বাবুর কাছে যাইবার জন্য বলিলেন। আমরা তাহাই করিলাম, তিনি ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব বাবুর সহিত তাহার কাজ সারিতে লাগিলেন, আমরা তিনজনে তখন শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গেলাম।

আশ্রমের মধ্যে গগনচুম্বি নবনির্ম্মিত প্রস্তরের 'যুগল-মন্দির' দূর হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা যে দরজা দিয়া প্রবেশ করিলাম সেই দরজায় 'রাম-নিবাস' এই কথাটি উৎকীর্ণ আছে দেখিলাম। ইহা পূর্ব্বে স্বর্গীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ বসুর পুষ্পোদ্যান ছিল এবং তিনিই বালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রথম ও প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কাত্যয়নী বসু স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুষ্পোদ্যান

তাহার গুরুদেবকে দেন এবং এইস্থানেই বালানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করেন।

ভিতরে যখন আমরা প্রবেশ করিলাম তখন আশ্রমের ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন এবং বহু নরনারী তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। আমরা মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ দর্শন করিয়া পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরের মধ্যে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর একটি সিংহাসনের মধ্যে গায়ত্রী দেবী ও শিব মূর্ত্তি রহিয়াছে ও তাহার নিম্নে স্বামী পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর একখানি বড় তৈল চিত্র পত্র-পুষ্প ও ধুপ-ধুনায় শোভিত রহিয়াছে। পাথরের বেদীর উপর দুইটি নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"ফনীন্দ্র নাথ বসু ও উমাশশী বসু"

বুঝিলাম যে, ইঁহারাই এইগুলি নির্ম্মাণের বোধ হয় ব্যয় বহন করিয়াছেন।

আশ্রমের মধ্যে এই দেবালয় ব্যতীত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, শ্রীশ্রীবালেশ্বরী অনাথ আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, সদাব্রত ও গোশালা প্রভৃতি রহিয়াছে। এই সমস্ত লোকোপকারক প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে, তজ্জন্য বহু ভক্ত অর্থ দিয়া একটি 'ট্রাষ্ট-ফণ্ড' গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সুপরিচালনার জন্য উক্ত ফণ্ড বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর হস্তে ন্যস্ত আছে।

আমি মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত একটু আলাপ করিলাম; তিনি তখন তাহার গুরুদেবের একখানি সুবৃহৎ আলোকচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি কলিকাতা হইতে এই আশ্রম দর্শন করিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তাহার গুরুদেবের বিষয়ে অনেক কথাই আমায় বলিতে লাগিলেন। মানুষের 'কর্ম্ম' ও 'ইচ্ছা' সম্বন্ধে তাঁহার গুরুদেবের মত এইরূপ ছিল বলিয়া তিনি বলিলেন।

কর্ম্ম সম্বন্ধে

"সেবা হৈ সব সে সেরা,
ধরম হৈ উসকা সার।
নয়ী শক্তি মিলে উসে,
লে জাবে অগুআর"

ইচ্ছা সম্বন্ধে

"ধর্ম্ম যদি চাহো তো,
ধৈর্য্য কো বঢ়াও রে।
ধন যদি চাহো তো
ধর্ম্ম কো বঢ়াও রে।
আনা যদি চাহো তো,
রাম শরণ মেঁ আওরে।
জীনা যদি চাহো তো,
জীবকো রক্ষা করোরে।
ভাগনা যদি চাহো তো,
ভাগ বুরে কর্ম্ম সে।
গা না যদি চাহো তো,
রাম গুণ গাওরে।
নাচনা যদি চাহো তো,
নাচ গোবিন্দ কে পাসরে।"

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিতে লাগিলাম, তাঁহার হিন্দী কথা শুনিয়া তাহাকে অবাঙ্গালী বলিয়া প্রথমে আমার ভ্রম হইয়াছিল, পরে জানিলাম যে তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী শুনিয়া মনটা কেন জানিনা বেশ একটু উৎফুল্ল হইল। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি একজন বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে সুপরিচালিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইলাম। তিনিও আমাকে আবার একদিন আশ্রমে আসিতে বলিলেন।

এদিকে হেমেন্দ্র বাবু তখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় দেখিতে ছিলেন। তাঁহার নিজের কলিকাতায় একটি ঔষধালয় আছে এবং তিনি স্বয়ং একজন কবিরাজ; সুতরাং ইহাতে তাঁহার যে আকর্ষণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা এই স্থান হইতে নব নির্ম্মিত 'যুগল মন্দির' দেখিতে গেলাম। মন্দিরটি বেলুড় রামকৃষ্ণ মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হইল।

এই মর্ম্মর প্রস্তরের বিরাট মন্দির দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ইহা নির্ম্মাণ করিতে শুনিলাম

প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের বংশোদ্ভূত স্বর্গত অক্ষয় কুমার ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চারুশীলা ঘোষ তাঁহার পুত্র যতীন্দ্র কুমার ঘোষের অকালে পরলোকগমনে, তাহার পবিত্র নাম চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের "যুগল-মন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে "যতীন্দ্র-স্মৃতি" এই কথাগুলি লেখা আছে এবং দাত্রীর নাম ও নির্ম্মাণের তারিখ নিম্নোক্তভাবে উৎকীর্ণ আছে :

"যতীন্দ্র-স্মৃতি"

সন ১৩৪৮ শকাব্দী ১৮৬৩

শ্রীচারুশীলা দাস্যা

প্রতিষ্টাপিতম্।

মন্দিরের কারুকার্য্য একটি দর্শনীয় বস্তু, ইহার বাহিরের পাথরগুলি ফিকে লাল বর্ণের পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ভিতরের যাবতীয় পাথরগুলি শ্বেত প্রস্তরের তৈয়ারী বলিয়া ইহার শোভা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতলের সুপ্রশস্ত হলে সহস্রাধিক লোক একত্রে বসিতে পারে এবং তাহার সম্মুখে দুইটি মন্দিরের মধ্যে একটিতে যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ ও তাহার পশ্চাতের দেওয়ালে অঙ্কিত কালীয়দমনের একখানি বৃহৎ চিত্র ; আর একটি মন্দিরে শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর উপবিষ্ট অবস্থায় একটি পূর্ণ্যবয়ব শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। বিগ্রহের গহনাগুলি কলিকাতার প্রসিদ্ধ অলঙ্কারশিল্পী স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ রায়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই মনোরম স্থানটিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতেছি এমন সময় আশ্রমের একজন ভক্তের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন যে, এই স্থানে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ও 'যুগল মন্দির' প্রতিষ্ঠার সময় দেওঘরের বিশিষ্ট ভক্তগণ তথায় বি-এ পর্য্যন্ত পড়িবার জন্য একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের কথা শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই।

তিনি বলিয়াছিলেন, "অঙ্গরেজী ভাষা অধ্যাত্ম ভাষা নহী হৈ। ইস্‌সে হিন্দু শাস্ত্র, বেদ, দর্শন, উপনিষদ্ ঔর পুরাণ জিসমে ধর্ম্ম কী রহস্য ভরী বাতে হৈঁ, উনকী রক্ষা নহী হোগী। উনকী রক্ষাকে লিয়ে সংস্কৃত বিদ্যা কা প্রয়োজন হৈ। ইস লিয়ে সংস্কৃত কলেজ হোনা চাহিয়ে। মেরা কর্ত্তব্য হৈ হিন্দু ধর্ম্মকো পুষ্ট করনা।"

সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এই দরদের কথা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। 'মহাবিদ্যালয়' কেন, ইহাকে সংস্কৃত 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নীত করিবার চেষ্টা বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষের করা উচিত। কারণ তাঁহারা

বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের ব্যায়ামাগার

মন্দিরের জন্য যেরূপ ভবন পাইয়াছেন, উহা কেবল স্থাপত্য শিল্পের উচ্চতম নিদর্শন বলিয়া নয়—উহার নির্ম্মাণে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে, যদি উহাতে অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমার বিশ্বাস বালানন্দ ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য সফল হইবে।

তিনি তাহার গুরুদেবের বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার একটি কথা আমার খুব ভাল লাগিল। তিনি তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে সর্ব্বদা বলিতেন—"হাতে কাম, মুখে নাম আর মনে ধ্যান।" অর্থাৎ কেবল নাম ও ধ্যান করিলেই সব হইবে না, সংসারের অন্য কার্য্যগুলিও যথাযথভাবে করিতে হইবে। এই দিকে আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীদের দৃষ্টি পড়িলে

সত্যিই আমাদের দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিল।

মন্দিরের সন্মুখে সুবৃহৎ একটি পুষ্করিণী 'যুগল-মন্দিরে'র শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে দেখিলাম। শুনিলাম পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় এই জলাশয় স্বয়ং খনন করান এবং ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে যে উৎসব হয় তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পরে শ্রীমতী চারুশীলা ঘোষ পুষ্করিণীর উত্তরের পতিত জায়গা কাটাইয়া ইহার কলেবর আরো বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দুইটি ঘাট ও চাঁদনী তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হইল, কিন্তু কায়স্থ মহিলা নিজ নাম "দাসী" বলিয়া চিরদিনের জন্য খোদাই করিয়া দিয়া নারী জাতি ও তাহার স্বজাতির প্রতি যে ঔদাসিন্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া মনে মনে ব্যথিত হইলাম। তখন স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রের কথা আমার মনে আসিল। একজন কায়স্থ মহিলা স্বামীজীকে পত্র লিখিয়া তলায় 'দাসী' বলিয়া নাম স্বাক্ষর করায় স্বামীজী তাহাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিয়া যেরূপ পত্র দেন তাহা স্ত্রীজাতির চিরদিন স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হইল। কিন্তু আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নিকট হইতে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা কে শুনিবে?

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল; হেমেন্দ্র বাবুও এদিক ওদিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন, কেষ্ট আমার সঙ্গেই ছিল—আর বিলম্ব না করিয়া আমরা আশ্রম ত্যাগ করিলাম। আশ্রমের বাহিরে বোধিসত্ত্ব বাবুর গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গাড়ি করিয়া আমরা 'বাহান্ন বিঘা'য় যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

তিনি আমাদের যত্নের সহিত খুব খাতির করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার বাগানের বিষয়ে বহু চমকপ্রদ গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার বসিবার ঘরের মধ্যে ভারতের বহু বড়লাট এবং বাঙ্গলা ও বিহারের গভর্ণরদের অসংখ্য প্রশংসাপত্র বেশ সুন্দর করিয়া বাঁধান রহিয়াছে। তাহার বাগানের মধ্যে একটি সুন্দর মন্দির রহিয়াছে—তাহাও একটি দর্শনীয় বস্তু বলিতে পারি। তিনি আমাদের লইয়া সমস্ত বাগানখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন এবং আমরাও তাহা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম। এই সমস্ত দেখিতে প্রায় একটা বাজিল; ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কেবল আমি নই, সকলেই বেশ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হইল—অথচ চাঁদমোহন বাবু ও হেমেন্দ্র বাবু এরূপভাবে দেশের বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন যে তাঁহাদের থামান আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইল। কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া, অনেক বেলা হইয়াছে, কেষ্ট ছোট ছেলে বোধহয় ক্ষুধা পাইয়াছে প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের বোধিসত্ত্ব বাবুর কবল হইতে কোন রকমে বাহির করিয়া আমরা গাড়িতে উঠিলাম।

বাড়ি ফিরিয়া খুব তাড়াতাড়ি স্নান আহার সমাপন করিয়া আমি বিশ্রাম করিতে গেলাম। কিন্তু বিশ্রাম করা আর হইলনা; সত্যেন ও জামাইবাবু আসিয়া উপস্থিত হইল—দুপুর বেলা তাহাদের সহিত তাস খেলিতে হইবে। আমি তাস খেলিতে জানিনা বলিলাম, কিন্তু তাহারা উভয়ে নাছোরবান্দা; তাহারা যেমন করিয়া হউক তাস খেলা শিখাইয়া লইয়া আমার সহিত খেলিবে। অগত্যা তাহাদের সহিত তাস খেলিতে বসিলাম। তাস খেলিতে খেলিতে বুঝিলাম যে, তাস খেলা তাহাদের একটা উপলক্ষ্য—আসল কথা আমি কলিকাতায় যাইব বলিয়াছি, সেই জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিবার জন্যই তাহাদের এই কৌশল। আমি তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইলাম, কিন্তু তাহাদের কোন প্রকারেই আমার কথায় মত করাইতে পারিলাম না।

শেষে সত্যেন বলিল যে সে ভাল মাংস রান্না করিতে পারে—তাহার হাতের মাংস রান্না খাইয়া আমার যাইতে হইবে। মাংস অবশ্য ইতিমধ্যে আমাদের তিন দিন খাওয়া হইয়াছে—কিন্তু সে খাওয়া গ্রাহ্য হইল না। অবশেষে স্থির হইল যে, পরশু অর্থাৎ রবিবার সত্যেনের হাতের মাংস রান্না খাইয়া আমরা সোমবার কলিকাতায় যাত্রা করিব।

অপরাহ্নে হেমেন্দ্র বাবুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম, পথে সৎসঙ্গ আশ্রমের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, আমি একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক; আমি অনুকূল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। যদিও তিনি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন না—তথাপি ব্রজেন্দ্র বাবু আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন। হেমেন্দ্রবাবুর শরীর সেদিন বোধহয় খুব ভাল ছিল না, তিনি বাড়ী গিয়া চাঁদমোহনবাবুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন, আর সেই সুযোগে সত্যেন ও আমি সন্ধ্যা বেলায় বায়োস্কোপ দেখিতে চলিয়া গেলাম।

আট

শনিবার সকাল বেলায় সকলে একত্রে বসিয়া চা পান করিতেছি, এমন সময় ব্রজেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে, আজ সারে আটটার সময় শ্রী অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উক্ত সময়ে যাইতে পারিব কি না, তাহাই তিনি ব্রজেন্দ্র বাবুকে দিয়া খবর লইতে বলিয়াছেন। আমার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, সুতরাং আমি ঠিক সময়ে যে যাইব তাহাকে ইহা বলিয়া দিলাম

আমাদের বাংলোর পাশেই 'বরাল বাংলো' এবং সেইখানেই সৎসঙ্গ আশ্রম; এমনকি আমাদের বাংলো হইতে তাঁহাদের আশ্রমের সমস্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আমার তথায় যাইতে কোন রকম অসুবিধাই হইল না। যথা সময়েই আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

ব্রজেন্দ্র বাবু আমার জন্য আশ্রমের সামনেই অপেক্ষা করিতেছিলেন—আমাকে তিনি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে স্থানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানে লইয়া গেলেন। এই স্থানটি 'ভক্তি-আশ্রম' বলিয়া কথিত। ছেচাবেড়ার পাঁচখানি কুঠির, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সম্মুখে ফুলের বাগান এবং সেই কুঠিরের দাওয়ার উপর সাদা ধপধপে বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

তাঁহার পাশে আট-দশ জন অন্তরঙ্গ শিষ্য বসিয়া আছেন। অনুকূল বাবুর সম্মুখে একখানি চেয়ার ছিল—আমি যাইতেই তিনি আমাকে সেই চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আমি নমস্কার করিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলাম। বেড়ার বাহিরে তখন অগণিত লোক আমাদের দর্শন করিতেছে—কারণ আমরা যে স্থানে বসিয়া আছি—তথায় কাহারও তখন আসিবার নিয়ম নাই।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বয়স প্রায় ষাট হইবে—সুঠাম সৌম্য চেহারা—মুখে চোখে তাঁর দিব্য ভাব বেশ প্রকাশিত হইতেছে দেখিলাম। আমি সাহিত্যিক তাহা ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে বোধহয় তিনি শুনিয়াছিলেন —তাই আমি কি কি বই লিখিয়াছি তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। 'হুগলী জেলার ইতিহাস' আমার-ই রচনা তাহা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং ঐ পুস্তক রচনা করার জন্য তিনি আমায় খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি ঐ পুস্তকখানি দেখিয়াছেন এবং অংশ বিশেষ পড়িয়াছেন বলিলেন—এবং তাহাদের আশ্রমের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই খারাপ—কারণ প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তি তাহাদের আশ্রমের এখন পাবনায় পড়িয়া রহিয়াছে, নচেৎ তিনি সৎসঙ্গ গ্রন্থাগারের জন্য উহা ক্রয় করিতেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া আমার যাবতীয় পুস্তক তাহাদের আশ্রমের গ্রন্থাগারের জন্য উপহার দিব বলিলাম।

তারপর তিনি আমায় আমার সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে তাঁহার কি অভিমত তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "ধর্ম্ম মানেই তাই, যাহা আমাদের ধরিয়া রাখে, অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখিয়া বাঁচিবার জন্য, সুখ সুবিধার জন্য, আনন্দের জন্য মানুষ যাহা করে—তাহাই এক কথায় হইল ধর্ম্ম।"

আমি তাঁহার কথায় প্রীত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যদি আমি তাঁহাকে আমার নিজের

বুঝিবার জন্য দু-একটি প্রশ্ন করি—তাহা হইলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন কি-না? তিনি আমাকে যাহা খুসি তাহাই প্রশ্ন করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনার আশ্রমের সুনাম ও দুর্নাম দুই আমি শুনিয়াছি—ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন—দেখিলাম অন্যান্য ভক্ত যাঁহরা বসিয়াছিলেন—তাহারা যেন একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি হাসিমুখেই বলিলেন, "যাহা আপনি শুনিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য। আমার এই 'সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান' ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়। দেশের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, মহামারী বন্যা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ধর্ম্মের নামে অনাচার, সামাজিক অব্যবস্থা প্রভৃতি যে সকল সমস্যা আমাদের হিন্দু জাতির বুকে পাথরের মত চেপে ব'সে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মারছে, তার প্রত্যেকটি আমি সমাধানের চেষ্টা করছি। আমার এই আশ্রমে এখন পাঁচশত নরনারী একত্র বসবাস করেন। তাহারা বিভিন্ন জাতি—বিভিন্ন মন, বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন স্থানে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত আছে, অশিক্ষিত আছে, ধার্ম্মিক আছে, অধার্ম্মিক আছে, সাধু আছে, চোরও আছে। আমি অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করবার চেষ্টা করি, চোরকে সাধু করবার চেষ্টা করি। একবার এইস্থানে একজন অতিথি এসেছিলেন—তাহার সোনার হাতঘড়ি চুরি হ'য়ে যায়। অবশ্য আশ্রমের লোকই তা চুরি করে, আমি যে ঘড়ি চুরি করেছিল তাহাকে উহা ফেরৎ দিবার কথা বলি। এবং বলা বাহুল্য যে চোর সেই ঘড়িটি ফিরিয়ে দেয়। এখন ধরুন ঘড়ি না পেলেই আশ্রমের বদনাম হ'ত।

তারপর একত্র বসবাসের ফলে যদি কোন নর-নারীর সহিত কোনরূপ ভালবাসা হয়, আমি তা কি ক'রে রোধ করতে পারি? আমি তখন তাহাদের বিবাহের উপদেশ দিই।

মেয়েরা যদি স্ব ইচ্ছাতে
সৎবরেই না করে বিয়ে,
কার বৌ কার ঘরে যায়
ঠিক পাবি কি দিয়ে?

মেয়েরা যদি পছন্দ ক'রে বর মনোনীত ক'রে নেয়, তা হ'লে জীবন তৃপ্তির হবে। আর যদি কোথাও পছন্দের একটু ভুলও হয়, তা হলেও বিবেক যতদূর সম্ভব ভাল ভাবে জীবন কাটাতে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু এখনকার মতন ঘটীদান, গাড়ুদান গোছের বিবাহে অপছন্দের ক্ষেত্রে সে প্রেরণা কখনই আসতে পারে না।"

তিনি যাহা বলিলেন, আমি তাহা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দাস এম-এ সৎসঙ্গের 'ঋত্বিক' দেখিলাম যে তিনি আমাদের কথা-বার্ত্তাগুলি সমস্তই 'শর্ট হ্যাণ্ডে' নোট করিতেছেন। আমি আশ্রমের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। একজন ভক্ত তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছিল—একজন ভক্ত ঝাড়ন লইয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল, একজন ভক্ত ডাবর লইয়া বসিয়াছিল, আর একজন ভক্ত ঘটি করিয়া জল লইয়া বসিয়াছিল দেখিলাম। তিনি একবার এক টুকাসিলেন—তখনই থুথু ফেলিবার জন্য ডাবর তাহার সামনে আসিয়া গেল, গামছা আসিল; ভক্তদের গুরু-ভক্তি দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

অন্যান্য প্রশ্নোত্তর গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিয়ে দিলাম:

প্রশ্ন:—আমাদের এখন করণীয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর:—আমাদের চাই common Ideal এ সংহত হওয়া—আর পারিপার্শ্বিকের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হ'য়ে সকলকে তুলে ধরা—কারণ পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে কারুর বাঁচা সম্ভব নয়। আমরাও সহস্র লোক refugee—কিন্তু common Ideal ধ'রে পরস্পর interested বলে তত suffer করতে হয় নি—সবাই নেংটে হওয়া সত্বেও, এখানে কতজন কত রকম চরিত্রের আছে, চোর বাটপাড়ও আছে—কিন্তু অন্যায় ক'রেও আবার অনুতপ্ত হ'য়ে স্বীকার করে।

আমরা গরু, কুকুর, ঘোড়া, ধান, পাট, সবটার চাষ করি, কিন্তু মানুষের চাষ যদি না করি, মানুষের জৈবী সংস্থিতি যাতে ভাল হয় তেমন eugenic adjustment যদি না করি ত হবে না, street dogএর মত হ'য়ে ঘুরব। প্রতিলোম বিবাহে সন্তান বিশ্বাস ঘাতক হবেই—সে হয়ত

এক টাকা চার আনার জন্য betray করবে। কুলিনের মেয়ে মৌলিককে দেওয়া ঠিক নয় ওতেও fim প্রতিলোম হয়। আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে আদর্শ ও কৃষ্টির পথে না চলি অন্যের খোরাক হ'য়ে পড়ব।

প্রশ্ন- আমাদের বাঙ্গালীদের একতা নাই—স্বার্থপরতা এত—এর উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলের বাপমার উপর, ছাত্রের শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা নাই—Idealকে মানা নাই—Ideal মানে শুধু ভাব নয়—একটা জীবন্ত মানুষ যার মধ্যে সর্ব্ব পরিপূরণী ভাবধারা মূর্ত্ত—যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের মত মানুষ—তেমন আদর্শে আমরা যত Concentric হ'য়ে উঠব—ততই আমরা integrated হব।

প্রশ্ন - এই ভাবধারা পাবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় মহাত্মাজী যেমন propaganda করেছেন তেমনি কাগজে নিত্য propaganda করা দরকার।......

সতীত্ব একদিন আমাদের মেয়েদের পরম সম্পদ ছিল—ঘরে ঘরে 'সাবিত্রী ব্রত' করতো—সতীত্বে নিষ্ঠা আজ antianated হ'য়ে গেছে। আজ এমন দিন এসেছে—হয়ত office থেকে ঘরে গিয়ে দেখা যাবে বৌ কার সঙ্গে চলে গেছে। আজকাল মেয়েদের স্বাধীনতা বোধ জেগেছে স্বামীকে বাদ দিয়ে—কিন্তু সেটা যে insulting তা' বোঝে না—তাদের স্বাধীনতাই যে স্বামীকে নিয়ে এই কথাটা মাথায় ধরে না। কয়েক শ' বছর আগে, বাংলা, বেহারে মুসলমানের সংখ্যা নাকি ছিল মাত্র ৩২,০০০, আজ তা' কোটী কোটী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—আমরা হ'য়ে গিয়েছি minority। আমাদের female তাদের ঘরে নিয়ে তাদের breeding medium ক'রে তুলেছে। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যদি প্রচলন থাকতো তবে ফল হ'তো এর উল্টো, আমাদের numerical strength-এর কমতি হতো না সমাজও এক গাট্টা থাকতো—ভাল মানুষের অভ্যুদয় হ'তো। তারপর মেয়েদের স্খলন পতন হ'লে তাদের যে অঙ্গীকার করে নিতে পারি না পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করে—সেও আমাদের দোষ। বের ক'রে দেওয়াই রেওয়াজ হয়েছে।

আমাদের মাথা এখনও তাজা আছে—কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে এখনও ফিরে দাঁড়ালে কি যে হয় বলা যায় না—আমাদের আলোকে সমস্ত জগৎকে আলোকিত করতে পারি।

প্রশ্ন—আমাদের শিক্ষা প্রথাকে mould করা লাগবে ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টির উপর দাঁড়ান লাগবে, ছেলেদের শ্রদ্ধা জাগান লাগবে—শিক্ষাকে practical ক'রে তুলতে হবে—শুধু theoratical training নয়—সত্যিকার বিদ্বান ক'রে তুলতে হবে শুধু লেখা-পড়ার উপর জোর না দিয়ে।

প্রশ্ন—সবর্ণ বিবাহই ত রীতি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বিধি মনু এবং অন্যান্য সংহিতার ভিতর আছে। আমরা ছোটকে বড় ক'রে তুলতে চাই—বড়কে ছোট নয়। মেয়ে সব সময়ই বড় ঘরে দিতে হয়—সমান সমান হ'লে হাম্ ভি মিলিটারী তুম ভি মিলিটারী এই রকম ভাব হয়। আরো আমাদের ঘটক system ছিল—কোন মেয়ের সাথে কোন ছেলের বিয়ে হ'লে, পর পর কেমন সন্তান হবে তাও তারা দেখতে পারত। ঘটকরা আবার পিছনে লেগে থাকতো—যাতে প্রত্যেকটি couple married life সব দিক থেকে successful হয়।

প্রশ্ন—Doury systemটা উঠিয়ে দেওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কোন movementই নেই against dowry, সে idea propagate করতে হবে। এত রকম আইন করি—dowry system-এর against এ যে কোন আইন করি না তার কারণ আমাদের নিজত্ব ও বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে দিতে চাই।

প্রশ্ন—আপনার কি ধারণা আপনার মত ও পথ অনুসরণ করলেই সব ঠিক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি তাই—আমি ত তাই করবো। শুড়ি সে ত বলবে আমার মদ ভাল।

বর্ণ সম্বন্ধে কথা উঠলো—

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের inherent instrictকে abolish ক'রে উন্নতি করতে পারব না। গীতায় আছে 'সধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—এটা বাদ দিলে সম্ভাব্যতা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম। তিনি পুনরায় আমায় আসিতে বলিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে ভবিষ্যতে যদি কখনও দেওঘরে আসি, আমি যেন তাঁহার আশ্রমের অতিথি হই। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম; তিন চারজন ভক্ত আমার সহিত বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিলেন। তাহাদের ব্যবহারে আমি খুব আনন্দিত হইলাম।

বাড়ীতে আসিতেই চাঁদমোহন বাবু হেমেন্দ্র বাবু আমার ঠাকুর দর্শন ও ঠাকুরের সহিত কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের নিকট সমস্ত বলিয়া স্নানাহার করিয়া দুপুর বেলায় বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন রবিবার সত্যেন মাংস রান্না করিল—সকলে খুব আনন্দ করিয়া খাইলাম। কিন্তু কাল সোমবার আমরা চলিয়া যাইব বলিয়া দেখিলাম বাড়ীর সকলেই বেশ একটু বিমর্ষ হইয়াছেন। চাঁদমোহন বাবুর মা কালী পূজার সময় আবার আমাদের আসিতে বলিলেন। সত্যেন, কেষ্ট, কমলা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমলা, রেণুকা, শীলা, লীলা প্রভৃতি চাঁদমোহনবাবুর পুত্র কন্যাগণ সকলেরই সেই এক মত যে আবার আমরা যেন কালীপূজার সময় পুনরায় আসি। কিন্তু পনের দিন পরে আবার কলিকাতা হইতে আসা কি করিয়া সম্ভব?

এত লোকের কথা ঠেলিয়া অবশেষে সোমবার (৩০শে অক্টোবর ১৯৫০) বৈদ্যনাথের নিকট বিদায় লইতে হইল। সোমবার নয়টার মধ্যেই আমাদের জন্য সমস্ত রান্না হইয়া গেল—দশটার সময় আহার করিয়া আমরা যশিডি ষ্টেশনের দিকে গাড়ি করিয়া চলিলাম। এক মাস পরেই আবার চাঁদমোহন বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত কলিকাতায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, তথাপি বিদায়ের সময় বিচ্ছেদের যে করুণ দৃশ্য সেখানে অবতরণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমার লেখনী সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে চাঁদমোহন বাবুর চার বছরের ছোট মেয়ে শীলা যখন আধো আধো স্বরে কালীপূজায় আসবেন এই কথাগুলি গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, তখন আমি কেবল মনে মনে বলিলাম—'ছোট বোনটি আমার, আমার প্রয়োজনের সময় অনেক মিথ্যে কথাই বলি—সব মিছে ক—কালীপূজার সময় আর আমরা আসব না।'

সমাপ্ত

জিজ্ঞাসা

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

চারিদিকে সেনানী শিবির
এ পৃথিবী ঘেরা রণাঙ্গণ,
জাগে রুদ্র প্লাবন রুধির
হেথা ক্ষুব্ধ প্রাণের ক্রন্দন;
সন্ধিক্ষণে জন্ম বুঝি তার
আগুনের দীপ্তশিখা লয়ে,
শূন্যপথে নেমে এল কার,
তালে তালে তাণ্ডব প্রলয়ে।
বহ্নিশিখা নেভেনিক ভাই,
দিকে দিকে আজো লেলিহান,
মত্ততায় মেতে ওঠে তাই,
অবিরাম কঙ্কালের গান;

বাঁচিবার বিফল প্রয়াস
ব্যর্থ হেথা হবে কি সফল?
সবলের তীব্রতম আশ
শোষণেতে জীবন দুর্ব্বল?
প্রতীক্ষায় মানুষ নিশ্চুপ
সহে ব্যথা জ্বালা অভিশাপ,
খনিগর্ভে কয়লার স্তূপ,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমিছে উত্তাপ।
জিঘাংসা, স্বার্থের তৃষা
দিকে দিকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত,
কাটিবে কি এ তিমির নিশা,
লয়ে দীপ্ত জীবন প্রভাত?

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

(নগরবাসিগণের প্রবেশ)

বিষ্ণুপদ—ও হে পতিতপাবন—হরিদয়াল—রামলোচন তোমরা সব চল্লে কোথায় ? একটু দাঁড়িয়ে যাও না—বড় ব্যস্ত সমস্ত দেখ্‌ছি যে।

রামলোচন—কেন ? কেন ? শোননি বুঝি ? এতবড় ব্যাপারটা শোননি বুঝি ? যাক্—সারা সহরটা হৈ হৈ পড়ে গেল—আর তুমি বেমালুম্ কিছু জান না ?

হরিদয়াল—আরে বিষ্ণু একটু খবর রেখো। সহরে বাস—একটু খবর রেখো। চলহে সময় নেই অনেক কাজ।

পতিতপাবন—এত বড় ব্যাপারটা যে এতক্ষণ জানে না—তাকে থাকতেই দাও না ভাই যেমন আছে তেমন করে। তাজ্জব করলে বিষ্ণু আরে তুমি বনে যাও। আমাদের কাজে আর বাধা দিও না—সে অনেক কাজ।

বিষ্ণু—ভায়ারা সব ! অনেক কিছু ত বল্লে কিন্তু কি তাতো বল্লে না। গৃহদাহ—শবদাহ—না অন্তর্দাহ—বলি ব্যাপারটা কি ?

তিনজনে—(মুখে হাত দিয়া) চুপ্।

বিষ্ণু—কেন ? তোমরা তিনজনেই দেখি রাজার রাস্তা দিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে ছুট্‌ছো—আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি—আমিও পেছু নেবো না কি ?

পতিত—আরে তাই বল না- পেছু কেন আগে চলো না দাদা—বলি সব শুনলে তো—সব ঠিক আছে তো—চল চল ব্যস তবে আর কি ?

বিষ্ণু—দেখ তোমরা ভাই—কিছু মনে ক'রো না—তোমরা এক একটি ঘানির গরু—চোখে সাতপুরু কাপড় বাঁধা—খালি পাকই খাচ্ছ।

হরি—কি বল্লে—গরু ?—ঘানিটানা গরু ? এই শুভ-দিনে রাজ্যের এত বড় আনন্দের দিনে বল্লে যে—

পতিত—চোখ বাঁধা বলদ—

রাম—তা'হলে তুমি কি ? বল্‌তে হবে ছাড়ছি না—হা হা কেমন ধরেছি—এই নিজের ফাঁদে নিজে পড়ো।

বিষ্ণু—তাইতো এ তো বড় মুস্‌কিলে পড়লুম—(চারিদিক চাহিল) (কুনালের প্রবেশ) আরে এ কে ? ওহে ছোকরা শোন—শোন—আরে তোমার পায় নৃত্য একটু থামাও ভাই—

কুনাল—কি ? গাইব ? আচ্ছা শোন—

(গান)

(আমি) গাহি গান মনের আনন্দে
নৃত্য করি নূতন ছন্দে—

বিষ্ণু—আরে না না—একটু—

কুনাল—গানও শুনবে—নাচও দেখবে—দুই—আমার ওতে কষ্ট হয় না—

(কুনালের নৃত্য ও গীত)

(আমি) গাহি গান মনের আনন্দে
নৃত্য করি নূতন ছন্দে—
পাখী গান গায় শোনায় আমায়
নদী গেয়ে গান নেচে চলে যায়
আর আমি গান গেয়ে যাই মনের আনন্দে।

কুনাল—(গান শেষ করিয়া) আচ্ছা বল্‌তে পারো—আমার বোনের বিয়ে তাতে আমার এত আনন্দ কেন ? তাও জঙ্গলে দেখা হয়েছিল—সে বল্লে "ভাই" আর আমি ডাক্‌লুম "দিদি"—এই যা। তারপরে হ্যাঁ একদিন তাকে বাঘের মুখ থেকে আর সে আমাকে সাপের মুখ থেকে বাঁচানর ব্যাপার। তাতেই এত। আর—আর একদিন নয় ঝরণার ধারে বসে বসে পাখীগুলোকে জল

খাইয়েছি—আর আর মনে নেই। অমনি এতদিনের বন ছেড়ে পাহাড় থেকে নেমে নগরের রাস্তায় নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছি—আমার] আনন্দ হচ্ছে—দিদির বিয়ে রাজার সঙ্গে।

বিষ্ণু—(সোল্লাসে) ওরে! পতে! খালি ঘুরছো আর ঘোরাচ্ছ—আমাদের রাজার বিয়ে—

পতিত—হ্যাঁরে দাদা—

বিষ্ণু—আমোদ, আহ্লাদ, বাজী, বাজনা, খাওয়া দাওয়া, নাচ গান। হ্যাঁ ভাই, খাবারের দাম দিতে হবে না—কি বলিস্? বড় মজা ভাই! ভাই, আমার যে কিছু হয়নি—কাপড়-চোপড় সাজা-গোজা।

কুনাল—আরে আগে আনন্দ করো—

(নগর পালের প্রবেশ)

নগরপাল—ওহে! তোমরা এখানে কি কোরছো?

পতিত—একটু আনন্দ চাঁকছি।

নগরপাল—কি ব্যাপার?

পতিত—আজ্ঞে। বড় 'আনন্দ বাজার'—রাজার বিয়ে—খাওয়া দাওয়া নাচ গান—আমরা মজা লুটবো—এখন একটু চেঁকে নিচ্ছি।

নগরপাল—ও সব বন্ধ—রাজাদেশ। আমোদ, আহ্লাদ, কিছু হবে না। যাও যে যার ঘরে। বিয়ের সাতদিন বাদে দরবারে সকলে হাজির থাকবে।

বিষ্ণু—সব বুঝলুম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? বিবাহ—

নগরপাল—তাও বলছি—বিবাহ হবে সপ্তাহ পরে। সর্দ্দার দীননাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাই তোমাদের রাণীমা হবেন। এইবার তোমরা যেতে পারো।

(কুনাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নগরপাল—কিহে বালক! তুমি গেলে না?

কুনাল—তাইত ভাবছি।

নগরপাল—কি ভাবছো?

কুনাল—আমি এখন কোথায় যাই। নাচ গান তো বন্ধ হলো কিন্তু ও-দুটো যে আমার না হলে চলে না। দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আচ্ছা, যদি ভুলে নেচে গেয়ে ফেলি তা হলে সাজা হবে?

নগরপাল—নিশ্চয়ই।

কুনাল—ধরে নিয়ে যাবে? মারবে?

নগরপাল—রাজার বিচারে যা হবে তাই। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমার অনেক কাজ।

(প্রস্থান)

কুনাল—ভারিত দিদি। ওঃ উনি হলেন রাজার রাণী—আর আমার নাচ গান বন্ধ। একবার তোমাকে কাছে পাই—

(অভিমানভরে প্রস্থান)

[ক্রমশঃ]

সম্পাদকীয়
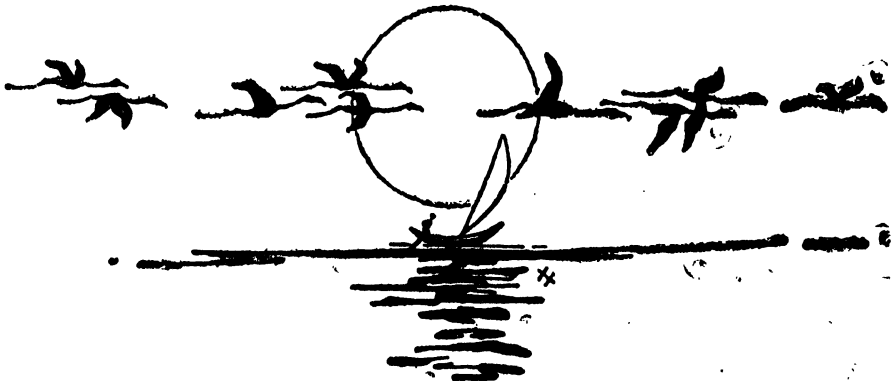
পণ্ডিত নেহরু ও আচার্য্য টেণ্ডন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস অনুমোদিত স্বাধীন ভারতের মন্ত্রী-সভার অধিনায়ক এবং আন্তর্জ্জাতিক বিভাগ সম্পূর্ণ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। আচার্য্য টেণ্ডন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহাসভার প্রেসিডেণ্ট আর ব্রিটিস সরকার কংগ্রেসের হাতেই কর্তৃত্ব ভার দিয়াছেন। উভয়েই ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে এক সঙ্কটময় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পণ্ডিতজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পদ হইতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেস-সেবী, বহুবার জেলে গিয়াছেন, ৩।৪ বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন এবং ভারত ও ভারতের বাহিরের সমস্ত লোক তাঁহাকেই কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া জানে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য করিতেন। এদিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষ হইতে অনেক বড়, সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান মানিতে সমগ্র কংগ্রেসসেবিগণ (যিনি যত বড়ই কেন হৌন না) একান্ত বাধ্য। পণ্ডিত জওহরলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (All India Congress Committee) এবং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটিরও সভ্য। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার কথা। একতন্ত্রতা কাহারও পক্ষেই শোভনীয় নয়। বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান মানিয়া চলিতে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী বাধ্য। পণ্ডিত জওহরলাল এখনও মনে করেন, কংগ্রেসের মত এত বড় প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয় নাই, আর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ আস্থাবান। সুতরাং এদিকে বাহ্যতঃ কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু গোলমাল ভিতরের।

গত ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট হইতে কংগ্রেস শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ৪ বৎসর অতীত হইল, কংগ্রেসই গণপ্রতিষ্ঠান হিসাবে মন্ত্রীদের সহায়তায় দেশ শাসন করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও প্রায় এক বৎসর শাসনতন্ত্র ইঁহাদের হাতেই ছিল বলা চলে, কারণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, শ্রীরাজাগোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, ৺শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, এই কয়বৎসরে কংগ্রেস সরকার কোনরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

যাহাহউক, এখন পণ্ডিত নেহরু এবং আচার্য্য টেণ্ডনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সম্বন্ধে পাঠকের নিকট কিছু আভাষ দেওয়া সঙ্গত। পণ্ডিত নেহরু মন্ত্রীসভার প্রেসিডেণ্ট, তিনি মনে করেন, "আমরা দেশ শাসন করিব, ভালমন্দ সব আমাদের হাতে। কংগ্রেসকে অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি এমন কি প্রেসিডেণ্টেরও আমরা কি তোয়াক্কা রাখি? আমরা যে কাজ করিব, সে কাজ কংগ্রেস অনুমোদন করিবে মাত্র; এইটুকুই কংগ্রেসের কাজ, কারণ আমরা তো কিছু অন্যায় করিতেছি না, বা দেশটাকে ডুবাইয়া দিতেছি না। আর তাই আমাদের নির্দ্দেশিত কাজের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে অতো কৈফিয়ত দেওয়া সম্ভব নয় ইহাতে জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া যাইবে।" এদিকে প্রেসিডেণ্ট মনে করেন, "মন্ত্রীদের অনুষ্ঠিত যাহা কিছু অন্যায় অভিযোগ, সবারই যেন দায়িত্ব আমাদের। অপরাধ করিবে মন্ত্রীরা, দোষী সাব্যস্থ হইবে কংগ্রেসকর্ম্মীরা, সুতরাং অনেক বিষয়ে যদি ওয়ার্কিং কমিটি কোনরূপ নির্দ্দেশ দেয়, তবে মন্ত্রিগণের তাহা অমান্য করা উচিত নয়।"

আমরা দেখিতেছি—যেমন কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের অভিযোগ বিনা কারণে হয় না, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মধ্যেও অনেকে মন্ত্রীদের অপকার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন। এই অবস্থায় যদি ডক্টর পাট্টাভাই সীতারামিয়ার মত মন্ত্রীদের মত পোষণ-

কারী নেতা সভাপতিরূপে বৃত হন, তবে বিশেষ কোন গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট যদি স্বাধীনচেতা হন, তবে তিনি একেবারে মন্ত্রীদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে চাহিবেন না। তিনি হয়তো বলিবেন, "তোমরা কি এতই সাধু যে সিজারের স্ত্রীর ন্যায় সন্দেহের বাইরে? তবে আমি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আমি চক্ষুষ্মান হইয়াও চক্ষু বুজিয়া থাকিব কেন?" ইহাই আসল এবং মূলনীতিগত পার্থক্য, তবে ইহার প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা যে মন্ত্রীমণ্ডলীর একতন্ত্রতা তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মনোভাব ছাড়া আরও কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট এবং পণ্ডিত নেহরুর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। দেশ বিভাগ বিষয়ে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত মতদ্বৈধ বলিয়া তাঁহার নির্ব্বাচণের পর পণ্ডিতজী অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের সম্বন্ধেও উভয়ের মনোভাব সমান নয়। টেণ্ডনজী বলেন, মুসলমানরা যখন ভারতবাসী, তখন তাহারা ভারতের অমুসলমানদেরই সমান সুবিধা পাইবে, কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে তোষণনীতির তিনি পক্ষপাতী নহেন। বাস্তুহারাদের সম্বন্ধেও তাঁহার মত এই যে, দেশবিভাগ যখন রাজনৈতিক প্রয়োজনে হইয়াছে এবং পাকিস্তানের হিন্দুগণ যখন ছন্নছাড়া, গৃহহীন, সহায়-হীন, তাহাদের ব্যবস্থা রাজ্যের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। খাদ্যাদির কণ্ট্রোল এবং মুদ্রামান সম্বন্ধেও তিনি পণ্ডিতজীর সহিত একমত নহেন। উপরোক্ত বিষয়াদিতে আচার্য্য টেণ্ডনের মত সর্ব্বতোভাবে সমর্থন যোগ্য। এদিকে জওহরলালজী যে মুসলমানদের প্রতি সমনীতির নামে (যাহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট মত) তোষণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দিল্লী-চুক্তি বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে মনে করিয়া গত বৎসর দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেও তিনি উহার বাস্তবতা বিশ্বাস করেন নাই, বরং তাঁহাদের উপর রূঢ় বক্তব্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন যদিচ দিল্লী-চুক্তির অবমাননার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এমনকি মাইনরিটি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ও পণ্ডিতজীকে জানাইয়াছেন যে দিল্লী চুক্তি পাকিস্থান কর্তৃক সংরক্ষিত হয় নাই, আর অন্যান্য মন্ত্রীরাও এবিষয়ে প্রায় একমত, তথাপি তিনি একটুখানি প্রতিবাদ করিয়াই যেন খালাস হইয়াছেন, কোনরূপ পুষ্ট মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন না। কাশ্মীর সম্বন্ধেও তাঁহার মনোভাব বর্ত্তমানে জোড়ালো হইলেও উপস্থিত বিপর্য্যয় যে তাহারই সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতি-সঙ্ঘের নিকটে অযাচিতভাবে বিচারপ্রার্থী হইয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত কতদিন অমান্য করিতে পারিবেন এবং অমান্য করিলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহার সম্মুখীন হইবার শক্তি ও সাহস তাহার আছে কি না, তাহার প্রমাণ না পাইয়া কাশ্মীর ব্যাপারে আমরা তাঁহাকে পূর্ব্ব কার্য্যের জন্যই বর্ত্তমানে সমর্থন করিতে পারিনা। চীন তিব্বত প্রভৃতির কথা এখন নাই তুলিলাম।

যাহা হউক, তথাপি আমাদের মত এই যে, টেণ্ডনজী যখন বার্দ্ধক্যে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আর পণ্ডিতজীর ব্যক্তিত্ব খুবই বেশী, তিনি খুব পরিশ্রম করিতে পারেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী এবং গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় কোনরূপ ক্লান্তিবোধ নাই, বরং দক্ষতাই আছে, এমতা-বস্থায় দেশের জনসাধারণ পণ্ডিত জওহরলালের ওয়ার্কিং কমিটি হইতে অপসরণ কখনও স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিবে না, বরং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু লোক কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইবেন। বিশেষতঃ টেণ্ডনজী যতই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হউন না কেন, সকলেই তাহার দৃষ্টিভঙ্গিকে অমননীয় মনোভাবের রূপান্তর মনে করিয়া অন্যায়ভাবে সমস্ত দোষ তাঁহার স্কন্ধেই ফেলিবেন। এমতাবস্থায় আমাদের মত টেণ্ডনজী আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পণ্ডিত জওহরলালের পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করিবেন এবং বোধহয় নিজেরটাও উপস্থিত করিবেন, তখন সভ্যগণ পণ্ডিতজীর পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর না করিয়া যদি টেণ্ডনজীর পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর করেন, তবেই বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে সমীচীন ব্যবস্থা হয়। এবং এরূপ হইলে টেণ্ডনজীও মানে মানে অবসর লইতে পারিবেন। যে কারণে আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন অবস্থায়ই

কোন প্রেসিডেন্ট থাকিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না, যদি তিনি প্রধান মন্ত্রীর সম্পূর্ণ সমর্থক না হন। আজ হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রমুখ মন্ত্রীরাও কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভার আজ্ঞাবহই করিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু এ কথাও উপেক্ষা করিবার নয় যে, দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কংগ্রেসের কর্ম্মীদের যত বদনামই হোক না কেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন এই জন্য মন্ত্রীরাই সমধিক ভাবে দায়ী। অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে জুলাই মাসে মহাত্মাজী প্রতিষ্ঠিত হরিজন পত্রিকায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীকিশোরী লাল মাসরুওয়ালা প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন—

"Several Ministers occupying the most important portfolies 'at the centre and in the States must be spending the major part of their time, intelligence and energies not in the discharge of their ministerial duties but in these nasty, manoeverings.

এই অবস্থায় একদিকে কংগ্রেস কর্ম্মীদের শোধরানো যেমন আবশ্যক, মন্ত্রীদিগকেও শোধরানো বিশেষ দরকার সুতরাং টেণ্ডনজী অবসর গ্রহণ করিলে পণ্ডিতজীকে কংগ্রেস এবং মন্ত্রীমণ্ডলী উভয়কেই শোধরাইতে হইবে। এমতাবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল যদি মন্ত্রীমণ্ডলী এবং কংগ্রেস উভয়েরই একনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তবে আর তাঁহাকে কোন বিষয়ে কাহারও নিকটে বাধা পাইতে হইবে না। তখন তিনি অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই টিঁকিয়া যাইবেন, না পারিলে অথবা অন্যভাবে চালাইলে লোকের সমর্থন পাইবেন না। যদি দুইটি কাজই একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব না হয়, তবে তাঁহাকে কংগ্রেসেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অন্য লোকের হাতে মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে। মন্ত্রিগণ তাঁহার নির্দ্দেশমতই কাজ করিবেন। এরূপ করিলে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা নানাভাবে বাড়িবে এবং সার্ব্বভৌমত্বও থাকিয়া যাইবে। মন্ত্রিগণও সংশোধিত হইবেন, কংগ্রেস কর্ম্মীরাও তাঁহার অধিনায়কত্বে ভালই হইবে। পাকিস্থানে মুসলীম লীগ এবং গভর্ণমেণ্টের ভার যেমন জনাব লিয়াকত আলীর উপরে, কংগ্রেস এবং গভর্ণমেণ্টেরও অধিনায়কত্ব পণ্ডিত জওহরলালেরই হওয়া উচিত। আমরা টেণ্ডনজীকে সমর্থন করিয়াও এইরূপ অবস্থার অর্থাৎ জওহরলালজীকে সর্ব্বাধিনায়ক করিবার কেন পক্ষপাতী,তাহার কারণ বুঝাইয়া বলিতেছি। দেশের লোকের নিকট পরিস্ফুট হওয়া দরকার, কাহাদের দোষে দেশের লোকের এত দুর্দ্দশা, কেন তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন ছন্নছাড়া, কেন তাহাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আচার্য্য কৃপালনী তো কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিতেছেন। আমরা চাই দেশের লোকও কে দোষী বুঝিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুক। নেহরুজী কংগ্রেস ও মন্ত্রী মণ্ডলীর সব ভার নিলেই তাহা বুঝিবার পক্ষে সম্ভব হইবে।

এখন যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বলেন টেণ্ডনজীকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট রাখিতেই হইবে, তবে একমাত্র পন্থা এই যে মন্ত্রীমণ্ডলীকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি কেবল সেবাব্রতে এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে তৎপর থাকুক। তাহা হইলে কংগ্রেসের সুনাম থাকিবে। এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান নষ্ট না হইয়া গঠনমূলক কার্য্য করিয়া দেশকে উন্নতির পথে সমধিকভাবে অগ্রসর করাইয়া দিবে। তবে যাহারা কর্ম্মযোগী ত্যাগী পুরুষ তাহারাই কেবল এ কাজে অগ্রসর হইবেন। বেশী লোক অগ্রসর হইবেন কিনা সন্দেহ। গান্ধীজী তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় মহাপ্রস্থানের দুইঘণ্টা পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন—

"For these and similar reasons, the A.I.C.C resolves to disband the existing Congress Organisation."

কিন্তু আমাদের মনে হয় সাতমণ তেলও পুড়িবেনা রাধারও নৃত্য সম্ভব হইবে না। তথাপি আমাদের বক্তব্য-গুলির সারমর্ম্ম একবার বর্ত্তমান সমস্যায় উপস্থিত করিতেছি।—

(১) মত পার্থক্যের জন্য টেণ্ডনজীকেই অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া পণ্ডিত নেহরুর প্রতি কংগ্রেসের সার্ব্বভৌমত্ব প্রদান করা উচিত। তিনি হয়তো নিজে নিতে চাহিবেন না, তাঁহার অনুগত কোন প্রেসিডেণ্টের

কাজ করা উচিত এইভাবে কাজ হইলে যদি পণ্ডিত নেহরু দেশের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনিই বরাবর নেতা থাকিবেন। আর যদি দেশের লোকের দুর্দ্দশা সমানই থাকে অথবা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেশই আবার তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইয়া উঠিবে।

(২) যদি টেণ্ডনজীকে প্রেসিডেন্ট রাখাই ঠিক হয় তবে কেবল গঠন মূলক কার্য্য ও সেবাব্রতই তাঁহার হাতে থাকিলে ভাল হইবে। কোন নির্ব্বাচন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বা সংশ্লিষ্ট হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাতে কংগ্রেস কর্ম্মীরা রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং প্রথমটিই চলিবে। এবং সেই ভাবেই দেশের লোকের সচকিত হইবার সুযোগ হইবে। কিন্তু নেহরুজী মন্ত্রী-মণ্ডলী এবং কংগ্রেস শোধরাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। উপসংহারে গান্ধীজীর কথাই সত্য হইবে, দেশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়াই সমীচীন ব্যবস্থা মনে করিবে। পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিয়া আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কিন্তু আবার বলি কংগ্রেস যেন গঠনমূলক কার্য্য লইয়াই থাকিতে রাজী হয়। নতুবা উহার অস্তিত্ব থাকিবে না।

"নবরূপায়ন" কর্ত্তৃক 'সাজাহান'

গত ১৩ই জুলাই শুক্রবার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নব রূপায়ন নাট্য শিক্ষায়তন কর্ত্তৃক স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সর্ব্বজনাদৃত নাটক "সাজাহান" সমারোহের সহিত অভিনীত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নাট্যশালার বিশ্বকোষের ভারতীয় নাট্যকলার ইতিহাস লেখক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন এবং 'যুগান্তর' সম্পাদক-শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভাপতি ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দেশের নাট্যকলার এবং নাট্যকারগণের ইতিহাস সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ভারতীয় নাট্যকলা আমাদের দেশে কিরূপে পাশ্চাত্য দেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নবভাবে উহার প্রবর্ত্তন করেন তাহা সবিস্তারে বিবৃত করেন এবং তিনি আরও বলেন যে, নাটক ও নাট্যশালার মধ্য দিয়া জনশিক্ষা যে ভাবে প্রচার করা যায়, তাহা আর অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়।

প্রধান অতিথি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—"পৃথিবীতে আমরা সকলেই অভিনয় করিতেছি। কেহ বা ব্যবসায়ীর অভিনয়, কেহ বা সাংবাদিকের অভিনয়, কেহ বা মন্ত্রী অথবা রাজনীতিকের অভিনয় করিয়া যাইতেছি। ইহাদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাগণ অতি অল্প সময়েই জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন, সেইজন্য মঞ্চাভিনেতাগণ যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভারতীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া অভিনয় চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সত্বর সাধিত হইতে পারে।"

বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ও দানশীল শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন—"নব রূপায়ন! তোমায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—কার্য্যান্তরে এই রাজ্যের বাহিরে থাকা নিবন্ধন আজ তোমার প্রথম অর্ঘ্য 'সাজাহান' অভিনয় কালে উপস্থিত থাকিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত। বহুবিধ সমস্যা জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন হইতে স্বভাবতঃই আনন্দ লোপ পাইতে বসিয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এক নিষ্প্রাণ এবং নিস্তেজ ভাব হতভাগ্য বাঙ্গালীর জীবনে দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে সুরু করিয়াছে। এমতাবস্থায় জাতির এই বেদনা-ভারাক্রান্ত অন্তরে কথঞ্চিত আনন্দ দানে তোমার এই নব প্রচেষ্টা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহার সাফল্য কামনা করি এবং ভবিষ্যতে তোমার পুনঃ নাট্যরস পরিবেশনে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করণের আশা পোষণ করি।'

অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দান করেন। তন্মধ্যে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের (ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মেট্রপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপস্থিতি ও সহানুভূতিতে কর্ম্মিগণ বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র শ্যাম (ভারতের খ্যাতনামা চা শিল্পপতি), শ্রীসুধীর কুমার মিত্র (সম্পাদক বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন), শ্রীহৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সম্পাদক ন'দের নিমাই), শ্রীতুলসীদাস মুখোপাধ্যায় (প্রোঃ আর্ট টেম্পল), শ্রীহেমেন্দ্রলাল সরকার (জমিদার), শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক নাথ ঘোষাল, ডাঃ রামরঞ্জন বসু, শ্রীপঞ্চানন আশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতিভাবান মঞ্চাভিনেতা শ্রীসন্তোষ দাসের অসামান্য দক্ষতায় এবং পরিচালনায় অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয় ও দর্শকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রশংসা অর্জ্জন করে।

অভিনয়ের দিক দিয়া সাজাহান, আওরঙ্গজেব, ও দারার ভূমিকায় যথাক্রমে দুর্গাকিঙ্কর দে, সুনীল ঘোষ এবং কান্তি দাসের অভিনয় প্রশংসনীয়। জি'হন আলীর ভূমিকায় দুর্গা সাহা সুঅভিনয় করেন। স্ত্রী চরিত্রে জাহানারার ভূমিকায় মনোরঞ্জন দাস যেরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় করেন, তাহা একজন পুরুষের পক্ষে সচরাচর দেখা যায় না। ছয় বৎসরের শিশু অসিত দাসের সিপার চরিত্রের অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হয়।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী শ্রীউষাকান্ত দাস নবরূপায়নের পক্ষে সমাগত অতিথিদের আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন।

রঙ্গমঞ্চের মরাগাঙে 'নতুন ইহুদী'

গত ১৫ই আগষ্ট কালিকা মঞ্চে নবগঠিত 'উত্তর সারথী' সম্প্রদায় কর্তৃক 'নতুন ইহুদী' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদীরা চিরকাল বাস্তুহীন ভাসমান জাতি, তাহাদের জীবনধারাকে তুলনা করিয়া বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের একটি বাস্তবরূপ অঙ্কিত করা হইয়াছে এই নাটকে। আমাদের জনৈক সহযোগী পত্রিকা এই নাটকটি সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহার আংশিক উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "কাহিনী বল্‌লে অবশ্য ভুল বলা হয়। নাটকখানির মধ্যে কল্পনাপ্রসূত কিছু নেই। বাস্তুহারাদের আবেগকে ধ'রে তাকে নাটকীয় রীতিতে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টাও এতে নেই। কৃত্রিম বা অসত্যের বা অবাস্তবের লেশমাত্র নেই। মনে হয় সত্যিকারের বাস্তুহারা একটি

পরিবারকে মঞ্চের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এত স্বাভাবিক এবং এমনি সত্য তারা আর তাদের জীবনের সব ঘটনাগুলো যে, এতকাল ধ'রে পথেঘাটে পল্লীতে পল্লীতে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের দেখে যে চেতনা জাগাতে পারেনি, নাটকখানি একটা প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে এখানকার সমাজজীবনের একটা প্রচণ্ড সমস্যা সম্পর্কে দর্শকমাত্রকেই সচেতন ক'রে তোলে। বাস্তুহারাদের সমস্যা সারাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনেরই যে কি আকুল সমস্যা, নাটকখানিতে সেই কথাটাই নগ্ন সত্যের রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবেদনকে পৌঁছে দেবার শক্তিতে এবং তেজোদ্দীপ্ত আবেগকে একটা পরম সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় 'নতুন ইহুদী' সময়ের একটি শ্রেষ্ঠ দান।"

অভিনয় দেখিয়া আসিয়া এই নির্ভীক এবং খাঁটি সত্যমূলক মন্তব্যের সঙ্গে আমাদের একটুও দ্বিমত হয় নাই। বরং বাংলার বর্ত্তমান সমস্যাসঙ্কুল জীবনে উদ্বাস্তু শ্রেণীর ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গাগত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু পরিবারের বাস্তবরূপটি দেশের মানুষের কাছে অভিনয়ের মাধ্যমে সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দনই জানাইয়াছি। শিল্পীবৃন্দের সকলেই সুঅভিনয় করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর সমস্ত নাটকখানির সাফল্য নির্ভর করে, তাঁহারা যেমন নিখুঁত কলাসম্মতভাবে নিজ নিজ চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আবার যাঁহারা মাত্র দুই একটি দৃশ্যে অবতরণ করিয়াছেন অথবা দুই একটি মাত্র কথোপকথনের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাও অনুরূপ দক্ষতাই দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। স্ত্রী ভূমিকায় বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও কমলা চট্টোপাধ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশংসার অধিকারিণী।

এ যুগ রঙ্গমঞ্চের সঙ্কটের যুগ। তাহার কারণ এই নয় যে দর্শকের অভাব; তাহার কারণ একদিকে সিনেমা শিল্পের অসাধারণ বিস্তৃতি এবং অন্যদিকে মঞ্চে ভাল নাটকের অভাব। অধিকাংশ মঞ্চেই আজকাল পুরাতন ঐতিহাসিক নাটকের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়; তাহার ফাঁকে ফাঁকে দুই একখানি নতুন নাটকের যাহাও বা অভিনয় দেখা যায়—তাহার অধিকাংশই বাস্তবসম্পর্ক-বর্জ্জিত। মঞ্চাভিনয় সঙ্কটের এই দুর্দ্দিনে 'নতুন ইহুদী' নতুন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করিল। ইহার জন্য নবীন নাট্যকার সলিল সেন, (তাঁহার বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য) পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক নেপাল নাগ এবং 'উত্তর সারথী'র অভিনেতৃমণ্ডলী ও কর্ম্মীবৃন্দকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশবন্ধু পাঠচক্র

গত ১৭ই আগষ্ট, শুক্রবার অপরাহ্নে প্রবীণা কংগ্রেস সেবিকা ও নেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সভা-নেত্রিত্বে দেশবন্ধু পাঠচক্রের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ' বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটী অভিভাষণ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গভঙ্গের প্রথম সেই উদ্যোগ-দিনে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি, রঙ্গমঞ্চ ও সাহিত্য কি ভাবে সম্পদশালিনী হইয়া উঠে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঋষি বঙ্কিমের পলিটিক্স—আত্মনির্ভরতা—বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুই যে দেশবাসীর নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেন, ইহাই বক্তা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎকালের কার্লাইল ও লায়ন সার্কুলার এবং নানারূপ অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাতেও দেশবন্ধুর অণুপ্রেরণা এবং অবদানও কম ছিল না। আর উহার জন্য দেশবন্ধুর পরামর্শেই শ্রীঅরবিন্দকে উহার ভার দেওয়া হয় এবং দেশবন্ধুই রাজা সুবোধ মল্লিকের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। এই আত্মনির্ভরতার পরিণতিই দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত একদা দেশবন্ধুর সহকারী ছিলেন। তাঁহার ভাষণে জাতির বিস্মৃত ইতিহাসটিই শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আলোকে ফুটিয়া ওঠে। সভায় অধ্যক্ষ জিতেশচন্দ্র গুহ এবং সুধীরকুমার মিত্র বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হেড্‌মাষ্টার কুলভূষণ চক্রবর্ত্তী, রায় বাহাদুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুজাতা বসু, শ্রীসন্তোষ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভা- সমিতিতে এইরূপ আলোচনা হইতে বড়বেশী দেখা যায় না। দেশবন্ধু পাঠচক্রের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দেশের কৃষ্টিপ্রসারের অনুগামী হইলে কেবল আনন্দের কথা নয়, দেশবন্ধুর ভাব প্রচারের পক্ষেও বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।"

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক ঃ বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩॥০ টাকা। ভি পি খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নয় আনা।

আষাঢ় হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে-কোন মাস হইতেই গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গশ্রী প্রকাশিত হয়। সাধারণত সার্টিফিকেট-অব-পোষ্টিং-এ পত্রিকা পাঠান হয়।

জমা-টাকা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকদের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভি পি করা হয়। মানি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মানি-অর্ডার-কূপনে অথবা নির্দ্দেশ-পত্রে "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা অথবা পত্র পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যাটি উল্লেখ করিবেন।

রচনা ঃ রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় পত্রাদি 'সম্পাদক, বঙ্গশ্রী', এই নামে পাঠাইতে হইবে। উত্তরের জন্ত ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। রচনাদি ফেরতের জন্ত উপযুক্ত ডাক-মাশুল দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপন ঃ বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাদি পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য। পুরাতন বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ ১০ তারিখের মধ্যে না আসিলে সেই অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলেও ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

ম্যানেজার—বঙ্গশ্রী,
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৪।

অসাধ্য সাধনায়

সিদ্ধিলাভ !!!

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধিপ্রাপ্ত **রাজজ্যোতিষী** পণ্ডিত শ্রীহরিশচন্দ্র শাস্ত্রী, কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকদ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার্জন করিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। প্রশ্ন গণনায় অদ্বিতীয়। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট মনিষীবৃন্দ নানাভাবে সুফল লাভ করিয়া অযাচিত প্রশংসা পত্রাদি দিয়াছেন। সদ্যফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ। **বগলা কবচ :**—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্য্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৪৫৲; **ধনদা কবচ :**—সহজেই প্রচুর ধনলাভ হয় বলিয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়। লক্ষ্মীদেবী, পুত্র, আয়ু, ধন ও কীর্ত্তি দান করিয়া সৌভাগ্যশালী করেন। সাধারণ—২৫৲; বিশেষ—২৫০৲।

হাউস অব এষ্ট্রোলজি (ফোন সাউথ—৯৭৮)
১৪১।১ সি, রসা রোড, কলিকাতা—২৬।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

পূর্ব্ব পরিচালনায় ঃ—

	১৯৪০	১৯৪৫	১৯৪৮
জীবন বীমা তহবিল	৮৪,১৭৭	২,১১,৩৩৯	৩,৬৭,১২৭
সরকারী সিকিউরিটি	১,০০,০০১	১,৯৪,৫০৭	২,৭২,৮০৪
রিনিউয়্যালের খরচের হার	২০১%	৩১%	৪২%
		(১৯৪৪)	
ভ্যালুয়েশন উদ্বৃত্ত	×	৩,০৬৫	

বর্ত্তমান পরিচালনায় ঃ—

	১৯৪৯	১৯৫০
জীবন বীমা তহবিল	৩,৯০,০৯৮	৫,৫১,৭৪৫
সরকারী সিকিউরিটি	২,৯৭,৮৫৭	৪,৩৪,৫৪৯
রিনিউয়্যালের খরচের হার	১৬%	১৫%
ভ্যালুয়েশন উদ্বৃত্ত	১,৮৫৯	২০,১৫৮

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা-১৩

শ্রী এস. সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সংস্কৃতি প্রসারে মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাগ্রে। মুদ্রণপারিপাট্য ও দ্রুত কাজের সুবিধা মুদ্রনালয়ের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। সেই দিকে আমাদের চিরকালের লক্ষ্য।

সুলভে ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজের জন্য

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস, লিঃ

৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪

[ফোন : সেন্ট্রাল ১২৭৮]
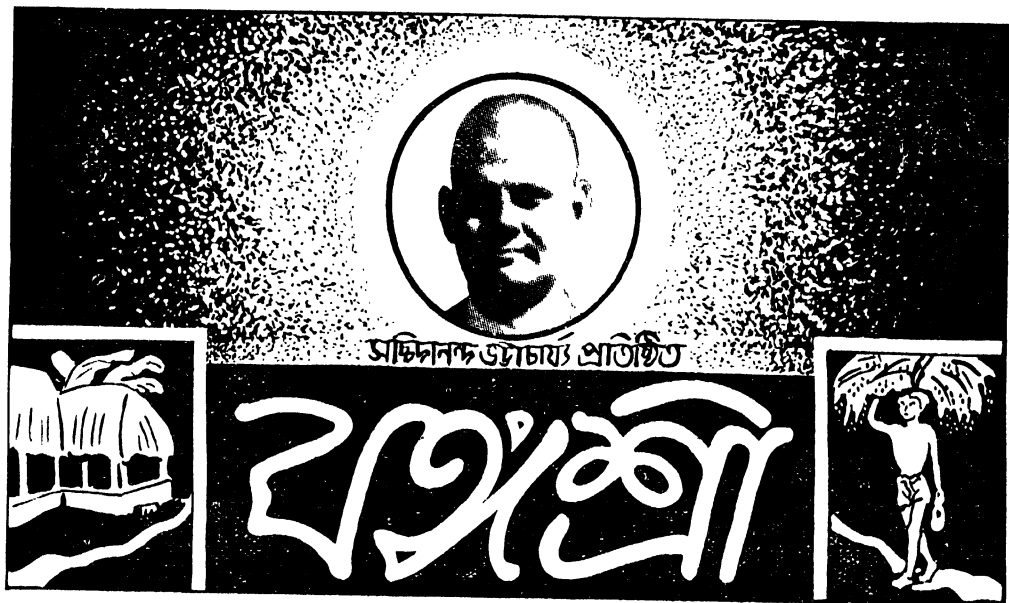
ঊনবিংশ বর্ষ শারদীয় আশ্বিন—১৩৫৮ ১ম খণ্ড - ৪র্থ সংখ্যা

'হে অখিল জগতের জননী ও চরাচরের ঈশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও। তুমি একাকিনীই জগতের আধারভূতা এবং মহীস্বরূপে অবস্থিতা। তুমি বৈষ্ণবীশক্তি এবং অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা অনন্তশক্তি পরমা মায়া। তুমিই জলরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া নিখিল জগতের পোষণ করিতেছ। পরা ও অপরা সকল বিদ্যাই তোমার অংশ। অদ্বিতীয়া তুমিই নিখিলবিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। তুমিই জীবকে মমতাবর্ত্তে ও মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ কর, আবার তুমিই প্রসন্না হইলে ভক্তকে স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান কর। তুমি পরিণাম-প্রদায়িনী সর্ব্বার্থসাধিকা নারায়ণী। তুমি সর্ব্বমঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিণী এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শক্তিভূতা সনাতনী, গুণাশ্রয়া এবং অগুণময়ী। তুমি ব্রহ্মাণী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, সরস্বতী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী। তুমি সহস্র-নয়নোজ্জ্বলা, সহস্রভুজা ও সহস্রবদনা বিশ্বব্যাপিনী দেবী। তুমি দংষ্ট্রাকরালবদন', শিরোমালাবিভূষণা চামুণ্ডা। হে সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা দেবী, আমাদের সকল প্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি পরিতুষ্টা হইলে অশেষ উপদ্রব দূর কর এবং রুষ্টা হইলে অশেষ অভিলষিত বস্তু নাশ কর। যাঁহারা তোমার আশ্রিত, কখনও বিপদ হয় না এবং তাঁহারাই সকলের আশ্রয়ণীয় হন। হে দেবী, বিবেক-প্রদীপের আলোকে শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রোজ্জ্বল থাকা সত্ত্বে মহান্ধকার মমত্বগর্ত্তে জীবগণকে ভ্রমণ করাইতে তুমি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জননী, তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না এবং ভক্তগণের প্রতি অভীষ্টদাত্রী হও। তোমাকে আমাদের ভক্ত-চিত্তের প্রণাম। আমাদের সমগ্র জাতির প্রণাম গ্রহণ করো তুমি জননী।'

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল-চক্রের আবর্ত্তনে, দ্বাদশ ঋতুর পর্য্যায়ক্রমিক পরিবর্ত্তনে, পুনরায় শরৎ-কাল সমুপস্থিত। বাঙ্গালার অতি প্রিয় ঋতু এই শরৎ। শরতের প্রারম্ভে বাঙ্গালায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব ঘটে। এই সময়েই বাঙ্গালা যথার্থই "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। রবির সিংহরাশিতে অবস্থিতিকাল, সৌরভাদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহা শকাব্দের বা বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাস; এবং শরৎ ঋতুর অন্তর্গত। শরৎ ঋতুর অন্তর্গত হইলেও, ভাদ্রমাস বর্ষা ঋতুর শেষ মাস। এই মাসে নদ-নদী, সরিৎসরোবর, খাল-বিল, তড়াগ-তটিনী জলপূর্ণ ও কুমুদ-কহ্লারে পরিকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন হয়। বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম শ্যামল শোভায় ফল-ফুলে পরিশোভিত হয়। এই মাসে আউস ধান্য পরিপক্ক হইয়া হরিৎ শোভায় পল্লী প্রান্তরের কৃষিক্ষেত্রগুলিকে মনলোভা শ্রীসম্পন্ন করে। এই হেতু সৌর ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসকে শরৎকাল বলা হয়; কিন্তু, ভাদ্র মাসের শেষ ভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কালই বর্ত্তমানে প্রকৃত শরৎ ঋতু। এই সময় আউস ধান্যের পরিপক্কতা হেতু মাঠে মাঠে নূতন ধান্য শোভা পায়। ধান্যের হরিৎ শীর্ষগুলি মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে দুলিতে থাকে। তাই কবি যথার্থই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গাহিয়াছেন---"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!"

শরৎকালের প্রভাতে বঙ্গের পল্লীশ্রী অতুলনীয়। নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সুপক্ক ধান্য। উদ্যানে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি এবং শ্যামল তৃণভূমি বক্ষে, দূর্ব্বাদলশীর্ষে উজ্জ্বল শিশিরবিন্দু। শিশিরসিক্ত শুভ্র স্নিগ্ধ শেফালিকা শরতের শ্রেষ্ঠ দান। অরুণবিকাশে নির্ম্মল জলাশয়সমূহের বায়ু-বিকম্পিত স্ফীত বক্ষে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতির মনোলোভা শোভা স্থলভাগে বর্ষাবারিপরিপুষ্ট বৃক্ষলতাগুলি সতেজে ফুল-ফলে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন। সর্ব্বত্র স্থলপদ্ম, কাশ কুসুম এবং শেফালিকার প্রাচুর্য্য। বঙ্গের এই শরৎশ্রী লক্ষ্য করিয়াই, অমর কবি বঙ্কিম-চন্দ্র বাঙ্গলাকে "সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের "আমার এই হেতুই "সকল দেশের রাণী"। অন্য একজন কবি আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রশ্ন করিয়াছেন, "কোন্ দেশের তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?"

দিবা-ভাগ অপেক্ষা সায়াহ্নের শোভা আরও মনলোভা। গগনমণ্ডলে কোথাও বর্ষার জলভরা কালো মেঘের চিহ্ন নাই। নীলাকাশে শ্বেত মেঘের লঘু খণ্ডগুলি বিচরণশীল। সন্ধ্যাকালে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ, এই সকল মেঘে প্রতিফলিত হইয়া, গগন প্রান্তে বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত দৃশ্যাবলির দ্রুত পট পরিবর্ত্তন করে। রাত্রি সমাগমে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে যখন পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ ঘটে, তখন বিমল জ্যোৎস্নাজালে পৃথিবী পরিপ্লুত হয়। নবসাজে সুসজ্জিত মোহিনী প্রকৃতি তখন নভোমণ্ডলে ও ধরাবক্ষে কুহকের সৃষ্টি করে। নীলাকাশে পূর্ণ চন্দ্র; নীল জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম! মৃদু শীতের সমাগমে স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বায়ু! যৌবন পুলকে চরাচর বিশ্ব উদ্বেলিত! কুহকিনী প্রকৃতির তরল সৌন্দর্য্যে প্রবৃত্তিপরায়ণ···জীবকুল উদ্‌ভ্রান্ত!

যৌবন-বৈভবে বিভূষিত শরৎ-প্রকৃতির রমণীয় শ্রীসম্পদের সূক্ষ্মানুভূতির অনুসরণ হইতে,—মনোজগতের বিস্ময়ানন্দ হইতে,—স্থূল জগতের বাস্তব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমরা উপলব্ধি করি—বিভ্রম ও বিভীষিকা! মানব প্রকৃতির রুদ্র বিকাশ—স্বার্থের রেষারেষি, দ্বন্দ্বের হানাহানি, ধ্বংসের কানাকানি, অস্ত্রের ঝনঝনানি রণ-সমুদ্যমের উন্মাদনা! মমতাময়ী প্রকৃতির নির্ম্মম বিপর্য্যয়।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন! রাষ্ট্রনায়কদের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখমণ্ডলও মেঘাচ্ছন্ন! ভারত ব্যতীত কয়েকটি দেশে হত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা! মহাগ্রহ শনি ও রাহুর ক্রূর দৃষ্টিতে বিপন্ন ক্ষুদ্র কোরিয়ায় যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে—পূর্ব্ব এশিয়া অতিক্রম করিয়া তাহার লেলিহান শিখা কোথায় পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অন্তরীক্ষে গ্রহ সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সন ১৩৫৭ সালের ২২শে আশ্বিন সোমবার কন্যারাশিতে যে ষড় মহাগ্রহের মহামিলন ঘটিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে পৃথিবী এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ও কেতু এই ষড় গ্রহের অশুভ সম্মিলনে ঐদিন যে "গোলযোগের" সৃষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প, প্রবল ঝটিকা, জল প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, প্রজ্ঞানাশ, মহামারী এবং ছত্রভঙ্গ হয়। গত বৎসর আসামে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহার অসীম ক্ষয় ও ক্ষতির বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। এই ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল ৩০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার। শনি, রবি কিংবা মঙ্গলবারে ভূমিকম্প হইলে শস্য হানি ঘটে, রাজ্য দগ্ধ হয়, রাজাদিগের ছত্রভঙ্গ ঘটে, ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং লোক সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। গত দ্বাদশ মাসে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে, পৃথিবীব্যাপী তুমুল যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধের অন্ত নাই। এমন যুদ্ধেরও আশঙ্কা রহিয়াছে, যাহাতে প্রবল শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন জাতি লিপ্ত হইতে পারে। বিভিন্ন পঞ্জিকায় প্রদত্ত রাষ্ট্রগত বর্ষফলের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান বর্ষে ভারতে বিপ্লব-বিপত্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ধনস্থানে রাহুর অবস্থিতি হেতু ভারতের অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং কেন্দ্রীয় "বাজেটে" অর্থাৎ আয় ব্যয়ের খসড়ায় বহু টাকা ঘাটতি ঘটিবে। শেয়ার মার্কেটের অবস্থা শোচনীয় হইবে এবং চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইবে। উপনিবেশ এবং বহির্ব্বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে বহুবিধ অসুবিধা ঘটিবে। আইন ও ধর্ম্ম সংস্কারে বহু গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। ভারতীয় অর্ণবযানের বিশেষ ক্ষতি ঘটিবে। পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। চীনের সহিতও মনোমালিন্য এবং বিবাদের আশঙ্কা রহিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান দূরে থাকুক, তৎসংক্রান্ত বিবাদ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে, কংগ্রেস, অর্থাৎ জাতীয় মহাসমিতি, দ্বিধাবিভক্ত হইলেও পুনরায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্য্যোগ প্রবল ঝটিকা, ভূকম্পন জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং রাজপুরুষের অত্যাচারে কেবল মাত্র ধনজনক্ষয় ঘটিবে, তাহা নহে; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। পৌষ মাসের শেষে শুভগ্রহের সঞ্চারে কাশ্মীর সমস্যার আংশিক অনুকূলে সমাধান ঘটিতে পারে; এবং বসন্তকাল মধ্যে কোন সর্ব্বজনপ্রিয় নেতার আবির্ভাবে রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

এই বর্ষব্যাপী দুর্য্যোগের অবসান-কল্পে সমরোপকরণ প্রস্তুতি প্রচেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি ব্যাহত হইতে পারে। অস্ত্রবল অপেক্ষা দৈববলই শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্ত আমাদের এই দুর্দ্দিন ও দুর্য্যোগের স্থায়ী অবসান-কল্পে, দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবীর আবাহন, অর্চ্চনা ও আরাধনা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। শরণাগতি ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। তিনি—"দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।" দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা। তিনি যে দুস্তর পাপাতঙ্ক হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাহা নহে; তিনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা। তিনি বরাভয়া। কিন্তু বর ও অভয় মাত্র দান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন না। যেখানে আমরা অসমর্থ, সেখানে তিনিই আমাদিগকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক। তিনি নানা আয়ুধধারিণী। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের শত্রু দমন করেন। আমরা ক্ষুদ্র মানব। দেবতাগণও অসহায় ভাবে তাঁহার শরণাগত। তিনি কল্পে কল্পে অসুর-নিপীড়িত দেবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে, বিষ্ণুকে উপলক্ষ্য করিয়া মধু ও কৈটভ

নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অপরাজেয় দৈত্যদ্বয়কে নিহত করিয়া, স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণকে তথায় পুনঃসংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ত্রিদশগণ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন। ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন দেবতাগণ দিব্য দৃষ্টি-প্রভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। আমরা মলিনসত্ত্ব ও স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। কিন্তু আমরাও যদি যোগাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সম্পন্ন হইতে পারি, তাহা হইলে, আমরাও মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধন ব্যতীত এরূপ সিদ্ধি সুদুর্লভ। সত্য-যুগে সুরথরাজা এই দেবীর পূজা করিয়া হৃতরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এই দেবীর অরাধনা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত ও সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুদুষ্কর অজ্ঞাত বাসের পূর্ব্বে, এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে, "বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার সহিত" তাঁহার স্তব করিয়া দুর্গমে অভয় ও সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; আমরাও অনন্য মনে তাঁহার আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তা-হমিতি মন্যতে।" অহঙ্কার-বিমূঢ় লোক আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। কিন্তু কর্ত্তা কে? কর্ত্তা পুরুষ নহেন;—প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই আমাদের মহামায়া, মহাদেবী ভগবতী। সাধক কবির কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হইয়াছে,—

সকলি তোমারি ইচ্ছা;—
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি করাও মা;—
লোকে বলে করি আমি॥

আমাদের অভিমান আছে যে, পুরুষকার আমাদের আয়ত্তে। কিন্তু আমরা বুঝিনা যে, পুরুষকার আমাদের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত মাত্র! পুরুষকারে সর্ব্বত্র সিদ্ধি লাভ হয় না। সিদ্ধি দৈবের আনুকূল্য সাপেক্ষ। মহামতি কর্ণ ছিলেন, পুরুষকারে মহাভিমানী,—তিনি দৈবের অপেক্ষা করেন নাই। ভক্তিমান্ অর্জ্জুন, অমিতপরাক্রমশালী হইলেও প্রতি পদক্ষেপে দৈবের আনুকূল্য অর্জ্জন করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। পুরুষকার আমাদের অতীব প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য; কিন্তু দৈবানুকূল্য ততোধিক প্রয়োজনীয়; দৈব আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে কিন্তু আয়ত্তের বশীভূত। দৈবকে আয়ত্ত করিতে হয় সদ্‌বৃত্তি দ্বারা। উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রচেষ্টা ঐকান্তিক হইলে, সিদ্ধি করতলগত হয়। এই নিমিত্ত, আজ ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দনুজদলনী দুর্গতি-নাশিনী দুর্গার আবাহন, অর্চ্চনা ও আরাধনা করিতেছি। আমরা পরশ্রী প্রত্যাশী নহি; আমরা আত্মরক্ষায় মাত্র প্রযত্নশীল। অন্যের অনিষ্ট আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না; আমরা আমাদের ইষ্টের অভিলাষী। সুতরাং দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভুজা আমাদিগকে দশদিক হইতে রক্ষা করিবেন। আত্মকলহের কিংবা অন্তর্দ্বন্দ্বের এখন অবকাশ নাই,—চাই আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা; আত্ম-নির্ভরশীলতা; আত্ম-রক্ষণতৎপরতা। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা অধর্ম্ম নহে; পরন্তু স্বধর্ম্ম। ভক্তগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুঃখ-দারিদ্র্য বিনাশিনী দুর্গা দুর্গমপথে এবং দুর্গম স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। অকপট ভাবে তাঁহার শরণ লইলে, এবং তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে, বিজয় ও বিভূতি অবশ্যম্ভাবী!

প্রণমামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গৌরীং সর্ব্বার্থসাধিনীম্॥

বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্কট

শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর আজ অতিশয় দুর্দ্দিন। দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে অবস্থিত। বাকী দুই-তৃতীয়াংশকে অবাঙ্গালী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা চরিত্রের অন্ত নাই, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যাহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে সুদূরতম প্রদেশে অবস্থিত, বাঙ্গলা-দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত তাহাদের কোনও পরিচয় ছিল না—আজও নাই। আজ যদি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রকৃত মালিক পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানেরা হইতেন, দুঃখ করিতাম না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রকৃতপক্ষে আজ তৃতীয় পক্ষ। তাঁহারা কতকটা 'নিজবাসভূমে পরবাসী'। প্রথম পক্ষ পশ্চিম পাকিস্থান, আর দ্বিতীয় পক্ষ পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত অবাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়—যাহাদের সর্ব্ব-প্রধান যোগ্যতা হইতেছে বাঙ্গালীর দেশে বাস করিয়াও বাঙ্গলা ভাষা জানে না।

ভারতবর্ষেও আমাদের দুঃখের সেই একই কাহিনী। বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। উহার পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে ধলভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি যে সকল বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গালীপ্রধান স্থান আছে, সেগুলিকে শীর্ণকায় পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাহার পূর্ব্বদিকের বৃহৎ ক্ষতির যৎকিঞ্চিৎ পরিপূর্ণ সাধনে বিবেচনা বা দয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নায়কগণ মালিকদের হইতে পারিল না! অথচ একথা তাঁহাদের ভাল করিয়াই জানা আছে যে, এই সকল ভূমি পূর্ব্বে রাজনৈতিক কারণে বাঙ্গলাদেশেরই অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বিহারকে দেওয়া হইয়াছিল। যে রাজনৈতিক কারণ একদা বাঙ্গলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই রাজনৈতিক কারণ এখন দানে পাওয়া বিহারের অঙ্গকে ছেদন করিতে অসমর্থ।

শুধু এই মাত্রই নয়; দুঃখের,—দুশ্চিন্তার আরও অনেক গভীর কথা আছে। আজ বাঙ্গলা ভাষা, অর্থাৎ বাঙ্গালীর মাতৃভাষা, বাঙ্গালীর কাছে তৃতীয় ভাষা। হিন্দী তাহাকে শিখিতেই হইবে, যেহেতু হিন্দী রাষ্ট্রভাষা; ইংরাজী তাহাকে ভুলিলে চলিবে না, যেহেতু ইংরাজী বিশ্বভাষা; তারপর বাঙ্গলা হইল তৃতীয় ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালীদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা; বড়জোর আসর-বিনোদনের জন্য দুই-চারখানা নাটক নভেল লিখিবার ভাষা। বাঙ্গলা আর প্রয়োজনীয় ভাষা থাকিবে না, কতকটা সখের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গলা ভাষাকে অপ্রয়োজনীয় ভাষায় পরিণত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষ জুড়িয়া যেরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে একদিন যদি বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মৃতভাষা হইয়া দাঁড়ায়, একদিন যদি বাঙ্গালী বাহিরের কাজ কারবার হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যকার সংসারের কথোপকথন পর্য্যন্ত ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষার দ্বারা চালাইয়া নিতে থাকে, তাহা হইলে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। ভাগলপুর এবং পাটনা জেলার স্থানে স্থানে এমন অনেক বাঙ্গালী সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, সাজসজ্জা বাঙ্গালীর মতই করেন, মাথায় টুপি পরেন না অথবা পাগড়ী বাঁধেন না, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন না; কথা বলেন হিন্দী অথবা হিন্দী-বাঙ্গলা মিশ্রিত এক অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষায়। সে ভাষার একটু নমুনা দিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন পারিপার্শ্বিক এবং রাজনৈতিক কারণে একটা ভাষা নিজেকে কতখানি হারাইতে পারে। যে নমুনাটি দিতেছি সেটি পাটনা সহরে ভিখ্না পাহাড়ী অঞ্চলের এক পিতাপুত্রের কথোপকথন।—

পুত্রের নাম যদু। পিতা যদুকে ডাকিতেছে—'যদ্‌দো, এ যদ্‌দো!' অর্থাৎ, 'যদু অ যদু!'

যদু উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতেছে, 'কি ফরমাইছেন ?' অর্থাৎ 'কি ফরমাশ করিতেছেন ?' অর্থাৎ কি আদেশ করিতেছেন।

যদুর পিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই না-কি ইস্‌সাল তরক্কী পাইলি না ?' অর্থাৎ, তুই না কি এ বৎসর প্রমোশান পাস নাই ?'

যদু উত্তর দিল—'না, তরক্কী ত পাইলাম না।' অর্থাৎ 'না প্রমোশান ত পাই নাই

উত্তর শুনিয়া যদুর পিতা বিরক্তিভরে বলিল 'সওয়াল ইয়াদ করবি না, ছরদিবালিতে কুদে কুদে বেড়াবি তো তরক্কী পাইবি কি ক'রে ?' অর্থাৎ পাঠ অভ্যাস করবি না, পাঁচিলের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াবি, তাহা হইলে প্রমোশান পাবি কি করিয়া ?'

ভাগলপুরে থাকা কালে মনোমোহন মুখোপাধ্যায় নামক একটি পনের ষোল বৎসর বয়সের ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। পরিচয় দিতে গিয়া সে বালকটি আমাকে বলিয়াছিল, 'আমার নাম দিলমোহন মুখার্জি, বা কি মনোমোহনও বলতে পারেন, কাজে কি দিল মানে মন।' অর্থাৎ, 'আমার নাম দিলমোহন মুখার্জি, মনমোহনও বলিতে পারেন, কারণ 'দিল' মানে 'মন'।

অথচ কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আজিকার এই 'যদ্দোরা' 'যদু' বলিয়াই সম্বোধিত হইত এবং মনোমোহন মুখার্জিরা নিজেদের নাম বিকল্পে দিলমোহন মুখার্জি বলিবার স্বপ্নও দেখিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের ভাষা শেষ পর্য্যন্ত কি ভিখ্‌না পাহাড়ী ভাষার দিকে যাত্রা আরম্ভ করিবে ? যে ভাষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষকে বিশ্বজনসভায় সম্মানার্হ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে ভাষা কি শেষ পর্য্যন্ত শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে ? বিশ্বজননেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষার প্রভাবে কত গভীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

যে বাঙ্গলা ভাষাকে অধঃপতন হইতে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা এতটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি, সেই বহু ঐশ্বর্য্যশালিনী, নানা রত্নালঙ্কারভূষিতা বাঙ্গলা ভাষা যদি আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইত, তাহা হইলে বিচার-বুদ্ধিকেই সম্মানিত করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদের বাস ; সংখ্যা এখানে উৎকর্ষের কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছে। যে-কোনও এগারর নিকট যে-কোনও দশ এখানে পরাজিত, সুতরাং বাঙ্গলা ভাষার শক্তিসামর্থ্যের কথা কে এখানে বিবেচনা করিবে ?

তবে বিবেচিত একেবারে যে হইতেছে না, সেকথাও বলিতে পারি না। কুড়ি পঁচিশ বৎসর হইতে বাঙ্গলা ভাষার কাছে দীক্ষা নিয়া হিন্দী ভাষা ক্রমশঃ বাঙ্গলা ভাষার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষার ব্যবধান যদি পঞ্চাশ মাইলের ছিল, আজ দশ মাইলের বেশী নয়। কালক্রমে হিন্দী ভাষার ক্রিয়া পদগুলি অহেতুক জটিলতা হইতে বিমুক্ত হইয়া সহজ ও সরল হইলে এ ব্যবধান নামমাত্রে পরিণত হইবে। তখন ভাষার ব্যবধানের চেয়ে লিপির ব্যবধানটাই বড় হইবে।

বাঙ্গালীর আজ দুর্দ্দিন। বাঙ্গালী আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, বাস্তহীন, বিতাড়িত। গুরুতর অপরাধ করিলে দণ্ডস্বরূপ যেখানে দ্বীপান্তরিত হইবার ব্যবস্থা, দৈবের কাছে কোন অপরাধবশতঃ জানি না বাঙ্গালী আজ তাহার সপ্তপুরুষের বাস্তভূমি হইতে উৎসাদিত হইয়া সেই দ্বীপে (আন্দামানে) অন্তরিত। যে বাঙ্গালী জাতি একদা সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃত্ব করিত, সে আজ 'সব-জন-পশ্চাতে'। আমি কিন্তু এই কথা বিশ্বাস করি না। রাতারাতি বাঙ্গালী তাহার শক্তি হারাইল এবং রাতা-রাতি অপর সকলে শক্তিমান হইয়া উঠিল,—এমন ঘটনা আরব্য উপন্যাসেই সম্ভব, বাস্তব ক্ষেত্রে নয়। বাঙ্গালী আজ রাজনৈতিক ঝড়ের চালে কিস্তিমাৎ হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতি এমন অনিশ্চিত, এমন অনির্ভরযোগ্য বস্তু যে, অচিরে একদিন যদি আড়াই ঘরের ঘোড়ার চালে বাঙ্গালী পুনরায় তাহার হারানো অবস্থা ফিরিয়া পায় ত' বিস্মিত হইব না। আমি আশাবাদী, একথা আমি বিশ্বাস করি ! [বার্ণপুর অভিভাষণের সারাংশ]

অনুক্ত

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

টক্ টক্ টক্।

বাজে কোনো শব্দ নয়, স্পষ্ট সঙ্কেত ধ্বনি!··· মাথার কাছের বন্ধ জানলাটার বাইরে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে··· এতে সন্দেহ নেই।

বিছানায় উপুড় হয়ে দুই কানে হাত চাপা দিয়ে কঠিন ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে শিবানী, কিছুতেই শুনবে না! কিছুতেই না। তবু শুনতেই হয়··এ শব্দ তার হাড় মাংস ভেদ ক'রে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে আঘাত করছে!···

টক্ টক্ টক্!

মনের ভ্রম নয়·· স্বপ্নের ঘোর নয়···নির্ভুল স্পষ্ট।

বুকের 'টিপ্ টিপ্' কানে শুনতে পাচ্ছে শিবানী··· কান চেপে থাকলে আরো প্রখর হয়ে ওঠে সে শব্দ!··· তবে কি করবে সে? দালানের দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে? জাগিয়ে তুলবে ঘুমন্ত নন্দরাণীকে? কিন্তু কি বলবে তাঁকে? বন্ধ জানলার বাইরে টোকা মারার শব্দ পেয়ে ভূতে পাওয়ার মতো দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছে শিবানী?···স্নেহে বিগলিত হয়ে নন্দরাণী তা' হলে বুকে টেনে নেবে তাকে?

কিন্তু কে বা উঠছে, কি বা বলছে!

শিবানীর কি ওঠবার ক্ষমতা আছে?

এ শব্দ ক্রমশঃ তার জ্ঞান চৈতন্য লুপ্ত ক'রে দিচ্ছে, অসাড় ক'রে দিচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি!

শিবানী ঠিক বুঝতে পারছে—এ সঙ্কেত হেমন্তর।

কিন্তু হেমন্ত কি ক'রে জানলো শিবানী আজ ঘরে একা আছে? আজই যে সারদার নাতনীর বিয়ে, এ সংবাদ তো হেমন্তর জানবার কথা নয়।

সকাল থেকেই আজ ছুটি নিয়েছে সারদা নাতনীর বিয়ে ব'লে। ব'লে গিয়েছে রাত্রে আসতে পারবে না।··· একাই শুতে হবে শিবানীকে। শাশুড়ী ননদ কেউ যে এ ঘরে শুতে আসবে - শিবানীকে আগলাতে, এতো বড়ো দুরাশা ছিলো না শিবাণীর।··· রাজীবলোচন খুন হওয়ার ভয়ঙ্কর দিন থেকে আর কোনোদিন এ ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়নি তারা।···তবু ক্ষীণ একটু আশা ছিলো যদি শিবানীকেই ডেকে নিয়ে যায়, এক রাত্রির জন্যে আশ্রয় দেয় তাদের ঘরে। চৌকীর ওপর নয়, মাটিতে।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেছে সেই ক্ষীণ আশা সূত্রটুকু। যথারীতি খিল প'ড়েছে নন্দরাণীর ঘরে। রাধা তো আগেই শুয়ে পড়ে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে।

শিবানীর ঘরের জানলাটা যে গরাদভাঙা, বাইরের দিকের দরজাটা যে নিতান্তই আলগা, একশো বছর

আগের তৈরী আমকাঠের ঘুনধরা কপাট দু'খানা যে একটা ধাক্কা মারলেই গুঁড়ো হয়ে পড়ে যেতে পারে, এ সব কি তাদের অজানা ?

শিবানী কি মান খুইয়ে আশ্রয় চাইতে যাবে ?

ভাঙ্গা গরাদের ফাঁকটাকে একটা তার জড়িয়ে জড়িয়ে আটকে, আর জীর্ণ দরজার গায়ে ভারী তোরঙ্গটাকে ঠেসে দিয়ে ভিতরের দালানের দরজায় খিল লাগিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েই শুয়েছিল শিবানী, হয়তো বা—আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমও এসেছিল একটু…হঠাৎ সমস্ত স্নায়ুশিরা শির শির ক'রে উঠলো কিসের একটা আতঙ্কে।…কে ডাকছে না ?

না - ডাক নয়, সঙ্কেত।

আঙুলের টোকার আওয়াজ। স্পষ্ট নির্ভুল।

—টক্ টক্ টক্।

সে শব্দ হাড়মাংস ভেদ ক'রে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে আঘাত ক'রছে শিবানীর।

কিন্তু শিবানী কেন ভয় খাচ্ছে ?

হেমন্ত তার কি করবে ? খুন ক'রে ফেলবে রাজীবলোচনের মতো ? গলাটা টিপে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে ?

তা' হ'লে তো বেঁচেই যায় শিবানী।

সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য হয়ে দম আটকানো আবহাওয়ায় শুধু বেঁচে থাকতে থাকতে যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বেচারা!

কতো দিনই তো রাত্রে শোবার সময় একান্ত প্রার্থনা করে শিবানী অপঘাতে মরা রাজীবের প্রেতাত্মা যেন অন্ধকারে এসে গলা টিপে ধরে ওর।

হায়! শিবানীর ভাগ্যে ভূতও ভগবানের মতো বধির!

হেমন্ত যদি রাজীবের প্রেতাত্মার কাজটা ক'রে দেয় তো দিক। জানলা খুলতে ভয় পাবে কেন শিবানী ?

ভয় পেয়েছিল বরং সেদিন—

সিনেমার ছবির মতো সমস্তটাই চোখের সামনে দেখতে পায় সে। শুধু সত্যিকার চোখের সামনে সমস্তটা দেখেও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না—হেমন্ত খুন না হয়ে রাজীব খুন হলো কেন!

চকচকে সেই ইস্পাতের দা'খানা রাজীবই তো তুলে ধ'রেছিল হেমন্তর মাথার উপর ?

তারপরটা আর কিছুতেই স্পষ্ট মনে পড়ে না।

সেই ধারালো দায়ের চোপটা হেমন্তর মাথায় না প'ড়ে ছিটকে এসে শিবানীর পায়ের ওপর পড়লো কি ক'রে, আর পায়ের যন্ত্রণায় সর্ষেফুল দেখা চোখ দুটো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে কেন দেখলো—ঘরের মেজেয় বীভৎস মুখ নিয়ে শুয়ে আছে রাজীবলোচন, আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে রাধা আর নন্দরাণী!

এই খানিকটা জায়গা ঝোপ্সা অন্ধকার।

তবু এতোদিনে আন্দাজে আন্দাজে বুঝেছে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিরুপায়ে হেমন্ত গলাটা চেপে ধরেছিলো রাজীবের।

হেমন্তর কাছে রাজীব তো মশা।

সব বছরের মত—এবারেও মেলা বসেছিল গ্রামের ধারে।

যতো রকম লোভনীয় বস্তু জগতে থাকা সম্ভব কোনোটাই না কি আসতে বাকী থাকেনি সেখানে। থাকেও না, কিন্তু এবারের তীব্র আকর্ষণ—ডবল মাথাওলা চতুর্ভুজ মানুষ। তার জন্যে অবিশ্যি আলাদা টিকিট লাগে, তা সে সামান্যই। চারটে মাত্র পয়সা খরচ করলেই যদি 'নরনারায়ণ' দেখতে পাওয়া যায়, না দেখে আবার থাকবে না কি কেউ ?

তিনদিন ধরে তাই গাঁয়ের পথে লোকের কামাই নেই।

দলে দলে কাতারে কাতারে যাচ্ছে আসছে। মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো, ইতর ভদ্র। কেউ বাকী নেই। রঞ্জিত—অতিরঞ্জিত অনেক কিছু শুনছে শিবানী আজ তিনদিন ধরে "প্রাসন্তি যাউন্তিদে"র মুখে।

শিবানীরা এখনো দেখেনি শুনে করুণা বিগলিত চিত্তে আরো বেশী লোমহর্ষক করে শুনিয়ে যাচ্ছে তারা। অথচ

কী এক গোঁ রাজীবের, বৌকে আর বোনকে কিছুতেই যেতে দেবে না।

বছর বছরই মেলা বসে, কোনোবারই দেয় না। বড়োজোর দু' জোড়া কাঁচের চুড়ি এনে দেয়, কি দু'খানা সরু বাঁটের পাখা কিনে এনে বাহাদুরী করে—হাজারখানা থেকে বাছাই করে আনা এমন হালকা আর শন্‌শনে পাখা নাকি মেলার বাজারে আর নেই।

কতো কাঁচের চুড়ি পুঁথির মালা ঝুটো মুক্তোর নেক্‌লেস্ লেস জরি ফিতে ঝুম্‌কো, কতো ডুরে শাড়ী রঙিন সায়া বাহারি ব্লাউস, কতো পুতুল, খেলনা বাসন-কোসন! এক কথায়—শিবানীর জ্ঞানগোচরিত প্রায় সমস্ত লোভনীয় বস্তুই মেলার মাঠকে আশ্রয় করে জ্যোতি বিকীর্ণ করতে থাকে শিবানীর কল্পনার আকাশে, সহস্র বাহু প্রসারিত করে আকর্ষণ করতে থাকে শিবানীকে, অভিমানী শিবানী মান খুইয়ে প্রায় হাতে পায়ে ধরে রাজীবের, তবু টলানো যায় না তাকে।

দুর্দ্দান্ত একগুঁয়ে লোক।

এদিকে তো তেজপাতার মতো শরীর, গায়ে নেই এক ছটাক শক্তি, হাঁপানীর ধমকে ধমকে পাঁজরার হাড়-গুলো খোঁচা খোঁচা, এক হাতের ঠেলায় ফেলে দিতে পারে শিবানী, তবু রাশটা তার বেজায় ভারী। বুনো ঘোড়ার মতো এক বগ্‌গা গোঁ।

যা করবেনা তা' করবেই না।

স্বয়ং ভগবান এলেও টলাতে পারবে না তাকে। সে জায়গায় রাধা শিবানী?

তার সেই এক কথা—"রাম কহো! ওখানে আবার ভদ্রলোকের মেয়েরা যায়?"

যেন গ্রামসুদ্ধু মেয়ে অভদ্র!

যেন নিজের চক্ষে দেখছেনা রাজীব, পাড়া ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে সবাই দিনে দুপুরে, সময়ে অসময়ে!

সে যুক্তি কে শুনবে?

নজীর যতোই ভারী করো, অনায়াসে উড়িয়ে দেবে রাজীব, বলবে—ওদের কথা বাদ দাও।

যেন গ্রাম সুদ্ধু, শুধু এ গ্রামই বা কেন, আশপাশের আরো পাঁচখানা গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককে বাদ দিয়ে—তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে, শুধু বৌকে আর বোনকে ধরে রেখে স্বর্গে যাবে রাজীব।

যেন রাজীবই জগতের মধ্যে একমাত্র বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি!

অবিশ্যি এ সব যুক্তি পুরনো হয়ে গিয়েছিল।

পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শিবানীর আর এখন এই ছাব্বিশ হলো তার। প্রতি বছরেই মেলা বসেছে—ভেঙেছে।...'ভাঙামেলায়' সস্তায় সওদা করতে দলে দলে সবাইকে যেতে আসতে দেখেছে তারই ঘরের জানলার নীচে দিয়ে। এটাই সর্টকাট রাস্তা মেলায় যেতে।

'দেখবেনা' বলে রাগ করে জানলা বন্ধ করে রেখেছে শিবানী, আবার এক সময় খুলে ফেলেছে তাদের কল-কণ্ঠের মুখর আকর্ষণে।

"—হতভাগা ছেলের ছিষ্টিছাড়া এক গোঁ! দেশশুদ্ধু ঝি বৌ যাচ্ছে আর ওর বৌ গেলেই—জাত যাবে!" বলে আড়ালে গজ্‌গজ্ করেছেন নন্দরাণী, আর রাধা দাদা বাড়ী থেকে বেরোলেই ভাজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে—ওনার পরিবার না হয় রূপসী সুন্দরী, পরপুরুষের হাওয়া গায়ে লাগলে গা ক্ষয়ে যাবে, আমরা তো বা খেঁদি পেঁচি কালো কুচ্ছিৎ, গণ্ডারের চামড়া গায়ে, আমাদের কি? ফিরেও তো তাকাবে না কেউ? আমাদের আটকানো কেন? আর কিছু নয়—ওনার পরিবারকে আগলাও বাড়ী বসে বসে!...কি করবো অমনিষ্যির হাতে পড়ে মানুষের বার হয়ে বসে আছি, নইলে কার 'তোক্কা' রাখতাম? ইচ্ছে হয় যে গলায় দড়ি দিই।

অবিশ্যি ইচ্ছে প্রকাশের ওজনটা তার যতো বেশী, ইচ্ছের ওজনটা তার সিকির সিকি হলেও এতোদিনে দড়ি একগাছা জোগাড় করে ফেলতো রাধা। তবে ততোদুর হয় না—নিজের জীবনকে যতোটা সম্ভব ধিক্কার দিয়ে পরক্ষণেই হয়তো রাধা পশমের 'গুছি' দিয়ে জোড়া বিনুনির খোঁপা বাঁধতে বসে, নয়তো—এক কড়া দুধের সব সরটা খাবলা করে তুলে নিয়ে এক বাটি ময়দার সঙ্গে গুলে ডলে' ডলে' মাখতে শুরু করে।

যতোই অমনিষ্যি হোক হেমন্ত, পরিবারকে ভাত কাপড় দেবার ক্ষমতা না থাক, আর—অম্লান বদনে

শালার অন্ন ধ্বংসাক, রূপে যে রাধা তার পায়ের নখের কাছেও লাগেনা—মনে মনে তো অস্বীকার করতে পারে না?

তাই জীবনে তার যতোই ধিক্কার আসে, ততোই সর ময়দা আর স্নো পাউডার মাখে।

এ সবই একরকম গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু "নর নারায়ণ?"

জীবনে এমন সুযোগ কি আর দ্বিতীয়বার মিলবে?

কাকুতি মিনতি করে এলে গেছে শিবানী, নন্দরাণী পর্য্যন্ত সুপারিশ করেছেন বৌয়ের হয়ে—রাজীব অনড় অচল।

সে তর্ক করে না বেশী, হাসে, আর ঝাঁজরা বুকের খাঁচার ওপর একটা চাপড় মেরে বলে—মরদকা বাত হাতীকা দাঁত! কথায় ভেজবার ছেলে এ বান্দা নয়। 'না' যখন বলেছি তখন না। বলেছি—ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের যাবার জায়গা নয়, ব্যস যাবে না।

অবশেষে মরীয়া রাধারাণী একদিন দাদাকে লুকিয়ে চুপি চুপি দেখে এলো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে।

এরপরেও বেঁচে থাকবে শিবানী?

মুখ দেখাবে রাধার কাছে? রাধা যখন হাত মুখ নেড়ে অনেক রং চড়িয়ে গল্প করবে মেলার মাঠের, তখন হাঁ করে শুনবে বোকার মতো? আর 'নরনারায়ণে'র কথায় খেদ করে যখন বলবে—"আহা কি করবে বৌ! কপাল তোমার! দেশবিদেশ থেকে কতো কতো পাপিষ্ঠি এসে দর্শন করে তরে গেলো আর পাড়ায় বাস করে পড়ে থাকলে তুমি!" তখন রাধার সঙ্গে গলা মিলিয়ে খেদ করবে?

নাঃ মরবেই সে।

রাধার মতো মরা নয়, সত্যিকার মরা।

রাজীবের মতো যার বর তার মরণই ভালো। বিকেলবেলা ঘাটে কাপড় কাচতে গিয়ে কলকেফুলের বীজ একমুঠো সংগ্রহ করে এনে ভাঁড়ার ঘরে শিলের পাশে লুকিয়ে রাখলো শিবানী, রাতটা একবার এলে হয়।

কলকেফুলের বীজ বেটে খেলেই নাকি অবধারিত মৃত্যু, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে।

আর সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা—

তার এই নির্ব্বান্ধব পুরীর একমাত্র বান্ধব···হেমন্ত রান্নাঘরের দোরে খেতে বসে চুপি চুপি অদ্ভুত এক প্রস্তাব করলো। মেলা বসে পর্য্যন্ত সকাল করে খেয়ে নেয় সে। রাত একটা ছুটোর আগে ফেরে না।

শিবানী যদি নিতান্ত মরীয়া না হতো, তা হলে—এ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারতো। বুঝে ভয় খেতো। কিন্তু ভয় তার প্রাণে কোথায়! যার ভাঁড়ারে লুকোনো আছে মুক্তির অমোঘ ঔষধ?

হেমন্তর অবশ্য একেবারে ভয় ছিলো না তা নয়—কিন্তু শিবানীর ওপর মমতাটাও ছিলো নিতান্ত প্রবল। যতোই শিবানী মূর্খ হোক, ক্লিষ্ট কাতর অভিমানাহত মুখ ওর পুরুষচিত্তকে উদ্বেল করেছে।

—একটা কাজ করতে পারেন বৌদি?

শিবানী চমকে উঠলো ফিস ফিস শব্দে। সচরাচর হেমন্তর গলা রীতিমত দরাজ।

কিছু বলছো নাকি ঠাকুরজামাই?

হ্যাঁ বলছিলাম কি, দাদাকে একটু সকাল করে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পারেন?

—ঘুম পাড়িয়ে? অতি দুঃখেও হেসে ফেলেছে শিবানী—ঘুম পাড়াবো কি আবার? খোকা নাকি?

—পাড়াবেন কি আর চাপড়ে চাপড়ে? চাপা স্বরে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে হেমন্ত—বিছানায় গিয়ে মেলা বক্‌বক্ না করলেই হলো। বেটাছেলের নাকতো ডাকবার জন্যে "মুখিয়ে" থাকে, আপনারা ডাকতে দেন কই? জানি তো—

শত মন খারাপেও হেমন্তর সঙ্গে কথা কইতে গেলেই না হেসে পারে না শিবানী। হেসে বলে—ঠাকুরঝির কথা না হয় জানতে পারো, আমার কথা কি জানো তুমি?

—ও জানতে আবার পয়সা লাগে নাকি? ঠাকুরঝি, আপনি নেই, পৃথিবীর সব মেয়েমানুষেরই ওই এক রোগ। মরুকগে—একটা দিন রোগটাকে ছাড়তে হবে বুঝলেন?

—বুঝলাম! তারপর?

—তারপর—রাত এগারোটা বারোটা নাগাদ মেলার মাঠ থেকে ঘুরে আসবো আমি বুঝলেন? এসে চুপি চুপি জানলায় টোকা মারবো। জেগে থাকতে হবে কিন্তু, নিজেই যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না।

শিবানী অবাক হয়ে বলে—তা যেন পড়লাম না, কিন্তু কেন?

—আঃ ঘুমিয়ে পড়লে আর দোর খুলে দেবেন কি করে? আমি টোকা মারতেই আস্তে আস্তে বাইরের দোরটা খুলে বেরিয়ে আসবেন আমার সঙ্গে, দাদার একঘুম সারা না হতেই মেলাতলা থেকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারবো আপনাকে।

হেমন্তর মতো পাগলের পক্ষেই অবশ্য এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করা সম্ভব, কিন্তু শিবানীরও তখন আর খেয়াল থাকে না, আশা স্পন্দিত বক্ষে বলে—তাই কখনো হয়?

—কেন হবে না? যাবো আর আসবো। আর তো কিছুই নয়, শুধু ওই চতুর্ভুজ মানুষটাকে দেখিয়ে আনা। সবাই বলছে একবার দেখলে নাকি আর জন্ম হয় না। কে জানে বাবা সত্যি না মিথ্যে, মরুকগে, একবার দেখলেই তো গোল মিটে যায়! সত্যি হয়—দিব্যি ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বৈকুণ্ঠে বাস করবেন—মিথ্যে হয় আবার গো জন্ম হবে।

—আর যদি 'ও' উঠে পড়ে?

—পড়বে না, পড়বে না। উপরোধ করে করে বরং ঠেশে চারটী ভাত বেশী ক'রে খাওয়াবেন, জঠরের ভারে ঘুমোবে। বলছিই তো—যাবো আর আসবো। চতুর্ভুজ যে কালই চলে যাবে, আর কি দেখা হবে কোনো কালে?

কাল চলে যাবে!

তবে আর দ্বিধা নয়।

তা'ছাড়া শিবানীও তো চলে যাচ্ছে কাল। তার আগে একবার যদি নারায়ণ দর্শনের পুণ্য করে নেওয়া যায় সে তো উত্তম। আত্মহত্যার পাপটা খাস্ত থাকতে পারে আগে থেকে। উঃ কী আশ্চর্য্য! এ নিশ্চয়ই ভাগ্যের সঙ্কেত। নইলে এতোদিনে তো এ সুমতি হয়নি হেমন্তর!

নাঃ দ্বিধা নয়। যাবেই শিবানী। ফিরে এসে আর রাজীবকে ভয়ই বা কি? ভাঁড়ারে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলেই তো সব নিশ্চিন্ত!

অতএব হেমন্তর প্রস্তাবে রাজী হতে আপত্তি থাকে না শিবানীর।

—মনে থাকে এগারোটা থেকে বারোটা! তার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে হবে দাদাকে! বলে শিষ দিতে দিতে আর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গিয়েছিল হেমন্ত।

কিন্তু আশ্চর্য্য!

কিছুতেই আর সে রাত্রে ঘুম পাড়াতে পারা গেলো না রাজীবকে। বাজে এক ছেলেবেলাকার গল্প ফেঁদে বসলো! হয় তো ভালোবেসেই করেছিল, ক্ষুব্ধ শিবানীকে একটু উৎফুল্ল করতে; মনটা ভালো করাতে।

'হাতির দাঁত' যতোই কঠিন হোক, রাত্রের অন্ধকারে কিছুটা নরম হয়ে আসে বৈ কি!

কিন্তু শিবানীর যে তখন মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে।

পাগলা হেমন্তর সরল কথায় এ প্রস্তাবের কদর্য্য দিকটা তখন তো চোখে পড়েনি, এখন যে মনে হচ্ছে—ডাক ছেড়ে কাঁদে।

রাজীব যদি টের পায়, সে কি বিশ্বাস করবে এই ছেলে ভুলোনো গল্প?...এমনিতেই যে বাড়ী থাকলে হেমন্তর চোখ থেকে পাহারা দিয়ে বেড়ায় শিবানীকে। ...সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে একতিল যে স্বস্তি নেই তার।

কিন্তু শুধু রাজীব কেন? রাধা? নন্দরাণী? পাড়ার লোক?

কে বিশ্বাস করবে?

হে ভগবান, হেমন্ত যেন ভুলে যায়, যেন ওর মন ঘুরে যায়।...পথে আসতে আসতে ওর যেন পা মচকে যায়...মেলার দোকানের সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে ও যেন অজ্ঞান হয়ে থাকে। অজস্র 'যেন' মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে শিবানীর...আর সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জানলায় টোকা পড়ে 'টক্ টক্ টক্'!

চমকে ওঠে রাজীব।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় জানলার দিকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর, কেউ কারুর মুখ দেখবার উপায় নেই, কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানতে পারেন শিবানীর অবস্থা। শিলের পাশের কল্‌কেফুলের বীজ এখন আর কোনো সান্ত্বনাই জোগাতে পারে না তাকে।

শব্দ আর একটু দ্রুত আর একটু চড়া।

নাঃ এ আর মনের ভ্রম নয়।

"—কোন শালার শয়তানী দেখি—" দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট মন্তব্য করে উঠে পড়েছিল রাজীব, আর পাশের দিকে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে খুলেছিল জানলাটা।

'—ঘুমিয়ে পড়েছেন তো দাদা ?'·· হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া অস্ফুট স্বর···'নিন বেরিয়ে আসুন চট করে! ···দেখবেন···নিঃশব্দে··· !'

হ্যাঁ নিঃশব্দেই দরজাটা খুলেছিল রাজীব, আর হ্যাঁচকা টান মেরে ঘরে টেনে এনেছিল হেমন্তকে।

তারপর সেই রাম দা'! ধারালো চকচকে!

শিবানী বোধ হয় একবার চীৎকার করে উঠেছিল··· 'সর্ব্বনাশ কোরো না গো, ও ঠাকুর জামাই—'

হ্যাঁ করেছিল, নইলে দাঁতে দাঁত চেপে ওকথা বলবে কেন রাজীব—ঠাকুর জামাই! ভারী পেয়ারের লোক না? শালাকে আজ কেটে দু'খানা করে তবে কথা! ঘরের বৌ বার করে নিয়ে যেতে এসেছিস শালা? দেখি তোর কতো বড়ো মুরোদ!

তার পরটাই একটা জমাট বাঁধা অন্ধকারের মতো কেমন যেন গুলিয়ে যায়···পায়ের ওপর একটা মারাত্মক আঘাত! ডান পায়ের কড়ে আঙুলটা যাতে উড়ে গিয়েছিল শিবানীর।

পায়ের পাতাটা চেপে ধরে কতোক্ষণ মুখ গুঁজে বসেছিল কে জানে, চৈতন্ত ফিরতে তাকিয়ে দেখলে সেই বীভৎস দৃশ্য।···

রাজীবের পায়ের ওপর আছড়া-আছড়ি করে চীৎকার করছে রাধা আর নন্দরাণী।···আর আস্তে আস্তে লোক জমছে এক এক করে। বাইরের দিকের দরজাটা তো খোলাই পড়েছিল তাদের সুবিধে করতে।

হেমন্তকে অবিশ্যি দেখেনি কেউ, জানেও না কেউ তার কথা।···'সর্ব্বনাশী রাক্ষুসী' শিবানীকেই খেসারৎ দিতে হয় তার নিজেরই চরম দুর্ভাগ্যের।

হাতে করে কেটে কুচি কুচি করে না ফেলেও, শুধু রসনায় মানুষকে মানুষ কতো নির্য্যাতন করতে পারে, শিবানীর মতো এমন করে কে কবে জেনেছে ?

ঘরে বাইরে···পুলিশে আর পড়শীতে···কী ছেঁড়াছিঁড়ি!

কিন্তু শিবানী কেন হেমন্তর নাম করেনি ?

অপরাধী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করবার জন্যে যখন তাকে সহস্র উৎপীড়ন করা হয়েছে, কি করে অমন নিঃশব্দে থেকেছে ?

রাজীবকে যে খুন করলো, জন্মের শোধ আগুন ধরিয়ে দিলো শিবানীর কপালে, সে হতভাগার শাস্তি না হলেই বা কি করে শান্তি হবে শিবানীর ?

ফাঁসির দড়ি গলায় লাগানোর পর যখন রাজীবের মতোই বীভৎস হয়ে উঠবে তার মুখখানা, হাত দু'খানা ঝুলে পড়বে তেমনি অসহায় ভাবে, তখনই না শোধ হবে রাজীবের মৃত্যুঋণ ?

কিন্তু কই ?

সে চেষ্টা কই শিবানীর ?

তারপর অবশ্য অনুমান করেছে অনেকে অনেক কিছু।

কানাঘুষো চলেছে পাড়া ঘরে।

হেমন্তর হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ খুঁজতে মুখর হয়ে উঠেছে অনেক রসনা, কিন্তু নন্দরাণীর সাক্ষ্যর ওপর তো আর কথা চলে না ?

নিজে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন নন্দরাণী, কালই রাত্রের গাড়ীতে দেশে গেছে হেমন্ত। নন্দরাণীকে বলে কয়েই গেছে।

গরজ তো শিবানীর, গরজ তো নন্দরাণীর, পাড়ার লোকের কিছু আর গরজ নেই রাজীবের খুনীকে খুঁজে বেড়াবার ?

ধরা পড়তো - ফাঁসি হতো—সে বরং একটা রং তামাসা দেখা যেতো।

খুন হওয়া লোকটার বিধবাকে দেখে তো নিতান্তই হতাশ হয়েছে লোকে, ফাঁসী যাওয়া লোকের বিধবা কেমন দেখ্‌তে হয় দেখতো একবার!

কিন্তু নন্দরাণী তো পাগল নয়, যে—পরের মেয়ের বৈধব্যের শোধ তুলতে পেটের মেয়েকে বিধবা করে ছাড়বেন!—রাজীবের নাম করে করে আকাশ ফাটিয়ে কান্নার সুখটাও যে চলে যাবে তা হলে!

শোধ তোলার সাধ মেটাতে তো শিবানীই রইলো।

নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব!

পাড়ার লোকেও কেউ এ ঘরের ছায়া মারায় না। খুনটা যে নিতান্তই নারী ঘটিত এতে তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই?

তবে? কে ছায়া মাড়াবে সেই বিষকন্যার?

দিনান্তে একবার এক পাথর আলোচালের পিণ্ডি ধরে দিয়ে যান নন্দরাণী দালানের এক পাশে। ইচ্ছে হয় খান, না ইচ্ছে হয় বয়ে গেলো! ক'দিন থাকবে না খেয়ে?

আর মাইনে করা সারদা রাত্রে আসে শুতে।

এই আগলানোর ঠাটটা বজায় না রাখলে, আরো কী করবে সর্ব্বনাশী কে জানে!

তবু এইটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ শিবানী।—আশ্চর্য্য! বী থেকে কি কলুকফুলের বীজ নিঃশেষ হয়ে গেছে? তাই অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে সে সারদার আগমনের প্রতীক্ষা করে?

সংসারের সব কাজ সেরে শুতে আসতে তো কম রাত হয় না তার।

শুধু আজকেই হয়েছে ব্যতিক্রম।

সারদা অনুপস্থিত।

আর আজকেই শিবানীর মাথার কাছের জানলায় পড়লো সেই মারাত্মক টোকা!

কিন্তু শিবানী কেন জানলা খুলবে না, ওর আবার ভয় কি? আর কি ক্ষতি করতে পারবে তার হেমন্ত?

কিন্তু একী অসম্ভব অদ্ভুত আবদার হেমন্তর!

ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকবে না মানুষের?

পুলিশ নাকি ওর পেছু নিয়েছে, অন্ততঃ ঘণ্টাকতকের জন্যেও আশ্রয় দিতে হবে ওকে!

শিবানীর একক শয্যা বিছানো নির্জ্জন ঘরে আশ্রয়? তাও কাকে? কেবলমাত্র 'পরপুরুষ বললেই কি সমস্ত পরিচয় শেষ হয় হেমন্তর?

শিবানীর যম নয়?

অথচ এতো ব্যস্ত আর ব্যাকুল মিনতি ওর যে প্রায় দিশেহারা হয়েই ওকে ঘরে ঢুকতে পথ করে দিলে শিবানী—ভারী সেই তোরঙ্গটা টেনে দরজা খুলে।

—বাঁচালেন বৌদি,—উত্তেজনারুদ্ধ ফিস্‌ফিসানি স্বর—উঃ কী বলে যে আপনাকে—সেই সন্ধ্যে থেকে পেছু নিয়েছে দু'ব্যাটা—

শিবানী নীচু গলায় স্থির স্বরে বলে—কেন, তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে নাকি?

…ওয়ারেণ্ট নেই। হুঃ!—হেমন্ত নিশ্চিন্ত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে—মাইরি আর কি! তবে কি আছে? সন্দেশের থাল?—উঃ কী ভাবে যে এই ক'মাস পালিয়ে বেড়াচ্ছি সে ভগবান ব্যাটাই জানে। আর বললে বিশ্বাস করবেন না, রাজ্যি জুড়ে টিকটিকি লেলিয়ে রেখেছে গো! যেমন ভাবে লুকিয়ে যে চুলোয় থাকি, সেখানেই সবাই আমার পানে চোরা চাউনি চাইছে? ইঁদুর বেড়ালের মতন ছুটোছুটি করছি আর গর্ত্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই তো আজকেই কি ভাবে যে ছুটে এ গাঁয়ে এসে পড়লাম বলতে গেলে সে এক মহাভারত! যেখানে যাচ্ছি পেছনে লোক—রেল গাড়ীতে চড়েও ছাড়ান নেই দেখি, ঠিক আমার পানে চেয়ে দু'ব্যাটা ফিসফিস করছে! আমিও বাবা তেমনি, একেবারে গাড়ীর উল্টো দরজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে স্রেফ্ হাওয়া! নে এখন কাকে ধরবি ধর?

শিবানী নিশ্চল হয়ে এই নির্ব্বোধ লোকটার যমযন্ত্রণার কাহিনী শোনে।

বিশ্বসুদ্ধ লোক যে ওর দুষ্কৃতির ইতিহাস জানতে পেরে ওকে ধরে ফেলবার চেষ্টায় ফিরছে, এ আর যেন জানতে বাকী নেই ওর।

কি আশ্চর্য্য! লোকটার ওপর মায়া হচ্ছে শিবানীর?

শিবানী দেবতা না দানব? যে লোকটা ওর এতো বড় সর্ব্বনাশ, এতো বড় ক্ষতি করে গেছে, তার দুর্দ্দশা দেখে মমতা? চেষ্টা করেও ভয়ঙ্কর একটা রাগ মনে আনতে পারছে না কেন? উচ্চারণ করতে পারছে না জ্বলন্ত কোনো অভিশাপবাণী? শুধু চেষ্টা করে কণ্ঠস্বরে

কঠোর সুর এনে বলে—আর আমি যদি তোমায় ধরিয়ে দিই ?

—সে আপনি পারবেন না তা জানি। ট্রাঙ্কটার ওপর চেপে বসে নিশ্চিন্ত স্বরে উত্তর দেয় হেমন্ত—সেই ভরসাতেই এসেছি—

—ভরসা ? শিবানী হয়তো বা হেসেই উঠতো—আমার ওপর তোমার ভরসা ? তা' সত্যি, কত বড়ো বন্ধু তুমি আমার!

—মাপ করবেন, মাপ করবেন বৌদি ? আপনি তো নিজের চক্ষে দেখেছেন—বলুন আর কিছু উপায় ছিলো আমার ? প্র্যাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে—কিন্তু সেই থেকে আমিও জ্যান্তে মরা হয়ে আছি বৌদি, একদিকে পুলিশ, আর একদিকে রাজীবদার চোখ সবসময় যেন আগুনের ভাঁটার মতো তাকিয়ে আছে আমার দিকে—

—থাক মেলা কথা বলতে হবে না। তা রাধার ঘরে না ঢুকে এ ঘরে এলে কেন ?

—রাধা ? ও বাবা! হেমন্ত দুই হাত জোড় করে—তাকে আর বিশ্বাস নেই, সে আমায় ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পারে।

—মস্ত লাভ হয় তার তা'হলে, কেমন ?

শিবানীর স্বরে শ্লেষের ঝাঁজ পেয়ে অবহিত হয় হেমন্ত—তা বটে, তা বটে! আমি ঝুললে তার মাছখাওয়াটা ঘুচবে বটে! কিন্তু বললে কি হবে—রাগের মাথায় ওরা সব পারে! মানুষকে খুন করে ফেলতেও আটকায় না। এক মায়ের পেটের ভাইবোন তো ?

আশ্চর্য্য!

এই ক' মাসে কতো পরিবর্ত্তন হলো শিবানীর, কতো বুদ্ধি বাড়লো, আর হেমন্ত ঠিক তেমনটিই আছে ? সেই স্বভাবগত অন্যমনস্কতায় কি যে বলে, খেয়াল করে না।

—খুন করাটা ওদেরই পেশা কেমন ?

তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে শিবানী।

—ঈস্‌স্‌! মাপ করবেন বৌদি, দোহাই আপনার! কিন্তু সত্যি এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি—এখনো ভাল করে বুঝতে পারিনা কে কা'কে খুন করেছে! আমিই কি সত্যি বেঁচে আছি ? নিজের গায়ে চিম্‌টি কেটে কেটে দেখি মাঝে মাঝে!···কতোদিন যে আয়নায় মুখ দেখিনি!

—আর খাওনি কতোকাল ?

ফস্‌ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় শিবানীর।

—খাওয়ার কথা ? সে আর জিগ্যেস করবেন না বৌদি, শুনলে আপনার চোখে জল আসবে। সে কাল তো আর নেই যে জামাই মানুষ অসময়ে এসে পড়েছে বলে রাত বারোটায় ঘটা করে খাওয়ার জোগাড় করতে বসবেন।···মনে আছে তো সেই বিয়ের পরেই নতুন বেলায় একদিন এ গাঁয়ে যাত্রা শুনতে এসে কি বিপদে ফেলেছিলাম আপনাকে ?

আপন রসিকতায় আপনিই হঠাৎ হেসে ওঠে হেমন্ত, স্থান কাল পাত্রের কথা বিস্মৃত হয়ে।···আর পরক্ষণেই দালানের ভিতর থেকে নন্দরাণীর ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া যায়—সারদা! অ সারদা!

ঘরের ভিতর দু'টি মানুষ নিথর।

নন্দরাণীর এ অঞ্চলে আসা প্রায় অভাবনীয়।

কিন্তু বারবার ডাক শোনার পর কতোক্ষণ নিথর থাকা যায় ? বাধ্য হয়েই আচমকা ঘুম ভাঙ্গার অভিনয় করে বলতে হয় শিবানীকে—সারদা তো আসেনি কই ?

হুঁ তাই এতো বাড়, দরজা খোল হারামজাদী।

ব্যাকুল হেমন্ত পুলিশের ভয় ভুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু—বুদ্ধিমতী নন্দরাণী যে আগে খিরকি খুলে বেরিয়ে শিবানীর দরজার বাইরের শিকলে তালা লাগিয়ে এসেছেন, এটা বুঝবে কি করে ?

কলেপড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করে অগত্যাই আশ্রয় অগতির গতি চৌকীর তলায়!

ক্রুদ্ধ নন্দরাণী ঘরে ঢুকেই সরাসর প্রশ্ন করেন—কার সঙ্গে কথা কইছিলি, বল হারামজাদী শতেক খোয়ারী ?

শিবানী হঠাৎ কোথায় পেলো এতো দুঃসাহস ? অবিচলিত ভঙ্গীতে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে নির্ভয়ে বলে—বলবোনা!

এতোটা দুঃসাহস সত্যি কল্পনাও করতে পারেননি নন্দরাণী, ক্ষেপে উঠে বলেন, কী বললি ? কী বললি সর্ব্বনাশী ?

—বললাম তো বলবোনা।

—বটে! ঘাড় বলবে তোর। রাখি আয় দিকি এদিকে—

শান্ত ভাবে বলে শিবানী—পাড়া জানিয়ে চেঁচাবেন-না, তাতে আপনাদেরই অনিষ্ট।

—তাই না কি? অনিষ্টর ভয় দেখাতে এসেছিস আমাকে? দেখি আজ তোর কোন "ইষ্টি" রক্ষে করে তোকে।...রাধি—

পিছন থেকে সানুনাসিক স্বর শোনা যায় রাধার—আঃ মা, চলে এসোনা, কেন তুমি ওই নরকে ঢুকতে গেছো? বলি—বৌয়ের তো আর একীর্ত্তি নতুন নয়, চমকাচ্ছো? ...সারদা তো ভারী পাহারাদার, ঘুমোয় না পাহার পড়ে।...নিত্য দিনই তো সারারাত গালগল্প হাসি তামসা শুনি।

—আচ্ছা আজ তার জড় মারছি। দেখি পাড়ার কোন ড্যাকরা আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে সাহস পায়! পাড়ার লোক ডেকে জড়ো কর রাধি, পাপের শেষ করি আজ।

—তাই ভালো—বলেই হঠাৎ শিবানী একটা অদ্ভুত কাজ করে বসে, হয় তো বা রাধার প্রতি প্রচণ্ড রাগে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই জানলার গরাদে মুখ চেপে নিশুতি পাড়াকে সচেতন করে তীক্ষ্ণ আর তীব্র চীৎকার করে ওঠে—"চোর! চোর! চোর!"

*

তারপর?

প্রায় রাজীবের খুনের রাত্রিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে।... একে একে পাড়ার লোক জমে ওঠে নন্দরাণীর বাড়ী... বেশীর মধ্যে প্রত্যেকের হাতে লাঠি-সোঁটা খোন্তা কুড়ুল। ...অতঃপর—চৌকির তলা থেকে টেনে বার করে; যথেচ্ছ প্রহারের পর—পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে মেহন্তকে। পুলিশে দেওয়া হবে।

পাড়ার সব প্রবীণ ব্যক্তিদের সামনে—জীবনে যাঁরা শিবানীর ছায়া দেখেন নি, তাঁদের সামনে—মুখ তুলে স্পষ্ট গলায় সাক্ষ্য দিয়েছে শিবানী, স্বামীর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে। অনুনয় করেছে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে। ...নিখুঁৎ নির্ভুল ভাবে বলেছে শাশুড়ী ননদের ভয়ে এতোদিন স্বামীহন্তার নাম প্রকাশ করতে সাহস করেনি, প্রত্যক্ষ্য প্রমাণের আশায় দিন গুনেছে। কৌশল করে আজকে ফেলেছে ফাঁদে। প্রায়ই তো আসে হেমন্ত স্ত্রী কন্যাকে দেখতে। নন্দরাণী না হয় মেয়ের মুখ চেয়ে ছেলের শোক ভুলতে পারেন, ক্ষমা করতে পারেন খুনী জামাইকে, কিন্তু শিবানী করবে কিসের সুবাদে? হেমন্তকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে না পারলে মরেও কি শান্তি হবে তার?

মুখে কাপড় গুঁজে না হয় মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে হেমন্তর, রাধা নন্দর মুখের কুলুপ এঁটে দিলো কে? বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে শিবানীকে যা খুসি বলতে দিচ্ছে কি বলে? শিবানীর মুখ বন্ধ করবার উপায় হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে?

অনেকদিন পরে মনের মতো একটা রং তামাসা দেখতে পেয়ে সত্যিকার খুসি পাড়া-পড়শীর দল অনেক বাকচাতুরীর পর অবশেষে আপন পথ দেখে, হাত পা বাঁধা হেমন্তকে উঠোনে ফেলে রেখে।

সকাল হলে দেখা যাবে ব্যবস্থা।

নিস্তব্ধ হয়ে যায় বাড়ী।

হারিকেনের শিখাটা অযথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে জ্বালানোর খেসারৎ দিতে সেটা হঠাৎ একেবারে দেউলে হয়ে জবাব দিয়েছে।...উঠে গিয়ে বোতল থেকে একটু কেরোসিন ঢেলে আলোটা জ্বালবে এ রুচি তিনজনের কারুর নেই।

মায়ে ঝিয়ে শিবানীর ঘাড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়বে—প্রতি মুহূর্ত্তে এই আশঙ্কা নিয়েও শিবানী নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে ওদের থেকে হাত কয়েক দূরে।

অন্ধকার।

মুখ দেখে মনের কথা অনুমান করার কথা নয়, তবে নাকি লেখকরা সবজান্তা তাই—অনুমান করতে হয় না দেখতেই পায়—নিজের হাতে নিজের মাথাটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে নন্দরাণীর, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে কুলটা বৌকে হাতে নাতে ধরে ফেলবার ফিকির খুঁজতে গিয়েছিল বলে।...নিজের হাতে নিজের চুলগুলো মুঠো মুঠো করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে রাধার হেমন্তর দুর্গতি দেখে নয় পুলিশের তাড়া খেয়ে হেমন্ত রাধার কাছে না এসে শিবানীর কাছে গিয়েছিল আশ্রয় নিতে এই দেখে।

আর শিবানীর?

কি ইচ্ছে হচ্ছে তার? নিজের হাতে নিজের হৃৎ-পিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলতে?...কিন্তু না, আগেই যে সে হৃৎপিণ্ডটা উপরে ছিঁড়ে ফেলেছে চিরশত্রুদের ওপর আক্রোশ ক'রে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর সিপাহীবিদ্রোহ "কাল বৈশাখীর" ঝড়ের মত রাজনীতিক গগনে দেখা দিয়াছিল সেই বৎসর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার শত বৎসর পূর্ব্বে—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে—পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাভব হয় এবং ইংরেজ এ দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে। ইংরেজ প্রথমে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে মশনদে বসাইয়া ক্রমে দেশ অধিকার করে। তাহার পূর্ব্বেই দিল্লীতে বাদশাহদিগের প্রভাব ও প্রতাপ নামশেষ হইয়াছিল। হাণ্টার সত্যই বলিয়াছেন—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য জীর্ণ অট্টালিকার মত ভগ্নদশাগ্রস্ত হয় এবং তখন—"Puppet emperors continued to reign at Delhi over a numerous seroglio, under such lofty titles as Akbor or Alamgir. But their power was not confined to the palace." বাঙ্গালার শাসক নবাবরা সুযোগ পাইয়া কতকটা স্বাধীন হইয়া উঠেন। মীরজাফরের শাসন কালীন অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন :—

"মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

সেই অবস্থায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাঙ্গালায় সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিল! যে বীরভূম যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা লোকাভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইল। বাঙ্গালীর মনীষা সেই ভগ্নস্তূপ হইতে নূতন সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হইল।

ইংরেজের শাসনে অশান্তির স্থান শান্তি গ্রহণ করিল; লোক মনে করিল—ধন ও প্রাণ নিরাপদ হইল। যে অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা—

"দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে সালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই"—সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ইংরেজ শাসন ও শোষণ করিতে লাগিল; কিন্তু পোষণের ফল উপলব্ধি হইতে বিলম্ব হয়। তাই বহু বিলম্বে ভারত-বাসী এ দেশে ইংরেজ সম্বন্ধে আমেরিকার রাজনীতিক ব্রায়েনের উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিল :—

"While he has boasted of bringing peace to the living, he has led millions to the peace of the grove; while he has dwelt upon order established between warring troops, he has impoverished the country by legalized pillage."

তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন—রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'অর্থনীতিক ইতিহাসে' আর সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁহার 'দেশের কথায়।'

দেশে ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ সপ্রকাশ হইল। কারণ, ইংরেজ রাজা এবং বহুগুণে গুণী। ইংরেজও এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে সহায় হইল। দুই সম্প্রদায়ের ইংরেজ সে কাজে অগ্রণী—এক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ দ্বিতীয় ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য—ভারতবাসীকে খৃষ্টান করা; তাহাই তাঁহারা সভ্যকরা বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য—অল্প ব্যয়ে শাসন কার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য ইংরেজী শিক্ষিত দল সৃষ্টি। সরকার যে শিক্ষায় সাহায্য দিতে লাগিলেন, তাহাতে মানুষের যাহা অত্যন্ত প্রয়োজন—শৃঙ্খলা, সন্তোষ ও ধর্ম্ম—সেই তিনটি উপেক্ষিত হইল।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা নব যুগের প্রবর্ত্তন করিল। রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন

চাহিলেন। প্রথমে যে সকল শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সকল দেশের লোকের আগ্রহে, অর্থে ও উদ্যমে দেখা দিল।

দেশে যখন বহু ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন সে-সকলের সুযোগ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—গোমুখীমুখ হইতে যেমন জাহ্নবীর পাবনী ধারা নানা পথে প্রবাহিত হইয়া দেশকে সুজলা, সুফলা করিয়াছে তেমনই শিক্ষাকেন্দ্রের উৎস হইতে জ্ঞানের ধারা বহু পথে সমাজে প্রবাহিত করা—জনগণের কল্যাণ সাধন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—তাহা

(১) গঠনকারী

(২) উদার

(৩) সাম্যমূলক (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ধনী-দরিদ্রে ভেদ নাই)

(৪) সংযতকারী

(৫) ঐতিহাসিক

(৬) ব্যক্তিগত

(৭) আধ্যাত্মিক

প্রায় বিশ্ববিদ্যালয় বাণীমন্দির। মন্দিরের গাম্ভীর্য্য ও পরিবেশ যেমন মনকে অভিভূত করে—বিশ্ববিদ্যালয়ের গাম্ভীর্য্য ও পরিবেশ তেমনই মানুষের মনকে বিদ্যার্থী করিয়া তুলে। যে মনোভাব লইয়া ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করে বিদ্যার্থীরা সেই মনোভাব লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথম যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভাওয়েল বলিয়াছিলেন, যাঁহারা অভিযোগ করেন, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল উত্তরীয়-ধারী পুস্তক (Books in chudder) বাহির হয়, তাঁহাদিগের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন 'দুর্গেশনন্দিনী' তাহাই প্রতিপন্ন করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি—"বিদ্যা-বিস্তার"। বিদ্যা-বিস্তারের যে আগ্রহ হেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পরিচয়ে দুইজন বাঙ্গালীর নামোল্লেখই যথেষ্ট :—

(১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(২) ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস'।
টোলস্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই 'ফিনিস্' ॥

এই সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত অসাধারণ প্রতিভাশালী ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাতীক্ষ্ণ ক্ষমতা লইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকাব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। সত্যই যে দাতা ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিতে পারিতেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিলেন—কিন্তু সে স্বর্ণমুষ্টি। তিনিই বাঙ্গলার (বোধ হয় ভারতে) প্রথম ব্যক্তিগত চেষ্টায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র—ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। তাঁহার সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।"

তিনি যখন বিহারে শিক্ষা-বিস্তারের উপায় উদ্ভাবনের ভার পা'ন, তখন বিহারে বহু ভাষা প্রচলিত—বাঙ্গলা, মগধী, মৈথিলী, হিন্দী প্রভৃতি। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন, বিহারে বাঙ্গলাকেই শিক্ষার বাহন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে আজ ভাষার জন্যও বাঙ্গলা বিহার দাবী করিতে পারিত। কিন্তু ভূদেব তাহা করেন নাই। শিক্ষা-বিস্তারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে হিন্দীই অধিক লোক ব্যবহার করে দেখিয়া তিনি বিহারে হিন্দীকে প্রাথমিক শিক্ষার বাহন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, অল্পকাল মধ্যেই হিন্দী পুষ্টিলাভ করিবে। ইহাই শিক্ষাব্রতের উপযুক্ত কার্য্য।

বলাবাহুল্য, যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শিক্ষা এ দেশের বিদেশী শাসকদিগের পরি-চালনাধীন। সেই কারণে তাহাতে কতকগুলি ত্রুটি অনিবার্য্য হইয়াছিল। সে সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান

যে শিক্ষা প্রদান করা হইল, তাহাকে "জাতীয় শিক্ষা" বলা যায় না। জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য—প্রত্যেককে তাহার কার্য্যের উপযুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য অবজ্ঞা করায় যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাহার কথা অরবিন্দ বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বর্জ্জনের প্রস্তাব সমর্থনে বলিয়া ছিলেন—যে ভাবে এ দেশে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার দৈন্য অসাধারণ, তাহাতে শিক্ষার্থীকে আত্মসম্মানের অনুশীলন না করাইয়া বিদেশী সরকারের আনুগত্যে প্ররোচিত করা হয়।

আজ ইংরাজ এ দেশের শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। একান্ত পরিতাপের বিষয় আজও ভারতের জাতীয় সরকার ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন নাই।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার ভার এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নহে। এখন সরকার সে পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কি করেন, তাহা বুঝিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই জন্য হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ভারত সরকার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছেন। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী কোন্‌টি রাষ্ট্র ভাষা হইবে, তাহা লইয়া কিছুদিন বিতর্ক চলিয়াছিল। হিন্দী সংস্কৃতমূলক এবং তাহাতে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য আর হিন্দুস্থানীতে ফার্সি শব্দ অনেক। বিতর্কের পরে স্থির হইয়াছে, হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হইবে। কিন্তু হিন্দীর দৈন্য অসাধারণ। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালার মত ঐশ্বর্য্য আর কোন ভাষার নাই—কোন ভাষার সাহিত্য বাঙ্গলার মত সহজ নহে। সুতরাং হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। হিন্দী শিক্ষা স্বেচ্ছাসাপেক্ষ হইতে পারে। বিশেষ ইংরেজী বর্জ্জন করিয়া তাহার স্থানে হিন্দীর প্রবর্ত্তন মূঢ়ের কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। সভ্যজগতের সহিত আমাদিগের প্রয়োজনে ও ভাবের আদান প্রদানে ইংরেজীও ব্যবহৃত হইতেছে এবং এখনও যে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার সভ্যজগতে বৈজ্ঞানিকদিগকে বিস্মিত করিতেছিল, তখন আমরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঁহারা যেমন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারের বিষয় জানিবার জন্য ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন তেমনই তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের আবিষ্কার বিবরণ বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করেন, তবে বিদেশীরা সে সকল জানিবার জন্য অবশ্যই বাঙ্গালা শিক্ষা করিবেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং উভয়েরই বাঙ্গলা রচনায় নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আবিষ্কার সমগ্র সভ্য জগতে জানাইবার জন্য ইংরেজীতে তাহার বিবরণ প্রদান প্রয়োজন; আবিষ্কার যত শীঘ্র জগতে বিঘোষিত হয়, ততই মঙ্গল। কাজেই আমরা এখন ইংরেজী শিক্ষা বর্জ্জন করিতে পারি না। মাতৃভাষা বাঙ্গলার সহিত যদি ইংরেজী শিক্ষাও করিতে হয় তবে তাহার উপর আবার হিন্দী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অসঙ্গতই হইবে। আমরা আশা করি, সেকেণ্ডারী একজামিনেশন বোর্ডও ইহা বিবেচনা করিবেন এবং হিন্দী রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের মাতৃভাষা বলিয়া বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে তাহা শিক্ষায় বাধ্য করিবেন না।

আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে অকারণ কতকগুলি দাবী শৃঙ্খলাভঙ্গে পর্য্যবসিত হইতেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষার সময় পিছাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় আর পরীক্ষার পরে প্রশ্ন কঠিন হইয়াছে বলিয়া "যেন তেন প্রকারেন" উত্তীর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ও অনুত্তীর্ণ দিগকে আবার একটি পরীক্ষা দিবার সুযোগ দানের জন্য আন্দোলন হয়। ইহা যেন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে অকারণ অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করে। উপাধিলাভের জন্য তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে অসঙ্গত উপায়ও অবলম্বন করে তাহাও দেখা গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

পরীক্ষার মান উচ্চ করিবার চেষ্টায় আপত্তি হয়। পরীক্ষার মান খর্ব্ব করা হইয়াছে, ইহা হয়ত সত্য। কিন্তু তাহার কারণ কি, প্রয়োজন কি হইয়াছিল?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষা বিদেশী শাসকদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সেই জন্য তাহাতে বহু ত্রুটি ছিল। সে সকল ত্রুটি সংশোধনের যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বিদেশীদিগের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিল; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহাদিগের সংখ্যাধিক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন 'শিক্ষার হেরফে'র প্রবন্ধ রচনা করেন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন সে কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই।

শিক্ষিত ভারতীয়গণ এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সরকারকে বলিতেছিলেন। জাপানে সম্রাট যখন শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন—জাপানে ইহাই সরকারের অভিপ্রেত যে এমন ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা হইবে যে, কোন গ্রামে একটি অশিক্ষিত পরিবার কোন পরিবারে একজন ও অশিক্ষিত ব্যক্তি থাকিবে না—তাহার পরে জাপানে শিক্ষাবিস্তার কিরূপ দ্রুত হইয়াছিল, তাহা শিক্ষিত ভারতীয়গণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের জয়ের পরে ভারতীয়গণ জাপানের উন্নতির কারণ ও স্বরূপ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এদেশে জাপানের উন্নতির প্রভাব য়ুরোপীয়রাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সার আলফ্রেড লায়াল লিখিয়াছিলেন—

"The Japanese war, in which Russia lost battles not only by land, out also at sea, was ...a significant and striking warning.

লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন—সমগ্রপ্রাচীর উপর দিয়া যে জাগরণের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, তাহার গতি রোধ করা যায় না।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করেন, এদেশে অবৈতনিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার কি উপায় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করা হউক। কিন্তু সরকারপক্ষীয়দিগের ভোটে সেই প্রস্তাবও যখন ত্যক্ত হয়, তখন দেশের লোকের মনে হয়, ইংরেজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে, দেশে শিক্ষার ঈপ্সিত বিস্তার সাধন সম্ভব হইবে না।

সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু প্রভুত্ব হইয়াছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার মনোনীত করা হয় নাই। সে বিষয় যখন এ দেশের সংবাদপত্রে আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত কেবল সরকারী কর্ম্মচারী ইংরেজদিগকেই ভাইস-চান্সেলার মনোনীত করা হইত। সংবাদপত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন মহেন্দ্রলাল সরকার বা (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের) ফাদার ছাটোঁর মত লোককে ভাইস-চান্সেলার করা হইবে না। চতুর ইংরেজ সরকার সেই আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম বাঙ্গালী ভাইস-চান্সেলার মনোনীত করেন।

তিনি বাঙ্গালী—কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী - কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। তাহার পরে আবার কয় জন য়ুরোপীয় ভাইস-চান্সেলার হ'ন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী। তিনি স্থির করেন, তিনি দেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য অগ্রসর করিবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই সে কাজ করিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন সিংহদ্বার বন্ধ তখন পশ্চাতের দ্বারপথে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।—

সম্মুখে তরঙ্গমালা ভাঙ্গি পড়ে
বেলা বালু পরে,
সূচ্যগ্র মেদিনী যেন কোনরূপে ভয় নাহি করে;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ—শত ক্ষুদ্র খাতে
প্রবাহিয়া—
নিঃশব্দে সাগর বারি চারিদিকে পড়ে
ছড়াইয়া।

তিনি কেবল বাঙ্গালায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত করেন নাই; পরন্তু পরীক্ষার মান খর্ব্ব করিয়া

বহু ছাত্রকে শিক্ষালাভের জন্য আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রাথমিক পরীক্ষার মান খর্ব্ব করায় মাধ্যমিক ও উপাধি পরীক্ষারও কতকটা সেই পন্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহাতে উচ্চ শিক্ষিতের অভাব না হয়, সে জন্য তিনি "পোষ্ট গ্রাজুয়েট" শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। সে জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয় এবং তাহাও নিম্নস্থ পরীক্ষার মান খর্ব্ব রাখিবার অন্যতম কারণ।

হয়ত সেই ব্যবস্থার ফলে ছাত্রদিগের মনে যে কোন উপায়ে উপাধি লাভের আগ্রহ অসঙ্গতরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই আগ্রহ শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘনেও তাহাদিগকে সময় সময় প্ররোচিত করে। যদি তাহাই হয় এবং সহজে সেই আগ্রহ নিবৃত্ত করা না যায়, তবে কি সে জন্য কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারেনা? উপায় যে থাকিতে পারেনা, এমন নহে।

প্রথম উপাধি পরীক্ষা—বি, এ, বা বি, এস, সি, —সহজলব্ধ করা যায়। তাহা হইলে মাধ্যমিক পরীক্ষার মান আরও উচ্চ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল ছাত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আরও দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উপাধি পরীক্ষা দেয়। যদি এমন নিয়ম করা হয় যে যাহারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর নিয়মিত ভাবে কলেজে পাঠ করিবে, তাহারা নিয়মিত ভাবে পাঠের ও সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে পাইলে—অতি সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই উপাধি লাভ করিতে পারিবে, তবে সে উপাধির মূল্য অধিক না হইলেও ছাত্রদিগের উপাধি লাভ ঘটিবে। শতকরা বহু পরিক্ষার্থীই উপাধি পাইবে।

অবশ্য এই ব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রদিগের জন্য। এখনও উপাধি পরীক্ষায় "পাস"ও "অনার্স" দুই ভাগ আছে। "অনার্স" পরীক্ষায় কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করিয়া বরং পরীক্ষার মান উচ্চ করা যাইতে পরে। তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর পরীক্ষা উভয়ই উচ্চাঙ্গের হইলে, যে সকল ছাত্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারাই "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগে প্রবেশ করিতে পাইবে এবং তথায় উচ্চ শিক্ষালাভের ও গবেষণার সুযোগ লাভ করিবে। তাহাদিগের সংখ্যা অল্প হইবে বটে, কিন্তু তাহারাই বিদ্যারক্ষেত্রে অধিক আদর লাভ করিবে। "পাস" ও "অনার্স" দুই প্রকার পরীক্ষায় প্রভেদ বর্দ্ধিত করিলেও ভাল হয়। যাহাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় হইতে ছাত্রগণ কোন্ উপাধিলাভের জন্য অধ্যয়ন করিবে তাহা বুঝিয়া অধ্যয়নের বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারে।

যদিও বর্ত্তমানে চলচ্চিত্রের আকর্ষণ ও খেলার অত্যধিক প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে নানা আন্দোলনেও ছাত্রদিগের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, তথাপি বাঙ্গালীর মনীষায় আস্থা হারাইবার কোন কারণ নাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিজ্ঞান বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরে সাহিত্য বিভাগে সেই পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হইলেও তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল—তিনি continuous student—শিক্ষার শেষ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। যদুনাথ সরকার অধ্যাপকের কাজের অবসরে ইতিহাসে যে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এখনও গবেষণায় বড় রহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ইতিহাসে গবেষণা করিতেছেন।

এ সকলই বাঙ্গালীর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহার ও মেধার পরিচায়ক। সেই স্পৃহা ও সেই মেধা সুপ্রযুক্ত করিবার সুযোগদানই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য—তাহাতেই তাহার নীতি সার্থক হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র—যাহাতে তাহার গাম্ভীর্য্য ও উপযোগিতা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাবে লুপ্ত বা নষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষক ও ছাত্র উভয় সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক কর্ম্মচারী ও ছাত্রদিগকে ধর্ম্মঘটে প্ররোচিত করিয়াছেন—এমন অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় ও কেন তাঁহারা সেরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা

আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমরা আশা করি, তাঁহারা তাঁহাদিগের পদের গাম্ভীর্য্য ও দায়িত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন বিবেচনা করিতে বিরত হইবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে, সে সকলের মধ্যে প্রধান—

(১) দেশের রাজনীতিক অবস্থা বিবেচনায় শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন অনুভূত হইলে—সে জন্য কি করা প্রয়োজন।

(২) দেশের অর্থনীতিক অবস্থা বিবেচনায় শিক্ষাদান পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্জ্জন প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন অনুভূত হইলে—সে জন্য কি করা প্রয়োজন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার স্থান না হয়, সে বিষয়ে কি করা প্রয়োজন। কারণ, বিশৃঙ্খলার স্থানে স্থায়ী শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা দুই দিক হইতে দেখা দিয়াছে—(ক) কর্ম্মচারীদিগের দিক হইতে, (খ) ছাত্রদিগের দিক হইতে। কোন পক্ষ হইতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের দিক হইতে বিবেচনা করা প্রয়োজন—বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিযোগ সরকারের শ্রম কমিশনারের বিচারাধীন হইতে পারে কি না? কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে undertaking পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কি না? বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে অভিযোগ বিচার জন্য স্বতন্ত্র কমিটী নিযুক্ত করিতে পারেন। ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে কোন অভিযোগ থাকিলে সিণ্ডিকেট তাহার বিবেচনা করেন। দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য ভাইস-চান্সেলারকে অথবা ভাইস-চান্সেলার ও সিণ্ডিকেটের দুইজন সদস্যে গঠিত কমিটীকে ভার দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) উপাধি পরীক্ষায় সাধারণ ও বিশেষ দুই ভাগ করা সঙ্গত কি না? যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য হ্রাস না হয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

ভাইস-চান্সেলার, যদি অভিপ্রেত বিবেচনা করেন, তবে এই বিষয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে মনোযোগী ব্যক্তিদিগের মনযোগ গ্রহণ করিতে ও পরামর্শ লইতে পারেন।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

রম্ভালালবাবুর ধারণা তাঁর আশে-পাশে যে সব মানুষ বিচরণ করে তাদের শ্রম লাঘব করবার জন্যেই তিনি শ্রীদেহ ধারণ করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কি ভাবে কম খেটে বেশী রোজগার করা যায়, এই গবেষণা করতে করতে তিনি মাথার চুল পাকিয়ে ফেল্লেন—কিন্তু উপার্জ্জন করা আর তাঁর জীবনে ঘটে উঠল না! ভাগ্যিস বাপ মোটা রকম কোম্পানীর কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, তাই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্রোতে এখনো ভাঁটা পড়েনি। নইলে কবে শুক্‌নো ডাঙায় নৌকো একেবারে আটকে থাক্‌তো।

রম্ভালালবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক জীবনের বহু অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কম পরিশ্রমের কলা-কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়েই সব মেহনত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে—লাঙ্গল চালানো আর সুরু করা সম্ভবপর হয়নি।

এ হেন রম্ভালালবাবুর সব গবেষণাই অভিনব এবং সব ব্যবস্থাই মৌলিকতার দাবী রাখে।

অতি ছোট-খাট জিনিসের ভেতর দিয়েও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা চালু করবার পক্ষপাতি।

শাক সব্জীর ঝুড়ি নিয়ে চাষারা বাজারে যাচ্ছে—তিনি তাদের রাস্তার মাঝখানে থামাবেন এবং ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে, কি ভাবে সমতা বজায় রেখে মাল বহন করলে পিঠের শিরদাঁড়া সোজা থাকবে আর মোট বইলেও মাথার কোনো কষ্ট হবে না। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মেহনত ক'রে যারা খায়—তারা রম্ভাবাবুর এই বিনামূল্যে বিতরিত সদুপদেশ গ্রহণ করতে চায় না, আবার বেশী পেড়াপিড়ি করলে গালমন্দ দিয়ে—পাশ কাটিয়ে প্রস্থান করে।

মজুরেরা হয়ত মাটি কেটে রাস্তা তরাট করছে; তিনি খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কর্ম্ম-পন্থা নিরীক্ষণ করলেন, তারপর সবাইকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—কি angle-এ কোদাল ধরে মাটি কাটলে মেহনত কম হয় অথচ বেশী মাটি কাটা যায়। বাবুর কথা শুনে মজুরের দল হো-হো করে হাস্‌তে থাকে। বলে, পাগলা বাবু!

কিন্তু অত সহজেই রম্ভালালবাবু হাল ছেড়ে দেন না। পরের উপকার করার মধ্যে যে কৃচ্ছ্রসাধন আছে তিনি তা আবিষ্কার করেছেন। জগতে তিনি তার বীজ ছড়িয়ে দিতে চান। বাইবেলের গল্প তাঁর মনে পড়ে

যায়। কৃষক যখন ক্ষেতে বীজ ছড়ায় তখন কিছু পড়ে কাটা গাছের মধ্যে, কিছু পড়ে শক্ত অনাবাদী জমিতে, কিছু পড়ে পাথরের ওপর—এগুলি হয়ত পাখীতে খেয়ে যায়! কিন্তু ভালো এবং চষা জমিতে যে বীজগুলি পড়ে তা থেকেই জন্মায় আসল ফসল। মানুষের মনও তাই! রন্তাবাবু জানেন, সবাই হয়ত তার সদুপদেশ গ্রহণ করবে না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যারা তার কথা শুনবে এবং মনে-প্রাণে সেই পথে কাজ করবে, তারা উপকার পাবেই। এ বিষয়ে রন্তালালবাবু একেবারে স্থির নিশ্চয়।

একদিন রন্তাবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন—হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল, গোয়ালারা রাস্তার গঙ্গাজলের কল থেকে বেমালুম জল মেশাচ্ছে দুধের সঙ্গে।

দেখেই রন্তাবাবুর সমস্ত রক্ত ব্রহ্মতালুতে গিয়ে উঠল। এম্‌নিতে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ তিনি। কিন্তু এই জাতীয় অনাচার দেখে চুপচাপ বসে থাকা যায় কখনো? এই দুধের ভিতর দিয়েই ওরা সারা দেশের লোকের মধ্যে রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে! কী কুশিক্ষা! তিনি গোয়ালাদের ডেকে জড় করলেন। তারপর তাদের উদ্দেশ করে বল্লেন, দেখ ভাইরা, দুধে তোমরা জল মেশাবে সে কথা জানি। ইংরেজী অক্ষর Q যেমন পাশে U-কে না নিয়ে পথ চলতে পারে না—তেমনি জল না মিশিয়ে তোমরা দুধ বিক্রী করতে পারো না—একথা আমি জানি। তাই বলে নোংরা জলগুলি দুধের সঙ্গে মেশাবে? সোজা আমার বাড়ীর উঠোনে চলে যাবে—ফিটকিরি দিয়ে জল পরিষ্কার করে জালা ভর্ত্তী রেখে দেবো—যতখুশী মিশিয়ে বিক্রী করো—আমার কোনো আপত্তি নেই।

গোয়ালারা প্রথমে রন্তাবাবুর ডাকে হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল—বাবু বোধকরি কর্পোরেশনের লোক হবেন। একটা ফ্যাসাদে ফেল্‌তে কতক্ষণ! কিন্তু যখন জানা গেল যে, তিনি গায়ে পড়ে মোড়লি করছেন, তখুনি গোপবৃন্দের স্বরূপ প্রকটিত হয়ে উঠল। উপদেশের পরিবর্ত্তে তারা বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় গাল দিতে দিতে দল বেঁধে প্রস্থান করল।

রন্তাবাবু আপন মনে ক্ষেদোক্তি করে বল্লেন, "উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

রন্তাবাবুর 'কপালকুণ্ডলা' পড়া ছিল! সংসারে একদল লোক থাকে যারা পরের জন্যে কাষ্ঠ আহরণ করিবেই। আমাদের রন্তাবাবু এই রকম পরের জন্যে কাষ্ঠ আহরণ করে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কি কুক্ষণে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সেই কথাই শুধু ভাবছি। যে কাহিনীটি গৃহের গৃহিণীর কাছে গোপন রেখেছি—আজ নিরিবিলি তাই আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। শুনতে পাই হৃদয়ের গোপন কথার ভার লাঘব করলে মানুষের মন আপনা থেকেই হাল্‌কা হয়, সে তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারে। আমিও তাই একটু আরাম করে বুকের বোঝা হাল্‌কা করে ঘুমুতে চাই।

যাক্ এবার আসল ঘটনায় আসা যাক্।

এক আত্মীয় বাড়ীতে বৌভাতের নেমন্তন্ন ছিল। তাই পুলকিত হয়ে ওঠবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। এই রেশনের যুগে—অতিথি নিয়ন্ত্রণের আমলে কে কাকে নেমন্তন্ন করছে!

শুধু নেমন্তন্নে গেলেই ত' হল না—তার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাও ত' করতে হবে! সেই জন্যে সকাল থেকে যথেষ্ট ঝামেলা যাচ্ছিল দেহ আর মনের ওপর দিয়ে।

প্রথম কথা—বিয়ে বাড়ী যাবার মতো বাড়তি জামা-কাপড় নেই! কণ্ট্রোলের দয়ায় একটি কাপড়ে এসে ঠেকেছে। তাই পরেই ডালহৌসী স্কোয়ারে কেরাণীগিরি করতে যাই আর সকাল-সন্ধ্যেয় ছাত্র ঠ্যাঙাই। সুতরাং শেষ রাত্তিরে উঠেই সাবান দিয়ে জামা, ধুতি, গেঞ্জি সব কেচে দিলাম যাতে অফিসে যাবার আগেই সব শুকিয়ে যায়। তারপর বিয়েতে প্রীতি উপহার দেবার একটা প্রথা আছে! মাসের শেষ—নগদ টাকা খরচ করে কিছু কিনে দেবার উপায় নেই—খাতা-পত্তর ঘেঁটে বের করা গেল একখানি বই। কবে কোন বন্ধুর কাছ থেকে পড়তে এনেছিলাম—কিন্তু আর ফেরৎ দেয়া হয়নি! ভালই হয়েছে। যাকে রাখা যায় সেই রাখে।

বইখানির নানা পাতায় বন্ধুর নাম লেখা আছে। ধীরে ধীরে ব্লেড ঘষে সেগুলি তুলে ফেল্‌তে হল। তারই ওপর 'নব বধূর করকমলে' কথাটা বেশ কলাসম্মত ভাবে লিখে একটি কর্ত্তব্য সমাধা করলাম।

ওদিকে ঘন-ঘন খবর নিতে হল যে, জামা-কাপড় শুকিয়েছে কিনা! যথাসময়ে সূর্য্যি ঠাকুর কৃপা করলেন এবং স্নানাহার সমাপনান্তে গৃহিণীকে জরুরী ঘোষণা জানিয়ে দিলাম—নেমন্তন্ন আছে, রেশনের যুগে যেন রাত্তিরে আমার চাল নিয়ে অপচয় করা না হয়।

এক খিলি পান মুখে দিয়ে ছাতা ও উপহারের বই বগলে নিয়ে তড়িৎবেগে বাসের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলাম। এর পরে মূল কাহিনীর ছেদ পড়ল অফিসের দৈনন্দিন ফাইল ঘাঁটার কাজে এবং নতুন ক'রে গল্পের যবনিকা উত্তোলিত হ'ল সন্ধ্যেবেলা ছুটীর পর।

অফিস থেকে বেরুতে আমার একটু রাতই হয়ে থাকে। যখন বেরুলাম বেশ নির্জ্জন হয়ে গেছে রাস্তা ঘাট। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। ভাবলাম, ট্রামে-বাসে না উঠে হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাই—গায়ের ঘামটাও মরবে—সারাদিনের গুমোট ভাবটাও একটু কাটবে।

বৌবাজার ষ্ট্রীট ধ'রে চল্‌তে শুরু ক'রে দিলাম। আত্মীয়টির বাসা আমার জানা ছিল না। কিন্তু পকেটে নেমন্তন্ন চিঠিখানি ছিল। লোককে জিজ্ঞেস ক'রে গলিটি কি আর খুঁজে বের করা যাবে না?

চাবিকাটি যখন হাতে আছে তখন আর ভাবনাটা কি? একটা গানের কলি ভাজতে-ভাজতে আপন মনে এগিয়ে চল্লাম।

কলেজ ষ্ট্রীট আর বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে হ'ল চিঠিটা বের ক'রে একবার ঠিকানাটা দেখে নেয়া ভালো। নইলে হারা-উদ্দেশ্যে আর কতদূর ঘুরবো? তবে এইটুকু মনে ধারণা আছে যে, সারপেন্টাইন লেন, বৌবাজার আর শেয়ালদা অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও হবে।

রঙীণ কারুকার্য্য করা চিঠিখানি পকেট থেকে বের ক'রে একমনে ঠিকানা দেখ্‌ছি, এমন সময় অতর্কিতে নৈশ আক্রমণের মতো এসে হাজির হলেন রম্ভালালবাবু।

রম্ভাবাবুর চোখে-মুখে পরের উপকার ক'রবার একটা সোনালী-সদিচ্ছা খেলে বেড়াচ্ছে।

আমাকে হাতের কাছে পেয়ে তিনি যেন বর্ত্তে গেলেন। বল্লেন, আরে, বৃন্দাবন যে! বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছ বুঝি? তা' উপহার কি নিলে দেখি—

কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলাম, কি আর এমন নিতে পারি? সামান্য একখানি বই নতুন বউকে উপহার দেবো।

কিন্তু অত সহজে রম্ভাবাবু আমায় নিস্কৃতি দিলেন না; প্যাকেটটি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেল্লেন, তারপর মুখটি বিকৃত ক'রে বল্লেন, উঁহু! শুধু একখানি বই কি নতুন বৌয়ের হাতে তুলে দেয়া চলে?

আমি জবাব দিলাম, উপায় কি বলুন, নেহাৎ ছাপোষা মানুষ—

রম্ভাবাবুর মুখে-চোখে ব্যস্ততা দেখা গেল। বল্লেন, তা' হ'লে নিদেন পক্ষে কয়েক ঝাড় রজনীগন্ধা নিয়ে যাও—; একটি টাকা দাও, বৌবাজারের মোড়ে খুব টাট্‌কা রজনীগন্ধা পাওয়া যায়—আমি তোমায় কিনে দিচ্ছি।

ঘড়ির পকেটে সযত্নে ভাঁজ করা সর্ব্বসাকুল্যে একটি মাত্র এক টাকার নোট সম্বল ছিল। রম্ভাবাবু যেরকম আগ্রহ ক'রে বল্লেন, তাতে আর কোনো মতেই আপত্তি উত্থাপন করা চলে না।

রম্ভাবাবু আমায় ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, রজনীগন্ধা 'শ্রী'র প্রতীক আর বই হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক··· তাই এই দু'টি বস্তু মিলিয়ে নববধূর হাতে দেয়া চলে।

এমন ব্যাখ্যার পরও যদি আপত্তি উত্থাপন করতাম, কিম্বা বলতাম যে, আগামী কাল সকালে রুগ্না মেয়ের দুধ-বার্লির ব্যবস্থা করতে হবে, তবে রম্ভাবাবু আমার বেরসিক নাম চারিদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতেন যে, সেটা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র!

রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে পাশ কাটাবো এমন সময় রম্ভালালবাবু আবার আমার পথ আট্‌কে দাঁড়ালেন।

বল্লেন, দেখি নেমন্তন্ন চিঠিটা—কোন পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে যাবে?

অগত্যা কার্ডখানা আবার তাঁর হাতে তুলে দিলাম। বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগ্‌লো। নেমন্তন্ন চিঠি প'ড়ে তাঁর নতুন কোনো পরোপকার প্রবৃত্তি জেগে না ওঠে! কিন্তু আমার অবস্থা যে ভাঁড়ে মা ভবানী সে কথা ত' আর তিনি তলিয়ে বুঝ্‌তে চাইবেন না!

যেন পাশ-ফেলের খবর বলা হচ্ছে—এম্‌নিভাবে শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে বল্লেন, ও! সারপেণ্টাইন লেন! আমিও যে সেই অঞ্চলেই যাচ্ছি। চলো, তোমায় সর্টকাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—নইলে এ জায়গাটা তুমি খুঁজেই বের করতে পারতে না।

যাক্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো!

টাকা-পয়সা খরচের আর কোনো মামলা নয়! শুধু সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবার ব্যাপার।

এতে ত' আমারই সুবিধে হ'ল। নইলে বাঁশবনে ডোম-কানার মতো ঘুরে বেড়াতে হ'ত আর কি! সারপেণ্টাইন লেন শুনেছি সাপের মতোই আঁকা-বাঁকা।

আমায় ইতস্তত করতে দেখে রম্ভালালবাবু বল্লেন, আর তোমায় কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। আমার দেখা যখন পেয়েছ—তখন একেবারে চোখ বুজে সোজা নেমন্তন্ন বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে।

আত্মতৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

রম্ভাবাবুর পেছন পেছন এগিয়ে চল্লাম। আমার এক হাতে বই, আর এক হাতে রজনীগন্ধার ঝাড়! সব সময়ই ভয়—কার কনুয়ের গুঁতোয় বই যায় পড়ে, কিম্বা কার ধাক্কায় রজনীগন্ধা যায় গুঁড়িয়ে।

রম্ভাবাবু কিন্তু বড় রাস্তা ধ'রে বেশীক্ষণ এগুলেন না, হুট্ ক'রে একটা গলির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে নির্দ্দেশ দিলেন, আমার পেছনে চ'লে এসো। তোমার সর্টকাট্ রাস্তা দেখিয়ে দেবো।

তাঁর গম্ভীর গলা শুনে মনে হ'ল তিনি যেন কাপালিক আর আমি যেন নবকুমার। নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, এখন তাঁর হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া দায়!

যাই হোক—"প'ড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।"

রম্ভালালবাবু বল্‌তে বল্‌তে আর বোঝাতে-বোঝাতে চল্লেন: তোমায় বলি বৃন্দাবন, এই কল্‌কাতা সহরের সমস্ত অলি-গলি আমার একেবারে নখাগ্রে। এতে যে কাজের কত সুবিধে হয় আর কত সময় বেঁচে যায়—সে-কথা তোমায় ব'লে বোঝাতে পারবো না। হারা-উদ্দেশ্যে অনিশ্চিতভাবে ঘুরে তুমি দু' ঘণ্টায় যে জায়গায় গিয়ে হাজির হবে—আমি আধ ঘণ্টায় হেলা-ফেলা ক'রে তোমায় সেখানে নিয়ে হাজির করবো।

গাধাবোট যেমন ষ্টিমারের পেছন পেছন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এগিয়ে চলে নাকে দড়ি দেওয়া বলদের মতো, আমিও তেমনি অনুসরণ করলাম রম্ভালাল বাবুকে—এ গলি থেকে ওগলি, ও গলি থেকে সে গলি।...

সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয় গলির নমুনা দেখে। কলকাতা সহরে গা ঢাকা দিয়ে এত অদ্ভুত ধরণের গলিও থাকে। দু'পাশ থেকে বাড়ীগুলি পথচারীকে যেন 'সাণ্ডুইচের' মতো চেপ্টে দিচ্ছে—আবার তার ওপর নীচে প্যাঁচপেঁচে কাদা। সর্টকাট করতে গিয়ে জুতোর যা দশা হল সে কথা খুলে না বলাই ভালো। কাছার দিকটা কাদার ছিঁটেয় নামাবলীর মতো বহু কলঙ্ক কণ্টকিত হয়ে উঠল। মৃদু আপত্তি করতে গিয়েছিলাম।

কিন্তু রম্ভালাল বাবু বল্‌লেন, ওই ত তোমাদের দোষ। কত কম হাঁটতে হচ্ছে তোমার—আর কত সময় বাঁচিয়ে দিলাম সেটা তোমরা হিসেব করে দেখবে না শুধু শুধু ওজর আর আপত্তি। এই দোষেই ত ভারত গেল।

আমার দোষেই যদি ভারত যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে! কাজে কাজেই চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

জন-কণ্টকিত ষাঁড় অধ্যুষিত কর্দ্দমলিপ্ত এবং মস্তকোপরি জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ গলিগুলির ভেতর দিয়ে রম্ভালাল বাবুকে অনুসরণ করে চল্‌লাম—যেমন ভাবে নাকি ব্রীড়াবনতা নববধূ সাত পাকের সময় নিঃশব্দে স্বামীকে অনুসরণ করে।

একবার ডাইনের গলি, পরমুহূর্ত্তে বাঁয়ের গলি, তার পর সাম্‌নের বাই-লেন, অতঃপর পাশের সরু গলি, এই ভাবে যে কতক্ষণ পথ চললাম তার আর হিসেব নেই।

'সর্টকাট' কথাটা কে আবিষ্কার করেছিলেন? মনে মনে তাঁর চৌদ্দ পুরুষকে নরক নামক স্থানে প্রেরণের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করে রাগের ঝাল মেটাতে লাগলাম—কিন্তু রম্ভালাল বাবুর কামড় কচ্ছপের কামড়! তিনি কিছুতেই 'সর্টকাট্‌' পন্থা পরিত্যাগ করেন না এবং আমাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না।

হঠাৎ একটা বাড়ীর বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি গেল আমার। একি! ন'টা বাজে।

এতক্ষণ ধরে শান্তশিষ্ট বালকের মতো রম্ভালাল বাবুর অনুসরণ করে কালের যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছি। ঘামে পিঠটা জ্যাবজেবে হয়ে গেছে। ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি কয়েক গুচ্ছ রজনীগন্ধার ওপরকার ফুলের অংশটুকু নেই—ডাঁটাগুলি আমার হাতে শোভা পাচ্ছে! তা হলে কি ব্যাপার ঘটল।

মস্তিস্ক পরিচালনা করে বুঝতে পারলাম গলিগুলির ভেতর দিয়ে ক্রমাগত শিবের বাহনেরা যাতায়াত করছে—তারাই দয়া করে ফুল প্রসাদী ক'রে দিয়ে গেছে। একটা টাকার জন্যে নিজের অজান্তেই দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। টাকাটা পকেটে থাকলে আগামী কাল সকাল বেলা বাজার পর্ব্ব সমাধা হত।

কিন্তু সেত' আগামী কালের কথা!

আজ নেমন্তন্ন বাড়ীতে পৌঁছুতে পারবো ত? খাদ্য কিছু জুটবে ত' সেখানে? বিশেষ সন্দিহান হয়ে উঠলাম।

রম্ভালাল বাবুরও যেন কেমন গোঁ চেপে গিয়েছে। যে করেই হোক গলির ভেতর দিয়েই তিনি পথ আবিষ্কার করবেন।

আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, এই ধরনা কেন—মানে ভগবান না করুন হিন্দুস্থানের সঙ্গে যদি পাকিস্থানের লড়াই বাঁধে তবে পূর্ব্ব অঞ্চলের যুদ্ধে সেই দলই জিতবে যার 'সর্টকাট'গুলি ভালো করে জানা আছে। পূর্ব্বপাকিস্তানকে কতদিক দিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ করা চলে সেই কথা বোঝাতে বোঝাতে আমরা আরো অনেক গুলি গলি পরিক্রমা করে ফেললাম।

সর্ব্বনাশ! ঘড়ির কাঁটা দশটার দিকে এগুতে চলেছে।

হঠাৎ সানায়ের পোঁ শুনে রম্ভালাল বাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে গোপিনীরাও এমন আকুল হয়ে উঠতেন কি না সন্দেহ।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ব্যস! এইবার তোমার বিয়ে বাড়ী এসে গেছে। কত সর্টকাটে যে তোমায় নিয়ে এসেছি—সে কথা নিজেই বুঝতে পারছ।

আমাকে আর টু শব্দটি করার সুযোগ না দিয়ে রম্ভালাল বাবু একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন।

সর্টকাটের জন্যে যে একটা সমবেদনা জানাবো সে সুযোগও জুটল-না আমার!

যাই হোক—এবার আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চাই। চল্‌তে চল্‌তে পায়ের দড়িগুলো যেন একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণ যদি বা না জোটে বিশ্রাম ত' খানিকটা পাবো।

গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই একটি উৎসাহী ছোকরা গলায় একটা মালা পরিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে শুধোলেন, আজ্ঞে আপনি কোন বাসা থেকে আসছেন? মনে হল ভদ্রলোক আমায় চিন্‌তে পারছেন না বলেই সন্দেহ করছেন।

আমিও যেন খানিকটা অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আজ্ঞে এটা কি ধনেশ বাবুর বাড়ী নয়?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইবার মৃদু হেসে বললেন, আজ্ঞে না। আমি ঠিক এই রকমই একটা সন্দেহ করছিলাম। আজকালকার দিনে অনেক ভদ্রলোকই একটা রজনীগন্ধার ঝাড় কিনে ঠিক এই ভাবেই বিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে, তারপর দিব্যি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করে—হাত মুছতে মুছতে প্রস্থান করতেও তাঁদের বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু গোদল চক্কোত্তীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়।

আপন রসিকতাতেই বুড়ো ভদ্রলোক ভাঙ্গা দাঁতগুলি বের করে হাস্‌তে লাগলেন।

হায় রজনীগন্ধার ঝাড়!

তখন আমার রন্তালাল বাবুর মুণ্ডুপাত করতে বাসনা জাগছিল! একটা ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে পুচ্ছ তাড়নে তিনি যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে গেলেন সেটা সামাল দেবার সাধ্যি আমার ছিল না।

গালে শক্ত হাতের একটি চড় খেয়েছি—মুখের ভাবটা ঠিক এই রকম করে আস্তে আস্তে সানাই-বাজা-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।

এতক্ষণ রন্তালাল বাবুর অভিভাবকত্বে অন্য কিছু ভাবতে পারিনি, এইবার স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বুঝলাম পেটের ভেতর ইঁদুর ক্রমাগত ডন খেল্‌ছে।

আমার আত্মীয় বাড়ীটি আবার এখান থেকে কতদূর হবে কে জানে? ঠিকানাটা আর একবার দেখে নি।

পকেটে হাত দিয়ে হাঁ—হয়ে গেলাম!

নেমন্তন্নের চিঠিখানি ত' রন্তালাল বাবুর হাতেই রয়ে গিয়েছে!

স্মরণ-শক্তির খ্যাতি আমার কোনো কালেই ছিল না অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধকালে কর্ণ যেমন কিছুতেই তার অতি পরিচিত বাণগুলির নাম স্মরণ করতে পারেনি—আমিও ঠিক তেমনি সারপেণ্টাইন লেনের এক অপরিচিত অংশে দাঁড়িয়ে আমার অতি প্রয়োজনীয় বাড়ীর নম্বরটা কিছুতেই চিন্তা করে মনে করতে পারলাম না।

পেটের জ্বালাটা যেন নতুন করে আমায় তাগিদ দিতে লাগলো।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

একটা ডাষ্টবিনের ধারে কতকগুলি এঁটো কলাপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে এটা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান-সমরের প্রতীক কিনা তা নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে সরস আলোচনা চালানো যেত।

কিন্তু দেহ আর মন দুইই প্রতিকূলে।

একটা দিক ধরে এগিয়ে চল্‌লাম। ঠিক বোঝা গেল না—কোন পথে আমি চলেছি। দৃষ্টি রয়েছে আমার পথের দু'দিকে!

কিন্তু একটি খাবারের দোকানও খোলা নেই! রাত এখন কত কে জানে!

হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘর থেকে আলো বেরুচ্ছে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম।

চিড়ে মুড়কি, মুড়ি যা পাওয়া যায় চিবুতে রাজি আছি। কিন্তু না,—একটা পানের দোকান!

দোকানী বল্‌লে, সোডা চাই? দেবো ভেঙে? খালি পেটে সোডা খেলে কি অবস্থাটা হবে সে কথা কল্পনা করে চোঁ-চাঁ দৌড় লাগালাম।

আরো খানিকটা পা চালিয়ে চলে গেলাম।

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো মেঘ তারাগুলিকে ঢেকে ফেল্‌ছে। গুরু গুরু আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। তারপর ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি সুরু হল। নিজের জন্যে না হোক্—বইখানাকে বাঁচাবার জন্যে একটি গাড়ী বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঠিক তক্ষুণি ছুটতে ছুটতে একটা লোক এক ঝুড়ি কলা নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলে। ভাবলাম, ভালই হল, অন্ততঃ কলা খেয়ে ক্ষিদেটাকে বাগে আনা যাবে।

পুরুষ্টু কলা…বেশ পাকা। বল্‌লাম, দু' গণ্ডা কলা কত নেবে? লোকটা জবাব দিলে, আট গণ্ডা পয়সা দেবেন বাবু—

দর কসাকসি করতে চাইনে। গরজ বড় বালাই। কিন্তু পটেকে হাত দিয়ে আবার রাঘব বোয়ালের মতো হাঁ করে ফেল্‌লাম। একটি টাকাই সম্বল ছিল—ফুল কিন্‌তে ফতুর হয়ে গেছি!

হায় রজনী গন্ধার ঝাড়!

তুমি কাব্যলোক ছেড়ে শেষকালে আমার স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হলে! পক্ক কদলী আর কপালে জুটল না!

কাচকলা খেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাত বারোটায় যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম—তখন গৃহিণী একেবারে তপ্ত হয়ে বসে আছেন!

সর্টকাট আমার হার্টকেও 'হত্যা'করেছে! তাই বর্ষণ মুখরিত সেই রজনীতে হৃদয়োচ্ছ্বাস রুদ্ধ করে রাখলাম।

আমার বীমা-জীবন
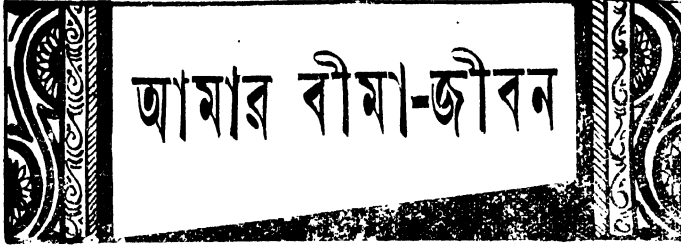
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জীবন বীমার কার্য্যে আমি গত অর্দ্ধশতাব্দী হইতে লিপ্ত আছি। অনেক বয়স হইয়াছে, এ জীবনে অনেক ব্যবসায় হাত দিয়াছি, কিন্তু জীবন-বীমার মত এত হিতকারী আমার পক্ষে আর বোধ হয় কোন ব্যবসাই হয় নাই। প্রথমে নিয়াছিলাম একটা অতিরিক্ত ব্যবসা হিসাবে, কিন্তু পরিণামে ইহাই মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতৃ বিয়োগে (১৮৯৯) সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর আসিয়াই পতিত হয়। সমস্ত পরিবারের ভার স্কন্ধে নিয়া জীবন-সংগ্রামে বরাবর আমাকে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে, কত স্থানে গিয়াছি, ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর গ্রহণ করিয়াছি, সহায়হীন, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন আমার পক্ষে জীবন বীমার রিনিউয়ালই হইয়া উঠে প্রধান সম্বল। ইহাতেই শিক্ষকতা ছাড়িয়া (১৯০৭) একান্তমনে আইন পড়িবার জন্য অবকাশ গ্রহণ করিতে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। নিশ্চিন্ত লাভের স্থান ময়মনসিংহ ছাড়িয়া (১৯১০) ইহারই জোরে ঢাকাতে আস্তানা উঠাইয়া নিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহারই জোরে কলিকাতার মত বৃহৎ অপরিচিত স্থানে সপরিবারে বাসা করিয়া (১৯১২) আইন ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সাহস হইয়াছিল, ইহারই ভরসায় আবার লাভবান ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া (১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য্য লাভ করিবার অধিকার লাভ করি। বস্তুতঃ এই ব্যবসাই আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে, আমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে সাহস দিয়াছে এবং আজও ইহাতেই আমি সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমি যখন বাঁকীপুর (পাটনা) থাকিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করি, দুকড়ি মিত্র নামে একজন শিক্ষক সিটি অব্ গ্লাসগো নামে বিলাতী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট ছিলেন। উক্ত কোম্পানীর ভারতীয় অফিস ছিল কলিকাতার ৫নম্বর লায়ন্স রেঞ্জে। কোম্পানীর প্যাড্‌গুলি দেখিতে বড় সুন্দর ছিল! একে বিলাতী ডিজাইন, এক এক পৃষ্ঠায় এক এক মাসের ডায়েরী লিখিবার কাগজ এবং পরে এক একখানি ব্লটিং কাগজ। দুকড়ি বাবু আমাকে একখানি প্যাড্ দিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল। অতঃপর আইনের লেকচার কমপ্লিট্ করিবার পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পাটনা ছাড়িয়া রাজবাড়ী (ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার উপসহর) গিয়া গোয়ালন্দ হাইস্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করি। সেই সময় হইতেই সম্পূর্ণভাবে আমাকে নিজের পায়ে নির্ভর করিতে হইয়াছে।

রাজবাড়ীতে এক বৎসরের মধ্যেই বিশেষ পরিচিত হই। সত্বাধিকারীরা শ্রদ্ধার সহিত বাসা দিয়াছেন। মা, দিদিমা, সহধর্ম্মিণীকে এখানে আনিয়াছি। বেতন যাহা পাই তাহাতে সংসার একরকম নির্ব্বাহ হয়। পূর্ব্ব ছয় বৎসর টিউসনি করিয়াছি, এখন আর টিউসনি করিবার তেমন ইচ্ছা হয় না। তখন জিনিষপত্র মাছ তরিতরকারী সবই ছিল সস্তা, বিশেষ অভাব মনে হয় নাই। তবে কিছু উপরি আয় থাকিলে ভাল হইত।

এই সময় হেড্‌মাষ্টার ছিলেন ৺লোকনাথ দত্ত, বি-এ। ইনি ইংরাজী খুব ভাল জানিতেন। পরিবার কলিকাতা ছিল বলিয়া প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা যাইতেন। পরবর্ত্তী শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের ভার আমার উপরেই থাকিত। এক সময়ে পাটনা থাকিতে অধ্যয়নে তাঁহার সহায়তা লইয়াছি। তাই তিনি আমার উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যাহা হউক, রাজবাড়ীতে একদিন সকালে স্কুলের অফিস ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছি, হঠাৎ কি খেয়াল হইল, সিটি অব গ্লাসগো অফিসে লিখিলাম, "আপনাদের একখানা ব্লটিং প্যাড পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।"

উত্তর আসিল—"এ বৎসরের যাহা ছিল নিঃশেষিত। বর্ষশেষ হইবার পূর্ব্বে চিঠি লিখিলে সানন্দে পাঠাইব।"

একে সাহেবের চিঠি, তার পরে বড় বিনয়ের ভাব, ভারী আপ্যায়িত হইলাম। পত্র লিখিলাম, "আপনারা আমাকে এজেন্ট করিবেন কি?"

উত্তর আসিল, "অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। আপনার ও জায়গাটা সহর নয়, আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন সহরের সিভিল সার্জ্জন। আমাদের বীমা অন্ততঃ ২০০০৲ টাকার কমে হয় না।"

উত্তরে লিখিলাম, "রাজবাড়ী মহকুমা, সিভিল সার্জ্জন এখানে প্রায়ই আসিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করানো অসম্ভব হইবে না। দুই হাজার টাকার বীমা করিবার লোকেরও অভাব হইবে না।"

তৃতীয় দিনেই উত্তর পাইলাম, "আপনাকে এজেন্ট নিযুক্ত করিলাম—দুই হাজার টাকার বীমা হইলেই ১০৲ বোনাস পাইবেন। আর কমিশন প্রথম বৎসরে প্রিমিয়ামের শতকরা ১৫৲ পাইবেন এবং পরবর্ত্তী বৎসর হইতে যে পর্য্যন্ত বীমা চালু থাকিবে, শতকরা ৫৲ টাকা পাইবেন।"

চিঠিখানি পাইয়া ভারী আনন্দ হইল। এমন সুন্দর ইংরাজী সকলকে দেখাইবার বস্তুও হইল। আর প্রতি বৎসর শতকরা ৫৲ টাকার 'রিনিউয়্যালের' কথাটা ভারী লোভনীয় হইল। মনে মনে ভাবিলাম, একজন লোককে বীমা করাইতে পারিলেই গড়ে বৎসরে ৫৲ টাকা পাওয়া যাইবে। আর একশত জনকে করাইতে পারিলেই তো ৫০০৲ টাকা আয়ের একটা সম্পত্তি হইবে। বেশ ভাল তো, একবার লাগিয়া যাই না কেন?

কিন্তু একে আমি নূতন লোক, তার উপরে মফঃস্বল জায়গা, বিশেষ সুবিধা বুঝিলাম না। ছয় মাসের মধ্যে মোটে দুইজনকে ইনসিওর করাইতে সমর্থ হইলাম। একজন আমাদের স্কুলেরই হেড মাষ্টার বিজয়চন্দ্র সেন, আর একজন কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও শিক্ষক। তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুরে, আর বিজয় বাবুর বাড়ী ছিল যশোহর জিলার মামুদপুরে, পরে খুলনা সহরে। ইহার পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বি-এল পরীক্ষা দিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার কয়েক দিন পরেই বড়দিনের ছুটীতে ফরিদপুরে গেলাম। সেখানে আমার এক দাদা থাকিতেন, নাম শশীভূষণ সেনগুপ্ত, আরও আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। ফরিদপুরে ছুটীর মধ্যে ৪।৫টা case করিলাম, প্রায় দশ হাজার টাকার কাজ হইল। আরও আশা খুব হইল। কারণ ক্ষেত্র এমন ভাবে তৈরী হইয়া রহিল যে দুই একদিনের ছুটি পাইলেই ফরিদপুর যাইতাম—বেশী দূরও নয়, রাজবাড়ী হইতে একঘণ্টার বেশী লাগে না, গেলেই কিছু কিছু কাজও হইত। পরীক্ষা করিতেন একজন এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ডাক্তার রেজিনাল্ড এস্, য়্যাস্ এমবি, ফরিদপুরের সিভিল সার্জ্জন। লোকটি মন্দ ছিলেন না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। হেড-মাষ্টার মহাশয় পরীক্ষার গার্ড হইবার জন্য কলিকাতা গিয়াছেন। এদিকে স্কুল সমূহের পরিদর্শক ইনস্পেক্টার মিঃ ব্যামফোর্ড আসিয়া স্কুলের খুঁটিনাটি সবই দেখিলেন। তাঁহাকে সব বিষয়ে খুসী করিতে পারিলাম বটে, কিন্তু ইহাতে আমার জীবনে আশু একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন আসিল। হেডমাষ্টার মহাশয় আসিয়াই সেক্রেটারীর কাছে লিখিলেন যে, আমি কোন কোন কাজ তাহাকে ডিঙ্গাইয়া করিয়াছি। সেক্রেটারী কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। তিনি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি উত্তর দিই যে স্কুলের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সেরূপ করিতে হইয়াছে। উত্তর পাঠাইতে হয় প্রধান শিক্ষকের মারফত। রাজবাড়ী আসা অবধি হেডমাষ্টার বাবু অনেক বিষয়ে আমার নিকট বাধিত ছিলেন—লতায় পাতায় সম্বন্ধও ছিল, তাই অভিমানে একটু কড়াভাবেই উত্তর দিলাম। পরে একদিন কথা হইল। তিনি আমাকে পত্রখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন, কারণ ইহাতে এমন সব বিষয় ছিল যাহাতে আমাদের দুইজনের একজন একটু নতি স্বীকার না করিলে উভয়ের আর একত্র থাকা সম্ভব হইবে না। কিন্তু পত্র আমি প্রত্যাহার করিলাম না। ইহার ফল হইল সেক্রেটারী বাণীবহের জমিদার প্রিয়শঙ্কর মজুমদার মহাশয়

আমাদের উভয়ের সঙ্গেই আসিয়া দেখা করিলেন। আমাকে খুব পীড়াপিড়ি করিলেন যে দুই একটা কথাতে অসৌজন্য প্রকাশ পায়, একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেই সব মিটিয়া যাইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমরা উভয়েই থাকি, কারণ অল্প সময় পূর্ব্বে আসিলেও আমি ২।৩ বার হেডমাষ্টারের স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্থানে অফিসিয়েট করিয়া অনেক সঙ্কটময় অবস্থা হইতে স্কুলটিকে কয়েকবার রক্ষা করিয়াছি, ব্যক্তিগত ভাবেও তাহার সঙ্গে খুব সম্প্রীতি ছিল। এদিকে হেডমাষ্টারও উপযুক্ত লোক, তাহার সম্মান ও প্রেষ্টিজ রক্ষা করা সেক্রেটারীর কাজ। কিন্তু অনেক অনুরোধেও আমি সেক্রেটারীর উপদেশানুসারে কাজ করিতে স্বীকৃত হইলাম না। ইহার অর্থ এই হইল যে, আমার যে ক্ষুদ্র সংসারখানি ঐখানে বৃহদাকারে পরিণত করিয়া ৩।৪ খানা বড় বড় খড়ের ঘরে চতুর্দ্দিকস্থ সহানুভূতিপূর্ণ সংসর্গের মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে পাতিয়াছিলাম, তাহা নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে হইবে। ছাত্রগণকে ছাড়িতে হইবে, নিশ্চিত আয়ের পথ ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মধ্যে পড়িতে হইবে। অবশেষে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। গ্রীষ্মের ছুটিটায় ফরিদপুরে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকার বীমার case করিয়া রাজবাড়ী আসিলাম, আর তাহার ৩।৪ দিন মধ্যেই সমস্ত মোটঘাট বাঁধিয়া সংসারটি ঘাড়ে করিয়া একেবারে সটান বাড়ী রওনা হইলাম। রাজবাড়ীর অনেকে চক্ষের জল ফেলিলেন, কিন্তু যাওয়াই যখন স্থির করিয়াছি কোন অনুরোধই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। বার্দ্ধক্যাবস্থায় এখন ভাবিতেছি বড় বাড়াবাড়িই করিয়াছিলাম, কেনইবা এতটা লিখিলাম, কেনইবা একটু ত্রুটি স্বীকার করিলাম না। কিন্তু আমি কে? কে একজন আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া বরাবর চালাইতেছে—সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে, তিনিই মূল—আমি তো পুতুল মাত্র। এই পরিবর্ত্তন আমার মনের মধ্যে কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারিল না, কারণ জীবন বীমার আয় এবং এসম্বন্ধে ভবিষ্যতের আশাই আমার উৎসাহ ও বল। আর মনে বলও হইল যে বহু অনুরোধ সত্ত্বেও নতি স্বীকার করিয়া থাকিবার প্রলোভন এড়াইতে শেষ পর্য্যন্ত সক্ষম হইয়াছি।

রাজবাড়ীতে আমার বাসায় ৪।৫টি ছেলে ছিল। দুইটি এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র আমাদেরই পাড়ার, সম্পর্কে ভাই হইত। একটী পিসতুত ভাই যতীন্দ্র (এখন ব্যবসায়ী), একটি খুড়তুতো ভাই ধীরেন্দ্র (এখন উকীল), আর একটি ভাগিনেয় সত্যরঞ্জন (এখন কবিরাজ)। আপাততঃ তাহাদের জন্যই ভাবনা হইল। তবে একটা কথা আজ এই পরিণত বয়সে স্বীকার করিতেই হইবে। হেড মাষ্টার বিজয়বাবু লোক মন্দ ছিলেন না। বহু বৎসর (প্রায় ত্রিশ বৎসর) পরে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহে আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যান। আমিও তাহা রক্ষা করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল আবার পূর্ব্বের ভাবই বজায় আছে।

বাড়ীতে ১২।১৪ দিন ভাবনার সঙ্গেই কাটিবার পরে একদিন হঠাৎ একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ষ্টীমার ষ্টেসন পদ্মাতীরে তখন আমাদের গ্রামেই ছিল, সেখানে বেড়াইবার সময় তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি ডায়মণ্ড হারবার "ষড়িষা হাই স্কুলের" সেকেণ্ড মাষ্টার, নাম শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এখনও জীবিত। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—

"আমাদের হেডমাষ্টারের পদটি খালি আছে। আপনি সেখানে চলুন না!"

আমি কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছিলাম, তাই সেখানকার জলবায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

যোগেন্দ্রবাবু—সেখানকার জলবায়ু খুব ভাল, আপনার শরীর খুব ভাল হবে।

দেখিলাম যোগেন্দ্রবাবু খাঁটি কলিকাতার কথা বলিতে পারেন। আমি তাহাকে ষড়িষা হইতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বুঝিয়া পত্র লিখিতে বলিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই ষড়িষা যাইবার আহ্বান আসিল। ভারী আনন্দিত হইলাম—একে হেড্‌মাষ্টারী পদ, তারপরে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান ও উহার উত্তম জলবায়ুর প্রলোভন।

গ্রামের ষ্টেসন হইতেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র উক্ত দুই ভাই পরেশ ও ভুপেশ এবং আমার পিসতুত ভাই

যতীন্দ্র সহ রওনা হইলাম। খুড়তুত ভাই ধীরেন মুন্সীগঞ্জ ভর্ত্তি হইয়াছে, ভাগিনেয়টিকে বাড়ী রাখিয়া গেলাম। পথি-মধ্যে রাজবাড়ী ষ্টেসনে স্কুলের সব মাষ্টার ও পণ্ডিত মহাশয়েরা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অম্বিকা চরণ সাহিত্যাচার্য্য সখেদে বলিলেন, "আপনি তো খুব ভাল স্থানে যাইতেছেন। আমরাই পড়িয়া রহিলাম যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

যথাসময়ে ষড়িষায় পৌঁছিলাম। ষড়িষার স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বসুর হাতেই স্কুলের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশেষ সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি ও যোগেন্দ্র বাবু সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে শুনিতে লাগিলেন হেড্ পণ্ডিত মহাশয়—নাম রামচন্দ্র কাব্যতীর্থ—বাড়ী কোটালীপাড়া—যেমন সদাহাস্য তেমনি পরোপকারী ও অমায়িক। ষড়িষা খুব ভাল লাগিল এবং অল্পদিন মাত্র বাস করিয়াও ষড়িষায় যাহা লাভ করিলাম, আজও তাহার ফল ভোগ করিতেছি।

এখানে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে একটী ছাত্র এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পড়িত। ছেলেটি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই দুইটির সঙ্গে একশ্রেণীতে পড়িত বলিয়া প্রতিদিন আমাদের বাসায় আসিত, তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতাম। তাহার চালচলন এবং কথাবার্ত্তাও খুব ভাল ছিল। পড়াশুনায়ও খুব মনোযোগ ছিল এবং ষড়িষার পাকা রাস্তায় বৈকালে বেড়াইবার সময় তাহাকে খালিপায়েই বেড়াইতে দেখিতাম। আর দেখিতাম নানা বিষয়ে আমার কথাগুলিও খুব একাগ্র-চিত্তে গলাধঃকরণ করিত। তখনই বুঝিলাম যে এপর্য্যন্ত যত ছাত্র পড়াইয়াছি এরূপ একটিও পাই নাই। একেবারে খাঁটি সোনা! যেমন মনোযোগী তেমনি বিনয়ী।

৩।৪ মাসের মধ্যে সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি হইয়াছে, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও বেশ খুসী আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ চিঠি পাইলাম ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আমাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজবাড়ী হইতেই আমি কোন কোন স্থানে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলাম। ময়মনসিংহের চাকুরীটির প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল বেশী, অনেক যোগ্যতর প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও আমাকে নিযুক্ত করিবার কারণ আমার কলেজের অধ্যাপকবর্গ (পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ সি আর উইলসন, র‍্যাঙ্গলার ডক্টর ডি এন মল্লিক, মিষ্টার বি এন দাস এমএ, ডি এস সি (লণ্ডন), স্যার যদুনাথ সরকার এম-এ, পি, আর এস) প্রভৃতির উচ্চ প্রসংসা পত্র ছিল। নিয়োগ পত্র পাইয়াই আমি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইহার বিশেষ কারণ ময়মনসিংহ একটি বড় সহর ওখানে জীবন বীমার কাজ খুব হইবে। কিন্তু এদিকে? সকলেই চলিয়া যাইব বলিয়া বিমর্ষ হইলেন। প্রথম শ্রেণীর সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণ একেবারে মুসরিয়া পড়িল, উপেন্দ্রবাবু এবং পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি শিক্ষকগণ ভারী দুঃখিত হইলেন। সকলের বিষাদের কারণ হইব বলিয়া মনটা দমিয়া গেল। দুই এক রাত্রি নিদ্রাও ভাল হইল না। একদিকে ময়মনসিংহ, বাড়ীর নিকটে, আবার জীবন বীমার প্রবল আকর্ষণ। অন্যদিকে সকলের বিষাদের কারণ হইব। উভয়শঙ্কটে পড়িলাম, কিন্তু আমার দিকে রহিলেন বন্ধুবর যোগেন্দ্রবাবু। তিনি বলিলেন—

"আপনি সেখানে গিয়ে আমাকেও নিয়ে যাবেন, বিদেশ ভুঁয়ে আর ভাল লাগেনা, কাজেরও প্রশংসা পাই না।" অবশেষে যাওয়াই স্থির হইল। সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভাইদের ট্রানসফার সার্টিফিকেট নিয়া ময়মনসিংহ রওনা হইলাম।

আসিবার পূর্ব্বে আমি হেডমাষ্টারের পোষাক কোট পেণ্ট টুপি পরিয়া মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিতাম। সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি ছাত্রেরা জানিত যে বীমার কাজে কলিকাতা যাইতাম। এইবারেই প্রথম ইন্‌সিওরেন্সের রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী মিঃ কলিন সি গালিলাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ইতিপুর্ব্বে তাঁহাকে আমার ময়মন-সিংহে যাওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। ইনি এতাবৎ যাহা কিছু করিয়াছি তাহার জন্য তো খুব প্রশংসা করিলেনই, উপরন্তু ময়মনসিংহ সহরে ইতিপূর্ব্বে যাহারা সিটি অব গ্লাসগোতে ইন্‌সিওর করিয়াছেন তাহাদিগের একটি তালিকা দিয়া নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। তবে তালিকাটি তিনি খুব confidential ভাবে ব্যবহার

করিতে বলেন। গালিলাণ্ড যেমন সামাজিক তেমনি হৃদয়বান—তাঁহার সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল যেন কত আপনার লোক! এ পর্য্যন্ত অনেক সাহেব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আকর্ষণীয় শক্তি কম লোকের দেখিয়াছি। ব্যবসায়ীদের এরূপ হইতে হয়, একথাও মানি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাও ঠিক নয়, কারণ ঐ আফিসেই আগে পরে অনেক সাহেব অফিসার দেখিয়াছি, গালিলাণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন তুলনাই হয় না। ময়মনসিংহ সম্বন্ধে আমাকে তিনি অনেক কথা বলিয়াও দিলেন।

সেখানে কবীন্দ্র প্যারীমোহন সেন কবিরাজের বাসায় উঠিলাম। তিনি খুবই যত্ন করিলেন। ইনি এত সজ্জন ছিলেন যে, আমি যতদিন ময়মনসিংহ ছিলাম, তিনি আমার অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বাসার ছেলেরা পরদিনই আমাকে একখানি বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে না হইলেও খুব নিকটে। বাসা করিবার পরেই বাড়ী হইতে দিদিমা ও ভাগিনেয় সত্য আসিল। একটু গুছানো হইলেই আমি বাড়ীতে গিয়া মা ও স্ত্রীকে নিয়া আসিলাম।

ময়মনসিংহে কিছুদিন পূর্ব্বে মিস্ মেল নাম্নী এক ইংরাজ মহিলার নামে মানহানিকর কথা প্রচারে জজ সাহেব লীর নামে ডিক্রী হয়। টমসন সাহেব জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, রডিস্ পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট, আর গ্রীণ সাহেব (Dr. D. Green, I.M.S.) সিভিল সার্জ্জন। তখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী প্রবাহ ময়মনসিংহ সহরটিকেও কম আলোড়িত করে নাই। বিশেষতঃ স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর বাড়ী এইখানে, সকলেই জানেন মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায়ও তিনি আসিয়া ১৬ই অক্টোবর কলিকাতার মিলনমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সহর তখন ভারী গরম। সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে উদার ভাব পোষণ করিত না, বোধ হয় বা ভয়ও করিত। চতুর্দ্দিকে কেবল বন্দেমাতরম ধ্বনি, উহাদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিত। যাহা হউক, কোন রকমে সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। অল্পদিন মধ্যেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে (পরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট) পাঁচ হাজার টাকার বীমা করাইলাম এবং প্রফুল্ল সেন উকিলকেও দুই হাজার টাকা করাইলাম, উভয়েই আত্মীয়। ডিসেম্বর মাসে ২৫খানি ব্লটিং প্যাড আসিল। ১৯০৪এ আসিয়াছিল মাত্র ৬খানা।
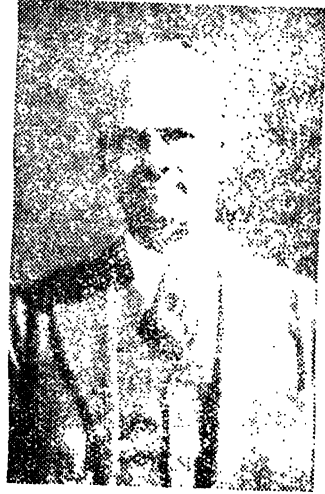
সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গ্রীণ সাহেব চলিয়া গেল, কপিনজার সাহেব (W. V. Coppinger) আসিলেন। ইনি বেশ ভদ্র ছিলেন, আর পরীক্ষাও বেশ সোজা ভাবেই করিতেন। ইনি পরে সার্জ্জন জেনারেল অব বেঙ্গল হইয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দুই, তিন, পাঁচ হাজার করিয়া এত কেস হইতে লাগিল যে, এক লক্ষ টাকার উপরে উঠিল। সিটি অব্ গ্লাসগোতে সাহেব একটি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন বৎসরে লক্ষ টাকার কেস হইলে আরও ৫০০৲ অধিক বোনাস পাওয়া যাইবে। সুতরাং সে বৎসরে আমার রিনিউয়াল বাদেই দুই হাজার টাকার উপরে আয় হইল। এই আয় হইল বলিয়াই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদান করিতে সমর্থ হই। আর তখনই গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা অভিনয় দেখিয়া ইতিহাসের খাঁটি রূপটি নূতন ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। খাঁটি স্বদেশী ভাব প্রকৃতভাবে তখন হইতেই আরম্ভ হয়। কংগ্রেস শেষ করিয়া গয়া কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আসি। গয়াতে আমি বিষ্ণুপাদপদ্ম, ফল্গু নদ এবং অক্ষয়

বটে পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করি। দিদিমাও তাঁহার বহুদিন বাঞ্ছিত বাসনা পূর্ণ করেন। পরে কাশীতে দিদিমাকে রাখিয়া আসি। এইসব নানাবিধ খরচ করা, একজোড়া শাল ক্রয় করায় বা দিদিমার খরচ জোগাইতে কোনরূপ অসুবিধাই হয় নাই, কারণ ইন্‌সিওরের সন্তোষজনক আয় তখন আমার ছিল। মাতাঠাকুরাণীর কোনরূপ অসচ্ছলতাই রহিল না। ইতিমধ্যে একটি নূতন বাইসিক্যালও কিনিয়াছিলাম। যাহা হউক, কলিকাতা, গয়া ও কাশীতে প্যারী কবিরাজ মহাশয়ও সঙ্গী ছিলেন।

১৯০৬তে সাহেব ব্লটিং প্যাড্ পাঠাইলেন ৩০০খানা প্রথমে, আরও পঞ্চাশখানি পরে। একেবারে সহরময় লোককে উপহারে কোম্পানীর দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিলাম। যতদিন গালিলাণ্ড ছিলেন, এই বরাদ্দই বজায় ছিল। কপিনজার সাহেব চলিয়া যাইতেই আসিলেন মেজর হেনরী ষ্টৌটসব্যারী উড (H. S. Wood), ইনি বড় ভদ্রলোক ছিলেন। আমায় 'বাবু' বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু কোনরূপ অসম্ভ্রমের ভাবে নহে। একদিন আমায় বলিলেন—

"বাবু, আমি যদি ইন্‌সিওর করি, এক হাজার পাউণ্ডে কত প্রিমিয়াম লাগিবে ?"

আমি সেইদিনই সব ঠিক করিয়া ফেলিলাম। খবর পাইলাম যে ঢাকার হেল্‌থ্ অফিসার ক্যাপ্টেন গোলে ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইলাম, কিন্তু উড্ সাহেব শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন গেজেট হইল। আমি আরও ৫০০০৲ টাকা করাইয়া নিলাম অর্থাৎ তিনি নিজেই করিলেন কুড়ি হাজার টাকার বীমা। উড্ সাহেব বড় সরল ও সহৃদয় লোক ছিলেন। যাইবার সময় ক্যাপ্টেন রাথারফোর্ড নামে পরবর্ত্তী সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে আমাকে আলাপ করাইয়া দেন। এবং বলিয়া দেন, "এই ভদ্রলোকটির মারফতই আমি মাসে একশত টাকার উপরে পাইতাম।" আরও অনেক কথা বলিলেন।

ইহার পরেই ১৯০৭-এর গ্রীষ্মাবকাশে মে মাসে প্রায় একমাস ঢাকায় আমার মামা শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের বাসা ঠাটারী বাজারে থাকি। সোনারঙ্গের দ্বিজেন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে দশ হাজার টাকা এবং আরও কতকগুলি case করি। সেন মহাশয়ের ওজনটা খুব বেশী ছিল, কিন্তু কর্ণেল ক্যাম্পবেল খুব সিনিয়ার এবং নাম করা সিভিল সার্জ্জন। তিনি লিখিলেন ওজনটা একটু বেশী বটে, তবে হাড় মোটা (Frame-work of the body is big) এবং জোড়ালো। আর স্বাস্থ্য খুব ভাল। কোম্পানী পোনের বছরের এন্‌ডাউমেণ্ট মঞ্জুর করেন। প্রিমিয়াম অনেক টাকা হয়। এইরূপে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার বীমা একমাসে করাইয়া ময়মনসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করি। আসিবার সময় শরীর ভাল নয় বলিয়া ক্যাম্পবেল সাহেবের নিকট হইতে একখানি সার্টিফিকেট নিয়া আসি।

এবার আসিয়া স্কুল হইতে আপাততঃ তিন মাসের ছুটি নিলাম। অসুখ কিছু ছিল না, কিন্তু ক্যাম্পবেল সাহেবের সার্টিফিকেট, ছুটি না দেওয়ার সাহস কাহার ? কিন্তু আমার সঙ্কল্প ছিল আর ওখানে যাইব না, স্কুলের কাজের এই শেষ।

এই সময়ে দুই-একটী Case সম্বন্ধে সময় ও জায়গা ঠিক করিবার জন্য রাথারফোর্ডের বাড়ী যাই। কিন্তু সাহেবটা পূর্ব্বের সাহেব দুইজনের মত এত ভদ্র ছিলনা। সেদিন আমি প্রায় মাইল খানেক হাঁটিয়া গিয়াছি, আমি ওর সঙ্গে দেখা করিয়া কথা কহিতে কহিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম সাহেব একটু উষ্ণ হইল। আমাকে বলিল—

"আমি যখন দাঁড়াইয়া থাকি, তখন আমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরাও দাঁড়াইয়া থাকুক, ইহা আমার ইচ্ছা, I like people to stand up while I stand up."

আমার ইহাতে একটু রাগই হইল। আমি বলিলাম, —"কেন আপনিও বসুন না ? আমি দূর হইতে আসিয়াছি, আমার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।"

রাথারফোর্ড—না, না, বসুন।

কিন্তু মুখখানি যেন ভার হইল। ইহার পরে একটি বীমা Case তাঁহাকে দিয়া পরীক্ষা করাই। দেখিলাম সে

বিষয়েও সুবিধাজনক নয়, ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। আমি গালিলাণ্ড্ সাহেবকে লিখিলাম—

'ইহার ব্যবহার বড় অসৌজন্যপূর্ণ, ইহাকে দিয়া কোন লোককে পরীক্ষা করাইবনা, নারায়ণগঞ্জে একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী কোম্পানীর ডাক্তার আছে, তাহাকে দিয়া পরীক্ষা করাইব।" ইহার নাম ডাক্তার ডগ্লাস্। ইনি আমায় বলেন,"বাবু, তিনজন বীমার লোক প্রস্তুত রাখিয়া আমায় জানাইলেই আমি আসিব।" আমি তাহাকে কয়বারই আনাইয়াছিলাম। প্রথম বারে ছয়টা কেস্ পরীক্ষা করে, কোন বারই তিনটার কম হয় না। সিটি অব্ গ্লাসগোতে কোম্পানীর ডাক্তারের ফি ছিল প্রতি কেসে ১৬৲।

ইতিমধ্যে গালিলাণ্ড সাহেব ময়মনসিংহ আসেন। ডাকবাংলোতে থাকেন, আমার বাসায় আসিয়া দুই একদিন টিফিন করিলেন। এবার গালিলাণ্ড সাহেব আসিয়াই বলেন—

"মিঃ দাশ, তোমার ছয়মাস মধ্যেই এক লক্ষ টাকার কাজ হইয়াছে। এখন হইতে বিনা সর্ত্তেই হাজার টাকার বীমায় দশ টাকা বোনাস প্রথম হইতেই দিব। আর তোমার আফিসের জন্য তিনখানি চেয়ার, একখানি টেবিল ও একটি আলমারী মঞ্জুর করিলাম।"

পূর্ব্বেই উহা ক্রয় করা হইয়াছিল, দামটা মঞ্জুর হইল। আমার একতলা বাড়ীর বাসাটি ছিল একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে এখানে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীটি বড় সুন্দর, ৫ খানি কামরাযুক্ত। সাহেব আফিসের ঘরটি দেখিয়া ভারী খুসী হইলেন, বলিলেন, এটিতো ("Our office") "আমাদের আফিস"। দুই দিন ছিলেন, তাঁহার সব কথাই এত সহানুভূতিপূর্ণ, আজও মনে হয় আমার জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। এরূপ কর্ম্মঠ এবং সৌজন্যপরায়ণ কোম্পানীর অধিনায়ক খুব বিরল। গত কংগ্রেসের সময় যখন কলিকাতা গিয়াছিলাম, আমাকে সেণ্ট এনড্রুর ভোজন উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবরা উক্ত সভায় খুব পেগ্ পান করিয়া বাঙ্গালীদের বড় গালাগালি দেয়, তাই আমি যাই নাই। পরে আমাকে বলেন, "মিঃ দাশ, তুমি গেলেনা, আমি তোমার জন্য বসিবার ভাল জায়গা রাখিয়াছিলাম।" তিনি সেই অনুষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন। যাহা হউক, বিদায়ের সময় গাড়ীতে উঠিয়াও আমাকে খুব শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কেবল একটি কথা ভাল লাগে নাই, আজিও মনে হইতেছে। আমাকে বলেন—

"মিঃ দাশ, ডাক্তার রাথারফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিয়া ভাব করিয়া ফেলিবে। একটু এদিক ওদিক হইলেও কি আর করা যায়। আর সেতো শাসক জাতির লোক (He belongs to the ruling race), একটু নতি স্বীকার করিলেও দোষ হইবে না।"

দেখিলাম 'রাজার জাতি'—এই ভাবটা কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষই ভুলিতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়টিতে মিঃ গালিলাণ্ডকে আমি খুসী করিতে পারি নাই। আর রাথারফোর্ডের সঙ্গে আমার ভাব হয় নাই, দেখাও হয় নাই। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়। আসিল মেজর লেভেনটন। একটু পাগ্লা গোছের লোক, তবে কাজ মন্দ করিত না।

লেখক

[ময়মনসিংহে এজেন্সি করিবার সময়]

গালিলাণ্ড সাহেব কলিকাতা পৌঁছিয়া গিয়া যে চিঠিখানি লেখেন, তাহা এত উৎসাহদায়ক যে, সর্ব্বদা আমার হাতবাক্সে থাকিত। বোধহয় খুঁজিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। উহাতে একটা কথা ছিল :

"কোন প্রতিষ্ঠানই নিয়ম এবং নির্দ্দেশ ভিন্ন চলে না, আর তোমাকে দেখিলাম সর্ব্বদাই আমার ও কোম্পানীর নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেছ। এখন হইতে বিনাসর্ত্তে তোমার কমিসনের হার বাড়াইয়া দিলাম। আর প্রতি মাসেই উক্ত মাসের কমিসনের টাকা পাইবে।"

প্রতি মাসের ১লা তারিখে বিল আসিত, কোন ব্যত্যয় হয় নাই।

এখন জীবন বীমার আয়ই একমাত্র আয়, আর তাহা নিতান্ত সামান্য নয়। ইতিমধ্যে দুইটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশী হইতে আমার পিসতুতো ভগ্নী চিঠি লিখিলেন—"তোমার দিদিমা সজ্ঞানে কাশীলাভ করিয়াছেন।" শুনিয়া সুখ দুঃখ দুইই হইল। দুঃখ হইল এত বড় আপ্রাণ স্নেহ ভালবাসার লোক আর দ্বিতীয় ছিল না; সুখ হইল আমাদের সকলকে রাখিয়া অল্পদিন মধ্যেই না ভুগিয়া কাশীলাভ করিয়াছেন—বরাবর ইহাই তাঁহার কামনা ছিল। সকালে চিঠি পাইলাম, পরদিনই মাতাঠাকুরাণী কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলাম (Wire Rs. 200/-) 'টেলিগ্রাফে ২০০৲ পাঠান'। ঠিক সেই অপরাহ্নেই টাকা পৌঁছিল। মা ইচ্ছামত কাজ করিলেন। আত্মীয় স্বজনকে ইচ্ছানুক্রমে খাওয়ান হইল। দেখিলাম জীবনবীমার দৌলতে কাজটি অপূর্ণ রহিল না। কিছুদিন পরে একটি ছেলেও হইল। তবে সেটি আর এখন জীবিত নাই।

এবার আরও একটি বড় কাজ হইল, তাহাও ঐ ইনসিওরেন্সের কৃপায়। ১৯০৭ বর্ষার সময় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট স্যার ল্যানসেট হেয়ার ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিতে আসেন এবং তাহাতে আলেকজাণ্ডার গার্লস স্কুলেও পদার্পণ করিবেন স্থির হয়। তখন স্বদেশীর দিন, কথা উঠিল "স্কুলের মেয়েরা ছোটলাটের গলায় মালা দিবে, ঐ স্কুলে আমরা মেয়ে দিব না।" প্রবল আন্দোলন হইল এবং একটা ঘরোয়া সভায় স্থির হইল মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হইবে এবং উহার শিক্ষার ভার অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমাকে দেওয়া হইবে। প্রবীণতম উকীল কালীশঙ্কর গুহ হইলেন প্রেসিডেণ্ট আর প্রসন্নকুমার গুহ সম্পাদক। মূলতঃ সমস্ত ভার পড়িল আমারই উপর এবং আমিও সানন্দে তাহা সম্পাদন করিতে উদ্যত হইলাম। নূতন স্কুল হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া সরকারী স্কুলসমূহের ইনস্পেকটার ষ্টেপলটন (পরে ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন) রাগতভাবে আসিয়া যেন জোর করিয়া আমাদের স্কুলটি ভাঙ্গিয়া দেয় আর কি! আমিও নির্ভীকভাবে এমন কড়া কড়া কথা শুনাইলাম যে সাহেবকে কিল খাইয়া কিল চুরিই করিতে হইল। কথাগুলি খুব বড় বড় কথায় অমৃতবাজার কাগজে প্রকাশিত হইল। সকলেই আমায় সাধুবাদ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ ময়মনসিংহের মহাকালী পাঠশালা আমার জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায় এবং এখনও উহার কথা খুব মনে হয়। এত সময়ও দিতে পারিতাম ইন্‌সিওরেন্সের কৃপায় স্বচ্ছন্দতার জন্যই। যাহাহোক সব কাজ সারিয়া আইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু কিছুই পড়াশুনা হয় নাই। তাই পরীক্ষার দুইমাস পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ছাড়িয়া দেওঘরে স্বগ্রামস্থ আমার পাড়ার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু হরনাথের ওখানে প্রায় মাসখানেক রহিলাম। সময়টা অক্টোবর ১৯০৭। হরনাথের মাকে আমি মাসীমা ডাকিতাম। তিনি যে কত যত্ন করিলেন, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। হরনাথ অসুস্থ, হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে পিতামাতাসহ সেখানে গিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারক দাশগুপ্ত মহাশয় কুমিল্লাতে মাষ্টারী করিয়া ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া ভ্রাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আমি আনন্দে অন্যভাবে বেশ টাকা দিলাম, অবশ্য তাঁহারা নিতে রাজী ছিলেন না, কিন্তু বীমার দৌলতে আমার কোনরূপ অসচ্ছলতা ছিল না। দেওঘর থাকিতেই স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের শোকসভায় স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দকে উপস্থিত দেখিলাম। সভাটির উদ্যোগের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

পরীক্ষার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতা ৫৯ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে অবস্থান করিলাম। আমার গ্রামের

ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড সত্যেন্দ্র সেন তাহার ঘরে আমার পড়ার সুবিধা করিয়া দিয়া অন্যঘরে থাকিত। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে কলিকাতা থাকিয়া পরীক্ষার নম্বরের তদ্বির করিবার জন্য আমি আরও তিন সপ্তাহ ৩৭ হ্যারিসন রোডে একটি মেসে থাকি। একটি ঘরে একমাত্র আমি থাকিতাম এবং একনম্বরের খাওয়া দিত। এই তিন সপ্তাহ কিছু কিছু নম্বর জানিলাম, আর কেবল থিয়েটার দেখিতাম। তখন এমন নাটক ছিল না, যাহার অভিনয় দেখি নাই। টাকা খুব খরচ হইত, যেন মফঃস্বলের বড়লোকের খরচের ন্যায়। গ্রাহ্য করিতাম না, কারণ সবই বীমার সহায়তায়। আর ঐ থিয়েটারও জীবনে যে কম সহায় হয় নাই, তাহাও ঐ বীমার আয়ের জন্যই।

যখন বুঝিলাম এবারে পাশ হইবার সম্ভাবনা কম, তখন কলিকাতা থাকা আর আবশ্যক মনে করিলাম না। ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। পৌঁছিতে পৌঁছিতে ১৯০৮-এর জানুয়ারী হইল। এইবারও আবার খুব উৎসাহে বীমা করাইতে লাগিলাম। এই সময় তিনটি কাজ হইল, এক ছেলের অন্নারম্ভ, দ্বিতীয় ভাগিনেয়ীর বিবাহ, তৃতীয় মায়ের নামানুসারে কবিরাজী ঔষধালয় স্থাপন। অন্নারম্ভে মা ইচ্ছামত খরচ করিলেন, টাকা আসিল পূর্ব্বের ন্যায় গৌরী সেনের তহবিল হইতে। দ্বিতীয়, মনে মনে ভাবিলাম ইনসিওর করাইতে বাড়ী বাড়ী যাইতে হয়, কিন্তু একটা কবিরাজী ঔষধালয় করিলে বেশ ভাল হয়। লোকে আমাদের ঔষধালয়ে আসিয়া টাকা দিবে। আমার ভগ্নীপতি কবিরাজ অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় আমার ওখানেই ছিলেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং কবিরাজী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও সুপণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ তাহারা বংশানুক্রমে কবিরাজ। তাহার নিজের কাছে জারিত লৌহ অভ্র প্রভৃতি অনেক ধাতু-ঘটিত জিনিষ ছিল। মায়ের নামও থাকে, ভগ্নীরও একটা উপায় হয়, এই ভাবিয়া হাজার খানেক টাকা খরচ করিয়া "অমৃত-ঔষধালয়" স্থাপন করি। ইহাতে ঔষধালয়টিতে বেশ বিক্রী হইতে লাগিল। অতঃপরে বিবাহযোগ্যা ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেওয়ারও ইচ্ছা হইল। ইতিপূর্ব্বে ভগ্নীর অসচ্ছল অবস্থা বলিয়া তাহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে বয়স্ক দোজবরের সঙ্গে। এইবার একটী সুপাত্রে তৃতীয় ভাগ্নীকে অর্পণ করিতে আমি অনেক স্থানে যাতায়াত করি। অবশেষে মধ্যপাড়া গ্রামের গোবিন্দ সেনের চতুর্থ পুত্র হেমচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। ছেলেটি সুপাত্র, বয়সও কম। আমার দেশের বাড়ী বিদগাঁয়েই বিবাহ হয়, এবং এই অবসরে বিবাহের কয়েকদিন পরে গ্রামের স্বজাতিবর্গকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াই। বীমা করাইয়া টাকা যোগাড় করি। সব কাজই বেশ সুষ্ঠুভাবে হইতে লাগিল।

পূজার পূর্ব্বে (১৯০৮, অক্টোবর) যাবতীয় কাজ সারিয়া আবার বি, এল, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার অনেক বন্ধু নগেন্দ্রনাথ সরকার চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার। পূজাবকাশে তিনি ময়মনসিংহ আসিয়া আমার অনেক বন্ধুর বাড়ী ছিলেন। তিনিও বি-এল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি আমাকে চুয়াডাঙ্গা তাঁহার স্কুল বোর্ডিংএ থাকিতে অনুরোধ করেন। যথাসময়ে, পরীক্ষার প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে সেখানে যাই। খোলা মাঠ, বৈকালে মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে একত্র বেড়াইতাম। একটী সঙ্কীর্ণ নদী ছিল, তাহাতে স্নান করিতাম। আর নগেনবাবু ও আমি একসঙ্গে পড়াশুনা করিতাম। কি চমৎকার ভাবে দিনকয়টা গেল—পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব, আর অপরাহ্নে শরতের সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া সান্ধ্যভ্রমণ। চিন্তার লেশও নাই, আর নাই কেবল জীবন বীমার কৃপায়।

যথাসময়ে কলিকাতা গিয়া পরীক্ষা দিলাম। এবার আর একদিনও বেশী রহিলাম না। কলিকাতায় ময়মনসিংহস্থ আমার একটি ছাত্র বিপিন চক্রবর্ত্তীর মেসে ৪৬ হ্যারিসন রোডে উভয়ে ছিলাম। নগেনবাবুর সহিত এক সঙ্গেই চুয়াডাঙ্গা ফিরিলাম, পরদিনই এক ঝুড়ি অর্জ্জুন ছাল লইয়া ময়মনসিংহ চলিয়া গেলাম। এবার কেন্দ্রীয় মহাকালী পাঠশালা হইতে স্বর্গীয় প্রবোধ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার খুড়তুত ভাই গজেন্দ্র বাবুকে আমাদের মহাকালী পাঠশালার হেড্‌ পণ্ডিতরূপে ঠিক করিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় মিনার্ভা থিয়েটারে নগেন বাবুসহ নাট্যকার গিরিশ ঘোষের "শাস্তি কি শান্তি" দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলাম।

এবার পরীক্ষা দিলাম একেবারে শেষ বারের জন্য, কারণ পরবর্ত্তী বৎসর হইতে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর পরীক্ষা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় এবারেই পাশ হইলাম। একদিনে তিনখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। মনটা ভারী খুশী হইল।

পরীক্ষায় পাশ হইলাম বটে, কিন্তু জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। যদি অশ্রদ্ধা না করিয়া কেবল বীমার কাজেই থাকিতাম, আর উহার লব্ধ টাকায় ঔষধালয়ের উন্নতি করিতে তৎপর হইতাম, তবে কোন কালেই অসুবিধায় পড়িতে হইত না। বংশ পরম্পরায় লাভের ব্যবসাটা থাকিয়াই যাইত। কিন্তু ওকালতি ব্যবসা করিবই ঠিক করিয়া ফেলিলাম—ইহাতে নানারূপ ঘটনাচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে জীবনের ভালমন্দ সুদিন দুর্দ্দিন অনেক অবস্থাতেই পড়িতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৈচিত্র্যময় জীবনে অর্থের দিক হইতে না হইলেও নানা দিক হইতে আবার অভিজ্ঞতা লাভও হইয়াছে অসম্ভব। তবে কোন্‌টা লাভ কোন্‌টা ক্ষতি এখনও বিচারের সময় আসে নাই। বস্তুতঃ কি হইলে ভাল হইত, কি করা উচিৎ ছিল তাহা আর ভাবিনা, কারণ মানুষতো অবস্থার ক্রীড়ণক মাত্র! আমাদের কার্য্যধারা যে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে নানা ভাবে ধাবিত হয়, তাহার উপর মানুষের হাত কি, এড়াইবারও বা শক্তি কোথায়?

যাহা হউক ১৯০৯ তে স্বর্গীয় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মাতাজী তপস্বিনী (যমুনা বাঈ) যথাক্রমে শ্রাবণ ও ভাদ্র (১৩১৬) মাসে ময়মনসিংহে আসিলেন। মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্যারী কবিরাজ মহাশয় ও আমি মাতাজীকে সঙ্গে নিয়া মুক্তাগাছা, গোলকপুর, রামগোপালপুর প্রভৃতি জমিদারের স্থানে গেলাম। জমিদারবর্গও আমাকে খুব চিনিলেন ও সাধুবাদ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই মহাকালী পাঠশালার বাড়ী হইল মুক্তাগাছার জমিদার বিনায়ক দাস আচার্য্য চৌধুরীর মাতা বিমলা সুন্দরী দেবীর নাম বহন করিয়া তাঁহারই প্রদত্ত অর্থ সামর্থ্যে। কিন্তু সেই সময়ে আমার একটি বিপদ ঘটিল। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার রাজর্ষি গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বাহিরে যাইবেন, আমরা তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইতে ময়মনসিংহ ষ্টেশনে গিয়াছি। ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও (বিলাতী সাহেব) ঐ গাড়ীতে যাইতেছিল। গোপালবাবুর ও তাহার কেবিন ছিল কাছাকাছি, আমাদের ভীড় দেখিয়া সাহেবের চাপরাসী একটু অসদ্ব্যহার করে, অমনি গোপাল বাবুর ছেলে সুধীরবাবুর আদেশে ধীরেন্দ্র সেন নামে তাহার একজন চেলা চাপরাসীকে একটি ভীষণ চপেটাঘাত করে। গাড়ী ছাড়িবার পরে যখন আমরা বাসায় ফিরিতেছিলাম, দারোগা কনেষ্টবল প্লাটফর্ম্মে আমাদিগকে ঘেরাও করে। সকলে উহাদিগকে ছাড়াইয়া দৌড়াইয়া যায়। আমিও সঙ্গে ছিলাম।

ইহার পরে আমাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীন একটি পুলিস্ কেস হইল। মিথ্যা সাজানো হইল স্বদেশী বাবুরা 'বন্দেমাতরম্' বলিতে বলিতে মারিয়া চলিয়া গেল। মোকদ্দমা অনেক দিন (কয়েক মাস) চলিল, কিন্তু সকলেই সেনাক্তের গোলমালে খালাস হইল, কেবল ধীরেনের ২৫৲ টাকা জরিমানা হয়। এই মোকদ্দমায় ওকালতী সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্কট্ সাহেব আমার পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন।

এই মোকদ্দমায় আমি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিতও হইলাম, জমিদারদেরও শ্রদ্ধার্জ্জন করিলাম, আর অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে খুব তারিফ করিল, ইহা ১৯০৯ জুনের কথা। আমি বীরত্ব দেখাইবার জন্য গালিলাণ্ড সাহেবকেও এই সংবাদটি লিখিলাম। তিনি তখন কলিকাতা ছিলেন না—কিন্তু সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ জন, সি, ল্যাঙ বড়ই অসন্তোষ ও ভয় প্রকাশ করিল। ফৌজদারী আদালতে আসামীরূপে দণ্ডায়মান। কি ভয়ানক। ইহাদের মর্য্যাদায় ভারী বাধে। তাই লিখিল, "It has passed beyond personal consideration," অর্থাৎ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত সৌহার্দ্দের বাহিরে গিয়াছে! দেশীয় লোকের স্বদেশীয় মামলায়

দাঁড়াইবার গৌরব ধারণা করিবার মত বুকের পাটা ইহাদের হয় নাই। যাহা হউক, ভাগ্যে খালাস পাইয়াছি, নতুবা লালমুখো সাহেবরা কি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিয়া আমার স্বর্ণকক্ষটি বোধ হয় ভাঙ্গিয়াই দিত। তবে গালিল্যাণ্ড সাহেব জানিতেন কিনা বলিতে পারি না। যতদূর মনে হয়, তিনি তখন কলিকাতা ছিলেন না।

পূজার সময়ে বাড়ী গেলাম। মা, স্ত্রী ও ছেলেটিকে দেশে রাখিলাম। আমি পূজার পরে ঢাকা গিয়া লক্ষ্মীবাজারের একটি মেসে বাসস্থান ঠিক করিয়া কেবল বীমা করাইতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ গিয়াও নিজ বাসায় থাকিয়া কাজ করিতাম। উদ্দেশ্য ১৯১০-এ ঢাকায় ওকালতি আরম্ভ করিব, ইতিমধ্যে সকলের সঙ্গে পরিচয়টাও হইয়া যাইবে। ময়মনসিংহে বাসা রহিয়াছে সুন্দর জায়গায় নদীতীরে, টেবিল চেয়ারের অভাব নাই, তবে ওকালতি করিতে সেখানে বসিবার প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলাম মহাকালী পাঠশালার জন্য কাজ করিয়া যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি এবং সেই দরুণই জমিদারদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে তাহা এখন ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপারে অপচয় করিব না। অনেকে পরামর্শ দিলেন সেইখানে বসিতে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্যারী কবিরাজ মহাশয় আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী, তিনি অনেক করিয়া বলিলেন, "হেম, তুমি এইখানেই ব্যবসা কর, আমি সমস্ত জমিদার-ঘর বাঁধা করিয়া দিব।" তিনি পারিতেনও কারণ জমিদার মহলে তাঁহার খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ময়মনসিংহে বসিতে কিছুতেই আমার মন চাহিল না, ঢাকায় বসিবই ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

১৯১০-এর এপ্রিল মাসে বাড়ী হইতে মা ও স্ত্রীসহ ঢাকায় আসিয়া আরমাণীটোলায় একখানা ২৫ টাকা মাসিক ভাড়ার দোতলা বাড়ীতে বাসা নিলাম। ওকালতি আরম্ভ করিয়াই আর ইন্‌সিওরের কাজ করি নাই। কিন্তু বাসা খরচের কোন ভাবনা নাই। এখন আমার রিনিউয়ালই মাসে ২০০৲ টাকা হইয়াছে। একটা জমিদারের আয় অপেক্ষা বড় কম নয়—আর একেবারে ঘরে বসিয়া বিনাপরিশ্রমে নির্ঝঞ্ঝাটে। দুই একটা মোকদ্দমাও পাইলাম—কখনও কিছু পাইতাম, কখনও বিনা পয়সায়ই করিয়া দিতাম।

ওকালতি আরম্ভ করিয়াই আমি গালিল্যাণ্ডকে চিঠি লিখিলাম। তাঁহার পত্রে এমন একটা নৈরাশ্য দেখিলাম যে বন্ধুবিয়োগেও সেরূপ হয় না। তিনি লিখিলেন, কত কষ্ট করিয়া আমায় শিখাইয়াছেন, কিন্তু আজ পৃথক হইতে চলিলেন।

ইতিমধ্যে খবর আসিল আমি আসার পরে ময়মনসিংহে ডিস্পেন্সারীর আয় ক্রমে কমিতেছে। আমি অতঃপরে ঢাকা সহরেই ৫১, দিগ্‌বাজার একখানা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী নিয়া সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড একখানি কামরার একদিকে ডিস্পেন্সারী করি, আর একদিকে পার্টিসনে বৈঠকখানা রাখি। এই বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর ছিল, ভগ্নীপতি কবিরাজ মহাশয়ও পরিবার নিয়া এখানেই বাস করিতে লাগিলেন। জন্মাষ্টমী আসিল, কত লোক মিছিল দেখিতে আসিলেন। কারণ এই রাস্তায়ই মিছিল যাইত। বাড়ীটি কাছারীরও খুব নিকটে, পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহারই কাছে। বুড়ীগঙ্গা, কলেজ, স্কুল সবই নিকটে। পূর্ব্বে ইহাতে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল বেড়া নিবাসী রামচন্দ্র সেন থাকিতেন।

এই সময় আগষ্ট মাস (১৯১০) হইতেই একটি বড় মোকদ্দমায় নিযুক্ত হই। পুলিন দাস ঢাকার প্রসিদ্ধ লাঠি বিশেষজ্ঞ, অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আরও ৪৩জন সহকর্ম্মী ও সহচরসহ গ্রেপ্তার হন, তাহাদের বিরুদ্ধে বিধি ১২১ ক দণ্ড বিধি (রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের) অভিযোগে মোকদ্দমা হইবে। রমনার মাঠে পরিত্যক্ত গভর্ণমেণ্টের বাড়ীতে মোকদ্দমা বসিয়াছে। কলিকাতা হইতে পি, এল, রায় ও এন, গুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টার আসিয়াছেন। আমার ভাগ্নী-জামাই হেম, তাহার ভ্রাতা পরেশ এবং পিতা গোবিন্দ সেনও মোকদ্দমার আসামী হইয়াছেন। আমাকে ইহাদের পক্ষে সমর্থন করিতে হইল। রমনায় প্রায় ৪।৫ মাস মোকদ্দমা চলে। অনেক উকীল ছিলেন, কিন্তু আমি থাকিতাম অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া। প্রায় হাজারখানেক দলিলের বিষয়বস্তু একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম, একটা প্রকাণ্ড বহিতে সব

নোটও করিলাম। এই নোটই পরে অমূল্য হইয়া দাঁড়ায়। সাক্ষীও ছিল তিনশতের উপরে। তাহাদের জবানবন্দীও আমার নখাগ্রে। বীমার আয়ে আমি নিশ্চিন্ত, অন্য উকীলদের ন্যায় অন্যদিকে তাকাইতে হয় নাই, আর সব উকীলরাও সমস্ত মোকদ্দমার নথিপত্র আমার নখাগ্রে বলিয়া আমার উপরই নির্ভর করিতে লাগিলেন। স্থির হইল কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে নিয়া আসিতে হইবে। তিনি আলিপুর বোমার মোকদ্দমা করিয়াছেন, আমাদের এটাও করিবেন না ? সব উকীলরা এবং তদানীন্তন উকীল লাইব্রেরীর প্রধান উকীল স্বর্গীয় রজনী গুপ্ত মহাশয় আমাকেই তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। যথাসময়ে কলিকাতা পৌছিলাম—চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিলাম, তিনি তখন হাইকোর্টের পূজার ছুটী উপলক্ষে বিলাত যাইতেছিলেন, ঠিকানা ও টাকার কথা বলিয়া দিলেন।

মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইল, ২রা জানুয়ারী (১৯১১) হইতে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। এবারেও আমাকেই কলিকাতা পাঠানো হইল। ঢাকার প্রবীণ নেতা স্বর্গীয় আনন্দ রায় মহাশয়ের সহযোগে তাহাকে নিযুক্ত করিলাম। প্রায় ১৫।২০ দিন (১৯১০ বড় দিন) সেই ৫৯ পটুয়াটুলীতেই থাকিয়া দাশ মহাশয়ের বাড়ী দুই বেলাই আসিতাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা জুনিয়ার উকীল হইয়াও আমিই তাহাকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝাইতাম। যথাসময়ে তাঁহাকে লইয়া একসঙ্গে ঢাকা পৌছিলাম। তিনি সেখানে ছয়মাস ছিলেন, আমি ছিলাম নিত্যসঙ্গী—কারণ কাগজপত্র আমার নখাগ্রে বলিয়া তিনি আমাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে চাহিতেন। আমার ডিস্পেন্সারীর ঔষধও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবন করিতেন। ময়মনসিংহ ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু ব্যবসা-জীবনে এ লাভও বড় কম নয়।

মোকদ্দমা শেষ হইলে তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন এবং ইঙ্গিতে আমাকে কলিকাতা যাইতে বলিলেন। দেখিয়াছি মোকদ্দমার কথা ছাড়াও তিনি ঢাকায় আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা আপন জন মনে করিতেন। মোকদ্দমা হইয়া গেলে আয়টা আরও বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম। রিনিউয়াল পাওয়া যায় যতদিন পলিসি চালু থাকে। ইতিমধ্যে কয়েকজন পলিসি হোল্ডারের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় আয়ও কিছু কমিয়াছে। তবে সেই কোম্পানীতে পলিসি Lapse (ঘাটতি) হইত খুব কম। আবার ময়মনসিংহ গেলাম, দুই এক দিন পিসতুত ভাইদের সঙ্গে থাকিয়া প্যারী কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীই রহিলাম। হাজার ত্রিশেক টাকার বীমা হইল। পূজার ছুটিতে (১৯১১) পরিবার-বর্গ ঢাকায়ই রাখিয়া মাকে নিয়া গয়া ও কাশীধামে গেলাম। মাসখানেক সেখানে থাকিবার পরে মাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া গয়া ও পাটনায় বিস্তর বীমার case করিয়া ফেলিলাম। সেই ভরসায়ই স্থির করিলাম এবার কলিকাতায়ই পাকাপাকি ভাবে বসিব। কিন্তু ময়মনসিংহের বাস উঠাইয়াছি, এবার ঢাকা হইতেও তল্পিতল্পা গুটাইতে হইল। ডিস্পেন্সারী জন্মভূমি বিদগাঁয়েই স্থানান্তরিত করিলাম। দেশের বাড়ীর বহির্ব্বাটিতে অনেকদিন কোন ঘর ছিল না, এবার বড় একখানি ঘর করা হইল। সেখানেই ডিস্পেন্সারী বসাইলাম। গ্রামে আসায় ডিস্পেন্সারীর আয় কমিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের আয় বেশ বাড়িল—কারণ তিনি বহুদর্শী কবিরাজ। এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া কালীঘাট ৬।১ শীকদার পাড়া লেন (পরে উহার নাম হয় মহিম হালদার ষ্ট্রীট এবং পরে নাম হয় যদু ভট্টাচার্য্য লেন) একতলা রকওয়ালা সুন্দর বাড়ীতে আসিয়া বাসা করিলাম। অনেক আত্মীয় স্বজন নিকটে। আমার বাড়ীস্থ খুল্লতাত আনন্দ দাশ মহাশয় ও খুড়ীমা আমাকে দেখিতেন, তাঁহারা নিকটস্থ বাসায়ই থাকিতেন।

এইখানে জীবন বীমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইবে। ইতিপূর্ব্বে কত বড় বড় উকীল সামান্য ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, আর আমি মফঃস্বল হইতে আসিয়া সহায় সম্বল ছাড়াও ঠাকুর চাকর রাখিয়া একেবারে ২৫৲ টাকা ভাড়ার বাসা করিয়া বসিলাম। ইহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মে মাসের কথা। তখন ২৫৲ টাকায় কালীঘাটে খুব ভাল বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইত। এরূপ ষ্টাইলে থাকা সম্ভব হইল মাসে মাসে কোম্পানীর সাহেব টাকা পাঠায় বলিয়া। যাহা হউক, ইনসিওরেন্সের কৃপায় ১৯১২ হইতে ১৯২১ এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবিরাম

ভাবে ব্যবসা করিতে লাগিলাম। প্রতিমাসে টাকা আসিত। আরম্ভ করিবার দুই এক বৎসর মধ্যেই ওকালতির আয়ও খুব হইতে লাগিল। অতঃপর বন্ধুবান্ধব কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া কাহারও ইনসিওর আর করি নাই। কিন্তু প্রতি মাসে রিনিউয়্যালের টাকা আসিতেও কোনরূপ বাধা বা ব্যত্যয় হয় নাই। প্রতিমাসের ২রা ৩রা তারিখেই টাকাটা পাইতাম।

ইতিপূর্ব্বে গালিল্যাণ্ড সাহেব আমাকে দুই একজন উপযুক্ত এজেন্ট ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিবার পরে আমি আমার দুইজন কাকাকে agent করাইয়া দিই। একজন বাঙ্গলার অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসা-দক্ষ Business Magnate বেঙ্গল সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জে,সি, দাশ, আর একজন মিঃ এস এন দাশগুপ্ত। ইনি কিছু দিন স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। ইনিও খুব কৃতী successful agent হন। উভয়ের কাছেই গালিল্যাণ্ড সাহেব বলিতেন—

"Hemendra is a born agent."

আবার কখনও বলিতেন, "তোমাদের পরিবারটিতেই (family) বীমা করিবার দক্ষতা মজ্জাগত।"

এইরূপে সাহেবের শুভেচ্ছা অর্জ্জন করিলেও আইন ব্যবসায়ে কলিকাতা থাকিয়া আর বীমার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি নাই। জ্যোতিষও (J. C) নিজে নূতন কোম্পানী করে, সুরেন্দ্রই (S. N) বীমাকাজের ধারাটা রক্ষা করে। যে কারণেই হউক, সাহেব আমার রিনিউয়্যাল কখনও বন্ধ করে নাই। তাহার successor পরবর্ত্তী সেক্রেটারী সুইট সাহেবও George C. Sweet'ও নয়। কিন্তু পরে নূতন নূতন সাহেব আসিল। তাহাদের সঙ্গে পরিচয়ও হইল না। ক্রমে ছাড়াছাড়ি হইবার উপক্রম হইল।

অতঃপরে নূতন একটি পরীক্ষায় পাশ করিয়া (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে) হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ভুক্ত হইলাম। ইহাতে ৫০০৲ টাকার ফি দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সম্ভ্রম বাড়িল। এখন সে ফি হইয়াছে ৮৫০৲।

যাহাহউক এইরূপে ওকালতিতে যশার্জ্জন করিতে লাগিলাম, কিন্তু শীঘ্রই একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আসিল।

১৯২১ স্বরাজ বৎসর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। কিন্তু স্বদেশ মাতৃকার আহ্বানে সব ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নাগপুর কংগ্রেসের (১৯২০ খৃষ্টাব্দ) পরে আমিও তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। আলিপুরের সকলে বলিতে লাগিল, "ইহার সাহসতো কম নয়! আমাদের এখান হইতে একমাত্র উকিল ইনিই ব্যবসা ছাড়িলেন!" কিন্তু সাহস কেবল রিনিউয়াল মাসে তখনও প্রায় সোয়াশত, শ'দেড়েক টাকা ছিল বলিয়া। যাহাহউক সমগ্র বৎসর স্বরাজ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি, জেলেও প্রায় দশমাস ছিলাম, কখনও বিন্দুমাত্রও মনে ক্ষোভ আসে নাই—কেবল এই ইনসিওর কোম্পানীর রিনিউয়ালের দৌলতে। এই জন্যই বাড়ীতেও মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি কখনও কোনরূপ অভাব বোধ করেন নাই। খালাস হইবার পরে আবার দেশবন্ধুর সাহচর্য্য করিতে লাগিলাম; এবং ডিস্পেন্সারীটিতেও বেশ সুনাম হইল। দেশবন্ধু ফরওয়ার্ড পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিলেন। টাকা তিনিই উঠাইলেন। আমি ইন্‌সিওরেন্স কাজ ভাল করিতাম বলিয়া ভাল কমিশনে আমাকে দিয়া কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকা উঠাইতে সক্ষম হন। কমিসন বাবদ আমিও প্রায় চারি হাজার টাকা পাই। তখন কিছু অভাবে ছিলাম, টাকাটায় বড়ই উপকার হইল। ফরওয়ার্ডে দেশবন্ধু Art and Literature এবং Stage and Screen প্রভৃতির বিভাগ করিবার ব্যবস্থা করেন। আমিই প্রথম Stage Editor হই। ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন কাগজেই রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে পৃথক্ কোনবিভাগ খোলা হয় নাই। ভারতীয় নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে Art and Literature পৃষ্ঠায় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার নূতনত্বের জন্য স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ বসুর সহায়তায় আমেরিকা হইতে একটি টাইটেল লাভ হইল। কিন্তু শীঘ্রই আবার একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিল। ১৯২৫, ১৬ই জুন, দেশবন্ধু আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাজনৈতিক জীবনেও তিনি আমাকে একান্ত বিশ্বাস করিতেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর হইতে আবার ওকালতি ব্যবসায়ে যোগদান করি। দেশবন্ধু নাই, এখন আবার বিলাতী কোম্পানীতেও ইঞ্জিওর করাইতে পারি না। আয়ও কমিয়া আসিয়াছে। এদিকে খরচও বাড়িয়াছে। তবে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলগাঁও কংগ্রেসও উকীলদিগকে যাহারা ব্যবসা ছাড়িয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। যাহাহউক ব্যবসায়ে আবার লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। দায়রার মোকদ্দমায় আমার বেশ খ্যাতি ছিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নূতন নিয়মানুসারে হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে কাজ করিবারও ক্ষমতা লাভ করি। এ পর্য্যন্ত ইহা ব্যারিষ্টারদেরই একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল।

অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও আমি কংগ্রেসের সংস্রব হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। সুভাষচন্দ্র জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া (১৯২৭ খৃষ্টাব্দে) আমাকে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া নিলেন। কংগ্রেসের পুরাতন সেবকদের মধ্যে অনেক কর্ম্মীই আমার বাসায় আসিয়া গল্প আলোচনা করিতেন। তখন আমার বাসা কালীঘাটস্থ ৩১নং হালদার পাড়া রোডে। মক্কেলেরও খুব ভীড় হইত। ডায়মণ্ডহারবারের শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর হালদার মহাশয় আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেখানকার প্রধান মোক্তার পশুপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও কাজ দিতেন না। বসিরহাটের রাখাল দাস বক্সী মহাশয়ও আমাকে সর্ব্বদাই মোকদ্দমা করিতে পাঠাইতেন। কিন্তু এই সবই আর বেশী দিন সহিল না। জলবুদ্বুদের মত সবই ক্ষয় হইতে লাগিল।

এই সময়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমার সেই পূর্ব্বতন ষড়িষা হাইস্কুলের প্রিয় ছাত্র সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মিলনের একটি সুযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার নিজস্ব নবনির্ম্মিত কালীঘাটস্থ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের বাড়ী নিয়া একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা আমাকে করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার খ্যাতির কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ কখনও হয় নাই। শুনিয়াছি ব্যবসায়ে তিনি অসম্ভব উন্নতি করিয়াছেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল তিনিই রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কমার্সিয়াল কেরিয়িং কোম্পানীর আয় প্রচুর-সম্পদ সম্ভার প্রদান করিতেছে। আবার একটি বীমা কোম্পানীও করিয়াছেন—নাম মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী। এই মোকদ্দমাটি আমার কংগ্রেস-বন্ধু সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস আমাকে দেন। ইনিও মাদারিপুর হইতে আইন ব্যবসা ছাড়িয়া কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে বরাবরই সদ্ভাব ছিল। সুরেন্দ্র বাবু তখন সচ্চিদানন্দের বিশ্বস্ত কর্ম্মসচিব। বলাবাহুল্য এই মোকদ্দমায় আমি কোন ফি গ্রহণ করি নাই। সুরেন্দ্র বাবুর কাছে সচ্চিদানন্দ জানিতে পারেন যে "মোদ্দমার উকিল তাহারই ভূতপূর্ব্ব ষড়িয়া হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হেমেন্দ্র বাবু।"

১৯৩১ সেপ্টেম্বর মাসে যখন মোকদ্দমাটিতে তিনি জয়লাভ করেন, আমার উক্ত কংগ্রেস বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথকে তিনি বলেন—

"সুরেনবাবু, মাষ্টার মহাশয়কে একবার আফিসে নিয়ে আসুন না!"

ইহার পরেই একদিন গাড়ী করিয়া সকালে সুরেনবাবু আমাকে পোলকষ্ট্রীটের অফিসে লইয়া যান। অফিস তখন ২৮ নম্বরে। সচ্চিদানন্দ সকালে বিকালে অফিস করিতেন। পার্শ্বে বসিতেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। সচ্চিদানন্দকে দেখিলাম, ধুতি পরিহিত, কিন্তু মূর্ত্তিমান কর্ম্মশক্তি। আমাকে দেখিয়া এত সম্মান করিলেন যে মনে হইল ১৯০৫এর সেই সচ্চিদানন্দ। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কথা কতবার মনে হইয়াছে, কিন্তু এখন দেখা হইল, তবে এখন তিনি কত বড়। একটু সঙ্কোচ আসিল। নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, অথচ চারিদিকে একান্ত কর্ম্মরত। কথাপ্রসঙ্গে বলেন—

"মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনার সব খবরই রাখি, তবে তখন আপনি সাহেবি পোষাক প'রে কল্‌কাতা ইনসিওর করাতে যেতেন, আমি একটা বীমা কোম্পানী ক'রেছি, কাজও ভাল হ'চ্চে, আমার ইচ্ছা আপনি আমার কোম্পানীতে আসুন।"

আমার তখন আসিবার কোন কারণ হয় নাই, তথাপি একবার আমি বলিয়াছিলাম—

"আমাকে মাস কত দেওয়া সম্ভব হবে ?"

সচ্চিদানন্দ—"আপনি যা বলবেন তাই As you will dictate." কথাগুলি খুব আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন।

আমি যা dictate করিব! সচ্চিদানন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

ইহার পরে আমাকে মোটরেই বাসায় পাঠাইয়া দেন।

ইহার পরে অনেক দিন (বোধ হয় এক, দেড় বৎসর) আর দেখা হয় নাই। কয়েকমাস পরে আমার ওকালতি জীবনের উপর একটা ভয়ানক আঘাত আসিল। ১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী টালিগঞ্জের ইনস্পেকটার সম্পূরণ সিং প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই রাত্রি ৩টার সময় আসিয়া "হেমেন বাবু, হেমেন বাবু" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম বাড়ীতে চোর ডাকাত আসিয়াছে না কি ? তারপরে বৈঠকখানা ঘর খানাতল্লাস করিয়া একটা কংগ্রেস পতাকা (Flag) ও কিছু কংগ্রেসের কাগজ লইয়া যায়। মনে করিয়াছিলাম আমাকে গ্রেপ্তার করিবে, কিন্তু তাহা করে নাই। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সমগ্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছেন, আমাকে গ্রেপ্তার করিলে বরং একটু সম্মান লাভ হইত! কিন্তু দয়া করিয়া করিল না বটে, তবে চতুর পুলিস-রাজ এবার আমার মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল। আমার সে বৈঠকখানায় আমি বসিয়া মক্কেলদের সঙ্গে মোকদ্দমার কথা কহিতাম, যে ঘরে নানাস্থান হইতে মক্কেল আসিয়া ভিড় করিত, যাহাদের কোলাহলে সর্ব্বদা যে কক্ষখানি মুখরিত থাকিত, পুলিস সেই ঘরখানি বাহির হইতে তালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া ছুইটি হিন্দুস্থানি জোয়ান গোছের কনেষ্টবল ২৪ ঘণ্টার জন্য দরজার সম্মুখে রকের উপরে বসাইয়া রাখিল। পালামত ছুইজন আসিয়া এই ছুইজনকে বদলী করিত। পরদিন তিনটি আপিল—ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ কে, সি, নাগের নিকট দরখাস্ত করিয়া তিনটিরই মুলতবি নিলাম। পূর্ব্বে ঢাকায় মিঃ নাগের সঙ্গে পড়িতাম। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিনদিন গেল, চলতি মোকদ্দমাগুলির কেবল তারিখই নিতে লাগিলাম। তালাও খুলিল না, বৈঠকখানায়ও প্রবেশ লাভ করিতে পারিলাম না, এদিকে মক্কেলও পুলিস দেখিয়া বাড়ীর কাছে আর ঘেঁসিতে সাহস করিত না! এইভাবে প্রায় আট মাস গেল—মামলা মোকদ্দমা একেবারে বন্ধ হইবার মত হইল। সংসার চলাই ভার হইল। কিছুটা ঋণও হইল আটমাস পরে আগষ্ট মাসে তালা খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু যে হাট অকস্মাৎ অকারণে ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা আর পূর্ণ হইল না। উকীলের পশার একবার গেলে আর শীঘ্র সংশোধন হওয়া ভার হয়।—বড়ই দুর্দ্দিন আসিল, ওকালতির আয় নাই। ইন্‌সিওরেন্সের রিনিউয়ালও খুব কমিয়া আসিয়াছে। বড়ই বিপাকে পড়িলাম। এদিকে মাতৃদেবীও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রাদ্ধেও প্রায় দেড়হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। উপরন্তু লেখার ঝোঁক যখন মাথায় চড়ে আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। এমনি উহার নেশা!

১৯৩৩ এর ফেব্রুয়ারী মাস, ছুটির দিনে সেদিন ইণ্ডিয়ান ষ্টেজের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করিয়াই একটু হাটিতে হাটিতে উকীল উপেন্দ্রবাবুর (তাহাকে আমি দাদা ডাকিতাম) বাসার দিকে আস্তে আস্তে হাটিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ১নং কালীদাস পতিতুণ্ডি লেনের কাছে একখানি বড় মোটর আসিয়া থামিল। গাড়ীতে সচ্চিদানন্দ ও অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া। অতুলবাবু উক্ত বাড়ীতে সচ্চিদানন্দবাবুর একজন ভাড়াটিয়া। এই বাড়ীর সম্পর্কিত মোকদ্দমায়ই আমি উকীল ছিলাম। যোগাযোগই বড়ই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত। আমাকে দেখিয়াই সচ্চিদানন্দ বলিলেন—

"মাষ্টার মশায় এখানে ? চলুন আপনার বাসায় আজ যাব। আসুন আমার সঙ্গে"।

অতুলবাবুও আপ্যায়িত করিলেন, তিনি জজকোর্টের পেসকার, তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই আমার খুব সম্প্রীতি ছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতুলবাবুর বাড়ীতে ছিলাম। তিনি দোভাজা চিড়া, ঘি, চিনি ইত্যাদিতে উভয়কে আপ্যায়িত করেন। পরে সচ্চিদানন্দ আমাকে সঙ্গে নিয়া আমার বাসায় আসেন।

বৈঠকখানায় সেই সময় একজন লোক টাকার তাগাদার জন্য আসিয়াছিল। আমার হাতে কিছু না থাকায় আরেক দিন আসিতে বলিলাম। সচ্চিদানন্দ সেই লোকটিকে বলেন, "কত তোমার বাকী?" বলিতেই তিন টাকা তখনই পকেট হইতে দিয়া দিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। নিষেধ করিতেও বাধিল। পরে তাহাকে উপরে নিয়া গেলাম। উদ্দেশ্য সমস্ত "ইণ্ডিয়ান ষ্টেজের" পাণ্ডুলিপি (manuscripts) তাহাকে দেখাই। দেখিয়া ভারী আনন্দিত হইলেন। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতির কাহিনী তাহাকে খুবই আনন্দ দিল, আমি বলিলাম--এগুলি ছাপাইতে পারি না, কিন্তু অমূল্য সম্পদ!

সচ্চিদানন্দ—সেজন্য ভাবনা কি? আমার প্রেস আছে, আমি ছাপাইয়া দিব।

নীচে আসিয়া বলেন—

"চলুন আমার বাড়ীতে।" আমিও চলিলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে বলেন, "মাষ্টার মহাশয়, বইএর জন্য আপনার ভাবনা নাই, আপনি আমার কোম্পানীতে আসুন—চলুন এখনই আমার বরানগরের বাগানে যাই, সেখানে আজই সব কথাবার্ত্তা হবে।"

ঐখান হইতে ১০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে সুরেন্দ্রবাবুর বাসায় আসেন, উদ্দেশ্য তাঁহাকেও সঙ্গে নিবেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর সেদিন কি একটা বিশেষ জরুরী ঠেকায় তিনি যাইতে পারেন নাই। অতঃপর আমাকে তাহার ৫৬ নম্বর কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে (সুরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জি রোডে) নিয়া যান। উপরে নীচে সমস্ত ঘরগুলি দেখান। তারপরে আমাকে জলটল খাওয়াইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার আফিসে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়া ঐ গাড়ীতেই বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

এবার আর গড়িমসি করিলাম না। দুই তিন দিন মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি প্রতি মাসে ৪০০৲ টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একখানি চেম্বারও দিলেন। এক ভাগে আমি, আর এক ভাগে অর্গানাইজিং অফিসার অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় বসিতেন। সুরেন্দ্রবাবু সচ্চিদানন্দকে বলিলেন, "ইনি ওকালতি ব্যবসা করেন, মাইনে থাকিলে কি ভাল হইবে? উচ্চ কমিসন দিলে হয় না?" তিনি বাধা দিয়া বলেন—

"না, সুরেনবাবু, আপনি যেমন বঙ্গলক্ষ্মীতে আছেন, আপনার মত আমার নিজের একজন লোক ইন্‌সিওর কোম্পানীতেও রাখিতে চাই

সচ্চিদানন্দের ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। এইভাবে সমূহ বিপদ হইতে ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া গেলাম। কে একজন এই ভাবেই বাল্যাবস্থা হইতে সর্ব্বদা আমাকে পিতার স্নেহে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁরই কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি।

যাহা হউক আমি প্রথমেই কোম্পানীর অফিসার হইলাম না। বেতন ও কমিসন দুইই থাকিল। তবে কথা হইল টাকাটা প্রতি মাসে অগ্রিম পাওয়া যাইবে। কথাবার্ত্তা হইয়া গেলে আমাকে বলেন, "মাষ্টার মহাশয়, এখন এই ভাবে চলুক, পরে কাজকর্ম্ম বুঝিয়া অন্য ব্যবস্থা করিব।"

আমার জন্য নূতন একটি পদ সৃষ্ট হইল—সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট, অর্গেনিজেসন।

১লা মার্চ্চ (১৯৩৩) হইতে কাজ করিতে লাগিলাম। ইন্‌সিওরেন্সের সহায়তায় আবার সংসার নির্ব্বাহ হইল। তখনও ওকালতি ছাড়িলাম না। তবে প্রতিদিনই কাছারী করিয়া আফিসে যাইতাম, ক্রমে আফিসই প্রিয় হইতে লাগিল, কাছারীর আকর্ষণ কমিতে লাগিল। তবে এই অবস্থায়ও সচ্চিদানন্দ তাহার জনৈক আত্মীয়ের মোকদ্দমায় আমাকে নিযুক্ত রাখেন। এরোপ্লেনে ঢাকা যাইতে হয়। যাহা হউক বীমার কাজও খুব আশাপ্রদ হইল। কয়েকজন আমার উকিল বন্ধুদেরও ইন্‌সিওর করাইলাম। আমার একটি ভাগিনেয় মাখন সেনকে অতিরিক্ত ৭৫৲ টাকা বেতনে আমার সহকারী করিয়া আনা হইল।

মেট্রোপলিটান আফিসে আরও দুইজন অফিসারের পরিবারবর্গের সঙ্গে আমি বহুদিন অবধি পরিচিত ছিলাম। উক্ত অমূল্যভূষণের বড় মামা অশোককে কয়েকদিন পড়াইয়াছিলাম, তাহার মাতামহ ডাক্তার কামেখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মী এবং আমার কাকার বন্ধু ছিলেন। আর একাউণ্টস্ অফিসার শৈলেন্দ্র

নাথ সেনের পিতা স্বর্গীয় গুরুনাথ সেন মহাশয়ের কাছেও আমাদের গ্রামস্থ মাইনর স্কুলে পড়িয়াছি। নানারূপ সম্বন্ধও আছে, যখন ওকালতি করি, এক পাড়ায় থাকিতাম। আবার যখন চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করিতে আসি, শৈলেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরেনও সহায়তা করিত। তখন সে পাটুয়াটোলা লেনেই থাকিত। বয়সে অনেক ছোট হইলেও এই দুইজনের (অমূল্য ও শৈলেনের) সঙ্গে বরাবর আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে

এখানে আসিয়াই সচ্চিদানন্দের বিশিষ্ট একটি সদ্‌গুণ আমায় বিশেষ আকর্ষণ করিল। যাহারা দেশের কার্য্যে বা অন্য ভাবে দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছেন তাহাদিগকে নানাভাবে কাজে লাগাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। উক্ত সুরেন্দ্রবাবু ব্যতীত শ্রীহেমন্ত সরকার, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, মিঃ বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতিকেও তিনি কাজ দিয়াছিলেন। ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। অনেক কংগ্রেস কর্ম্মীকে তিনি টাকা ধারও দিয়াছেন। ধার নামে, শোধ আর হয় নাই। নেতাজী সুভাষকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা আমি জানিতাম।

এখানে আসিবার পরে সচ্চিদানন্দ আমার "ইণ্ডিয়ান টেক্স" প্রথম খণ্ড ছাপাইয়া দেন। কোম্পানীই প্রকাশক হয়। দ্বিতীয় খণ্ডও মুদ্রিত হয় খুব সুবিধায়। এই বইগুলি মুদ্রিত হওয়ায় দেশ-বিদেশে আমার যে কি সম্মান বাড়িল, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু এইবার ইংরাজ কোম্পানীর সিটি অব গ্লাসগো হইতে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইল। ত্রিশ বৎসর সমানে রিনিউয়াল পাইয়াছি, কখনও কোন বাধা হয় নাই। কিন্তু একদিন কি একটা কাজে উক্ত আফিসে গিয়াছি, একজন পূর্ব্ব পরিচিত এজেন্টের সহিত দেখা হইল। পরে বুঝিতে পারিলাম উক্ত ব্যক্তিটি 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'। ৪।৫ দিন পরে চিঠি আসিল—আমি অন্য কোম্পানীতে কাজ করি সুতরাং আমাকে রিনিউয়াল কমিসন দেওয়া হইবে না। ইহাদের নাকি এখন সেইরূপ নিয়মই হইয়াছে। আমি লিখিলাম—

"অন্য কোন কোম্পানীতে কাজ করিলে রিনিউয়্যাল যাইবে, আমার নিয়োগপত্রে এরূপ সর্ত্ত ছিল না। আমার রিনিউয়াল যাওয়া ন্যায়সঙ্গত হইবে না, বিশেষতঃ সিটি অব গ্লাসগোর উপর আমার শ্রদ্ধা সমানই আছে।"

কিন্তু নূতন সাহেব, চিঠিপত্রে কিছু হইল না, আমিও দেখা করিলাম না। কিছুদিন পরে স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো আফিসের সর্ব্বাধিনায়ক সাহেব কলিকাতা আসেন। আমি তাহার সঙ্গে ফোনে ব্যবস্থা করিয়া দেখা করিলাম। অনেক আলাপ হইল, আলাপে মুগ্ধও হইলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিলাত গিয়া আপ্যায়িত করিয়া দীর্ঘ চিঠি লিখিলেন, কিন্তু স্থানীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৯৩৪-এর মে মাস হইতে কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ রহিত হইল। একবার ভাবিলাম মোকদ্দমা করি, আবার সাতপাঁচ ভাবিয়া বিরত হইলাম। তখন রিনিউয়াল পঞ্চাশের কোঠায় নামিয়াছে, তবু দীর্ঘকালের সম্বন্ধ, বড় কষ্ট হইল। ইহার ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই নূতন আইন ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স য়্যাক্ট হইবার পরে 'সিটি অব গ্লাসগো' তাহার কলিকাতার আফিস বন্ধ করিয়া দিল।

যাহাহউক, অচিরেই আবার এক পরিবর্ত্তন আসিল।

১৯৩৬, ১৪ই এপ্রিল, সেদিন বাঙ্গলা বৎসরের প্রথম তারিখ। সকালেই সচ্চিদানন্দ ফোন করেন—

"মাষ্টার মহাশয়, আপনি কোম্পানীতে পার্ম্মানেণ্ট সার্ভিস (স্থায়ী চাকুরী) নেবেন?"

উত্তরে আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আপত্তি নাই।"

তিনি আচ্ছা, আজ বৈকালে একবার আসিবেন।

বৈকালে উপস্থিত হইতেই বলিলেন, "যিনি সেক্রেটারী আছেন, আপাততঃ তাঁহাকে বদ্‌লাইতে চাই আপনি সেক্রেটারী হবেন, আপনার ইহাতে ক্লেম (দাবী) আছে। আর ৮।১০ দিন মধ্যেই পাঞ্জাব ও দিল্লী যাইতে হইবে। সেখানকার ব্রাঞ্চগুলির কাজে বড় ভাটা পড়িয়াছে।"

আমি স্থায়ী চাকুরী নিতে রাজী হইলাম, কিন্তু বলিলাম, "সেক্রেটারী হইলে অমূল্যরই হওয়া উচিৎ, আমাকে অন্য একটা পদ দিয়া বর্ত্তমান কাজের ভার দিয়া পাঞ্জাবে পাঠাও।" অমূল্যভূষণের নাম করিবার কারণ—কয়বৎসর লক্ষ্য করিয়াছি অর্গানাইজারদের সঙ্গে তাহার নীতি স্পষ্ট এবং বেশ উদার। অফিসের কাজে এবং ব্যক্তিত্ব

সম্বন্ধেও সচ্চিদানন্দকে তাহার প্রতি খুব সন্তুষ্ট দেখিতাম। আমি নিজেও সেরূপই লক্ষ্য করিয়াছি।

অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় তখনও কোম্পানীর অরগানাইজিং অফিসারই ছিলেন।

পরদিন বরানগর বাসায় আমি ৪০০৲ বেতনের কোম্পানীর স্থায়ী অফিসার "এজেন্সি ম্যানেজার" নিযুক্ত হইলাম ? এবং ১লা মে তারিখে পাঞ্জাব রওনা হইয়া গেলাম। সেবার পাঞ্জাব ও দিল্লীর কাজ সারিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া দেখিলাম সুরেনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া এম, এল-এ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর সেক্রেটারীর পদটি ঠিকই আছে।

রাত্রিতে বরানগর দেখা করিতে গেলাম। সচ্চিদানন্দ অসুস্থ ছিলেন, আমাকে দেখিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করেন। নভেম্বর মাসে আবার আমাকে দিল্লী, আম্বালা এবং পাটনা পাঠাইলেন। এবার লাহোরে এবং উত্তর প্রদেশের সমস্ত স্থান ঘুরিয়াছিলাম।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমাকে তাহার স্বদেশের বাড়ী হরিণাহাটি লইয়া যান। প্রকাণ্ড বাড়ী, মনে হইত যেন পূর্ব্ববঙ্গের কোন রাজবাড়ী, প্রকাণ্ড পুকুর দক্ষিণে, উত্তরে তিনখানি পাকা বাড়ী, পুকুরের দক্ষিণে বৈঠকখানা ও অতিথিশালা, তার দক্ষিণে প্রকাণ্ড বিল ও উহার বিস্তীর্ণ জলরাশি। কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাইয়াছিলাম।

ইহার পরে আবার ভাগলপুর পাটনা, এলাহাবাদ এবং কাশী গিয়াছিলাম।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পূজার সময় বিক্রমপুর রিলিফ্ কাজে গিয়াছিলাম। আসিয়া শুনিলাম সেক্রেটারীর কাজ গিয়াছে, অমূল্যভূষণই সেক্রেটারী হইয়াছেন।

দুইতিন বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিবার পরে সচ্চিদানন্দ আমার কাজের ভার আরও লাঘব করিয়া দেন। বিশেষতঃ এখন সেক্রেটারীর পদ কর্ম্মঠ ব্যক্তির হাতে পড়িয়াছে। তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বাহিরে আর আমাকে যাইতে হয় না, তবে কার্য্যপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তখন ক্লেইমের সংখ্যাও বাড়িতেছে, তাই সেই claim এর (দাবীর) ভারই আমার উপর অর্পিত হয়। তবে সমস্ত orgauisation-এর সহিতই যে আমি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা দেখাইবার জন্য আমার পদবী Agency Managerই রাখিয়া দেন, আর সুষ্ঠু কাজের জন্য একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী বোর্ড (Internal Board) করিয়া দেন, তাহাতে যেরূপ একমতে কাজ হয়, কুত্রাপি অন্য কোন স্থানে বা প্রতিষ্ঠানে এইরূপ সংহতি দৃষ্ট হয়। ইহার মেম্বর তিনজন, এক সেক্রেটারী এ, বি, চাটার্জ্জি, দুই একাউন্টস অফিসার শ্রী এস, এন, সেন (পূর্ব্বোক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন) এবং তিন আমি। অমূল্য বাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্লান্ত কর্ম্মী শৈলেন বাবুও কোম্পানীর অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ।

এখন যে claim-এর কাজ করিতেছি তাহাতে ওকালতির আইন ও প্রমাণ (Law and Facts) দুইটিরই পরিচালনা হয় বলিয়া আমার খুবই ভাল লাগে। বিশেষতঃ আফিসে পূর্ব্বোক্ত দুইজন ব্যতীত অন্যান্য অফিসারগণ ও ষ্টাফের নানা পদবীর কর্ম্মীবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে বলিয়া অফিসের যাবতীয় কাজই খুব প্রীতিকর এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরের (১৯৩১—১৯৪৫) ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যে উপলব্ধি করিয়াছি সচ্চিদানন্দের ন্যায় এরূপ হৃদয়বান কর্ম্মবীর পুরুষসিংহ সংসারে ক্বচিৎ দেখা যায়—যেমনি কর্ম্মী, তেমনি শাস্ত্রবিদ্, যেমন অর্থনীতি-বিশারদ, তেমনি অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ, যেমন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, তেমনি খাঁটি ধর্ম্মপরায়ণ, এদিকে ধুলা হাতে পাইলেও স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন, আবার তাহার বিচক্ষণতায় যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিচারবাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। আত্মম্ভরিতা তাঁহার মধ্যে কখনও দেখি নাই, আর নিজ শক্তিতে বিশ্বাসও কখনও তিনি হারান নাই। যেমন অর্থের অপব্যবহার করেন নাই, আবার দিতে থুইতে খাওয়াইতে আপ্যায়িত করিতেও তাহার তুলনা ছিল না।

ইতিমধ্যে সুরেনবাবুকেও আবার তিনি কাজে বহাল করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন, আমি কদাচিৎ কোন অর্থশালী ব্যক্তিকে তাহার ভূতপূর্ব্ব কয় মাসের শিক্ষককে এত সম্মান করিতে দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি কি, শুনিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। মনে আছে ১৯৪৫ এর ১লা জানুয়ারী আমি ও সুহৃদ্বর সুরেনবাবু তাঁহার নবনির্ম্মিত প্রাসাদোপম বরানগরের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। নানা উপচারে নিজের সঙ্গে বসিয়া আমাদিগকে সাত্ত্বিক ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিতে করিতে আবেগভরে বলেন—

"মাষ্টারমহাশয়, কি ভাবেন আপনি? আপনি আমার মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে বসিয়ে বসিয়ে কেবল মাত্র চেক্ সহি করাব।"

কিন্তু এই শেষ, তাঁহারই ন্যূনাধিক দেড় মাস মধ্যে এই সর্ব্বজয়ী মহাপ্রাণ পুরুষসিংহ সবেমাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে কেবল পাঁচদিনের অসুখে সব ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে পরমধামে চলিয়া গেলেন।

তাহার পরেও ছয় বৎসর অতীত হইল। বহু যত্ন সিঞ্চিত, বহু সাধনায় বর্দ্ধিত, স্বহস্তরোপিত সচ্চিদানন্দের এই কর্ম্ম-বৃক্ষটি আজ বহু শাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া উহার স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়াতলে বহুজন প্রতিপালন করিতেছে, বহুজনের নিকটে শান্তিতৃপ্তি বৃত্তিশক্তি উপহার বহন করিতেছে। মেট্রোপলিটানের যশোরাশি আজ সমগ্র ভারতের পল্লীতে, মহকুমায়, সহরে, নগরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত, বিদেশেও প্রবাদের মত ইহার কর্ম্মপ্রবাহ সকলকে বিস্মিত করে। বিশ বৎসরের কোম্পানী, তথাপি বৎসরে আট দশ কোটি টাকার বীমাপত্র এস্থান হইতে প্রেরিত হয়, এপর্য্যন্ত দাবীস্বরূপই প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা বিতরিত হইয়াছে, ইহার ছোট বড় সকল কর্ম্মচারী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে একসূত্রে গ্রথিত, সচ্চিদানন্দের সুযোগ্য বিচক্ষণ পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ পিতার নাম যশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিয়া এই কলিকাতায়ই ব্যবসা-কেন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিকেতনে নিজস্ব বাড়ীতে অপ্রতিহত প্রভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন, সচ্চিদানন্দের সহোদরোপম চেয়ারম্যান সতীশচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে অভিভাবকোপযোগী সহযোগিতা প্রদান করিতেছেন, আর সচ্চিদানন্দের মেট্রোপলিটানের বিরাট উচ্চ সৌধ আজ সর্ব্বোপরি তাহার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিয়াছে। মেট্রোপলিটান বীমা প্রতিষ্ঠান আজ সর্ব্ববিজয়ী।

আরও বিস্ময়, এত বড় প্রতিষ্ঠান এই বিশাল কর্ম্ম-প্রাসাদে আমার পদটিও বড় কম শ্লাঘনীয় নয়। কোন্ যুগে মাষ্টারী করিতে করিতে এজেন্সি নিয়াছিলাম—তখন ছিলাম যুবক মাত্র, আর আজ অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই পরিণত ত্রিসপ্ততিতম বৎসরে পদক্ষেপ করিলেও আমার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও উৎসাহের মধ্যেও আমার সেই দুইটি পদই অক্ষুণ্ণ আছে। এই যশোবর্দ্ধিত বিরাট প্রতিষ্ঠানের আমিই এজেন্সি ম্যানেজার, আর পঞ্চসহস্রাধিক কর্ম্মীসঙ্ঘের অজস্র শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া আমি এখানে সকলেরই **মাষ্টার মহাশয়**। এই দেবদুর্লভ সম্মান আমার ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহাই আমার জীবনে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। ঈশ্বর করুন আশৈশব বীমা-এজেন্ট আমার যেন দিগ্বিজয়ী ছাত্র-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটান বীমা কোম্পানীর ক্রমোন্নতি দেখিতে দেখিতেই চিরতরে চক্ষু নিমীলিত হয়।

গান

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

গানে গানে আমি ছড়াই যে হায়—
মনের কামনাগুলি,
ব্যথার আঘাতে গিয়েছে আমার
হিয়ার দুয়ার খুলি'।
নীরবে গোপনে আঘাত সহিয়া—
কত নিশিদিন গিয়াছে বহিয়া,
বেদনা তাহার সহিতে নারিয়া—
মন মোর উঠে দুলি'।
আমার জীবনে এসেছিলে তুমি
শাওন-ধারার মত,
কেন তবে হায় এঁকে গেলে বুকে
হেন বেদনার ক্ষত ?
ভুলে যাবে যদি হে প্রিয় আমার,
মনে রেখো শুধু স্মৃতিটুকু তার—
বিদায় বেলার মিনতি আমার
যেও নাক কভু ভুলি'।

শরৎ

সন্তোষকুমার অধিকারী

শ্রাবণ বুঝি ফুরালো, দিনসজল হ'লো সোনা,
আকাশে মেঘ হারিয়ে গেলো ; গোধূলিমায় বোনা
আশ্বিনেরি স্বপ্ন নিয়ে নামলে অবিরত
সূর্য্য হ'য়ে হাসতে রাঙা সবুজে আর যত
দিগ্‌ভুলানো ধানের শীষে ? শ্রাবণ অশ্রুজলে
আবার নাকি ছন্দ দিয়ে ভালোবাসার বলে
গাঁথবে হাসির মুক্তো ক'রে, জীবন দিয়ে প্রাণে
নতুন ক'রে আঁকবে আকাশ-আলোর গানে গানে ?

হায়, অনন্ত আশার বাসা, হায়রে ভোলা মন,
আবার নাকি মৃত্যু থেকে আসবে সে জীবন !
পৃথিবী তাই ফুলে ফলে শিশির দিয়ে গোণে
প্রাণের আকুল পদধ্বনি ; স্বপ্ন দিয়ে বোনে
অসীম হ'য়ে নতুন হ'য়ে বাঁচার মধু আশা ;
হৃদয়ে লাল রক্ত দিয়ে আঁকলো ভালোবাসা
আবার ধরা।—হায়রে, মিছে মধুর আশা, হায়
জলের দাগে জীবন গড়ো, কেবল মুছে যায়।

শিব-শঙ্কর

শ্রীমমতা ঘোষ

সাগর মথনে যে বিষ উঠিয়া জুড়েছিল চরাচর
কে করিল ত্রাণ, বাঁচালো কে প্রাণ, কে সে মহা
বিষহর
অমৃত সকলে করে অভিলাষ—গরলে সবার ভয়;
সকলি সমান দেখে একজন,—মানে না সে লাভ ক্ষয়
সে যে শঙ্কর, ভূষণ তাহার ভস্ম ও হাড়মালা,
শিরে জাহ্নবী, ভালে শশাঙ্ক, কণ্ঠে বিষের জ্বালা।

দেখেছি তাহারে দক্ষযজ্ঞে ভয়াল রুদ্র বেশে,
উৎসব সভা দিল প্রাণাহুতি রোষানলে নিঃশেষে।
যজ্ঞ নাশিয়া দেখেন সতীর গতপ্রাণ হেম দেহ,
অনল নিভিল, অন্তর জুড়ে উদ্বেল হ'ল স্নেহ।
শোকে উন্মাদ শব লয়ে ফেরে দিবারাতি অনুখন,
শঙ্কর হ'তে প্রেমের মহিমা জানিয়াছে ত্রিভুবন।

নয়ন-আগুন দগ্ধ করেছে মোহন পঞ্চশরে,
মরেছে মদন বাণ আপনার তবুও যে কাজ করে।
গৌরীর পাণি গ্রহণ করেছে ধরিয়া বরের বেশ,
পুরাণো সতীরে নবীন রূপেতে দেখে আঁখি অনিমেষ।
হারাই হারাই ভয়ে ভয়ে তাই অভিন্ন হ'ল দেহ—
ত্রিলোকে অতুল শঙ্কর দেব—অতুল শিবের স্নেহ।

তটভূমি

শিল্পী—উমা রায়চৌধুরী

মায়ামুগ্ধ গ্রামখানি
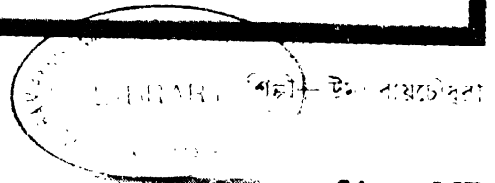
শিল্পী—বিমল রায়

মেঘস্বপ্ন　　　　　শিল্পী—বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কলঙ্কিত সম্পর্ক

শ্রীজগদীশ গুপ্ত
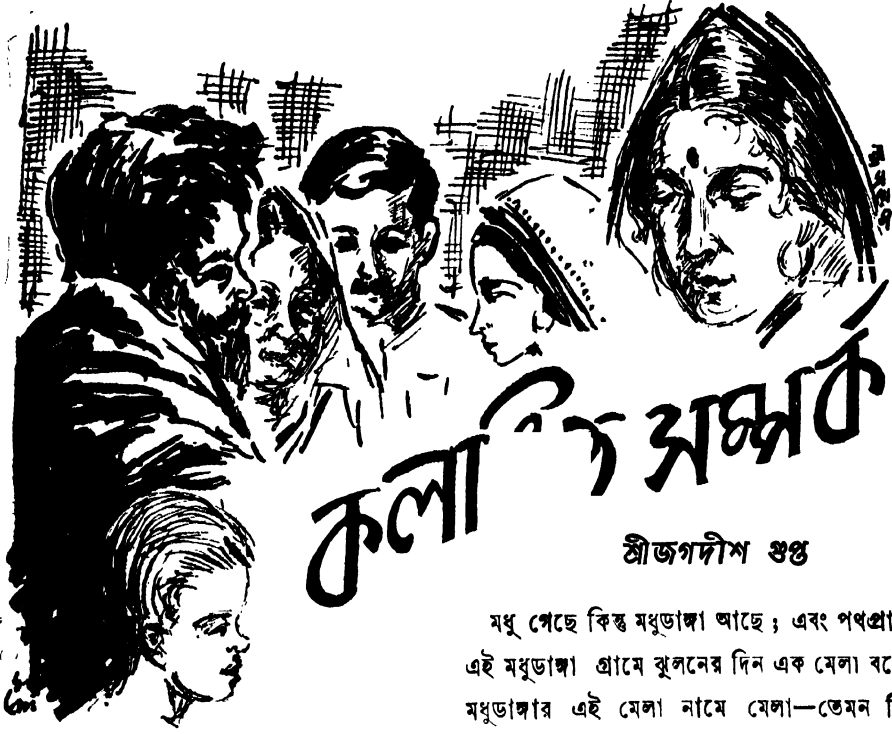
প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ী ফিরিবে।

সাতকড়ি এতদিন কোথায় ছিল তাহার হিসাব দিতে হইলে মধুডাঙ্গার সেই ঘটনাটা বিবৃত করিতে হয়।

কোন যুগে কার আমলে কি কোন্ রাজার রাজত্বের সময় মধুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত এদিককার কেহ মনে করে নাই। মধু হিন্দু ছিল কি মুসলমান ছিল, উগ্রক্ষত্রিয় ছিল কি সদ্গোপ ছিল তাহাও কেহ জানে না—জানে কেবল ইহাই যে, বহুদিন পূর্ব্বে মধু নামে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু এই স্থানে বাস করিত। স্থানের নাম আগে ছিল পীতাম্বরপুর—তারপর মধুর নামে নাম প্রচলিত হইয়া এখন এই পীতাম্বরপুরকে সবাই বলে মধুডাঙ্গা।

দিগন্তবিস্তৃত তৃণবৃক্ষহীন দুস্তর এই ডাঙ্গার কোথায় নাকি মধুর দুর্গ ছিল ভুগর্ভে—সরকারী কোনো গুপ্তচর সেই দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর মধুকে কোনোদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

মধু গেছে কিন্তু মধুডাঙ্গা আছে; এবং পথপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র এই মধুডাঙ্গা গ্রামে ঝুলনের দিন এক মেলা বসে। কিন্তু মধুডাঙ্গার এই মেলা নামে মেলা—তেমন কিছু নয়। মাত্র দশবারোখানা দোকান বসে; বাল্‌তি কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, হরেক রকমের খেল্‌না, আরশি-বসানো টিনের কৌটা, কাঠের চিরুণী, কাঠের মালা, ফিতে, ঘুন্‌সি, সূচ, সুতা, পাঁপর ভাজা, ঘুগ্‌নি, পান, সিগারেট আর নানান আকারের নানান স্বাদের নানান রঙের, আর নানান গন্ধের বিবিধ মিষ্টান্ন—বালক বালিকার আর গৃহস্থের লোভনীয় এবং ক্রেয় যা তাহাই কেহ গরুর গাড়িতে, কেহ নিজের মাথায় কি পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে, আর, চট টানাইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু সমারোহটা ভিতরেই বেশী।

রাধামাধব বিগ্রহের প্রশস্ত আর উচ্চশির মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির, তার এদিকে চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধু বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই বড় বড় আলো জ্বালাইয়া কীর্ত্তন শুরু হইয়া গেল। অসংখ্য লোক কীর্ত্তনানন্দ আর কীর্ত্তন-রস গ্রহণ করিতে বসিয়া গেছে—দেড়মাসের শিশুটিকে লইয়া এক জননীও আসিয়াছেন—শতাধিক বর্ষ বয়স্ক এক

অন্ধ বৃদ্ধকে আনিয়া বাড়ীর লোকে একেবারে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেছে। সক্ষম লোকের ত' কথাই নাই।

কীর্ত্তনের আসরে অনেক লোক থাকিলেও সেখানেই সবাই নাই। বাহিরে গাছের তলায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণবীগণ-সহ বাবাজী বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কোনো কাজ নাই, গল্প চলিতেছে কেবল। ওদিকে কেউ ইট পাতিয়া আগুন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে—রাধামাধবের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ তার হয় নাই, যেমন হইয়াছে বৈষ্ণবীগণসহ ঐ বাবাজীর। ধোঁয়ায় ধূলায় স্থানটা বড় অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আরো যারা বাইরে আছে তারা সবাই যেন ক্লান্ত—যে বেড়াইতেছে সে গা দুলাইয়া বেড়াইতেছে; যে বসিয়া আছে সে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া আছে; যে শুইয়া আছে সে পিঠ দুমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শুইয়া আছে; একটি ভিখারিণী বসিয়া বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তার ছেলেটির দিকে তাকাইয়া আছে—ছেলেটি ধূলা লইয়া মুখে পুরিতেছে···

দোকানগুলি খোলাই আছে। বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে একটি মনিহারী দোকানের সম্মুখে বসিয়া কাহার জন্য যেন ঘুনসি বাছাই করিতেছিল, দু'গাছা বাছিয়া লইয়া আর দাম দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে—

মেয়েটি সরিয়া গেল।

মেয়েটির অপরিচিত ঐ লোকটিই সাতকড়ি, প্রাণপ্রিয় দুইটি বন্ধুসহ সে মধুডাঙ্গার মেলায় আসিয়াছে, ফুর্ত্তি করিতে।

কি রকম ফুর্ত্তি সে এতক্ষণ করিয়াছে, এবং কি রকম ফুর্ত্তি সে রাতভোর করিত তাহা কেহই জানে না, সে-ও জানে না; কিন্তু যে চরম ফুর্ত্তিতে যে প্রচণ্ড বাধা পড়িয়া গেল তাহা সবাই জানে। ফুর্ত্তি চরমে তুলিতে যাইয়াই মধুডাঙ্গার মেলা হইতে তাহাকে সবান্ধবে যাইতে হইল গিরিধরপুরের থানায়—ফুর্ত্তি করা শেষ হইল না, গুরুতর একটা অপরাধের দরুণ আদালতের বিচারে তার কারাদণ্ড হইল। সেই কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অর্থাৎ ফুর্ত্তির শখ নিংড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, সাতু কাল বাড়ী ফিরিবে। আজ মাসের কোন্ তারিখ তাহা এ-বাড়ীর কেহ জানে কেহ জানে না। কিন্তু এত লোকের কে একজন যেন নিঃশব্দে হিসাব রাখিতেছিল; হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিল,কা'ল সাতু বাড়ী আসিবে। কাল ৭ই।

চারিটি ভাইয়ের ভিতর সাতকড়ি দ্বিতীয়। ছোট দু'ভাই বিদেশে থাকে; তবু বাড়ীতে লোকের ভিড়, ভিড়ের ভিতর সাতকড়ির স্ত্রীও বর্ত্তমান।

সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গণিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু অন্যভাবে; স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরুদুরু বুকে ভয়ে ভয়ে গণিতেছিল—গণিতে গণিতে অবশ হইয়া একদিন সে গণিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—শুরুর সূত্রটা মনে ছিল, আর গণনার শেষ দিনটা বিভীষিকার মতো সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার বুক কাঁপাইয়া তাহাকে জর্জ্জর করিতেছিল; কিন্তু একটি একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—আর সে ভাবিতে চাহে নাই; মনে মনে চোখ বুজিয়া অন্ধ হইয়া সে সেই অগণ্য দিনের শেষ দিনটাকে প্রাণপণে অনন্ত অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছিল···

ভয়াবহ সেই দিনটা সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়াছে—মাখন চমকিয়া উঠিল। মাঝখানে ছোট একটা রাত্রি; সূর্য্য ঐ অস্তে যায়; এই সূর্য্য কা'ল আবার উঠিবে; তখন স্বামী আসিবেন—

মাখনের জীবন্মৃত শুষ্ক প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সূর্য্যের উদয়াস্তব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এত সংক্ষিপ্ত তার কোনোদিন মনে হয় নাই; সাতকড়ি যেদিন যায় সেদিনের তখন কেবল প্রভাত; আজ এই সন্ধ্যা—

মাখনের মনে হইতে লাগিল, মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে; নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই; বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্ব্বহ হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে দেড় বৎসর কাটিয়া গেল!

বাড়ীতে আরো লোক আছে—সবাই সাতুর আপন; কেউ ভাই, কেউ ভাজ, কেউ মা, কেউ আর কিছু। কিন্তু এতগুলি পরমাত্মীয় থাকিতেও মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন

সকলের চেয়ে বেশী—সে ই বেশি করিয়া জড়ানো। সে স্ত্রী; বাহির হইতে আসিয়া স্বামীর কোন ক্ষেত্রটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে কেহ কখনো বোধ হয় মন খুলিয়া বসে নাই; তবু একটা স্থানে তার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোকে যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে; একটি স্থানে সে সর্ব্বস্ব, সর্ব্বগ্রাসী সতত জাগ্রত; সে তাহার দাবী পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অণুপরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ, আর, দাবি লঙ্ঘন সহ্য না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভুজার মতো দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মতো যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সে ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই; সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তার মুখ হেঁট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ী কতবার আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই—সৌষ্ঠব শ্রীসৌন্দর্য্য সম্মান একমাত্র তারই হাতে। সবারই সেই মত; বাড়ীর বাহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান। মাকে ডিঙাইয়া, একটি অগ্রজ, দুইটি অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্ব্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই; কেহ ইতস্ততঃ সন্দেহ করে নাই; শাশুড়ী যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন; তার অস্তিত্বই যেন একটা অপরাজেয় অপরিহার্য্য শাসনবাণী—তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু আজ সে পরাস্ত—শাসনদণ্ড ধুলায় লুটাইতেছে; সে আজ এত তুচ্ছ অকর্ম্মণ্য গুরুত্বহীন যে, তার থাকা না-থাকার একই মূল্য। দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সে ত' সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না! তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র; স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সংযোগ তার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের আবহমণ্ডলে ফুটিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই ঐ।

ঐ পরিচয়ই চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইয়া গেল—পৃথিবী তার পথ ছাড়িয়া উল্‌টাইয়া পড়িল; যেখানে যে বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়াই সে সুখে ছিল, স্বাভাবিক ছিল, একটি বার চোখের পলক না পড়িতেই তারা মিলিয়া মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া গেল…

স্বামী জেলে গেলেন—

যে-কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড আঘাতে সে এলাইয়া পড়িল; যে আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কম্পন দিয়া সাজানো ছিল, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল; ভাবনার দলগুচ্ছ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্ম্মিত যে নীড় অনন্য ছিল তাহার চিহ্নও রহিল না; মন্দিরের নিত্য অর্চ্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেল, ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিল; যে-পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে-পথে সুধা ঝরিত, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক রহিল না…

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে যতদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে কুটিরে পথে পাথারে, পৃথিবী যেখানে সত্যসত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হইয়া গেছে—জীবজগৎ শিহরিয়া কানে আঙুল দিয়া বসিয়া আছে…

এই দুর্ব্বিসহ লজ্জা অখণ্ড গুরুভার আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুক জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিল—"আমিও তোমার সঙ্গে আছি" বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেউ আসিল না!

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তার চিন্তাই সহ্য হয় না; মানুষ কোনোদিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই; ভগবানের নাম যার

বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, এ-জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই।

স্বামী এমনি অচিন্তনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন; মুক্তি পাইয়া কা'ল ফিরিয়া আসিবেন। কা'ল ৭ই।

গৃহের আর সবাই উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্য্যন্ত; বিমর্ষে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই শ্রান্তির মাঝেই যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি হইয়াছে; তাহাদের মনে নাই, কি কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই।

কিন্তু কোনোদিন একেবারে না থাকিলেই যেন ভাল হইত।

রাত্রি তখন গভীর———

মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিল···

এতবড়ো আকাশের যেখানে যে জ্যোতিঃ-বিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে; থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে; তার শ্বাস বহিতেছে না—

মাখনের ভয় করিতে লাগিল···

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাহারা তাহাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে; তাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই—কেবল চক্ষু দু'টি দপদপ করিতেছে···

তাদের নির্ম্মম অবিশ্রান্ত দণ্ডপ্রহারে আবর্ত্তকেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে—আগে ধোঁয়া, তারপর ফেনমুখী হলাহল উদ্গিরিত হইতেছে···সেই জ্বালাময় হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল; কালোর মাঝেই কালো মূর্ত্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ তেমনি দৃঢ় তেমনি মন্থর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। কতদূর হইতে কালোর অবগুণ্ঠন ঠেলিয়া ঠেলিয়া মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছে—তার গতির বিরাম নাই; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই —পথের শেষ নাই···

কবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তার হাতে দিবে!

বড় জা গোলাপ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়াছিল—

সে উঠানে নামিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল; এবং সেই চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিল, মাখন মূর্চ্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ী ছুটিয়া যাইয়া বধুর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

আজ এখনই ছেলে আসিবে যে! আজ ৭ই।

গোলাপ দু'মিনিটে তিন বাল্‌তি জল তুলিয়া ফেলিল; নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, কাকীমা? কাকীমা?

সাতকড়ির দাদা সতীশ দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়াই ফিরিয়া গেল।

গোলাপ নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল; বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন; এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিল না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে, সে দৃশ্যটি সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল!

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, কেমন আছ?

কিন্তু মাখনের মন ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন—শব্দ গঠিত করিয়া উত্তর দিতে তার দেরী হইল।

বিরাজ আবারও ঐ প্রশ্নই করিলেন; কিন্তু মাখন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সতীশ নামিয়া আসিল—

বিরাজ বলিলেন,—কোথায় যাচ্ছিস?

—সাতুকে আন্‌তে যাচ্ছি, মা···

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—বউমা উঠোনে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন কি করে?

—তা'ই ত' ওকে শুনোচ্ছি। তুই ভাবিস্‌নে, ভালই আছে।

অর্থাৎ সাতকড়িকে আনিতে যাইবার পক্ষে বউমায়ের জন্য উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

—যাই' বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেল।

পল্লীপথে— [শিল্পী—অজয় চট্টোপাধ্যায়

ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর ছিল কিনা কে জানে; কিন্তু একা একা, যেন অনিমন্ত্রিতের মতো, গৃহে প্রবেশ করিতে সে সংকোচ বোধ করিতে পারে—তাহারই নিবারণকল্পে বিরাজ এবং তার বড়ো ছেলে সতীশ পরামর্শ পূর্ব্বক সহজভাবে একটু চেষ্টা করিলেন—সতীশ আগুয়ান্ হইয়া তাহাকে আনিতে গেল।

বিরাজ ও বড়বউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন—

—অসুখ করেছে?

মাখন নির্জ্জীবের মতো বসিয়াছিল; বলিল, না।

—তবে? ভয় পেয়েছিলে।

—না।

—তবে?

মাখন বলিল—রাত্তিরে ঘুম হ'ল না; বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন কেমন করে' অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেছি জানিনে।—বলিয়া মাখন উঠিল।

নিতু তখন মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিল।

অনেক বেলায় সতীশ ফিরিল, কিন্তু একা।

ছোট বউকে সুস্থভাবে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সেদিকে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুত্রের আগমন প্রতিক্ষায় সদর দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—সাতু কই?

সতীশ ধীরে ধীরে তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—সে এল না।

—এল না? কোথায় গেল?

এতদিন দর্শন ও প্রাপ্তি আসন্ন হয় নাই—অনিবার্য্য বিলম্ব সহিতেছিল; কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্ত্তে নিকট-তর হইতে হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল! বিরাজের বুক ফাট্‌ফাট্‌ করিতে লাগিল…

সতীশ বলিল,—চলো ভেতরে, বল্‌ছি।

ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাকে আন্‌তে পারলিনে কেন? কোথায় গেল সে?

—কি জানি কোথায় গেল! জেলের বাইরে এসে সে বল্‌ল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে' সে কি কাজে গেল জানিনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার—

সাতুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তার কি দুরবস্থা ঘটিল তাহা সতীশ বলিল না; বোধ হয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিয়াই পাশ কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন, সে হয়তো তখুনি এসে তোকে না দেখ্‌তে পেয়ে অন্যদিকে চ'লে গেছে!

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সতীশের নিকট হইতে কোনো জবাব আসিল না।

বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিল সে-জল নিজেও থামিল না, তিনিও চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিঃশ্বাসও বহিতে লাগিল…

কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল এই বেদনাটাই যে, যে-পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র! এই চোখের জল সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা—জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।

বিরাজের একবার চোখ মুছিবার সময় মাখন বলিল, —পথ চেয়ে আছ বৃথাই মা। দিনের আলোয় মানুষের সাম্‌নে দিয়ে আসার উপায় তাঁর নেই। তিনি আসবেন সন্ধ্যার পর।

শুনিয়া বিরাজের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তিনিও বধূর ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীক্ষ্ণতর চক্ষে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, বউমা, তোমার মান অভিমান আর রাগের ভঙ্গী আমার ভাল লাগছে না। তোমার মুখ দিয়ে বিষ পড়ছে। অমন বিষমুখ করে থেকো না তুমি, মুখ অমন বিষ করে ছেলের সামনে যেতে তুমি পাবে না শুনে রাখো। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। আমরা তোমার গুরুজন। আমাদের সামনে—

কিন্তু মাখন হঠাৎ পিছন ফিরিল, দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন —শেষ কথাটাই অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সতেজে বলিয়া দিলেন,—যাও, কিন্তু সাবধান

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি মা?

—যাই, বলছি গিয়ে।—বলিয়া বিরাজ ছোট বউয়ের আচরণ অর্থাৎ তার দুঃখের আর ক্ষোভের কথা, বড় ছেলের কানে ঢালিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু সুখ কি দুঃখ কিছুই পাইলেন না। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল, বলিল,—বড় বউকে বলো সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন। বলিয়া সে মুখ নামাইল।

মায়ের নিঃশব্দ চোখের জল আর সবার মুখের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু গম্য-অগম্য ইতর ভদ্র কোনস্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিল না—কোথায় গেলে সাক্ষাৎ মিলিবে সে সন্ধানও মিলিল না।

এই সংবাদ বিরাজ পাইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং খানিক শুইয়াই রহিলেন, তারপর তিনি মুহুর্মুহুঃ ঘর বাহির করিতে লাগিলেন, মাখনের রকম দেখিয়া উৎকণ্ঠার উপর তাঁর ক্রোধ জন্মিতে এবং জমিতে লাগিল—তথাপি তাঁর মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল। তাঁর মুখে আজ ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাখনের কথাই।

সন্ধ্যার পর বার-দুয়ারের চৌকাঠে ঠাকুরমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?

বিরাজ বসিয়া যেন বিষের ঘোরে ঝিমাইতেছিলেন বলিলেন, তা জানিনে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

নিতু বলিতে লাগিল,—কাকা অনেকদিন বাড়ীতে আসেনি, নয় ঠাকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিল এতদিন? আমার জন্যে কি আনবে?

পরম স্নেহাস্পদ বালক পৌত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠাকুরমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বালকের এমনিধারা শতেক প্রশ্নে যে মিনতি আর যে আগ্রহ দেখা দেয়, বিরাজের প্রাণের আনন্দপ্রবণ অন্তঃস্রোত তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাঁর অজ্ঞাতেই মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল মাত্র, কিন্তু মনে পড়িল না যে সবই বিষদৃশ। নিতু চুপ করিবার পর বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গেল, বিরাজ আনমনা হইয়া রহিলেন—

বিরাজ আনমনাই ছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি লোক তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না—"সাতু"? বলিয়া তিনি প্রকৃত সজীব ব্যক্তির মতো লাফাইয়া উঠিলেন; সাতু গায়ে-মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই হৈ চৈ বাঁধিয়া গেল; নিতু চীৎকার করিয়া সংবাদ রাষ্ট্র করিতে লাগিল, বাবা, কাকা এসেছে, মা কাকা এসেছে, কাকীমা কাকা এসেছে। বলিতে বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল···

"আয়"। বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন পিছন সাতু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিল তার স্ত্রী ব্যতীত আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন। দাদাকে সে প্রণাম করিল, বউ-দিকেও প্রণাম করিল, দাদার ছোট ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই—"এটা আবার কবে হল?" জিজ্ঞাসা করিয়া সাতু ডান্‌হাতের দুটি আঙুলে তাহার গণ্ড স্পর্শ করিল।

দাদার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। "আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি?" বিস্মিত এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঠিয়াছিল; কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বোধ হয় চক্ষুলজ্জার বশেই সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল; মাকে সন্তুষ্ট করিতেও সে কোনো সম্ভাষণই মুখে ফুটাইতে পারিল না।

বউদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল আছ?

সাতু বলিল,—তোমাদের আশীর্ব্বাদে।—বলিয়া হাসিল। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তার হেঁসেল ছিল—মুৎফরক্কা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেল।

বিরাজ ছেলেকে অবলোকন করিতেছিলেন; তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, হেসেলও নাই; ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বড় রোগা হয়ে গেছিস। ভেতরে অসুখ নেই ত?

সাতু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; হাসিয়া বলিল,—না। কিন্তু বড় কষ্ট দিয়েছে, মা!

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল—বলিলেন,—আজ সারাদিন খেয়েছিস্?

সাতু তাদের আড্ডায় আজ যা খাইয়াছে সে জিনিস এ-বাড়ীতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিল; বলিল, কিছুই খাইনি, মা!

—কিছুই খাস্‌নি? আ হা হা হা···আর্ত্তনাদ করিয়া বিরাজ হাঁকিলেন,—ছোট বউমা, রান্না হ'ল?—বলিয়া উত্তরের জন্য একমুহূর্ত্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন—এবং রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ছোটবউ ব্যাধিকাতর দুর্ব্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এককোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাসিয়া বসিয়া আছে...

খুবই লক্ষ্য করা—এ ব্যাপারটা মুলতবী রাখিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন,—বড়বউমা, রান্না হ'ল? সাতু সারাদিন কিছু খায়নি

"এই হ'ল মা"—বলিয়া বড়বউ হাঁড়ি আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবেলায় রান্নাঘরের আমিষ মাটি ভুলেও মাড়ায় না; কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল; মুলতবী ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে তিনি আমিষ মাটির উপর দিয়াই ছোট বউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন করে বসে আছ যে?

ইত্যবসরে তাঁর বিরহী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরহিনী বউয়ের উচিত ছিল বলিয়া বিরাজের মনে হইল।

মাখন কথা কহিল না; তার মাথা মাটির দিকে আরো ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভাল নেই, বউমা। এমন সময়ে তুমি আমায় জ্বালিও না বলছি। ওঠো।

মাখন মুখ তুলিল না; বলিল,—উঠে কি করব?

—করবে আবার কি? নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সাম্‌নে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না।—বলিয়া মহা রাগতভাবে মাথার মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন।

সাতু ইত্যবসরে তার দেড় বৎসরের পরিত্যক্ত গড়-গড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে। কেবল তার প্রিয় তরকারীগুলি প্রস্তুত করিতে বধূদ্বয়কে হুকুম করিয়াই বিরাজ কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাতুর শ্রান্তিহারী এবং সুখজনক শৌখিন তামাক আর টিকেও আনাইয়া চাকরটাকে, কি কারণে কে জানে, সে দিনের মতো ছুটি অর্থাৎ বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সাতু চট্‌পট্ তামাক সাজিয়া লইয়া টানিতে বসিল। নিতু তার ছড়ানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ছিলে কাকা এতদিন?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তার উত্তরের আশা মিটিল না; ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—তোর সে কথায় বারবারই কাজ কি রে লক্ষ্মীছাড়া? পালা এখান থেকে।—বলিয়া নিতুর সোহাগ সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে তিনি দাঁড় করাইয়া দিলেন।

সাতু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে, এবং ভর্ৎসনা দিয়া মায়ের এই আবৃত করিবার চেষ্টায়, তার মনে ঘৃণাক্ষরেও একটু বিকারও উপস্থিত হইল না; বলিল—আহা, বসুক না! বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইল বসাইল; কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহের খবর, শুনাইতে লাগিলেন; সাতু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল।

আহারের ঠাঁই হইল দু' ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সংসারে বেশি, এবং প্রবল। দাদা সতীশের সঙ্গে, এবং মায়ের সঙ্গেও, সাতু আহারে বসিয়া যথেষ্ট লিপ্ততার সঙ্গে সে আলোচনা করিল এবং অকুণ্ঠিত ভাবে আর দীর্ঘ ভাষায় স্বীকার করিল যে, ঋণ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ সে-ই।

সতীশ ভাতের থালার দিকে এবং বিরাজ সাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া ঋণ সম্বন্ধে তার বক্তব্য শুনিলেন—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

ভোজনে সাতু বুক-তুল্য—

কিন্তু আজ তাহাকে অল্পেই তৃপ্ত হইতে দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন; বলিলেন—কই, খেলিনে যে তেমন?

—পেটের খোল চুপ্‌সে গেছে, মা, না খেয়ে খেয়ে। ভেবোনা, ক্রমশঃ আবার বড় হবে। বলিয়া সাতু মাতৃহৃদকে অভয় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আনন্দের মাঝেই আহার সমাধা হইল। সাতু তামাক সাজিয়া লইয়া শয়ন কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিল।

মাখন ভাতের থালা সামনে লইয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল।

গোলাপ কাতরস্বরে বলিল,—খা…

দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই মাখন হাত টানিয়া লইল। গোলাপ সে দিকে একবার বিষন্ন চক্ষে চাহিয়া দেখিল—আর বলিল না কিছুই।···

বহু যোজন দূরে ঝড় উঠিলে নাকি সমুদ্রের নির্ব্বাত তটেও তার ঢেউ আসিয়া লাগে। মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই; মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাসবায়ু চালিত হইয়া তার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিল, ভাই, আমার মাথা খা'স···

মাখন বলিল,—দিদি, আমায় বিষ দাও।

বড়বউ ছলছল চক্ষে বাম হস্তে তার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

"ছোট বৌমার খাওয়া হ'ল?"—জানিতে চাহিয়া বিরাজ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন—অকারণেই তাঁর মনে হইতেছিল, ছোটবউ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করিতেছে।

বড়বউ বলিল—হয়েছে।

ছোট বউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিলেন,—তবে বসে' আছ কেন? হেঁসেল বড় বউমা সারবে'খন, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে।—বলিতে বলিতে তাঁর নজরে পড়িয়া গেল সাতুর খাওয়া থালাখানা। থালাখানা তাঁর সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোটবউ ভাত লয় নাই; দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা তিনি মোটেই তুলিলেন না; কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কথা বলছ না যে?

কি কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু ধিক্কার যেন ছিল—তাহাকে নির্ব্বিষ করিতেই তিনি তাঁর ক্ষমার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া মরিতেছেন; বধূর মুখের কথায় যদি তা'ই একটু পান্; কিন্তু মুশকিল এই যে, এই কথা লইয়া গলা চড়াইবার উপায় নাই।

আরো মুহূর্ত্ত দুই অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের ঝাঁজ যেন গলিয়া গলিয়া মুখে দিয়া বাহির হইতে লাগিল: "কথা কইছ না যে তবু? কার হাতে তুমি পড়েছ তা' জানো? আমার হাতে। আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।"

বলিবার কিছু ছিল না বলিয়াই মাখন তথাপি কিছু বলিল না। বড়বউ মধ্যস্থ হইয়া আসিল; বলিল,—তুমি যাও, মা। আমি ওকে দিয়ে আস্‌ছি।

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিল না। পাথরে আঘাত কে কত করিতে পারে! মনে মনে ছোট বউয়ের মাথা চিবাইতে চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড়বউ যাইয়া মাখনের হাত ধরিল।

বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সাতকড়ি মধুডাঙ্গার মেলার ঘটনাই চিন্তা করিতেছিল—সেখানকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আর দুর্বিপাকের বহর ভাবিতেছিল, দৈব নিতান্তই বিমুখ; নতুবা ধরা পড়িবার ত' কোনোই সম্ভাবনা ছিল না! সঙ্গীরা পাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনোদিকেই ত্রুটী হয় নাই—মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পায় পায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল—ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

দোকানপাট বন্ধ হইয়া মেলার স্থানটা ক্রমে নিদ্রিত নির্জ্জন হইয়া গেল। কীর্ত্তন তখন দুলে চলিতেছে, জমিয়াছে বেশ; কীর্ত্তনওয়ালা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছে—তবু তার বসিবার নামটি নাই; খোলবাদকগণ যেন নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে···

নাটমন্দিরের ভিড়ের বাহিরে একটা টিনের চালার কাঠের খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মেয়েটি ঢুলিতেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হরিধ্বনিতে চম্‌কিয়া সজাগ হইয়া সে বোধ করি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের আওতায় বাতাস ভাল বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে ধীরে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল···

তারপর যা ঘটিল, তা' চক্ষের পলকে—মেয়েটীর মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীরবেগে চলিতে লাগিল।

অদূরে বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো অকেজো ছোট বড় গাছে আর ঝোপ জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। কিন্তু বিধাতা এমনি অপ্রসন্ন যে, গভীর রাত্রে বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন দর্শককে পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-ই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল

তারপর মামলা; অত্যন্ত তোড়জোড়; অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়, কত কি বিশৃঙ্খলা, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট···

তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস; দেহের শক্তি যেন নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিদারুণ দাসত্ব সহ্য করিতে হইয়াছে।

দুঃসহ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতুর কিন্তু নিঃশ্বাস পড়িল না—মেয়েটির মুখখানা তার মনে পড়িল—নয়নাভিরাম; কালোর উপর উল্‌কির ফোঁটা; স্বাস্থ্য অতি সুন্দর; চক্ষু দু'টি আয়ত; সিন্দুর শঙ্খ নাই; অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই; নিতান্তই গেঁয়ো হাবা—দেখিলেই তা' বোঝা যায়। মেলায় একা আসিয়াছিল, না, সঙ্গীসাথী কেহ ছিল কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন তার দশা, তাই বা কে জানে!

সাতু উহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মাখন আসিয়াছে—সে আরো দেখিল যে সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর···

বলিল,—এতক্ষণে দেখা দিলে! এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষমানা কি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটির মতো সরাসরি শয্যায় না যাইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইয়া দাঁড়াইল—তার সোহাগপূর্ণ সাদর আহ্বান সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে মাঝে তা স্ফুটিত; তার উপর, কোথায় ভয়াবহ দণ্ডপাণি একজন শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্য একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা' অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিবার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেম্‌নি কঠিন। সুখের হোক্, দুঃখের হোক্, তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও, এবং ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্ত্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল; অভিমানবোধ ছিল, আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এতবড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না—সে বুঝিল না যে, দু'জনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের, অনভ্যস্ত আত্মা যেন এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিয়াছে—পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্চ্ছিতার বিহ্বল দৃষ্টি—নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ···

সাতু হাসিতে লাগিল, বলিল,—বড়ই অভিমান যে! ডাকছি, তা আসা হচ্ছে না! ঢং দেখলাম বিস্তর। নেও হয়েছে, এস এখন, না, আমাকেই উঠতে হবে!

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোক গিলিল—তার বুক ধড়ফড় করিয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে···

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ।—বলিয়া বিরক্তি আর শ্লেষ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল।

মাখন কেবল সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল—কোথায় সে যাইতে চায় সে জ্ঞান তার নাই, যাইবার স্থান নাই। তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়া সে কেবলি সরিয়া সরিয়া দেয়ালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়াছে—তার স্থূল অবয়ব

কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তার পিঠের চামড়া কাটিয়া গেল।

সাতু অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—

তার স্পর্শটা আসিয়া মাখনের সর্ব্বশরীরে যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিদ্ধ হইতে লাগিল···

কিন্তু দেহ সংকোচনের অবকাশ আর নাই পর মুহূর্ত্তেই তার সঙ্কুচিত আড়ষ্ট সর্ব্বাবয়ব যেন রুদ্ধ বায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিল—সর্ব্বান্তঃকরণ বিদ্যুতের আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল···

সাতু তাহা দেখিল—এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই; কিন্তু সাতু তাহা গ্রাহ্য করিল না; তা' করিবার মতো মন তার হইলে সে জেলে যাইত না। বলিল,—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, একটা কথা আছে না? অমন করে চাইলে কি হবে! আমার—

বলিতে বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসাধারণ—তার উদ্দেশ্য যেন শুধু আত্মরক্ষা নয়, তার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতই দুর্জ্জয় হউক, আর, এখানে সেখানে সে যতই ভুল করুক, এবার সে ভুল করিল না, আর, ভয় পাইল; হটিয়া আসিয়া বলিল, মা'রবে নাকি?

মাখন বলিল,—আমায় ছুঁও না।

—যদি ছুঁই?

—ভাল হ'বে না।

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিল—

নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তার মনে হইল, তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে—আঁচলে তা' ঢাকা আছে।

সাতু ফিরিল; প্রাণভয়ে পলাইবার মতো করিয়া ছুটিয়া যাইয়া দড়াম্ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল, মা?

বিরাজ অবশ্য তখন জাগিয়াই ছিলেন—একডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুলকণ্ঠ কানে বাজিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"কি রে? কি হ'ল রে?"—বলিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিল,—বউকে বে'র করে আনো; ও-ঘরে আমি যাব না। মারবে বল্‌ছে।

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন: "মারবে বল্‌ছে?"

—তা' পারে। ওর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে' দেখ—ছুরি ছোরা বোধ হয় ওর কাছে আছে।

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বড় কষ্টে দীর্ঘ দিন তাঁর কাটিয়াছে; উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া পড়িয়া অবিরাম ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়াছে, শ্রান্ত শক্তিহীন হইয়া গেছে, ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁর কিছুই ভাল লাগে নাই; তার উপর, এই বধূরই পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্তিতে আর বধূর অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাঁর রক্ত তখনো ফুটিতেছিল···

এখন ছুরি লইয়া সেই বধূ তাঁর পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচম্‌কা এই খবর পাইয়া তাঁর মাথার হাড় পর্য্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল—

"কই"? বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশে ধাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ—হিতাহিত ন্যায় অন্যায় বুঝিবার হুঁশ লোপ পাইয়া গেছে···

চোখে পড়িল, বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁর চোখে পড়িল না; ছোরা ছুরির ভয়ও তিনি করিলেন না; লাফাইয়া যাইয়া তার সম্মুখে পড়িলেন; ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন; এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান্ পার করিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন—

বলিলেন,—যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তারপর খিল আঁটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপরে সতীশের কানে গেল খিলের শব্দটা, জিজ্ঞাসা করিল,—সদর দরজা কে খুলেছে?

সাতু উত্তর করিল,—মা।—তারপর অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিল, বলিল,—জেলই আমার ছিল ভালো।

পলায়নী ক্ষণ-বৃত্তি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

তারকার এই দুঃখ, যে-আলো হারায়
সে কি ফের ফিরে আসে? সহস্র অযুত
আলোকবর্ষের উজ্জ্বলিত পরমায়ু—
ফেরারী সে চক্ষের পলকে দিগন্তরে।
আমারো তো দুঃখ এই। মুহূর্ত্তের ভীড়-
ক্ষণপুঞ্জ এ-জীবনে কোথায় দাঁড়ায়
কয়েকটি স্বর্ণরশ্মি—সুরভির তার!
হায় ভূমা! কোথা পাবো সৌখীন ভূমায়
অল্পে সুখ আমাদের; স্বল্প আয়, আয়ু।
মুষ্টিভিক্ষা লাভে চিত্ত তুষ্টিতে ঘুমায়।

পান্থবাসে পণ্য-সুখে শূণ্য ঝুলি ভরে'
অক্ষুণ্ণ মোদের মন। জীবন বেজুত।
ভূমার স্পর্শ কি ছিলো তোমার চুমায়?
সেই অল্পে—স্বতস্ফূর্ত্ত মুহূর্ত্তের ঝড়ে?
আমার ও তারকার একই দুঃখ, হায়!
আলোক, সে ফেরে বুঝি—সে নহে গতায়ু—
ফিরে আসে কোনোকালে। অযুত নিযুত
আলোকবর্ষের পারে। হয়ত আবার
ফিরবে মোদের চুমু। তখন কাবার
সে-তারার মত তুমি আর এই শ্রীযুত॥

প্রিয়া

শ্রীসরোজ নাথ সরকার

ছায়াহীন মরু:দেশে যদি বহে সুশীতল বারিধারা,
তার চেয়ে বেশী প্রিয়ার হাতের পরশ পাগল পারা।
পশ্চিম আর পূরব গগন উজ্জ্বল রবি-করে,
তার চেয়ে বেশী ঝলকে বিজলী প্রিয়ার নয়ন-শরে।
মৃত্যু-শীতল বায়ু যদি লভে আগুনের আশ্বাস,
প্রাণময়ী আরও প্রিয়ার কেশের সুগন্ধ কেশপাশ।
দক্ষিণ-মেরু তুষারের সাথে গ্রীষ্মের আলাপন
রভস-ব্যাকুল আনন প্রিয়ার করে মধু-গুঞ্জন।

হৃদয়ের তটে ওঠে পড়ে ঢেউ পূর্ণ তাহার বক্ষ দুই,
স্বরগের সুধা পান করি প্রিয়া
জীবন-সাগরে ডুবিয়া রই।
চাঁদের আননে নাই কো সে রূপ
প্রিয়ার মুখে যা আছে,
তাই তো বিকায় চিত্ত আমার
যা কিছু প্রিয়ার কাছে।

* Swinburne-এর অনুসরণে

বাণ ডেকেছে

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

আজ আকাশ গাঙে বাণ ডেকেছে
ভাসিয়ে মনের তরী,
কে যাবি ভাই আয়রে ত্বরা
আয়রে ভেসে পড়ি!
ভাসিয়ে সাদা মেঘের ভেলা
করছে কারা জল-খেলা,
তাদের দেখবি যদি আয়রে ছুটে
আয়রে ত্বরা করি।

আজ চাঁদের আলোর বাণ ডেকেছে
আকাশ-সাগরে,
মনের ভেলা ভাসাবি কে
আয় ত্বরা করে!
পাল্লা দিয়ে মেঘের সাথে,
ভাস্‌বো আকাশ-দরিয়াতে,
তুফাণ দেখে করবো না ভয়,
মরব যদি মরি॥

রবীন্দ্রকাব্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব

শ্রীউষা বিশ্বাস

বাংলা শিশু-সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই। তাঁর অপূর্ব্ব অবদান "শিশু"র কবিতাগুলিতে যে বিচিত্র শিশু-মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়েই কিছু আলোচনা করবো। সাধারণতঃ আমরা বয়স্কেরা শিশুদের অপরিণত মানব মনে ক'রেই মস্তো বড় ভুল করি। আমরা আমাদের নিজেদের মনের মাপকাঠিতেই বুঝতে চাই শিশুদের মন। তাই আমরা তাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া, কার্য্যকলাপ ও খেলা-ধূলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারি না। এগুলি আমাদের কাছে নিতান্তই অদ্ভুত ও অর্থহীন বলে মনে হয়। কবি তাঁর দরদী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন শিশুমনের প্রকৃত স্বরূপটি। তিনি খুঁজতে চেয়েছেন শিশুর মনোবিকাশের স্বাভাবিক ক্রম ও ধারাটিকে। তাই তিনি ব'লেছেন,—

"খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি' সে-নিভৃতে।"

কবি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই শিশুর মনকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছেন। তিনি শিশুর জগৎকে দেখতে চেয়েছেন শিশুর চোখ দিয়েই। তিনি চেয়েছেন—

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে-পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে -
সকল উদ্দেশ হারা
সকল ভুগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে ;—
যেথা আসে রাত্রি দিন
সর্ব্ব ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক-ধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কা'রা করে আসা-যাওয়া।"

তাই কবি যেন শিশুমনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছেন। কবির কল্পনা মিশে গিয়েছে শিশুর কল্পনার সঙ্গে। সে কল্পনা সকল সম্ভাব্যতার সীমা-রেখা ছাড়িয়ে এক "অপরূপ অসম্ভব" দেশে চলে গিয়েছে—যে দেশ "সকল ভুগোল-ছাড়া"—যেখানে আসে "রাত্রিদিন সর্ব্ব ইতিহাস-হীন রাজার রাজত্ব হ'তে হাওয়া"। শিশুর জগৎ ও কবির জগৎ যেন এক হ'য়ে গিয়েছে, "শিশু"র কবিতাগুলি পড়ে তাই মনে হয় কবি যেন শিশু-মনে ঢুকবার চাবিকাঠিটি সত্যিই খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নিজেই যেন একজন শিশু হ'য়ে গিয়েছেন। তাঁর মন যেন তাই শিশুর মনোরাজ্যেই বিচরণ করছে—যেখানে অসম্ভব বা অদ্ভুত কিছুই নেই। সেই জন্যেই কবি তাঁর অপরূপ ছন্দে ও ভাষায় রূপায়িত ক'রে তুলতে পেরেছেন শিশু-হৃদয়ের সকল আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ, বেদনা, দুঃখ ও নৈরাশ্যের বিচিত্র স্পন্দন। তাঁর লেখনী সোনার কাঠির স্পর্শে অপূর্ব্ব হ'য়ে ফুটে উঠেছে—শিশুর স্বপ্ন ও কল্পনা—তা'র বিচিত্র খেলা-ধুলা। শিশুর বিশ্ব তার ক্ষুদ্র খেলাঘরটির সীমানায় আবদ্ধ। তা'র মন খেলা ও কল্পনার মায়ায় বিভোর। সেই মায়া-রাজ্যে যুক্তি বিচারের

কোনও স্থান নেই। তাই শিশুর কাছে—বিশ্বের চরাচর—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র—কোনও নিয়মেই চলে না। শিশু থাকে "জগৎ মায়ের অন্তপুরে" যেখানে—

"সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী!
সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোস প'ড়ে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।"

আমরা বয়স্কেরা থাকি "জগৎ-পিতার বিদ্যালয়ে"—যেখানে সব কিছুই নিয়মের কঠিন নিগড়ে বাঁধা—যে জগতে—

"জ্যোতিষ শাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে
রসারসি।"

আমরা বয়স্কেরা সব কিছু যুক্তি বিচারের মাপ কাঠিতেই জানতে ও বুঝতে চাই। এখানেই শিশুর মনের সঙ্গে বয়স্ক মনের প্রভেদ। সন্ধ্যেবেলায় গাছের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদকে উঁকি মারতে দেখে সেই চাঁদকে দু'হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে ধরতে চাওয়াও তাই শিশুর পক্ষে বিচিত্র নয়। "জ্যোতিষ শাস্ত্র" শীর্ষক কবিতাটিতে এই ভাবটিই সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

"আমি শুধু বলেছিলাম—
কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধ্যেকালে,
তখন কি কেউ তা'রে
ধ'রে আনতে পারে?"
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে "আমার খোকা,
তোর মত আর দেখি নাই কো বোকা।
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন ক'রে ছুঁই?"

প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো শিশু সব কিছু যুক্তি বা সম্ভাব্যতার মানদণ্ডে বিচার করে না। তাই যে চাঁদকে সে নিজের চোখে গাছের ডালে আটকা পড়তে দেখেছে তাকে দূরের জিনিষ বলে ভাবতেই পারে না। দূরত্বের ধারণাও তার খুবই সীমাবদ্ধ।

"দাদা বলে, "পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ?"
আমি বলি, "কেন দাদা,
ঐ তো ছোট চাঁদ,
দু'টি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধ'রে।"
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায় "খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসতো
দেখতে কত বড়ো।" "

শিশুর জ্যোতিষ-তত্ত্ব জানা নেই। সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ছোট একটি চাঁদকে। সেটিকে কেন যে সে তা'র ছোট দু'টি হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রতে পারবে না তা' তার ধারণার অগম্য।

কবি তাঁর "জীবন স্মৃতি"তে এক জায়গায় বলেছেন—"ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায়, তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ।" বাস্তবিকই শিশুর চোখে নব বিস্ময়ের মোহাঞ্জন-দৃষ্টিতে তার গভীর রহস্যের ঘন কুহেলিকার আমেজ। অপরিচয়ের বাধা তার পদে পদে। তার কাছে জগৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে যা কিছু দেখে তাতেই তার মন অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ভরে ওঠে। তাই তার মনে স্বভাবতঃই বিস্ময় ও কৌতুহল জাগে, সে কোথা থেকে এসেছে—তা'র মা তা'কে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছেন? কত শিশুকে তা'র মাকে এই প্রশ্ন করতেও শোনা যায়। শিশুর কাছে তা'র নিজের জন্ম গভীর রহস্যে আবৃত। তাই তা'র মনে সেই সম্বন্ধে কৌতুহল জাগা খুবই স্বাভাবিক।

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

প্রশ্নটি শুনে যেন মনে হয় শিশুর মুখ থেকেই কথাগুলি শুনছি।

আমাদের বয়স্কদের সকলেরই নিজেদের শৈশবের কথা কিছু কিছু স্মরণ আছে। আমাদের অনেকেরই হয় তো মনে আছে ছোটোবেলায় আমরা কত তুচ্ছ সামান্য জিনিষ পেয়েই খুশী হতাম। বড়োদের কাছে যে সব জিনিষ অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, শিশুদের কাছে সেইগুলিই অনেক সময়ে হ'য়ে ওঠে অমূল্য সম্পদ। আমরা প্রাপ্তবয়স্কেরা নিজেদের মনের মাপকাঠিতেই সব জিনিষের মূল্য নিরূপণ করি প্রয়োজনের তুলাদণ্ডেই সব কিছু ওজন করে দেখতে চাই। তাই অনেক সময়ে শিশুদের অতি আদরের জিনিষগুলিকে আমরা অনাবশ্যক জঞ্জাল বলে মনে করি। কবি তাই বলেছেন—

"বাছা, রে মোর বাছা,
ধূলির পরে হরষ ভরে
লইয়া তৃণ গাছা—
আপন মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ ল'য়ে খেলা॥"

কত সামান্যতেই শিশুর সন্তোষ। কিন্তু আমরা বয়স্কেরা কি অল্পতেই সন্তুষ্ট হই? আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই। আমরা অনেক সময়েই সুখ-মরীচিকার পিছনে ছুটে বৃথা দুঃখ পাই। আমাদের দুঃখ নৈরাশ্য বেদনা অনেক সময়েই আমাদের নিজেদেরই মনগড়া। কবি তাই শিশুকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন—

"যা পাও চারিদিকে
তাহাই ধরি' তুলিছ গড়ি'
মনের সুখটিকে।"

আর আমরা বয়স্কেরা যা পাবার নয় তাই চেয়ে অসুখী হই। আমাদের চাওয়ারও যেন অন্ত নেই।

"না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরি আশায় ফিরি'
ভাসাই মোর ভেলা॥"

আমরা বয়স্কেরা শিশুদের মন বুঝি না—তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাদের মনোভাব বুঝতেও চেষ্টা করি না। তাই আমরা বুঝতে পারি না কেন অতি তুচ্ছ জিনিষও শিশুদের কাছে অতি অপরূপ হ'য়ে ওঠে। আমাদের তাচ্ছিল্যে বাস্তবিকই শিশুরা অনেক সময়ে মনে অত্যন্ত ব্যথা পায়—অভিমানে তাদের বুক ভরে ওঠে। "পাখীর পালক" কবিতাটিতে কবি এই ভাবটিই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন ব'লে মনে হয়। একটি সামান্য পাখীর পালক নিয়ে শিশু তার মাকে গভীর আগ্রহভাব দেখিয়ে বলে—

"ও-মা, দেখ্‌ দেখ্‌
কী এনেছি দেখ্‌ চেয়ে।"

শিশুর নবীন চোখে সাধারণ একটি পাখীর পালকই অতি অপূর্ব্ব, বিস্ময়কর বলে মনে হয়। গভীর আনন্দে তার মন ভ'রে ওঠে। শিশুর মা'ই তা'র সব চেয়ে আপনজন, তাই সে তার আনন্দের ভাগ তার মাকেও দিতে চায়। সে পাখীর পালকটি তা'র মাকে দেখাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে। তা'র মনে হয়—

"সোনালী রঙের পাখীর পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খ'সে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে,
নয়ন-ভুলালো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যেথা,
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা।"

কিন্তু শিশুর মা'র কাছে সেটি শুধু একটি তুচ্ছ পাখীর পালক মাত্র। তিনি তার মধ্যে কোন বৈচিত্র্যই দেখতে পান না।

"মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
কী বা জিনিষের ছিরি
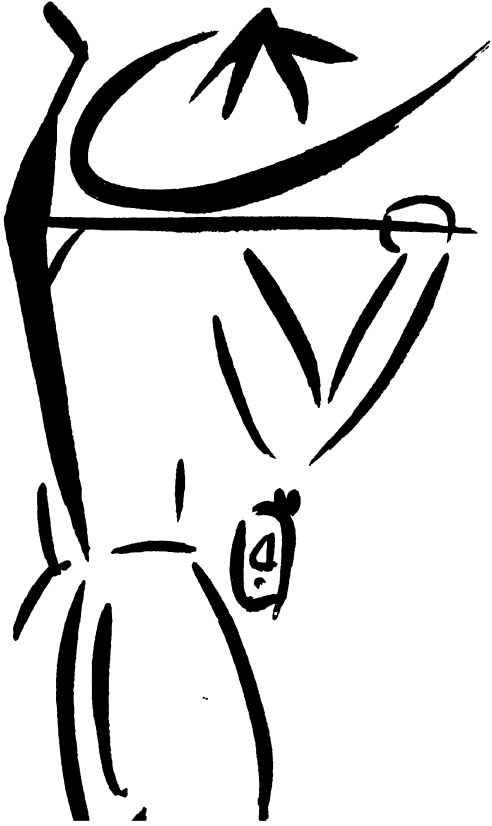
ল'ঙল হাতে কৃষক : শিল্পী—রবীন সেনগুপ্ত

ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি।"

মা'র মুখে গভীর অবজ্ঞার হাসি দেখে—তাঁর মুখের তাচ্ছিল্যপূর্ণ নিরুৎসাহের বাণী শুনে শিশুর মনটি দমে গেল। নিদারুণ অভিমানে তা'র মনটি ভরে গেল। সে তার খেলাধুলা সব ভুলে মাটিতে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো—তার মুখের হাসিটিও অমনি মিলিয়ে গেল। তার দু'চোখ দিয়ে অভিমানাশ্রু ঝরে পড়লো। সে আস্তে আস্তে পালকটি তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। সেটি নিয়ে সে নিজেই খেলতো, নিজেই তুলে রাখতো—আগ্রহ ভরে আর কখনও সেটি কাউকে দেখাতে চাইতো না। কবির "পাখীর পালক" কবিতাটি পড়ে আমাদের চোখের সামনে এই রকম একটি ছবিই ফুটে ওঠে। আমরা যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই শিশুর সেই বেদনাহত অভিমানভরা মুখখানি। কবি তাঁর অপূর্ব্বছন্দে শিশুর এই মর্ম্মব্যথাটিই সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শিশুর মনে কত যে বিচিত্র সাধ জাগে তা'র খবর আমরা বয়স্কেরা রাখি না। তাই তা'র মনের বাসনাগুলি বড়োদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বলে মনে হয়, কারণ তাঁরা নিজেদের মনের মাপকাঠিতেই সেগুলি বিচার করেন। সেগুলি বুঝতে গেলে আমাদের যে শিশুর মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে হবে, সেকথা আমরা ভুলে যাই। সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুদের চারপাশে বাধানিষেধের বিপুল অচলায়তন গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেন—বড়োরা অনেক কিছুই করেন যা শিশুরা করতে পায় না। এই রকম করে পদে পদে আমরা শিশুদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করতে চেষ্টা করি। এই জন্যে শিশুর মন স্বাধীনতা লাভের জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। সে তার বাঁধন ছাড়া কল্পনার রাশ ছেড়ে দ্যায়—কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় এক স্বপ্নময় মায়ারাজ্যে—যেখানে তাকে বড়োদের বাধানিষেধ মেনে চলতে হবে না—যেখানে সে একবারেই মুক্ত, স্বাধীন। বন্ধনক্লিষ্ট শিশুমনের এই মুক্তি কামনা অপূর্ব্ব হ'য়ে ফুটে উঠেছে কবির "বিচিত্র সাধ" কবিতাটির মধ্যে। বেলা দশটার সময় রোজ যখন শিশু স্কুলে যায়, সে দেখে ফেরিওয়ালা রাস্তা দিয়ে জিনিষ ফেরি করতে যাচ্ছে। ফেরিওয়ালার হাঁক শুনে শিশুর মনও আনন্দে নেচে ওঠে। ফেরিও-য়ালা যে পথে খুশী চলে যায়—যখন খুশী বাড়ী ফেরে। তাই শিশুরও ইচ্ছে হয়—

"শেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি ক'রে বেড়াই নিয়ে ফেরি।"

সাড়ে চারটের সময় স্কুল ছুটী হ'লে হাতে কালী মেখে শিশু বাড়ী ফেরে—পথে দেখে বাবুদের বাগানে মালী কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। দেখে শিশুর সাধ হয় সেও অমনি বাগানের মালী হবে, যেহেতু—

"কেউ তো তা'য়ে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে,
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।"

একটু রাত হতে না হতেই মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে চান। শিশু চোখ চেয়ে ঘরের জানালা দিয়ে দেখে মাথায় পাগড়ী প'রে পাহারা-ওয়ালা চলেছে রাতে পাহারা দিতে। তাই দেখে শিশুর মনেও সাধ হয়—

"ইচ্ছে করে পাহারা-ওলা হ'য়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি॥"

কত রাত হ'য়ে যায়। পাহারাওয়ালা তবু জেগে থাকে। কেউ তাকে ঘুমোতে বলে না। দেখে শিশুর ইচ্ছে হয় সেও অমনি পাহারাওয়ালার মতো রাত জাগবে—যতক্ষণ খুশী।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা সবাই জানেন অনুকরণ শিশুদের একটী সহজাত বৃত্তি। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের যা' ক'রতে দেখে তাই ক'রতে চায়। এই রকম করে বড়োদের অনুকরণ করাও তা'দের একটি খেলা, যা'তে তা'রা প্রচুর আমোদ পায়। তাই তারা কল্পনায় কখনও মা হ'তে চায়—মা'র মতো ক'রে তা'রা তা'দের পুতুল খোকা খুকুদের খাওয়ায় ঘুম পাড়ায়, কখনও বা শাসন করে, কখনও বা আদর করে। শিশুরা কখনও বা নিজেদের তা'দের দাদা দিদি মনে ক'রে বিশেষ আনন্দ পায়। কখনও বা তারা তা'দের বাবার কার্য্যকলাপও নকল করে—বাবার মতো চোখে চশমা এ'টে বই পড়তে, লিখতে, খবরের কাগজ পড়তে চায়। কখনও বা তারা নিজেদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কল্পনা ক'রে আমোদ অনুভব করে—তাঁ'দের যা করতে দেখে তা'রাও তাই করতে চায়। কবি তাঁ'র "মাষ্টারবাবু" কবিতাটিতে শিশুদের এই অনুকরণ স্পৃহাটিই বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশুর মুখ দিয়েই তিনি যেন বলছেন—

"আমি আজ কানাই মাষ্টার
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।

যাত্রী : শিল্পী—রবীন সেনগুপ্ত

রোজ রোজ দেরী ক'রে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি, "শোন্, শোন্।"
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখা পড়ার ভারি হেলা।
আমি বলি—চ ছ জ ঝ ঞ,
ও কেবল বলে—মিয়োঁ মিয়োঁ!"

শিশু তাঁ'র মাষ্টার মশায়কে যেমন ক'রে তাঁ'র ছাত্রদের পড়াতে শাসন করতে দেখে, সেও তার কল্পিত ছাত্রটিকে সেই রকম ক'রে পড়িয়ে শাসন করে আমোদ পেতে চায়। সে দেখেছে ছাত্ররা দেরী ক'রে ক্লাসে এলে পড়ায়

অমনোযোগী হ'লে মাষ্টার মশায়রা তা'দের শাসন করেন, বকেন সেও তা'র ছাত্রটিকে অমনি ক'রে শাসন করতে চায়। মাষ্টার ম'শায়ের মতো ক'রেই সে ছাত্রটিকে হিতোপদেশ দিতে চায়—"চুরি ক'রে খাস্‌নে কখনো," "ভালো হোস্ গোপালের মতো"—"পড়ার সময়ে তুমি পোড়ো"—"তারপরে ছুটি হ'য়ে গেলে খেলার সময়ে খেলা কোরো"—"মাষ্টার বাবু" কবিতাটি প'ড়ে আমাদের চোখের সামনে শিশু মাষ্টার ম'শায়ের ছবিটিই ভেসে ওঠে।

সাধারণতঃ শিশুরা তা'দের ছোটো ভাইবোনদের একটু অনুকম্পা করে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে তা'রা যে তাচ্ছিল্য বা অনুকম্পা পেয়ে থাকে, এ তা'রই প্রতি-ক্রিয়া। শিশুরা জানে তা'রা কোনও বিষয়েই বড়োদের সমকক্ষ নয়। তা'ই তা'রা নিজেদের অক্ষমতা সম্বন্ধে সদাই সজাগ থাকে। এই জন্যেই ছোটো ভাই বোনদের চেয়ে তা'রা যে বেশী জানে এবং বোঝে সেইটেই বিশেষ ক'রে জানিয়ে তারা আনন্দ পায়। "বিজ্ঞ" কবিতাটিতে শিশুদের এই মনোভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে।

"খুকী তোমার কিছু বোঝে না মা,
খুকী তোমার ভারি ছেলে মানুষ!
ও ভেবেছে তারা উঠ্‌ছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়ে ছিলেম ফানুষ।

আমি যখন খাওয়া খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা, পুরি।

সামনেতে ওর শিশু শিক্ষা খুলে'
যদি বলি—খুকী, পড়া করো,
দু-হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে,
তোমার খুকীর পড়া কেমন তরো?"

বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুদের 'ছেলে মানুষ' বলে সর্ব্বদাই দমিয়ে রাখতে চান। তাই তা'রা এমনি করে নিজেদের বড়ো ব'লে প্রতিপন্ন করতে চায়—এম্‌নি করে বয়ো-জ্যেষ্ঠদেরই অনুকরণ করতে এবং তাঁদেরই সমকক্ষ হ'তে চায়। শিশুরা ছেলেমানুষ—তা'রা কিছু বোঝে না—এই ব'লে বড়োরা তা'দের কোন বিষয়েই আমল দিতে চান না। এটা শিশুদের আদৌ মনঃপূত নয়। তাই তারা যে তাদের ছোটো ভাইবোনদের চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞ—তা'দের চেয়ে অনেক বেশী জানে এবং বোঝে—এই কথা ভেবে তা'রা বিশেষ আনন্দ পায়।

শিশু ছোটো ব'লে অনেক কিছুই করতে পায় না। অর্থাৎ তা'র দাদা দিদিদের যা করতে দেখে তা' করতে তা'র মনেও সাধ হয়। তাই সে স্বপ্ন দেখে বড়ো হ'লে বড়োদের মতো কি কি করবে। সে মোটেই ছেলেমানুষ হয়ে থাকতে চায় না।

"দাদার চেয়ে অনেক মস্তো হব
বড়ো হ'য়ে বাবার মতো হোলে।"

এইটেই শৈশবের স্বপ্ন। ভবিষ্যতের এই স্বপ্ন দেখেই শিশু আনন্দ পায়। তা'র দাদা তা'কে অবজ্ঞা করে ছেলেমানুষ বলে। তাই সে কল্পনা ক'রে সুখ পায়—'সে দাদার চেয়ে অনেক মস্তো হবে—বড়ো হয়ে বাবার মতো হোলে।'

"দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি ব'কে দেব!
বলব, "তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।"
বলব, "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে"—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখীর ছানা॥"

কবি তাঁ'র "ছোটোবড়ো" কবিতাটিতে শিশুমনের এই ভাবটিই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

আমি আগেই বলেছি বড়োদের অনুকরণ করা শিশুদের একটি অতি প্রিয় খেলা। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদের মতে এই রকম ক'রেই শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে অভ্যস্ত হয়। বড়োদের যা' কিছু করতে দেখে শিশুরা তাই করতে চেষ্টা করে। কিন্তু একজন্যে অনেক সময়েই তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শুধু তিরস্কারই পেয়ে থাকে। তখন তা'দের মনে

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—বড়োরা যা করে তা'রা তো তাই করছে তবে তারাই বা কেন সেজন্যে তিরস্কৃত হবে, আর বড়োদেরই বা কেন কেউ কিছু বলবে না! শিশুদের পক্ষে এই রকম ক'রে বড়োদের কাজের সমালোচনা করা যে কত স্বাভাবিক, কবি তাঁর "সমালোচনা" শীর্ষক কবিতাটিতে তাই বিশেষ ভাবে বলতে চেয়েছেন।

"আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র -
আমার বেলা কেন মা, রাগ করো?
বাবা যখন লেখে
কথা কওনা দেখে
বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন নাকি রোজ?
আমি যদি নৌকা করতে চাই
অমনি বলো—নষ্ট করতে নাই?
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?"

কবির ভাষায় শিশুমনের এই স্বাভাবিক প্রশ্নটিই রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাবা লিখে কাগজ নষ্ট করলে মা তাঁ'কে কিছু বলেন না। অথচ সে কাগজ নিয়ে লিখতে বসলেই কিংবা কাগজ দিয়ে নৌকা তৈরী করতে গেলেই মা বলেন—"কাগজ নষ্ট করতে নেই।" শিশু ভাবে—মা'র এ কেমন তরো বিচার?

শিশু তা'র কায়িক শক্তির অল্পতা ও দৈহিক অক্ষমতা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন। বড়োদের তুলনায় তা'র কার্য্য-ক্ষমতা যে কত কম তা' সে খুব ভালো ক'রেই জানে। তাই সে কল্পনায় অনেক অসম্ভব দুঃসাহসিক কাজ করে বড়োদের কাছ থেকে বাহবা পেতে চায়—যা' বাস্তবে তার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। সে স্বপ্ন দেখে সে অনেক কিছু অসম্ভব কাজ ক'রে বড়োদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। শিশুর অবচেতন মনে তা'র দৈহিক ক্ষমতার স্বল্পতার গ্লানি সদাই জাগরুক। তাই সে কল্পনায় নিজ বীরত্বের স্বপ্ন দেখে অসীম আনন্দ অনুভব করে। কবি তাঁর "বীরপুরুষ" কবিতাটিতে শিশুমনের এই দুঃসাহসিকতার স্বপ্নটিকেই রূপ দিতে চেয়েছেন।

"মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধূলোর মেঘ উড়িয়ে আসে।"

শিশুর কল্পনায় ফুটে ওঠে—একটি অসম্ভব দুঃসাহসিক অভিযানের ছবি। সে স্বপ্ন দেখে সে তাঁ'র মাকে একটি ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে বলে তাঁ'র মা যেন তা'কে বাহবা দিয়ে বলছেন—

"ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হোত তা না হোলে।"

এর অনুরূপ একটি ভাব কবির "দুঃখহারী" শীর্ষক কবিতাটির মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। শিশুমনের পরম ও চরম কামনা সে মস্তো বড়ো একটা কিছু করবে। তা'র দৈহিক ও মানসিক শক্তি যে সীমাবদ্ধ এ কথা সে ভালো ক'রে জানে ব'লেই বোধ হয় বড়োদের মতো অনেক বড়ো বড়ো কাজ করছে ভেবে সে বিশেষ আনন্দ পায়। তাই কল্পনায় অসম্ভবকে সম্ভব মনে ক'রে সে খুশী হয়।

"মনে করো তুমি থাকবে ঘরে
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী
জিনিষ-পত্র সব নিয়েছি ভরি',
ভালো ক'রে দেখ্ তো মনে করি',
কী এনে মা, দেব তোমার তরে!"

শিশুর মন কল্পনায় চলে যায় সোনার দেশে - তা'র মা'র জন্যে সোনা আহরণ ক'রে আনতে—চলে যায় সাগর পারে যেখান থেকে সে জাহাজ ভ'রে ভ'রে মা'র জন্যে নিয়ে আসবে মুক্তো ভারে ভারে। সে কল্পনা করে সে দাদার জন্যে আনবে "মেঘে ওড়া পক্ষীরাজের বাচ্চা দুটি ঘোড়া"—বাবার জন্যে আনবে "কনকলতার"

অনেকগুলি চারা। সে তা'র মা'র জন্যে আনবে সব চেয়ে সেরা জিনিষ—"সাত রাজার ধন একজোড়া মাণিক"। "দুঃখহারী" কবিতাটিতে কবি শৈশবের এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাটিকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

শিশুর মন সর্ব্বদাই এক অসম্ভব "ভূগোল ছাড়া" দেশে বিচরণ করে। তবে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে ওঠে। তাই তার রাজার বাড়ি"—ছাদের পাশে যেখানে তুলসীগাছের টব থাকে।

"আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো।
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত!
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে॥
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।"

শিশুর "রাজার বাড়ি"টি যে কোথায় তার খবর একমাত্র সে নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না। আর কারুর পক্ষে সেই "রাজার বাড়ি"টি খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। সাতসাগরের পারে কোথায় রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে তার সন্ধানও শিশু নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না, কারণ সেই রাজকন্যা শুধু শিশুর কল্পনাতেই বিরাজ করছে—তার কল্পনার সোনার কাঠির পরশেই সে জেগে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন—তাঁর সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা বাড়ীর একটা জায়গাকে "রাজার বাড়ি" বলতো। সে মাঝে মাঝে বলতো—"আজ সেখানে গিয়েছিলাম"। কিন্তু সেই "রাজার বাড়ি"টি যে কোথায় কবি তা তাঁর পরিণত বয়সেও আবিষ্কার করতে পারেন নি।

মাঝিকে নদীর উপর দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে দেখে শিশুও তার কল্পনার তরীটিকে অমনি ভাসিয়ে দিতে চায়। তার ইচ্ছে হয় সেও বড়ো হ'লে ঐরকম খেয়াঘাটের মাঝি হবে।

"মা যদি হও রাজি
বড়ো হোলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।
এপার ওপার দুই পারেতেই
যাবো নৌকো বেয়ে!
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে তাঁর নিজের শৈশবের দিনগুলি স্মরণ করে লিখেছেন—"পাল তোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" মাঝির নৌকো দেখে শিশুর মনও বিনা ভাড়ায় তা'র সওয়ারি হ'য়ে যেতে চায় "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে"—"তেপান্তরের মাঠে"—এক "নতুন রাজার দেশে"। সারাদিন পরে সন্ধ্যেবেলায় সে ফিরে আসবে মায়ের কোলটিতে—তা'র একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়ে।

"ফিরে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে,
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।"

আমাদের অনেকেরই হয় তো নিজেদের শৈশবের স্মৃতি মন থেকে একবারেই মুছে যায় নি। অনেকেরই হয় তো মনে আছে ছোটো বেলায় কাগজের নৌকো তৈরী করে সেটি জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমরা কত আমোদ পেয়েছি। সে নৌকো যে কতদুর যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। নদীর উপর দিয়ে নৌকো যেতে দেখে শিশুরও ইচ্ছে হয় তার কাগজের নৌকোখানি অমনি ক'রে জলের উপর দিয়ে ভেসে যাবে। কাগজের নৌকো তর্ তর্ করে ভেসে যায়—দেখে শিশুও উল্লসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তাঁর নিজের শৈশবের স্মৃতি থেকেই "কাগজের নৌকা" কবিতাটি লিখেছিলেন।

"ছুটি হোলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকা খানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম,

বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি!
যদি সে নৌকো আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি,
কার কাছ থেকে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ নৌকাখানি?

লাইনগুলি পড়ে বাস্তবিকই আমাদের মন ক্ষণেকের জন্যে সুদূর অতীতে ফেলে আসা সেই শৈশবের দিনগুলির মাঝে ফিরে যায়। নিজেদের ছেলেবেলাকার কথা যাঁদেরই স্মরণ আছে তাঁরাই জানেন এই খেলাটি শিশুদের কত প্রিয়।

শিশুর মন স্বভাবতই কল্পনা-প্রবণ। এই কল্পনাও make-believe একটা খেলা। তাই সে গল্প শুনতে ভালোভাসে। গল্পের মধ্যে তার মন কল্পনার যথেষ্ট খোরাক পায়—কল্পনায় সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চ'লে যেতে পারে। সন্ধ্যেবেলায় অথবা বাদল দিনে বাইরে যখন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি নামে, শিশু বাইরে ছুটোছুটি ক'রে খেলতে পায় না। সে তখন ঘরের কোণে ব'সে চুপটি ক'রে গল্প শুনতে ভালোবাসে।

—"ঘরের কোণে
মিটি মিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ্।"

গল্প শুনতে শুনতে রূপকথার অপরূপ মায়ায় শিশুর মন আবিষ্ট হ'য়ে যায়। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হ'য়ে গল্প শোনে—মাঝে মাঝে গভীর বিস্ময়ে তা'র মন ভরে ওঠে। সে ভাবে তেপান্তরের মাঠটি কোথায়—'কোন্ সাগরের তীরে'—'কোন্ পাহাড়ের পারে'—'কোন্ রাজার দেশে'—'কোন্ নদীটির ধারে'। সেখানে কি শুধু শুকনো ঘাসের জমি ধূ ধূ করছে? সেখানে কি শুধু একটি গাছের ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমি বাস করছে? শিশু-মনের এই ব্যাকুল প্রশ্নগুলির উত্তর কে দেবে? সে স্বপ্ন দেখে মাঠের উপর দিয়ে একলা ঘোড়ায় চেপে চলেছে রাজপুত্র—গজমোতির মালাটি তার বুকের উপর দুলছে—রাজপুত্র চলেছে রাজকন্যার সন্ধানে। হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। রাজপুত্রের অমনি চকিতে মনে প'ড়ে গেল তা'র দুঃখিনী দুয়োরাণী মা'র কথা—ভাবলো হয় তো তা'র দুঃখিনী মা তখন গোয়াল ঝাঁট দিচ্ছেন। শিশু তা'র সমস্ত পড়াশুনা খেলাধূলা ভুলে একমনে গল্প শোনে। বাস্তবে কি সম্ভব বা অসম্ভব তা'র মন তা' বিচার করে না। "ছুটীর দিনে" কবিতাটিতে কবি এমনি একটি ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবির ভাষার মধ্যে দিয়েই আমরা যেন শুনতে পাই শিশুর কলকণ্ঠ—সে গল্প শুনবার জন্যে তা'র মা'র কাছে আবদার জানাচ্ছে—

"পড়ার কথা আজ বোলো না।
যখন বাবার মতো
বড়ো হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।"

গল্প শুনতে শুনতে নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখে শিশুর ক্ষুদ্র বুকটি উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। কখনও বা তা'দের দুঃখে তা'র চোখ থেকে সমবেদনার অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মতো ঝ'রে পড়ে—কখনও বা তা'দের সুখে তা'র মুখে অসীম সুখের মিষ্টি হাসিটি ফুটে ওঠে। শিশু নিজেকেই নায়ক নায়িকা কল্পনা ক'রে নিয়ে তা'দের সুখ দুঃখকেও বরণ ক'রে নেয়। রামায়ণের গল্পে সে শোনে রাজা দশরথ তাঁ'র ছেলে রামকে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে পাঠিয়েছিলেন। বন কি শিশু তা' জানে না। কিন্তু তবু সে কল্পনায় বনের জীবনযাত্রার একটি সুন্দর ছবি এঁকে নেয়। সে শুনেছে রাম একা বনে যান নি'—সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর ছোটো ভাই লক্ষ্মণকে। তাই শিশুর মনে হয় সেও রামের মতো তা'র বাবার আদেশে

বনে যেতে পারে—যদি তা'র সঙ্গেও লক্ষ্মণের মতো একটি ছোটো ভাই থাকে।

"রাক্ষসেরে ভয় করি নে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।
হনুমানকে যত্ন ক'রে
খাওয়াই দুধে-ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।
মাগো, আমায় দে না কেন
একটি ছোটো ভাই
দুই জনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।"

"বনবাস" কবিতাটিতে শিশুমনের এই বিচিত্র বাসনার একটি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

শিশুর কাছে তা'র মা'ই সব চেয়ে প্রিয় এবং সব চেয়ে আপন জন। তাই তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, খেলা, ধুলা সব কিছুই যেন তা'র মাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। তা'র সুখ দুঃখের চিরসাথী সেই জননীকেই কেন্দ্র ক'রে সে রচনা করে তা'র কল্পনার স্বর্গটিকে। তা'র মা-ই হয়ে ওঠেন তা'র সব চেয়ে প্রিয় খেলার সাথী। খেলাই শিশুজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য। এই খেলা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। তার কাজ ও খেলাতে কোনও তফাৎ নেই। খেলার অপরূপ মায়ারাজ্যেই তা'র মন অহরহ আনাগোনা করে। তাই সে বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুকেই খেলার সামগ্রী ব'লে মনে করে।

"যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে॥"

তাই শিশুকে খেলা করবার জন্যে আহ্বান জানায়—আকাশের মেঘ—নদীর জলের ঢেউ। এরা সবাই তা'র খেলার সাথী। সেই আহ্বানে শিশুর উদাসী মন চলে যেতে চায়—"নব মেঘের দেশে"—"নব ঢেউয়ের দেশে"। কিন্তু সে তো তা'র মাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না। তাই সে আহ্বানে শিশুর মন তেমন ক'রে সাড়া দ্যায় না। "মাতৃবৎসল" কবিতাটিতে এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে।

শিশু চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরই কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই জানেন শিশু লুকোচুরি খেলা খেলে কত কৌতুক অনুভব করে—এই খেলায় সে কত আমোদ পায়। "লুকোচুরি" কবিতাটিতে শিশু তা'র মাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লেছে—

"আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা, চিনতে আমায় পারো?
তুমি ডাকো "খোকা কোথায় ওরে?"
আমি শুধু হাসি চুপটি ক'রে।"

শিশু কল্পনা করছে সে যেন চাঁপা গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটে আছে—গাছের কচি পাতার সঙ্গে সে যেন মিশে গিয়েছে। তা'র মা তাই আর তা'কে খুঁজেই পাচ্ছে না। "খোকা কোথায় ওরে"—বলে তা'র মা তা'কে ডাকলে সে সাড়া দেবে না—শুধু চুপটি ক'রে হাসবে। কল্পনার এই রকম খেলা ক'রে শিশুরা যে কত আমোদ পায় তা' প্রত্যেক শিশুর জননীই জানেন।

"সাত ভাই চম্পার" গল্পটি শুনে শিশুর মনে যে ছবিটি ফুটে ওঠে কবি তাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন বলে মনে হয়—তাঁর "সাত ভাই চম্পা" কবিতাটিতে। সাত ভাই চাঁপা ও পারুলদিদির মুখে শিশু যেন তা'র নিজের ভাই বোনদেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়—

"সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনার মুখ,

পারুলদিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক্‌।"

খেলার মধ্যেও শিশু তা'র মাকে বেশীক্ষণ ভুলে থাকতে পারে না। খেলার মাঝে যখনি তা'র মা'র কথা মনে পড়ে যায়, মা'র জন্যে তা'র মনে কেমন ক'রে ওঠে—ছুটে তা'র মা'র কাছে যেতে ইচ্ছে করে। তাই তা'র মনে হয় চাঁপা ভাইদেরও বোধ হয় তা'দের মা'র জন্যে মন কেমন ক'রচে—

ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপন দেখে মাকে ;
সকাল বেলায় "জাগো জাগো"
পারুল দিদি ডাকে॥"

সকাল বেলায় তা'দের পরুলদিদি এসে ডেকে বলে—"জাগো জাগো"—সকাল হ'লে তা'র দিদি এসে যেমন করে তা'কে ঘুম থেকে জাগায়।

শিশুদের সুখ দুঃখের মাপকাঠিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা সবাই জানি তা'রা কত অল্পতেই খুশী হয় আবার কত অল্পতেই দুঃখ পায়। কবি তাঁ'র "সুখদুঃখ" শীর্ষক কবিতা-টিতে শিশুদের সুখ ও দুঃখের দু'টি চিত্র পাশাপাশি দেখিয়েছেন।

"আজকে দিনের মেলা-মেশা,
যত খুসি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি,
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।"

এরই পরে কবি একটি দুঃখের চিত্রও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ঠাকুর বাড়ী ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায়
ভেসে যায়রে দেশ!
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো,
ঐ-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি'—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে,
একটি পয়সা নাহি!"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে কয়টি কবিতা আলোচনা করা হ'লো তা' থেকে বোঝা যায় কবি কত সুন্দরভাবে শিশু চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ ক'রেছেন— কী গভীর দরদী মন দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন শিশুর মনকে। শিশু হৃদয়ের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা তাই যেন ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে তাঁর ছন্দে ছন্দে। কবির ভাষায় যেন শুনতে পাই শিশুর কলকণ্ঠেরই অবিকল প্রতিধ্বনি। তাঁর কথা শুনে মনে হয় যেন তাঁর মনের গোপনে একটি চিরন্তন শিশু ঘুমিয়ে আছে—যার সঙ্গে শিশুর হৃদয় ও মন এক সুরে এক তন্ত্রীতে বাঁধা। তাই শিশুর স্বপ্ন ও কল্পনা, তার মনের বিচিত্র ভাব ব্যঞ্জনা, তার খেলা-ধূলা অমন ক'রে ধরা দিয়েছে কবির অপূর্ব্ব ছন্দোবন্ধনে। কবির কথার মধ্যে দিয়ে যেন শুনতে পাই সেই চিরন্তন শিশুরই মর্ম্ম কথা। সেই কথার যাদুপরশে জেগে ওঠে আমাদের মনের চিরন্তন শিশুটিও।

●

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক কাব্য, তা সে যতই সামান্য বা ক্ষুদ্র মনে হোক্ না কেন, তার স্বক্ষেত্রে আছে তার বিশেষ প্রয়োজন। ব্রহ্মাণ্ড শুধু বৃহৎকায় পর্ব্বত আর আকাশ জোড়া সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ে গঠিত নয়, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনে তুচ্ছতম ধুলিকণাও সমান প্রয়োজনীয়।

—শ্রীঅরবিন্দ

সঙ্কেত

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শুধু সাদা থানই নয়, মনটাকেও যেন সেবা সাদা রঙে ডুবিয়ে নিয়ে এলো। গাড়ী থেকে নেমে কোনরকমে হেঁট হ'য়ে বাপকে প্রণাম করে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। মেয়েকে গেট পার হ'তে দেখেই মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রান্নাঘরে পালিয়ে গেলেন। মেয়ের এ চেহারার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতন সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না। কোন মা'ই বুঝি পারেন না। চোখ দুটো বন্ধ করলেই জল জল ক'রে ওঠে সিঁথি ভরা রক্তের মতন রাঙা সিঁদুরের রেখা, সোনালী হাতে সোনাবাঁধানো ধবধবে শাঁখা। মধ্যে বড়ো জোর তিনটে মাস। এর মধ্যেই সব ওলট-পালট হ'য়ে গেলো। জীবনের সমস্ত রংয়ের উৎস নিয়তির ক্রুর নিঃশ্বাসে নিমেষে শুকিয়ে গেলো। সামনে শুধু রুক্ষ ধু ধু প্রান্তর।

পা টিপে টিপে ইলা ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলো একবার। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে সেবা ফুলে ফুলে কাঁদছে। একটু এগিয়েই ইলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বলবে কি গিয়ে? কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে? দেয়ালে এখনো বসুধারার দাগ আঁকা, বিয়ের দু'দিন আগে নিজের হাতে পছন্দ ক'রে কেনা রঙীন পর্দ্দাগুলো এখনও দুলছে জানলায়, হয়তো খোঁজ করলে আরো অনেক জিনিষ বেরোবে বাড়ী থেকে—বিয়ের উপলক্ষ্যে কেনা টুকিটাকি অনেক কিছু! কিন্তু হাজার খোঁজ করলেও একটা মানুষ আর ফিরে আসবে না।

পিঠে একটা স্পর্শ পেয়ে ইলা ঘুরে দাঁড়ালো। মা ডাকছেন হাতের ইসারায়। বাইরে বারান্দায় যেতে বলছেন। আবার পা টিপে ইলা বাইরে বেরিয়ে গেলো।

'ইলু মা, তোর দিদিকে উঠে হাতে মুখে জল দিতে বল। সারা রাত ট্রেনে কেটেছে। হাত মুখ ধুয়ে কিছু একটু—' মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

'যাচ্ছি মা'—ইলা ঘরের মধ্যে ঢুকে সেবার পিঠের ওপর আলতো একটা হাত রাখলো, 'দিদি, দিদি।'

আস্তে সেবা উঠে বসলো। দুটো হাত দিয়ে পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলের গোছা বাঁধলো ঠিক করে—তারপর আঁচল দিয়ে চোখের কোন দুটো মুছে নিয়ে বললো, 'কি-রে ইলা ?'

'ওঠো দিদি, মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

সেবাকে একরকম ঠেলেই ইলা বাথরুমে পাঠিয়ে দিলো।

মনতোষবাবু খরচপত্র বড় কম করেন নি। নগদই দিয়েছিলেন দু'হাজারের ওপর। তার ওপর সোনার দর বুঝি মানুষের দরের চেয়েও বেশী। চল্লিশ ভরি সোনাতেই বাড়ীর দলিল হাত বদল করলো। তবু এমন কিছু নয়। ছাপোষা ঘরের ছেলে। শ দেড়েক টাকা পায় মাসান্তে, তবে সরকারী চাকুরে এই টুকুই যা। মেয়ের বাপেদের চোখে ঘোর লাগার পক্ষে এই টুকুই অবশ্য যথেষ্ট। তাই মনতোষবাবু জোর করে মনের খুঁতখুঁতুনীটা দাবিয়ে রেখেছিলেন। আজকালকার দিনে এমন পাত্রই বা জুঠছে কোথায়! মেয়ের বয়স বেশী এই অজুহাতেই অন্ততঃ জনা দশেক লোক সরে পড়েছে। এই বিয়েটাও ভেঙে যেতো, শুধু ছেলের মামার খুব পছন্দ হ'য়ে গেলো। মেয়েকে দেখে যতটা না হলো, মেয়ের কুষ্ঠী দেখে হলো তার চেয়েও বেশী। পাশে বসা ছেলের বন্ধুর দিকে হেসে বললেন, 'বাবাজী, সমীরকে গিয়ে বলো এ একেবারে রাজযোটক। দু'জনেরই বৈশ্যবর্ণ, আর্দ্রা নক্ষত্র, তুলা রাশি। এ বিয়ে হ'লে দু'জনেই খুব সুখী হবে।'

কুষ্ঠির মিলের জন্যই কিনা জানা যায় নি, তবে পাত্রের পছন্দ হ'য়ে গেলো। নিজেই দেখতে এসেছিলো বন্ধুকে সংগে নিয়ে। যে কালের যা রেওয়াজ। গয়া আর এমন কি দূর! একটা রাত বৈ তো নয়! বিয়েটা হয়েই গেলো শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে সব খুইয়ে যে মেয়ে এমনি ভাবে ফিরে আসবে তা' আর কে ভাবতে পেরেছিলো।

দিন দুয়েক তার পরেই আশ্চর্য্যভাবে সেবা নিজেকে সামলে নিলো। সোজা বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি আবার লেখাপড়া করবো বাবা, 'বিয়ের আগে যেমন ক'রছিলাম।'

মনতোষবাবু খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর খুব আস্তে বললেন, 'বেশ তো, এ' তো খুব ভালো কথা।'

কিন্তু খুব যে ভালো কথা নয়, এটা বেশ বুঝতে পারলেন নিজের মনে মনে। আড়াই শ' টাকার চাকরী সম্বল ক'রে ছেলেদের ঠিকমত লেখাপড়া সেখানোই কষ্ট-সাধ্য, তার ওপর ঘাড় থেকে কোন রকমে নামিয়ে ফেলা মেয়ে যদি আবার ছিটকে আসে সংসারের মধ্যে, তার লেখাপড়া শেখাটা বিলাসিতারই নামান্তর।

কিন্তু থাকতে হবে তো কিছু একটা নিয়ে। বাইশ বছরের একটা মেয়ের অবলম্বন চাই তো একটা।

সেবা বইপত্তর কিছু জোগাড় ক'রে কিছু কিনে মহা আড়ম্বরে লেখাপড়া শুরু ক'রে দিলো। কিন্তু বড় জোর সপ্তাহখানেক। তারপর একদিন সমান উৎসাহে বইয়ের গোছা নিয়ে ইলার সামনে এসে দাঁড়ালো, 'ইলু, কিছুতেই মন বসছে না বইয়ের পাতায়। কি করি বল্ তো ?'

কিন্তু ইলা কি বলবে? অনেক ব'লেও দিদিকে সাদা থান ছাড়াতে পারে নি। নিজের সাদা রঙের শাড়ী-গুলোর রঙীন পাড় চড় চড় ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে নিজের হাতে। পাড়গুলো দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে ইলার দিকে, 'নে ইলু, তোর কোন শাড়ীতে বসিয়ে নিস। আমার জীবনের রংই না হয় কি হ'য়ে গেছে, কিন্তু পাড়গুলোর জেল্লা ঠিক আছে, দেখেছিস?

ইলা আপত্তি ক'রেছে, 'তুমি যে কী দিদি! কেন, পাড়ওলা শাড়ী পড়লে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে? ওই তো সেনদের মল্লিকাদি এখনও রঙীন শাড়ী পরে!'

পরে বুঝি'? সেবা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, 'আর জানিস ইলু, বিথীদির ননদ একটা ছেলে নিয়ে বিধবা হ'য়েছিলো তো, আবার নাকি বিয়ে ক'রেছে। কালকেই মা ফিস ফিস ক'রে ব'লছিলেন বাবাকে।'

সেবার দিকে একবার মুখ তুলে চেয়েই ইলা তাড়া-তাড়ি চোখ দুটো নামিয়ে নিয়েছিলো। সাদা থান আর রুক্ষ চুলের গোছা, কিন্তু কি জ্বলন্ত দুটো চোখের চাউনি!

ওর দেহ মনের সব রঙ বুঝি ওই চোখের আগুনেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে বসেছে।

খুব সাবধানে সেবাকে এড়িয়ে যেতে লাগলো ইলা। কথাবার্ত্তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। এমন সব কথা বলে, শুনে গা যেন শিউরে ওঠে।

'এই ইলু' জানলার গরাদে মাথাটা চেপে ধ'রে সেবা বললো, 'বাবা আর মা আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। আমি দেখেছি আমার সংগে কথা বলবার সময়ও তারা অন্যদিকে চেয়ে থাকেন। কেন বল তো?'

বনমহোৎসব

কি উত্তর দেবে ইলা? বই গুছোবার অছিলায় কিংবা শাড়ী রোদে মেলে দেবার ছুতো ক'রে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু সেবা পথ আগলে দাঁড়ালো। হেসে বললো, 'শোনই না কথাটা! মেয়ের কেবল কাজ আর কাজ।'

অগত্যা চুপচাপ ইলাকে দাঁড়াতে হ'লো দিদির দিকে চেয়ে। 'আমি তো ইচ্ছে ক'রলেই পারি পাড়ওয়ালা শাড়ী পরতে, গায়ে দু' একটা গহনাও তো রাখতে পারি, আমার বয়সী মেয়েদের এমন অবস্থা হ'লে তারা সাজ-গোজ করে না বুঝি? কিন্তু না, ঠিক এমনি সাদা কট-কটে থান আর খালি হাত নিয়ে মা-বাপের সামনে বেড়ালে তবে মা-বাপের শিক্ষা হবে। চাইতে পারবে না চোখ তুলে, আড়চোখে দেখবে আর ভেতরটা তাদের পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।'

'দিদি!' ইলা আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলো না। সেবার কি মাথাই গেলো নাকি খারাপ হ'য়ে? শোকে তাপে দিক্‌বিদিক জ্ঞান নেই।

সেবার হাসি অম্লান, 'না না, যা ভাবছিস তা নয়। মাথা আমার মোটেই খারাপ হয় নি।'

ইলা সেবার কথা শেষ হবার আগেই পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর একদিন। নিচের ঘরে কি একটা কাজ করছিলো ইলা, হঠাৎ ওপর থেকে এসরাজের আওয়াজ ভেসে আসলো। পা টিপে টিপে সিঁড়ির চাতাল পর্য্যন্ত উঠেই ইলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেবা বসেছে এসরাজ নিয়ে। ওরই এসরাজ অবশ্য। বিয়ের আগে মাসখানেক ধ'রে বাজনা শিখেছিলো কিছুটা। বেশী নয়, বোধ হয় গোটা দুয়েক গান আর গৎ খান চারেক। বিয়ের জন্য এই যথেষ্ট। পা মুড়ে বসে কাঁপানো হাতে ছড় টেনে টেনে কোন রকমে বাজালো "বাদল বাউল বাজায় বাজায়" কিম্বা হালকা গৎ দু' একটা। পাত্রপক্ষের পছন্দের শুরুতেই এসরাজের শেষ। সেবাকে অবশ্য এসরাজ বাজিয়ে শোনাতে হয় নি। বরের মামা ও সব মোটেই পছন্দ করেন না। কাজেই শ্বশুর বাড়ীতেও যন্ত্রটা নিয়েও যেতে হয় নি। তা ছাড়া ইলা বাকী। দু একটা গৎ তো তাকেও শিখতে হবে।

মুখ তুলতেই ইলার সঙ্গে সেবার চোখাচোখি হ'য়ে গেলো। বাজনা থামিয়ে সেবা বললো, 'অনভ্যাসের ব্যাপার, কিছুতেই হাত চলছে না। তুই আর বাজাস না ইলু?

ইলা ঘাড় নাড়লো। সংসারের কাজ করেই সময় পায় না, আবার গান বাজনা।

'দিবাকরদাকে খবর পাঠানো যায় না?' সেবা ছড় দিয়ে আলতো তারের ওপর টান দিলো দু একবার।

'দিবাকর দাকে?'

'হ্যাঁ ভাবছি এবার বাজনাটা ভালো করেই শিখবো। বাইরের লোকের মন ভোলাবার জন্য যেটুকু শিখেছিলাম, তাতে নিজেকে ভোলানো যায় না। তুই খবর পাঠাবি দিবাকরদাকে?'

হ্যাঁ, না, কোন উত্তরই ইলা দিতে পারলো না। কিছুই কি বোঝে না দিদি? দিবাকরদা আত্মীয় নয়, পাড়া সুবাদে আলাপ। বিনা পয়সায় মেহনৎ করতে মোটেই রাজী হবে না। বিয়ের আগে দিবাকরদাকে ডাকতে হয়েছিলো প্রয়োজনে। আর বিনামূল্যেও তিনি আসেন নি। মাসের শেষে গুণে গুণে টাকা তুলে দিতে হয়েছে তাঁর হাতে।

দিবাকরদাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু সেবা খুঁজে খুঁজে নিয়ে এলো দূর সম্পর্কের এক পিসতুতো ভাইকে। রোজ নয় সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু তাতেই বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। একি আরম্ভ করেছে সেবা? লাজ লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে নাকি? এর চেয়ে মুখ গুজড়ে পড়ে পড়ে কাঁদতো—সেও তো ছিলো ভালো। বলবে কি আশে পাশের লোকেরা।

আশে-পাশের লোকেরা কিছু বললো না, কিন্তু ইলাই একদিন কথায় কথায় বললো, 'এ তুমি কি শুরু করছো বলো তো দিদি?'

কি শুরু করেছি, এস্রাজের তারগুলোয় হাত দিয়ে অনাবশ্যক একটা ঝঙ্কার তুললো সেবা।

'যা রয় সয় সেটাই ভালো' ইলা মরিয়া হ'য়ে উঠলো। দিদির আর কি। ঠাট্টা টিটকিরী বাঁকা বাঁকা কথা সবই তো ওকেই শুনতে হয়।

'কথাটা খুলেই বল্ না?' সেবা এসরাজটা সরিয়ে রাখলো পাশে।

ইলা খুলেই বললো। সব জিনিসের একটা সীমা থাকাই তো ভালো। এখন কি এ সবের সময়?

দু' এক মিনিট কিংবা বুঝি তারও কিছু কম। চোখ দুটো আবার জলে উঠলো সেবার।

'আমি কি নিয়ে তবে থাকি বল্?'

'কেন, সংসারের কাজ রয়েছে। অবসর সময়ে ভালো বই-পত্তর নিয়েও কাটাতে পারো।'

'তবু ভালো ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাকতে বলিস নি? তোর আর কি!' আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে সেবা সরে গেলো সেখান থেকে।

শুধু ইলার চোখেই নয়, ওর বাপ মার চোখেও ধরা পড়লো ব্যাপারটা।

'সেবা যেন বদলে যাচ্ছে দিন দিন। বয়স কম তা মানি, এ বয়সে এমন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই মুস্কিল, তাও বুঝি, কিন্তু খুব ছেলেমানুষ তো আর নয়, একটু সামলানো উচিত।' কথাগুলো মনতোষ বাবু খুব সাবধানে বললেন, প্রায় চুপি চুপি, এদিক ওদিক বার কয়েক চেয়ে নিয়ে।

সেবার মা কিন্তু অন্য কথা বললেন, 'আহা কিই বা বয়স, এর মধ্যে জীবনের সাধ আহ্লাদ তো সবই ঘুচে গেলো। মেয়েদের সিঁদুর মোছা তো নয়, মনের সব রঙ মুছে ফেলা। গানবাজনার শখ ওর চিরকালের। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো?'

কথাটা বললেন বটে, কিন্তু অন্যের দিকে মেয়ের ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'সেবা, নে মা তৈরী হ'য়ে নে। চৌধুরীদের বাড়ী কথকতা হচ্ছে, শুনে আসি।'

জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো সেবা। মার কথায় মুখ ফেরালো। চৌধুরীদের বাড়ী কথকতা! পাড়ার গিন্নী আর বিধবাদের ভীড়। মনকে নিরাসক্ত করার আয়োজন। মায়ার ঘোরে মুখ থুবড়ে যারা পড়ে আছে, তাদের তুলে নেবার প্রয়াস। কিন্তু সেবাকেও যেতে হ'বে সেখানে।

যাবে না এ কথাটা বলতে গিয়েই সেবা থেমে গেলো। আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়িয়ে আস্তে বললো, 'একটু দাঁড়াও মা, তৈরী হ'য়ে আসি।'

সময় হয়তো বেশীক্ষণ লাগলো না, কিন্তু তার মধ্যেই সেবা পরিপাটি সেজে এলো। স্নো আর পাউডারে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখের রং, এলো খোঁপা, কিন্তু তাতেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ইচ্ছে ক'রেই বুঝি ইলার লাল ভেলভেটের স্লিপারটা সেবা পায়ে গলিয়ে নিলো।

সেবার মা আড়চোখে চেয়ে দেখলেন মেয়ের দিকে। পাড়ার নানান রকমের লোক আসবে কথকতার আসরে। মানুষ সবাই সমান নয়, কি কথায় কি কথা উঠবে ঠিক আছে? তার চেয়ে দরকার নেই, ঘরেই থাক সেবা। ঘরের মধ্যে যা ইচ্ছে করুক, চারটে দেয়ালের মধ্যে, কিন্তু বাইরে একটু বেচাল হ'লে, চি চি পড়ে যাবে। কান পাতা যাবে না।

'তোর আজ আর গিয়ে কাজ নেই সেবা, আর একদিন বরং নিয়ে যাবো। আজ প্রথম দিন বড্ড ভীড় হবে।' সেবার মা আর দাঁড়ালেন না।

মুচকি হাসলো সেবা। আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিলো। ভালোই হ'য়েছে পোষাকটা। একটা পান খেয়ে নিলে আরো রাঙা হ'তো ঠোঁঠটা।

পোষাকটা খুলতে গিয়েই সেবা থেমে গেলো। নিচে পরিচিত লোকের গলার আওয়াজ। এমন একটা গলার স্বরের প্রত্যাশা সেবা কিছুদিন ধরেই করছিলো। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালো দরজার পাশে। হ্যাঁ, ঠিক, আর ভুল নেই। ভাশুরের গলার আওয়াজ। চাপা গম্ভীর শব্দ, অনেকটা হাঁড়ি মুখে দিয়ে কথা বলার মত।

খবর আনলো ইলা।

'তোমার ভাশুর এসেছেন দিদি তোমায় নিয়ে যাবার কথা বলছেন।'

দরজার পাল্লাটা ধরে সেবা সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

'আমি কোথায় যাবো?'

অদ্ভুত উদ্ধত ভঙ্গি। গলার আওয়াজে ঔদাসীন্য আর অবহেলা সমস্ত শরীর যেন জ্বালা ক'রে উঠলো ইলার।

'কোথায় আবার, শ্বশুর বাড়ী। স্বামী নেই, তা ব'লে শ্বশুরবাড়ী তো আর মুছে যায় নি।'

'স্বামী থাকলেও তো শ্বশুরবাড়ীর পালা শেষ হ'য়ে যেতে পারে অনেকের। ইঁট কাঠ আর কড়ি বরগা নিয়েই তো আর মানুষের শ্বশুরবাড়ী নয়!'

'তার মানে?'

'মানে তুই বুঝবি না।' সেবা জোরে জোরে পা ফেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

মনতোষবাবু সিঁড়ির কাছ থেকেই চেঁচাতে আরম্ভ করলেন, 'কইরে কোথায় গেলি? নবীনবাবু এসেছেন।'

সেবার শ্বশুরবাড়ীর রেওয়াজ মনতোষবাবু ভালোই জানতেন। ভাশুর ব'লেই যে একগলা ঘোমটা দিয়ে ধারে কাছে ঘেঁষবে না বউ, এমন নয়। ঘোমটা মাথায় থাকে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। কথাবার্ত্তা সবই হয়। কাজেই নবীনবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সেবার কোনই অসুবিধা নেই।

সেবা সামনে এসে দাঁড়াতেই মনতোষবাবু একটু ঘাবড়ে গেলেন। এমন ফিটফাট সেজে ভাশুরের সামনে না দাঁড়ানোই ভালো। একটু উস্কোখুস্কো থাকবে চুল, চোখ মুখে বিষাদের ছায়া। সদ্য শোক পাওয়া তো, আর যে সে শোকও নয়। মেয়েছেলের আসল লোকই স্বামী, সার জিনিষ।

কিন্তু মুখ ফুটে মেয়েকে কিছু বলতেও মনতোষবাবুর বাধলো। কেবল গলার স্বর খুব খাটো ক'রে বললেন, "নবীনবাবু এসেছেন সেবা।"

'হঠাৎ'? সেবা ভুরু দুটো তুললো।

'মানে ইয়ে', মনতোষবাবু ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিলেন, 'এখানে এসেছিলেন, তাই একবার দেখা করে যেতে চান।'

'অ:' হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা অল্প টেনে দিয়ে সেবা বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো।

নবীনবাবু বাইরের দিকে চেয়েছিলেন, পায়ের আওয়াজে ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন, তারপর অনেকক্ষণ আর অন্য কোন দিকে চাইতে পারলেন না। আশা ক'রে-

ছিলেন গুমরে গুমরে কান্নার আওয়াজ শুনবেন কিছুক্ষণ ধ'রে, তারপর বাড়ীর লোকেরা হয় তো বুঝিয়ে শুনিয়ে সেবাকে সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রসাধিত সম্পূর্ণ অপ্রতিভ এই মেয়েটিকে অপলকদৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে থাকতে দেখে নবীনবাবু যেন মুস্কিলেই পড়লেন।

নবীনবাবু ফিরতেই সেবা এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলো, তারপর অল্প হেসে বললো, 'কেমন আছেন? দিদি-ভাই ছেলেপুলেরা ভালো তো?'

নবীনবাবু ঘাড় নাড়লেন। 'হ্যাঁ, ভালোই আছে তারা।' সেবা কেমন আছ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই কি ভেবে থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সেবা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ আর নবীনবাবু চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন।

হঠাৎ একসময়ে নবীনবাবু নড়ে-চড়ে সোজা হ'য়ে বসে বললেন, 'অনেকদিন তো হ'য়ে গেলো, এবার যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়।'

'যাওয়ার বন্দোবস্ত'? সেবার গলার আওয়াজে মনে হ'লো সে যেন বেশ আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। আবার ফিরে যাওয়া। ছেঁড়া সুতোয় গিঁট বাধা। শাখা সিঁদুরের সংগে ওখানকার জীবনও তো রেখে এসেছে পিছনে। তবে?

'দুদিন আমি ক'লকাতায় আছি। ভাবছি পরশু ফেরবার সময় তোমায় সংগে করেই নিয়ে যাবো।'

'কিন্তু আমি যাবো না।'

'যাবে না? সে কি বৌমা?'

'আপনাদের ওখানে যেতে আমার ইচ্ছা করে না।'

'সবই বুঝি বৌমা'। নবীনবাবু আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন: 'কিন্তু কি করবে বলো, এ তো আর মানুষের হাত নয়! প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে, তারপর আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে হবে বৈ কি!'

'কিন্তু আমার আবার কিসের সংসার'? আচমকা সেবা খুব চড়ালো গলার স্বর, 'তিন মাসের তো পরিচয়!'

সমস্ত শরীরটা নবীনবাবুর জ্বালা ক'রে উঠলো, কিন্তু অত সহজে মেজাজ খারাপ করার লোক তিনি নন। তাহ'লে আর মুহুরীগিরি ক'রে ওকালতী পাশ করতে পারতেন না। কাঠগড়ায় এর চেয়ে অনেক বেয়াড়া সাক্ষীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'য়েছে। প্রথমে ভিজে কথা মিঠে মিঠে বুলি, তাতে সুবিধা না হ'লে তারপর আসল ওষুধ।

মেয়ের গলার আওয়াজ শুনে মনতোষবাবু পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। কাছাকাছিই ঘুরছিলেন। ভাশুর ভাদ্রবৌয়ের আলাপ আলোচনার মধ্যে মাথা গলাতে চাননি। কিন্তু মেয়ের গলা শুনেই বুঝলেন বিপত্তি বেঁধেছে। বেফাস কথাই হয়তো ব'লে ফেলেছে সেবা। আশ্চর্য্য, মেয়েটা কেমন বদলে গেছে যেন! বিয়ের আগে সাত চড়ে রা করতো না, এখন কথা বলবার আগেই মারমুখী হ'য়ে আসে।

মনতোষবাবুকে দেখে নবীনবাবু একগাল হেসে বললেন, 'শুনলেন আপনার মেয়ের কথা?'

মনতোষবাবু মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে চাইলেন। কথাটা নবীনবাবুই বললেন, 'বলছে তিনমাসের পরিচয়। আমি আর যাবো না সেখানে।' হাকিমি ঢংয়ে নবীনবাবু টেনে টেনে হাসলেন।

'সে কি কথা'? মনতোষবাবু মাথার পিছন দিকটা চুলকোলেন,—'শ্বশুরবাড়ী ছাড়া মেয়েদের আর কি আছে'? হঠাৎ থেমে কি ভেবে মেয়ের দিকে চাইলেন একবার, তারপর গলার আওয়াজটা আরও মোলায়েম ক'রে বললেন, 'বেশ তো, এক্ষুণি যেতে না ইচ্ছা করে, মাসখানেক যাক, আমিই রেখে আসবো এখন সংগে ক'রে।'

নবীনবাবু একটু বিচলিত হ'লেন। আবার মাসখানেক। কিন্তু একটা লোকের তাঁর জরুরী দরকার। দিনকয়েকের মধ্যেই বোধ হয় স্ত্রী আঁতুড়ে ঢুকবেন, সেই সময় সংসার দেখবার জন্য মেয়েছেলের একটা খুব প্রয়োজন। পিঠে হাত বুলিয়ে কোন রকমে একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়। তারপর নিজমূর্ত্তি ধরলেই হবে।

'না, আমি আর কক্ষণো যাবো না'। সেবার গলা সপ্তমে।

শিল্পী—উমা রায়চৌধুরী] দিনান্ত [মুকুন্দ মজুমদারের সৌজন্যে

নবীনবাবু আর মনতোষবাবু দু'জনে মুখ তুলে চেয়েই অবাক হ'য়ে গেলেন। ঘোমটা পিঠের উপর খসে পড়েছে। বিকেলের সযত্নে বাঁধা খোপা এলিয়ে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের শিখার মতন। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। সেবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নবীনবাবু মনতোষবাবুর দিকে চাইলেন। উদ্দেশ্য তাঁর মতামতটা জানা। মেয়ের মতই কি তাঁর মত? কিন্তু মনতোষবাবুর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নবীনবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'এ রকম যে একটা হবে তা আমি আসবার আগেই আঁচ করেছিলাম মনতোষবাবু। এ সব মেয়ের বিয়ের চেষ্টা আপনার না করাই উচিত ছিলো।'

'না, মানে, ছেলে বয়সে শোক পেয়ে মাথার ঠিক নেই ওর।' কথা রীতিমত জড়িয়ে গেলো মনতোষবাবুর। এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি কোনদিন বোধ হয় হননি।

নবীনবাবু দমলেন না। আস্তে পাঞ্জাবীটা উল্টে ভিতর জামার পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করলেন। কাগজটা মুঠোর মধ্যে ধরে নাটকীয়ভাবে হাতটা নাড়লেন, 'ভেবেছিলাম পুরোনো কাসুন্দি আর ঘাঁটবো না, কিন্তু আপনার মেয়েই বাধ্য করাচ্ছে আমাকে।'

দু' এক মিনিটের স্তব্ধতা। এমন কি সেবার চোখের দীপ্তিও স্তিমিত হ'য়ে গেলো।

নবীনবাবু কাগজটা প্রসারিত ক'রে ধরলেন সেবার সামনে, 'দেখো তো বৌমা হাতের লেখাটা তোমারই তো?'

সেবা আর মনতোষবাবু দু'জনেই ঝুঁকে পড়লেন কাগজটার দিকে। বেশী নয়—লাইন কয়েক, কিন্তু সেবারই হাতের লেখা, সন্দেহ নেই।

বেশ মনে পড়লো সেবার। তার লেখা ডায়েরীর ছেঁড়া একটা পাতা। আলমারীর ওপরে কিংবা বিছানার তলায় ছিলো, হুড়োহুড়ি ক'রে আসার সময় অতটা খেয়াল হয় নি। নবীনবাবু বুঝি সংগ্রহ করেছেন সে ডায়েরীটা। এলোমেলো অনেক কথা লেখা ছিলো তাতে অবশ্য।

নবীনবাবু মনতোষবাবুর দিকে চোখ তুলে চাইলেন একবার, তারপর বললেন, 'শুনুন পড়ি।' বড়োরকমের বিবৃতি একটা পাঠ করছেন এইভাবে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে পড়ে গেলেন, 'অতীতটা যদি মুছিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে আমার জীবন হইতে এ বিবাহ আমি মুছিয়া

ফেলিতাম। অল্প বয়সে স্বামী হারানো দুর্ভাগ্য মেয়ের সংখ্যা এ দেশে কম নয়, কিন্তু তবু সারা জীবন তাহারা স্বামীর পুণ্য স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতে পারে। কিন্তু স্বামীর স্মৃতি তো দূরের কথা, স্বামীর কথা মনে হইলেই সমস্ত শরীর জ্বালা করিয়া উঠে, বিজাতীয় ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠে।' এই অবধি প'ড়েই নবীনবাবু মুখ তুলে আড়চোখে সেবার দিকে একবার চেয়ে নিলেন। ছাইয়ের মত পাংশু মুখ, থর থর ক'রে কাঁপছে শুকনো দুটো ঠোঁট, দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, ঠিক বুকেই বিঁধেছে তীর। নবীন বাবু পুলকিতই হ'লেন।

মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের অবস্থা আরো মারাত্মক। মনতোষবাবু দেয়াল ধ'রে ধ'রে কোন রকমে এগিয়ে তক্তপোষের এক কোণে গিয়ে বসে পড়লেন। সব কিছু যেন দুলছে। ক্যালেণ্ডারের পাতার সঙ্গে সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো মেয়ের মুখটাও! ওঁর চিন্তা শুধু সেবাকে নিয়ে নয়, এখনও ইলা রয়েছে যে! এ রকম একটা ব্যাপার হ'য়ে গেলে ও মেয়েকে পার করাই যে দায় হবে।

নবীনবাবু নিজের গলায় বাকি বিষটুকু মেশালেন, 'কি বউমা, কিছু তোমার বলবার আছে?'

প্রশ্নটা মেয়েকে হ'লেও তা'র খোঁচাটা মনতোষবাবুর বুকে গিয়ে বিঁধলো। নখ দিয়ে তক্তপোষের কাঠটা তিনি খুঁটতে লাগলেন। এমনি ক'রে নিজের অতীতটাও যদি খুঁটে ফেলতে, পারতেন মুখের এমনি একটা ভাব।

সেবা সোজা মুখ তুলে চাইলো নবীনবাবুর দিকে। হঠাৎ পায়ে পোকামাকড় ঠেকলে যেমন হয় চোখের ভাব, দুটি চোখে ঠিক সেই দৃষ্টি। আঁচলটা গুটিয়ে এক হাতে মুঠো ক'রে ধ'রে আস্তে আস্তে বললো, 'না বলবার কিছু নেই। তা ছাড়া আপনার এই জ্বলন্ত প্রমাণ কি আর মুখের কথায় উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? আমারও দলিল আছে। একটু বসুন, এখনি নিয়ে আসছি।

পর্দাটা সজোরে ঠেলে সেবা ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

মনতোষবাবু গলাটা শব্দ ক'রে ঝেড়ে নিলেন, তারপর খুব মিহি গলায় বললেন, 'অল্প বয়সে শোক পেয়ে মেয়ের মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে!'

'তা'ই নাকি?' নবীনবাবুর গলা কিন্তু মিহি নয়, 'কোচানো শাড়ী, ফিটফাট পোষাকে না দেখলাম শোকের চিহ্ন, না মাথা খারাপের লক্ষণ। আসল কথা কি জানেন, এ সব সহুরে মেয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়াই অন্যায় হ'য়েছে। আমার অমন শিবতুল্য ভাই—

কথা শেষ হবার আগেই পর্দাটা দুলে উঠলো। জোর পায়ে সেবা ঘরে ঢুকলো। ফিটফাট পোষাক, মনে হ'লো, এই অবসরে মুখটাও বোধ হয় মেরামত ক'রে এসেছে। এসেই তক্তপোষের পাশে বসলো প্রায় ভাশুরের গা ঘেঁষে। হাতে গোটা চারেক খাম।

'দেখুন তো এ হাতের লেখা চেনেন কি না?' সেবা একটা খাম থেকে নীলাভ কাগজ বের ক'রে নবীনবাবুর সামনে ধরলো।

নবীনবাবু ঝুঁকলেন না খুব বেশী, ঘার ফিরিয়ে একটু দেখে নিলেন। ভালো ক'রে দেখারই বা কি আছে! সমীরেরই হাতের লেখা। তেমনি গোল গোল ছাঁচ, অনেকটা মেয়েলী ঢং।

'চিঠি থেকে পড়ে শোনাবার ধৈর্য্য নেই। এ চিঠিটা 'মিনু' বলে কোন একটি বিবাহিতা মেয়ের লেখা, আর এই চিঠিটা আপনার ভাইয়ের লেখা, পোষ্ট করার অবসর পান নি। তার আগেই অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরেন। চিঠিগুলো পড়ে দেখলেই আমার ওপর তাঁর টানের বহরটা টের পাবেন। এমন কি এ চিঠিটায় বার পাঁচেক বোধ হয় আমার মৃত্যু কামনাই করা আছে।' একটু দম নিলো সেবা। একটানা এতগুলো কথা ব'লে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। এক সময়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আস্তে বললো, 'আমার ডায়েরীর যে ছেঁড়া পাতাটা পড়লেন, সেটা এ চিঠিগুলোর পরে লেখা। দেখেছেন একটুও তাল কাটতে দিই নি আমি। আপনার ভাই যে সুরে সেতার বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি ঠিক সেই সুর বজায় রেখেছি।'

আশ্চর্য্য, এই প্রথম, এমন একটা ব্যাপারে সেবার গলা কেঁপে উঠলো আর সংগে সংগে গাল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো চিঠির স্তূপের ওপর।

মানুষ

সুরুচি সেনগুপ্তা

ছেলের ব্যবহারে সুরমা দেবী ক্রমেই উত্যক্ত হ'য়ে ওঠেন। কলসীর জল ঢেলে খেলে কদিন যায় সে কথা বুঝবার বয়স তার হ'য়েছে, তবু সে অবুঝের মত সংসারের দিকে ফিরে তাকাবে না কেন? তিন মাসের ছেলে কোলে নিয়ে তিনি বিধবা হ'য়েছিলেন, স্বামী যে সামান্য সঞ্চয় রেখে গেছিলেন, সে তো কবেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার পর থেকে কত কষ্ট করে যে তিনি সংসার চালিয়ে এসেছেন, সে কথা জানেন অন্তর্য্যামী। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে বি, এ পাশ করিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, ছেলে এখন সংসারের হাল ধরবে এই আশাই তাঁর ছিল। কিন্তু আগের মতই শ্রমণ সংসারের প্রতি উদাসীন হ'য়ে থাকে, মা যে কত কষ্টে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যোগাচ্ছেন, সেদিকে ফিরেও তাকায় না। পেটে না খেয়ে কে কবে কোন মহৎ কাজ করতে পেরেছে, বি, এ পাশ ক'রেও একথা না বুঝলে আর বুঝবে কবে? দেশের যাঁরা বড় বড় নেতা, দেশের কাজ ক'রে যাঁরা চির বরেণ্য হ'য়ে আছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ধনীর সন্তান। রোজগার না ক'রে দেশ উদ্ধার করা তাঁদেরই শোভা পায়। কিন্তু যাদের পৈত্রিক বিষয় নেই, বিধবা মাকে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হয়, তাদের রোজগার না ক'রলে চ'লবে কেন? মায়ের অনুযোগ, অভিযোগ সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়, রাজনৈতিক কাজে মশগুল হয়ে থাকে শ্রমণ, অর্থোপার্জ্জনের দিকে তার এতটুকু আগ্রহ দেখা যায় না। এম, এ ক্লাসের মাইনে অনেক কষ্টে যোগার করেন সুরমা, কিন্তু ছেলে ক্লাসে যায় কিনা, সে বিষয়ে তিনি দারুণ সন্দিহান।

ছেলের অবিবেচনার জন্য একেকবার তিনি দূরে চ'লে যাবেন সঙ্কল্প করেন, দেখে নেবেন যে না খেয়ে সে কত দিন দেশের সেবা করতে পারে! কিন্তু একমাত্র সন্তানকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না, রূঢ় ভাষায় তিরস্কৃত করলেও সমস্ত দিন খেটে অনেক কষ্টে ছেলের সমস্ত অভাবই মিটিয়ে যান দিনের পর দিন। শুধু ছেলের কেন ছেলের রাজ-নৈতিক দলের অনেক ছেলের অনেক অভাবই তাঁর মেটাতে হয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সমস্ত কাজ সেরে অনেক বেলায় যখন তিনি দুটি ভাত বেড়ে নেন, তখন হয়তো পার্টির কোনো ছেলে এসে তাঁর কাছে এক গ্লাস জল খেতে চায়। ওর মুখের দিকে চেয়েই সুরমা বুঝতে পারেন যে সে কঠিন পরিশ্রম ক'রে এসেছে আর এত বেলা পর্য্যন্ত কিচ্ছুই খায় নি। শুধু এক গ্লাস জল দিতে

তাঁর মাতৃহৃদয় গ্লানি বোধ করে। নিঃশব্দে তিনি নিজের ক্ষুধার অন্ন ধ'রে দেন তার সম্মুখে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে শ্রমণকে ক্ষুৎপিপাসাতুর মায়ের অনেক কটূক্তি সহ্য করতে হয়। পার্টির ছেলেগুলি আর কোনোদিন জ্বালাতন করতে এলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবেন বলে তিনি বার বার ছেলেকে ভয় দেখান। কিন্তু পার্টির এই ছেলেগুলির আর কোনো গুণ থাক আর নাই থাক্, গভীর সহিষ্ণুতা আছে। ওরা কানে তুলো গুঁজে সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে, আর যখন যা' আহার্য্য পায়, তাও নির্ব্বিবাদে পরিপাক করে নেয়। এসব ব্যাপারে দ্রোণীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। পার্টির মধ্যে কনিষ্ঠ হয়েও এই বয়সেই সে এম, এ, পাশ করেছে। ধনীর সন্তান হয়েও দ্রোণী আজ এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল। সরকার তার পিতাকে উচ্চ পদে বহাল ক'রে 'রায় বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত করেছেন। তাঁরই ঘরে বসে তাঁরই ছেলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, এত অনাচার সহ্য ক'রবার মত ধৈর্য্য দ্রোণীর পিতার ছিল না। রাজভক্ত পিতার গৃহে তাই রাজদ্রোহী পুত্রের স্থান হয় নি। গৃহ বিতাড়িত দ্রোণীকে শ্রমণ অত্যন্ত স্নেহ ক'রত। অধিকাংশ দিনই শ্রমণের আহার্য্যের অংশ গ্রহণ ক'রে দ্রোণীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত। এই অক্লান্ত কর্ম্মী শান্ত ছেলেটিকে উপবাসী থাকতে দেখে মনে মনে ক্লেশ বোধ করলেও প্রতিদিন ছেলের আহারে ঘাটতি সুরমা সইতে পারেন না। আহার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কটূক্তিও দ্রোণীর গলাধঃকরণ করতে হয়। মায়ের অসাক্ষাতে কতদিন শ্রমণ নিজের সমস্ত আহার্য্য দ্রোণীর সম্মুখে ধরে দিয়ে নিজে উপবাসী থাকে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সুরমা সবই বুঝতে পারেন, অসহায় আক্রোশে ছট্‌ফট্ করেন তিনি, কিন্তু বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেও বোবার শত্রু নেই, এই প্রবাদবাক্য স্মরণ ক'রে শ্রমণ চুপ করে থাকে।

দুই

সেদিন অনেক রাত্রে একটা স্যুটকেস্ হাতে দ্রোণী এসে ঘরে ঢোকে। তার মুখ দেখেই বোঝা যায় যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত, তার চোখের সেই শান্ত দৃষ্টি কি একটা শংকায় চঞ্চল, অধীর। শ্রমণ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে ওকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তার দৃষ্টি দেখেই মনে হয় সে এতক্ষণ দ্রোণীর প্রতীক্ষা করছিল। চোখে চোখে তাদের কি কথা হয়, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখে সুরমা ভীত হ'য়ে পড়েন, কোনো প্রশ্ন করতে তাঁর সাহস হয় না।

'ঘরে খাবার কিছু আছে মা? দ্রোণীর বড় খিদে পেয়েছে—'

তার পার্টির ছেলেদের সম্বন্ধে এমন নির্ভীক দাবী কখনো সে মায়ের কাছে করে নি।

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে সুরমা বলেন: 'কিছু নেই, শুধু কয়েকটা কাঁচা আলু আছে।'

'একটু ঘুঁটে জ্বেলে তাই-ই সেদ্ধ ক'রে দাও, ওকে এখন কিছু খেতেই হবে।'

ছেলের এই অকুণ্ঠ আদেশে সুরমা মনে মনে জ্বলে ওঠেন: 'ওই আলু ক'টা ছাড়া কাল রান্নার আর কিছু নেই। হাতে একটি পয়সাও নেই আমার।'

'ওঃ-এই কথা! লঘু কণ্ঠস্বরে কথাটার গুরুত্ব কমিয়ে আনতে চায় শ্রমণ—'কাল না হয় নুন ভাতই খাওয়া যা'বে, একদিন নুন ভাত খাওয়া সেতো খুসীর ব্যাপার—কি বল?' মায়ের চোখের দিকে না চেয়েও মাকে শ্রমণ প্রশ্ন করে।

তিক্ত স্বরে সুরমা বলেন, "তোমার পার্টির জন্য তুমি না হয় নুন ভাত খেতে পারো, উপোস্‌ও ক'রতে পারো, কিন্তু আমি নুন ভাত গিলতে যাবো কোন্ দুঃখে? তা' ছাড়া সারাদিন খেটে পিটে এই তো সেলাই নিয়ে বসেছি, এটা শেষ ক'রে দেব, তবে কাল মুখে—'বলেই তিনি অতি বড় কটূক্তিটাকে সাম্‌লে নিলেন।

নতমুখে চুপ ক'রে থাকে শ্রমণ, দ্রোণী কি জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে, তা-ও বোঝা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে থালায় ক'রে আলুভাতে ভাত বেড়ে নিয়ে আসেন সুরমা; একখানা আসন পেতে দিয়ে দ্রোণীকে আহ্বান করা মাত্র উঠে সে নিঃসঙ্কোচে খেতে বসে। কাছে ব'সে গরমভাতে পাখা করেন সুরমা।

শেষ রাতে পুলিশ এসে দরজায় ঘা মারে। ব্যাকুল হ'য়ে সুরমা ছুটে যান ওদের ঘরে। দেখেন এর জন্য ওরা প্রস্তুত হ'য়েই আছে। জানালা দিয়ে একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে দেয় শ্রমণ, 'আর দেরী নয় দ্রোণী, শীগ্‌গীর পাশের বাড়ীর ছাদে নেমে যাও—তারপর সবই তো জানা আছে তোমার—'

'তুমি ?' ব্যাকুল হ'য়ে প্রশ্ন করে দ্রোণী।

'আমি ? দু'জনের পালানো সম্ভব নয়, আমি ওদের এখানে আটকে না রাখলে ওরা এখনই পিছু ধাওয়া ক'রবে। তাতে দু'জনেই ধরা পড়ব। অত কষ্টের জিনিষগুলো হাত ছাড়া হ'লে কষ্ট পাওয়াই শুধু সার হবে।'

'তবে তুমিই ওগুলো নিয়ে পালিয়ে যাও শ্রমণদা।' মিনতি ক'রে বলে দ্রোণী।

'এখানে যাকে পাবে, পুলিশ তাকেই অ্যারেষ্ট্ ক'রবে, এ তো জানিস্। জেলে যেতে হয় আমি রইলাম, তুই পালা দ্রোণী, আর দেরী করিস্‌নে, ওরা এসে পড়লো ব'লে।

শ্রমণের চোখের দিকে গভীর ভাবে একবার ত ক'রে দড়ি ধ'রে নেমে যায় দ্রোণী।

পুলিশ কিসের সন্ধানে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে সারা বাড়ী। তারপর শ্রমণকে প্রশ্ন করে: 'কালকে আপনারা উত্তর পাড়ায় ডাকাতি ক'রতে গেছিলেন। গহনায়, টাকায় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে এসেছেন স্যুট্‌কেস ভর্ত্তি ক'রে। সেগুলো কোথায় ?'

শ্রমণ বলে, 'ডাকাতি আমার পেশা নয়, দেখছেন তো কি দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাই, ডাকাতি করলে তো সুখেই থাক্‌তে পারতাম।'

'আপনি ডাকাতি না করলেও আপনি জানেন যে সেগুলো কোথায় আছে।'

'দেখছেন তো এখানে নেই। পৃথিবীতে কোথায় কি আছে, সে খবর রাখা কি আর কারো পক্ষে সম্ভব ?'

'দ্রোণী রায় নামে একটি ছেলের কাছে সেগুলো ছিল, আর সে সেগুলো নিয়ে এখানেই এসেছে। আপনাদের পার্টির একটি ছেলে একথা স্বীকার ক'রেছে। কোথায় গেছে সে ?'

'আমারই নাম দ্রোণী রায়। কিন্তু কাল বিকেল থেকে আমি এ ঘরের চৌকাঠও ডিঙ্গাই নি। ডাকাতি ক'রতে যাওয়া তো দূরের কথা।'

পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সুরমা, পুলিশ এ্যারেষ্ট ক'রে নিয়ে গেল শ্রমণকে। বিচারে তার তিন বৎসর কারাদণ্ড হ'ল।

সে তিন বৎসরও সুরমার কেটে গেছে। কারা-দণ্ডিত পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তাঁর সাধ্যমত তিনি চেষ্টা করেছেন। পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতি দিন তার জন্য তার প্রিয় খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন কারাগারে, মাসে দু'বার ক'রে গিয়ে দেখে এসেছেন তাকে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অনেক চেষ্টা ক'রে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কারাবাস ক'রেও শ্রমণের কোনো পরিবর্ত্তন হ'ল না। লাভ ক'রেই সে আবার তার পরিত্যক্ত কর্ম্মপন্থা আশ্রয় করে, কারাবাসী ছেলের জন্য মা যে কত টাকা ঋণ ক'রেছেন, কত কষ্ট স'য়েছেন, সে তার এতটুকু মূল্য দেয় না, মার দুঃখ দুশ্চিন্তার এতটুকু অংশ গ্রহণ করেনা।

সুরমার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সংসার যখন অচল হ'য়ে পড়েছিল, তখন শ্রমণ হঠাৎ একদিন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলো ঘরে। বউটি তাদের স্বজাতীয়ও নয়, সুন্দরীও নয়, লেখা পড়াও জানেনা, তবু সুরমা ক্ষুণ্ণ হ'লেন না। বিয়ে ক'রে ছেলে যে সংসারী হ'তে চ'লেছে, এতেই তিনি খুসী হ'য়ে উঠ্‌লেন।

এর পর সংসার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা শ্রমণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। আর কষ্ট আর কটূক্তিকে উপেক্ষা করা যত সহজ হ'য়েছিল, স্ত্রীর বেলায় তা' হল না। কিন্তু জীবনের সুযোগ সুবিধাকে একবার অবহেলা ক'রলে তারা আর ফিরে আসে না। অর্থোপার্জ্জনের যে সুযোগ সুবিধাকে এতদিন সে অবহেলা ক'রেছে, এখন মাথা কুটেও সে সুযোগ তার হস্তগত হ'ল না। অনেক চেষ্টায় সে যা' কিছু রোজগার করতে লাগল, সংসারের চাহিদা তাতে মেটে না। ক্রমে তার দু'একটি সন্তান হয়, সংসারের অশান্তি অনটন ক্রমে বেড়েই চলে; ধাপে ধাপে সংসারের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে সে।

তিন

তারপর চ'লে গেছে অনেকদিন। সন্তান পালনে অসমর্থ হ'লেও সৃষ্টিকর্ত্তা অকৃপণ হস্তে সন্তান দান ক'রেছেন, কিন্তু কার্পণ্য ক'রেছেন অর্থদানে। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সে স্ত্রী পুত্রের মুখে নিয়মিত অন্ন তুলে দিতে পারেনা, তাদের শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় তার দুঃসাধ্য। সুরমা দেবী এখন বৃদ্ধা হ'য়েছেন, কর্ম্মক্ষমতা তাঁর নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, যে ছেলেকে বড় ক'রবার জন্য, সুখী ক'রবার জন্য তিনি দেহপাত ক'রেছেন, সেই ছেলের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রমণের জীবনের যে দিক্ আজ অতীতের গর্ভে লয় হয়ে গেছে, সে জীবন ছিল ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, ভবিষ্যতের কোন্ এক কল্যাণ-সম্ভাবনায় অপেক্ষমাণ। যারা তার সঙ্গী ছিল, সেই রাজদ্রোহী ছেলেগুলির মুকুলিত জীবনের নির্ভীক অভিযান, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, অসীম সহিষ্ণুতা, বহুদিন আগে দেখা সুখস্বপ্নের মত অস্পষ্ট হ'য়ে ভেসে বেড়ায় সুরমার মনের মধ্যে। একটা ক্ষীণ আনন্দ যেন তার মনকে দোল দিয়ে যায়। যে আগল-ভাঙ্গা পাগল ছেলেগুলির আবদারে তিনি উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, তাদেরই একটু পদধ্বনি শুনবার আশায় কান পেতে থাক্‌লেও এখন তারা কেউ আসে না। পুত্রের সংসারের দারিদ্র্য-দুঃখ ছাড়াও যে ছেলে তাঁর ছিল দেশসেবার ত্যাগে মহিয়ান, তার আত্মিক অবনতিই তাঁকে আঘাত করে বেশী। দেশের কাজে সংসার-বৈরাগী ছেলের সংসারের দায়িত্ব বহন ক'রে যখন তিনি তাকে লাঞ্ছনার ছলে গৌরবান্বিত ক'রেছেন, সেদিন এই ছদ্মঅমৃতের আস্বাদ তিনি ভোগ করতে পারেন নি, স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন ক'রে সেই অমৃত আস্বাদ করেন আজ। সংসারের পীড়নে হীনতা আর নীচতার পঙ্কে তাঁর সেই ত্যাগী ছেলে কোথায় হারিয়ে গেছে, তাঁকে তিনি খুঁজে পাননা। ছেলে এখন বিয়ে ক'রে সংসারী হ'য়েছে, নাতি নাত্‌নীতে আজ ঘর ভ'রে গেছে, তিনি যা' চেয়েছিলেন, তা তো পেয়েছেন, তবু সেই দুঃখের দিনকে স্মরণ ক'রে তিনি আজ এই সুখের দিনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিগত জীবনের স্মৃতিকে শ্রমণ আজ অভিশাপ দেয়। কৈশোরে যৌবনে যখন লোকে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে, সেই দুর্লভ সময়কে সে অপব্যবহার ক'রে দিয়েছে দেশসেবার কাজে, অন্ধকার কারাগৃহে নিগ্রহ আর অত্যাচার সয়েছে সে নির্ব্বিচারে। তার পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বি, এ পাশ ক'রে পিতার সে উচ্চ রাজ-পদ সে অনায়াসে দাবী ক'রতে পারত, তার দাবীপূরণ হ'ত, এ আশ্বাসও সে পেয়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদী শাসকের সে অনুগ্রহকে সে ঘৃণা ক'রে উপেক্ষা ক'রেছে। অবহেলিত ও অপচয়িত কৈশোর আর যৌবনের জন্য আজ সে অনুতাপ করে। অত্যধিক পরিশ্রম ও কারাবাসে নিজের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে সে অব-হেলায় ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে, সংগ্রামের পথ রচনা করেছে দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে। কিন্তু বিনিময়ে সে পেয়েছে কি? জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণকে অপব্যয় ক'রে জীবনের সায়াহ্ন বেলায় সে আজ রিক্ত, নিরালম্ব। তার তপঃপূত জীবন আজ অর্থকৃচ্ছ্রতায় পশুত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে।

কিছুদিন আগেই খবরের কাগজে খবর পাওয়া গেছে যে, রাজদ্রোহিতার অপরাধে দ্রৌণীর প্রতি গুরুতর রাজ-দণ্ডের আদেশ হ'য়েছে, কিন্তু একজন প্রহরীকে হত্যা ক'রে দ্রৌণী নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। সম্প্রতি রাজদ্রোহী হত্যাকারী দ্রৌণীর অনুসন্ধানকারীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে সরকার সংবাদপত্রের মারফৎ এক ঘোষণাপত্র প্রচার ক'রেছেন।

সুরমা উদ্বিগ্ন মুখে বলেন, 'কেন যে তার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল শ্রমণ, তার বাপের মৃত্যুতে সে তো প্রচুর টাকা পয়সা পেয়েছিল, কি অভাব ছিল তার, কিসের জন্য এমন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল সে?'

শ্রমণ হেসে বলে, 'যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে কি আর বিপদ বুঝে পড়ে মা? ঝাঁপিয়ে পড়াটাই তখন তার আনন্দ!'

সেদিন তিমির-স্তব্ধ-আর্দ্র রজনী। বাইরে মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের মত ঝুর্ ঝুর্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে। চাপা-কণ্ঠে একেকবার মেঘ ডেকে উঠ্‌ছে।

সুরমার বন্ধ দরজার কড়া ন'ড়ে ওঠে, সন্তর্পণে, খুব সতর্কভাবে। অস্ফুট কণ্ঠের একটু শব্দ শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তিনি দরোজা খুলে দেন। ঘরে ঢোকে দ্রৌণী।

সুরমা প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারেন না। চাপা স্বরে বলেন, 'দ্রৌণী তুই, তুই দ্রৌণী ; কোথা থেকে এলি বাবা ?'

বলেই তিনি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন। 'তুই যে কাঁপছিস্ দ্রৌণী, ভিজে যে 'কাক ভেজা' হ'য়ে গেছিস্ ধন, বোস্, বোস্, এই বিছানার উপর। সোনার জীবন তোর, এ লাঞ্ছনা কেন বাবা ?'

ব'লেই তিনি ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলেন। সুরমার পায়ের ধুলো নিয়ে দ্রৌণী ব'সে পড়ে, জিভ্ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, সব কথা জানো তো মা ? আগে কিছু খেতে দাও, আজ সাতদিন শুধু জল খেয়ে পথে বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

হাঁড়িতে পান্তা ভাত ছিল, নুন্ লঙ্কা দিয়ে তাই বেড়ে তার সম্মুখে ধ'রে দিয়ে একখানা তোয়ালে দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে সুরমা বলেন, 'ভিজে কাপড় ছেড়ে শুক্‌নো কাপড়খানা পরে খেতে বোস্ বাবা।'

খেতে খেতে দ্রৌণী হেসে বলে, 'মনে পড়ে মা, আগেও কতদিন তোমার ঘরে যখন যা পেয়েছি, এম্‌নি ক'রে কেড়ে খেয়ে গেছি।'

সুরমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

গোগ্রাসে গিল্‌তে গিল্‌তে দ্রৌণী বলে, 'যখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কারো আশ্রয়ে যেতেই সাহস পাইনি, আমার বড়দি, মেজদির কাছে না, ছোট বোনের কাছেও নয়। মাসীমা, পিসিমা কারো আশ্রয়েই যেতে পার্‌লাম না, তখন হঠাৎ মনে হ'ল তোমার কথা। মনে হ'ল তোমার কোল ছাড়া জগতে নিরাপদ আশ্রয় আমার আর কোথাও নেই। এলেই পেট ভরে খেতে পাব, ভেবেই ছুটে এসেছি।'

'ওরে পাগলা ছেলে, লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা ছাড়া এ পাষাণী মায়ের কাছে তুই কবে কি পেয়েছিস্ যে, আজ সারা জগতের মধ্যে আশ্রয়ের আশায় তুই তারই কাছে ছুটে এসেছিস্ ? ক্ষুধার সময় এই দুঃখিনী মায়ের কাছ থেকে তুই কতদিন শুষ্ক মুখে ফিরে গেছিস্, এক গ্রাস অন্নও তো সে তোর মুখে তুলে দিতে পারেনি ; তবে আজ কিসের ভরসায় সেই অভাগিনী মায়ের কাছেই তুই আশ্রয় নিতে এসেছিস্ ?'

এক হাতে চোখের জল মুছে অন্যহাতে সুরমা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।

'শ্রমণকে ডাক্‌ব দ্রৌণি ?'

'না, থাক্, সকালেই দেখা হবে, এত রাতে আর তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নেই।'

খেয়ে উঠে সুরমার জীর্ণ মলিন বিছানায় শুয়ে অনেক দিন পর দ্রৌণী আজ নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর সতর্ক প্রহরীর মত বাইরে কান পেতে ব'সে থাকেন সুরমা।

সকালবেলা দ্রৌণীকে দেখে চোখ কপালে তুলে শ্রমণ বলে, 'সর্ব্বনাশ করেছিস্ দ্রৌণী, কী দুঃসাহস তোর, নিজেও মর্‌বি, আমাদেরও মার্‌বি।'

দ্রৌণী হাসে, 'না, না, কেউ মর্‌ব না, তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই শ্রমণদা ! তোমরা কেউ আমার নাম ধরে ডেকো না। আমি মা'র এই কোণের ঘরের অধিকতর কোণে দিন-দুই লুকিয়ে থেকে, খেয়ে ঘুমিয়ে একটু চাঙ্গা হ'য়েই চম্পট দেব। কিন্তু পার্টির খবর কি শ্রমণদা ?'

মুখ বিকৃত করে শ্রমণ—"কিছুই জানিনে, আমার পার্টি এখন এই এরাই—" বলে হাত বাড়িয়ে ছেলেমেয়ে-গুলিকে সে দেখিয়ে দেয়।

সন্তর্পণে একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রৌণী বলে, 'এই দশটা টাকা রাখো শ্রমণদা, মাছ মাংস আনো ; বৌদি, বেশ ভালো ক'রে রাঁধো। মা, তোমার ঘরের নিরামিষ ঝালের ঝোল শাক ঘণ্টও চাই। আগের দিনের মত আজ গুল্‌জার ক'রে খাওয়া যাবে। কিন্তু ওকি, রবিবার দিন আজ জামা জুতো পরে কোথায় বেরোচ্ছ শ্রমণদা ? এসো, ব'সে গল্পগুজব করা যাক্ অনেকদিন পর।'

শ্রমণ বলে, 'বাইরে একটু কাজ আছে, যাবো আর আসব। না গেলেই নয়।'

শ্রমণ রাস্তায় পা দিয়েই থমকিয়ে দাঁড়ায়, পেছন থেকে ডাক দিয়েছেন সুরমা।

'শুভ কাজে বেরোচ্ছি, দিলেতো পেছু ডাক—' শ্রমণ বিরক্ত হয়।

'মা ডাকলে বরং শুভ হয়। কিন্তু শুভ কাজটা কি তোমার শুনি?'

মায়ের দৃষ্টি ও কণ্ঠের তীক্ষ্ণতায় শ্রমণ মাথা তুলতে পারে না।

'শ্রমণ?'

সে গভীর কণ্ঠস্বর যেন শ্রমণের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ ক'রে দেয়। পলকের জন্যও সে মায়ের চোখের দিকে চাইতে পারেনা।

সুরমা দেবী বলেন: 'জীবনে অনেক দুঃখ দিয়েছিস্ শ্রমণ, তবু একটা গৌরবে আমার বুক ভ'রে ছিল যে, যাকে আমি গর্ভে ধরেছি, নিজের সুখ তুচ্ছ ক'রে দেশের জন্য সে আত্মত্যাগে উদ্যত হয়েছে। এই আনন্দ মিশ্রিত গর্ব্বে আমি ছিলাম গরীয়সী। কিন্তু তিল্ তিল্ ক'রে আমার সে গৌরবকে তুই ধ্বংস ক'রেছিস্। আর আজ? এত হীন তুই শ্রমণ, এত নীচ? আঁতুড় ঘরে তোকে কেন আমি নুন খাইয়ে মেরে ফেলিনি, সেই অনুতাপে আজ আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে।'

শ্রমণের দৃষ্টি কঠিন হয়ে আসে, রূঢ়স্বরে বলে, 'কি অপরাধ আমার শুনি? এতে আর এমন কি অন্যায় হবে? শেয়াল কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আজ হোক কাল হোক্, ধরা পড়বেই, তখন ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে। এই সুযোগে আমি যদি কয়েকটা টাকা পাই, তাতে কি এমন ক্ষতি হবে? ছেলে মেয়ে গুলোকে একটু ভালো ভাবে মানুষ করতে পারব, দেখছ তো সংসারের অবস্থা!'

সুরমা কঠিন কণ্ঠে বলে, 'না খেয়ে যদি তোদের সব শুদ্ধ ম'রেও যেতে হয়, টাকার অভাবে বাসি মড়াও হ'তে হয়, তবু তোকে এ হীন কাজ আমি করতে দেব না। এ-কথা কি ক'রে তোর মনে এলো, কি করে তুই উচ্চারণ করলি শ্রমণ? এত অবনতি হ'য়েছে তোর? ভগবান—' কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসে।

ছেলের হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে এসে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দেন তিনি। সমস্ত দিন সতর্ক হ'য়ে থাকেন, গোপনে মোছেন চোখের জল।

রাত্রে নিদ্রিত দ্রোণীকে ঠেলে জাগিয়ে দেন তিনি। চোখ রগড়িয়ে দ্রোণী বলে, 'কি হয়েছে মা? তুমি এখনও ঘুমোওনি?'

সুরমা কেঁদে বলেন, 'এখনই তুই এখান থেকে চ'লে যা দ্রোণী, চ'লে যা। বড় আশা ক'রে পাষাণী মায়ের কাছে ছুটে এসেছিলি একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য, কিন্তু তোর মা যে কত বড় নিরুপায়, সেতো তুই জানিস্‌নে বাবা! আর একদণ্ডও তুই এখানে থাকিস্‌নে ধন,—

বিহ্বল ভাবে দ্রোণী বলে, 'কি হ'য়েছে মা? পুলিশ—'

'না বাবা, পুলিশ নয়। কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞেস্ করিস্‌নে দ্রোণী, শুধু এই কথাটা মনে রাখিস্ যে কখনো তুই এই দুর্ভাগিণী মায়ের কাছে আসিস্‌নে। কখ্‌খনো না।'

মায়ের চোখের দিকে একবার গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে দ্রোণী তাঁর পায়ের ধুলো তুলে নেয়। তারপর বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদেন সুরমা। কাকে হারিয়ে তিনি কাঁদলেন? শ্রমণকে হারিয়ে? না দ্রোণীকে হারিয়ে?
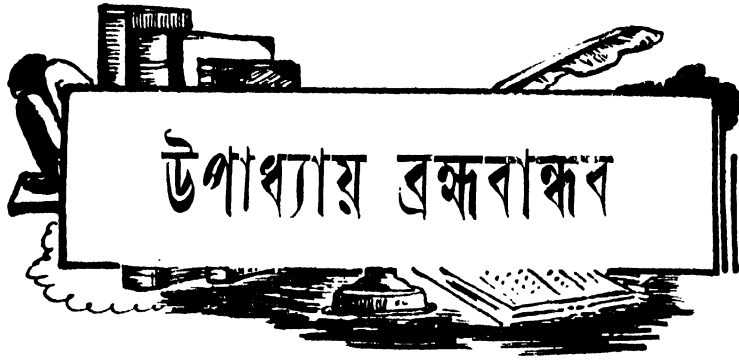
শ্রীকুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত

গত শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে দেশের মুক্তি সাধনায় দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্রহ্মবান্ধব। ইঁহার মনীষা, প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, রচনাকুশলতা এবং বাগ্মীতা অনন্যসাধারণ ছিল, বাস্তবিকই ইনি যখন বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, তখন বাংলাদেশে কয়েকটি প্রবল আন্দোলন চলছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষিত সমাজে একটা রাষ্ট্রচেতনার সঞ্চার হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শেই হোক কিংবা ঐতিহাসিক পরিবেশের ফলেই হোক, তরুণ শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে জাতীয়তার একটা আবেগ চাঞ্চল্য এনেছিল। আমরা পৃথিবীর সভ্যজাতদের সমতালে পা ফেলবো—এই ছিল লক্ষ্য। মগ ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে, মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে অরাজক উচ্ছৃঙ্খল শাসনের পীড়নে আর বর্গীর লুণ্ঠনে সাধারণ বাংলার নর-নারীর প্রাণটা আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। জাতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। মনুষ্যত্বের লাঘবে যে নৈতিক অবনতি ঘটে—তা পুরোমাত্রায় এসেছিল। তাই তৃতীয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে তার পক্ষপুটে তখন অস্তিত্ব বজায় রাখবার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। এতদুর সেই সময় আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে, দলাদলি, ইতর দুরভিসন্ধি, ঘোর স্বার্থান্ধতায় পদে পদে নেতারা মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব ও নষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে মসীলিপ্ত ও কলঙ্কিত করতে তাঁরা একটুও ইতস্ততঃ তখন করেননি। অতীতের সেই বিষবৃক্ষের বীজগুলি এখন ফলে ফুলে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। আজ ভারত স্বাধীন হয়েও আমরা তার ফলভোগ করছি না। বড় দুঃখেই মহাকবি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলা নাটকে 'করিম চাচার' মুখে এই আক্ষেপ করেছিলেন "বঙ্গভূমিরূপ সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান, সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ। এ বাংলায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন—তিনি বিধাতা পুরুষ। বাংলা ফিরে গড়তে হবে, পুরাণো বাংলায় চলবে না।"

সেই দুর্দ্দিনের কিছুকাল পরে রাজা রামমোহন বাংলা দেশে আবির্ভূত হয়ে এক বিরাট ঐক্যমন্ত্রের প্রচার করেন। তাঁর সাধনায় বাংলার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়েছিল। তৎকালে অনেক ত্যাগী মনীষী ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে, সামাজিক জীবনে বিপ্লবের তরঙ্গ তুলেছিলেন। সেই তরঙ্গ গত শতাব্দীর শেষ পাদে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ব্যাপদেশে কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে

দেশকে সেইভাবে গড়তে চেয়েছিলেন—পাদরী কেরী মার্শিম্যান ডফ প্রভৃতির প্রেরণা ও শিক্ষার ফলে। ডিরোজিওর প্রভাবে যুক্তিবাদী ইয়ং বেঙ্গলের দল ভারতের ধর্ম্মসমাজকে ভেঙ্গে পুরোমাত্রায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গড়বার প্রয়াস পান। রামমোহনের প্রভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সমাজ সংস্কারে ও শিক্ষা প্রচারে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তৎকালে অগ্রণী হয়েছিলেন, হেয়ার সাহেব, বেথুন সাহেব প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ সদাশয় মনীষীরা এই আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ ও শশধর তর্কচুড়ামণি এবং কর্ণেল অলকট পরিচালিত থিওযোফি সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রাণরসকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করে প্রতিভা গৌরবে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত ও প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। এই সব সৌর গ্রহের পার্শ্বে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও স্মরণীয় মনীষীরা বাংলার সেই যুগকে প্রদীপ্ত ও মহিমান্বিত করেছিলেন। এই সব সম্মিলিত ধারায় বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে তরুণ হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে একটা দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে এঁদের প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মবান্ধব সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে ও তাঁর উপদেশ শুনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। পরবর্ত্তী জীবনেও তাঁর স্বরাজ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সোনার বাংলায় সোণার গৌরাঙ্গের পর এমন সোণার চাঁদ আর জন্মগ্রহণ করে নাই।"

ব্রহ্মবান্ধবের মুখে শুনেছি যে, তরুণ বয়সে তিনি দু দু বার সামরিক শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য এই সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে আমার পরিচয় সৌভাগ্য ঘটে—স্বর্গীয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভবনে। ঈশ্বরগুপ্তের সহোদর ভ্রাতার দৌহিত্রেরা সেই বাড়ীতে বাস করতেন। কবির দৌহিত্র স্বর্গত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত পরমহংস দেবের শিষ্য ও পরম ভক্ত ছিলেন। মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁদের বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। একদিন মণীন্দ্রবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেন। তাঁহাকে তখন দেখলাম রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী—পিতৃদত্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ত্যাগ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম ধারণ করেছেন। কেশব বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেন হীরানন্দের সঙ্গে কারাচীতে যান—ব্রহ্মবান্ধব নন্দবাবুর সঙ্গী ছিলেন। Vaswani বাল্যকালে এঁদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধব প্রথমে Anglican সম্প্রদায়ে খৃষ্টান হন—পরে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী শোফিয়া কাগজ তথায় সম্পাদনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদ করিয়া জগতকে বিস্ময়ে আপ্লুত করেন—যখন কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী খৃষ্টান জগতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব পতাকা উড্ডীন করে এক প্রবল ধর্ম্ম তরঙ্গের আন্দোলন তুললেন—তখন তাহার তরঙ্গে সমগ্র ভারতও আন্দোলিত হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিলেন এবং তাঁহাদের সেই পরিচয় হয় ব্রাহ্মসমাজে। কিন্তু বন্ধুর গৌরবে গর্ব্ব বোধ করলেও খৃষ্টান ব্রহ্মবান্ধব "শোফিয়া"তে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম যে বেদান্ত অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি শোফিয়া পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শোফিয়ার কয়েকটী সংখ্যা তিনি মণীন্দ্রকৃষ্ণকে উপহার দিতে এসেছিলেন এবং নিজে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে ঘোর তর্কবিতর্ক করতে লাগলেন। আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম। আমার তখন ১৯ বৎসর বয়স। দার্শনিক তত্ত্ব বিচার নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা চলছিল—তাতে তাঁর সংস্কৃত শাস্ত্রে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন আমি বালক এবং তিনি প্রায় ৩৩।৩৪ বৎসরের যুবক। হিন্দু ধর্ম্মের সমর্থনে তবুও আমি সেই তর্কে যোগ দিয়েছিলাম। শাস্ত্রাদি বিষয়ে আমার তখন অ

কি জ্ঞান ছিল—শুধু আমার বালচপলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তখন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি এবং তাঁর উপদেশ যে সত্য উপলব্ধির সহায় এটি তিনি দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এর পরেও তিনি দুই-একবার ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ীতে মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বেশ জমে উঠেছিল। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় পুরুষ গেরুয়া বসনে, তাঁর তেজপুঞ্জ-মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, সহাস্যবদন আর অমায়িক ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, তিনি নিরামিষাহারী এবং পাদুকা ব্যবহার করেন না। দেখলাম তিনি নগ্নপদেই এসেছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বাংলাদেশে ফিরে এসে আলমবাজার মঠে অবস্থিতি করছিলেন—তখন মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমিও স্বামিজীর কাছে গিয়েছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে মণীন্দ্রবাবু বললেন, "স্বামিজী, ভবানীদা (ব্রহ্মবান্ধব) একেবারে বদ্‌লে গেছেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়ে 'শোফিয়া' বলে একটা সিন্ধু দেশ থেকে কাগজ বের কচ্ছেন। আপনাকে খুব আক্রমণ করে খৃষ্টান ধর্ম্মকে বৈদান্তিক তত্ত্বের উপর স্থাপিত বলে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মত এমন উল্টে গেল?" স্বামিজী হেসে বললেন, "কে ভবানী—ও আবার কিছুদিন পরে ঘোর বেদান্তী হয়ে হিন্দু ধর্ম্মের কথা বলবে। ওর জন্য কিছু ভাবতে হবে না। ও সরল খাঁটী লোক। মাঝে মাঝে একটু ঘুরপাক অনেকেই খায়। ওর খৃষ্টানী ঝোঁক সাময়িক। ব্রহ্মবান্ধবের সম্বন্ধে স্বামিজীর এই উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল, প্রমাণ—উপাধ্যায় মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাজ সিন্ধুদেশে তখন জমেনি, কারণ তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের পাদরীরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদে খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্বব্যাখ্যান চান না। রেবাচাঁদ প্রমুখ দুই একজন সিন্ধী যুবককে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তাঁহারাও ব্রহ্মবান্ধবকে গুরুপদে বরণ করে ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। রেবাচাঁদের সন্ন্যাস নাম অনিমানন্দ। ইনি ব্রহ্মবান্ধবের উপদেশ মত বালকদের শিক্ষাকার্য্যে আজীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথমে Boy's Own School মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে খোলা হয়, পরে হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে তা উঠে যায়। মণীন্দ্রবাবুর ছেলেরাও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালী এদেশের বালক-বালিকাদের উপযোগী নয়—ইহাই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের বিশ্বাস। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সহিত এই বিষয় নিয়ে তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। কবি ব্রহ্মবান্ধবের গভীর পাণ্ডিত্য, সর্ব্বতোমুখী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতা এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি দেখে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মবান্ধব কবির একান্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির চেয়ে কম নয়, তা তিনি প্রকাশ্যে বলতেন এবং প্রবন্ধেও লিখেছিলেন। এই দুই মণীষীর সম্মিলনে বোলপুর শান্তি নিকেতনে "ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব Boy's own school-এর ছাত্রবৃন্দসহ অনিমানন্দকে তথায় প্রেরণ করেন। কবি ও ব্রহ্মবান্ধব তথায় অধ্যাপনার কার্য্যে যোগদান করতেন। ব্রহ্মবান্ধবের তখন সাহায্য না পেলে কবির এ শিক্ষাকল্পনা রূপায়িত হোত কি না—তা বলা কঠিন। কবির প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় উভয়ের সহযোগেই গড়িয়া উঠে।

দুঃখের বিষয়, আজ শান্তিনিকেতন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হচ্চে, তাতে শুধু কবির জয়ধ্বনি শোনা যাচ্চে। তা হোক এবং তা হওয়া উচিতও বটে—কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের সহায়তা, সহযোগিতা ও পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে এর গোড়াপত্তন—তা একেবারে ভুলে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? হোতে পারে পরে কবির আদর্শ ও পরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতি—ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ঠিক মিশ খায় নি, কিম্বা নানা কারণে তাঁদের এই মিলন চিরস্থায়ী হয় নি—এইরূপ বহু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব যে শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রবৃন্দ ও শিষ্য শিক্ষককে নিয়ে গোড়াপত্তন করেছিলেন—এটা ধ্রুব সত্য। এমন কি তিনি আমাকে সেই সময়ে বলেছিলেন, "বড় একটা সু খবর আছে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। ছাত্রেরা পল্লবগ্রাহী আর

তোতা পাখীর মত বড় বড় কথা আবৃত্তি করতে পারে, কিন্তু চরিত্র গঠন ও স্বাবলম্বন শিক্ষা হয় না। ব্রহ্মচর্য্য যে ছাত্রদের শিক্ষার বিষয় তা বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে না। আমাদের দেশের আদর্শ তো তা নয়। সু-খবর বলছি, স্বয়ং রবিবাবুকে এই কাজে নামিয়েছি। তিনি বোলপুরে থেকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম পরিচালনা করবেন আর খরচ-পত্র সব নিজেই বহন করবেন। প্রথম আমাদের আলাপ-আলোচনায় কি ভাবে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন করলে ভাল হয় তা ঠিক হল। রবিবাবু এই বিষয়ে পূর্ব্বেই ভাবছিলেন এবং কি ভাবে কার্য্যে পরিণত হোতে পারে তা চিন্তা করছিলেন। আমি দেখলাম—তাঁর ক্ষমতা সব দিকে আছে। আমাদের কিছু করতে গেলে নানা দিকে নানা বিঘ্ন আর অভাব এসে জোটে—তা দূর করতে করতে আসল কাজ করবার সামর্থ্য থাকে না। রবিবাবুর পক্ষে সে অন্তরায় নেই,—বোলপুরে মহর্ষির তপস্যাপূত স্থান। চারদিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও খোলা মাঠে ছেলেদের মন আনন্দে ভরে উঠবে। রবিবাবুও ঘরের মধ্যে ছাত্রদের আটক রেখে ক্লাস করতে চান না।—তপোবনের মত গাছের তলায় শিক্ষক ও ছাত্র বসে পড়াবে ও পড়বে। শুনতে কবিত্ব আছে কিন্তু দেখলে পরে বুঝতে পারা যায় তাঁর এই শিক্ষাদানের কল্পনা ছাত্র ও শিক্ষকদের মনে সহজ ভাবে কি প্রভাব বিস্তার করছে! ক্লাসের বিভীষিকা নেই, কিন্তু উল্লাস আছে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রাণের একটা সহজ টান আছে। আপনি একবার দেখতে যাবেন। আমার মনে হয়, কলকাতার শিক্ষাব্রতীরা দলে দলে গেলে একটা নূতন আদর্শ পাবে।" ব্রহ্মবান্ধবের কয়েকবার অনুরোধেই পরে আমি বোলপুরে গিয়েছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা এখানে বললে শুধু অপ্রাসঙ্গিক হবে না, শুধু শুধু কথা বেড়ে যাবে। পরে সে প্রসঙ্গের স্মৃতিকথা লিখব। আজ শান্তিনিকেতনের প্রভাব দেশদেশান্তরে বিস্তার লাভ ক'রেছে, দলে দলে বিদেশী ও দেশী মনীষীরা দেখতে বোলপুরে যান। কবির তিরোধানে শান্তি নিকেতন জগতে একটী তীর্থরূপে পরিণত হয়েছে। কবির আজীবনের সাধনা ও কল্পনা তাঁর শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বভারতীতে রূপায়িত হয়েছে—এটা আমাদের জাতীয় গর্ব্বের কথা!

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৬ সালের ফাল্গুনের বিচিত্রায় "বিশ্ব ভারতী" সম্বন্ধে ব'লেছিলেন, "যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটী লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্চে ও পথ নির্দ্দেশ করচে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ভাবে এই শিক্ষা-দীক্ষার অন্য দশ রকম প্রয়োজনীয় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড় হয়ে উঠল।

"জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোন একটা আদর্শ আছে—যা কেবল পেট ভরাবার জন্য না, টাকা করবার জন্য না, এ কথা যদি না মানি তা হ'লে নিতান্ত ছোট হয়ে যাই।

"এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথম বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্চে বাইরের নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষোভ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই জন্য এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটী সব চেয়ে বড় ছিল সে হচ্চে বিশ্ব-প্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।"

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার বিরাট পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। তবে ব্রহ্মবান্ধবের মত মনস্বীর সাহচর্য্য, পরামর্শ ও বিশেষ সহায়তা যে একে কার্য্যে পরিণত করেছিল—সেটাও সত্যি কথা। মণীন্দ্র গুপ্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বর্ত্তমান কারমাইকেল কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। আমরা তাকে "গোরা" বলে ডাকতাম। ব্রহ্মবান্ধব ও রবিবাবুও তাকে এই নামেই ডাকতেন। গৌরগোবিন্দ তার ভাইদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনে ছাত্র ছিলেন। রেবাচাঁদ বা অণিমানন্দ যে কয়েকটী ছাত্র নিয়ে এই শিক্ষামন্দিরে যোগদান করেন—গোরা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সূত্রে জানি, তিনি রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাব্রতে একজন প্রধান ব্রতী ছিলেন। তৎকালে তিনি এই কাজে তাঁর দেহ মন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এইরূপ পূর্ণ সহযোগিতা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ছিল।

১৯০২ সালের ৫ই জুলাই বোলপুর শান্তিনিকেতন হতে যখন ব্রহ্মবান্ধব হাবড়া ষ্টেশনে পৌছলেন, তখন ষ্টেশনেই শুনতে পেলেন যে গত কল্য রাত্রিতে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছেন। কালবিলম্ব না করে তিনি তৎক্ষণাৎ বেলুড় মঠে ছুটলেন। বেলুড়মঠে স্বামিজীর গতায়ু দেহের প্রতি সকলে সজল নয়নে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। পুষ্পহারে সজ্জিত স্বামিজীর গত-প্রাণ দেহের দিকে চেয়ে ব্রহ্মবান্ধব গভীর চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। শোকাহত ব্যথিত অন্তরে স্বামিজীর প্রেরণা তিনি অনুভব করলেন। কে যেন তাঁর অন্তস্থল হতে বল্‌লে "এই ব্রত গ্রহণ কর। বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয় ব্রত। তোমার যা কিছু শক্তি আছে তাই দিয়ে এই কাজে লেগে যাও।" স্বামিজীর চিতাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ডে যাবেন স্থির করলেন। এই দৃঢ় সংকল্প সাধন করবার জন্য উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তিন মাস পরে ৫ই অক্টোবর মাত্র ২৭৲ টাকা সম্বল নিয়ে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করলেন। নিঃস্ব ত্যাগী নির্ভিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব ভবিষ্যতের খরচপত্রের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেন না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলে-ছিলেন "আমি স্বামিজীর চিতাপার্শ্বে দৈববাণী শুনতে পেয়েছিলাম-পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করতে হবে। স্বামিজীর কায চালু করতে হবে। তাই যাবার খরচ বাদে ২৭৲ টাকা যথেষ্ট মনে করলেম। যে বাণীর উপর নির্ভর করে যাচ্চি—সেই বাণীই আমাকে চালাবেন।" ব্রহ্মবান্ধব এক মাস পরে ৫ই নভেম্বর ইংলণ্ডে অক্সফোর্ডে উপস্থিত হলেন। তখনও সেখানে কলেজগুলি খোলা ছিল--১৩ই নভেম্বর বন্ধ হবে। তিনি বিলম্ব না করে—সেখানে নিম্নলিখিত চারটী বক্তৃতা দেন। Hindu theism বা হিন্দুর ঈশ্বরতত্ত্ব, Hindu Ethics বা হিন্দুর নীতিবাদ, Hindu Sociology অর্থাৎ হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান এবং Hindu Thought and the Western Culture (হিন্দুর চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি)। তাঁর বক্তৃতা শুনে Joseph Rickaby মত প্রকাশ করলেন, "I was particularly struck with the thorough understanding he showed of the philosophies current in Oxford." শীত প্রধান বিলাতে কঠোর তপস্বী ব্রহ্মবান্ধবের পরিচ্ছদ দেখেও তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "In Oxford he suffered from insufficient clothing and poverty." প্রথম তিনটী বক্তৃতায় ডাঃ কেয়ার্ড সভাপতি ছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজে উপাধ্যায় মশায় তিনটি বক্তৃতা করেছিলেন—নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, হিন্দু ধর্ম্মনীতি, এবং হিন্দু ভক্তিযোগ। কেম্‌ব্রিজের বক্তৃতায় ডাঃ মেটাগার্প সভাপতি ছিলেন। সকলেই তাঁর বক্তৃতায় গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাশীলতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ওজস্বিনী ভাষা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি Review of Reviews-এর ষ্টেড সাহেব তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু দর্শন ও ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে তাঁর সম্পাদিত কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আলাপ আলোচনা করবার জন্য ষ্টেড সাহেব তাঁর বাড়ীতে ব্রহ্মবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব শোনবার জন্য কেম্‌ব্রিজ Trinity College-এ আবার উপাধ্যায় মশায় অনুরুদ্ধ হলেন। তিনি পুনরায় সেখানে হিন্দু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা

করলেন। তাঁর এই বক্তৃতার ফলে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শন শিখাবার জন্য একজন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার প্রস্তাব হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হন, এটি ব্রহ্মবান্ধবের অসামান্য কৃতীত্বের পরিচয় ব'লতে হবে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ব্রহ্মবান্ধবের উপর অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করেন।

প্রস্তাবটী হয়েছিল এই রকম—হিন্দুদর্শনের অধ্যাপককে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বেতন দেওয়া হবে না। তিনি যে সব ছাত্রকে তাঁর অধ্যাপনায় আকর্ষণ করবেন, তাহারা যে বেতন দিবে তা নিয়ে তাঁকে চলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অনুগ্রহ করে বিনা বেতনের সর্ত্তে হিন্দুদর্শনের অধ্যাপকের জন্য একটি আসন নির্দ্ধারিত রাখবেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত থেকে ফিরে এলে এই 'নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি স্বর্গত ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীলকেও এই বিষয়ে অনুরোধ করেন। "ইণ্ডিয়ান নেশন" সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ ঘোষ মশায়ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্টে তাঁর কাগজে এই সংবাদটী প্রচার করেছিলেন। তিনি ঐ সম্বন্ধে এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন: "ব্রহ্মবান্ধবের যত্নে এই বন্দোবস্ত হয়েছে এবং তাঁরই উপর নির্ব্বাচনের ভার পড়েছে।" ব্রহ্মবান্ধব বহু চেষ্টা করেও এই বিষয়ে কৃত-কার্য্য হতে পারেন নি। বোধ হয় অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর ক'রে যেতে কেহ সাহস করেন নি। ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ডে যদি তাঁর বক্তৃতার প্রভাবে ষ্টেডসাহেব প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটা ফণ্ড তোলবার জন্য কোন কমিটি গঠন করতে পারতেন এবং তার আয় থেকে একজনের স্বচ্ছলভাবে চলবার মত টাকা উঠত, তবে বোধ হয় তাঁর এই চেষ্টা ফলবতী হত। ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদকের মতে ইউরোপীয় ভাবে শিক্ষিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি অল্প। ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ম'শায় তখন কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ—সে কাজ ফেলে বিলাতে বক্তৃতা করবার জন্যও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলনা।

ব্রহ্মবান্ধব কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বক্তৃতায় অনেককে মুগ্ধ করতে পারলেও সেখানে স্থায়ী ভাবে কোন প্রভাব রেখে আসতে পারেন নি। তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই চলে এলেন। বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত ফিরিঙ্গি বিজয় করবার যে উদ্দীপনা ও প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর চিতাপার্শ্বে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর অন্তস্থলে যে বাণী শুনেছিলেন—যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পাশ্চাত্য দেশে অকস্মাৎ চলে গেলেন—কয়েকমাস পরেই তাঁর সে প্রেরণা—উদ্দীপনা কোথায় চলে গেল? পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিনি ভারতের পরাধীনতা, দুঃখ, দুর্দ্দশা, দৈন্য আর বিদেশীদের ভারত সংস্কৃতির উপর অবজ্ঞা দেখে তাঁর প্রাণে অন্য ভাব জেগে উঠল। ফিরিঙ্গি-বিজয় অন্য আকারে দেখা দিল। তিনি পাশ্চাত্যদেশে রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে গণশিক্ষা গণজাগরণ দেখে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন দেশে গিয়ে গণজাগরণের কাজ করতে হবে। গণজাগরণ না হলে, সাধারণের ভিতর আন্দোলন না চালাতে পারলে আমরা ফিরিঙ্গ-বিজয় করতে পারব না। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যে কাজ করে সফল হওয়া যাবে না। ইংরাজকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে হবে—দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এই দাসত্ব শৃঙ্খল না ভাঙ্গতে পারলে কোনও কার্য্যই হবে না। স্বাধীনজাত না হলে পাশ্চাত্যজাত আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্কৃতিকে কৃপার চক্ষে দেখবে, তখন এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এই উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস নিয়ে বুকে অগ্নিময়ী জ্বালা ধারণ করে ব্রহ্মবান্ধব অল্প দিনের মধ্যেই ভারতে ফিরে এলেন। বিলাত থেকে ফেরবার পথে বোম্বেতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বোম্বের প্রবাসী বাঙালীদের কয়েক জন তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসেন। তখন দেখলাম তাঁর ধর্ম্মমত বদলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়—দেশের জনসাধারণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করবার তাঁর বিশেষ ব্যাকুলতা আর আগ্রহ। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে বল্লেন—"দেখলাম ওদেশে কুলি মজুরেরা Cabman পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে—তারা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বেশ জানে, কিন্তু আমাদের দেশের জন-সাধারণেরা একেবারে মূর্খ অজ্ঞ। কোন রকমে পেট ভরলেই হল। যেন প্রাণহীন যন্ত্রবৎ তারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে। এবার আমার উদ্দেশ্য এদের জাগিয়ে

তুলতে হবে। ওদের ভাষায় লিখে ওদের খবরের কাগজ পড়াতে হবে —ওদের ভাবে খবর বলতে হবে—দেশ সম্বন্ধে ওদের ওয়াকিবহাল করতে হবে।" এই সব কথা বার্ত্তায় তাঁর মুখে চোখে যেমন সহানুভূতির ব্যথা দেখা যাচ্ছিল—তেমনি একটা দৃঢ়সংকল্পের তেজ ফুটে উঠেছিল।

তিনি কলকাতায় এসে প্রথম দুটি কাজে হাত দিলেন। কেম্‌ব্রিজে অধ্যাপক নির্ব্বাচন ও প্রেরণ, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, এতে তিনি কৃতকার্য্য হতে পারেননি। দ্বিতীয় তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করলেন। ব্রহ্মবান্ধব যখন বিলাতে ছিলেন—তখন তাঁর কতকগুলি পত্র হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব এখন খৃষ্টান নন—হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত। আমার বোধ হয় এটাও তাঁর দেশাত্মবোধ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে এখন বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতেন না,—দেশের জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকেই ধর্ম্ম ও সমাজকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছিলেন। এই সময় তিনি "সন্ধ্যা" কাগজ প্রকাশ করবারও চেষ্টা করছিলেন। তাঁর হিন্দু সমাজের সঙ্গে অবাধ ভাবে মেলামেশায় এবং হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এবং স্বাধীনতার বাণীতে কতকগুলি তরুণ যুবকও ব্রহ্মবান্ধবের অনুরক্ত হন। খৃষ্টান পাদরী ফার কোহার "শ্রীকৃষ্ণ"কে আক্রমণ করে একটা বই সেই সময়ে প্রকাশ করেন—ব্রহ্মবান্ধব এলবার্ট হলে ১৯০৪এর জুলাই মাসে "Personality of Sri Krishna" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা উক্ত পাদরীর যুক্তিগুলি খণ্ড বিখণ্ড করে প্রতিবাদ করলেন। "ইণ্ডিয়ান নেশনে"র সম্পাদক ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সেই সভার সভাপতি ছিলেন। এই বক্তৃতা শুনতে অনেক কৃতবিদ্য লোক গিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা ছাপিয়ে ফার কোহার সাহেবকে দেওয়া হল—এর জবাব দিতে। বাংলায় উক্ত বক্তৃতাটী অনূদিত হয়ে সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। "Epiphany"তে উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন যুক্তিযুক্ত হয়নি—শুধু মিশনারীদের পুরাণো বুলি বলা হয়েছে—তা অগ্রাহ্য—উপেক্ষণীয়।

উপাধ্যায় পূর্ব্ব থেকেই একটা তরুণদলের সংস্পর্শে এসেছিলেন—যাঁরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এঁরা কেউ কেউ উপাধ্যায়ের পতাকাতলে এলেন—"সন্ধ্যা"র প্রকাশ ও প্রচারে তাঁরা সহায়তা করেছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন "সন্ধ্যা" প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। লোকে ভাষার ভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেল। উপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত নবপর্য্যায়ে "বঙ্গদর্শনে" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু সে ভাষা আর সন্ধ্যার ভাষা একেবারে আকাশপাতাল প্রভেদ। দিন দিন "সন্ধ্যায়" গণভাষা ফুটে উঠল—এই ভাষাতে তাঁরই একমাত্র অধিকার ছিল—তিনি এক্ষেত্রে একা—অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর দেহত্যাগের পর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বাধীনতামন্ত্রের উদ্গাতা সুপণ্ডিত সুলেখক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং সুপণ্ডিত সাংবাদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সন্ধ্যা"য় তাঁর ভাষা অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সকলেই এই বিষয়ে বিফলকাম হয়েছেন। তাই "সন্ধ্যা" শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর বিয়োগে রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল! তাঁর "সন্ধ্যা"র ভাষা ছিল—অননুকরণীয়। সাংবাদিক সাহিত্যের এই দান উপাধ্যায় মশায়ের স্মৃতির সঙ্গেই আমরা ভুলতে বসেছি। আজ যে চলিত বাংলায় সাহিত্যের গতি চলছে—সংবাদপত্রে উপাধ্যায় মহাশয় এটা সর্ব্বপ্রথম চালু করেন—এই সত্যটী সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যিক এই নিয়ে আলোচনা করেন নি—বর্ত্তমান তরুণেরা সে ইতিহাস কখনও স্মরণ করবে না—কারণ স্মরণযোগ্য সাহিত্যিকেরা কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক শিক্ষায় ব্রহ্মবান্ধবকে বিস্মৃত হয়েছেন।

"সন্ধ্যা"র ভাষা প্রথমে সংস্কৃতে ঘেঁসা ভাষা ছিল, সেটা বোধ হয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করবার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ, চলিত হিন্দুয়াণীর বর্ণবৈষম্য

প্রভৃতি রক্ষণশীলের বুলি ছিল। কিন্তু "সন্ধ্যা" যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হল, বঙ্গভঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র বাংলা দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল যখন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ, অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধ পাঠেও তাঁর প্রাণমাতানো জাতীয় সঙ্গীতে তরুণদলকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় ওজস্বিনী ভাষায় দার্শনিকভাবে রাজনীতির আসর জাঁকিয়ে বসলেন—যখন রাষ্ট্রচেতনায় যুবক বাংলা গুপ্ত সমিতির আন্দোলন চালাতে লাগলেন, তখন "সন্ধ্যা"য় ব্রহ্মবান্ধব জনগণের ভাষায় আপামর সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে মুক্তি সংগ্রামে দেশকে আহ্বান করতে লাগলেন। ইংরাজের আইন আদালতকে কাজীর বিচার, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস কমিশনারের আখ্যা দিলেন কাজী, শহর কোটাল এমন কি নামকেও বিকৃত করে ইংরাজ সরকারকে সাধারণের নিকট তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। তাঁর মূল কথা ছিল—এরা বিদেশী অর্থলোভী বণিক, পরদেশ লুণ্ঠন এদের ব্যবসা—আমরা এই রাজকে মেনে নিয়েছি বলেই এদের রাজ্য ও রাজশক্তি, না মানলেই এই শক্তি টিঁকবে না এবং এদের সরকারী ঠাঁট তাসের ঘরের মত পড়ে যাবে। "কালীমায়ের বোমা" প্রভৃতি নাম দিয়ে সত্যিকার বোমার আভাস "সন্ধ্যা"তে প্রকাশ হয়েছিল।

বাংলা দেশেই তখন জাতীয়তা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কেন্দ্র বা ঘাঁটি ছিল। এই দেশের প্রেরণায় সমগ্র ভারত অনুপ্রাণিত হত। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন চন্দ্র, অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব ও কবি রবীন্দ্রনাথ স্ব স্ব ভাবে দেশের মধ্যে জাতীয়তার হোমকুণ্ড প্রজ্জলিত করেছিলেন, সর্ব্বত্যাগী স্বাধীনতাকামী যুবকেরা দলে দলে তাঁহাদের জীবন তাতে আহুতি দিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সব কাজে ঘৃত ও সমিধ জুগিয়েছিলেন। দেশের এই ত্যাগী দলকে আদালতে কঠোর নির্ম্মম বিচার থেকে রক্ষা করবার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ চেষ্টা করতেন; সেখানে দেনা পাওনার হিসাব ছিল না—ছিল শুধু দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম—দেশমুক্তির বাণী। এই মুক্তি সংগ্রামে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশবন্ধু দধিচীর মত আত্মবিসর্জ্জন করেছিলেন। আজ সে কথা থাক.

সরকার বাহাদুর ব্রহ্মবান্ধবকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করলেন। ইংরাজের আইন ও আদালত একটা প্রহসন মাত্র, ব্রহ্মবান্ধব তা দেখাবার জন্য বরের মত সেজে টোপর মাথায় দিয়ে চল্লেন—পুলিশ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে। নির্ভীক ব্রহ্মবান্ধব যে ভাবে আদালতে গিয়েছিলেন, তা' বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটী অভিনব ব্যাপার। আদালতকে এত অগ্রাহ্য ইতিপূর্ব্বে কেউ দেখাতে সাহস করেন নি। মুখে অনেকে অগ্রাহ্য বা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু আদালতকে প্রহসনের রঙ্গস্থল ক'রে এইরূপ নির্ভীক ভাঁড়ামীর অভিনয় আর কেউ দেখান নি।

ব্রহ্মবান্ধব জামিনে খালাস হলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে ব'লেছিলেন, "উপাধ্যায় ম'শায়ের মত অমন নির্ভীক লোক খুব বিরল। আদালতে তাঁর জামিনের জন্য সলজবাব করার পর—তিনি আমাকে বল্লেন—বেশ ব'লেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে কি জবাব দেওয়া যাবে? তিনি চুপ ক'রে একটী কাগজে লিখে তাঁর লিখিত উত্তর আমাকে দিয়ে বল্লেন—'একটী ছত্র বা শব্দ বাদ দেবেন না।' আমি প'ড়ে অবাক হয়ে তাঁকে বল্লাম—'এতো আত্মরক্ষা নয়—একেবারে কবুল জবাব।' এই জবাব দাখিল করলে আপনার সাপক্ষে বলবার কিছু থাকবে না। তিনি বল্লেন, 'আপনি কি মনে করেন—আমাকে এরা জেলে আটকাতে পারবে—আমি কলা দেখিয়ে চলে যাব।' সন্ধ্যাতেও ব্রহ্মবান্ধব নিজের কথা অনুরূপ ভাবে লিখে-ছিলেন—"ভূপেনের বেলা যোড়া রস্তা, সন্ধ্যার বেলা বখে লম্বা।' ব্রহ্মবান্ধব যে ইংরেজীতে লিখিত জবাব দাখিল করেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্চে—

"I accept the entire responsibility of the paper and the article in question. But I don't want to take part in the trial because I do not believe that in carrying out my humble share of God-appointed *Swaraj,* I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

অর্থাৎ আমি সন্ধ্যা পত্রিকা এবং নালিশী প্রবন্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কিন্তু বিচারে আমি যোগদান করতে চাই না কারণ এই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট স্বরাজ আন্দোলনে যে ক্ষুদ্র অংশ নিতেছি এবং যে বিদেশীরা ঘটনাক্রমে আমাদের উপর শাসনকার্য্য চালায়—ও আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি যাদের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্চে এবং হবে—তাদের কাছে কোন প্রকারে আমাকে জবাবদিহী দিতে হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না।

কি নির্ভীক উক্তি—ব্রহ্মবান্ধবের মন মুখ এক ছিল। সন্ন্যাসীর নগ্নপদ, নিরামিষ ভোজন, সামান্য শয্যায় শয়ন—কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয় নি। বিদ্যায় গর্ব্ব বা অহঙ্কার ছিল না। মিষ্টভাষী, রসিক, অমায়িক অথচ গম্ভীর। দেশের রাজনৈতিক নেতারা সকলেই এঁকে মান্য করতেন—পরামর্শ নিতেন।

যখন ব্রহ্মবান্ধব জামিনে খালাস পেলেন সেই সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখেই বল্লেন, "আপনি আমার সঙ্গে আজকালের ভিতর দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী গোপন কথা আছে।" আমি "যে আজ্ঞা" ব'লে ঠিক দু'দিন পরে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে শুনি তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্রের চিকিৎসাধীনে অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্ত্তি হয়েছেন। আমি ভাবলাম, তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।—হায়, কি দুর্ব্বুদ্ধি, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। এখন অনুতাপ হয় কেন হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম না।

কয়েকদিন পরেই শুনলাম—ব্রহ্মবান্ধব দেহত্যাগ করেছেন।

দেশবন্ধু যখন জেরা করতে গিয়ে হাকিমের মেজাজ দেখে আদালত গৃহ থেকে চলে আসেন—তখন উপাধ্যায় মশায় তাঁকে বলেছিলেন—"বেশ করেছেন, আমি ফিরীঙ্গির আদালত মানি না—কোন জেরা করব না। ঠিক জানবেন ফিরীঙ্গির সাধ্যি নেই যে আমাকে জেলে দেয়।" এই মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আর রাজনৈতিক আলোচনায় কোন কোন দিন বেশী রাত্রি হলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব দেশবন্ধুর বাড়ীতেই রাত্রিটায় থেকে যেতেন। দেশবন্ধুর গৃহে শয্যার অভাব ছিল না। দেশবন্ধু বলেছিলেন, "আমাদের অনেক সাধ্যসাধনায় উপধ্যায় মশায়কে খাটে শোয়াতে পারিনি—তিনি ভূমিশয্যাতেই বেশ আরামে শুয়ে থাকতেন", সন্ন্যাসীর ভূমিশয্যা—ব্রহ্মবান্ধব সেইটি যথাযথ সাধন করতেন।

১৯০৭ সালে ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পরে ব্রহ্মবান্ধব ইহলীলা সম্বরণ করেন। দেশের নেতৃবর্গ ও দেশপ্রেমিক যুবকেরা দলে দলে শ্মশানে উপস্থিত থেকে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। সকলের মুখে বিষাদ কালিমার ছায়া। "সন্ধ্যা"র সেই তেজপূর্ণ চলিত কথায় কি সরকার বাহাদুরের সম্মুখীন হতে, কি দেশের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার বাণীতে অনুপ্রাণিত করতে, আবালবৃদ্ধবনিতা ইতর ভদ্র নির্ব্বিচারে কে এমন করে দেশের কথা শেখাবে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গে" উল্লেখ করেছেন যে, ব্রহ্মবান্ধব একদিন যোড়াসাকো বাড়ীতে ম্লানমুখে অনুতপ্ত ভাবে বলেছিলেন যে "রাজনীতির" পথ ধরে ভুল করেছিলেন। কবির এই উক্তি সত্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি কি ভ্রান্তির বাস্তব অনুশোচনা! কৈ, পরবর্ত্তী জীবন তা প্রমাণ করে না। হয়ত দেশের লোক তাঁর আহ্বানে আশানুযায়ী সাড়া দিচ্ছে না—স্বাধীনতার মন্ত্রে সকলে মেতে উঠছে না, চারদিকে দ্বেষ হিংসা দলাদলিতে নেতৃবর্গের উৎসাহ—তাই হয়ত তাঁর মনে ক্ষণিক অবসাদ এসেছিল এবং তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অন্তরের ভাব প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন। এইরূপ অবসাদ মাঝে মাঝে তাঁর আসত। তাঁর "স্বরাজ" পত্রিকায় বিবেকানন্দকে উল্লেখ করে এই মর্ম্মে লিখেছিলেন যে, যখন চারদিকে নিরাশার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে, যখন হতাশ নিস্ফলতায় মন বিকল হয়ে পড়ে—বুক ভেঙ্গে পড়ে, তখন স্বামিজীর বাণী—স্বামিজীর কথা মনে এলে সে ঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে নূতন আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হয়, বক্ষে তাড়িত প্রবাহ বয়ে যায়, হৃদয়ে মনে প্রাণস্পন্দনে আশার উজ্জ্বল জ্যোতি তিনি দেখতে পান। সেইরূপ একটা

সাময়িক অবসাদ আসায় হয়ত তিনি কবির কাছে গিয়েছিলেন প্রেরণা পেতে।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনটী আগাগোড়া একটী চঞ্চল কর্ম্মমুখর প্রাণবন্ত বহুরূপীর আলেখ্য। কৈশোরে সামরিক শিক্ষা, যৌবনে ব্রাহ্ম আবার খৃষ্টান সন্ন্যাসী আবার খৃষ্টভক্ত বর্ণাশ্রমাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিন্দু, কখনও শিক্ষা সংস্কারে, কখনও ধর্ম্মপ্রচারে আবার কখনও সংবাদ পত্রে রাজনীতিক্ষেত্রে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সব মহাপুরুষদের প্রাণ এত ব্যাকুল অধীর চঞ্চল যে, যখন যে ভাবে তাঁরা দেশের কল্যাণ হবে মনে করেন—তাঁরা সে কর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন অত হিসাবনিকাশ যুক্তিচিন্তার তাঁরা ধার ধারেন না। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীঅরবিন্দ তৎকালে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্যে বক্তৃতায় ব'লেছিলেন—"Upadhaya saw the necessity of realising Swaraj within us and hence he gave himself up to it. He said that he was free and the Britishers could not bind him, his death is a parable to one Nation." এই মহাপ্রাণের সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা উচ্চ প্রশস্তি আর কি হ'তে পারে ?

দুরাশা

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

এখনো প্রাণের প্রান্তে দুরাশার ত্রস্ত আনা গোনা
বহুদিন গেলো তবু ক্ষান্ত যে হোলো না।
এখনো তোমার কথা যখনি স্মরণে ভেসে আসে
হিয়া মোর ভরে ওঠে গোপন উল্লাসে।
বসে বসে ভাবি—
হয়তো তোমার কাছে আমার এ হৃদয়ের দাবী
এখনো জন্মের মতো হয়নি নিঃশেষ,
মাঝে-মাঝে-মনে-পড়া মনে-মনে চাওয়ারই উদ্দেশ।
দিনের কাজের শেষে বসে-থাকা গোধূলি বেলায়
অস্তরাগরশ্মি যবে ধীরে ধীরে আকাশে মিলায়,
অদূর প্রাঙ্গণ পারে শুনে ঝরা-পাতার মর্ম্মর
মোর পদধ্বনিভ্রমে প্রাণে জাগে হয়তো শিহর ;
হয়তো বাসনাঘন উল্লসিত মৌন প্রতীক্ষায়
বিনিদ্র রজনী কাটে কণ্টক শয্যায়।
হয়তো এখনো তব মনের বেতারে
বেজে ওঠে মোর কথা সঙ্গীতের আলাপে বিস্তারে।

দুরন্ত কালের স্রোতে মানুষের যা কিছু সঞ্চয়
লুপ্ত হয় একে একে, আশা শুধু একা বেঁচে রয়।
মিলনের স্মৃতির সে পূর্ণ করি প্রাণের পেয়ালা
মানুষ বিস্মরে প্রিয়-বিচ্ছেদের জ্বালা।
চলেছে জগৎ জুড়ে পাশাপাশি আলো-অন্ধকার,
ভরা জীবনের রাজ্যে নির্ম্মম মৃত্যুর অভিসার,
বাস্তবে যে চিরতরে মিথ্যায় মিলায়
আশা তারে নিয়ে নিত্য স্বপ্ন রচে কম কল্পনায়।
একদা আমার ছিলে, আজ তুমি আমার কেহ না,
আবার তোমারে পাবো, দুরাশা এ—
এ মোর সান্ত্বনা।

নি দা লি

দুপুরের খাওয়ার ছুটিতে অফিস হইতে বাড়ি আসিয়া তড়িতের টেলিগ্রাম পাইলাম: "বাবা জাগিয়াছেন। অবিলম্বে আসুন।" তড়িৎ আমার মামাত ভাই। তার বাবা আমার পূজনীয় মাতুল। তাঁহার জাগার খবরটি আমাদের সারা পরিবারের কাছেই মূল্যবান।

পাঠকেরা একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি। না, মামা এমন কোনও অত্যাচারী বা কদাচারী নন যে, তাঁর বিবেক জাগ্রত হইবার কথা উঠিবে। তড়িৎ শান্ত সুশীল ছেলে, কোনও অসবর্ণা বা বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পিতাকে সে কুপিত করে নাই যে, মামার অনুতাপের খবরটা তড়িৎ ঘটা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবে। মামা বাস্তবিকই জাগিয়াছেন, অর্থাৎ ঘুম হইতে জাগিয়াছেন।

মনে হইতে পারে, ঘুম হইতে জাগাটা এমন কোনও বড়ো খবর নয়। কিন্তু যারা আমার মামা সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর রাখেন, অথবা খবরের কাগজে ক'বছর আগে প্রকাশিত জনৈক নিদ্রারোগীর চাঞ্চল্যকর কাহিনী মনে রাখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই খবরটিকে তাচ্ছিল্য করিবেন না, বা ইহাকে টেলিগ্রামের পয়সা অপব্যয় মনে করিবেন না।

গত কয় বছর ধরিয়া, অর্থাৎ ইংরেজের রাজত্ব অবসানের আগে হইতেই মামা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমাইতেছেন। ইতিমধ্যে একবারও জাগেন নাই। সেই মামার জাগার খবর কত বড় খবর, একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমাদের বাড়িতে মামার নামের একটু অদল-বদল করিয়া আমরা তাঁহার একটি নতুন নামকরণ করিয়াছি। ইহাতে মামার বোন আমাদের মা, বিরক্ত হন, কিন্তু নামটি অন্যদের ভারি মনে লাগিয়াছে। মামা এখন এই নামেই আমাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। শ্রীতেজেন্দ্রপ্রসাদ ভঞ্জ নামটির সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা আমাদের ঘুমন্ত মামাকে আদর করিয়া রিপ ভ্যান্‌ আঙ্কল বলিয়া উল্লেখ করি। আমাদের সেই রিপভ্যান উইঙ্কেল জাগিয়াছেন।

মা'র তাড়াতে সেদিনই ছুটি লইয়া রাঁচি ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের সওয়ারি হইলাম। মস্তিষ্কবিকার-গ্রস্তদের পক্ষে
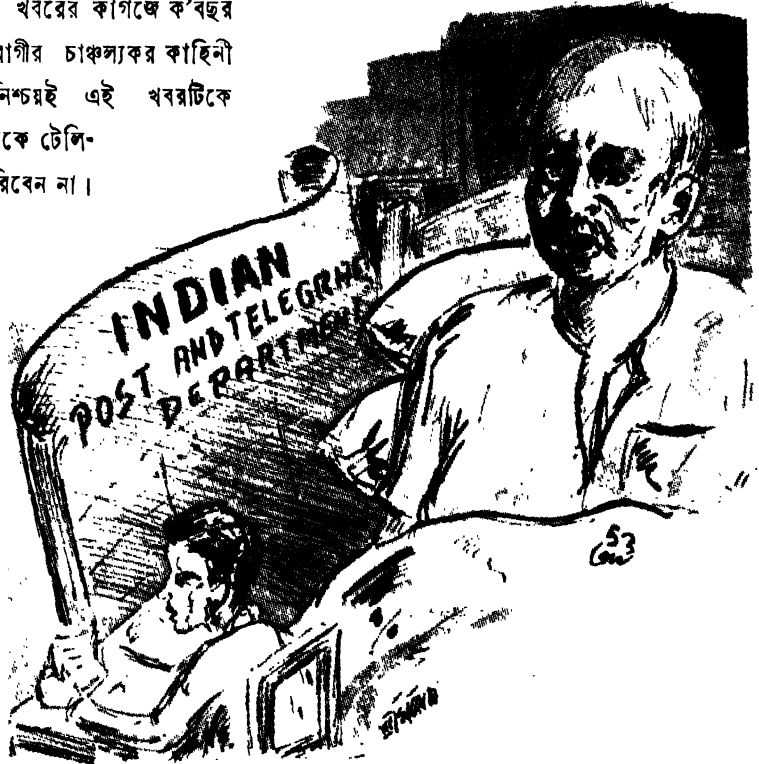
সুবোধ বসু

জায়গাটি সুবিধাজনক ; কিন্তু মামাদের রাঁচি প্রবাসের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। তাঁহারা বহুকাল হইতেই রাঁচির স্থায়ি বাসিন্দা।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটা আন্দাজ রাঁচি পৌঁছিয়া দেখিলাম ষ্টেশনে তড়িৎ হাজির আছে।

'মামা জেগে আছেন তো?' আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম।

'তা আছেন। একটু বেশি রকমই জেগে আছেন।' তড়িৎ গম্ভীর মুখে কহিল।

'কি রকম?'

'সেই যে জেগেছেন, আর ঘুমোচ্ছেন না। দিন রাত্রি সারাক্ষণই জেগে আছেন'…

'তা জাগুন,' আমি আশ্বাস দিয়া কহিলাম। 'দশ বছরের ঘুমোনো একবারেই ঘুমিয়ে নিয়েছেন। এখন একটু বেশি না জাগলে ক্ষতিপূরণ হবে কি করে—'

তড়িৎ ইহার কোনও জবাব দিল না। আমার ব্যাগটা হাতে লইয়া সে আমাকে ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া আসিল। সেখানে বাড়ির গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। আমার ব্যাগটি পিছনের আসনে ও আমরা উভয়ে সামনের আসনে আসীন হইবার পর তড়িৎ গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া মামীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'মামা এখন কেমন আছেন?'

'এসো, বাবা', মামীমা মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, 'তুমি আসায় সাহস হলো…কই, ভালো আর কোথায়। এক রোগ গেল, কিন্তু তার বদলে আরেক রোগ…'

'কি রোগ?' আমি কহিলাম। 'ঘুম না হওয়া তো? সে কিছু নয়…মামা কোথায়?'

'ওপরে আছেন। যাও, দেখা করে এসো।' মামীমা গম্ভীর মুখে কহিলেন।

রিপ্ ভন্ আঙ্কল্ উপর তলার পড়া-কামরায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমার চেষ্টাকৃত পায়ের শব্দ পাইয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

'কে! পিণ্টো! থাক্। তুই হঠাৎ কেন? বাড়ির খবর ভালো তো?'

আমি প্রণাম-নত মস্তক উন্নত করিয়া কহিলাম, 'হ্যাঁ। ভালো।'

'বস', মামা কহিলেন, 'বেড়াতে এসেছিস? এখন আবার কিসের ছুটি?'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না।' আমি মিথ্যা করিয়া কহিলাম। 'ভাবলাম, দুদিন বেড়িয়ে…'

'বেশ করেচিস।' মামা কহিলেন। 'আমার নিজের শরীরটাও খুব ভালো যাচ্ছে না। কিছুকাল হলো অনিদ্রায় বড় কষ্ট পাচ্ছি…

হায় ভগবান! মাত্র দুদিন হইল যোগনিদ্রা হইতে জাগিয়া এ কি অযৌক্তিক অভিযোগ। মামার চির-কালই ঘুম সম্বন্ধে বাতিক ছিল। ভগবান তাহার আক্ষেপ মিটাইবার আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহা-তেও দেখি রিপ্ ভন্ আঙ্কেলের তৃপ্তি হয় নাই।

'এখন ভারতবর্ষের ভাইসরয় কে বলতে পারিস?'

আমি বিস্মিত হইয়া তাকাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মামার যোগনিদ্রার কথা মনে পড়িল; কহিলাম, 'ভাইসরয় আজকাল আর কেউ নেই। এখন শুধু গভর্ণর জেনারেল, শীগ্‌গিরই প্রেসি…'

'ভাইসরয় অ্যাণ্ড গবর্ণর জেনারেল।' মামা জোর দিয়া কহিলেন।

'আজ্ঞে না', আমি সবিনয়ে কহিলাম। 'পনেরোই আগষ্টের পর থেকে শুধু গবর্ণর জেনা…'

'কেন, পনেরোই অগাষ্টে কোনও টিকিমেধ যজ্ঞ হয়েছে নাকি?' মামা বিরস কণ্ঠে কহিলেন, 'বড়লাটের টিকি খসে পড়েছে?…'

'ডোমিনিয়নগুলিতে ভাইসরয় থাকে না। গবর্ণর জেনারেল থাকে…'

'থাক। ষ্ট্যাটুট্ অব ওয়েষ্টমিন্সটার আর তোকে শেখাতে হবে না।' মামা ধমক দিয়া কহিলেন। 'কিন্তু আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষে ভাইসরয় না থাকলে চলবে কেন?…'

'পরাধীন!' আমি তিনবার ঢোক গিলিয়া কহিলাম। কণ্ঠের উপর দখল ফিরিয়া পাইবার পর প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া সহসা মনে পড়িল, মামা আমাদের স্বাধীনতা

লাভের সময় নিদ্রিত ছিলেন; এত বড় বিরাট এক পরিবর্ত্তনের কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু বাড়ির কেহ কি তাহাকে এ দুই দিনেও এই খবরটি জানায় নাই? অথবা স্বাধীনতা ইতিমধ্যে এমন মামুলি ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, এ খবরটা যে যোগনিদ্রোত্থিত মামাকে জানান দরকার, তাহাই কাহারও মনে হয় নাই।

'কি সব হচ্চে দেশে দেখ।' মামা শুরু করিলেন। 'কংগ্রেসের হাম্বিতাম্বিই সার; এতদিনেও ইংরেজকে এক হাত নড়াতে পারলে না। যেমন ছিল, তেমনি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তেমনি দুর্ভিক্ষ, তেমনি দারিদ্র্য, তেমনি সরকারি জুলুম, তেমনি অনাচার। এই আজকের কাগজেই পড়লুম·

'মামাবাবু, আপনাকে কি ওরা এখনও বলেনি, ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি·

মামা চোখের পাতা তুলিয়া চাহিলেন। ক্ষণকালের জন্য তাহার দৃষ্টিতে কোনও ভাবোন্মেষ দেখা গেল না। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কি বললি?…'

আমি কহিলাম, 'ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। ১৯৪৭এর পনেরোই আগষ্ট তারিখে আমরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ পেয়েছি, শীগ্‌গিরই পূর্ণ…'

সহসা মামার দুই ঠোঁটের প্রান্তে প্রশ্রয়ের একটু ক্ষীণহাস্য ভাসিয়া উঠিল। তিনি সস্নেহ কণ্ঠেই কহিলেন, 'যা, শুয়ে পড়গে। সারারাত ট্রেণে এসে তোর খুব ঘুম পেয়েছে…' অর্থাৎ আমি সারা রাত জাগিয়া আসিয়া এখন মাথামুণ্ডু বকিতেছি।

আমি স্বভাবতই ইহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, 'না মামাবাবু, সত্যিই আমরা স্বাধীন। এখন আমাদের…

'ছেলেরা বিক্ষোভ-প্রদর্শন করলে পুলিশের গুলিতে মরতে পারে', মামা আমার বাক্যপূরণ করিয়া কহিলেন, 'এখনও আমাদের ছেলেরা বিনা বিচারে আটক হ'তে পারে, এখনও আমাদের দেশে অন্নাভাবে লোকের মৃত্যু হয়, এখনও আমাদের দেশে ব্ল্যাক মার্কেটের তাণ্ডব-লীলা চলছে খাদ্যের বাজারে, পরিধেয়ের বাজারে, রোগীর ওষুধের বাজারে…এই দেখ, এক আজকের কাগজেই এ সমস্ত খবর ছাপা আছে।· বলিয়া কাগজটি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

তার দরকার ছিল না। প্রত্যহই খবরের কাগজে এ সকল খবর থাকে। মামা বহুকাল পরে খবরের কাগজ হাতে লইয়া এই সকলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছেন।

'তা হোক, আমরা এখন সত্যই স্বাধীন।' আমি সত্যের খাতিরে কহিলাম।

'যা, তুই শুয়ে পড়গে। তোর আগে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।' মামার কণ্ঠ প্রশ্রয়-সদয়। 'সারা রাত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিস, এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। যা ঘুমিয়ে নে গে একটু।…স্পষ্ট দেখছি, চারদিকে ইংরেজের আমলের সকল লক্ষণ—প্রসেশনে গুলি-বর্ষণ, অডিন্যান্সে আটক, মিটিং বন্ধ, ১৪৪ ধারা, রাজনৈতিক এবং আর্থিক সকল দুর্গতি কায়েম হয়ে আছে, তবু যা সত্য তা অস্বীকার করতে চেষ্টা করচিস। বেচারি!…সত্যই, এ অসহ্য। ভাবছি, শরীরটা একটু সারলে আবার কংগ্রেস আন্দোলনে নামব—নন্দ সহায়কে চিঠি লিখে দিয়েচি। ইংরেজের এই দমন-নীতি ভদ্র-লোকের অসহ্য। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনই বাঁচবার একমাত্র উপায়…

যা, শুয়ে পড়গে। বহু পুরোণো খবরের কাগজের ফাইল জড়ো হয়ে আছে—ইংরেজের সাম্প্রতিক অনাচারের কাহিনী একটু একটু করে' পড়ে দেখচি

নিচে নামিয়া আসিলাম। মামীমা কহিলেন, 'কেমন দেখলে, বাবা? তোমাকে চিনতে পারলেন?…

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম।

'কিছু প্রশ্ন-টশ্ন করলেন?' তড়িৎ উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিল।

'তা করেচেন।' কহিলাম। 'আচ্ছা, একটা কথা।… ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার কথা তোরা কেউ মামাকে জানাস নি?…'

তড়িৎ গম্ভীর মুখে কহিল, 'তা হ'লে এরই মধ্যে তোমার কাছ থেকে verify করে' নেবার চেষ্টা হয়েচে…

কি জানো, পিন্টোদা, অসুখ এখন ঐ দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছর আগে যখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন থেকে সময় আর এগোয়নি, এই মনে করেন। এখনও ওঁর ধারণা, জাপানে যুদ্ধ চলছে। ইংরেজ এদেশ ছাড়েনি ইত্যাদি। গত ক'মাসের পুরাণো খবরের কাগজের ফাইল ঘাটছেন এবং এ বিশ্বাস ওঁর দৃঢ়তর হচ্চে…'

'কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এদের নামও তো খবরের কাগজে নিত্য বের হয়। তা পড়েন না?…' আমি প্রশ্ন করিলাম।

'সে সম্বন্ধে চেপে ধরলে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। বলেন, এই সব গুলি ছোঁড়া, লাঠি-চার্জ্জ, ধর-পাকড়, ১৪৪ ধারা এ সব ইংরেজ আমল চলার অভ্রান্ত লক্ষণ। বেশি চেপে ধরলে বলেন, ওরা ইংরেজের চাকরি নিয়েচে। মাথার গোলমালের স্পষ্ট লক্ষণ। একে নিয়ে কি করা যায় বলো দেখি। রাঁচি থেকে মেণ্টাল-হস্‌পিটালের বড় ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল কাল। তিনি বলে গেলেন, আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, সত্যি সত্যি আমরা যে এখন স্বাধীন, আমাদের জনপ্রিয় নেতারা এখন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা, এ কথা ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। কিন্তু আমাদের কোনও যুক্তিই বাবা শুনছেন না,—সব উড়িয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, ইংরেজ আমলের সকল অনাচারের লক্ষণ চারদিকে দেখতে পাচ্ছি, তবে দেশ স্বাধীন হয়েছে কি করে' মেনে নিই। বল তো, কি বিপদ! নিরুপায় হয়ে তোমাকে টেলিগ্রাম করতে হয়েছে।…দেখ, যদি বোঝাতে পার। ইদিকে বাবা কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারীর কাছে গভর্ণমেণ্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নতুন আন্দোলন সুরু করবার জন্য চিঠি ছেড়েচেন—হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না…'

সুতরাং আমরা যে স্বাধীন হইয়াছি এ কথাটা মামাকে বুঝাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলাম। কিন্তু মামার ঐ এক কথা। স্বাধীনতার লক্ষণ কোথায়? আমাদের নেতারা প্রধানমন্ত্রী উপপ্রধানমন্ত্রী সহপ্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, এটাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণই মনে করেন না। বলেন, ইংরেজ নতুন কায়দা খেলিয়া নেতাদের বড় বড় চাকরি দিয়া দেশে আপন কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাদের চিরাচরিত রীতিতেই দেশের শাসনকার্য্য চলিতেছে। স্বাধীনতার যা সুবিধা, সাধারণ নাগরিক কেহই তাহার যদি দেখা না পায়, তবে স্বাধীনতা কোথায়?

ইদিকে পাগলা-গারদের ডাক্তার প্রত্যহ আসিয়া ভিজিট লইতেছে এবং উপদেশ দিয়া যাইতেছে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এটা ওঁকে তাড়াতাড়ি বুঝাইতে চেষ্টা করুন। নইলে মাথার ব্যারাম জটিল হইয়া উঠিতে পারে।

আমরা আরও জোর চেষ্টা করিতেছি। সেদিন সকালে তড়িৎকে কহিলাম, 'দেখ, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আর ১৫ই আগষ্টের কতগুলি খবরের কাগজ জোগাড় করতে পারিস? তাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সচিত্র বিশেষ বিবরণী ছাপা আছে, দেখলে মামাবাবুর বিশ্বাস হতে পারে…'

'দেখি যদি পাই।' তড়িৎ গম্ভীর ভাবেই কহিল। 'আমার এক বন্ধুর বাবার পুরাণো খবরের কাগজ জমাবার বাতিক ছিল, একবার খোঁজ করে' দেখতে পারি।…কিন্তু যে কোনও প্রমাণই মানছেনা, সে কি খবরের কাগজের রিপোর্টেই…'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কি,' আমি কহিলাম। 'তা ছাড়া স্বাধীনতা-লাভের এমন অকাট্য প্রমাণ আর কোথায়? পুরাণো খবরের কাগজ আমরা নিশ্চয় জাল করব না…'

সারা দিনে তড়িতের আর দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় সে এক গাদা পুরাণো খবরের কাগজের বাণ্ডিল লইয়া বাড়ী পৌছিল। কহিল, এই নাও, সারা দিনের পরিশ্রমের ফল। ফাইল ঘেঁটে পাঁচ প্রদেশের পাঁচটি খবরের কাগজের ১৪ই আর ১৫ই অগাষ্টের সংখ্যাগুলি নিয়ে এসেচি…'

আমি প্রায় উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলাম। পাতাগুলি যথাযথ আছে কি না একবার দেখিয়া লইয়া তক্ষুণি

কাগজগুলি লইয়া সদলবলে মামার দোতালার পড়ার-কামরায় হানা দিলাম।

'এই নিন্, পড়ে দেখুন।' কোনও রকম ভূমিকা না করিয়া আমি একটির পর আর একটি খবরের কাগজ মামার সামনে মেলিয়া দিলাম। ১৪ই আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসবের ভূমিকা ও ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা লাভ উৎসবের পূর্ণ সচিত্র বিবরণী উদ্যত করিয়া পূজনীয় মাতুল-দেবকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিলাম। মামীমা ও তড়িৎ আমার মিত্রশক্তির মতো কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে সমর্থনের জন্য প্রস্তুত রহিল।

মামা নীরবেই একাধিক কাগজ পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে পরাজয়ের অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল। আমরা পুলকিত কণ্টকিত বোধ করিলাম।

'এর পরে আপনি কি করে' সন্দেহ করতে পারেন, আমরা এখনও স্বাধীনতা পাই নি?' আমি যুযুৎসু উকিলের মতো জেরার মুষ্টি উদ্যত করিয়া কহিলাম ভাবখানা এই যে, মামা প্রতিবাদ করা মাত্র হাজার যুক্তির মর্টার ছুঁড়িয়া মারিব।

মামা কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দ থাকিবার পর কহিলেন, 'তাই তো দেখচি···কিন্তু এ কি রকম স্বাধীনতা! এখনও যে ইংরেজের পদ্ধতিতেই দেশের শাসন চলছে। তবে কি স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝেচি, আমাদের নেতারা তা বোঝেন নি? আমরা চেয়েছি ব্যক্তি স্বাধীনতা, পাঁচ জনের খাওয়া পরার সচ্ছলতা, সহৃদয় শাসন; আর তাঁরা চেয়েছেন ইংরেজের মতোই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খাটাতে? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!···যাক্, গে, এবার তোরা নিচে যা। আমার বড় ঘুম পাচ্চে, আমি একটু শোব···'

আমরা ডবল নিশ্চিন্ত হইয়া নিচে আসিলাম। প্রথমত, মামা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার কথাটা মানিয়া লইয়াছেন; দ্বিতীয়ত প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী অনিদ্রার পর

তাঁর ঘুম পাইয়াছে। সকল পরিবার আশ্বস্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। আমার রাঁচি আসা সার্থক মনে করিলাম।

ইহার দুইদিন পরে চাকরি বজায় রাখার জরুরি প্রয়োজনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা এখন কেমন আছেন?'

'ঘুমোচ্ছেন।' আমি ব্যাগ নামাইয়া কহিলাম।

'কি ঘুমোচ্ছেন রে!' মা শঙ্কিত হইয়া কহিলেন।

'কি ঘুম আবার। সেই ঘুম। যে ঘুমের দৌলতে তিনি আমাদের রিপ্‌ভন্ আঙ্কেল্!' আমি যথাসাধ্য করুণ কণ্ঠে জানাইলাম।

'বলিস কি! আবার!'

'হ্যাঁ।'

'আবার কি হলো?'

'এ অসুখের কারণ কি কেউ জানে!' আমি আশ্বাস দিয়া কহিলাম।

'ডাক্তার কি বলেন?' মা কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিলেন।

'আরে, ঐ ব্যাটাই তো এবারের অসুখের জন্য দায়ি।' আমি ক্রুদ্ধস্বরেই কহিলাম। 'বলে কিনা, দেশ স্বাধীন হয়েছে; এটা ওকে যেমন করেই হোক বুঝিয়ে দাও। আমরা তার কথা মতো মামাকে বুঝিয়ে দিলাম। হাতে হাতে ফল মামা বললেন, তোরা নিচে যা, আমার ঘুম পাচ্চে। সেই যে ঘুমিয়ে পড়লেন, আমি রাঁচি ছাড়া পর্য্যন্ত আর জাগেন নি...'

'হেঁয়ালি রাখ।' মা প্রায় তিরস্কার করিয়া কহিলেন। 'স্বাধীনতার সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক কি?'

সম্পর্ক কি, তাহা বলিতে পারিতাম। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা এবং মত মিলাইতে না পারিয়া লোকে পাগল হয়; কিন্তু পাগল হওয়া যাদের কপালে নাই, তারা রিপ্‌ভন আঙ্কেল্ হয়, এ কথাটা মা বুঝিবেন কি?

'সব বলব'খন পরে। এবার তাড়াতাড়ি না করলে অফিসে লেট্ হয়ে যাব।' বলিয়া আমি কৌশলী সেনাধ্যক্ষের মতো ষ্ট্র্যাটাজিক পশ্চাদপসরণ করিলাম।

একটি কৈশোর কবিতা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

হাত দু'খানি একটু হাতে
ঘুমিয়ে থাকে থাক না:
নীড়ান্তরে কপোত যেন
বুজিয়ে রাখে পাখ্‌না।
কথার নদী নামুক, খোলা
থাকুক আঁখি ঢাকনা।

এমন দিন কতই গেছে
যখন রোজই আসতে—
দুয়ার ঠেলে সাঁঝ-নিশুতে
আওয়াজহীন আস্তে।
মনে আছে সে সব কথা
কতই ভালবাসতে।

আজকে কেন নির্ম্মমতা
বক্ষে দোলা হানছে?
দেখছো নাকি ক্ষীণায়ু-চাঁদ
ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।
তাই ত হাত তোমার হাতে
স্বপ্ন-ছবি আঁকছে।

একটু আরো কথার স্রোত—
দীপ জ্বেলে কি রইবে?
থাকুক ভয়, সরিয়ে দাও
অদৃষ্টকে দৈবে।
ভালবাসার জন্যেই নয়
অল্প ক্ষতি সইবে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সীতানাথ বাবু কাশ্মীর যাবেন বলে শোনা গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রী নন্দিতা আব্দার ধরে বস্‌লো—আমিও যাবো।

সীতানাথ বাবু অধ্যাপক মানুষ—সদাশিব ধরণের, এবং স্ত্রীকে ফেলে বাইরে বেড়াতে যাবার মনোবৃত্তি তাঁর নেই, কিন্তু কাশ্মীর যাবার ব্যাপারে পত্নীকে সঙ্গে নেওয়াটা তিনি সমীচীন মনে করছেন না।

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলো—কেন, সেখানে লড়াই হচ্ছে বলে?

সীতানাথ বাবু বললেন—না, মানে আমি প্লেনে যাবো, প্লেনেই ফিরবো। নির্ম্মল হাসিতে নন্দিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, স্মিত হাসির সঙ্গে সে বল্‌লে—আমি কি প্লেনে চাপতে জানিনা, না চাপতে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মামার সঙ্গে সেবার রেঙ্গুন থেকে এলাম কিসে চেপে?

সীতানাথ ঈষৎ গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে তর্ক থেকে ক্ষান্ত হলেন, কিন্তু নন্দিতা ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলতে লাগ্‌লো—তপন ঠাকুরপো বুঝি কাশ্মীর নিয়ে যাচ্ছেন তোমায়! ওঁকে বলো আমিও যাবো।

এই গল্পের সুরুর ও আগে কিছু ভূমিকা আছে। তপন বাবুর সম্পর্কেই।

সীতানাথ বাবু একদা শান্তি নিকেতনে যাচ্ছিলেন, পৌষ-উৎসবে যোগ দিতে বোধ হয়। বোলপুর ষ্টেশনে দেখা হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে; বিলাতী পোষাক জৌলুসমাখা চেহারা দেখেই বেশ অভিজাত ও ধনী বলে মনে হয়। এক জীবন-বৈরাগী সাধু শিউড়ি যাবার একখানি টিকিট এবং কয়েকটি টাকা হারিয়ে ফেলে কান্নাকাটি করছে।

সেই জৌলুষী চেহারার ধনী ভদ্রলোকটি বললে—তুমি সন্নিসি হয়ে জগতের এই তুচ্ছ জিনিষের ওপর এই রকম গভীর মমতা বিস্তার করে থাকো—আমরা গৃহী লোকেরা কী করবো তা হলে? এই নাও পঁচিশটা টাকা—

সীতানাথ বাবু শুনলেন—ভদ্রলোকটিও শান্তিনিকেতনে যাবেন। পথের আলাপ যেমন হয়—সেই ভাবেই গোড়া পত্তন হল—এবং ক্রমে তা ঘনীভূত হয়ে বেশ দানা বেঁধে উঠলো, জানা গেল ভদ্রলোকটি ভারতীয়। এয়ার ফোর্সের মস্ত বড় অফিসার। কাশ্মীর থেকে কিছু যুদ্ধবন্দী নিয়ে কোলকাতার ফোর্টে আস্‌তে হয়েছে–দিন পনেরোর মধ্যেই আবার কাশ্মীরে ফিরবেন তিনি। এরই ফাঁকে শান্তিনিকেতনটা একবার বেড়িয়ে যাচ্ছেন। এ দিকটায় আর আগে কখনো আসা হয়নি। এঁরই নাম তপন বাবু।

সীতানাথ বাবু খুব খুসী হলেন। আলাপকে আরো ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে বললেন—আমার শ্যালিকা সেখানে আছেন, পৌষ-উৎসবে একরকম তারি আগ্রহে আমাকে ছুটতে হচ্ছে বন্ধুহীন ভাবে, আপনাকে পথে পেয়ে যে কী খুসী হওয়া গেল—

শান্তি নিকেতনে পৌছে খুসীর পরিমাণ বাড়লো কমলো না, তপনবাবু একদা ভোজে আপ্যায়িত করলেন সীতানাথ বাবু ও তাঁর শালী ছন্দিতাকে, এবং এই সূত্রেই আলাপ জমে উঠলো ছন্দিতার সঙ্গে গভীর ভাবে।

ছন্দিতা বললো—আপনারা মাটির মানুষ নন, আকাশের পাখী; কিন্তু তবুত' মানুষের মত ধরা দিতে পারেন।

কি যে বলেন, কি যে বলেন করে তপন বাবু গদগদ হয়ে উঠলেন। শেষ কালে বললেন—এই ত' জীবন! ছুটছি, ছুটছি ছুটছি। নদী, সাগর, মরুভূমি, বন, পাহাড় নগর, মাঠ—ডিঙিয়ে ছুট'ছ। হঠাৎ তারি মধ্যে ঝুপ করে নেমে পড়লাম্। গতির শেষে ক্ষণিক বিশ্রাম, মরুদ্যানের ফুলের সুরভিতে স্নিগ্ধ হল মন। একেই ত' জীবন বলে মানি। এই জন্যেই ত' জীবনের প্রতি আকাশচারী মানুষের এই মমতা।

সীতানাথবাবু দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি জীবন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত এবং আশ্চর্য্য ভাবে বিপক্ষ তথ্যও শোনাতে লাগলেন।

ছন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরের দোকান থেকে কিনে তপনবাবু তাকে সবচেয়ে ভালো একটা ফাউনটেন পেন উপহার দিলেন। দাম অন্তত পঞ্চাশের উপর। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো ছন্দিতা। টানা টানা দুটি চোখ মায়ার হাসিতে ভরে গেল। তপনবাবুও প্রত্যুত্তরে দিল খোলা উচ্চকিত হাসি হাসলেন। মানুষে মানুষে এই পরিচয়, এই প্রীতি ভরা সংবেদন—একটানা একঘেয়ে জীবনের মরুভূমিতে শ্যামল সরস শস্প বিশেষ।

সীতানাথবাবুর কি একটা কথার খেই ধরে তপনবাবু বললেন—হ্যাঁ স্মৃতিই সব। জীবনের গতিপথে মুহূর্ত্তের এই আলাপ এবং এই আলাপের রোমন্থনই জীবনকে রসদ জোগাতে থাক। একেই ছোট করে লোকে বোধ হয় স্মৃতি বলে থাকে।

ছন্দিতা বললো—আপনি লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়েছেন তপনবাবু, আমিও এই স্মৃতির সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকবো।

সীতানাথবাবু যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন; এবং অতি তাড়াতাড়ি তিনি তপনবাবুকে নিয়ে ফিরে এলেন কোলকাতায়।

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে তপনবাবু বললেন—হোটেলে যাই দেখি সীট মেলে কি না!

সীতানাথবাবু এই ক'দিন শুধু ভাবছিলেন যে তপনবাবু তাঁর ও ছন্দিতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেই যাচ্ছেন, কোলকাতাতে অন্তত তপনবাবুকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এসে একটা দিনের জন্যেও আপ্যায়িত না করলে চলে না। একরকম জোর করেই তপনবাবুকে ধরে নিয়ে গেলেন সীতানাথবাবু।

সীতানাথবাবুর এখানে বিশেষ কেউ থাকেন না। পত্নী নন্দিতা এবং শালা বিশ্বনাথ ছাড়া। তপনবাবু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের কাছে পরমাত্মীয়রূপে প্রতীয়মান হলেন। মুহুর্মুহু সিনেমায় যাওয়া, অভিজাত রেঁস্তোরায় গিয়ে খাওয়া বসা, ট্যাক্সী চেপে বেলুড় দক্ষিণেশ্বর ঘুরে বেড়ানো—নন্দিতা যেন একটা নূতন জীবনের স্বাদ পায়। নন্দিতা বল্লে, গতবার শীতের যে এত জামাকাপড় কিনলাম তিন-চার হাজার টাকা দিয়ে,—গায়ে দিয়ে বের হচ্ছি—এখন মনে হচ্ছে—এবার কেনা যেন সার্থক

হয়েছে, ঘরেই যদি বসে থাকবো,—তবে এত টাকা খরচের কী দরকার ছিল?

ছন্দিতার চেয়ে নন্দিতার মুখখানা যেন আরো মিষ্টি। বাঁ গালের তিলটা সৌন্দর্য্যের প্রতীক—নন্দিতার চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে খুসির মধ্যে দিয়ে জীবনের ঝড় বইছে যেন। তপনবাবু চেয়ে চেয়ে দেখেন। দেখেন সীতানাথ বাবুও।

উপক্রমণিকা এইটুকু।

তপনবাবু বললেন, আমি ত' কাল কি পশু' ফিরবো কাশ্মীরে। আপনি ত' বলছিলেন কখনো প্লেনে চাপেন নি, চলুননা আমার সঙ্গে দিনকতক ঘুরে আসবেন।

সীতানাথবাবুর আপত্তি নেই। কলেজ খুলতে এখনো কয়েকটা দিন দেরী আছে—তা ছাড়া এ বছর জানুয়ারীতে ছুটি নিয়ে তিনি বাইরে যাবেন ঠিক করেছিলেন। সুতরাং সময়গত আপত্তি নেই, অর্থ তাও ত' নয়ই। নন্দিতাকে নিয়ে যা একটু বাধা।

তপনবাবু বললেন—বেশ ত' নন্দিতা বৌদিকেও নিয়ে চলুন। আজ সকালে উনিও বলছিলেন যাবেন। আমার কোন আপত্তি নেই। খালি প্লেন ত' যাবে—এক ফাঁকে একদিনের ছুটি নিয়ে আবার আপনাদের কোলকাতায় নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

কাশ্মীরে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে—এখন সেখানে যাওয়াটা কি নিরাপদ হবে?—সীতানাথবাবু প্রশ্ন করলেন।

সীতানাথবাবুর মুখের ওপর তপনবাবু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর হেসে বললেন—সেজন্যে ভাববেন না। আমার অনেক আত্মীয় আত্মীয়া সেখানে এখনো আছেন। যুদ্ধ হয়তো হচ্ছে এক জায়গায়, হানাদাররা হয়তো কাশ্মীর সীমান্তের এক দিকে মাঝে মাঝে আসে, তা বলে গোটা কাশ্মীরে মানুষ থাকবে না?

সুতরাং যাওয়াই ঠিক হলো। নন্দিতা একমুখ মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সীতানাথবাবুকে বললে—কেমন যাওয়া হবেনা নাকি আমার? আচ্ছা, তপন ঠাকুরপোকে বলে ছোড়দার একটা চাকরী জোটে না এয়ার ফোর্সে—বি-কম পাশ করে বসে রয়েছে।

সত্যিই ত' কথাটা একেবারেই সীতানাথবাবুর মাথায় আসেনি, এখনি সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলা দরকার। না হলে তিনি হয়তো বা কথাটা পাড়তেই ভুলে যাবেন।

সব শুনে তপনবাবু বললেন—আপনার এই তুচ্ছ একটা আদেশ মানতে পারবো না—একি আর কথার কথা হল!

সীতানাথবাবু বাধা দিলেন, আদেশ কেন বলছেন, আমার অনুরোধ আপনার কাছে—

তপনবাবুও বাধা দিতে জানেন। বললেন—না, অনুরোধই বা কেন, বরঞ্চ বলতে পারেন দাবী। আচ্ছা য়্যাভিয়েশনে কেন দিতে চাইছেন, ন্যাভিগেশনে দিন না। আমাদের লাইনে মাইনে নেই; হাজার কি বারশো টাকায় সারা জীবন রট করতে হবে, অথচ ন্যাভিগেশনে ষ্টার্টিং পেই হল বারোশ টাকা। যদি ন্যাভিগেশনে দিতে রাজি থাকেন তবে আমি না হয় আজই ট্রাঙ্ক টেলিফোন করে চাকরীর ব্যবস্থা দেখি। দিল্লীতে দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে একটা কিছু করে ফেলি। বিশ্বনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়েই ফোন পর্ব্বটা সেরে আসতে হয় তা হলে—যদি দু'চার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে—তবে সঙ্গে সঙ্গে জবাবও দিতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতায় সীতানাথবাবুর মন ভরে ওঠে। মোটা মাইনেতে বিশ্বনাথের চাকুরী হয়ে যাচ্ছে শুনে নন্দিতাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে। তপনবাবু বিশ্বনাথ বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যান ফোন করতে।

বিকেলে বিশ্বনাথ ও তপন বাবু যখন ফিরলেন, শোনা গেলো ট্রাঙ্ককলেও মাননীয় মন্ত্রীকে পাওয়া গেল না। তিনি মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে কোন এক দেশীয় রাজ্যে নৃপতি সভায় সভাপতিত্ব করতে গেছেন। ফিরে এসে বিশ্বনাথই প্রথমে নন্দিতাকে খবরটা দিলে। তপন বাবু সীতানাথ বাবুর কাছে এই দুঃসংবাদ দেবার সময় প্রায় কেঁদে ফেলবার মত করে বললেন—এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারলাম না, এবার এজন্য মার্জ্জনা চাইবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

সীতানাথ বাবু বিস্মিত হলেন—তাতে হয়েছে কি? পরে সুযোগ সুবিধে মত একটা ব্যবস্থা করবেন। এর

জন্যে আপনি অতটা ব্যস্ত হবেন জানলে…ছি, ছি, আপনি চুপ করুন তপন বাবু।

তবুও দুঃখ রাখবার জায়গা না পেয়ে তপন বাবু কাঁচুমাচু করতে থাকেন।

কোলকাতার বাসায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে সীতানাথ বাবু পত্নী ও শ্যালকসহ কাশ্মীরেই ঘুরে আসবেন ঠিক হল। তপন বাবু বললেন—হ্যাঁ এইবারেই চলুন, যুদ্ধের জন্য কিছু ভাববেন না। ট্রেণে ত' আর যাচ্ছেন না বা এখন যাওয়াও ঠিক হবে না। ফিরবেনই প্লেনে। পৃথিবীর ভূস্বর্গ যে বলেছে কাশ্মীরকে সেটা সত্যি। বোটে থাকবেন, আঙুর খাবেন, দিন কেটে যাবে।

সীতানাথ বাবু বললেন—কিন্তু বাড়ীতে এত জিনিষ পত্র তালা দিয়ে এ সময়ে যাবো—তাই ভাবছি! দিনকাল যে রকম—

তপন বাবু বললেন—যদি দরকার মনে করেন বা ইচ্ছে করেন দামী দামী জিনিষ পত্র সব প্যাক করে ফেলুন, সঙ্গে নিয়ে চলুন—আমি তো খালি প্লেন নিয়েই ফিরছি। তা ছাড়া আমার মালপত্র বলে আমি ফোর্ট উইলিয়ম থেকে শীল করিয়েও আনতে পারি—হারাবার যদি আশঙ্কা করেন।

সবচেয়ে খুসী হয় নন্দিতা। ব্যবহার বুদ্ধিহীন পড়ুয়া একটি লোককে বিয়ে করে তার মনের প্রজাপতিবৃত্তি তৃপ্ত হচ্ছিল না। দৌড় ঝাঁপ করে, ধন দৌলতের বিলাস দেখিয়ে জীবনকে উপভোগ করার পক্ষে সীতানাথবাবু অচল। এদিক থেকে তপন ঠাকুরপোকে হাজারবার ধন্যবাদ না জানালে আর চলছে না।

প্যাকিং চামড়া কিনে আনা হল। দামী পোষাক পরিচ্ছদ, গহনাগাটী সবই যাবে। শুধু আসবাবপত্র, কাঁচের জিনিষ খাট পালঙ্ক—এই সব থাকবে। টেনে নিয়ে যাওয়া ও ফের টেনে আনার হাঙ্গামা ও মেহনৎ পোষাবে না।

নন্দিতা গয়নার বাক্সে চাবি লাগাতে লাগাতে স্বামীকে বললে—তুমি এই হীরের আংটিটা হাতে দিয়ে রাখো বিয়ের জিনিষ; কোথা থেকে কোথায় যাবে

সীতানাথবাবু বললেন—যাবে আর কোথায়? হাত থেকেই বরং চুরি চামারী হতে পারে। অবশ্য প্লেনে যাচ্ছি, সে ভয় নেই। তবু তুমি ছোট বাক্সে রাখো। বাক্সটা বেডিং এর সঙ্গে প্যাক করলেই চলবে'খন। গয়নার বাক্সটা সাবধানে রাখো। ওতেই ত' সব রইলো হাজার বিশ টাকার মত জিনিষ—চোখে চোখে রেখো।

তপনবাবু নন্দিতাকে বললেন—বাঙালীর পক্ষে কাশ্মীর যাওয়া একটা ঘটনা বিশেষ। হিমালয়ের দেশ সেটা, উঁচু নীচু জমি, শ্যামল-সবুজ। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়। মনোরম ধূসর। তার উপর সঙ্গে যদি মনের মত মানুষ থাকে—ঝিলমের সেই আঁকা বাঁকা স্রোতের উপর নিরালা পোল, বর্ণ সৌষ্ঠবে চির নূতন আকাশ—শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে সে জিনিষ নিজে না অনুভব করতে পারলে আদৌ তা' বুঝতে পারবেন না বৌদি।

নন্দিতার মনের বাগানে চঞ্চল একটি হরিণী জেগেছে। একটু খেলতে চায়, ছুটতে চায় উদ্দম গতিতে। স্বামীর দর্শনশাস্ত্রের রজ্জু থেকে মুক্ত নন্দিতা ভাসুক হাওয়ায়, আকাশে—

তপনবাবু বললেন আমার একটা মুস্কিল কি জানেন বৌদি? যাচ্ছেন—এটা খুব ভালো, কিন্তু আপনাদের ফেরবার সময় আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আবাহনের এই মাধুর্য্য নিরঞ্জনের বেদনায় যে কি গভীর রেখাপাত করবে—তা ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

চটপট করে খেয়ে নেওয়া হলো। দুটো ট্যাক্সী ডেকে আনা হয়েছে—আর কাশ্মীরের মত জায়গায়, শীত বস্ত্রেরই ত' গোটা তিনেক মস্ত ভারী মোট হয়েছে। তা ছাড়া বিছানাপত্র, খুচরো জিনিষ গহনা।

বেড়াতে যাওয়ার নেশাই আলাদা। মানুষকে বিহ্বল করে তোলে, পাগল বানিয়ে দেয়। সীতানাথ বাবুও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ট্যাক্সীতে চাপবার সময় বললেন একেই বলে পথের আলাপ। তপনবাবু কে?

আমি কে ? জীবনের গতিপথে দুজনে এখনই একটা বাঁকে মিলিত হলাম—আমাদের উভয়ের জীবন যাত্রায় পরস্পর অপরিহার্য্য হয়ে উঠলাম।

তপনবাবু আর সীতানাথবাবু একট্যাক্সীতে উঠলেন। নন্দিতা আর বিশ্বনাথ অন্যটায়। মালপত্র সবই নন্দিতার ট্যাক্সীতে। তপনবাবু বললো—আপনাদের একটু দুর্ভোগ আছে। আমাকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হবে কোলকাতার শাখা অফিস থেকে, সেখান থেকে যাবো ফোর্টে, মালপত্রগুলো শীল করতে হবে ; কেননা কাশ্মীরে পৌঁছেই সটান আমরা কোয়ার্টারে গিয়ে উঠবো, পরে এরোড্রোম থেকে মালপত্তর আমার ঠিকানায় পৌঁছবে, তা ছাড়া হারাবার ভয় নেই। মিলিটারী জিনিষ হিসাবে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যাবে—

সীতানাথবাবু এ প্রস্তাবে খুব খুশী হলেন। বল্লেন—আচ্ছা আমরা একেবারে দমদমে গিয়ে হাজির হইনা কেন আপনি আপনার ট্যাক্সীতে কাজকর্ম্ম সেরে আসুন।

তপনবাবু বললেন—এক যাত্রায় আবার পৃথক ফল কেন ? একসঙ্গে যেতে কি আপনার কিছু আপত্তি আছে ?

সীতানাথবাবু বললেন—না, না, তা কেন।

তপনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বেশ ত' আপনারা না হয় এক কাজ করুন। ফোর্টের বাইরে প্ল্যাসী গেটের ধারে অপেক্ষা করার চেয়ে আপনারা বরং ফারপোতে বসুন ; আমি মালপত্র বুক করেই ফিরে আসছি। তারপর একসঙ্গেই দমদম যাওয়া যাবে'খন।

ধর্ম্মতলার মোড়ে এসে ঠিক হলো ফারপোতে সীতানাথবাবু শালা বউ নিয়ে অপেক্ষা করবেন—আর ট্যাক্সী করে তপনবাবু ফোর্টে মালপত্র বুক করতে যাবেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন।

নির্দ্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী কাজ হলো। নন্দিতার দিকে চেয়ে তপনবাবু বিদায় নিয়ে ট্যাক্সী চেপে বসলেন, যেটা থেকে নন্দিতা আর বিশ্বনাথ নামলো। তপনবাবু বললেন—মোটরের সীট কি বেইমান বলুন ত বৌদি। আপনারা বসেছিলেন—ঠিক সেই রকম ভাবে গর্ত্ত তৈরী করেছিল, এখন আমার জন্যে আমারই চেহারার সুবিধা মত আরাম অনুযায়ী খোদল তৈরী করবে।

হা হা করে খানিকটা হাসলেন, দার্শনিক সীতানাথ বাবু। হেসে বললেন—আপনিও কম দার্শনিক নন তপনবাবু। এই ধারারই ঘোরানো নাম বিবর্ত্তনবাদ, পৃথিবী অনেকের ছিল—অনেকের সুবিধানুযায়ীই ছিল ; আবার নূতনেরা এলেন, তাদের সুখ সুবিধার অনুপাতে নূতন ভাবে গঠিত হল, ভবিষ্যৎ পৃথিবী নূতন ভাবে নিজেকে তৈরী করবে আগামী দিনের সেই সব মানুষদের সুখ সুবিধা বিলোতে—এও ত' একজাতীয় বিবর্ত্তনবাদ।

মিলিটারী কায়দায় বিদায় হানিয়ে ট্যাক্সী ছাড়ার হুকুম দিলেন তপন বাবু। নন্দিতা চেয়ে রইলো।

রেড রোড ধরে কেল্লার দিকে গাছপালার সবুজের আড়ালে মিলিয়ে গেল ট্যাক্সী। এই পথ—পথ আজ ডাকছে এদের সবাইকে, এস, নন্দিতা এস, আসুন সীতানাথবাবু আসুন ; কাশ্মীর যাবেন ?

ফারপোর ঘরে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায় ? সূর্য্য যে নেমে গেল পশ্চিমের শেষ বাঁক ঘুরে রক্ত রঙ ছড়াতে ছড়াতে, আহা কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্য্য ডোবে, প্রতিদিন আকাশে মেঘে রঙের ছবি আসে, কই মনকে তো এমন দোলা দেয় না। নন্দিতা কিসের এক উত্তেজনায় কোন্ এক আবেগে অধীর হয়ে ওঠে। স্বামীকে বলে—দেখো, হোটেলের জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখ ওই সূর্য্যাস্ত, প্রতিদিন সূর্য্য ডুবছে, সূর্য্য ফের উঠছে—কিন্তু আজকের এই আবির মাখা আকাশ, আজকের এই রঙীন দিনান্ত—এযে চিরদিন মনে আঁকা রইলো।

কাল আবার সূর্য্য উঠবে—ডুববে—কিন্তু মনে কি এমনই দাগ দেবে ?

সীতানাথ বাবু সূর্য্যাস্ত দেখেন—রোজই সূর্য্য নেমে যায় পশ্চিমে—এও তেমনই অনাড়ম্বর বৈচিত্র্যহীন একটা ঘটনা বলেই মনে হয় তাঁর।

এতক্ষণে শুধু বিশ্বনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারে—কমার্সের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্র সে, ডেবিট ক্রেডিটে পাকা। সে হিসেব করে তপন বাবুর লাভ হলো কতটা। কিন্তু বুঝতে দেরীর জন্যে ছটফট করে মনটা।

সূর্য্য ডোবে, ফের সূর্য্য ওঠেও—কিন্তু তপন বাবু আর ফেরেন না।

কেন এলে তুমি প্রিয়া

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

রঙ্ ছিল যবে আকাশে
কেন আস নাই প্রিয়া ?
গোধূলির ধূলি হতাশে মলিন
তোমারে আদরি কি দিয়া ?

কালো এলো-চুলে যেন তারা ফুল—
বনানীর পরে জোনাকী আকুল !
লগন কখন চলে গেল সাধিয়া
কেন আস নাই প্রিয়া ?

স্বামীর ভাই

শ্রীমণি দাশগুপ্ত

আমার স্বামীর ভাই
এমন ছেলে হিন্দুস্থানের
কোন স্থানে নাই।
আমার স্বামীর ভাই ॥

লেখা পড়া দিলেন ছেড়ে
গার্ডের মাথায় ডাণ্ডা মেরে
ধরা পড়ে ম্যাট্রিকেতে
করে টুক্‌লীফাই—
আমার স্বামীর ভাই।

গাড্ডু মেরে একই ক্লাসে
বছর পাঁচেক থেকে
সব বিষয়ে বাছা মোদের
উঠেছে খুব পেকে
ছড়া কাটে ফরফরিয়ে
নাম্‌তা পড়ে গড়গড়িয়ে
এ্যাংলো-চালে ইংরিজি কয়
Ta-Ta, Bye-Bye
আমার স্বামীর ভাই।

অনেক সেধে তেরেকেটে
সা-রে-গা-মা-পা
বেশ শিখেছে লাড়ে-লাপ্পা-
লাড়ে-লাপ্পা-লা।

আনাগোনা হোটেল Barএ
চিত্রতারার বাড়ীর ধারে
চাঁদ্‌নীচকের Suit চড়িয়ে
গলায় বেঁধে Tie
আমার স্বামীর ভাই।

বাক্যবাগীশ কুঁড়ের রাজা
কথাতে ও কাজে
অবস্থাতে চালচুলোহীন
ফোতো-কাপ্তেন সাজে
পকেট কেটে জেলে গিয়ে
ফিরল মাথায় টুপী দিয়ে
নেতা হ'ল এক দলেতে
অপর দলে চাঁই
আমার স্বামীর ভাই।

মেয়ে দিতে চাও যদি কেউ
এমন যোগ্য বরে
দড়ি কলসী সঙ্গে দিও
মেয়ের সুখের তরে
বসে গরীব দাদার ঘাড়ে
সবার Ration একই মারে
পরম সুখে দিয়ে বুকে
হাঁটু কিম্বা Thigh
আমার স্বামীর ভাই ॥

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমলদাই খবরটা নিয়ে এসেছিলো। কী যে ভালো লাগছিলো আমার শুনে! যেন অনেক দিন পরে হঠাৎই একটা আনন্দের ঢেউ এসে লাগ্‌লো মনের কিনারায়, বললাম, নিশ্চয়ই যাবো বিমলদা, যতো কাজই থাক, যাবোই আমি।

বিমলদা হেসে বল্‌লে, হ্যাঁ যাওয়া তো উচিতই আমাদের, হেড্‌ মাষ্টার মশাই বার বার ক'রে বললেন আমাকে, আজ প্রায় পনেরো বছর পরে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে সকলের সংগে একি কম আনন্দের কথা নীরু?

বললাম, আমারো তো সেই কথা?

হেড্‌ মাষ্টার মশাই বললেন,- বিমলদার বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি, দেখাশোনা হ'বার জন্যেই তো এই সভার আয়োজন ক'রেছি বাবা, একদিন তোমরা সব এক সংগে এই স্কুলে পড়তে, তারপরে কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছো, সেই জন্যেই তো প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে এই অধিবেশনের আয়োজন।

সুদীর্ঘ পনেরো বছর আগের কয়েকটা স্পষ্ট আর অস্পষ্ট ছবি মনের উপরে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বিমলদা বল্‌লে, তুই তো এখন ভয়ানক কাজের লোক, তাই ভাবছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারবি কি না।

বল্‌লাম, না বিমলদা, আমি যাবোই!

পনেরো বছর আগের আমাদের সেই কমলদীঘি ইন্‌ষ্টিটিউশানের ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তখন আমরা থাকতাম অম্বিকা ডাক্তার লেনে। কাছেই মেরীডিথ রোডের উপরে ছিলো "কমলদীঘি ইন্‌ষ্টিটিউশান"। ক্লাশ টু থেকে সেই স্কুলে পড়েছি। আহা! সে সব সোনার দিন কি আর ফিরে আসবে কখনো? এই বিমলদা ছিলো আমাদের সেক্‌শানের 'ফাষ্ট বয়'। আমাদের ইংরীজি পড়াতেন সুরেশ্বর বাবু, বড়ো চমৎকার মানুষ, বড়ো ভালোবাস্‌তেন আমাদের। যখন ম্যাট্রিক পড়ি সেই সময়ে একটা হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ক'রেছিলাম আমরা, তাই নিয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন তিনি।

কতোদিন আর দেখা সাক্ষাৎ নেই তাঁদের সংগে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত মনটা কোথায় কোন সুদূরে যেন তলিয়ে গেল!

অধিবেশনের দিন স্থির হ'য়ে ছিলো সাম্‌নের রবিবারে। হাতে অবশ্য সত্যিই আমার অনেক কাজ ছিলো, কিন্তু সব একে একে বাদ দিলাম। একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে এক জায়গায় কিছু প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনাও ছিলো সেদিন—তাও বাদ গেলো।

সভা আরম্ভ হবে ঠিক দু'টোয়। অনেক উদ্যোগ আয়োজন ক'রেও ৫টার আগে আর কিছুতে সেখানে পৌঁছুতে পারলাম না। গিয়ে দেখি গেটের সাম্‌নেই হেড মাষ্টারমশাই দাঁড়িয়ে। প্রণাম করতেই একেবারে যেন জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, আয় বাবা, তোদের জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। বললাম, ভালো আছেন মাষ্টারমশাই?

—হ্যাঁ বাবা! তোদের সকলকে দেখে আজ যে কি আনন্দ হচ্ছে! কতোদিন পরে দেখা!

বললাম, আমাদেরো তাই! সেই পরীক্ষার পর সকলে ছিট্‌কে পড়েছিলাম এদিকে ওদিকে, আজ কেউ আমাদের মধ্যে বড়ো অফিসার হ'য়েছে, কেউ বা নামকরা শিল্পী, সত্যি এ যে কি আনন্দ!

এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হেডমাষ্টার রাখালবাবু এসে দাঁড়ালেন। নীচু হ'য়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। দুই হাত তুলে ধ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, 'জয় হোক্'—এসো বাবা, ভেতরে বস্‌বে এসো!

সমস্ত 'হল্'এর পার্টিশানগুলো সেই আগের দিনের মতো আজো খুলে ফেলা হ'য়েছে।

ছোটবেলার সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লো। প্রতিবছর সরস্বতী পূজোর সময়ে এই 'হল্'এর সমস্ত কাঠের পার্টিশানগুলি এম্‌নি ক'রেই খুলে ফেলা হোত—সমস্ত বিদ্যাভবনে যেন একটা আনন্দের ঢেউ এসে লাগতো। আমরা যেবারে 'ফার্ষ্ট ক্লাশে', পূজোর ভার আমাদের উপরেই যথারীতি এসে পড়লো। হেড মাষ্টার-মশাই একদিন ক্লাশে এসে বললেন, "এবারের পূজোর সমস্ত ভার তোমাদের উপরে—সুতরাং সুশৃঙ্খলায় যাতে কাজ হয়, আশাকরি তোমরা সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে।"

জীবনে এই এমন একটা গুরু দায়িত্ব নেবার আহ্বান, গর্ব্বে আনন্দে বুকটা যে কতোখানি ভ'রে উঠেছিলো, তা ভাবতে আজো সমস্ত মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে।

'হল'-এ ঢুক্‌বার মুখেই শৈলেন সেনের সংগে দেখা। আমাদের ক্লাশের আরেকটা রত্ন। এখন ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার হ'য়েছে—চেহারায় অনেকটা গাম্ভীর্য্য নেমেছে। হাতটা ধ'রে কথা বলতে আরম্ভ করলো সে। কতোদিন পরে দেখা, দুঃখ করলো খুব। বললে, এতোবড়ো লেখক হ'য়েছো তুমি, কাগজে তোমার কতো লেখা পড়ি, অথচ একদিনো দেখা হয় না তোমার সংগে। কতোদিন ইচ্ছে হ'য়েছে একদিন বাড়ী গিয়ে তোমার সংগে দেখা ক'রে আসি, তা ভাই যা কাজের চাপের মধ্যে আছি।

বললাম, আমাদেরো তো সেই অবস্থা, যতো বয়েস বাড়ছে ততোই যেন হু হু ক'রে সময় ক'মে যাচ্ছে জীবন থেকে।

—হ্যাল্লো নিরুপম! পিছন থেকে আকস্মিক এক যেন আক্রমণ। ফিরে দেখি রবি মিত্তির! আমাদের ক্লাশের সেই দুষ্টু দুরন্ত রবি এখনো প্রায় সেইরকমই আছে। স্যুট্ প'রে এসেছে, টাটার কারখানায় সে এখন মস্ত বড়ো এন্‌জিনিয়র—খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলো। বললে, কিহে, ভালো ছেলের সংগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা হচ্ছে বুঝি?

ওরদিকে চেয়ে একটু মুচকি হাস্‌লো শৈলেন, বল্লে, আর সে ভালোত্ব নেই ভাই—সংসার-চক্রে পড়ে এখন অন্য রকম আকার নিচ্ছে জীবনটা!

বললাম, বিয়ে করলি, একবারো একটা খবর তে দিলি না, তারপর এমন একখানা লাভ ম্যারেজ'!

ঈষৎ চোখটা যেন কেমন নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলো রবির, তবু বললে, ড্যাম ইট্—ছেড়ে দে ভাই ও সব কথা। ব'লে প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চুরুট বের করতে যাচ্ছিলো, সাম্‌লে নিলো।

পরিতোষ এসে সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে আভূমি কুর্ণিশের ভঙ্গীতে অভিবাদন করলো। হেসে ফেললাম,

বললাম, চেহারাটার কিন্তু বেশী উন্নতি করতে পারিস্‌নি, তবে বাইরের উন্নতিটার খবর রাখি। তোর ওপরে লেখা প্রবন্ধ পড়েছি ভারতবর্ষে, এখন আছিস কোথায়?

হেসে বললে, পাতিয়ালায়। ওখানকার ষ্টেটের কাজই করতে হয়, তা ছাড়া দু'একটা গভর্ণমেণ্ট অর্ডারও পাচ্ছি—সম্প্রতি ক্ষুদিরামের লাইফ সাইজ মূর্ত্তি গড়ছি।

বললাম, তোর ভাস্কার্য্যের এই সাধনা জয়যুক্ত হোক্‌' এই প্রার্থনা করি, তারপরে বিবাহাদি—?

হেসে বললে, হ'য়ে ওঠেনি, তা ছাড়া বেশ তো আছি—আবার কেন ঝন্‌ঝাট্‌?

দেখতে দেখতে সমস্ত হলঘরটা ভ'রে উঠলো। আমরা এসে এক জায়গায় বসলাম। ক্লাসের সব বেঞ্চিগুলিকে সুন্দর ক'রে চারদিকে সাজিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। আমাদের অঙ্কের মাষ্টার মশাই অবনী বাবু এসে সন্মুখে দাঁড়ালেন। সেইগম্ভীর মুখ ঠিকই আছে, কিন্তু আজ তা স্নেহে অদ্ভুত কোমল দেখাচ্ছিলো। ভয়ে কোনো দিনোক্লাসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে পারিনি। আমাদের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, কি আজ যে সব বড্ড কথা বলা হ'চ্ছে, বেঞ্চির উপরে দাঁড়াবার ভয় নেই বুঝি?

একটা উচ্ছ্বসিত হাসির রোল উঠলো আমাদের মধ্যে।

হেডমাষ্টার মশাই ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন। সুধীর বাবু আমাদের ইংরেজী গ্রামার পড়াতেন। প্লাট্‌ ফরমের উপরে রাখা টেবিলটার উপরে একটা টেবলক্লথ ঢেকে দিয়ে গেলেন—মনীশ বাবু এক পাঁজা মাটির গ্লাস নিয়ে ওদিকের ঘরে চ'লে গেলেন, দেখলাম। আজ আমরা প্রত্যেকেই যেন এক একটি মাননীয় অতিথি, আর ওঁরা আমাদের আতিথ্যের জন্যে শশব্যস্ত হয়ে চারদিকে ঘুরছেন।

কিন্তু খুব আশ্চর্য্য লাগছিলো বিমলদা আর নীহার এখনো আস্‌ছে না দেখে। স্কুল ছাড়বার পর প্রায় প্রাত্যহিক সংযোগ মাত্র এদের দুজনের সংগেই আমার

গভীর ছিলো। অন্তরংগতাও সব থেকে বেশী এদের সংগে, তারা আজকের এই উৎসবের বার্ত্তা বহন ক'রে বিমলদাই সব প্রথমে আমার কাছে এসেছিলো—নীহারেরও উৎসাহ কম দেখিনি। একটু সংশয়াকুল চিত্তে তাই ঘন ঘন গেটের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে রাখাল বাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললাম, স্যার বিমল এখনো আসে নি?

বললেন, কই বাবা, না তো! তবে এখনো তো সময় যায়নি—এই এসে পড়লো ব'লে!

আবার দরজার দিকে চাইলাম, দেখি ওঁর কথাই ঠিক। বিমলদা আর নীহার দুজনে ঢুকছে হলের মধ্যে তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে গেলাম, বললাম, উঃ—এতো দেরী ক'রে এলি তোরা?

নীহার হাসলো একটু, বললে, একটা মিটিং ছিলো পার্টির, তাড়াতাড়ি কোনরকমে শেষ করে চ'লে এলাম—বিমলকেও ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।

তিনজনে এসে বসলাম পাশাপাশি—আবার সমস্ত হলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হ'লো।

প্রায় সাতটার কাছাকাছি সভা আরম্ভ হোল। হেড মাষ্টার মশাই এসে প্লাটফরমের উপড়ে দাঁড়ালেন। বললেন আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিন, অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিলো, তোমাদের, সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে এই রকম একটা প্রীতিসম্মেলন করি, তা নানা কারণে আজো পর্য্যন্ত সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। আজ তোমরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত—সত্যিকারের জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হ'য়েছে তোমাদের—আমাদের এই ক্ষুদ্র বিদ্যাভবন থেকে তোমরা যে সকলে একে একে একদিন বৃহত্তর পৃথিবীর রাজপথে পা বাড়িয়েছিলে, আজ সেই কথা মনে ক'রে আমাদের আনন্দের সীমা নেই। —বক্তৃতা চলতে লাগলো। মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে তাঁর কথা বলার ভংগীটাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম শুধু,—কি তিনি বলছেন তার দিকে লক্ষ্য রইলো না। কিন্তু আবেগের সংগে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কিভাবে কথা বলছেন তাই দেখেই বড় ভালো লাগছিলো—আজকের এই সম্মেলনের মধ্যে সব থেকে চোখে বড়ো হোয়ে লেগেছে সকলের হাসি। মনে হোলো আজকের দিনটার ইতিহাস আমার জীবনে লাল অক্ষরে লেখা হ'য়ে থাকবে—এমন অনাবিল আনন্দের নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে কচিৎই জোটে আজকাল।

হেডমাষ্টার মশাইএর বক্তব্য শেষ হোলো। করতালি ধ্বনিতে সমস্ত হল যেন ভেঙ্গে পড়লো। এবারে উঠলেন আমাদের এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হেড্‌মাষ্টার রাখালবাবু। তিনিও সেই একই ভাবে তাঁর আন্তরিক আনন্দের কথা বললেন আমাদের। সকলের শেষে অনুরোধ করলেন, একটা কমিটী ক'রে যাতে প্রতি বছরেই এই রকম একটি প্রাক্তন ছাত্র সভার আয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করতে—বিদ্যাভবনের যাতে ক্রমিক উন্নতি হয় তার জন্যে আমাদের ভাবতে—কারণ এ সম্বন্ধে দায়িত্ব তো নিশ্চয়ই আজো আমাদের কিছু আছে।

চুপচাপ গম্ভীর মুখে নীহার আর বিমলদা আমার পাশে ব'সে ছিলো, এইবার ঈষৎ একটু যেন ন'ড়ে উঠ্‌লো নীহার—চাপা একটা বিদ্রুপের হাসিতে তার সমস্তটা ঠোঁট বেঁকে গেলো, ব'ললে, হ্যাঁ, তা তো আছেই!

বক্তৃতার শেষে রাখালবাবু বললেন, আজ আমাদের সব থেকে বড়ো আনন্দের দিন, তাই এই সন্ধ্যায় তোমাদের আনন্দের জন্যে এর পরে আমরা সামান্য কিছু ম্যাজিক দেখানোর আয়োজন ক'রেছি। যিনি যাদুকর তিনি আমাদের এই পল্লীরই অধিবাসী, হয়তো তোমরা এর থেকে অনেক ভালো ভালো যাদুবিদ্যা দেখেছো, কিন্তু তবু আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।

সমস্ত হলের মধ্যে আবার হাততালি পড়লো।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পাশ থেকে নীহার সোজা হোয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ মুখ তার রীতিমতো উত্তেজিত। হেড্‌মাষ্টারমশাইএর দিকে চেয়ে বললে, আপনাদের সকলের কাছে কিছু বক্তব্য ছিলো—যদি অনুমতি দেন তো তা নিবেদন করি।

রাখালবাবু একবার আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন নীহারের দিকে। তিনি জানতেন নীহারকে। বুঝলেন, একটা ঝড়ের একটু সুস্পষ্ট ইংগীত। বললেন, এখানে

আর কি বলবে, তোমরা কমিটী করো ক'রে সেইখানেই বলো—তার চেয়ে এবারে আমাদের ম্যাজিক আরম্ভ হোক্।

ভূগোলের মাষ্টারমশাই সরসীবাবু চুপচাপ এতোক্ষণ একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, আহা ও বল্‌তে চাইছে, ওকে বল্‌তে দেওয়া হোক্ না।

ভুঁখা বাংলা

আর অপেক্ষা করলে না নীহার, বিদ্যুৎ গতিতে এক লাফে গিয়ে এবারে সে উঠ্‌লো প্ল্যাটফরমের উপরে, তারপরে সকলের উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে সাধারণ জনসভায় যেমন ক'রে সে বক্তৃতা দেয়, অবিকল সেই ভংগীতে আরম্ভ করলো: ভাই সব,—আজ তোমাদের কাছে আমি একটা আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। কিছু বলবার আগে আমাদের প্রণম্য মাষ্টার মশাইদের এই ব'লে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আজ এই সভায় তাঁরা আমাকে কিছু কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি আমার যা বক্তব্য তা তো বলবোই, তা ছাড়া আমার বন্ধু বিমলও তোমাদের কিছু বলবে। ভাই সব, একটু আগে আমাদের এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার মশাই বললেন, বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে আমরা যেন প্রত্যেকেই ভাবি এবং একটা কমিটী ক'রে তার সুপরিচালনার সুব্যবস্থা করি। ভাই সব, তোমরা এটা জেনো, আমিও তোমাদের মতো একদিন খুবই শিশুকাল থেকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম—আমার সেই শৈশব জীবনের অনেকটা অংশ তোমাদের অনেকের মতোই আমারো এখানে কেটেছে—এ বিদ্যাভবনের উপরে আমার কৃতজ্ঞতা আরো বেশী এই কারণে যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে ছুটিরকাল কখনো বিনা বেতনে এবং কখনো অর্দ্ধ বেতনে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ দিয়েছিলেন, আনন্দের সঙ্গে আজ সে কথা স্বীকার করেই তোমাদের কাছে সুখ-দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি সেই পবিত্র বিদ্যাভবনে দারুণ অনাচার প্রবেশ ক'রেছে—ভাই সব, সেই সব কথা তোমাদের সকলকেই জানিয়ে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে এসেছি। উত্তেজিত গলায় নীহার চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো: আজ আমাদের এখন সব থেকে বড়ো দায়িত্ব হবে এই বিদ্যাভবনকে সেই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। তোমরা বোধহয় জানো না, আজ কয়েক বছর হোলো সোমেশ্বর রায় বলে এক ভদ্রলোক এখানে অঙ্কের মাষ্টার হ'য়ে এসেছেন, কিন্তু তোমরা শুনে শিউরে উঠ্‌বে যে সেই সোমেশ্বর রায়···রাখালবাবু এবারে নীহারের কাছাকাছি এসে শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন, ছি নীহার এ কি করছো তুমি?—একবার তাঁর দিকে চেয়ে নীহার দ্বিগুণ উত্তেজনায় আবার আরম্ভ করলো, ভাই সব, তোমরা জানোনা সেই সোমেশ্বর রায় কতো বড়ো লম্পট, তার

নৈতিক জীবন কি ভয়ানক অন্ধকারে ঢাকা—আর ভেবে দেখো সেই সব মানুষের হাতে যদি কোমল মতি শিশুদের শিক্ষার ভার থাকে—

সমস্ত হলের মধ্যে মুহূর্ত্তে একটা উত্তেজনার ভাব ছড়িয়ে পড়লো, অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হ'লো চারিদিকে—এক কোন্ থেকে একটী ছেলে চীৎকার ক'রে বললো, 'খুব থিয়েটার হ'য়েছে ভাই—এবার ব'সে পড়ো!' 'বসে পড়ুন' 'বসে পড়ুন' আরো দু' একটা শব্দ এদিক-ওদিক থেকে শোনা গেলো। কিন্তু নীহার আজ অদম্য, আজ সে যা বলবে ব'লে সংকল্প ক'রে দাঁড়িয়েছে, তা যে-কোনো উপায়ে হোক বল্‌বেই। চীৎকার ক'রে আবার সে আরম্ভ করলো, ভাই সব, তাই বল্‌ছি, ম্যাজিক দেখ্‌তে আমরা এখানে আসিনি, ম্যাজিক অনেক দেখেছি জীবনে, এবারে এখানে সত্যিকারের আসল ম্যাজিক দেখ্‌তে চাই। আমরা লজেনচুস খাওয়া ছোট ছেলে নই যে, ম্যাজিক দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌বেন এঁরা—ম্যাজিকের বয়েস পার হ'য়ে গেছে—যে ঘোরালো আর অন্যায় ম্যাজিক তাঁরা রোজ দেখাচ্ছেন তার শেষ হওয়া চাই।

মুহূর্ত্তে সেই যাদুকর ভদ্রলোকের মুখের উপরে আমার চোখ গিয়ে পড়লো, সমস্ত মুখ তাঁর ম্লান হ'য়ে উঠেছে, হেড মাষ্টার মশাই মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছেন—রাখাল বাবু প্ল্যাটফরম্ থেকে নেমে এসেছেন, নীহার তার বক্তব্য শেষ ক'রে বললে, কই সেই সোমেশ্বর রায়? আজ ভয়ে তিনি সভাতেই আসেননি দেখ্‌ছি!" তারপরে বিমলকে ডেকে বললে, বিমল, এবার তোমার কথা বলে যাও।

'শেম, শেম' একটা বিকট চীৎকার উঠ্‌লো সভার মধ্যে। সরসীবাবু এবারে একেবারে প্ল্যাটফরমের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, যাওনা বিমল, যদি তোমার কিছু বলবার থাকে।—বিমলদা শুধু মাথা নাড়লো একবার, তারপরে বললে, না, আমি কিছু বলবো না।

আর আমি মাথা নীচু ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম। এক-একটী মুহূর্ত্ত এক-একটী ঘণ্টার মতো যেন মনে হোতে লাগলো আমার, শুনলাম আবার সমস্ত সভা আস্তে আস্তে নীরব হ'য়ে আসছে, পিছন থেকে শৈলেন উঠে দাঁড়িয়েছে, সে বল্‌ছে, আজ খুব দুঃখের সংগে আমার বন্ধু নীহারের কথার একটা উত্তর দিতে হচ্ছে। আমরা ভাব্‌তে পারিনি, এমন একটা আনন্দের পরিবেশের মধ্যে এমন একটা জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ উপস্থিত হ'য়েছে। সত্যিই যদি এ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুবরের কিছু অভিযোগ করবার থেকেই থাকে তবে তা যথাস্থানে গিয়ে তার করা উচিত ছিলো—এ ভাবে আমাদের সকলের আনন্দকে চূর্ণ ক'রে দেবার কোনো অধিকার তার নেই।

পিছন থেকে কে একজন ব'লে উঠ্‌লো, দাওনা ছোকরাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে—তা হ'লেই তো সব গণ্ডোগল মিটে যায় বাবা—!

শৈলেন এবারে ব'সে পড়লো। এখান থেকেই দেখ্‌তে পেলাম, রাগে-দুঃখে তার সমস্ত মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

মাথা নীচু ক'রে চুপচাপ অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম আমি। এদিকে ততক্ষণে প্ল্যাটফরমের উপরে ম্যাজিক দেখানো আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোক একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে থেকে একে একে অসংখ্য রুমাল বের করছেন। নীহার এসে চুপচাপ আমার পাশে বস্‌লো, বিমলদা গম্ভীর মুখে তেম্‌নি ভাবেই ব'সে রইলো।

তাদের পাশে পাথরের মতো আমিও চুপচাপ ব'সে রইলাম। সমস্ত হলের মধ্যে আবার একটা মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছে। সব থেকে বিস্মিত হ'য়েছিলাম আমি নিজে, কারণ ওদের দু' জনের সংগে অন্তরঙ্গতা আমারই বেশী—অথচ ঘুণাক্ষরে ওদের এই ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জান্‌তে পারি নি।

আস্তে আস্তে একসময়ে উঠে পিছনের দিকে চ'লে গেলাম। ম্যাজিকের আসর আর তেমন ক'রে জম্‌লো না। দরোজার কাছে দু'তিনটী ছেলের সঙ্গে শৈলেন দাঁড়িয়েছিলো, এগিয়ে গেলাম, বললাম, আজ আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হোলো ভাই শৈলেন, সব থেকে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জানো, ওরা আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু,

কিন্তু ওদের মনে যে এ-সব ছিলো এর আগে একদিনের জন্যেও তা বুঝ্‌তে পারিনি। বললাম, তুমি ঠিকই ব'লেছো, তুমি না বললে খুবই অন্যায় হোত!

একটু পরেই নীহার আর বিমলদা উঠে পড়লো। বললে, ৯টার সময়ে ওদের কোন লাইব্রেরীর একটা জরুরী মিটিং আছে, যেতেই হবে। রাখালবাবু ওদের পথ আটকালেন, বললেন, তোমরা যখন এসেছো, তখন একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে যেতে পারবেনা বাবা, এসো। কিন্তু ওরা কিছুতেই খাবে না, তবু রাখালবাবু ছাড়লেন না, হেডমাষ্টার মশাই নিজে এসে চা জল-খাবার পরিবেশন করলেন তাদের।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলাম। আজকের দিনের আমার সমস্ত আনন্দ যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে। এতোক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বিনা কাজেই ঘুরে বেড়িয়েছি। কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছিনা। সব থেকে দুঃখ হচ্ছিলো আমার বিমলদার উপরে। তার মতো মানুষ যে হঠাৎ এমন ভুল ক'রে ফেলবে এ কথা কোনো-দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। পরে অবশ্য সব জিনিষটাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে। যখন ওরা বেরিয়ে আসে তখন দেখি অন্ধকারে সরসীবাবু ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি একটু দূরেই ছিলাম, সরসীবাবু বললেন, বিমল তুমিও বললে পারতে, কী যে ভুল করলে,—নীহার আজ খুব ব'লেছে!

মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনাটা যেন দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো আমার চোখে। চুপচাপ ফিরে এলাম। আমি জানি সরসীবাবুকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি যে কিনা করতে পারেন তাও আমি জানি।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতে ঘুম এলো না। বিমলদাকে আমি মনে-প্রাণে চিনি। জানি তার ভুল সে একদিন বুঝ্‌তে পারবেই। কোনোদিন সে কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারেনা, আর নীহার? তার মতো স্পষ্টবাদী নির্ভীক ছেলে জীবনে কম দেখেছি। এই দুটী সরল ছেলের সরলতার সুযোগ নিয়েছেন সরসীবাবু। আমি জানতাম, গত বছরে তাঁরই এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হেডমাষ্টার হ'বার কথা ছিলো কিন্তু কোনো কারণে তা হয়নি, তাই সমস্ত বিদ্যাভবনের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ এইভাবে ফুলে উঠেছে—আর সকলের সামনে এম্‌নি ভাবে আমাদের সেই বিদ্যাভবনকে ম্লান ক'রে দেবার অস্ত্র স্বরূপে বেছে নিয়েছেন বিমলদা আর নীহারকে।

অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আমার যেন ভয়ে কান্না পেতে লাগলো, মনে হোলো, নীহার এ ভুল করতে পারে কিন্তু বিমলদা—বিমলদা কেন এ ভুল করলো?

হেডমাষ্টার মশাই-এর সেই ক্লান্ত অপমানিত ম্লান মুখটা চোখের উপরে আরেকবার ভেসে উঠলো। তার পরে রাখালরাবুর নীহারকে থামাবার সেই আকুল প্রচেষ্টা, তার পরে সেই যাদুকর ভদ্রলোকের অপ্রতিভ মুখমণ্ডল। মনে হোল হল-এর সমস্ত আলোগুলো দপ দপ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে এইবার বুঝি একসংগে হঠাৎই সব নিভে যাবে—অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলাম—'বিমলদা?'

মনে হোল আমার সেই আধো-জাগরণ এবং তন্দ্রার মধ্যে বিমলদা যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, না ভাই, আমি তো আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম।

ভালো ক'রে চোখ চাইবার চেষ্টা করলাম একবার স্পষ্ট দেখলাম, আমাদের সেই বিদ্যাভবনের সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় আলোগুলি আবার যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।
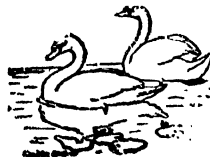
চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী

বালীগঞ্জ ফার্ণ রোডে "প্যারাডাইজ" বাড়ীর মালিক মিঃ এস, রয়। মিঃ রয় হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার। দশ বছর পুর্ব্বে মিসেস রয় একমাত্র পুত্র দীপক ও স্বামীকে রেখে মারা গেছেন। "প্যারাডাইজ" বাড়ী বাস্তবিকই একখানি বর্ত্তমান যুগোপযোগী আধুনিক সৌধ। বাড়ীর পিছনে বিরাট 'লন'—দু' পাশে সুন্দর বাগান। সামনে গেট—গেটের উপরে যুঁই ও মাধবীলতার কুঞ্জ। রাস্তা থেকে একটু দূরে বাড়ী—সামনের দিকে "পর্টিকো"। গেটে বসে থাকে সর্ব্বক্ষণ বন্দুকধারী দারোয়ান—তার পোষাক-পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাড়ার লোকেরা বলে রায় সাহেবের বাড়ী। প্রতিবেশীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—তাদের গতিবিধি নাই এই বাড়ীতে।

"প্যারাডাইজ" সৌধে বাস করে দুটি প্রাণী—মিঃ রয় ও তার যুবক পুত্র দীপক। দীপক নব্য ব্যারিষ্টার। সে নিত্য নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ পড়ে কোর্টে যায়—রুচি ও আদব-কায়দা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। বার লাইব্রেরীতে তার একটি নির্দ্দিষ্ট বসবার স্থান আছে—তার টেবিলে আইনের বই খুব কম—অধিকাংশই সচিত্র বিলাতী মাসিক। সে অধিকাংশ সময় যাপন করে ছবি দেখে—মুখে চব্বিশ ঘণ্টা পুড়ছে 'সিগার'। বারের জুনিয়র মেম্বররা তার নাম রেখেছে "খোকা ব্যারিষ্টার"। তাদের উপর সে ভয়ানক খাপ্পা। দু' এক দিন এই নিয়ে অনেক বচসা হয়ে গেছে। 'খোকা ব্যারিষ্টার' বললেই সে হয় চটে লাল। তার সঙ্গে বসে সমর চৌধুরী—ইনি ১০ বছর বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন। দেশে ফিরেছেন এক 'মেম' পত্নী নিয়ে। তার সমসাময়িকরা বলে এই বিবি ছিল 'ইনে'র ধোপানী। চৌধুরী বলে, তার শ্বশুর ছিল কোন 'লর্ডের' নাতি। চৌধুরী বাস করে 'সাদার্ণ এভিনিউ'-র এক 'ফ্ল্যাট' বাড়ীতে, ভাড়া দেয় মাসিক ৩৭৷৷০ টাকা—কলকাতার এটর্ণীরা নাকি কদর বুঝল না তাই তার "ব্রিফ" মেলে না। সে 'ব্যাগু' ঝুলিয়ে যাতায়াত করে পুলিশ কোর্টে—সেখানে বসে গালাগাল করে এটর্ণীদের আর তালিম করে পুলিশ কোর্টের উকিলদের। ছোট আদালতে ঢোকে না। সেখানে বাড়ীওয়ালা ডিক্রী করেছে তার নামে তিন তিনটা—আলীপুর মুন্সেফ কোর্টে দু' বছর চলছে উচ্ছেদের মোকদ্দমা। চৌধুরী এক চক্কর পুলিশ কোর্টে ঘুরে এসে বসে রায়ের পাশে। চৌধুরী স্তবগান করে রায়ের, গালাগাল করে রায়ের প্রতিপক্ষদের। বারে রটণা করে কুলোকে রায় আর্থিক সাহায্য করে চৌধুরীকে প্রতি মাসে, তাই বন্ধুত্ব এত নিগূঢ়। চৌধুরী নিত্য আসে কোর্টে খোকা ব্যারিষ্টারের খোকা 'অষ্টিন' গাড়ীতে। রাস্তায় দুই বন্ধুতে করে কত আলাপ-আলোচনা—আর চৌধুরী মুণ্ডপাত করে জজ-এটর্ণীদের—তাকে কেউ দিলে না নেহাৎ একটা "রিসিভার-সিপ"। হ্যাঁ, হাকিম ছিল ছোট আদালতের প্রধান জজ রহমান সাহেব—সে দিয়েছিল তাকে তিন তিনটে ভাল কমিশন, কোন হাইকোর্টের। তার মেম সাহেব দেখা করে আদায় করেছিল সেই কমিশন।

সিনিয়র কৌন্সুলী মিঃ সাণ্ডাল একদিন বলেছিলেন খোকা বারিষ্টারকে কেন সে থাকে না তার বাবা মিঃ রয়ের সংগে সংগে কাজ শিখতে। দিলীপ তো রেগে টং—মিঃ সাণ্ডালকে বললে: "সার্, মাইণ্ড ইওর অউন বিসিনেস্"। মিঃ সাণ্ডাল হলো মর্ম্মাহত খোকা ব্যারিষ্টারের অশিষ্ট ব্যবহারে। এই কথা প্রচারিত হল মুখে মুখে বার এসোসিয়েশনে। সিনিয়র কৌন্সুলীরা হল রুষ্ট। মিঃ রয় পুত্রের আচরণ শুনে হলেন লজ্জিত। মিঃ সাণ্ডাল মিঃ রয়ের সহপাঠী ও বন্ধু—তারপর সাণ্ডাল প্রস্তাব করেছিলেন তার একমাত্র সন্তান মিস শোভনার সংগে দিলীপের বিবাহের এবং মিঃ রয় সানন্দে হয়েছিলেন রাজী এই প্রস্তাবে, যেহেতু শোভনা সুন্দরী বিদুষী মেয়ে

—অভিজাত সমাজে শোভনার মত মেয়ে দুর্লভ। আর এই মেয়ে পাবে পিতার অগাধ সম্পত্তি। তাই দিলীপের এই অশিষ্ট আচরণ এক গভীর রেখাপাত করল মিঃ রয়ের অন্তরে।

সেকালে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরলে অনেকের একটি কু অভ্যাস বা সভ্যরুচি ছিল মদ্যপানের। এরা প্রচার করত, সভ্য সমাজে মিশতে হলে একটু ড্রিঙ্ক না করলে অংগ হানি হয় সভ্যতার। বিলাতে পিতামাতা পুত্রকন্যা একসঙ্গে বসে করে মদ্যপান—তারা এটাকে মোটেই অন্যায় বা নৈতিক অবনতি বলে মনে করে না। মিঃ রয় সেই আদর্শে আদর্শবাদী, সুতরাং তিনি প্রত্যহ পান করতেন 'হুইস্কী'। এই তরল পদার্থ পেটে না গেলে নাকি তার খোলেনা মাথা। প্রথম বয়সে খুব চলছিল এই পানাহার কিন্তু স্ত্রী সরলা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী নারী, তিনি স্বামীর এই পানাসক্তিকে করলেন 'কনট্রোল' নানাবিধ ফিকিরে। তার মদ্যপ সংগীরা হলেন মনোঃক্ষুণ্ণ—একে একে তারা সব সরে গেলেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার সংযম গেল টুটে। বরং জুটল আর একটি ম'কারের উপসর্গ।

গোকুল রয় সাহেবের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য। মনিবের জন্য সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। মিসেস রায়ের মৃত্যুর পর গোকুলের ঘাড়ে চাপল গৃহস্থপণার সব কিছু কাজ। গোকুল হল একাধারে ঘরের গিন্নী বাইরের সংগী। চাকর গোকুল প্রভুর পদস্খালনে হ'ল মর্ম্মাহত—কি করে তার মনিবের সুমতি ফিরে আসবে তাই সে ভাবে অহর্নিশি। সে প্রার্থনা করে বিভুর চরণে ফিরাতে প্রভুর মতি গতি। সব সময়ে গোকুল থাকে মিঃ রয়ের সংগে ছায়ার ন্যায়। মিঃ রয় সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন গোকুলের হাতে, গোকুলের হাতে এনে দিতেন উপার্জ্জিত অর্থ গোকুল ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাত, বাড়ীর খরচ-পত্র করত। সন্ধ্যার পর মিঃ রয় যাত্রা করতেন নরকের পথে—সংগে থাকত গোকুল।

একদিন গোকুল টেলিগ্রাম পেল স্ত্রী তার মৃত্যুপথ-যাত্রী। টেলিগ্রাম মনিবের হাতে দিয়ে গোকুল যুক্ত করে প্রার্থণা জানাল ছুটির। মিঃ রয় টেলিগ্রাম পড়ে বিমর্ষ মুখে বললেন: "তাই তো, তোমার বাড়ী যাওয়া খুবই প্রয়োজন। কিন্তু গোকুল তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে কি করে?" অসহায় ভাবে তাকাল মিঃ রয় গোকুলের মুখের পানে। গোকুল হৃদয়ঙ্গম করল মিঃ রয়ের অসহায় অবস্থা। যাবার প্রাক্কালে গোকুল নতজানু হয়ে মিঃ রয়ের পা দু'খানা জড়িয়ে প্রার্থনা করল: "বাবা, আমার অনুরোধ আমি না ফিরে আসা অবধি রাত্রে বাড়ীর বাইরে যাবেন না।" গোকুল তার অবর্ত্তমানে রেখে গেল তার একটি আত্মীয়কে রয় সাহেবের বাড়ীতে।

এক মাস পর। গোকুল ফিরল কলকাতায় সংগে নিয়ে তার কিশোর পুত্র মহাতাপকে। সে জানাল মনিবকে তার স্ত্রীর মৃত্যুবার্তা। সংসারে তার আছে একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মহাতাপ পড়ছিল দেশের স্কুলে কিন্তু মহাতাপ থাকতে চাইল না দেশে, তাই গোকুল সংগে এনেছে তাকে। মিঃ রয় সব কথা শুনে সমবেদনা প্রকাশ করল গোকুলের স্ত্রী-বিয়োগে। নির্দ্দেশ দিলেন মহাতাপকে ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করতে। মহাতাপের পড়া-শুনার সব ভার বহন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ রয়। গোকুল আনন্দের আতিশয্যে রয়ের পা জড়িয়ে ধরল—চোখে ফুটে উঠল আনন্দাশ্রু। মহাতাপ আশ্রয় পেল ধনীর গৃহে—অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে বর্ষণ করল আশীর্ব্বাদ মহাতাপের মস্তকে।

দিলাপ দেখল গোকুল একমাস দেশে ছিল তার বাবা যায়নি নৈশ ভ্রমণে। তার মনে একটা ধারণা জন্মাল যত সব নষ্টের গোড়া হল ঐ বেটা গোকুল উড়ে। আবার গোকুল ফিরে আসতে না আসতেই মিঃ রয় সুরু করলেন নৈশ অভিযান। গোকুলের উপর চটল হাড়ে হাড়ে খোকা ব্যারিষ্টার। দিলীপকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে গোকুল—অনেক আব্দার, কিল-গুঁতো-লাঠি সহ্য করেছে ঐ বৃদ্ধ গোকুল। চক্ষুলজ্জা সেই কারণে, নয়তো খোকা ব্যারিষ্টার গোকুলের মাথায় লাঠি মেরে দু'ভাগ করে দিতো কোন দিন! মুশকিল বেঁধেছে সেখানে। গোকুল এখনও তদারক করে, সেবা করে দিলীপকে প্রতিদিন। কোর্টে যাবার প্যাণ্ট সার্ট কোট সাজিয়ে রাখে—কোন্ দিন কোন্ জামাটি পড়বে গোকুল জিজ্ঞেস

করে দিলীপকে। ইদানীং সে খুব কম কথা বলে গোকুলের সংগে। ইদানীং দিলীপের ব্যবহার হয়েছে রুক্ষ। গোকুলকে "দাদা" ব'লে ডাকত, এখন ডাকে গোকুল ব'লে। কোনদিন রেগে ডাকে 'ওরে বেটা উড়ে! গোকুল অবাক হয়ে ভাবে খোকা সাহেবের এই পরিবর্ত্তনের কারণ, কিন্তু 'কারণ' খুঁজে পায় না এই সরল প্রভুভক্ত চাকর। পূর্ব্বে দেশ থেকে ফিরলে এই খোকা সাহেব জিজ্ঞাসা করত গোকুলকে তার ঘরের কুশলবার্ত্তা, আরো কত কথা। চেয়ে নিতো শ্রীজগন্নাথ দেবের মিষ্টি প্রসাদ, ভক্তিভরে নয় রসনা তৃপ্তির জন্য। কিন্তু এইবার দিলীপ একটি কথা জিজ্ঞাসা করে নি গোকুলকে। মহাতাপের আসার পর গোকুলের কিছু সময় যায় ছেলের তদারক করতে, দিলীপ এই অজুহাত নিয়ে কটু কথা বলে গোকুলকে—তার ত্রুটী খুঁজে বের ক'রে অকারণ দিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা গোকুলকে। গোকুল নীরবে সহ্য করে খোকা সাহেবের অন্যায় ব্যবহার।

কয়েক মাস পর। একদিন বাড়ীর গরু দড়ি ছিড়ে বাগানে ঢুকলে, মহাতাপ যায় গরু ধরতে কিন্তু গরু গিয়ে ঢুকল খোকা সাহেবের ফুল বাগানে—ভাঙ্গল তার কয়েকটি ফুলের টব। দিলীপ সেই দৃশ্য উপর থেকে দেখে ক্রোধান্ধ হয়ে নামল নীচে হাতে নিয়ে বেতের ছড়ি। বিনা বাক্য-ব্যয়ে 'শপাং' 'শপাং' ক'রে মারল কিশোর মহাতাপের সর্ব্ব শরীরে। বালক হ'ল মূর্চ্ছিত। গোকুল ছাড়াতে এসে খেলো কয়েক ঘা—তার কপাল ফেটে ছুটল রক্ত। গোকুল রক্তাক্ত কলেবরে পুত্রের শুশ্রূষা করল। বাগানের মালিরা ও বাড়ীর অন্যান্য চাকররা এল ছুটে গোকুলকে সাহায্য করতে। বালক মহাতাপ হ'ল শয্যাশায়ী। মিঃ রয় বাড়ী ফিরলে প্রত্যহ মহাতাপ খুলে দেয় তাঁর জামা-জুতা। সেদিন কোর্ট থেকে বৈকালে রয় সাহেব বাড়ী ফিরলে মহাতাপকে না দেখতে পেয়ে মিঃ রয় মহাতাপের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করল। গোকুল মাথা হেট ক'রে নীরবে রয় সাহেবের জামা, জুতা খুলতে লাগল। মিঃ রয় গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল তার কপালে গভীর আঘাতের চিহ্ন। তিনি গোকুলকে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে দরজায় ব্যস্তভাবে দেখা দিল মালি সুখন। সে সাহেবকে সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে জানাল, মহাতাপ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর গোকুলকে ডাকছে। গোকুলের মুখ হ'ল শুষ্ক সুখনকে দেখে। সে সুখনকে সেখান থেকে অবিলম্বে যেতে নির্দ্দেশ দিল কিন্তু তার গমনে বাধা দিল মিঃ রয়। তিনি মালীকে প্রশ্ন করলেন: "সুখন কি ব্যাপার খুলে বলত? মহাতাপের কি হয়েছে? আর গোকুলের কপালে কিসের আঘাত?" মালিকে গোকুল কি ইঙ্গিত করতে যাচ্ছিল কিন্তু মিঃ রয় আজ্ঞাসূচক কণ্ঠে মালি সুখনকে সব ঘটনা ব্যক্ত করতে নির্দ্দেশ দিলেন। মালি নিরুপায় হয়ে খোকা সাহেবের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী ব্যক্ত করল মিঃ রয়ের কাছে। মিঃ রয়ের মুখে-চোখে ছুটল অগ্নিশিখা। তিনি জামা কাপড় ছেড়ে দেখতে এলেন মহাতাপকে। তিনি শিহরিয়া উঠলেন দেখে পুত্রের নৃশংস অত্যাচারের ছাপ মহাতাপের সর্ব্বাঙ্গে—বালকের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে নীল দাগ—শরীর গেছে ফুলে। তৎক্ষণাৎ তিনি ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। দারোয়ানকে হুকুম দিলেন খোকা সাহেবকে না ঢুকতে দিতে এই বাড়ীতে। দারোয়ান বিস্মিত হয়ে সেলাম ঠুকে বলল: যো হুকুম, হুজুর।

তারপর। শহরে প্রচারিত হল মিঃ এস. রয় বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন তার একমাত্র পুত্র দিলীপ রায়কে। পুত্রকে গৃহ হ'তে বহিষ্কার করবার প্রকৃত ঘটনাই অনেকে শুনল। একদল বলল, এটা হল লঘু পাপে গুরু দণ্ড। চৌধুরী প্রচার করল, রয়ের আদুরে উড়ে চাকর বাড়ীতে ঢুকছিল একটা মাগী নিয়ে, দিলীপ বারণ করলে উড়েটা বাধা দেয়—তারপর দিলীপ মেরেছে কয়েক ঘা বাপ-বেটাকে। দিলীপ প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল মিঃ চৌধুরীর বাড়ী। মেমসাহেব ও চৌধুরী সাদরে অভ্যর্থনা করেছিল খোকা ব্যারিষ্টারকে কিন্তু যখন দেখল সে কপর্দ্দকহীন, কয়েকদিন পর স্থানাভাবের ভাণ করে দিলীপকে তাড়াল বাড়ী থেকে। দিলীপ আশ্রয় নিল অগত্যা বৌবাজারের একটা হোটেলে।

গোকুল তার মনিবকে করল অনেক অনুরোধ-উপ-রোধ ফিরিয়ে আনতে বাড়ীতে খোকা সাহেবকে, কিন্তু মিঃ রয় কিছুতেই রাজী হলেন না পুত্রকে গৃহে আনতে।

সকলে বলল কি পাষান হৃদয়! গোকুল কোলে-পিঠে করেছে দিলীপকে, তার হৃদয় কাঁদল খোকা সাহেবের জন্য। গোকুল একদিন গেল দিলীপের হোটেলে। দিলীপ তাকে দেখে রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে গালাগালি করল অকথ্য ভাষায়। গোকুল নীরবে সেই বাক্যবান সহ্য করল। পরে দিলীপ শান্ত হলে গোকুল তার বস্ত্রাঞ্চল হতে এক খানি কাগজ বের করে সজল নয়নে বলল, "খোকাবাবু, তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। দয়া করে গ্রহণ কর তোমার ভৃত্যের এই সামান্য সাহায্য। প্রতি মাসেই তোমাকে দিয়ে যাব এই সামান্য টাকা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে নিতে বাড়ীতে কিন্তু সাহেব করেছেন ধনুর্ভংগ পণ। খোকাবাবু, একদিন তুমি চলো সাহেবের কাছে।" দিলীপ রেগে ফোঁস করে উঠে বলল: "না! না!! আমি যাবো না বাবাকে খোসামোদ করতে। আমি তোমার সহৃদয়তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। হয়তো আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম গোকুল!" দিলীপ সাগ্রহে কাগজখানি খুলে দেখলে সেখানি এক শত টাকার নোট। হোটেলের ম্যানেজার নোটীশ দিয়েছিল সেদিন, ১০০৲ টাকা না দিলে বন্ধ করবে তার 'মিল'। দিলীপ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ছয় বছর পর। মিঃ রয় অসুস্থতার জন্য কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন। বাড়ীতে 'কন্‌সালটেসন্' করেও উপার্জ্জন করেন মোটা টাকা। নাস্তিক রয় এখন হয়েছেন পরম বৈষ্ণব। কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে পড়ছেন ধুতি সার্ট। বাড়ীতে নিত্য হয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন-পাঠ কথকতা। মিঃ রয় পুত্রাধিক স্নেহ করেন মহাতাপকে। মেধাবী মহাতাপ জলপানী পেয়ে ম্যাট্রিক, আই-এ ও বি-এ পাশ করে—এম-এ তে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মিঃ রয় তাকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গোকুল ছেলেকে আইনজীবী করতে নারাজ—তাদের একটুতেই নাকি মাথা গরম হয়। মহাতাপ আই, এ, এস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করল।

কিছুদিন পর। এক মধ্যাহ্নে হঠাৎ শচীন্দ্রশেখর রায় ওরফে মিঃ এস, রয় সামান্য অসুখে দেহত্যাগ করলেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রায়ের মৃতদেহ দেখতে জড় হলেন। সংবাদ পেয়ে মাননীয় চিফ জাষ্টিস্ মিঃ রয়ের প্রতি সম্মানার্থ কোর্ট ছুটি দিলেন। বৈষ্ণব গুরুভাইয়েরা খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে রয়ের কানে হরিনাম কীর্ত্তন করতে লাগল।

বহুদিন পরে চৌধুরী দেখা দিল দিলীপ রায়ের টেবিলে; হাসিমুখে বলল—"হিপ্ হিপ্, হুররে! চলো—'প্যারাডাইজে' চলো—হোটেলের পাট তুলে প্রাসাদে চল।" দিলীপ কোন উত্তর দিল না। নীরবে যাত্রা করল তার হোটেলের উদ্দেশ্যে। তার মুখে কোন আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। বরং শোকাচ্ছন্ন ভাব প্রতিফলিত হচ্ছিল তার চোখে-মুখে। দিলীপ হোটেলে গেলে ম্যানেজার জানাল তার খোঁজে তিনবার লোক এসেছিল। তার পিতা পরলোক গমন করেছেন মধ্যাহ্নে। দেরীতে আসলে তাকে সোজা যেতে বলে গেছে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে। দিলীপ দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদল বালকের ন্যায়—তারপর সাধারণ ধুতি জামা পরে হোটেল ত্যাগ করল। সে যখন কেওড়াতলা পৌঁছল তখনও শব এসে পৌঁছায় নি ঘাটে। কিছুক্ষণ পরে শব এল ঘাটে। গোকুল খোকা সাহেবকে ঘাটে দেখে শোকের মধ্যেও পেল বিপুল আনন্দ; সে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে পড়ল খোকাসাহেবের কাছে। দুজনের চোখে ছুটল অশ্রু-ধারা। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলল: "এবার চল খোকা ভাই তোমার ঘরে—বুঝে শুনে নাও তোমার বিষয়-সম্পত্তি ছুটি দাও তোমার বুড়ো ভাইকে।"

মহাসমারোহ সহকারে শেষকৃত্য সমাধা হল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দিলীপ গেল না ফার্নরোডের বাড়ীতে! গোকুল পড়ল অকুল পাথারে। তার পর গুজব উঠল শচীন রায় এক উইল করে গেছেন—তাতে তার ফার্ণ রোডের 'প্যারাডাইজ' দিয়ে গেছেন 'বৈষ্ণব সম্মিলনী'কে—অন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন গোকুল-নন্দন মহাতাপকে। দিলীপ ভবিষ্যতের যে সুখ-স্বপ্ন দেখছিল তাহা দুঃস্বপ্নের মতো তার বুকে চাপল—সে হল ক্ষিপ্ত, দিশেহারা। শ্মশানঘাটে সে যে কাঁচা পড়েছিল তা ছেড়ে ফেলে সে পড়ল প্যাণ্ট, হবিষ্যি ছেড়ে দিয়ে সে খেতে সুরু করল নিষিদ্ধ দ্রব্য। গোকুল তার হোটেলে

দেখা করতে গেলে সে দিলীপের হাতে খেল বেদম প্রহার। গোকুল হাত জোড় করে বলে, সব কথা মিথ্যা। সে জানে না কিছু উইলের কথা। যদি কোন উইল করে থাকেন সাহেব সে কখনও গ্রহণ করবে না এই দান। কিন্তু কে শোনে তার কথা! গোকুল ফিরে আসে ফার্ণ রোডে নিরাশ অন্তরে। গোকুল কাঁদে, মহাতাপ কাঁদে। তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ঘোরে দ্বারে দ্বারে। বলে তবে কি সাহেবের হবে না শ্রাদ্ধ, হবে না তাঁর আত্মার উর্দ্ধগতি। গোকুল জানে সাণ্ডেল সাহেব ছিলেন তার সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধু—সে গেল সাণ্ডেল সাহেবের বাড়ী, কেঁদে জড়িয়ে ধরল সাণ্ডেল সাহেবের পা দু'খানি। সাশ্রুনয়নে বলল—"হুজুর আপনাকে করতে হবে এর বিহিত। আমার সাহেব কি পাবে না তাঁর ছেলের এক গণ্ডুষ জল? তাঁর আত্মার হবে না সদ্‌গতি?" সাণ্ডেল সাহেব এড়াতে চেয়েছিলেন এই সব ঝঞ্ঝাট। কিন্তু গোকুলের আকুল মিনতিতে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর হৃদয় উঠল কেঁদে। তিনি জানতেন মিঃ বাসু ছিলেন মিঃ রয়ের বন্ধু—মিঃ বাসুকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলেন। সঠিক সংবাদ পেয়ে তিনি হলেন চিন্তাকুল। তার পর গোকুলকে ডেকে করলেন কি শলা পরামর্শ। বিচারক মিত্র ছিলেন মিঃ রয়ের সুহৃদ। মিঃ সাণ্ডেল বিচারক মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এই ব্যাপার নিয়ে। এই বিচারক দিলীপকে করেছেন একটি এষ্টেটের রিসিভার। সেই কারণে দিলীপ আছে কৃতজ্ঞ মিঃ মিত্রের নিকট।

জাষ্টিস মিত্তিরের বাড়ী। সেখানে সমবেত হয়েছে মিঃ সাণ্ডেল, দিলীপ, গোকুল ও মহাতাপ। কিছুক্ষণ পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন জাষ্টিস মিটার ও এটর্ণী মিঃ বাসু। মিঃ বাসু দেখালেন ও পড়িয়ে শোনালেন মিঃ রয়ের উইল সকলকে। উইলের মর্ম্ম ছিল—মিঃ শচীন্দ্রশেখর রায়ের অবর্ত্তমানে তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পাবে মহাতাপ মহান্তী। ছিল দু'টি নির্দ্দেশ—একটি, 'প্যারাডাইজ' বাড়ীর নিম্নতলের হল ঘরে বৈষ্ণব সম্মিলনীর থাকবে অধিকার সভা সমিতি ও পূজাপাঠের। দ্বিতীয়—দিলীপকে দিতে হবে মাসহারা ৩০০৲ টাকা এষ্টেটের আয় হতে।

মহাতাপ হাত যোড় করে বলল—"আমি আমার সকল দাবীদাওয়া ত্যাগ করছি এই উইলের লিখিত সম্পত্তির উপর। সেই মহান ব্যক্তি দয়া ক'রে আমাকে করেছেন মানুষ—দিয়ে শিক্ষাদীক্ষা। আমি কেন করব বঞ্চিত তার পুত্রকে পৈত্রিক সম্পত্তি হতে? এই উইল আপনারা বাতিল করে দিন—আমি লিখে দিচ্ছি না-দাবী পত্র সাহেবের সকল সম্পত্তির উপর।" দিলীপ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মহাতাপের দিকে। সমস্যা দাঁড়াল কি উপায়ে হয় এই বিষয়ের সমাধান। এটর্ণী বাসু বললেন: উইল প্রবেট করে মহাতাপ দানপত্র করবে দিলীপের নামে। মিঃ সাণ্ডাল বললেন: তাতে নষ্ট হবে অনেক টাকা। গোকুল অনুমতি চাইল কিছু বলতে। জাষ্টিস মিটার প্রসন্ন চিত্তে তাকালেন গোকুলের দিকে—গোকুল বুঝল সে পেয়েছে অনুমতি। সে অসংকোচে চেয়ে নিল এটর্ণীর নিকট হতে উইলখানি—তারপর ছিঁড়ে ফেলল সেই আন-রেজিষ্টার্ড উইলপত্র। হাসিমুখে বলল: আমার মতে এই হচ্ছে সব চেয়ে সহজ সমাধান এই সমস্যার।

সকলে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইল এই অদ্ভুত লোকটির দিকে।

শারদীয়ার অবকাশে আমরা আমাদের গ্রাহক, গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও সর্ব্বসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি।

কর্ম্মসচিব—বঙ্গশ্রী

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গাঁয়ের পথে [শিল্পী—জনতোষ চক্রবর্ত্তী
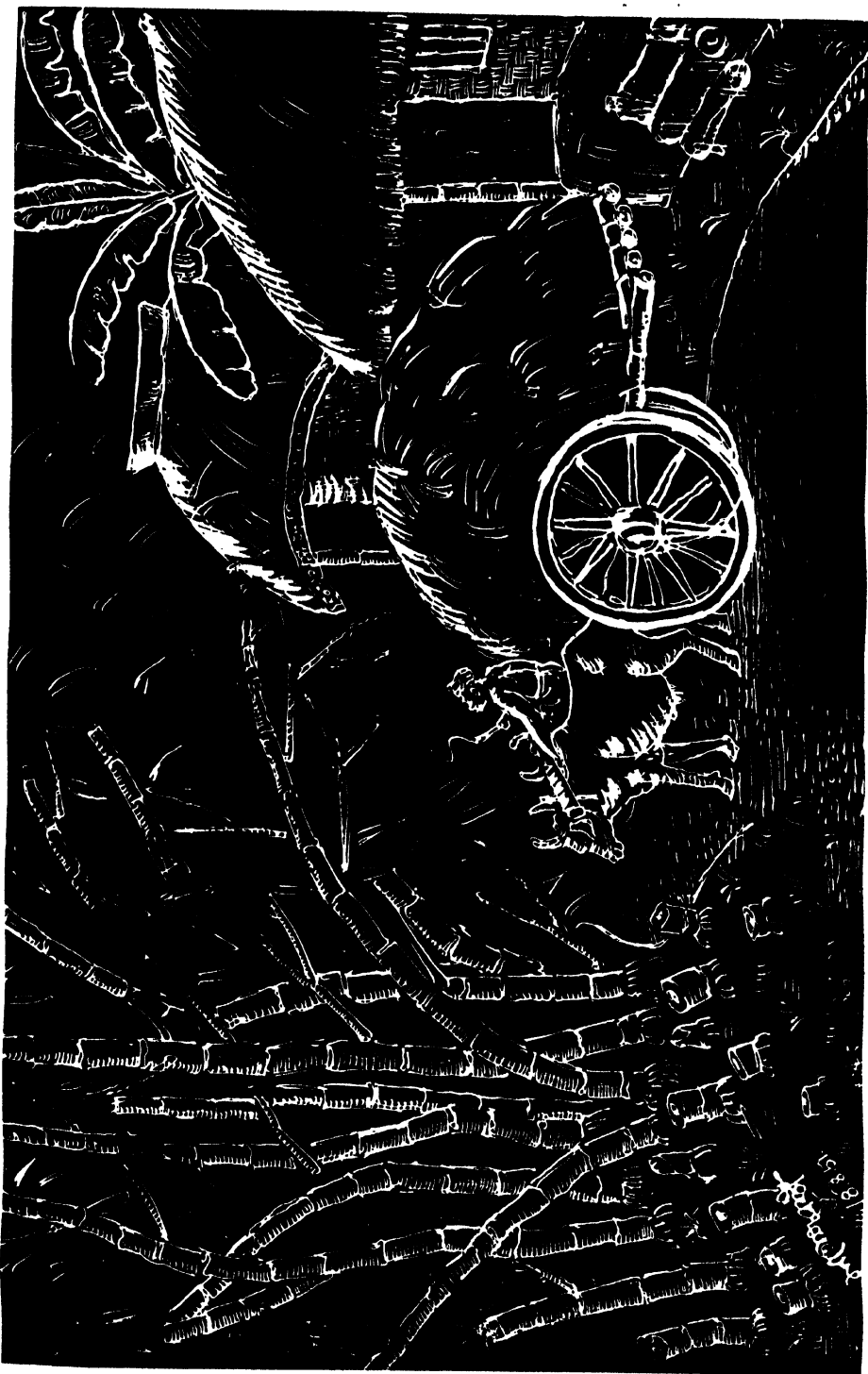
ঊনবিংশ বর্ষ কার্ত্তিক—১৩৫৮ ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

চন্দ্র-পাল-বর্ম্ম-সেন বংশের রাজত্বকালে বিক্রমপুরের সামাজিক অবস্থা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুরে পূর্ব্ববঙ্গে বিভিন্নকালে যে সমুদয় রাজারা রাজত্ব করিতেন, সেকালের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এখানে আলোচনা না করিয়া সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব, তাহা হইতেই প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিদের শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল এবং সংস্কৃতি ও বিভিন্নরূপ সামাজিক ব্যবস্থাই বা কি ছিল, সংস্কার ও সংগঠন বিচারইবা কিরূপ প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইত, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। উহা দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গলার একটি মনোজ্ঞ সমাজচিত্রও আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাইব।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা গঙ্গানদীর প্রবাহের মত। যুগে যুগে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে আমরা মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ ও শাসনতন্ত্রের ইতিহাস হইতে অনেক কথা জানিতে পারি। সেকালের শাসনতন্ত্র, সামাজিক বিধি, জাতিভেদ, সমাজস্থিতি, গ্রাম ও নগর, পারিবারিক জীবন, সামাজিক আদর্শ ইত্যাদির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রভৃতি আমরা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বিবরণ হইতে জানিতে পারি। সেবিষয়ে আমাদের এখানে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমে পালরাজাদের সময়ে বাঙ্গলা দেশের ও বিক্রমপুরের অবস্থা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে বলিব। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিতেন না, এজন্য তাঁহাদের দীর্ঘ চারি শত বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কলহ বা অশান্তির উদ্ভব হয় নাই। বিক্রমপুরেও এক সময়ে পাল রাজাদের প্রভুত্ব ছিল। বিক্রমপুরে এখনও রায়পাল, বজ্রযোগিনী, হরিশ পালের দীঘি প্রভৃতি হইতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্ত্তি হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সে সময়ে বিক্রমপুরে পূর্ব্ব বঙ্গে 'বজ্রযান'-মত বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। বহু স্ত্রীমূর্ত্তিই তাহার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনার জন্য স্ত্রী চাই-ই। এই ভাবে ধর্ম্মবিপ্লব চল্‌তে লাগল। বজ্রযান, মহাযান, বেদান্ত ও অন্যান্য মত হল। এই সবের একখানা বই আমাদের কাছে আছে, "পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়" বলে।" বৌদ্ধ রাজাদের শাসন কালেও ব্রাহ্মণেরা যাগ-যজ্ঞ করিতেন, পশু বলি—এমন কি নরবলি প্রচলিত ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, মন্ত্র, তন্ত্র, অভিচার প্রভৃতি বিবিধ আচার ও অনুষ্ঠান ছিল। পাল রাজাদের সময় তান্ত্রিক নিয়ম কতটা প্রচলিত ছিল বলা কঠিন। তবে তাহাদের মধ্যে জাতিবিচার ছিল না—জাতিবিচার নিবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

পালবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অবস্থা

যজ্ঞ ও বলি জাতিবিচার

নাথ জাতি বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে ও বিক্রমপুরে। এ সময়ে নাথপন্থীগণ নিজ নিজ মতের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে সময়ে দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রসার লাভ হয়। বৌদ্ধেরা সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। সংস্কৃতে কথা বলিতেন, বাঙ্গলা ভাষায়ও কথা বলিতেন, কিন্তু কোন ভাষার উন্নতির দিকেই তাঁদের তেমন মনোযোগ ছিল না। বৌদ্ধেরা হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিচার মানিতেন না। বুদ্ধদেবই ছিলেন তাঁদের গুরু। তবে দেব পূজা (god worshipper) আর গুরু ভজা বা (man worshipper)-ও তাঁদের মধ্যে ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সেকালের বৌদ্ধ রাজারা সকল ধর্ম্মের লোকের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যাঁহার যেরূপ গুণ তাঁহাকে তেমন ভাবে পুরস্কার দিতেন। ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল বিচার কার্য্যের ভার সমর্পিত। রাজাও বিচার করিতেন, তবে তাহা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে নিষ্পন্ন করিতেন। বিধি ব্যবস্থা, আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তনভার ব্রাহ্মণের হাতে থাকায় ধীরে ধীরে বিচারকের গুরুদায়িত্বভারও ব্রাহ্মণের হাতেই গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশ তাঁহাদের দ্বারাই অধিকৃত হইল। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও সেই পাল যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমাজে বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া আছেন। তাঁহারা হইতেছেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ; শাকদ্বীপের বর্ত্তমান নাম সিলিয়া। সিলিয়া পারস্যের উত্তরে, পূর্ব্বতুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ লইয়া ইউরোপীয় রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। যাদবেরা মূর্ত্তি পূজার জন্য শাক দ্বীপ হইতে যে ব্রাহ্মণদের আনয়ন করেন, তাঁহারাই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বেদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। ঠিকুজী করা, হস্ত রেখা গণনা ইত্যাদি হইল তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা মূর্ত্তি গড়িতে, পাথর, কাঠ ও মাটির এবং চিত্রকার্য্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এখনও ইঁহাদের সে প্রাধান্য আছে। ইঁহারা গ্রহাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন, এখনও তাঁহারা সেই গৌরবে গৌরবান্বিত আছেন।

ব্রাহ্মণের সম্মান

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ

চন্দ্র ও পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধদের যেমন প্রতাপ ছিল, সেন রাজাদের সময় ক্রমশ তাঁহাদের প্রভুত্ব হ্রাস পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা সমাজ পরিচালনায় ও ধর্ম্ম বিচারে প্রবল হইয়া উঠিলেন। সমাজ-শাসন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নানা গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সমাজ ও গৃহস্থালী আচার বিচার দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পুঁথি লিখিতে লাগিলেন। সে সব গ্রন্থে ছিল প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয়। ভবদেব ভট্ট ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, রাঢ়ী শ্রেণী সামবেদী ব্রাহ্মণ, হলধর মিশ্র, এঁরা সমাজ বন্ধনের জন্য সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং বর্ম্ম ও সেন বংশের পূর্ব্বে বৌদ্ধ পাল ও চন্দ্ররাজারা ছিলেন ক্ষমতাশালী ও প্রভাবান্বিত। তাঁহাদের তাম্র লেখের প্রারম্ভে "ওঁ নমো বুদ্ধায়" এইরূপ বচনই উৎকীর্ণ থাকিত। যতদিন এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে বিরাজমান ছিল, ততদিন অন্যান্য ধর্ম্মমত প্রচলিত থাকিলেও কোন ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে আসনচ্যুত করিতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে পাঠান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রমপুরে ও বঙ্গদেশে যখন সেন রাজারা রাজত্ব করিতেন তখন শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধান হইল। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনও ধর্ম্মমত সম্পর্কে পিতার অনুগামী ছিলেন। বিজয় সেনের স্বমত পরিপোষক উপাধি ছিল বৃষৎশঙ্কর গৌড়েশ্বর, বল্লাল সেনের উপাধি ছিল নিঃশঙ্ক—শঙ্কর গৌড়েশ্বর। বল্লাল সেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন গৌড়েশ্বর হইলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী হইলেন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী রাজারা যখন রাজা হইলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইল এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত করিয়া সদর্পে বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিতেছিল, সেই সময়েই দেখা দিল পাঠানের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা। পাঠানেরা আসিয়া নব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতন

মুসলমান অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বিক্রমপুরের চন্দ্র-পাল-বর্ম্ম ও সেনরাজগণ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রাচীন প্রচলিত ব্রাহ্মণ বা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যে রাজ্য শাসন করিতেন সে বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শক্তি ও শাসন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য চেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও তৎকালে বৈদিক ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠাবান ছিল। আর একথা ঠিক যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তান্ত্রিকতা অলক্ষ্যে সে সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব রীতি-নীতি বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছিল।

পাল রাজাদের সময়ে হিন্দু সমাজের জাতিগত সংকীর্ণতা দুরীভূত হইয়া আর্য্য, শক ও অনার্য্যদের মধ্যে একস্তরে দৃঢ়সূত্র বৃদ্ধি পাইতেছিল— কাজেই বিক্রমপুরের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে একটা মহামিলনের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেন রাজগণের অভ্যুদয়ে ম্রিয়মাণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সমাজে দৃঢ় হইল এবং বিভিন্নতার সৃষ্টি হইল এবং জাতিভেদের অনুদার নীতি দৃঢ় মূল হইয়া জাতি ও সমাজের মিলনের ঐক্যবন্ধন ও সংগঠনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল।

সেকালে নৃপতিবর্গ জনগণের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেন। প্রজাসাধারণ রাজাকে দেবতা অপেক্ষা কোন অংশেই পৃথক্ জ্ঞান করিত না। রাজদর্শনে পাপনাশ, সেকালে প্রজাগণ মধ্যে এই আদর্শ প্রচলিত ছিল; নৃপতিবৃন্দও প্রজাদের হিতার্থে সর্ব্বদা মনোযোগী হইতেন। তাঁহারা "পরম ভট্টারক" 'মহারাজাধিরাজ' 'পরমেশ্বর' ইত্যাদি উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতেন। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া, কেহ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন না— এক কথায় বলা চলে, সে সময়ে স্বেচ্ছাচারী নৃপতি বড় কেহ ছিলেন না। তৎকালে পুষ্করিণী খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ, পথ প্রস্তুত, পান্থশালা, মঠ নির্ম্মাণ, অন্নসত্র, বৃক্ষ রোপণ, পাঠশালা ও চতুষ্পাঠি প্রতিষ্ঠা, ব্রত, নিয়ম ও বিবিধ উৎসবে দান ও ধ্যানের কার্য্য পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

রাজার সম্মান

জলকষ্ট নিবারণ-কল্পে সরোবর প্রতিষ্ঠা অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। বিক্রমপুরের এবং পূর্ব্ব ও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অদ্যাপি অসংখ্য দীঘিকা,

পুষ্করিণী, মঠ, দেউলবাড়ী ইত্যাদি বিদ্যমান আছে এবং গ্রামে গ্রামে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। গমনাগমনের সুবিধার্থ খাল, নৌ-সেতু, ইষ্টক-সেতু, প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্য হাট, বাজার, বন্দর, নগর, বিপণি, মেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া চন্দ্র-পাল-বর্ম্ম ও সেন রাজারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। রাজা রাজ্য রক্ষার্থ দুর্গ, কেল্লা, দেউল, পরিখা নগর প্রাচীর ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতেন।

বাঙ্গলা দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কি দেব প্রতিমা গঠনে, কি মন্দির নির্ম্মাণে নৃপতি ও ভাস্করগণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত যেমন প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তেমনি মন্দির নির্ম্মাণেও বাঙ্গলার নৃপতিরা বাঙ্গলার বিশেষ স্থাপত্য রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

পাল বংশীয় নৃপতি—"নয়পালদেবের রাজত্বকালে বৈদ্য জাতির প্রভুত উন্নতি হইয়াছিল। বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত নরপাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারী পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্ত রঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী।

লোধ্রবলী কুলীন :—লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্তকুলোৎপন্নাঃ।

শিবদাস সেন সম্পাদিত—চক্র দত্ত, ১৩০২ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

জনার্দ্দন মন্দিরের প্রশস্তি বাজো বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্য বজ্রপাণি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিত লিপিদ্বয়ের শিল্পীর অনবধানতঃ প্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। * * নরপাল-দেবের রাজত্বকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘ স্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত রাজের একান্ত অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে এ-বিষয়ে সবিস্তারে বলা হইয়াছে।

নরপাল দেবের শাসন সময়ের প্রস্তর লিপির মধ্যে গয়া ধামের কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরস্থিত প্রস্তর লিপিখানি উল্লেখযোগ্য। ইহা বাজি বৈদ্যদেব বিরচিত। উক্ত প্রশস্তির উনবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে: "বাজি বৈদ্য সহদেব বিরচিত তদীয় এই প্রশস্তি সজ্জন হৃদয়ে রমণীর ন্যায় প্রেম-সৌহার্দ্দ্য ও সুখের একমাত্র আধার হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক।"

পাল রাজাদের রাজত্বকালে বিক্রমপুর নানাভাবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে তিব্বতের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং সে সময়ে মঙ্গোলিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। পাল রাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি বিচার ছিল না বলিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু ব্যক্তি বিক্রমপুর বা বঙ্গ রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা পরে বলিব। নৃপতি নরপালের সময় বাঙ্গলার সর্ব্বত্র শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল—সে কথাও বলা হইয়াছে।

বাঙ্গলা ও মগধে যেমন বহু বিহারের ইঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বিক্রমপুরেও সে সময় বহু বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'বিক্রমপুরী বিহার' তাহার অন্যতম। কাল-বশে সে সমুদয় ধ্বংসপ্রায়।

বুমেরাং

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আপিসের বড় সাহেব মিঃ সিন্‌হা কলিং বেল্‌ বাজালেন, চেম্বারের বাইরে অপেক্ষমান বেয়ারা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে এলো, হুকুম হলো—ঘোষালকে বোলাও।

পুলিশের পরোয়ানা-পাওয়া অপরাধীর মত ভীরু দৃষ্টিতে কম্পিত পদে টাইপিষ্ট্‌ ঘোষাল এসে হাজির হলো বড় সাহেবের এয়ার-কণ্ডিসনড্‌ চেম্বারের মধ্যে। সাহেব তখন কী একটা কাগজে চোখ দিয়ে ছিলেন, দৃষ্টি তোলবার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না। ঘোষালের প্রতি কী হুকুম তাও জানালেন না। বড় সাহেবের ঘরে ঘোষালের মত চুনোপুঁটিদের ডাক কদাচিৎ পড়ে; তাই মনে তার একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ছিলই, তার ওপর সাহেবের দীর্ঘ নীরবতা ওর উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলতে লাগলো উত্তরোত্তর, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলো সে চুপচাপ নিরুত্তর হয়ে, সাহেবের সামনে চেয়ারে বসতে তার সাহস হলো না। বরং ইউরোপীয়ানরা যতদিন ছিল আপিসের চার্জ্জে, সাধারণ সৌজন্যের দিক থেকে তাদের ব্যবহার ছিল অনেকগুণে শ্রেয়। আপিসে ডাকলে তারা চেয়ারে বসতে বলতো। কিন্তু গোলাম যখন প্রভুর পদে বসে, তার ঔদ্ধত্য ওঠে সীমা ছাড়িয়ে, আপিসের ম্যানেজারের আসন যেদিন থেকে মিঃ সিন্‌হা অলঙ্কৃত করছেন, তার পর থেকে কেরাণীদের থাকতে হয় তটস্থ হ'য়ে। কখন যে কোন বিষয়ে ক্রটি হয় ডিসিপ্লিনের, তা বুঝে ওঠাই শক্ত, কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে বড় সাহেবের উদ্যত শাসন ছুটে আসতে দেরি হয় না।

অবশেষে কথা কইলেন মিঃ সিন্‌হা,—শুনতে পেলুম, অ্যাকাউণ্ট্‌স্‌ সেক্‌সনের হাপ্‌-ইয়ার্লি ষ্টেটমেণ্টগুলো এখনও টাইপ হয়নি, কেন?

—খুব চেষ্টা করছি স্যার, যত শীগ্‌গির সম্ভব তৈরি করবার চেষ্টা করছি!

বড় সাহেব ব্যঙ্গ ক'রে বল্লেন—ও সব পার্লামেণ্টারি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। কেন এখনও তৈরি হয়নি তার কৈফিয়ৎ দাও, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্‌ ব'লে গেল, সাতদিন থেকে কাগজগুলো প'ড়ে আছে তোমার কাছে, তুমি জানো আসছে ১৫ই তারিখের ভেতর ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌গুলো পাঠাতে হবে হেড আপিসে?

—স্যার, আগে টাইপ সেক্‌সনে ছিল ছ'জন লোক। এখন শুধু আমরা তিনজন রয়েছি, বাকি তিনজন ছাঁটাই হয়ে গেছে; কাজের চাপ আমাদের ওপর বেড়ে গেছে অনেক, তাই সব কাজ সব সময়ে ঠিক গুছিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

বড় সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—স্যাট্‌ আপ। বাজে কথা শুনতে চাইনে। কাজ করতে পারলে করবে, না পোষালে ছেড়ে দেবে। আমি লেকচার শোনবার জন্যে লোক রাখিনে। আজকে পাঁচটার ভেতরে কাগজ-পত্র তৈরি না হ'লে, আই উইল টেক্‌ ডিসিপ্লিনারি অ্যাকসন্‌। ডোণ্ট্‌ ওয়েষ্ট মাই টাইম্‌। গো অ্যাবাউট্‌ ইওর ওন্‌ বিজনেস্‌।

মিঃ সিংহ, ওরফে সিন্‌হা, এ সদাগর আপিসের বড় সাহেব। বিলিতি কোম্পানী। সোনালী হরফের রিলিফ লেটারে লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড আছে আপিসের সামনে: "অ্যালাইড্‌ কমার্শিয়াল করপোরেশন লিমিটেড।" হেড-আপিস্‌ এডিন্‌বার্গ। আগে এ আপিসের ম্যানেজারের পদ ইংরেজদেরই ছিল কায়েমী। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষুধা মেটাতে বহু ইংরেজ সন্তানকেই আরামের কায়েমী চাকরী ছেড়ে রণক্ষেত্রে যেতে হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবার সৌভাগ্য হয় নি। দেশরক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে যে-সব বড় পদ খালি হয়েছিল, তাতে সাময়িক ভাবে কোন কোন ভারতীয় উন্নীত হয়েছিল।

মিঃ সিন্‌হা তাদেরই একজন। উনি আগে এই আপিসেই ছিলেন ছোট পদে, ম্যানেজারের তক্তেতে প্রমোশন পাবার পর থেকেই তিনি প্রাণপণ উৎসাহে লেগে পড়েছেন কোম্পানীর ঘরে নাম কেনবার প্রচেষ্টায়। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার উৎকট উৎসাহের ফলে সব চেয়ে বেশি চোট্ খাচ্ছে শুধু কেরাণীরাই। শতকরা ত্রিশজন হারে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই হ'য়ে গেছে কর্ম্মচারিদের সংখ্যা। তা ছাড়া ছোটখাটো অনেক অ্যালাওয়্যান্স এবং সুখ সুবিধা যা তারা ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ সাহেবদের আমলে নির্ব্বিবাদে পেয়ে এসেছে, সে গুলোও একে একে বন্ধ হ'য়ে গেছে। সিন্‌হা সাহেব এখনও চেষ্টায় আছেন আর কোন ভাবে আপিসের খরচা আরও কমানো যায় কিনা! কোম্পানীর কর্ত্তাদের সুনজরে পড়বার একটা নেশা এসে গেছে ওঁর।

কেরাণীর দল একদিন সভয়ে শুনতে পেলো যে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিনাপয়সায় চা ও টিফিনের যে যে ব্যবস্থা প্রায় পঁচিশ বছর থেকে চালু ছিল, সিন্‌হা সাহেব তা বন্ধ করবার জন্য ফতোয়া জারি করেছেন। ক্ষোভে ক্রোধে গরীব কর্ম্মচারির দল অন্তরে অন্তরে প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ওরা সবাই সাংসারিক দায়িত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মাথা উঁচু ক'রে কথা বলবার অথবা প্রতিবাদের সাহস কোথা থেকে হবে ওদের। সামান্য একটু চাকুরির ওপর নির্ভর ক'রে হয়তো ঝুলছে একটা প্রকাণ্ড পরিবারের ভরণপোষণ। তাই মার এলে বোবা জানোয়ারের মত মুখ বুঁজে মার খাওয়া ছাড়া ওদের আর উপায় থাকেনা কিছু, তবু ওদের মধ্যে যারা অল্পবয়স্ক এবং যাদের সংসারের দায়িত্ব কিছু হাল্কা, তারা এগিয়ে এলো কয়েকজন সাহেবের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানাতে।

মিঃ সিন্‌হা তখন সবে ফারপোর বাড়ি থেকে লাঞ্চ শেষ ক'রে এসে চেম্বারে বসেছেন। কেরাণীদের টিফিনবন্ধের অনুযোগ শুনে বল্লেন,—দেখো, কোম্পানী যে রকম তোমাদের মুখের আহার যোগাচ্ছে সেই রকম কোম্পানীর প্রতিও তোমাদের একটা আন্তরিক আনুগত্য থাকা উচিত। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের কোম্পানীর ফাইনান্‌শিয়াল কণ্ডিশন্ খুব ভাল যাচ্ছে না, শিপিং ইন্সিওর‍্যান্সে কয়েকটা মোটা রকম লস্ খেয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের আপিসটাতো উঠিয়েই দিয়েছে, সুদিনে কোম্পানী যেমন তোমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেককেই পুরস্কার দিয়ে থাকে, তেমনি কোম্পানীর দুর্দ্দিনে তার জন্যে তোমাদের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয় তবে তার জন্য তো তোমাদের অপ্রসন্ন হওয়া উচিত নয়।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বল্ল—নিউজিল্যাণ্ডের আপিস্ তো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সেই অজুহাতে আমাদের টিফিন বন্ধ করা মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নয়। যেখানে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা কোম্পানী নীট মুনাফা পেয়ে যাচ্ছে, সেখানে গরীব কর্ম্মচারীদের জলখাবার বাবদ সামান্য কিছু খরচা করলে এমনই কী ক্ষতি হবে স্যার! বরং কোম্পানী তার লোকজনের কাছে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে থাকবে।

আর একজন বল্ল—পেটে না খেলে কাজের উৎসাহ আসবে কী ক'রে স্যার! সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে এক পেয়ালা চা এবং সামান্য একটু খাবার টনিকের কাজ করে। নিজেদের যা সামান্য রোজগার তার মধ্য থেকে টিফিন খেতে গেলে, বাড়িতে হয়তো আর একজনকে আধ পেটা খেয়ে থাকতে হবে।

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে তর্ক করবার মত কেরাণীদের ধৃষ্টতা দেখে যদিও মিঃ সিন্‌হা মনে মনে যারপরনাই রুষ্ট হয়েছিলেন, তবু মুখে একটা কাষ্ঠহাসি টেনে এনে ভান করলেন যেন কিছুমাত্র বিরক্ত হননি। থ্রী-ক্যাস্‌ল্‌স্ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অ্যাস্‌ট্রেতে শেষ অংশ ত্যাগ করে বিজ্ঞের মত বল্লেন,—দেখো, তোমরা যা বল্লে সবই শুনলুম। মানুষ হচ্ছে অভ্যাসের দাস। শুনেছো তো, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট না পেলে যদি মনে করো কাজের এনার্জ্জি নষ্ট হয়, তবে বুঝতে হবে এনার্জ্জি তোমাদের কোন কালেই ছিল না, চা তো এমন কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয় নয়। দু'দিন অভ্যাস করলেই দেখতে পাবে চা ছাড়াও কাজ চলে। তা ছাড়া তোমর

হয়তো জানো এই কলকাতা সহরেই বহু সওদাগর-আপিস আছে যেখানে চা জলখাবারের খরচা দেওয়া হয় না। কিন্তু তা ব'লে কি সে সব আপিসে কেরাণীরা কাজ করে না!

কেরাণীদের মধ্য থেকে একটা চাপা অসন্তোষ এবং প্রতিবাদের অস্ফুট গুঞ্জরণ শোনা গেল কিন্তু সাহেবের সামনে প্রকাশ্য প্রতিবাদ কেউই করলো না। মিঃ সিন্‌হা কিছুক্ষণ স্তব্ধ জনতার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তারপর বল্লেন—যাও, সময় নষ্ট না ক'রে নিজের নিজের কাজে যাও। সবাই সুট্ সুট্ ক'রে বেরিয়ে গেল একে একে। অপস্রিয়মান জনতাকে উদ্দেশ্য ক'রে মিঃ সিন্‌হা তাঁর কথার উপসংহার টানলেন—বিলাসিতা হচ্ছে মানুষের পরম শত্রু। ওকে যতই বাড়াবে ততই বেড়ে যাবে। বরং অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারাই আন্তরিক সুখের মূলকথা। সেই জন্য বড় বড় লোকেরা বলেছেন 'প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং।'

দিনের পর দিন আসে, কিন্তু মিঃ সিন্‌হার স্বভাব বদলায়নি একটুও। আপিস্ থেকে চাকুরী গেছে আরও জন কয়েকের। কেরাণী ছাড়াও নিম্নতন অফিসার যারা তাদের মধ্যে ভাতা কাটা গেছে কয়েকজনের। প্রত্যেক কাজের জন্য পদে পদে কৈফিয়ৎ তলব করা হয় প্রতিটি লোকের। এমনকি বিশ্বস্ত এবং বহু পুরাতন যারা কর্ম্মচারি, তাদেরও মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কথা বলেন না মিঃ সিন্‌হা। যখন তখন সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে ঢুকে কর্ম্মচারিদের মান সম্ভ্রমের দিকে দৃকপাত না ক'রে অসভ্য ভাষায় গালাগাল ক'রে থাকেন জুনিয়ার ক্লার্কদের সামনে তাদের ওপরওয়ালা কর্ম্মচারিদের। মিঃ সিন্‌হার ব্যবহারে সমস্ত আপিসে একটা চাপা অশান্তি এবং অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। অথচ প্রকাশ্য প্রতিবাদের চেষ্টা আজও কিছু হয়নি। চাকুরিজীবী মানুষ সাধারণতই ভীরু। একেবারে নিরুপায় না হ'লে সহজে তারা মাথা তুলতে চায় না।

যাই হোক, আরও এক বছর ঘুরে এসেছে। সকল উৎপীড়ন এবং লাঞ্ছনা সত্বেও সকলেই নিঃশব্দ ধৈর্য্যে মুখ বুঁজে টিকে আছে। একটা ক্ষীণ আশা ছিল মনে, নতুন বছরে হয়তো সকলেই কিছু কিছু পাবে ইনক্রিমেণ্ট অথবা প্রমোশন। কিন্তু নিরাশ হলো সবাই, যখন শুনলো, কেরাণীদের মধ্যে কেউ পায়নি ইন্‌ক্রিমেণ্ট অথবা পদোন্নতি। সব চেয়ে মোটা পুরস্কার পেয়েছেন মিঃ সিন্‌হা। পেয়েছেন দেড়'শ টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট এবং ছ'মাসের বেতন বোনাস্। ওরা আরও শুনলো, মিঃ সিন্‌হার রিপোর্টের জোরেই নাকি কেরাণীদের ইন্‌ক্রিমেণ্ট এবার ষ্টপ করা হয়েছে। খবরটা কানা-ঘুষায় সকলের মধ্যেই রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছে এবং তা শুনে চিরদিনের ভীরু নির্জ্জীব কেরাণীদের মধ্যেও একটা ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ উত্তেজনা এসেছে। ওরা একজোটে ষ্ট্রাইক করবার জন্যে গোপনে গোপনে পরামর্শ শুরু ক'রে দিয়েছে। এই সব আয়োজন এবং উদ্যোগে যে ছেলেটি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, তার নাম বিকাশ। ছেলেটি বুদ্ধিমান, ল' পাশ করেছে, কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে পারেনি বলে অবশেষে কেরাণী হয়ে ঢুকেছে সদাগর আপিসে। তার সততায় এবং পরার্থপরতায় আপিসের সকলেই তাকে মান্য করে এবং ভালবাসে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল বিকাশের ওপর নোটিশ হয়েছে, এক মাসের মধ্যে তাকে চাকরী ছাড়তে হবে।

ওদিকে নিজের উন্নতিতে মিঃ সিন্‌হার মন উঠেনি। তাঁর আশা ছিল আরও উঁচু। তাই তিনি সেদিন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ ম্যানেজার মিঃ সরকারকে নিজের চেম্বারে ডেকে খেদে বলছিলেন—দেখলে তো সরকার! এ সব আর কিছু নয়, স্রেফ্ রেসিয়ালিজম্। কালা আদমিকে শাদা চামড়ারা কী চোখে দেখে, তাই একবার বুঝে নাও। টমসন্ যখন ছিল আপিসের ম্যানেজার, বছর বছর তার তিনশ' টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট্ এবং আট হাজার টাকা বোনাস্—এ ছিল বাঁধা গৎ। এর ওপরে কমিশনটা তো ছিল ফাও। আর আমার বেলায় শ্বেতাঙ্গ মহা-প্রভুরা অনুকম্পা করে দিলেন একমুঠো মুষ্টিভিক্ষা। এ বেটা-দের ঠেঙ্গিয়ে দেশ ছাড়া করলেও গায়ের ঝাল যায় না।

মিঃ সরকার নির্ব্বিচারে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সত্যিই স্যার। তাতে মিঃ সিন্‌হার

উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি পঞ্চমুখ হয়ে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে লাগলেন,—আমি ম্যানেজারি নেবার পর থেকে আপিসের কত উন্নতি হয়েছে তা কি ব্যাটারা একবারও চোখ চেয়ে দেখলো না! আপিস-এক্সপেন্স প্রায় ফর্টি পার্সেণ্ট্ কমিয়েছি, ওভারহেড চার্জ্জেস্ কমিয়েছি থার্টিথ্রি পার্সেণ্ট। এ ছাড়া টমসন্ চ'লে যাবার পর থেকে আমাদের এই ইষ্টার্ণ জোন্-এ ক্যালকাটা সেণ্টারে নিট্ আড়াই কোটি টাকার বিজনেস্ এক্সপান্‌সন্ হয়েছে। অথচ সে তুলনায় কোম্পানী আমার জন্য কী কনসিডার করেছে? হ্যাঁ, যদি থাকতো কোন ইংরেজ এ আপিসের চার্জ্জ নিয়ে তাহলে দেখতে এই ফিরিঙ্গি কোম্পানী দু'হাত ভরে তাকে দিতে কার্পণ্য করতো না। তুমি কি বলতে চাও, এই ব্যবহারের মধ্যে কালা আদমির ওপর একটা চিরাচরিত ঘৃণা এবং অবহেলা প্রকাশ পাচ্ছে না!

উত্তেজনায়, ক্রোধে মিঃ সিন্‌হার গণ্ডদেশ রক্তাভ হয়ে উঠলো। তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝপথে বাধা পেয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে এলো টাইপিষ্ট ঘোষাল। বিনীত নমস্কার করে জানালো—স্যার বিকাশদার ওপরে কেন নোটিশ হয়েছে তাই আমরা জানতে এলুম। তাঁর যদি অপরাধ কিছু গুরুতর না হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে তাঁকে আবার কাজে বহাল করা হোক এই আমাদের অনুরোধ।

একটা ক্ষুদে কেরানীর স্পর্দ্ধায় মিঃ সিন্‌হা বিস্মিত হলেন। বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে মেষ-শাবক যে প্রতিবাদ জানাবার সাহস পাবে সে কথা তিনি ভাবতে পারেন নি কোন দিন। তাই উন্মত্ত সিংহের মতই গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—কী বলছো ডেপো ছোকরা?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১০।১২ জন কেরাণী উগ্র মেজাজে ঢুকে পড়লো কামরার মধ্যে। মিঃ সিন্‌হার প্রশ্নের জবাব দিল তারাই,—ঠিকই বলেছে। বিকাশকে কেন চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তার জবাবদিহি করতে হবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে, আমরাই নেবো এ ব্যাপারে বিচারের ভার।

ওদের কথা শেষ হতে না হতে, আরও পাঁচ সাত জন ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। এমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনার জন্য মিঃ সিন্‌হা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিহ্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বিপদের মুখে পড়লে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। মিঃ সিন্‌হা যে আপিস্ এটিকেট ভুলে যাবেন তাতে অবাক হবার কীই বা আছে! কলিং বেল টিপতে ভুলে গিয়ে তিনি গলা ছেড়ে তারস্বরে হাঁক দিলেন—বেয়ারা, বেয়ারা।

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে। তিনি তখন টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে লোকাল এক্সচেঞ্জ অপারেটারকে ডাকলেন—হ্যালো মিস্ জুনিয়ান্, প্লিজ পুট মি থ্রু টু লালবাজার পোলিস্ ষ্টেশন।

জবাব এলো,—আই রিগ্রেট স্যার। দি হোল্ অফিস্ ইজ অলমোষ্ট ইন এন অ্যাগ্রেসিভ্ ফর্ম্ম অফ্ ষ্ট্রাইক। দে হ্যাভ্ অলরেডি ষ্টরমড্ ইন্‌টু দি কন্‌ট্রোল রুম অ্যাণ্ড আর নাউ ইন্ কমপ্লিট কমাণ্ড অফ্ এক্সচেঞ্জ অপারেশনস্। ইউ কাণ্ট্ গেট্ এনি কানেক্‌শন টু এনি হোয়্যার অন দি আর্থ। অ্যাণ্ড ইউ সী, আই অ্যাম কোয়াইট হেল্পলেশ আণ্ডার দি সারকামষ্টানসেস্।

ভয়চকিত দৃষ্টিতে এবং পাণ্ডুর মুখে মিঃ সিনহা টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

সোমনাথ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

একবার নয় ছয় ছয়বার আক্রমণ হয় সোমনাথের উপর। খৃঃ অঃ ১০২৫, ১২২৭, ১৩১৪, ১৩৯৫, ১৫১১ আর ১৫২০—এই ছয়টি সাল দেখিয়াছে আক্রমণকারীর সর্ব্বনাশ সাধনের ভয়ঙ্কর রূপ।

সোমনাথের উৎপত্তি ও ইহার পৌরাণিক কাহিনী অত্যন্ত চমকপ্রদ। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সোমনাথের প্রাদুর্ভাব বিবরণ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পার্ব্বতীর প্রশ্নের জবাবে মহাদেব বলেন, "পূর্ব্বে আমি এখানে (প্রভাসে) স্পর্শলিঙ্গরূপী ছিলাম। তখন কেহই আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে নাই। যে প্রলয়ে ব্রহ্মারও লয় হয় তাহাকে মহাকল্প বলে। প্রত্যেক মহাকল্পেই লিঙ্গেরও পুনঃ পুনঃ পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সপ্তম ব্রহ্মা বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্রহ্মার নাম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সোমনাথ লিঙ্গেরও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তম ব্রহ্মার নাম শতানন্দ, আর সোমেশ্বর দেব 'সোমনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।" এই সম্পর্কে আরও প্রশ্নের জবাবে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলেন, "এক্ষণে যে শতানন্দ নামে ব্রহ্মা আছেন, ইঁহার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যিনি সর্ব্বপ্রথম মনু হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে লক্ষ্মী ও কৌস্তভাদির সহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে যে চন্দ্র উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কালভৈরব নামক লিঙ্গের আরাধনাপূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা দ্বারা চতুর্দ্দশ কল্প অতিবাহিত করেন। হে শুভে! সুন্দরি! আমি তাঁহার তাদৃশ অদ্ভুত তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর আমি যদি বরদানের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে হে প্রভো! ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আপনার এই লিঙ্গ সোমনাথ নামে প্রখ্যাত হউক আর মনুর অবসান ঘটিলে পর অপরাপর যে সমস্ত চন্দ্র জন্মিবেন, হে দেবেশ! এই সোমনাথই যেন তাঁহাদের কুলদেবতা হন। হে প্রভো! ব্রহ্মার প্রলয়ান্তে তাঁহারা যেন স্ব স্ব আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রে

সোমনাথের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণ। অলিন্দের বাতায়ন-পথে প্রদক্ষিণ-মার্গ দেখা যাইতেছে।

অবস্থানপূর্ব্বক সোমনাথদেবের আরাধনা করেন। হে দেবেশ! এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ভবদীয় এই লিঙ্গের 'সোমনাথ' নাম প্রখ্যাত হউক। হে তেজোলিঙ্গ,

আপনাকে নমস্কার করি।" (স্কন্দপুরাণম—প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যম্, পৃঃ ৪৫৬৪—৪৫৬৭)

উপরি উক্ত উদ্ধৃতির সহিত জড়িত একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহাতে সোমনাথ মন্দির স্থাপনের চমৎকার একটি কাহিনী জানিতে পারা যায়। নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল।

সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেব দক্ষের সাতাশটি কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে একজনের উপর সোমের পক্ষপাতিত্ব ছিল। ইনি রোহিণী। পত্নীদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি একটু বেশী অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু অন্য ভগ্নীরা ইহা সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। এই অনুরাগ-বৈষম্যে ঈর্ষান্বিতা ও ক্ষুব্ধা হইয়া ভগ্নীরা চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিতার কাছে নালিশ করিলেন। প্রথমত, দক্ষ জামাতা বাবাজীকে উপদেশ দিলেন এবং সকল পত্নীকে সমান ভাবে ভাল বাসিতে বলিলেন। কিন্তু তাতে সোমের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। রুষ্ট শশুর রাগ করিয়া সোমকে অভিশাপ দিলেন। বলিলেন, 'তোমার মুখমণ্ডল কুষ্ঠরোগীর মত বিকৃত হইয়া যাইবে।' শ্বশুরের রোষ দেখিয়া সোম অত্যন্ত মুসড়াইয়া পড়িলেন। তিনি অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সোমের অনুনয়ে এবং অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে রাজা দক্ষ সোমকে ক্ষমা করিলেন। "বলিলেন, আমার অভিশাপ ফিরান যাইবে না। উহা ফলিবেই, কিন্তু তুমি যখন দয়া ভিক্ষা করিতেছ তখন তোমাকে আমি রক্ষা করিব। প্রতিমাসে এক পক্ষ কালের জন্য আমি তোমার মুখ ঢাকিয়া রাখিব, কিন্তু তোমাকে মহাদেবের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্য পূজা করিতে হইবে।" সোম প্রজাপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিলেন। তিনি নিত্যপূজার জন্য জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সোমের আরাধ্য শিবলিঙ্গ হইল সোমনাথ। কথিত আছে প্রথমে রাজা সোম স্বর্ণদ্বারা, অতঃপর কৃষ্ণ রৌপ্য দ্বারা এবং সর্ব্বশেষ ভীমদেব প্রস্তর দ্বারা মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন।

সোমনাথে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্লিঙ্গ ছাড়াও আরও ১২টি দেবস্থানে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে উহা জানিতে পারা যায়।

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈল্যাম্ মলকার্জনম্।
উজ্জয়িন্যাম্ মহাকালম্ ওঙ্কারে মমলেশ্বরম্॥
পারল্যাম্ বৈদ্যনাথং চ ডাকিন্যাম্ ভীমশঙ্করম্।
রামেশ্বরং সেতুবন্ধে নাগেশং দ্বারকাবনে॥
বারাণস্যাম্ বিশ্বনাথম্ ত্র্যম্বকং গোমতি তটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ধৃষ্ণেশ্বরং শিবালয়ে॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পাঠেন্নরঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ সোমনাথ. মলকার্জন, মহাকাল, মমলেশ্বরম্, বৈদ্যনাথ, ভীমশঙ্কর, রামেশ্বর, নাগেশ বা নাগেশ্বর, বিশ্বনাথ, ত্র্যম্বক, কেদার, ধৃষ্ণেশ্বর এই দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ বর্ত্তমান। জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বন্ধে পুরাণে বিশদ বর্ণনাদি রহিয়াছে।

সোমনাথ মন্দির প্রভাসপত্তনে অবস্থিত। ইহা দেবপত্তন, সোমনাথপত্তন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। প্রভাসপত্তন জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশীয় রাজ্যটিকে সম্প্রতি নবগঠিত সৌরাষ্ট্র রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। প্রভাসপত্তন অতি প্রাচীন সহর ও বন্দর। ইহা হিন্দুদের নিকট বিশেষ পরিচিত পুণ্যতীর্থ। এই প্রভাসেই যাদবকুল আত্মকলহে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংস হন। অনতি দূরেই সরস্বতী, হিরণ্য আর কপিলা নদী। এই ত্রিবেণীর পূত জলধারা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মাইল খানেকের মধ্যেই 'দেহোৎসর্গ'। মহাভারতের প্রধান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ একদিন তরুচ্ছায়াতলে নিদ্রিতাবস্থায় ব্যাধের তীরে আহত হয়ে দেহত্যাগ করেন এইখানে। তা' ছাড়া রহিয়াছে বৈরাগ্যতীর্থ। কৃষ্ণ-বিরহিণী রুক্মিণী ও তাঁহার অন্যান্য সপত্নীরা এইখানেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া দেহ বিনাশ করিয়া সতী হন। দিগন্ত বিস্তৃত রৈবতক গিরিমালা প্রভাস পত্তনের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বহুল পরিমাণে। এমনি সুন্দর ও স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত ছিল সোমনাথ মন্দির।

বর্ত্তমানে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। কিন্তু উহা আসল মন্দির নহে এবং এ স্থানের বিগ্রহও আসল নহে। প্রথম মন্দির বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করে আক্রমণ-কারীর দল। এই মন্দিরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।

"শ্রীমন্দিরের অলিন্দ সকল বীচিবিক্ষুব্ধ সাগরের উপর বিস্তৃত ছিল এবং সীসকমণ্ডিত ৫৬টি কাষ্ঠস্তম্ভ অলিন্দ বেষ্টন করিয়া এই মন্দিরকে সুদৃঢ় করিয়াছিল। মধ্য প্রকোষ্ঠে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, লিঙ্গটি দশহস্ত দীর্ঘ এবং তিন হস্ত পরিমাণ প্রশস্ত ছিল। মন্দিরের মধ্যভাগে মন্দিরের চূড়া হইতে দুইশতমণ ওজনের একটি স্বর্ণশৃঙ্খল প্রলম্বিত ছিল। সহস্র ঘণ্টা এই শৃঙ্খল মালায় সংলগ্ন ছিল। আরতির সময় যখন দুইশত ব্রাহ্মণ পূজারী ঐ স্বর্ণ শৃঙ্খল সঞ্চালিত ঘণ্টাধ্বনি করিতেন, তখন অপূর্ব্ব ধ্বনি দিগদিগন্ত মুখরিত করিত। মন্দিরের মধ্যভাগ অন্ধকারাবৃত। ঘৃতসিক্ত সুসজ্জিত অসংখ্য স্বর্ণদীপ শ্রেণীর সম্মিলিত আলোক শত শত হীরকখণ্ড এবং মরকত মণিসমূহের সমুজ্জ্বল ছটা মন্দিরাভ্যন্তরে বিচিত্র বর্ণের আলোকমালা প্রকাশিত করিয়া অতি সুন্দর শোভার সৃষ্টি করিত। বহু ক্রোশ দূর হইতে আনীত গঙ্গাবারি দ্বারা প্রত্যহ শিবলিঙ্গের স্নান সম্পন্ন হইত। সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সোমনাথের পূজা করিতেন। ৩৫০ জন চারণ সুললিত স্বরে স্তুতি পাঠ করিতেন। ৩০০ গায়ক দৈনিক গীতবাদ্যের দ্বারা সমাগত যাত্রিগণের শ্রুতিরঞ্জন করিত। সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ পাইত। শিবলিঙ্গের সেবার জন্যে দশ সহস্র দেবোত্তর গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। চন্দন কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত নানা-প্রকার কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ সিংহদ্বার মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিত।" (তীর্থ চিত্র) এই মন্দিরটি মামুদ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়। "ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরময় মন্দিরের যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এককালে উহা সৌন্দর্য্যে ও বিশালত্বে জগতে অতুলনীয় ছিল। এক্ষণে উহার চূড়া নাই, দরজা নাই, আরও অনেক জিনিষ নাই, তথাপি এখনও যাহা আছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, এককালে ভারতের স্থপতিশিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মন্দিরের চারিধারে বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আবার প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের তলদেশ ধৌত করিবার জন্যই যেন বারিধি-তরঙ্গমালা একটির পর একটি প্রাচীর গাত্রে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সে কি মহান দৃশ্য।" (দ্বারকার পথে)।
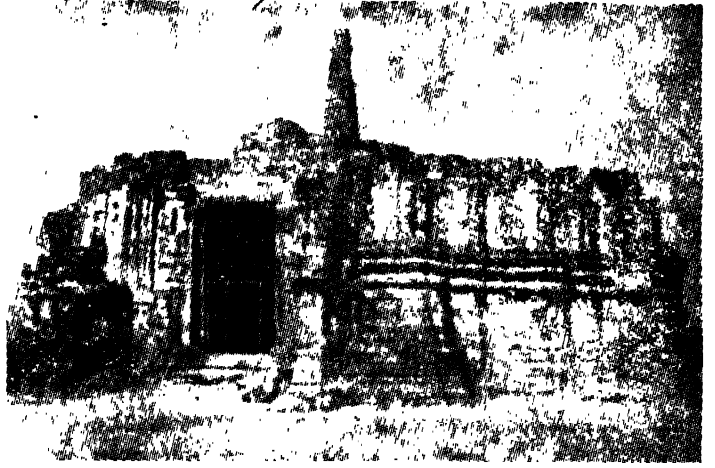
অতীতের সোমনাথ মন্দিরের সম্মুখভাগের দৃশ্য। প্রাচীরের সুদৃঢ় গঠন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত।

মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর অপর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের উপরে যে বিগ্রহ রাখা হইয়াছে, তাহা নকল। আসল জ্যোতির্লিঙ্গ মৃত্তিকাগর্ভে কুঠুরি নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। গর্ভমন্দির সুসজ্জিত ও কুসুমবাসে সুরভিত। পুনর্লুণ্ঠনের আশঙ্কায় এইভাবে বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে।

সোমনাথের মন্দিরের ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়, ইহার অতীতকাল তেমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কে যে কবে এই মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ করেছিলেন তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে লিখিত কোন দলিল সংগ্রহও সম্ভব হয় নাই। তবে নানা সূত্রে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়। তখন

সোমনাথ ছিল শিবপন্থী পাশুপত সমাজের ধর্ম্মসাধনার পীঠভূমি। অবশ্য কিম্বদন্তী যে, অতি প্রাচীনকালে সোমনাথলিঙ্গম খুব সম্ভব সমুদ্রতীরে উন্মুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে কোন মন্দিরাদি ছিল না। মন্দির নির্ম্মাণ করেন সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা বল্লভী রাজবংশ। ইহারা শিবের উপাসক। কিন্তু ইহাতে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। অনেকের মতে প্রথম মন্দির বল্লভীরা তৈয়ার করান নাই। প্রথম মন্দির কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বল্লভী রাজবংশ ঐ স্থানে দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের শাসনকাল ৫৮০ হইতে ৭৩৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময় প্রভাসের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে আরব দস্যুদের হামলার ফলে প্রভাস ক্ষেত্র নষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথও। এবার সোমনাথ মন্দির নির্ম্মাণ করেন গুর্জ্জর প্রতিহার। বংশের দ্বিতীয় নাগাভট্ট। পুরাতন মন্দিরের সঙ্গেই নির্ম্মিত হয় তৃতীয় মন্দির। এর এই পুনর্নির্ম্মাণকাল হইল ৮০০ খৃষ্টাব্দ। মন্দিরটি লাল পাথরে নির্ম্মিত হয়। এত বৃহৎ মন্দির তৎকালে আর ছিল না। গুর্জ্জর-প্রতিহার সম্রাটরা ৮০০—৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। এই সময়েই সোমনাথ মন্দিরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এবং মন্দির প্রদর্শনে বহুলোকের সমাগম হয়। সোমনাথ একটি প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। আরব পর্য্যটক আল বেরুণি এবং রোমক পর্য্যটক মার্কো পোলোর বিবরণীতে সোমনাথের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। সোমনাথ মন্দিরের কাহিনী মুসলমান ঐতিহাসিক ইবন আসিরেয় "কামিন উৎ-তারিখ" গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, "মন্দিরের মধ্যভাগে সোমনাথ বিগ্রহ স্থাপিত। উপর বা নীচ হইতে কোন কিছু ইহা ধারণ করিয়া নাই। হিন্দুদের নিকট ইহা পরম ভক্তির বস্তু। শূন্যে দোদুল্যমান এই অবলম্বনহীন বিগ্রহ দর্শন করিয়া মুসলমানই হউক আর কাফেরই হউক, সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইত।" কিন্তু ঐতিহাসিকের উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মন্দিরের বা বিগ্রহের সৌন্দর্য্য ও চাতুর্য্য ধনলোভী গজনীর সুলতান মামুদকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী। ধনরত্ন লোভ তাহাকে সুদূর গজনী হইতে টানিয়া আনিল। তিনি বীরবিক্রমে সোমনাথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গজনীর সুলতান মামুদ তেরো বার ভারতের উত্তরাঞ্চলে হানা দেন। রাজ্য দখল ও তাহা পদানত করার চাইতে ভারতের অপরিসীম ধনরত্নই তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাই প্রতি আক্রমণের শেষেই অফুরন্ত মণিমাণিক্য লুণ্ঠন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। লুণ্ঠন তাহার এই হানার এক মাত্র উদ্দেশ্য হইলেও সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর উপর তিনি রাজনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। সোমনাথের উপর আক্রমণই তাহার শেষ ভারত আক্রমণ।

মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ-মন্দির আক্রমণের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হইতেছে এই যে, মন্‌সগালুরি সা ওরফে হাজিমহম্মদ নামে একজন মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী মুসলমান সোমনাথে বসবাস করিতেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মক্কায় বাস করিতেন, সেখানে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, পয়গম্বর যেন তাহাকে সৌরাষ্ট্রে গিয়া বসবাস করিতে বলিতেছেন এবং সেখান হইতে হিন্দুর মন্দিরাদি ধ্বংস করিবার জন্য গজনীর সুলতান মামুদকে আহ্বান করিতে আদেশ করিতেছেন। কাহিনীর সত্য মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব নয়।

যাহা হউক, সুলতান মামুদ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন। তিনি ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া মুলতানের পথে আজমীঢ় উপনীত হইলেন। আজমীঢ় তাঁহার আক্রমণে ও লুণ্ঠনে বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হইল। ইহার পর তিনি সোমনাথের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজারাও তাঁহাদের প্রিয় দেব মন্দির রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুইপক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিন চারিদিন ব্যাপী যুদ্ধ চলিতে থাকে। হাজার হাজার হিন্দু বীরবিক্রমে মন্দির রক্ষার জন্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। সোমনাথে চতুর্থ নদীর সৃষ্টি হয়—সে নদীর জল লাল। টাটকা হিন্দু শোণিত প্রবাহিত সেই নদী পথে। কিন্তু 'বীরের এই রক্তস্রোত'ও মামুদকে রোধ করিতে পারিল না। মামুদ বিজয়গর্ব্বে

মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ধনরত্ন পরিপূর্ণ মন্দির দেখিয়া লোভে তাঁহার চক্ষুদ্বয় চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। অবিলম্বে দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য এবং সমস্ত মণিমুক্তা ও ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন। পূজারীদের সমস্ত আবেদন নিবেদন বিফলে গেল। ধনরত্ন উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। নিজহস্তে বিগ্রহ চূর্ণ বিচুর্ণ করিলেন এবং সমস্ত স্বর্ণরৌপ্য মণিমাণিক্য এমন কি মন্দিরের দ্বারটি পর্যন্ত অপহরণ করিলেন। কিন্তু বিপুল লুণ্ঠিত অর্থ নিয়া মামুদ নির্ব্বিবাদে গজনীতে উপনীত হইতে পারেন নাই। পথে তাহাকে হিন্দু রাজাদের বহু আক্রমণ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে তাঁহাকে প্রায় লুকাইয়া ঐ ধন সম্পদ লইয়া ভারত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কাহিনী বেশীর ভাগ পাওয়া যায় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে। উহাতে সুলতান মামুদকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং যে ভাবে হিন্দুদের অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহাতে যে সত্য রক্ষিত হয় নাই, নানাভাবেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এলিয়ট তাঁহাদের গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন

যাহা হউক, সুলতান মামুদ ধনরত্ন লইয়া চলিয়া গেলেও সোমনাথের শাসকরূপে এক ব্যক্তিকে রাখিয়া যান। ইনি মামুদের বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইল না। তিনি বিতাড়িত হইলেন এবং মালবের রাজা ভোজ ও গুজরাটের রাজা ভীমদেব (১০২২-১০৭২ খৃঃ) ভূলুণ্ঠিত তৃতীয় মন্দিরের সম্মুখে চতুর্থ মন্দির নির্ম্মাণ করান। অতঃপর ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সম্রাট কুমার পাল মন্দিরটিকে নূতন আকারে নির্ম্মিত করান। ইহাই পঞ্চমমন্দির। আকৃতিতে ইহা ছিল বিরাট, এবং সৌন্দর্য্যেও ইহা ছিল অপরূপ। বর্ত্তমানে সোমনাথ মন্দিরের যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায় তাহা কুমার পাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ।

ইহার পর দ্বিতীয় আঘাত আপতিত হয় সোমনাথের এই পঞ্চম মন্দিরের উপর। এবারের আক্রমণকারী হইল দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজি। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি আলাফ খান সোমনাথের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিযান পরিচালনা করেন। রাজপুতেরা আলাউদ্দিনকে বাধা দিতে গিয়ে দলে দলে প্রাণ দিলেন। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত, বিগ্রহ ধ্বংস ও মন্দিরের ক্ষতি করিয়া বিজয়ী নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিলেন।

১৩০৮-২৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা মহীপালদেব মন্দির পুনরায় সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২৫-১৩৫১ সালে মহীপাল দেবের পুত্র চতুর্থ খাঙ্গার মন্দিরে সোমনাথ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহীপাল দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল কুমারপালের মন্দিরের নিকটেই। উহার আকার যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি ছিল কারুকার্যহীন সাধারণ। ইহার পর হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষীরা কয়েকবার সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে কিন্তু মন্দিরের বিশেষ ক্ষতি সাধন না করিয়া দেববিগ্রহ বিনষ্ট করে। ১৩৭৫ সালে গুজরাটের সুলতান, ১৪১৩ সালে আবার গুজরাটের
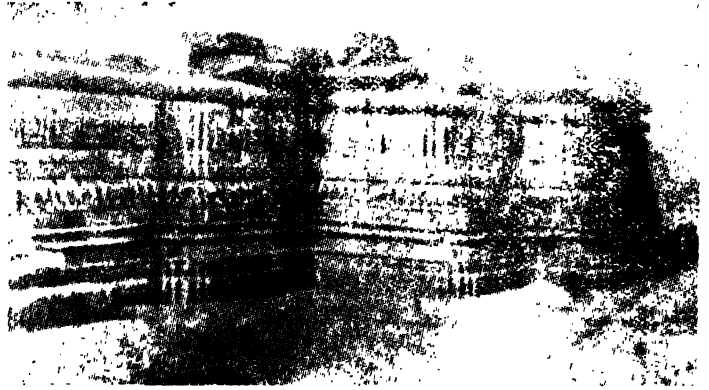
পার্ব্বতী মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দৃশ্য।

সুলতান আহম্মদ শা ঐ ভাবে বিগ্রহ অপসারিত করিয়া নিজেদের ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় দেয়। কিন্তু হিন্দুদের সমবেত চেষ্টায় উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বেগাদা বিগ্রহ অপসারিত করিয়া মন্দিরটিকে মসজিদে পরিণত করেন। ইতিপূর্ব্বে মন্দির লুণ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু উহাকে মসজিদে পরিণত করার চেষ্টা হয় নাই। যাহা হউক, হিন্দুরা প্রথম সুযোগেই মসজিদকে আবার মন্দিরে পরিণত করেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা করেন। তারপর আসে সম্রাট আকবরের কাল। সেই সময় হইতে শাহজাহানের কাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ দুই শতাব্দী সোমনাথ মন্দিরে আর কোন হামলা হয় নাই কিন্তু ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর আবার সোমনাথের উপর কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে। তাঁহারই নির্ম্মম আদেশে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস হয়। শুধু ধ্বংস করিয়াই তিনি তৃপ্তি পান নাই, উহা ভস্মীভূত করিবার আদেশও দিয়াছিলেন। আজও বিধ্বস্ত সোমনাথ মন্দিরের স্তূপের মধ্যে ভগ্ন স্তম্ভাদির দেহে অগ্নিদহনের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষ করিয়া দিবার জন্য তিনি বিধ্বস্ত মন্দিরের উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। তারপর তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়ে এ পরিকল্পনাও তিনি পরিত্যাগ করেন। মন্দির তাই মসজিদে পরিণত হয় না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের আঘাতের ফল যে ভাবে মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল তাহাতে শীঘ্র সোমনাথের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ মন্দিরে বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহার ভাস্কররা স্থানটি পরিদর্শন করেন; কিন্তু ঐ মন্দির পুনর্গঠন অসম্ভব বিধায় সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণের পরামর্শ দেন। মহারাণী সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নূতন মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দেন। এইটিই ষষ্ঠ মন্দির। এই মন্দিরের বিশেষত্ব এই ছিল যে, উহাতে একটি গুপ্ত মন্দিরও নির্ম্মিত হয় এবং আসল বিগ্রহ ঐস্থানে স্থাপিত হয়। পূর্ব্বেই এ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারত স্বাধীন (?) হইবার পর সোমনাথের পুনরুজ্জীবনের সঙ্কল্প করেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁহাদের সঙ্কল্প উপযুক্তই হইয়াছে, কারণ ঐ মন্দিরের সহিত কেবল মাত্র যে ভারতের ধর্ম্ম, সভ্যতা, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির প্রশ্নই জড়িত আছে তাহা নহে, উহার সহিত জড়িত আছে ভারতের কয়েক যুগের মর্ম্মান্তিক ইতিহাস যাহার শুধু সেন্টিমেন্ট্যাল মূল্যই নয় ঐতিহাসিক মূল্যও সমধিক। ইতিহাসের শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলার জন্যও এই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

যাহা হউক, প্রাচীন মন্দিরের উপরেই পূর্ব্বতর মন্দিরের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর একটি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ১৯৪৮ সালে সোমনাথ মন্দির ট্রাষ্ট গঠিত হয়। এই ট্রাষ্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাহাতে শুধু সোমনাথ নয় প্রভাসপত্তন আবার পৌরাণিক সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হইবে। ইহাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে গত ১১ই মে, বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমাতে প্রভাসপত্তনে সমুদ্রসৈকতে নবনির্ম্মিত সোমনাথ মন্দিরে আবার নবগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[১৮৬৩—১৭ই মার্চ্চ, ১৯১৩]

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনার প্রথমেই মনে হয় "More is thy due than more we can pay"; তাঁহার প্রাপ্য সম্মান আমরা তাঁহাকে দিই নাই। তাঁহার রচনার দোষ বিচারে গুণ-লেশও যেন উপেক্ষিত হইয়াছে। বাংলা দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য।

তাঁহাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা বাঙালীর কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে, যে কারণেই হোক্, রঙ্গালয় কিঞ্চিৎ তৎপর হইলেও, সুধীসমাজ তাঁহার অধিকাংশ রচনাকে কাঁচের আলমারীতে রাখিয়া দিয়াছে। উপযুক্ত সমাদর না হইবার কারণের মধ্যে বলা যায় ৪টি :—(১) সমুজ্জ্বল-জ্যোতিষ্ক-ম্লানকারী রবিরশ্মি, (২) কবির নিজ সমাজের প্রতি অকপট কঠোর শ্লেষ, ( ) নাটক, হাসির গান ও কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্য সঙ্গীত ব্যতীত বহুতর রচনায় ভাষার অসংযম ও ছন্দোবন্ধের শিথিলতা, এবং (৪) প্রোপাগ্যাণ্ডার অভাব।

তিনি কোন Epic, মহাকাব্য বা উপন্যাস লেখেন নাই; এমন কি ছোট গল্পও নয়।

কিন্তু তাঁহার দান অতুলনীয়। নাট্যকার হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করিয়াছেন; Byron Shakespeare, Shelley তাঁহাকে প্রেরণা জোগাইত। "আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ" নামক রচনায় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Shelley-র অনুসরণে "সোরাব রুস্তম" নামক Opera তাঁহার নিজেরই ভাল লাগে নাই। নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি চরিত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাই—'প্রতাপ সিংহে' তিনি যোশী, 'মেবার পতনে' শঙ্কর, 'দুর্গাদাসে' দুর্গাদাস, 'সাজাহানে' দিলদার, 'বিজয় সিংহে' বিজয়সিংহ। বাংলার নাট্যজগতে তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নৈতিক দান সুরুচি; সাহিত্যিক দান ছন্দোময় গদ্য—যাহা পদ্য অপেক্ষাও মধুর; ইহা হইতে বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের বিপুলতা ও তাহার প্রয়োগ-শিল্পের ঐশ্বর্য্য বুঝা যায়। হয়ত বার্ণার্ড শ ও গল্সওয়ার্দির নাটকে পদ্যের পরিবর্ত্তে গদ্যের প্রবর্ত্তন তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

নূতন ছন্দ প্রয়োগে, দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকত্বে, শব্দচয়ন ও শব্দসৃষ্টির সুকৌশলে, অপরূপ বাণীলাবণ্যে এবং স্বচ্ছন্দ গতিবেগে তাঁহার নাটকগুলি সেই স্বদেশীযুগে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কি লিখিয়াছেন—'সৌন্দর্য্যে কম্পমান', 'নিঃস্ব হাসি', 'বিস্মিত আতঙ্ক', 'বিরাট স্বেচ্ছাচার' 'সুপ্তিহীন প্রাণ' ইত্যাদি, যাহার যথাযোগ্য প্রয়োগে অভিব্যক্তি স্পষ্টতর হইয়াছে? আবেগ ও সংস্কারকের তীব্রতা তাঁহার কবি-প্রতিভাকে স্থানে স্থানে ছায়ামলিন করিলেও, তাঁহার দুর্ব্বার দেশপ্রেম, বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির ফলে বাঙালীর জাগিয়াছে মনুষ্যত্ব-পিপাসার মহিমাবোধ, সমপ্রাণতার অনুভূতি, অভ্যুদয়ের আশা ও তজ্জনিত কর্ম্মস্পৃহা। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে যদি আর কিছুও নাই পাইতাম, এইটুকুই যেন ধরিয়া রাখিতে পারি।

তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস-মাধুরী বিচিত্র সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়া বঙ্গদেশকে ধাত্রী ও জননীরূপে আবাহন করিয়াছে—সাগরোত্থিতা জন্মভূমির রূপশ্রীর সজীব কল্পনা বাস্তবের পটভূমিতে ইন্দ্রজাল রচিয়াছে—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা এই দেশটির বন্দনা নবতম ঝঙ্কারে অনুরণিত করিয়াছে—মনে হয়, যেন নূতন করিয়া মহাকবি পড়িতেছি—

"This happy breed of men, this little world,
This precious stone set in the silver sea,
This blessed spot, this earth, this realm
this England!"

Browning-এর England এর মতো ভারতবর্ষকে দ্বিজেন্দ্রলাল 'supremely read' করিয়া আঁকিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের 'অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে, ঐ শোভে, উর্দ্ধশিরে পরশি গগন; অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে, কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ, দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর, উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি তদুপরে, হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর তুলিছে মস্তক যেন ভেদি নীলাম্বরে,'—রবীন্দ্রনাথের "ললাটে তোমার নীল নভতল, বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল, নীরব আশীষ সম হিমাচল তব বরাভয় করে" জীবন্ত মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানের অনেকগুলি classic হইয়া রহিয়াছে। শ্লেষ, কৌতুক, বিদ্রূপ, রসিকতা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি হাস্যরসের উপাদান যত সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন ও রসঘন হইবে, ইঙ্গিতের দ্বারা বিদ্বেষশূন্য আক্রমণ যত নিবিড় হইবে, হাস্যরসের অভিব্যক্তি তত মধুর হইবে। বিদ্রূপের বিষয়বস্তুর নগ্ন-প্রকাশ বা কথাঘাতের তীক্ষ্ণতা ক্রোধ বা বিরক্তির উদ্রেক করে এবং হাস্যরস ব্যাহত হয়। "বিলেত ফেরতা ক ভাই," "গুঁতোর চোটে' ইত্যাদি রসরচনায় এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'আমি যদি পীঠে তোর', 'বিলেত দেশটা মাটির' ইত্যাদি সঙ্গীত Inferiority complexএর বিরুদ্ধে কৌতুক রচনা, কিন্তু বক্তৃতার ধ্বনিতে ইহাদের রসনিক্কণ স্তিমিত হইয়াছে। Humour-এ তাঁহার হাসির গানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি ভরপুর— অসঙ্গতির জন্য হাস্যোদ্রেক অথচ একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, একটি দীর্ঘশ্বাস মনকে সজাগ করিয়া তোলে; ক্ষণপরেই দুঃখ ও নিরাশায় হৃদয় ভরিয়া ওঠে, কবির রসসৃষ্টি সার্থক করিয়া Humour pathosএ ডুবিয়া যায়। দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস তাঁহার গভীর বেদনার প্রতীক: Charles Lambএর মতো তিনি "Laughed to save himself from weeping."

বঙ্কিমের 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম', 'কমলাকান্ত' ইত্যাদিতে ব্যঙ্গ রঙ্গ, ধিক্কার ও হাস্যরসের তলে তলে এই প্রকার মর্ম্মছোঁয়া বেদনার কাতরতা রহিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে হেম, নবীন, কেদারনাথ ও রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত রহস্যের আবরণে দেশের জন্য কাঁদিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রসরচনায় ব্যথার উপর হাসির পালিশটুকু অত্যন্ত তরল!

তাঁহার রচনার আর একটা দিক আছে—তাজা মনে ও নিছক স্ফূর্ত্তিকে ক্ষণতরে আত্মভোলা হইয়া কবি 'Pleasant Nonsense' রূপে যে সুরুচিময় আনন্দরস "বিষ্যুৎবারের বারবেলায়" পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা Fun বা কৌতুকের চমৎকার অভিব্যক্তি এবং কয়েকটি সনাতন সত্যের প্রকাশ। রহস্যের পরিবেশের মধ্যে Witএর উদাহরণ তাঁহার বহু রচনায় বিশেষতঃ "মন্দ্রে" ও "আষাঢ়ে" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান—কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে এবং দীর্ঘ বর্ণনায় রহস্যের effect স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ Wit ঠিক flashএর মতো, চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। কবি নিজেই তাঁহার 'আষাঢ়ে'র সমালোচনায় বলিয়াছেন—"ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবদ্ধ, অতীব শিথিল ইহাকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করা যায়।"

লঘু বিষয়ের রচনায় লঘু এমন কি গ্রাম্য ভাষার প্রয়োগে তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ; কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় সাধু ভাষার সহিত সহসা গ্রাম্য ভাষার অবতারণা তাঁহার কয়েকটি কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'মন্দ্র' নামক কাব্যগ্রন্থে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিকে তিনি নিজে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াছেন। আরম্ভ করিয়াছেন—"হে সমুদ্র! আমি আজি এইখানে বসি তব তীরে,...মধ্যে হঠাৎ গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াই লিখিতেছেন—

"—না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগ্‌সৈ হে!
ভারি অর্থপূর্ণ;—নয়?—হে সমুদ্র! ব'লো ভাই, ব'লো,
মাফ্ ক'রো কথাগুলো; অশ্লীলটা না হ'লেই হল;
তোমার যে প্রাপ্যমালা তার আমি করিব না হানি;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর! আমি বেশ জানি।"

শেষের দিকে সমুদ্রের প্রাপ্য তাহাকে দিয়াছেন অনবদ্য ভাবভাষা ও ছন্দসুষমায় মণ্ডিত করিয়া—যথা—

"তুমি গর্ব্বী; তুমি অন্ধ; তুমি বীর্য্যমত্ত; তুমি ভীম;
কিন্তু তুমি শান্ত; প্রেমী; তুমি স্নিগ্ধ; নির্ম্মল; অসীম;
অগাধ; অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।

* * *

দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাষ্পাকারে
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,
দেবতার বরসম, প্লাবি নদনদী হ্রদহ্রাদি,
জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্প-রাজত্ব, বারিধি !

* * *

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু ! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্বের স্তম্ভ ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও ;
— যাও চিরকাল সমভাবে বীর, কল্লোলিয়া যাও।"

[বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ দ্বিজেন্দ্রগ্রন্থাবলীর কবিতা ও গানখণ্ডে কবির বহু দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী ও বাংলা রচনা প্রকাশ করিয়াছেন] মন্দ্রের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ইহা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে ; ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।" কিন্তু তিনি ইহার রসবিন্যাস ও ছন্দসজ্জা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, যাহার আঘাত যুক্তির সাহায্যে তীব্র হইয়াছিল।

বাংলার মহান্‌ সঙ্গীতের উপযোগী করিয়া কোরাস গান রচনা পদ্ধতি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি—যথাস্থানে ইহার প্রয়োগশিল্প তাঁহার নিজস্ব। যদিও হেমচন্দ্রের "জয়মঙ্গল গীত" (রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের চীফজাষ্টিস পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত) "অর্দ্ধ কোরাস," "পূর্ণ কোরাস" ও "সকলে একত্রে" শীর্ষক নানা ছন্দবিশিষ্ট বাংলা, মৈথিলী কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে—ইহারা অনেকটা যাত্রা বা সংকীর্ত্তনের মতো।

গ্রীক নাটকের উৎপত্তি দেবতা বিশেষের কার্য্য ও গুণ বর্ণনায় Dithyramb নামক কোরাসে, যাহা উৎসবমত্ত গ্রামবাসীরা বৎসরে চারিবার মাটির বেদীকে ঘিরিয়া সমবেত ভাবে গান করিত, ক্রমশঃ এই প্রথার পরিবর্ত্তন হইল ; একজন অভিনেতা উৎসব পরিচালনা করিলেন এবং কোরাস গাহিবার দল অভিনেতার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে বিশদভাবে বুঝাইবার ও অভিনয়টির নৈতিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিবার ভার লইলেন। ইংরাজ কবিদের মধ্যেও কোরাসের ও সেমিকোরাসের এই শেষোক্তরূপের প্রচলন আছে। হেমচন্দ্র উপরোক্ত গীতটিতে আংশিকভাবে ঐরূপের অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কোরাসের মূল প্রাণশক্তি বজায় রাখিয়া উদ্দীপক ছন্দে শ্রুতিমধুর ভাষায় তাহাকে দুই লাইনের কবিতায় সাজাইলেন।

তাঁহার সঙ্গীতের সুরই প্রাণ, কথা দেহমন্দির। ছন্দের আস্বাদনে কান ও প্রাণের সহযোগিতা অপরিহার্য্য ; মধুসূদন বলিতেন, Train the ear, দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন, "হোক্‌ না সুন্দর স্বরের ভঙ্গী, হোক্‌ না শুদ্ধ তাল ও লয়, গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার, তাহার সে গান গানই নয়।"

এ কথা সখীকে শ্যামনাম শুনাইবার দিন হইতে সত্য।

বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি সুবিখ্যাত স্কচ্‌, ইংলিশ ও আইরিশ কবিতার সুন্দর ছন্দানুবাদ করেন, কিন্তু কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল না বলিয়া সেগুলি জনপ্রিয় হইল না। কিন্তু বিদেশের সুর লইয়া বাংলাসঙ্গীতে প্রচলনের দুঃসাহস তাঁহার ছিল বলিয়াই আমরা কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর "জাতীয় সঙ্গীত" পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। বিলাতি ও দেশী সঙ্গীতের পার্থক্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করিব—"একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীন গতি, স্বাবলম্বী বিংশতি বর্ষীয়া কুমারী ইংরেজ মহিলা, অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গনে সশঙ্কগতি গৃহপ্রবেশোদ্যতা ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ···একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী,— অপরটি যেন সভয়া বিনত-নয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য, অপরটি বিলাপ।" এই 'বিলাপ' তিনি ঘুচাইয়াছেন।

খণ্ড কবিতা রচনায় তাঁহার "আলেখ্য", "ত্রিবেণী" উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে একটু শক্তই ঠেকিবে, একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।" ইংরাজী বা Italian Sonnet-এর অনুকরণে পক্ষপাতি ছিলেন না এবং চতুর্দ্দশপদী অপেক্ষা দশপদী

কবিতা রচনার পক্ষে উপযোগী বলিয়া ভাবিতেন এবং এই কবিতাগুলির ছন্দ বিচার সম্বন্ধে ভূমিকায় সহজ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধের পথ গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত গান ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক তাঁহার কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইল। "আনন্দ-বিদায়" নামক Parody (বা কৌতুকানুকৃতি)তে তিনি বলিলেন, "যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু।" দলাদলির কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেলে, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১৩ সালের প্রারম্ভে লিখিলেন, "আমাদের শাসনকর্ত্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন, এবং রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

সমালোচনায় (বিশেষতঃ "কালিদাস ও ভবভূতি" নামক গ্রন্থে) দ্বিজেন্দ্রলালের নিরপেক্ষতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইলে এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইত। "মনে মুখে" তিনি এক ছিলেন। এই সাহস ও অকপটতা তাঁহার জীবনের যাত্রাপথকে মসৃণ করে নাই। তাঁহার প্রবন্ধ-গুচ্ছ "চিন্তা ও কল্পনা" অনেক চিন্তা ও কল্পনার ফল হইলেও প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ভাষা অনবদ্য, কোথাও উচ্ছ্বাসময়, কোথাও অনুরাগস্নিগ্ধ। "প্রেম কি উন্মত্ততা" শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধটির ভাষা সুরুচিপূর্ণ ও মধুর। তাঁহার প্রহসন "পুনর্জ্জন্ম" অতি সহজে অভিনয় যোগ্য ও বিদ্বেষহীন হওয়ায় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। "একঘরে" বা "কল্কি-অবতার"—প্রহসনের জ্বালা ইহাতে নাই।

ক্ষীণতম প্রবন্ধে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ প্রতিভা, চরিত্রমাধুর্য্য ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অবদানের দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নহে। তাঁহার সাহিত্য সেবা সার্থক হইয়াছে—তিনি বাণীর আশ্রয়ে অপূর্ব্ব মানসিক বলের সাহায্যে দুঃখ জয় করিয়া, কাব্যামৃত রসাস্বাদে মজিয়া আনন্দের সন্ধান দিয়া গাহিয়াছেন—

"মরুভূমিসম যখন তৃষায় আমাদের মাগো
বুক ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা
তোমার হাসিটি করিয়া পান।
জননি বঙ্গভাষা, চাহিনা অর্থ চাহিনা মান।"

একটি সনেটের প্রতিশ্রুতি

বটকৃষ্ণ দাস

বিষণ্ণ দিনের শেষে রাঙা মেঘে পাখীর ডানায়
থরোথরো সন্ধ্যা নামে। মধুর মধুর আকাশ
চেতনায় হাওয়া দেয়। ঠাণ্ডা হাত, নরম নিশ্বাস
শরীরে ঝরিয়ে যেন শিলঙের অনুশীলা রায়
ঘন হ'য়ে কাছে এসে এলোমেলো কথা ব'লে যায়।
কথার তরঙ্গে তার মাঠ বন সমুদ্র আকাশ
স্বপ্নের ঝালরে কাঁপে। তারপর আদিম উচ্ছ্বাস
দেহের নির্জ্জন দ্বীপে ক্লান্তি আনে প্রেমে, রিরংসায়।

এখানেই শেষ নয়। অন্তিম আতস পুড়ে গেলে
ভস্মসার স্বপ্নস্তূপে তবুও রাত্রির কুয়াশায়
সমুদ্রের ঘ্রাণ ভাসে। বিবসনা তনুর তুষার,
ম্লান শয্যা, বন্ধ্যা প্রেম, ক্লেদাক্ত রাত্রির গুরুভার
সব ছুঁয়ে,—কামনার অন্ধকার ক্লান্তি, মৃত্যু ঠেলে
শ্বেতপক্ষ পারাবত রৌদ্রের বন্দরে উড়ে যায়।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

আঠার

সেদিন ছিল শ্রাবণ মাসের তৃতীয় শনিবার। এক বছর আগে এই দিনে বাবা নতুন মাকে বিয়ে করেন। বছরান্তে জন্ম মৃত্যুর উৎসব হয়, জয় বিজয়ের উৎসব হয়, নতুন বছরের স্বাগত উৎসব হয়। এতগুলি অনুকূল নজীরের উপর নির্ভর করে বাবার জনকয়েক বন্ধু তাঁর বিয়েরও বার্ষিক উৎসবের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ঠাকমা কি আমি কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। আমরা জানলাম উৎসবের দিন বিকাল চারটে আন্দাজ যখন ক্ষেমী পিসি আর সুরমা মোটরে করে এসে নামল বাড়ীতে।

একা ক্ষেমী পিসি এলে কোন সন্দেহই জাগত না আমাদের মনে। কারণ সে মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই যখন তখন আসত। সন্দেহ হল তার মেয়েকে দেখে, সে তার মায়ের মত যখন তখন বা ঘন ঘন আসত না। সে আসত প্রতি রবিবার বিকালে। তা ছাড়া সুরমা কোন দিন মোটরেও আসত না, মার সঙ্গেও আসত না। সে আসত হেঁটে বা শেয়ারের গাড়ীতে এবং একা একা।

সুরমার মত সমস্ত মেয়ে একা একা আসে যায় দেখে ঠাকমা একদিন 'সরকারী'র কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে সরকারী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল —একা একা আসবে কোন দুঃখে বিধু, ওর সঙ্গী সাথীর অভাব কি? পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে তারাইত ওকে সঙ্গে করে আনে।

সেদিন স-নন্দিনী ক্ষেমীপিসিকে বলয় বেষ্টিত শনি গ্রহের মত শনিবারের বারবেলায় উদয় হতে দেখে ঠাকমা বিহ্বল হলেন, আমিও বিস্মিত হলাম। মা মেয়ে একজনও কোন দিকে না চেয়ে সোজা চলে গেল দোতলায়। তাদের চলনের দাপটে সেগুন কাঠের পুরোন সিঁড়ির পাঁজর কেঁপে উঠল।

ক্ষেমী পিসিদের নামিয়ে দিয়েই 'ফিয়াট' খানা বোঁ করে বেরিয়ে গেল আর সেই সময় হাজির হল এসে নেপিয়ার—মামাবাড়ীর দলবল সহ দিদিমা, বড় মাসী, মণী মাসী আর বছর চৌদ্দ পনরোর একটি দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল। মেয়েটি বড় মাসীর —নাম কমলা। সার্থক নামা মেয়ে—যেমন রূপ তেমনি লাবণ্য। এরাও কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে সটান উপরে পাড়ি দিল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই 'ফিয়াট' ফিরল—একমাত্র আরোহী বেহারী মামাকে নিয়ে। গাড়ীখানা এসে থামতে না থামতেই বাবার খাস খানসামা দশরথ পড়িতমরি ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এল এবং গাড়ী থেকে কয়েকটা খাবারের চাঙারি, দই, রাবড়ির ভাঁড় উপরে বয়ে নিয়ে গেল। আর ফজলি আমের চাঙারির উপরে কাবুলি ফলের ঠোঙা কয়টা বসিয়ে কলাপাতে মোড়া যুঁয়ের গড়ে নিয়ে স্বয়ং বেহারী মামা চললেন উপরে। যেতে যেতে আমার দিকে এমন ভাবে চেয়ে গেলেন যা থেকে আমি অনুমান করলাম সে দিনের অত উদ্যোগ-আয়োজনের কারণ তিনিও তখন জানতেন না।

এদিকে নীচেও একটি দুটি করে বাবার বন্ধুরা এসে জমছিলেন। গল্পগুজবে, সিগার-সিগারেট-অম্বরীর সুগন্ধে আর হাস্য পরিহাসের সুমিষ্ট ঝঙ্কারে একটি মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন সময় মুখুজ্যে দাদুকে বাড়ী ঢুকতে দেখে ঠাকমাকে বললাম—ঠাকমা মুখুজ্যে দাদুও আসছেন যে!

আমার কথা শুনে ঠাকমা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—মুখুজ্যে, ব্যাপার কি বলত?

মুখুজ্যে দাদু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—তুমি আছ কোন ভালে? আজ যে মধুর বিয়ের বার্ষিক উৎসব। বাড়ীতে এত বড় ধ্যাঁট আর তুমি জানো না?

ঠাকমা সবিস্ময়ে বললেনস—ত্যি মুখুজ্যে আমি ত এ সবের কিছুই জানিনে! বিয়ের বার্ষিক ধ্যাঁট। লোকের বাপ মা মরলে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করে আমি জানতাম। বিয়ের বার্ষিকী! কই শুনিনি ত কথ্খনো।

মুখুজ্যে দাদু—আমরাই কি আগে শুনেছি? বিলেত থেকে শুধু লবণের চালানই আসে না; আরো অনেক কিছু আসে। বিয়ের বার্ষিকীটাও ঐ দেশেরই চালান। এই বলে গিয়ে তিনি বাবার ঘরে ঢুকলেন।

ঠাকমা নিজে নিজে বললেন—কী হবা-গবা মানুষ আমি। চোখ কান থেকেও আমার নেই। শিবুর মা অসুখে না পড়লে তার মুখেই হয়ত খোঁজখবরটা পেতাম। যাই একবার উপরে—গায় মানে না আপনি মোড়ল এর মত। যদি কিছু করবার থাকে যাই দেখি গে।

ঠাকমা সিঁড়ি বেয়ে দোতালার স্বর্গে গেলেন। আমি ঠাকমার পিছু পিছু চললাম।

উপরে গিয়ে দেখি একটা ডেক্‌চিতে চায়ের জল ফুটছে—প্রাইমাস ষ্টোভে। দিদিমা প্লেটে খাবার সাজাচ্ছেন, ক্ষেমী পিসি সেঁকা পাউরুটিতে মাখন মাখাচ্ছে, আর সুরমা ডজন খানেক চা-কাপে চামচে ক'রে গোয়ালিণী মার্কা গাঢ় বিলাতি দুধ বিলি করছে।

ঠাকমা চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সুরমার পাশে গিয়ে বস্‌লেন। অনেকক্ষণ থেকে ডেক্‌চিতে জল ফুটছিল দেখে তিনি বললেন—জলটা নামিয়ে দে ত সুরমা—ক'রে ফেলি চা'টা!

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে বল্‌লে—what nonsense! কি যে বলছো! তুমি করবে চা? তবেই হয়েছে। এ শাক-সুক্তনি নয়, দিদিমা; এর নাম চা।

ঠাকমা তার নাতনীর বয়সী সুরমার প্রগল্‌ভতাকে উপেক্ষা ক'রে বল্‌লেন—কেনরে সুরমা, চা করতে কি জানিনে আমি?

—জানবে না কেন? তবে সে চা একা তুমিই খেতে পার।

—চা আমি খাইনে; তবু করতে জানি। আমার তৈরী চা খোকন খায়, বেহারী খায়, বউমাও আগে-আগে খেতেন, মধু এখনও কোন কোন দিন খায়। ক্ষেমীও আগে খেতো। কই কেউত নিন্দে করেনি কোনদিন।

ঠাকমার কথায় সুরমার পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি মেঘে যেন ছেয়ে দিল। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই সে বললে—বলি বয়সেই না হয় ভুশণ্ডী হয়েছ, দশজনকে দেখে শুনেও ত একটু আপটুডেট (আধুনিক) হতে হয়। তোমাতে আর শিবুর মাতে তফাৎটা কি শুনি?

ঠাকমা স্তম্ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন রে সুরমা কি দোষ করলাম?

—না দোষ কেন করবে? গুণের সাগর তুমি! মোষ্ট আন্ কালচার্ড ফেলো—অসভ্যের চূড়ামণি। আমার মাকে যখন তখনই ক্ষেমী ক্ষেমী কর কেন বলত?

ঠাকমা অবাক হয়ে বললেন—ক্ষেমীকে ক্ষেমী বলব না ত কি বলব?

—কেন ক্ষেমঙ্করী বলতে কি মুখে আটকায়?

ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে পারল না। হর্ণের একটা বিকট আওয়াজ করে জাহাজের মত একখানা মোটর এসে সদরে দাঁড়াতেই বাড়ীময় একটা শোর গোল পড়ে গেল। 'এসে গেছেন, এসে গেছেন' বলতে বলতে নতুন মা, বড়মাসী, মলীনাসী, ছোট মামা ছুটে নীচে নেমে গেলেন। দিদিমা নীচে নামলেন না, হয়ত স্থূলাঙ্গী ছিলেন বলে। কি জানি কেন এমন আনন্দের দিনেও তাঁর মুখে হাসির আলো কি আনন্দের দীপ্তি ছিল না। সেখানে আসন পেতেছিল হিংসার ছায়া—বুক ভাঙা বিষাদের কালিমা। কেন? ছোট বোনের সুখ সম্পদের দুঃস্বপ্নে কি? হয়ত তাই। রামায়ণে নাকি বিভীষণকে জ্ঞাতি শত্রু বলেছে। মায়ের পেটের বোন কি এই নজীর নাকচ করে মিত্র হতে পারে?

সিঁড়িতে মাদল বেজে উঠল পদধ্বনির। নতুন মা-দের আদর অভিনন্দনে সুনন্দিতা হয়ে একটী মাঝ বয়সী হৃষ্টপুষ্ট বিধবা এসে দর্শন দিলেন সিঁড়ির মাথায়। তাঁর পড়নে শেমিজ ও গরদের ধুতি, পায়ে ভেলভেটের স্যাণ্ডেল, নাকে সোনার ফ্রেমে আঁটা বাই ফোকাল চশমা

আর বাঁ হাতের অনামিকায় ছিল একখানি একক হীরার চোখঝলসানো আংটি। মহিলাটি কৃত্রিম বিস্ময়ে চারিদিকে সমঝদারের দৃষ্টি বিলিয়ে আর প্রসাধনপুষ্ট শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে চললেন ললিত গতিতে—অনুগ্রহ-স্বরূপ সকলের সঙ্গেই একটি দুটি কথা কইতে কইতে।

ক্ষেমীপিসী রুটিতে মাখন মাখানো ফেলে একগাল হাসি নিয়ে ছুটে এসে সুলভ স্তাবকের মত বললে—এই যে ছোড়দি! তাই ত বলি তুমি না এলে কি কোন উৎসব আনন্দ ভাল লাগে, না জমে। এই যে কষ্ট করে একটিবার এলে কত আনন্দ হল আমাদের। লতুর কি ভাগ্যি আজ!

দিদিমা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। জোর করে মুখে একটুখানি হাসি টেনে বললেন—তা বই কি। শুধু কি লতুর? মধুমনির ভাগ্যি, বেয়ানের ভাগ্যি আর আমাদেরও ভাগ্যি।

বড় মাসী এমন স্তুতি বন্দনার আসরে এক ঘরে হয়ে এক কোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেটা কি সম্ভব, না শোভন হয়? তিনি তার মার কথার জের টেনে বললেন—ভাগ্যি বই কি মা। তা ওঁরই কি আসতে অসাধ। আসবেন কি, যা কাহিল শরীল, বছর বছর তিথ্‌থি ধর্ম্ম করে আর জল-হাওয়া বদলে কোন রকমে বেঁচে আছেন আমাদের বরাতগুনে।

বিধবাটি অকৃপণ ভাবে সকলের দিকেই লুটের বাতাসার মত হাসির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে নতুন মার সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

আমরা কিছু জিগ্‌গেস না করলেও গায়-পড়া হ'য়েই ক্ষেমী পিসি বল্‌লে—আমার ছোট ননদ রাণীবালা—লতুর ছোট মাসী। টাকার আণ্ডিল, ছেলেপুলে নেই। পাঁচ-পাঁচটা জেলায় জমিদারী। মস্তবড় মারবেলের বাড়ী যেন লাটের পুরী। বলতে বলতে ক্ষেমঙ্করীর শ্রীমুখখানি শ্লাঘার স্ফুরণে কি হিংসার দহনে লালচে হয়ে উঠল তা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না।

ঠাকমার সাদাটে মুখখানি অরুণাভ হল অন্য কারণে—লজ্জায়, অভিমানে। নিজের রক্ত-মাংসের মত প্রিয় পুত্রের শ্বশুর বাড়ীর লোকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু তাদের দূর সম্পর্কের লোকদের স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষা অপমান নির্ব্বিকারে সহ্য করা মাটির মানুষ বলে নয়, দেব-দেবীদের পক্ষেও সব সময় সম্ভব নয়। অমন যে ভোলানাথ সদাশিব তিনিও শ্বশুরের কৃত অপমান সইতে পারেন নি। এ অবস্থায় ঠাকমা যদি টাকার আণ্ডিলকে অভিনন্দিতা আর নিজেকে উপেক্ষিতা মনে করে অন্তরে আঘাত পেয়ে থাকেন, ন্যায় কি সমাজ কোনটার চোখেই তাঁকে দোষী করা চলে না।

নতুন মার ছোট মাসী এই প্রথম এলেন আমাদের বাড়ী। বাবা ও নতুন মা বছরের মধ্যে কম হলেও এক ডজনবার তাঁর বাড়ী গেছেন—অবশ্য অনাহুত হয়েই। সামাজিক নিয়মে বাবা ও নতুন মাকে ছোটদিদিমার অন্তত একদিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। তিনি তা করেন নি। ছোট দিদিমা যদি ধনী না হতেন, তা হলে নতুন মা কি বাবা নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমাও মাড়াতেন না। 'বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে' কথাটায় মনের মধ্যে সন্দেহ সাড়া দিলেও অর্থ যে জগৎপূজ্য সে সম্বন্ধে হয় ত ষোল আনা লোকই নিঃসন্দেহ।

কোথাও গিয়ে বেশীক্ষণ বসা কি বেশী কিছু খাওয়া বড় মানুষী কায়দা-কানুন নয়। ছোট দিদিমাও বেশীক্ষণ বসলেন না। সামান্য জলযোগ করেই মিনিট পনরোর মধ্যে উঠে পড়লেন। বিধবা হলেও সামান্য চা-জল-খাবারে তাঁর অরুচি দেখলাম না। বড়মাসী, ক্ষেমী পিসি, তার মেয়ে সুরমা, এরা সকলেই এই সৌভাগ্যবতী ধনী বিধবাকে জলযোগে আপ্যায়িত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেহ ধূমায়িত চা, কেহ মিষ্টি, কেহ নোস্তা খাবারের সাজানো রূপোর রিকাবী—আকারে থালাও বলা যেতে পারে, থরে থরে সাজিয়ে দিল তাঁর সুমুখে। দেবী প্রতিমার সুমুখে ভোগ-নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে দেখেছি; কিন্তু দেবীকে তা স্বহস্তে গ্রহণ করতে দেখিনি। সেদিনই প্রথম দেখলাম দেবীকে স্বহস্তে রাধাবল্লভী, মোহনপুরী, শিঙাড়া, কচুরি আর সন্দেশ, দরবেশ, রাজ-ভোগ পরম তৃপ্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে।

এবার ছোট দিদিমার বিসর্জ্জনের পালা। সকলে সঙ্গে চললেন তাঁকে মোটরে তুলে দিতে। আজকাল

দেব-দেবীর বিসর্জ্জনও মোটরের মারফৎই সম্পন্ন হচ্ছে। শুধু দিদিমাই সঙ্গে গেলেন না। তিনি সর্ব্বদাই সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ থাকতে চাইতেন। তাই সকলের আগে আগে সিঁড়ির মাথায় এসে ছোট দিদিমার পথ রোধ করে সগর্ব্বে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলিরে রাণী, আমার নতুর বাড়ী-ঘর!

ছোট দিদিমা বড় মানষী ঢংয়েই উত্তর দিলেন—মন্দ কিছু দেখলাম না দিদি; দু'পুরুষের ব্যবসায়ীর বাড়ী এর চাইতে আর কি ভাল হবে। যা দেখলাম সবই ত ভাল লাগল নজরে, শুধু ঘরগুলি ছোট ছোট আর আসবাবপত্তরগুলো সেকেলে। এক বছর আগে যেসব বাজারে চলতি ছিল এখন তা বাতিল হয়ে গেছে। আমরা যে নিত্য নতুনের যুগের লোক।

দিদিমার থোঁতামুখ ভোঁতা করে, নতুন মা'র পিঠে মুরুব্বির মত হাত বুলিয়ে ছোট দিদিমা বল্‌লেন—সবইত দেখলাম নতু। তা বেশ সাজ-গোছ করেছিস বাড়ীর; কিন্তু সিঁড়িটা বড্ডই সাদাসিধে ঠেকছে। কার্পেট কি লিনোলিয়াম বিছিয়ে পেতলের 'রড' এঁটে নে।

গৃহ সজ্জায় এই অঙ্গহীনতায় নতুন মা'র বড্ডই লজ্জা হল। সত্যিইত বাড়ীর দামী দামী সাজ-সজ্জার পাশে সিঁড়িটাত নেড়া-নেড়াই ঠেকছে। নতুন মা নরম গলায় বল্‌লেন—আবার যে দিন আসবে মাসীমা, দেখবে সিঁড়ির চেহারা কেমন বদলে গেছে।

ছোট দিদিমা খুশি হয়ে বল্‌লেন—আজ আর মধুর সঙ্গে দেখা করবো না; সে হয়ত এখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। একদিন আসিস দু'টিতে। তোর শাশুড়ী কই? তাকেত দেখলাম না।

দিদিমা ডাকলেন—অ বেয়ান একবার এদিক পানে এসো। নতুর মাসী ডাকছেন

ঠাকমাকে বাধ্য হয়ে। আসতে হল। আগেকার আমলের নব বধূর মত অন্তরে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালেন নমস্কার করে।

দিদিমার ছোট বোন, বড় মাসীর ছোট মাসী, পাঁচ জিলার জমিদার যিনি, তিনি কি করে ঠাকমাকে নমস্কার করেন। তিনি ঠাকমার নমস্কার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন; কিন্তু ঠাকমার প্রাপ্য নমস্কারটি দিলেন না তাঁকে। সংসারেরই এই রীতি! লোকে নিজের প্রাপ্য আঠারো আনা আদায় ক'রে নেয়, আর অপরের প্রাপ্য সম্বন্ধে আজীবনই খাতক থেকে যায়!

ঠাকমাকে দেখে ছোটদিদিমা যেন খুবই কৌতুক বোধ করলেন। সুরমা ও বড় মাসীর চোখে-মুখেও কৌতুকের আভাস দেখলাম। দু'জনেই যেন উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল সিংহিনীর সুমুখে শশক কি ক'রে আত্মরক্ষা করে তা দেখবার জন্য।

বিস্ময়ের সহিত ছোট দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন—অ, তুমি নতুর শাশুড়ী? আসবার সময় খাবার সাজাতে দেখেছি বটে। আমি কিন্তু তাই ভাবতেই পারিনি তুমিই আমার বেয়ান! আমি মনে করলাম রাঁধুনী-টাধুনী কেউ হবে।

টাকার গরবে গরবিণীর টেক্কা তুরুপে ঠাকমা কথায় ফতুর হয়ে পড়লেন। এই সৌজন্য নিঃস্ব, নির্লজ্জ ধৃষ্টতার যোগ্য জবাব দেওয়া ঠাকমা উচিত মনে করলেন না। তিনি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই নীরব থাকলেন। স্থল বিশেষে নীরবতা যে বাকপটুতাকে পরাজয় করে সে দিন সকলেই এই সত্যটা অন্তরে অন্তরে স্বীকার ক'রেছিল নিশ্চয়ই। সকলেই বুঝতে পারল এই স্বেচ্ছাকৃত মৌনতা অবিনীত ছোট দিদিমাকে অবনত ক'রেছে; তাঁর এক-টানা মানের স্রোতকে উল্টে দিয়েছে। ছোট দিদিমার অবস্থা সঙ্কট দেখে, ধূর্ত্তামিতে সিদ্ধ হস্ত ক্ষেমঙ্করী ছুটে এলো তাঁর উদ্ধারের জন্য। সবাইকে সে কনুইয়ের ঘায়ে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে এসে বললে—তা তোমার আর কি দোষ ছোড়দি। পরনে যা ময়লা কাপড়!

ঠাকমার কাপড়টা সত্যই ময়লা ছিল। বাড়ীতে উৎসব হ'তে চ'লেছে, কুটুমবাড়ীর লোকজনরা আসবে জানলে হয়ত একখানা ফর্সা কাপড়ই পড়তেন।

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করীর কথা শুনে অনেকের মুখেই চাপা হাসি দেখা দিল। হা হা ক'রে হাসল শুধু সুরমা। মায়ের মান বাড়াতে যত না হোক, ঠাকমাকে অপদস্থ করবার উদ্দেশ্যেই সে বল্‌লে—দিদিমার জন্য তোমার একখানা ধোয়া কাপড় এনে দিলেই পারতে মা।

চাপা হ'লেও শোনা যায় এমন গলায় বড় মাসী বল্‌লে—নতু, যেমন কেউটে তোর শাশুড়ী, তেম্‌নি বেজী সুরমা।

ঠাকমা লজ্জা, অপমানে মাথা হেঁট করলেন। আর আমি নিষ্ফল রোষে ভিতরে ভিতরে ফোঁস ফোঁস ক'রছিলাম।

কবিবর বিপিনবিহারী নন্দী

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

জননী চট্টলা অনন্ত কবি-প্রকৃতি, কবিত্বের মূর্ত্তচ্ছবি। জননীর পর্ব্বতমালায় তরঙ্গায়িত কবিতা ; তাঁর নীল সিন্ধু-গর্ভে তরঙ্গভঙ্গে কবিতা ; অগণিত নদ-নদীতে কবিতা রজতধারে উচ্ছ্বসিতা। মাতার বনে বনে, ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে, সহস্রবিভঙ্গ বনবিহঙ্গের কলকাকলীতে কবিতা। তাই মায়ের বুকে নৈসর্গিক স্নেহের মত, পুষ্পের সৌরভের মত—কবিতা স্রোত চট্টলাসুত বিপিনবিহারীর ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। বিপিনবিহারীর কবিতায় আছে গঙ্গার স্রোতোধারার মত একটী অনিবার্য প্রবাহ, শান্ত সুমধুর স্নিগ্ধতা, মাধুরীমাময় পবিত্রতা। কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় বিপিনবিহারীকে গ্রহণ করতে হয়নি। চট্টলজননীর প্রভূত শক্তি বিপিনবিহারী জন্মাধিকার সূত্রেই অর্জ্জন করেছিলেন।

বিপিনবিহারীর সাহিত্য সাধনার বিশিষ্ট সময় বঙ্গীয় ১৩১০ সাল হইতে ১৩২১ সাল। ৪৮ বৎসর আগে ১৩১০ সালে তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ অর্ঘ্য প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩১২ সালে "চন্দ্রধর" ১৩১৬ সালে "শিখ" ১৩১৮ সালে "সপ্তকাণ্ড রাজস্থান" এবং ১৩২১ সালে "চন্দ" প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত, "নারী" নামক একটী ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি "অর্ঘ্য" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপিনবিহারীকে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাধকস্বরূপে স্বীকার করে নেন।

"অর্ঘ্য" গ্রন্থ চতুরঞ্জলি সমন্বিত। এই চারি অঞ্জলির মধ্যে প্রথম অঞ্জলি নবীনচন্দ্রকে সমধিক মুগ্ধ ক'রেছিল, তাই নবীনচন্দ্র ব'লেছিলেন—"প্রথম অঞ্জলির কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে ; - ভয় ও বসন্তের তুলনা নাই।" বসন্তে সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা—প্রকৃতি দেবী নিজেই পাগলপারা, প্রাণে প্রাণে টানাটানি কাড়াকাড়ি লেগে গেছে সর্ব্বত্র।

বসন্তে কবি বল্‌ছেন—

"ধরার জড়তা গেল ছুটি
প্রাণে প্রাণ নিতে চায় লুটি।
নিখিল উন্মাদ অন্ধ
ঘুচে গেছে লাজ বন্ধ
অরাজক রাজ্যের শাসনে
আজি কে কার কথা শোনে॥"

তাই দিন রাতকে আস্‌তে বারণ করছে, রাত বল্‌ছে সে প্রভাতে আত্মপ্রকাশ করবে না। শশী তারাকে দেখা দিতে বারণ করছে ; তারাগুলি এর ওর কাণে কাণে নানা কথা ব'লে দিচ্ছে—

"এ উহার কাণে কাণে
আজি কে কার কথা মানে।"

তৃতীয় অঞ্জলির "কোকিল" কবিতায় কাব্যপিপাসুকে কবি ব্রজবুলির শব্দ নির্যাস পরিবেশন ক'রেছেন প্রভূত কৃতিত্বের সঙ্গে—কবি বল্‌ছেন,

"নীল বিমল নভ স্বচ্ছ ফটিক সর
রজত কনক মুখ সরস কুসুম থর
হাসত নাচত মলয় পরশ সুখ ;
মধুময় মধু ঋতু জড়িত অখিল বুক।
কো তুঁহু মুহু মুহু, ডাকয়ি উহু উহু
নিবিড় তিমির ঘন পত্রে॥"

অদৃশ্য কোকিল পরিদৃশ্যমান বিরহানলে সমস্ত হৃদয় জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন, "কোটি বদন ভ'রি, কোটি সজল আঁখি" ; তবু কোকিল উন্মাদ ডাক ডাকে।

তৃতীয় অঞ্জলিতে "উপাসনা" শীর্ষক কবিতায় কবি জিজ্ঞাসা করছেন—"কামিনী কাঞ্চনে কেন এতই বিদ্বেষ ?" তা'তে কার এত ক্লেশ বাড়ছে ? সকলে যদি কৌপীন পরে পাহাড়ে ঘুরতো, তা' হ'লে ভগবানের রহস্যতত্ত্ব কে কাকে দেখাত ? তাই কবি এই জটিল প্রশ্নের সমাধানে বল্‌ছেন—

"একটি রহস্য গ্রন্থি দিতে পারি খুলে
সহস্র স্তুতির গানে, সে ফল কি ফলে ?
এই মম উপাসনা, এই মম কাজ।"

চতুর্থ অঞ্জলিতে কবিতাময় উপাখ্যানের অবতারণা বড়ই উপভোগ্য। 'অসি হস্তে ওথেলো' কবিতায় হত-

ভাগ্যা ডেস্‌ডিমনা'র প্রতি কবির উচ্ছলিত স্নেহ কবিতাকে গীতি-ধর্ম্মী ক'রে তুলেছে। "নদী যথা শত শৈল লঙ্ঘি অকাতরে" সমুদ্র পথে প্রবাহিত হয়, ডেস্‌ডিমনার প্রেম-স্রোত দুর্ব্বার বাধা অতিক্রম ক'রে ওথেলোতে এসে মিশেছে—কবি অশ্রু সজল নয়নে বারংবার ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করছেন,

"তাই কি দিতেছ আজি প্রতিশোধ তার,
প্রেমের দক্ষিণা, নিয়ে জীবন তাহার ?"

কবির প্রতিভাসূর্য্য চন্দ্রধর ও শিখাগ্রন্থে মধ্যাহ্ন গগনে আরূঢ়। সেই রশ্মিতে দিগন্ত বিপ্লাবিত। বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাঞ্চল থেকে সেই রশ্মি কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমালোচকদের আনন্দ বিবর্দ্ধন করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু সকলেই তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। বিপিন বিহারী তখন নবীনচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণের পন্থা অনুসরণ করে আধুনিকভাবে প্রাচীন পুঁথির রস পরিবেশন করছেন। সৃষ্টির কৌশলও বিপিনবিহারীর করায়ত্ত ছিল। কবি ভেবেছিলেন, প্রাচীন পুঁথির শেষ অংশে চন্দ্রধর কর্ত্তৃক মনসা দেবী পূজনে চন্দ্রধরেরও গৌরব বর্দ্ধিত হয় না, মনসারও দেব প্রতিভা খর্ব্ব হয় তদপেক্ষা সহস্রগুণে। তাই তাঁর গ্রন্থে চন্দ্রধর মনসা পূজা করেননি। সলক্ষীন্দর বিপুলা ফিরে গেলেন, সনকা নদীতটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কবির মতে এটাই চন্দ্রধরের প্রকৃত ছবি।

'শিখ' গ্রন্থে গুরুগোবিন্দের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গ্রন্থে হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিরোধে ভারতের অবনতি, এবং সর্ব্বশক্তিধরকে কোটি খণ্ডে বিভক্ত করে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করে কবি অশেষ আক্ষেপ করেছেন। কবি সত্যই বলেছেন—

"সেই ধর্ম্ম হায়,
সাজিয়াছে বহুরূপী দুর্গত ভারতে,
ঘুরিতেছে অর্থলোভে স্বরূপ গোপনে,
ভিন্নরূপে ভিন্নরুচি করিয়া সৃজন
রুচিভেদে মতভেদ, বিবাদ বিদ্বেষে" ॥

সপ্তকাণ্ড রাজস্থানে কবি সপ্তভাগে রাজপুতানার সপ্তরাজ্যের রাজন্যবৃন্দ ও তাৎকালিক ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছন্দোগতিতে রূপায়িত করেছেন এবং প্রারম্ভেই রামচন্দ্রের উপাসনা করেছেন।

টড্‌-মহোদয়ের রাজস্থান অবলম্বনে রচিত এই কাব্য-গ্রন্থ অশেষ কাব্যশক্তির পরিচায়ক। কবির ভাষায় বলি—

"মারবার বিকানীর মিবার অম্বর
কোটা বুন্দি কাশ্মীর রাজ্য মনোহর
আছে যার বক্ষ জুড়ে সেই রাজস্থান,
শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্যের বিরাট শ্মশান।
সেই রাজ্য সপ্তকের পুণ্য ইতিহাস।
সপ্তকাণ্ড রাজস্থান নামেতে প্রকাশ ॥"

এই গ্রন্থে রাজপুতনার শৌর্য্য-বীর্য্য-সমন্বিত অপূর্ব্ব গৌরবেতিহাস বর্ণন ব্যতীত দেওয়ালী বর্ণন (পৃঃ ৪৬), ভারতভূমি বর্ণন (পৃঃ ৬৩) প্রভৃতি প্রসঙ্গে কবির কল্পনা ও ভাব শতধারায় উৎসারিত হয়েছে এবং মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহ করেছে।

কবির "চন্দ" নামক গ্রন্থ রাজস্থানের পূর্ব্বেই বিরচিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিশাল গ্রন্থ বিরচনরত কবির পক্ষে "চন্দ" মুদ্রিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। "চন্দ" গ্রন্থে কবি বৃদ্ধ রাণা লক্ষ মুসলমানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করার পর, রাঠোর কর্ত্তৃক মিবার গ্রাসের চেষ্টা এবং মিবারের আত্মরক্ষার বিষয় বর্ণনা করেছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত এ ঘটনা কবি মধুর ভাব ও ভাষায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। চন্দগ্রন্থে কবি দেখিয়েছেন—চন্দের বীরত্বের ফলে ফুটে উঠেছে মিবারের মুখে হাসিমাখা হাসি, ধরণী হলো আনন্দবিচঞ্চল :—

"আসিল নূতন ঊষা, নূতন প্রভাত ;—
নির্ম্মল আনন্দ হাসে গগনের বুকে,
নির্ম্মল আনন্দভাসে মিবারের মুখে ॥"

রাজপুত নারীদের পূত কাহিনী অবলম্বনে কবি ক্ষুদ্রাকৃতি একটী কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বিপিন বিহারীও আজ বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন প্রায়। একদিন এঁরি বিজয়-ডঙ্কা দিগন্ত মুখরিত করেছিল। স্বল্প ৩০-৩৫ বৎসরেই তাঁর স্মৃতিগাথা বিস্মরণীর অন্তর্ভুক্ত। দোষ কবির নয়, দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশবাসীর। স্বাধীনতালোকে কবির আলোকচিত্র প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠুক, দেশ ধন্য হোক—এই প্রার্থনা ॥

সুর

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ

দোষ যূথীরই। অন্ততঃ শিবেন তাই বলে। অফিস থেকে ফিরে এসে সব ঘটনা শুনে স্ত্রীর সাথে এ নিয়ে মৃদু বচসাও হয়ে গিয়েছে। যূথী প্রথমে কোন কথা বলেনি, কিন্তু অসহ্য হয়ে গেলে আর চুপ করেও থাকতে পারেনি। শিবেনের কথায় সে প্রত্যুত্তর করেছে—"যা' সত্যি বলে জেনেছি, তাই বলেছি—এ নিয়ে এত কাণ্ড হবে—তা কে জানত বাপু?"

সার্টের বোতাম খুলতে খুলতে শিবেন ফিরে দাঁড়ায়—"সত্যি কথা বলা আর—সত্যি কথা বলে মানুষকে আঘাত দেওয়া এক নয়—"

যূথী আর প্রতিবাদ করেনি। শিবেনের জলখাবার গুছিয়ে, চা করবার জন্য নীচে নেমে চলে গেল। অফিস থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে, এমন একটা বিশ্রী আবহাওয়ায় শিবেনের বিরক্তি বোধ হয়।

তুচ্ছ ঘটনা—

যূথী বলেছে—"মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং রুচিবোধ দিন দিন বদলে যাচ্ছে বাবা, আপনি যে গান এবং সুর জানেন, তা আজকালকার দিনে আর চলে না—"

হরনাথ বাবু বলেছেন, ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছেন·

"তা হলে আমার এই জীবনব্যাপী সাধনা সবই মিথ্যা বলতে চাও বৌমা?"

"—তা কেন বলব বাবা!" যূথী বৃদ্ধ শ্বশুরকে যথেষ্ট সম্ভ্রম দিয়ে নম্র সুরেই বলেছে—"সাধনা কখনও মিথ্যা হয় না, তবে সাধনারও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান, কাল আছে—তার বাইরে—সে সাধনা মানুষের কোন কল্যাণে আসে না—"

"তুমি বলছ এ কথা—"হরনাথ বাবুর পাকা আমের মত সুন্দর মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছিল।

যূথী বুঝেছিল এ সময় কথা বলা মানে বৃদ্ধ শ্বশুরকে আরও রাগিয়ে নেওয়া। বিশেষতঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে রাগও যেন বেড়ে চলেছে। তাই ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যূথী বলে—"আপনি চান্ করে নিন্—বেলা হয়ে গেছে—"

হরনাথ বাবু তাঁর নিজের ঘরে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বলেছেন—"তোমরা খেয়ে নাও, আমি খাবনা—"

সেই যে ঘরে খিল এঁটেছেন, এখন বেলা পাঁচটা বাজতে চলল—এখনও খোলেন নি। ইচ্ছে থাক্‌লেও পুত্র-বধূরা কেউ তাকে ডাকেনি, যেহেতু কোন সাড়াই দেবেন না হয় তো তিনি। বড় ছেলে শিবেন অফিস থেকে ফিরে এসেছে, মেজ ছেলে নীরেনেরও আসার সময় হয়ে গেছে। উনুনে আঁচ ধরিয়ে যূথী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। মেজ বৌ প্রসাধন শেষ করে যূথীর সাথে টুকি-টাকি কাজ করে যাচ্ছে। নীরেন এলেই সীতা সিনেমায় যাবে। সাপ্তাহিক পালাক্রমে সীতারই আজ সিনেমা দেখার দিন।

শিবেন হরনাথ বাবুর দোর গোড়ায় গিয়ে বার কয়েক ডেকেছে। কিন্তু একটি মাত্র জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন হরনাথ বাবু—"আমাকে এখন বিরক্ত ক'রনা শিবেন—"

শিবেন বিরক্ত হয়ে আপন মনেই গজ গজ করতে করতে ফিরে এসেছে। নীরেন ডাক্‌বে না। যেহেতু নীরেনের সাথে আলাপই করেন না হরনাথ বাবু।

একমাত্র ছোট ছেলে বীরেনের ডাকেই তিনি দরজা খুলবেন—এ সবাই জানে। কিন্তু সেও আজ ফিরতে দেরী করছে অফিস থেকে। বালীগঞ্জে জলসা আছে তার। বোধ হয় অফিস থেকেই সে জলসায় গাইতে গিয়েছে।

বীরেন এসে সব শুনে বৌদিদের উপরই রাগারাগি করে।

—"তোমরা জানো, মা মারা যাওয়ার পর উনি অল্প কথায়ই আঘাত পান, তোমরাও ইচ্ছে করেই তাঁকে রাগিয়ে নেবে।"

যুথী উমার সাথে বলে—"ইচ্ছে করে কেউ ওঁকে আঘাত দেয়নি ঠাকুর পো, কথা প্রসঙ্গে আধুনিক গানের কথা উঠ্‌তেই উনি রেগে গেলেন।"

বীরেন আর কথা বলে না। জলসায় পর পর কয়েকখানি গান গেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে তর্ক করতে ইচ্ছে হয় না তার। তিন ভাইএর মধ্যে বীরেন এখনও অবিবাহিত।

বীরেনের সাড়া পেয়ে নিজের ঘর থেকে হরনাথ বাবু ডাকেন—"বীরেন, শোন এদিকে—"বীরেন জামা-কাপড় না ছেড়েই বাবার ঘরে চলে যায়।

হরনাথ বাবু বললেন—"ছাখো বীরেন, তোমাদের সংসারে আমার ঠাঁই নেই, একথা বলিনা, কিন্তু আর না থাকাই উচিত। বড় বৌমার দোষ দিই না। সত্যিই যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা চলে না। আমি কাশীর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাই—"

বীরেন ইতস্ততঃ করে বলল—"এই বছরটা থেকে—"

কথা সমাপ্ত করে না বীরেন—যে হেতু কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল।

যুগের আবহাওয়া বদলে গেছে—সত্যই এ আজ আর অস্বীকার করা চলে না সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে। যুথী যে গান এবং যে সুরের স্বপক্ষে তাঁকে অত বড় কথা শুনিয়ে দিল—এই মাত্র বীরেন জলসা থেকে সেই সুরেই গান গেয়ে ফিরল। বীরেনকেই তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। অবশ্য এ ভালবাসার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। কিন্তু তাই বলে বীরেন পিতৃভক্ত ছেলের মত তাঁর গান অথবা সুর ব্যবহার করে না তো!

বংশটার মধ্যে একটা গান বাজনার রেওয়াজ চলে আসছে পুরুষানুক্রমে। বড় দুই ভাই শিবেন এবং নীরেন শুধু গান জানে না—ভালো সঙ্গীত শিল্পী। এ ঘরে যারা বউ হয়ে আসছে তারাও কুশলী গায়িকা।

হরনাথ বাবুর মনে পড়ে তাঁর পিতামহ দীননাথের কথা। বুক পর্য্যন্ত সাদা শোনের মত দাড়ি ছিল বৃদ্ধের। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি পদাবলী গান রচনা করে নিজেই গাইতেন। হরনাথ বাবু নিজে দেখেছেন—রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপ জেলে লাল খেরো খাতায় তিনি পদাবলী রচনা করছেন কুঁজো হয়ে বসে। তখনকার দিনে কলকাতায় তাঁর গানের সমাদর ছিল প্রচুর। বর্দ্ধমানের মহারাজা নিজে এসে তাঁকে রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান পদাবলী শোনবার জন্য। তারপর প্রিয়নাথ বাবু—হরনাথ বাবুর স্বর্গগত পিতা। প্রিয়নাথ বাবু কিন্তু পদাবলী ছেড়ে গাইতে সুরু করলেন দরবারী সঙ্গীত। এ নিয়ে প্রায়ই মতান্তর হ'ত পিতা-পুত্রের সাথে। পিতা দীননাথ চাইতেন পুত্র প্রিয়নাথ পদাবলীই গাইবেন। কিন্তু প্রিয়নাথ কোনদিন পদাবলী পছন্দ করেননি। তিনি ওস্তাদ ধরেছিলেন অন্য সুরের। তারপর পিতা পুত্রের এই কলহে ফল হয়েছিল নাকি বিপরীত। প্রিয়নাথ একদিন রাগ করে কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তাঁর প্রিয় তানপুরাটী কাঁধে ফেলে। পিতার মুখেই শুনেছেন হরনাথ—তিনি নাকি প্রথম যান দিল্লী। সেখানে তখনও বাদশাহী আমলের উচ্চাংগ সংগীতের প্রচলন খুব বেশী। ওস্তাদ হোসেন আলির নাম তখন দিল্লীর পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে ফেরে। প্রিয়নাথ তানপুরা কাঁধে ফেলে ঢুকলেন তাঁর দরবারে। পাকা আমের মত গায়ের রং ওস্তাদ হোসেন আলির। চোখের দৃষ্টিতে যেন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিশাল দেহভার এলিয়ে দিয়েছেন দু'পাশের দুটি তাকিয়ার 'পরে। দুই একজন প্রিয় শিষ্য এবং শিষ্যা ছাড়া আর কেউ নেই।

ওস্তাদ হোসেন আলী শুদ্ধ উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—"কি চাই বাবা?" প্রিয়নাথের তখন বয়স অল্প। ভাবাবেগে তানপুরাটী ওস্তাদ হোসেন আলির পায়ের কাছে রেখে তিনি ব'লেছিলেন—"গুরুজী, আমি আপনার করুণা প্রার্থী—"

পুরো চার বছর ধ'রে দরবারী, কানাড়া, জৌনপুরী প্রভৃতি কঠিন সুর আয়ত্ব ক'রে ওস্তাদ হ'য়েই ফিরলেন প্রিয়নাথ। আসার সময় ওস্তাদ হোসেন আলি সস্নেহে পিঠ চাপড়ে ব'লেছিলেন—"যাও বেটা, গুরুর নাম রেখো—"

প্রিয়নাথ গুরুর অমর্য্যাদা করেন নি কোনদিন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় কোথায়ও একটু ছন্দ পতন হয়নি।

হরনাথের শিক্ষা পিতা প্রিয়নাথের কাছেই। বলতে গেলে ওস্তাদ হোসেন আলির শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন। সেই সুর, সেই গানকেই কিনা যূথী আজ অবলীলাক্রমে ব'লে গেল—"ও সব আজকালকার দিনে চলে না—"

সেই তানপুরা—যে তানপুরায় সময় সময় ওস্তাদ হোসেন আলীও তাঁর চনী বসানো আংটী পরা পরিচ্ছন্ন আঙুলে সঙ্গত ক'রেছেন—হরনাথ জীবনব্যাপী সেই তানপুরায়ই সাধনা ক'রে এসেছেন। যূথী একটী মাত্র কথায় এতদিনকার একটা ঐতিহ্য অস্বীকার ক'রে ফেলল।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে প'ড়েছে হরনাথের জানালার কাছে। সামনের নারকেল গাছের মাথায় স্বর্ণাভ রশ্মিটুকু প'ড়ে ঝলমল ক'রছে। চিন্তা করতে করতে অনেক পিছনে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি। সহসা তাঁর চিন্তা হোচট্ খায় শিবেনের আহ্বানে।

স্বপ্নালু চোখেই তাকালেন তিনি শিবেনের দিকে—"কি বলছ ?"

শিবেন বলে—"বীরেনকে যাঁরা দেখ্তে এসেছিলেন, তাঁরা একটা পাকা কথা চাইছেন।"

হরনাথ তেম্নি নিস্পৃহভাবে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমাকে আর এর মধ্যে টানাটানি করছ কেন শিবেন ? তোমরা যদি ভাল বোঝ, এবং বীরেনের যদি মত থাকে, তবে আমার আর মতামতের দরকার কী ?"

"—এ আপনি রাগ ক'রে বল্‌ছেন বাবা"—শিবেনের স্বর ছেলে মানুষের মত শোনায়।

"—না—না রাগ নয়—রাগ করব কেন ? বড় বৌমা ঠিকই ব'লেছেন। শুধু গানে নয়, সকল দিক দিয়েই আমাদের আর স্থান নেই কোথাও। আমার অবর্ত্তমানেও তো তোমরাই পছন্দ ক'রে বীরেনের বিয়ে দিতে—এখনও না হয় তাই দাও। আমি আছি তাই জিজ্ঞাসা করছ—কিন্তু এতদিন তো আমার থাকবার কথা নয় !"

সত্যই অনেক বেঁচেছেন হরনাথ বাবু। এ সংসারের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে চলে এখন একটি মাত্র সরল পথের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। পথও সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদটুকু স'রে গেছে জানালার কাছ থেকে।

বীরেনের বিয়ের পরও হরনাথ বাবু কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কাশী যাওয়ার জন্য, বীরেনও এ বিষয়ে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছে, কিন্তু কেউ ভাল ভাবে কারও মত ব্যক্ত করে নি। একটা ক্ষোভ নিয়ে সংসার ত্যাগ করতে চাইছেন হরনাথ বাবু সম্ভবতঃ এ কারও পছন্দ হয়নি।

যূথীর সাথে আলাপ বন্ধ সেই থেকে। বীরেনের বউ বন্দনাই দেখাশোনা করে বৃদ্ধ শ্বশুরের। হরনাথ বাবু ডাকেন 'বন্দীমা'। একদিন সহাস্যে বললেন তিনি—"আমি তো কাশীই চলে যাচ্ছিলাম মা, তুমি এসে আবার আমায় বন্দী করেছ—"

বন্দনা শ্বশুরের কেশবিরল মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—"এত শীগগীর কাশী যাবেন কেন বাবা ? আগে আপনার সুরগুলো আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যান।"

ভাবাতিশয্যে বৃদ্ধ সোজা হয়ে উঠে বসে—"তুমি কি আমার গান পছন্দ করবে ?"

"কেন করব না বাবা—গানের কতটুকুই বা শিখেছি, কিছুই জানা হোল না—তবু আমি একটি গাইছি আপনি শুনুন—"

হরনাথের তানপুরায় বন্দনা ঝংকার তুলে গাইলো একটা জৌনপুরী। হরনাথ চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শুনলেন—মাথা নেড়ে তাল ঠুকলেন।

গান শেষ করে বন্দনা বললে—"কেমন শুনলেন—"

"বেশ—বেশ—আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভাল হবে মা।" সহসা কি চিন্তা করে হরনাথবাবুর সমস্ত উৎসাহ যেন এক দম্‌কা হাওয়ায় নিভে যায়। বন্দনার দিকে বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—"তুমি আর এসব গান গাইবে না, মা—"

"কেন ?" বন্দনা আশ্চর্য্য হয়ে বলে।

"ভয় হয় এ গানের সমজদার হয়তো তুমি পাবে না—গানের সুরে তুমি যা' বলতে চাইবে হয়তো তা কেউ শুনবে না। পুরনো দিনের এই সব গানের ওস্তাদদের অবমাননাই হবে তাতে—"

সে বছরও কাশী যাওয়া হ'ল না। বীরেনের মেয়ে হয়েছে একটি। ছেলেরা এবং পুত্রবধূরা ধরে বসল, মেয়ের নামকরণ এবং অন্নপ্রাশন না হলে কাশী যাওয়া হ'তে পারে না। হরনাথবাবুও ইতস্ততঃ করে থেকে গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ একদিনেই হবে।

আগের দিন রাত্রে বীরেন হরনাথবাবুর ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে অতি পরিচিত তানপুরাটী নেই। ওস্তাদ হোসেন আলীর আঙুলে ঝংকৃত প্রিয়নাথের সাধনা যে তানপুরার তারে, সেই তানপুরা বাদ দিয়ে হরনাথবাবুর এ ঘরখানাকে কল্পনাই করা যায় না।

পরিবর্ত্তে নতুন ঝক্‌ঝকে একটি সেতার হরনাথবাবুর টেবিলে।

বীরেন বলল—"একি, আপনার তানপুরা কি হ'ল বাবা?"

মৃদু হাসলেন হরনাথবাবু।—"তানপুরাটী বিক্রী করে ঐ সেতারটী কিনে আনলুম—"

"কি হবে সেতার দিয়ে?"

"তোমার মেয়ের অন্নপ্রাশনে ঐটী উপহার দিয়ে যাব ভাবছি—বিয়ে পর্য্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা জানি না, তাই আগেই সে কাজ সেরে যাচ্ছি।—আর হ্যাঁ—ত্মাখো, তোমরা যাই নাম রাখো না কেন—আমি ওর নাম রেখে যাচ্ছি—স্বপ্না—"

কাশী চললেন হরনাথবাবু। সাথে গেল চাকর রতন এবং প্রতিবেশী বৃদ্ধা হারুর মা। বীরেন হাওড়ায় গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল। যাওয়ার সময় গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বীরেনকে বললেন—"আমি যে সেতার দিয়ে গেলাম স্বপ্নাকে—ও যতদিন বড় না হয় ততদিন যেন কেউ না বাজায়। বড় হলে ওকে বলো আমি দিয়ে গেছি।—আরও একটি কথা বলে যাই। স্বপ্নার সময়ে বোধ হয় আজকের দিনের অর্থাৎ তোমার—বড় বৌমার সুর ও গান অচল হয়ে যাবে। আগামী দিনে যে সব নতুন নতুন সুর সৃষ্টি হবে, তাই ওকে শিখিও।"

গাড়ী ছেড়ে দিল। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌তে পারলেন হরনাথ বাবু। তাঁর তানপুরার একটা সদুপায় করে যেতে পারলেন, এই আনন্দটাই সবচেয়ে বেশী করে অনুভব করলেন তিনি। স্বপ্না। বেশ নাম হয়েছে। অনাগত দিনের ভাবধারা স্বপ্নের মত বাসা বেঁধে আছে স্বপ্নার মধ্যে। একদিন তার বিকাশ হবে। আজকের দিন সে দিনের কাছে হয়ে যাবে পুরনো। যুগে যুগে তাই হয়ে আস্‌ছে। সহসা একটি অদ্ভুত বিশ্বাস তাঁকে পেয়ে বসে। ঐ স্বপ্না একদিন বড় হবে। ক'লকাতার রাস্তা দিয়ে বেণী দুলিয়ে ফিরবে কোন নব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিক্ষালয় থেকে। তারপর কোন অবসর মধ্যাহ্নে সোফার 'পরে বিলোল ভঙ্গীতে দেহ এলিয়ে তাঁরই দেওয়া সেতারে একটি নতুন সুর তুলবে। তারপর যৌবনপুষ্ট আঙুলের ঝংকারে সেতারের তারগুলো কথা কয়ে উঠ্‌বে। পাশে বসে থাক্‌বে যুথী। সেতারের ঝংকার নয়—যেন স্বপ্নাই বলবে যুথীর দিকে তাকিয়ে—"আপনি যে সুর জানেন জ্যাঠাইমা, তা আজকালকার দিনে আর চলে না—"

এডিনবরায় আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(গত ভাদ্র সংখ্যার পর)
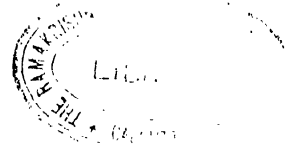
জাতিসঙ্ঘ বা United Nations কিছুদিন থেকে তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের কাজ সুরু করেছেন! গত বৎসর প্যারিতে এঁদের একটি বিশেষ সম্মেলন বসেছিল। সেখানে 'লেখক এবং স্বাধীনতার আদর্শ' (The writer and the Idea of Freedom) এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু আলোচনা কোনো সুনির্দ্দিষ্ট উপসংহারে গিয়ে পৌছতে পারেনি। তাই এই আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে এঁরা পেন ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হয়ে এসম্বন্ধে দু'দিন ধরে আরও আলোচনা করেন। আলোচনার ফলে দেখা যায় স্বাধীনতার যে আদর্শ লেখকদের কল্পনায় আছে, তা য়ুনেস্কোর সদস্যদের ধারনার সঙ্গে মেলে না। স্বাধীনতা বলতে যে ঠিক অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা বোঝায় না, এটা অবশ্য উভয় পক্ষই স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার রূপ এঁদের পরস্পরের বিবেচনায় বিভিন্ন। এ সম্বন্ধে লেখকদের অধিকাংশেরই মত একটু সাম্যবাদী গণতন্ত্র ঘেঁষা, কিন্তু য়ুনেস্কোর সদস্যরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে কিছুটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান। উভয় পক্ষের মতভেদ এইখানে। ভারতবর্ষের মাননীয় অতিথি সার সি, পি, রামস্বামী আইয়ার এবিষয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সভায় যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা কংগ্রেসে উপস্থিত প্রায় সকল সদস্যেরই সমর্থন লাভ ক'রেছিল। পরের দিন সংবাদ-পত্রগুলিতেও পেন কংগ্রেসের বিবরণীতে দেখা গেল তাঁরা লিখেছেন—Sir C. P. Ramswami Iyor from India carried the house.

পরের দিন ১৯শে তারিখে শনিবার যথাসময়ে গেম্মার সাহেব গাড়ী এনে হাজির। যে ক'দিন এডিনবরায় ছিলুম, গেম্মার সাহেবের গাড়ীতেই সর্ব্বত্র আনাগোনা ক'রেছি। আজকের 'পেন কংগ্রেসে' বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আজকের নাটক' '(The Drama—to-day'), সভায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পড়া হ'লে কোনো বিষয়টা নিয়েই ভাল ক'রে আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যায় না ব'লে 'পেন কংগ্রেস' এক এক বৎসর এক একটি বিষয় আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেন। সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন প্রধান বক্তা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসে বিশদভাবে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা সে বিষয়ে অনুরাগী, তাঁরা সেই প্রবন্ধ নিয়ে বা সেই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা করেন। এবার বক্তা নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন আমেরিকার খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত রবার্ট শের উড! তিনি কিন্তু আজকের নাটক সম্বন্ধে কিছু না ব'লে 'নাটকের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়লেন (The future of the Drama if any). বক্তা আমেরিকান, সুতরাং তাঁকে যা খুসী বলবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল। অন্য কোনও দেশের বক্তা হ'লে সম্ভবতঃ তাঁকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রবন্ধটি ফেরত দেওয়া হ'ত।

প্রথমেই আন্তর্জ্জাতির পেন ক্লাবের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্রোচের বাণী পড়া হ'ল। তিনি আসতে পারেন নি। তাঁর বাণী মাত্র কয়েক ছত্র, কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ। ক্রোচে তাঁর বাণীতে বলেছেন যে, মধ্য-যুগীয় বাস্তব বা স্বাভাবিক অভিনয়কে নাট্য শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত করার মূলে রয়েছে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব। 'এই ইতা রেনেসাঁস'ই তিনি বলেন—'basing itself upon Greco-Roman achievements, bequeathed the language of Drama, roles as interpreted by the 'Comedia dell' Arte sets and machinery, in a word, 'Theatrical Art' to the world.…

Croce adds that the Renaissance has not solved the Crucial problem which faces all dramatic critics, because, in his opinion, it is bound to remain insoluble - since every drama is both the poetic expression of the Author's sentiments and fantasy, and a theatrical production designed to attract popular applause and become a Box Office success, on short, the unsolved problem can be posed in the following question. Is it possible to write a Drama in which poetry and 'Theatre' are mingled in such a way, that neither the one nor the other is adversely affected.

বক্তা এবারের নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু 'বর্ত্তমান নাটক' ছেড়ে একেবারে ভবিষ্যতে চ'লে গেছেন দেখে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ অনেকেই বিস্মিত হলেন খুব। শ্রোতাদের মধ্যে কানাঘুষোও চললো একটু। কিন্তু ধীরভাবে সবাই শুনতে লাগলেন। বক্তা একেই নিজে একজন নাট্যকার, তার উপর তিনি আমেরিকান; কাজেই তিনি ভাবীকালের নাটকের বিষয়বস্তু কত বিচিত্র হ'তে পারে, বল্‌তে গিয়ে গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ধ্বংস কামনায় হিরোশিমা ও নাগাসাকী নগরে মার্কিন বিমান বহর যে 'এটম্ বম' নিক্ষেপ ক'রেছিল, সেই কাজটার সমর্থনে যুক্তি দেখাতে সুরু করেন। আর যায় কোথা! শ্রোতাদের আপত্তিজনক গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই তা উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদে পরিণত হল। চারিদিক থেকে শোনা যেতে লাগলো—'Shame! Shame!' 'Sit down!' 'Get away with your Atoms!' 'You are hear to speak on Drama and not politics.'

কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বড় বিপন্ন বোধ করলেন। বক্তা শ্রীযুক্ত শেরউড সাহেবও অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তখন সেদিনের সভাপতি উঠে শ্রোতাদের এই বলে চুপ করালেন যে, 'আপনাদের সকলকেই এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আপনাদের নিজ নিজ মত ব্যক্ত করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। অতএব বর্ত্তমানে বাধা না দিয়ে মন দিয়ে ওঁর বক্তব্য শুনে জবাবের পয়েন্ট-গুলি নোট করে রাখুন।'

এতে কাজ হল। সবাই চুপ করলেন। শেরউড সাহেব এক গ্লাস জল খেয়ে কোনও রকমে তাঁর প্রবন্ধটা শেষ করে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন। তাঁর প্রবন্ধ দীর্ঘ ও নীরস হওয়াতেও শ্রোতারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন। শেরউড সাহেব রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করাতে আলোচনা মুলতুবি রইলো বিকেলের অধিবেশনে হবে বলে। কারণ তখন বেলা হয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সভা বন্ধ থাকবে। অধিবেশন প্রত্যহ দু'বার বসবে স্থির হয়েছিল। সকালে প্রাতরাশের পর বেলা সাড়ে ন'টা দশটা থেকে সাড়ে বারোটা একটা পর্য্যন্ত। তারপর বেলা দুটো আড়াইটে থেকে চারটে সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত।

যথা সময়ে বিকেলের অধিবেশন শুরু হল। প্রতিবাদ-কারীরা একে একে বক্তার আসনে উঠে এসে শুধু এ্যাটম বম ব্যবহারের বিরুদ্ধে নয়, রবার্ট শেরউড কল্পিত নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। আমিও এইদিনের বৈকালীন অধিবেশনে 'Drma and its Future if any' শেরউড সাহেবের এই বিষয়ের উপর কিছু বলে'ছিলুম আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। ওখানকার এবং P. E. N. পত্রিকায় এর বিবরণ বেরিয়েছিল। আপনাদের জ্ঞাতার্থ আমার সেই বক্তৃতার একটু সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

That "this world is a stage" is a truth which was revealed to India long before Shakespeare realized it. In ancient Indian Philosophy and also in old Indian Folk songs, this wonderful idea has repeatedly been expressed, that this world which appears to be so real is in fact not a real thing at all. It is but an Illusion or "Maya". The sorrows and pleasures which we feel in our every day life are also not true. These are just like the same short and realistic experiences as we feel in our dreams, or, when we are in a Threatre. The success of a drama, which is but only a faithful representation of the many brief chronicles of man's own wordly events, depends therefore, not only on the extraordinary merits of the Dramatist alone, but also on its highclass production, its superb acting, and on the appreciative qualities of the audience. These are the salient reasons why in every country, in the domain of literature

Dramas are still in the minority list The playwright has no freedom or licence to say direct to the audience what he thinks and what he would like to say, as a storyteller or a Novelist can easily do. A Dramatists' scope is very limited, since, it must be confined within the appropriate and proportioned dialogues of the characters he has introduced in his Drama, And, as such, Drama is entirely a dependent subject and its future depends entirely on the advent of more powerful Dramatists with broad visions on the outer world more talented and efficient histrionic Artists on the stage, as well as more capable and imaginative producers, and last but not the least, on the more improved dramatic sense and better taste of the audience.

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ সভা শেষ করে দেওয়া হল, কারণ সেদিন এডিনবরা আর্ট কলেজে একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন ছিল। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এডিনবরার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র The Scotsman. 'এডিনবরা ন্যাশনাল বুক লীগ' নামে গ্রন্থ প্রতিষ্ঠান এবং স্কটিশ পি-ই-এন ক্লাব। বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশিত নানা বিষয়ের ১০০১ খানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাছাই করে এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীটি দেখে আমরা সবাই বিশেষ প্রীত হয়েছিলুম। স্কচ ম্যানরা যে কেবল পাউণ্ড শিলিং পেন্সই নয়, তাদের মধ্যেও যে রুচি ও রসবোধ আছে, একথা স্বীকার না করে উপায় ছিল না।

রাত্রে আমাদের এসেমব্লি হলে লর্ড প্রোভেষ্টের Banquet-এ নিমন্ত্রণ ছিল। সে এক বাদশাহী ব্যাপার! পাঁচ-ছ'শো সুসজ্জিত নরনারী সেই বিশাল হলে একসঙ্গে খেতে বসেছে। শুধু, পি-ই-এন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাই নন, তার সঙ্গে এডিনবরা শহরের কর্পোরেশানের কাউন্সিলাররা, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটরা এবং লর্ড মেয়র দি রাইট অনারেবল সার এ্যাণ্ড্রু মারে, ও বিই এল, এল, ডি, স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে আমেরিকান এ্যাম্বাসেডার দি অনারেবল মিঃ লুইস ডগলাস এসেছিলেন। রকমারী উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় ও তার সঙ্গে বহুমূল্য দুর্লভ সুরা যে যত পারেন গ্রহণ করুন। পানাহার ও ভোজনোত্তর বক্তৃতার পর বাড়ী ফিরতে রাত্রি ১১টা হয়ে গেল।

পরের দিন ২০শে আগষ্ট রবিবার কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ। প্রার্থনা ও বিশ্রাম দিবস। যেন কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষরা আজ তাই প্রতিনিধিদের জন্য ছুটি উপভোগের উপযোগী কার্য্যসূচীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সকালে যে যার ধর্ম্ম মন্দিরে উপাসনা সেরে বেলা দশটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত এডিনবরার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ দর্শন, তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বিরাম। অপরাহ্ন ছ'টায় স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত অভিমুখে অভিযান এবং সেখান থেকে এ্যাবটস্ ফোর্ডে সার ওয়াল্টার স্কটের আবাস গৃহ দর্শনে যাত্রা। আর ওয়াল্টার স্কটের পৌত্র অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সার ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল স্কট, সি, বি, ডি, এস, ও, ডি, এস্, সি, আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর মহান পিতামহের তীর্থতুল্য আলয়ে।

এডিনবরা থেকে ৮খানি সুন্দর মোটর বাসে সকলকে তুলে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এই ৭০|৮০ মাইল ধরে আমাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন পেন কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষরা। ফেরার পথে স্থানীয় একটি বিশিষ্ট হোটেলে আমাদের চা ও মিষ্টান্ন দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন অমর কবি সার ওয়ালটারের সমর ব্যবসায়ী পৌত্র। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে, আমার পূর্ব্ব পুরুষ তাঁর লাইব্রেরী ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে মসি চালনা করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জনের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিলেন, আর আমি তাঁর অযোগ্য বংশধর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আজীবন অসি চালনা করে এসেছি, আমার কিন্তু খ্যাতি ও অমরত্ব লাভের কোনও আশা নেই। That 'Pen is mightier than Sword' একথা আর কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, আমি করতে বাধ্য।

সন্ধ্যায় আমরা ফিরে এলুম। এই দিন আমাদের জন্য আরও একাধিক লোভনীয় অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম সেণ্টবাইলস ক্যাথিড্রালে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত ও নাট্যোৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়

আমেরিকান এ্যাম্বাসেডারকে meet করবার জন্ম 'পার্লিয়ামেণ্ট হলে' ইংরাজী ভাষাভাষীদের সমিতির আমন্ত্রণ। তৃতীয়,—'আমারহলে' স্কটল্যাণ্ডের সাম্বৎসরিক জাতীয় উৎসবের উদ্বোধনে ঐকতান বাদন ও পরে ফরাসী সুর সঙ্গীতের ভোজ। চতুর্থ,—রয়াল স্কটিশ এ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল আমাদের নৈশ পান-ভোজনে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। আমরা শহরে ফিরে এসে সেদিন এইখানেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খুব আনন্দে কাটিয়ে এসেছিলুম। এ্যাকাডেমির প্রশস্ত মর্ম্মর সোপান অতিক্রম করে উপরে যাবার সময় সেখানে একজন ঘোষক (Announcer) দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আমাদের ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নিচ্ছিলেন, যাদের নেই তাঁদের ইন্‌ভিটেশান কার্ড অন্যথায় নামধাম জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করছিলেন—মিঃ এণ্ড মিসেস নরেন্দ্র দেব from ক্যালকাটা ইণ্ডিয়া। রয়াল স্কটিশ এ্যাকডেমির প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণ এ্যাকাডেমির গাউন ও রোব প'রে সেখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোষকের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রছিলেন। বেশ লেগেছিল এদের এই পরিচয় প্রথা। পরদিন সোমবার ২১শে আগষ্ট পেন কংগ্রেসের চতুর্থ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ ও পরাহ্ণ অধিবেশনে নানা দেশের প্রতিনিধিরা নাটক ও নাট্যকলার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এইদিন বিকেলে পাকিস্তানের পি-ই-এন সদস্য জনাব জসিমুদ্দিন সাহেব পাকিস্তানের লোকনাট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার একটা বিশেষ অংশ ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের প্রাতিনিধিদেরই ভাল লাগে নি। তিনি যখন অসঙ্কোচে বললেন যে, আমাদের পল্লী-কবিরা গ্রামের মধ্যে কোথাও নারী-ধর্ষণ ঘটলে বা দলগত বিবাদের ফলে খুন জখম হ'লে সেই ঘটনা অবলম্বনে সঙ্গে সঙ্গে লোক-নাট্য রচনা করতেন এবং গ্রামে গ্রামে তার অভিনয় হ'ত, তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইনি, দুঃখিত ও লজ্জিতও হ'য়েছিলেম খুব। তিনি ভারতের পি-ই-এন ক্লাব ভারতবর্ষ বিভাগ হবার আগে কি অবস্থায় ছিল এবং ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত এই দুই ভাগে বিভক্ত হবার পর কি অবস্থায় পৌছেছে, এ নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁর মোদ্দা কথা এই ছিল যে, ভারত বিভাগের আগে মুসলমানদের সহযোগিতার জন্যই ভারতীয় পি-ই-এনের এতটা উন্নতি হয়েছিল। পাকিস্তান নবজাত প্রদেশ, সুতরাং এখানে পি-ই-এনের নূতন ক'রে পত্তন ক'রতে হয়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই আমরা ভারতীয় পি-ই-এন-কে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবো।

[আগামী বারে সমাপ্য]

*

আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারো থাকে তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের না, নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা ক'রতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ।

—শরৎচন্দ্র

অভিযান

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

সংবাদটা শুনে অবধি একজন ছাড়া একে একে সবাই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো।

সান্ধ্য-আসরটা বেশ জমে উঠেছিলো। পুরাণো একতলা দালানের একখানা এঁদো ঘর। দপ্‌দপ্‌ করে গোটা তিনেক হেরিকেনের আলো জ্বলছে। এক পাশে দাবা, এক পাশে তাস, এক পাশে ক্যারম চলছে। দূরে এক কোণে উবু হয়ে বসে একজন তবলায় হাত সাধছে। তার পাশে খালি গলায় একজন ভঙ্গীসহকারে সাধনা করছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

কিন্তু সংবাদ শুনে সবাই কেমন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। সবারই হৃদয়ের সমবেদনার তারে বেজে উঠতে থাকে ঐক্যতানিক ঝঙ্কার। এত বড়ো অন্যায় এ যুগে হতে দেওয়া চলে না। প্রতিকার চাই, নিশ্চিত প্রতিকার।

সংবাদবহ আগন্তুক ক্লাবঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। নভোচুম্বী শীর্ণদেহ সাইকেলের ’পর ঈষৎ হেলানো। হ্যাণ্ডেলের গায়ে একটা ময়লা কাঁচ পরাণো হেরিকেনে কুত কুত করে আলো জ্বলছে।

অস্বস্তিভরা কণ্ঠস্বরে সম্ভাব্য ঘটনাটা বিবৃত করে আগন্তুক গৃহস্থ তরুণদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে -- কী, আপনারা যাবেন কি না বলুন? দেরী করলে সর্ব্বনাশ। রাত্রি সাড়ে নটায় লগ্ন। না যান তো বলুন, আমি একাই এর প্রতিবিধান করবো।

তার উত্তেজনাময় দেহের কাঁপনিতে সাইকেলের পুরাণো বেল প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে বলে—এ কি মগের মুল্লুক না কি? একটা ষোলো সতের বছরের সুন্দরী মেয়ে। বাবা নেই বলে তার মামা পয়সার লোভে একটা পঞ্চাশ বছুরে বুড়োর সঙ্গে ঘুরিয়ে দিতে চায়। দিস্ ইজ্ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী; আমরা মরিনি এখনও। আগে ঐ মেয়ের মামাকে দেখে নেবো। এর চেয়ে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলা অনেক ভালো।

ক্লাবঘরের অবিবাহিত তরুণমহলে বেশ একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। সবাই উঠে দাঁড়ালো একে একে।

দাবার আসরের মাণিক বোস অ-স্থাখা আততায়ীর উদ্দেশ্যে ঘুষি পাকিয়ে জোর পরখ করবার জন্যে মারলো ঘরের দেয়ালে এক ঘা।

নকু কর বেচারী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনা করছিলো। সে ঐ দেখে হো হো করে হেসে উঠলো।

মাণিক বোস তার হাত ধরে টেনে এনে বললো—স্থাখ্ অনেকদিন বক্সিং অভ্যাস নেই। আজ হয়ে যাক এক হাত। তুই লম্বা আছিস, মেয়ের মামাকে পাছড়ে ধরবি। আমি, বেশী না, দুটো ঘা বসিয়ে দেবো থুথ্নীতে। - তার বজ্রমুষ্টি এগিয়ে গেলো নকু করের নাকের দিকে।

তাসের আসরের অনিল বাড়ুয্যে রুখে এগিয়ে এলো বলতে বলতে—আর সে বুড়ো বর ব্যাটারও একটা গতি করতে হবে তো? নিশ্চয়ই ও ব্যাটা মেয়ের মামাকে টাকা দিয়ে হাত করেছে।

বিনয় সরকার বলে উঠলো—আরে, বরকে ও সব না। জল-চুতরা দিয়ে পা থেকে মাজা পর্য্যন্ত কসে দিতে হবে। তা হলে ভিতরের জ্বালা একটু কমবে।

তারা ভঞ্জ আগের বক্তার খেই ধরে বললো—আরে শুনেছিস বর নাকি এক ইস্কুলের য়্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার। তার আগের পক্ষের মেয়েরও নাকি বিয়ে হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, এবার মা-মেয়েতে কম্পিটিশন চলবে আর কী! নীরদ ঘোষ চশমার উপর দিয়ে তারা ভঞ্জের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে হেসে উঠলো।

ঠিক হয়ে গেলো অন্যায়ের প্রতিবিধান করতেই হবে। প্রস্তুত হয়ে সবাই ঘর থেকে বেরুবার উদ্যোগ করলো। একটা লোক তখন কোনো দিকে কর্ণপাত না করে অসহায়ের মতো দাবার ঘুঁটিগুলি গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

সে আধপোড়া বিড়িতে টান মেরে মুখ ফিরিয়ে বললো—তোরা কি সত্যিই যাবি তবে?

—যা—বো? আপনার গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই বাচ্চুদা?

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বাচ্চু দত্ত বললো—যাবি যা, বিয়ের আগে এ সব ব্যাপারে একটু উৎসাহ বেশীই থাকে। তবে আমি ভাবছি—গিয়ে কী করবি! আচ্ছা আমি থাকছি, ঘুরে আয় তোরা, তারপর আর এক দান হবে।

দশ বারোজন উৎসাহী যুবকের মিছিল গিয়ে থামলো বিয়ে বাড়ীর অঙ্গনে। বড়ো একখানা আটচালা ঘরের মাঝে বরযাত্রীর আসর। গ্যাস লাইটের আলোয় ঘরের ভিতর আলোকিত। দরজার সামনে দাঁড়ালেই স্থাখ্যা যায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বর বসে আছেন। মাঝে মাঝে সজোর হুলুধ্বনি ভেসে আসছে মেয়েদের মহল থেকে।

মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সেই সংবাদবহ দূত, কানাই চাটুয্যে।

কেউ বলে—আগে আমরা বরকে দেখবো। কেউ বলে—না, আগে মেয়ে দেখবো; আমরা তার কাছে জান্‌বো, তার এ বিয়েতে মত আছে কি না।

—আরে কানাই যে। কী খবর, বোসো, বোসো। এঁরা কারা? অবিন্যস্তবেশী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে এঘর থেকে ও-ঘরে যাবার পথে কানাইকে দেখে প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে, এরা আমার বন্ধু। এই টাউনেরই ছেলে। এঁরা এসেছেন বিয়ে দেখতে।

—তা বেশ তো। আমার দায়তো তোমাদেরই দায়। তোমরা তো পর নও। মনে কয়ো তোমারই বোনের বিয়ে। একটা সতরঞ্চি-টঞ্চি চেয়ে নিয়ে বসতে দাও এঁদের।

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

দলের মাঝ থেকে বক্তার মাণিক বোস জিজ্ঞাসা করলো—আরে, ও লোকটা কে রে কানাই?

—মেয়ের মামা।

—আগে বলিসনি কেন? হাতের কাছ থেকে শিকার ফসকে গেলো।

কানাই ইসারায় হাত উঁচু করে নিষেধ জানিয়ে বললো—আগে থেকে হট্টগোল করলে সব মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু উৎসাহীরা উত্তেজিত। কারো তর সয়না। যা হয় একটা কিছু শীগ্‌গীর সেরে ফেলাই ভালো।

যে ঘরের ছাঁচতলার কাছে তারা দাঁড়িয়েছিলো সেখানা একখানা ছোটো খরের চালা দেওয়া ঘর। সেই ঘরের মাঝেই একজন মেয়ের নেতৃত্বে চলছিল কনে-সজ্জা।

সহসা একজনের নজর পড়লো ঘরের মাঝে। দরজার সামনে মুখ করে হেরিকেনের আলোর কাছে বসে আছে ক'নে। কতো শোভন অশোভন হাসি তামাসা চলছে তাকে উদ্দেশ্য করে। সে নীরব, নিস্পন্দ। খোলা দরজার পানে সে চেয়ে আছে। হৃদয়ের শূন্যতা যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে দুটি কালো চোখের আলো বেয়ে।

—কানাই, ঐ বোধহয় মেয়ে, না?

—হ্যাঁ, চুপ।

ষোলো সতের বছরের তরুণী। ছিপছিপে গোলগাল গড়ন। প্রচুর হিমানী পাউডারের প্রলেপ সত্ত্বেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যটুকু চাপা পড়েনি। চন্দন-চর্চ্চিত মুখখানি দেখে মনে হয় যেন নির্ম্মল আকাশ শত শত তারার ইঙ্গিতে প্রকাশ করছে তার হৃদয়ের অজ্ঞাত রহস্য সম্ভার।

মেয়েরা কনেকে নিয়ে ওপাশে চলে গেলো। উঠে দাঁড়াতেই বাইরের অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে একবার চোখোচোখি হোলো তার। হেরিকেনের স্তিমিত আলোয় স্থাখা গেলো মেয়েটির চোখ দুটি জল-ছলছল।

বাইরে একটু দূরে তখন সানাই বাজছে। তার করুণ সুর-মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হচ্ছে চিরন্তন তরুণী হৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী কোনো গূঢ় মর্ম্মবেদনার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস।

দলের লোকের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে মেয়ের এ বিয়েতে মত নেই। সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো অবস্থার ত্বরিত প্রতিবিধানের জন্যে। প্রত্যেকেই এক একটি সুনিশ্চিত উপায় উদ্ভাবন করে প্রকাশ করতে লাগলো দলপতির অনুমোদনের জন্যে। উদ্দীপনাময় কথার স্বরে বেশ একটা ছোটখাটো সোর-গোল সৃষ্টি হয়ে উঠলো।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হোলো মেয়ের মামাকে ডেকে এনে সব বলে এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপোষে না হলে বলপ্রয়োগ।

কে ডাকতে যাবে? কানাই ছাড়া আর কারো মেয়ের মামার সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু অত্যুৎসাহী কানাই রাজী হয় না। কী বলে ডাকবে ভেবে পায়না।

মেয়ের মামা এমনি সময়ে আবার ব্যস্ত হয়ে ঐ পথেই যাচ্ছিলেন। বক্সার মাণিক বোসই এগিয়ে গিয়ে ডাকলো তাঁকে।

—শুনুন, একটা কথা আছে।

মেয়ের মামা এগিয়ে এসে কানাইকে এবং তার বন্ধুদের সেইভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিনয়ে বললেন—আরে, কানাই, তুমি এখনো এঁদের বসতে দাওনি? তুমি তো নিজের লোক বাপু।

– আমরা বসতে আসিনি; আপনার ব্যস্ত হতে হবে না। সেই কম্বুকণ্ঠস্বর।

—আজ্ঞে বলুন তবে কী করবো?

—এ বিয়ে হবে না।

মেয়ের মামা আকাশ থেকে পড়লেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন—আপনারা বলেন কী? আর এক ঘন্টা পরেই যে লগ্ন!

—আজই বিয়ের সব লগ্ন ফুরিয়ে যাবে না। আবার আসবে। আরেকজন বলে উঠলো।

—কানাই ছিলো পুরোভাগে। এবার চক্ষুলজ্জা বাঁচাতে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে দলের পিছনে আসতে লাগলো।

—কিন্তু কেন বলুন তো? মেয়ের মামার কণ্ঠে একটা ব্যস্ত জিজ্ঞাসা।

—একটা পাকা-চুলে বুড়োর সঙ্গে আপনি আপনার ষোড়শী ভাইঝির বিয়ে দিতে চলেছেন; কতো টাকা খেয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছেন? পয়সা আয়ের আর পথ খুঁজে পেলেন না?

ভদ্রলোক বজ্রাহত। কী বলে এরা? বাপহারা নিঃসহায়া মা-সম্বলা মেয়ে। আজ পাঁচ ছ' বছর ধরে তাঁর সংসারে প্রতিপালিত হচ্ছে। গরীবের সংসার, সামান্য কেরাণীগিরির আয় আর কিছু জোত জমি ভরসা। তাই দিয়েই তিনি বোন, বোনঝিদের, নিজের ছেলেমেয়েদের লালন পালন করছেন। নিজের মেয়েও বয়স্থা হয়ে উঠেছে। তা' সত্ত্বেও তিনি অস্বচ্ছল সংসারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে কিছু ঋণ করে ভাগনীর বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। পাত্রও খারাপ না। শিক্ষিত, ইস্কুল মাষ্টার। স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘর, একমাত্র বয়স একটু বেশী, দোজবর। তাতে কী, সধবা থাকা না থাকা তার কপাল। অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই কি আর মেয়ে বিধবা হয় না? তা' ছাড়া, ভগবান না করুন, এমন অমন হলেও অন্নবস্ত্রের জন্যে তাকে পথে বসতে হবে না। এ বিয়ে ভেঙে গেলে হয়তো তাঁর মতো সঙ্গতিহীন লোকের পক্ষে আর কোনো সম্বন্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি ভেবে পান না এ গুজব রটালে কে? কানাই? তাঁর পাশের বাড়ীর ছেলে কানাই। অবাধে সে এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতো, নিজের বাড়ীর ছেলের মতো অবাধে সে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতো—তারই এ কাজ?

কী জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়লেন। সাত পাঁচ ভেবে বললেন—কিন্তু যা শুনেছেন, ভুল। এ বিয়ে না হলে মেয়েটির সর্ব্বনাশ হবে।

—আচ্ছা সে দ্যাখা যাবে। দেশে ছেলের আকাল হয়নি। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো মাণিক বোস্।

দলের মাঝ থেকে একজন প্রস্তাব দিয়ে উঠলো—যাঃ যাঃ, ও ভদ্রলোককে ছেড়ে দে। ওঁর আর দোষ কী! আমরা বরকে চাই।

—তা মন্দ না। কতো টাকার জোর হয়েছে তার একবার শুনি? টাকার জোরে এ যুগে সব রকম অন্যায় করা যায় না।

মেয়ের মামা আত্মসম্মানের ভয়ে হাত জোর করে বললেন—দেখুন, আপনারা বরপক্ষের সঙ্গে কোনো অভদ্রতা করবেন না। দোহাই আপনাদের। দু' কথা মন্দ বলতে হয় আমাকে বলুন। অন্যায় যদি হয়ে থাকে তো সে আমার। কিন্তু কী করবো, আমার এর বেশী সাধ্য ছিলো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যান। আমরা অভদ্রতা করছিনে। আমরা বরকে সসম্মানে ফিরে যেতে বলবো। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত মেয়ের মামার নাকের কাছ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বক্তার মাণিক বোস বললো।

মেয়ের মামা নিরুপায় হয়ে চলে গেলেন। দল এগিয়ে গেলো বরযাত্রী ঘরের সাম্‌নাসাম্‌নি। দলের অগ্রণী কানাই তখন সাইকেলখানা রাস্তামুখো ঘুরিয়ে নিঃশব্দে দলের পিছনে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত তরুণদলের কারো তা চোখে পড়লো না।

বরযাত্রী আসরের মাঝখানে দরজার মুখো মুখ করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বর বসে। ডান হাতের কাছে টোপরটা রয়েছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। চুলে কোথাও ধূসরত্বের চিহ্নমাত্র নেই। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে গোঁফের দ্বিবর্ণত্ব চোখে পড়ে।

দলের পুরোভাগে তখন মাণিক বোস। সহসা বরকে হাসতে দেখে দরদী দল আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অনিল বাড়ুয্যে বলে উঠলো—দেখিছিস, ব্যাটা চুলে কলপ লাগিয়ে ছোকরা সেজেছে অথচ ঐ ত্যাখো, গোফে কলপ লাগাতে ভুলে গেছে।

—আবার মুচকি হাসছে। শয়তান কোথাকার। —নকু করের কণ্ঠস্বর।

—ওরে থাম্। বেরিয়ে আসুক আগে। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এই একটা স্রোর ওয়াদা।—মাণিক বোসের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

বাদানুবাদ ছোট্ট একটি সোরগোলের আকার ধারণ করে ওঠে। বরপক্ষের একজন বারান্দায় এসে সব ব্যাপারটা জেনে বরকে গিয়ে বললো। বর শুনে কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, বলোগে বর ওঁদের সঙ্গে ত্যাখা করতে আসছেন।

ধবধবে নেটের গেঞ্জি গায়ে, ফিন্‌ফিনে ধুতি কাপড়ের কোঁচা বাঁ হাতের পর এলিয়ে বর এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন তরুণদলের সামনে।

দলের অগ্রবর্ত্তী দুঃসাহসী মাণিক বোস দলের পক্ষ থেকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

বর দলের কাউকে প্রথমে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই করজোড়ে বলতে লাগলেন—দেখুন, আমি সব শুনেছি। এ বিয়ের বিরুদ্ধে আপনারা প্রবল প্রতিবাদ জানাতে এসেছেন; সেজন্যে আর যে যাই ভাবুন, আমি খুশীই হয়েছি। দেশের ভরসাস্থল প্রাণবান যুবক আপনারা, এ আপনাদের দরদী প্রাণেরই পরিচয়। এ ধরণের অন্যায়ের প্রতিকারও আপনাদেরই হাতে। আপনারা যেদিন শুধু কথার দরদ নয়, প্রাণের দরদ নিয়ে এগিয়ে আসবেন, সেদিন থেকে দেখবেন আমাদের বয়সী লোকেরা সাহস করবে না কোনো তরুণীর পাণিগ্রহণ করতে……।

—ও সব গরম বক্তৃতায় আমরা ভুলছিনে··· গলায় খ্যাকর দিয়ে মাণিক বোস প্রতিবাদ জানালেন আর কেউ কোনো কথা বললো না।

বর ও-কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠলেন—আপনারা শিক্ষিত যুবক; আমার বক্তব্য আগে শেষ করতে দিন, বাধা দেবেন না। তারপর আপনাদের যা বলার থাকে বলবেন। আমি তো আপনাদেরই মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি।

এবার সবাই নীরব হোলো। বর বলতে লাগলেন —আপনারা আমাকে সসম্মানে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিতে চান। আপনাদের প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা। মেয়েটি আজই সৎপাত্রস্থা হোলো দেখে যেতে চাই। আমি বিয়ের সব খরচা বহন করবো। আপনাদের মাঝ থেকে যে কেউ যুবক এগিয়ে এসে ওকে এই লগ্নে বিয়ে করতে রাজী হন। সব প্রস্তুত, কোনো বেগ পেতে হবে না।

বক্সারের সবল হাতের শিরায় তখন রক্ত সঞ্চালন মন্দীভূত হওয়া সুরু হয়েছে। মাণিক বোসের মুখ থেকে কোনো কথা বেরিয়ে এলো না।

একটু চুপ করে থেকে মাণিক বোস বললেন—আচ্ছা, কানাইয়ের ইণ্টারেষ্টটা যখন বেশী, তখন তাকেই বলে দেখি। এই কানাই! কানাই!

উত্তর এলো না। মাণিক বোস পিছনে ফিরে ছাখে কানাই তো নেই-ই, তার পশ্চাদ্বর্ত্তীরাও কখন্ উঠোন পেরিয়ে বাইরের দরজার কাছাকাছি হয়ে পড়েছে।

—কোথায় গেলো কানাই? এই কানাই! মাণিক বোস জোর গলায় হাঁক ছেড়ে ওঠে।

উঠোনের ওপার থেকে অনিল উত্তর ছায়—কোথায় তোর কানাই? বেগতিক দেখে অনেকক্ষণ আগে সে ভেগে পড়েছে।

—মার শালা কানাইকে। বক্সারের বজ্রমুষ্টি নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষণিকের জন্য উঁচু হয়ে উঠলো।

—সে এখন তোমার মারের বাইরে। অনিল দলের কয়েকজন সমেত সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় কেটে পড়লো।

নিরুপায়ের মতো বক্সার মাণিক বোস বরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বরের মুখ তখন নিঃশব্দ ব্যঙ্গের হাসিতে প্রৌঢ়ত্বের জড়িমাজাল ছিন্ন করে যৌবনের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

স্বপ্নিল ধান

সুনীলকুমার নন্দী

শীতের পড়ন্ত রাতে ঘুম ভাঙে শব্দ শুনে, আকাশের গায়
একটি নক্ষত্র জ্বেলে শোঁও শোঁও শব্দ তুলে প্লেন উড়ে যায়;
ধূসর কুয়াশা মাঝে অজস্র পেঁচারা যেন ডানা ঝাপ্‌টায়!
শব্দ থামে। আলো নেভে। তারপর চুপচাপ ঘন অন্ধকার।
পড়ে থাকে শুধু মোর নিঃসঙ্গ হৃদয় আর বিবর্ণ আকাশ—
প্লেনের মতোন শেষে ডানা মেলে দু'একটা কল্পনার হাঁস
স্বপ্নিল ধানের গন্ধে; এ পুরোনো ধান হায় ঝ'রে গ্যাছে কবে
আমার জীবন থেকে। তবু আমি প্রান্তরের মতোন নীরবে
বিশুষ্ক খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে দোল খাই, ঘুম পায় আর।
আজ আর না ঘুমিয়ে আমার কল্পনা হাঁস উড়ুক উড়ুক;
নীল অন্ধকার ক্ষেতে দুলে ওঠে ধান শীষ: সুজাতার মুখ
শিশিরের মতো শেষে হয়তো সে ভোর রাতে ঝরবে। ঝরুক!

—

চিত্রশিল্পী সুনীলমাধব

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত স্ব-অঙ্কিত যে তিন খানি তৈলচিত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শিল্পরসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তিনটি চিত্রের একটি "প্রতীক্ষা" (Suspense) পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং অপর দুইটী "শিল্পীর পত্নী" ও "ক্লিওপেট্রা" প্রশংসা অর্জ্জন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ক্লিওপেট্রা চিত্রখানি অমরশিল্পী গুইডোরেণী (Guidu) Reni অঙ্কিত বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রের কপি এবং ইতিপূর্ব্বে কোন কপি-চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায় নাই।

প্রদর্শনীতে চিত্রসমূহের বিচারক ছিলেন--মিঃ পার্শী ব্রাউন, শ্রীঅতুল বসু, শ্রী ও, সি, গাঙ্গুলী এবং শ্রীবরদা উকিল। তাঁহাদের বিচারে 'ফিগার' চিত্রসমূহের মধ্যে সুনীলমাধবের "প্রতীক্ষা" চিত্রখানিই অন্যতম বিবেচিত হয়। চিত্রখানির 'কলার কম্পোজিসন' ছিল অতুলনীয়। "শিল্পীর পত্নী" ফটোর মতই স্বাভাবিক ও বর্ণসুষমায় অনবদ্য। "ক্লিওপেট্রা" কুমার বিশ্বনাথ রায়ের ভবনে রক্ষিত প্রায় ৩০০ বৎসরের পুরাতন চিত্র হইতে কপি করা অপূর্ব্ব চিত্র।

ক্লিয়োপেট্রা

কলিকাতায় 'বেলগাছিয়া ভিলা' এবং রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ভবনে সংগৃহীত কয়েকটি বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পীর চিত্র দেখিয়া শিল্পী সুনীলমাধবের অন্তরে ঐরূপ চিত্র কপি করিবার প্রেরণা জাগে। শিল্পীর অঙ্কিত এই সার্থক কপি-চিত্রখানি প্রদর্শনীক্ষেত্রে একজন শিল্পরসিক সংগ্রাহক সহস্রমুদ্রায় ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সুনীলমাধব উহা হস্তান্তরিত করিতে স্বীকৃত হন নাই।

সম্প্রতি তাঁহার শিল্পাগার পরিদর্শনের সুযোগ ঘটে। তিনি সাদরে আমাকে তাঁহাদের কলিকাতা জগদীশনাথ রায় লেনস্থ বাসভবনে লইয়া যান। ভবনের দ্বিতলে একটি সুদীর্ঘ সুরম্য গৃহে চিত্রাগারটি স্থাপিত। তিনি যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত অতি সুন্দর ভাবে চিত্রগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্যই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহার সামান্যমাত্র বিবরণ এই প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে শিল্পীর পরিচয় দিয়া পরে তাঁহার রচিত শিল্পের পরিচয় দেওয়াই সাধারণ বিধি, আমি এই বিধিরই অনুসরণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত সুনীলমাধব সেনগুপ্ত পেশাদার শিল্পী নহেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপাধিধারী এবং কলিকাতায় ভারতগভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটি দায়িত্বপূর্ণপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি আবাল্য চিত্রশিল্পের অনুরাগী এবং তাঁহার সেই অনুরাগ এই পরিপূর্ণ যৌবনপ্রান্তে পৌঁছিয়াও কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই,

প্রতীক্ষা

(একাডেমির পুরস্কার প্রাপ্ত)

বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। এখন চিত্রাঙ্কনই তাঁহার অবসর-বিনোদন এবং আনন্দলাভের একমাত্র উপকরণ।

সুনীলমাধব ১৯১০ অব্দে পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনও কোন আর্টস্কুলে শিক্ষালাভ না করিলেও, বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। বাঁকুড়ায় ১৯১৯ অব্দে পূজামণ্ডপে পটুয়াদের তৈয়ারী বিরাট ও অতি সুন্দর হরগৌরী মুর্ত্তি দেখিয়া নবম বর্ষীয় বালক সুনীলমাধব বিশেষভাবে মোহিত হন। বাড়িতে ফিরিয়া কাঠকয়লার সাহায্যে তিনি দেওয়ালে অতি যত্ন সহকারে উক্ত মুর্ত্তির একটি প্রতিরূপ অঙ্কিত করেন। সুনীলমাধবের মাতামহ শ্রীহরিনাথ রায় (স্বর্গত জগদীশনাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র) সে সময় বাঁকুড়ার এক জন ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দৌহিত্রের অঙ্কিত হরগৌরীর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং স্থানীয় জেলাস্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার শ্রীঅসিত দাশগুপ্তকে বালককে ড্রয়িং শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করেন। সুনীলমাধব উক্ত শিক্ষকের নিকট কয়েক বৎসর ড্রয়িং শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৮ অব্দে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তাঁহার আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইবার বাসনা হয়, কিন্তু অভি-ভাবকেরা তাহাতে সম্মতি দান করেন না। তিনি অয়েল পেন্টিং শিক্ষার জন্য অনেক শিল্পীর নিকট যাতায়ত করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে শিক্ষা দিতে রাজী হন না—সকলেই তাঁহাকে আর্টস্কুলে যাইতে বলেন। সুনীলমাধব অগত্যা কলেজের অবসর সময়ে একজন বন্ধুর সহায়তায় কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অয়েল পেন্টিং ক্লাসে যাইতে আরম্ভ করেন। তিনি সেখানে দীর্ঘসময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছাত্রদের ছবি আঁকা দেখিতেন। সুনীলমাধব সেই সময় মাঝে মাঝে শিল্প-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও হাতে ধরিয়া শিক্ষাদান করেন নাই।

কয়লা কুঠির কামিন

কলেজে পাঠের কালে অবসর সময়ের সমস্তটাই তিনি শিল্প-চর্চায় কাটাইতেন।

সুনীলমাধব-অঙ্কিত প্রথম তৈলচিত্র 'বিচারপতির বেশে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ শিল্পীর অঙ্কিত এই প্রতিকৃতিচিত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন। যথাসময়ে বি-এ এবং বি-এল পাশ করিয়া সুনীলমাধব কিছুকাল কোর্টে বাহির হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় কিছু ব্যবসায়ও করেন। তৎপরে ১৯৪৪ অব্দ হইতে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন।

শিল্পী সুনীলমাধব প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত শিল্পের সাধনায় মগ্ন থাকেন। ১৩৪৬ সালে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় তিনি যে শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতি-চিত্র দান করেন, তাহা সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে। ১৯৪৪ অব্দের 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টের' প্রদর্শনীতে তদানীন্তন রাজ্যপাল চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সুনীল-মাধব-অঙ্কিত পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রখানি দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট

মনের কথা

রিক্তের হাসি

হাউসে উহা রক্ষার জন্য গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে চিত্রখানি গভর্ণমেণ্ট হাউসের চিত্র সংগ্রহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া শিল্পীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ১৩৫২ সালে সুনীল-মাধব তাঁহার অঙ্কিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তৈলচিত্র আই-এন্-এ ফাণ্ডে দান করেন। শ্রীজওহরলাল নেহরু চিত্রখানির সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শিল্পী সুনীলমাধব বিগত ৬ই জানুয়ারী হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ১নং চৌরঙ্গী টেরাস ভবনে যে একক শিল্প প্রদর্শনী করেন, তাহাতে বহু শিল্প-রসিকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই শিল্পীর কৃতিত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার জয়গান করেন।

শিল্পীর চিত্রাগারে বর্ত্তমানে তৈলচিত্র ও স্কেচে প্রায় ১৫০খানি চিত্র রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিলেই প্রথমে 'ক্লিওপেট্রা' তৈলচিত্রখানি চোখে পড়ে। সওয়া চারিফুট × সাড়ে তিনফুট মাপের এই বৃহৎ চিত্রখানির দিক হইতে সহজে দৃষ্টি ফিরানো যায় না—অপূর্ব্ব চিত্র।

সংগ্রহে ফিগার চিত্রই অধিক। অনেকগুলি ভ্যান্‌গগ্‌ ও পিকাসোর ধরণে অঙ্কিত। পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র "প্রতীক্ষা" আকাড়ে সাড়েতিন × আড়াই ফুট, ভাবটি ও রংএর সমাবেশ সুন্দর। "তন্দ্রা" ছবিটির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তরুণী বই পড়িতে পড়িতে সবে মাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একটু জোরে কথা কহিলেই তাহার তন্দ্রা টুটিয়া যাইবে ও চাহিয়া দেখিবে। ছবিটি আকারেও ছোট নয়, ২ ফুট ৭ ইঞ্চি×২ফুট ২ ইঞ্চি। 'কয়লা কুঠীর কামিন' ২ফুট ৪ ইঞ্চি×১ ফুট ৪ ইঞ্চি। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে খাদে যাইতে হইতেছে বটে, কিন্তু নিজের যৌবন ভারাক্রান্ত দেহের সম্বন্ধে সে সদাই সচেতন। "মনের কথা" ২ফুট ২ইঞ্চি×১ফুট ১০ইঞ্চি। নিভৃতে দুইটী তরুণীর মনের কথা প্রকাশের ভাবটি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। "রিক্তের হাসি" চিত্রখানি অতি সুন্দর। এটি কাল্পনিক চিত্র নয়। শিল্পী বলিলেন কলিকাতায় কোন বাজারে এই ভিখারীটিকে দেখিয়াই তিনি চিত্রখানি আঁকিয়াছেন। সর্ব্বহারার এই হাসির মধ্যে একাধারে দুঃখ ও আনন্দের অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শককে মুগ্ধ করে। এই চিত্রখানি যে কোন প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। পরমহংসদেব, সন্ন্যাসী, স্বর্গত জগদীশ নাথ রায় প্রভৃতি প্রতিকৃতি চিত্রগুলিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পাগারে কোন জল-রং চিত্র নজরে পড়িল না। শিল্পী তৈলচিত্রেরই একান্ত অনুরাগী।

শিল্পীর অঙ্কিত পেনসিল-স্কেচ সমূহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কয়েকখানি চিত্র অতি ভাল লাগিল। শিল্পরসিকেরা শিল্পী সুনীলমাধবের শিল্পাগারে আরও যে সকল চিত্র দর্শনে আনন্দ লাভ করিবেন, সে সকলের পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর হইল না। চক্ষের সম্মুখে যে চিত্রগুলি ভাসিতেছে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিলাম।

কথাসূত্রে শিল্পী বলিলেন, একবার বিদেশে যাইয়া চিত্রাগারগুলি দেখা এবং পিকাসো, মাটিস ও অগষ্টাস্‌ জন্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পিগণের সঙ্গে আলাপ করার তাঁহার বিশেষ বাসনা। তিনি যাহা কিছু রোজগার করেন তাহার বেশী ভাগই ছবির পিছনে খরচ হইয়া যায়। মাসের শেষে প্রায়ই তাঁহাকে ধার করিতে হয়। সুযোগ বুঝিয়া অনেক সময় পরিচিত জনে নামমাত্র মূল্যে তাঁহার নিকট হইতে ছবি গ্রহণ করেন। যে ছবি তিনি দেন নাই, এক সময় ৭০০৲ টাকা মূল্যে, অর্থাভাবের সময় একজন বন্ধু মাত্র ১৫০৲ টাকা দিয়া তাহা লইয়া গিয়াছেন।

শিল্পীর কোন পুত্র-কন্যা নাই, এজন্যে সাংসারিক ঝঞ্ঝাটও কম। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা যে, শিল্পী-পত্নীও চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগিনী এবং তিনি সর্ব্বদাই শিল্পীস্বামীকে চিত্রাঙ্কণে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। শিল্পী সুনীলমাধব সেনগুপ্ত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া শিল্প-সাধনায় আরও কৃতিত্ব লাভ করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি
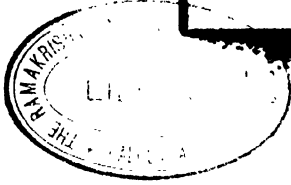
রণজিৎ কুমার সেন

বাইশ

আবার সেই নবগঙ্গা-বিধৌত মাতৃস্নেহের মতো মাগুরার নরম মাটি। নবগঙ্গার জোয়ার পারবে না কি এই তাপদগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত জ্বালাকে ধুয়ে নিতে? ধ্যানী বুদ্ধের মতো কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো বিজন চিরপুরাতন নবগঙ্গার চিরমনোহর রূপকে আবার নতুন ক'রে, তা সে নিজেই জান্‌লো না। মনে মনে একবার উচ্চারণ ক'রলো সে: 'আমার সকল অপরাধ যেন তোমার চিরকালের ক্ষমা দিয়ে মুছে নিও মা!' তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সোজা বাড়ী এসে মায়ের পায়ের ধূলো কুড়িয়ে নিল' সে মাথায়।

নির্ম্মলা কিন্তু বিজনের এই আকস্মিক আবির্ভাব কল্পনাও ক'রতে পারেন নি। প্রথম দর্শনেই তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'লেও আশ্বস্ত হ'লেন তিনি কম নয়। ঘরের শূণ্যতা যেন মুহূর্ত্তে আবার ভ'রে উঠলো। আশীর্ব্বাদ ক'রে তিনি ব'ল্‌লেন, 'এতদিনে তবে আস্‌তে পারলি বাবা! কিন্তু এ তোর কোন্ ছিরি হ'য়েছে, বল্ তো? ক'ল্‌কাতার মতো সহরে থেকে কই শরীরের তো কিছু উন্নতি হয়নি তোর?'

মায়ের পাশ ঘেঁষে ব'সে বিজন ব'ল্‌লো, 'কলের দেশ ক'লকাতা, সেখানে কি আমাদের এই গ্রামের মাটির মতো মমতা আছে যে, শরীর ভালো হবে মা!'

—'তবে এমন কি দরকার ছিল সেখানে গিয়ে এম্‌নি ক'রে থেকে শরীর ক্ষয় ক'রবার! বি-এ তো তুই দৌলতপুরে থেকেও প'ড়তে পারতিস্ বাবা!' উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলেন নির্ম্মলা ছেলের মুখের দিকে।

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমিই কি জান্‌তুম মা, ক'ল্‌কাতা শুধু ফাঁকির দেশ, উৎকর্ষতা নেই কানাকড়িও। আর আমি ক'ল্‌কাতায় যাবো না মা।'

—'তাই যাস্‌নে বাবা! আমিও তবে বাঁচি।' থেমে নির্ম্মলা বললেন, 'এখন আর এই দেহটার উপর একদণ্ডও ভরসা রাখতে পারছি নে, কখন্ চক্ষু বুজে যাই, সেই শুধু ভয়। তোকে দূরে রেখে আমি যে নিশ্চিন্তেও মরতে পারবো না বাবা।'

মায়ের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বিজন বললো, 'এম্‌নি ক'রে যদি শুধু মরার কথা ব'লবে, তবে আর এক দণ্ডও আমি এখানে থাকবো না মা। কোথায় তোমার মুখের হাসি দেখে প্রাণটা একটু জুড়োবো, তা নয়—

কথা শেষ হ'লো না বিজনের। ছেলেকে দু' বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে নির্ম্মলা বললেন, 'এই আমি চুপ করছি বাবা। যা দেখি কেমন পারিস আমাকে ফেলে?'

বিজন এবারে আর একটি কথাও বলতে পারলো না। মায়ের বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ সে নীরবে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এক সময় বললো, 'আঃ, তোমার বুকখানির মতো শীতল হ'তো যদি সমস্ত দুনিয়াটা, তবে এম্‌নি ক'রেই মুখ লুকিয়ে বসে থাকতুম মা।'

কথা না ব'লে ছেলের পিঠের উপর দিয়ে শুধু স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

এম্‌নি ক'রেই সারাটা দিন কেটে গেল।

বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে অবধি অতসীর জন্ম অনবরত মনটা খাঁ খাঁ ক'রছিল বিজনের। অনাথিনী হ'বে রাজেন্দ্রানী হ'য়ে দেখা দিল একদিন, অনাত্মীয় হবে আত্মার গভীর নিকটে এসে আত্মীয়তম হ'য়ে দাঁড়ালো। অতসীর আবির্ভাবে যত বেশী সংশয় ছিল, এ ঘর থেকে তার বহির্গমনে সংশয়ের চাইতে মনটা আজ হাহাকার ক'রে উঠ্‌ছে বেশী। মানুষ কত পশু হ'তে পারে—যার দ্বারা অতসীদিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব! বিজন বললো, 'এমন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল গ্রামে, অথচ এ নিয়ে কারুর মধ্যে কিছুমাত্র অস্থিরতা দেখা গেল না, মা?'

—'কার লেগেছে যে অস্থির হবে, বাবা?' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'গ্রামের কারুর কথা ভাবি না, শুধু ভাবি সেই অভাগিনী মেয়েটার কথা। এমন ভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল যে, জান্‌তে পর্য্যন্ত পারলুম না।'

—'জান্‌তে পারলে আর এমন কাণ্ড ঘ'টবে কেন! একেই বলে অদৃষ্ট, অদৃষ্টের উপর মানুষের হাত নেই মা।' থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তুমি লিখেছিলে, ছন্দা এখন এখানেই আছে, কই, তাকে তো সারা দিনের মধ্যে একটি বারও দেখতে পেলাম না? সেবার শ্যামলকান্তির অসুখের কথা লিখেছিলে, এখন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তো?'

উত্তর দিতে গিয়ে চোখ দু'টি এবারে ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠ্‌লো নির্ম্মলার। বিজনের তা দৃষ্টি এড়াল না। কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এখানেও অদৃষ্টের উপর মানুষের হাত নেই বাবা। মেয়েটার যে এম্‌নি ক'রে কপাল ভাঙ্‌বে, এ তো কল্পনাও ক'রতে পারিনি বিজু! জানতুম, তোকে লিখলে ছন্দার এ শোক তুই সহ্য ক'রতে পারবি নে, তাই লিখিনি, লিখতে হাত কেঁপে উঠেছিল।'

মনে হ'লো—কে যেন অলক্ষ্যে থেকে সহসা বিজনের মুখ থেকে সমস্ত কথা কেড়ে নিয়েছে, এমনি অসহায় ও অস্থির দৃষ্টিতে সে যে কতক্ষণ ধ'রে মায়ের সজল চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে রইল, তা সে নিজেই জান্‌লো না, তারপর একসময় অস্ফুট কণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'তা হ'লে ছন্দার নির্য্যাতিত জীবনেতিহাসের পুনরাবর্ত্তন ঘটলো, যে তিমিরে সেই তিমিরেই আবার তবে ফিরে আস্‌তে হ'লো ছন্দাকে?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'শ্বশুর বাড়ীর দিক দিয়ে সমস্ত সম্পত্তিই অবিশ্যি সে হাতে পেয়েছে, কিন্তু যক্ষপুরীতে একা ব'সে সে-সম্পত্তি ভোগ ক'রবার মতো অবস্থা নেই ছন্দার। ছিলেন ওর শ্বশুর ঠাকুর, তিনিও কিছুদিন হ'লো চক্ষু বুজে গেছেন, যাবার আগে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়ে গেছেন ছন্দাকে। কিন্তু ওর জীবনে তার মূল্য কতটুকু? এখানে না এলে দু'দিন বাদে হয়ত ওকেও যমে টেনে নিত। এখানে অঞ্জনার অত্যাচার আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েও ও হয়ত ওর মনের সান্ত্বনা খুঁজে পাবে মাগুরায় থেকে!'

উত্তরে আর কিছু-একটাও ব'ললো না বিজন। ব'ল্‌বার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। দু'দিক থেকে দু'টি বিপরীত ধারা এসে নব-গঙ্গায় আজ এক নূতন মোহনা সৃষ্টি ক'রেছে। একদিকে জীবনের সর্ব্বস্ব খুঁইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ছন্দা, অন্যদিকে ব্যর্থতার দুঃসহ তাপ নিয়ে এসে দুঃখের শ্বাস টান্‌ছে সে নিজে। নবগঙ্গার শান্ত প্রবাহ পারবে কি এ জ্বালা ধুয়ে দিতে? কিন্তু সংসারে আজ ছন্দার তুলনায় তার নিজের ক্ষতি কতটুকু? বৈধব্যপীড়িত হ'য়ে আজ যে জীবনের সমস্ত আশা, আনন্দ আর সুখকেই বিসর্জ্জন দিতে হ'লো ছন্দাকে! তার কাছে কি সত্যিই আজ দাঁড়াতে পারে তার নিজের হাহাকার? ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সে, সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই একবার সে মনে মনে উচ্চারণ ক'রলো, 'কি নিষ্ঠুর তোমার বিধান, মানুষের জীবন নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেল্‌ছ তুমি অহরহ!'

পরদিন সকালের দিকে ছন্দা এসে বার দু'য়েক ঘুরে গেল। ক'দিন ধ'রেই মন তার কেমন যেন সাড়া দিচ্ছিল—বিজুদা আসবে। তার এসে পৌঁছাবার কথাটুকুও তার অজানা ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও পারছিল না সে বিজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। লজ্জায় নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছিল সে, দুঃখে ভেঙে প'ড়ছিল

শতখান হ'য়ে। বিজুদাকে গিয়ে মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত আজ আর অবস্থা নেই তার। কেমন ক'রে কোথা দিয়ে তার জীবনটা আজ কি হ'য়ে গেল—মাঝে মাঝে এ-কথা ভেবে সে নিজেই শিউরে ওঠে। অথচ বিজুদা আজও তেম্‌নি আছে ; তেম্‌নি প্রতীক্ষা, তেম্‌নি সাধনা, তেম্‌নি একা। ছোট বেলার দিনগুলির কথা মনে প'ড়ে চোখের জল ঢেকে রাখ্‌তে পারে না ছন্দা। দু' দু'বার এসে ঘুরে গিয়ে একবারও তাই বিজুদার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না সে।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'তোর বিজুদা এসেছে, যা—দেখা ক'রে আয়।'

উত্তরে ছন্দা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আছে তো কিছুদিন, না হঠাৎই আবার ক'ল্‌কাতা ছুট্‌বে ?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবারে চোখ দু'টোকে একবার বড় ক'রে তাকালেন নির্ম্মলা : 'আছে রে আছে, কথা দিয়েছে—আর ক'ল্‌কাতা যাবে না বিজু। যেমন দেশ ক'ল্‌কাতা, কাউকে কি সেখানে যেতে আছে মা ! শরীর একেবারে আধখানা ক'রে এসেছে বিজু।'

বুকখানি একবার ছাঁৎ ক'রে উঠলো ছন্দার। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, অসুখ করেছিল নাকি ?'

—'বালাই, ষাট, অসুখ কেন ক'রবে ? আসলে মেস-হোটেলে থেকে কি কারুর শরীর টেকে !' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, শুধু কল-কারখানা ধোঁকাবাজি—এই নিয়ে ক'ল্‌কাতা সহর, দেখাশুনা করবার মতো নিজের লোক না থাক্‌লে যা হয়।'

কিন্তু তাতেই কি শরীর আধখানা হ'য়ে যেতে পারে ! বিজুদার মনেও হয়ত শান্তি ব'লে কিছু নেই ! অশান্তি যে মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে ক্ষয় করে, তা অন্ততঃ সে তো জানে ! কিন্তু যেটুকু জানে, তা মুখ ফুটে প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। নির্ম্মলার কথায় উত্তরে তাই কিছু একটাও আর না ব'লে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বিদায় নিয়ে ব'ল্‌লো, 'আসি মাসীমা, পারি তো ওবেলায় দিকে আবার আস্‌বো।'

তার এই খাপছাড়া ভাবটা যে নির্ম্মলার লক্ষ্যে না প'ড়লো, তা নয়, কিন্তু এই নিয়ে কিছু একটাও ব'লতে পারলেন না তিনি। শুধু অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ ছন্দার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে পুনরায় নিজের কাজে মন দিলেন নির্ম্মলা।

কিন্তু বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছন্দার ধৈর্য্যে কুলোয় নি। দুপুর না গড়াতেই আর একবার এসে ঘুরে গেল সে।

কাছে ডেকে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'আয়, ঘরে এসে ব'স্ মা।'

—'ব'স্‌বার কি অবকাশ আছে মাসীমা ? বাড়ীর মেজাজ আজ উগ্র, এরই মধ্যে দু'পশলা হ'য়ে গেছে। যেতে দেরী হ'লে ঘরে গিয়ে আর টিক্‌তে পারবো না।'—কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব চেপেই কথাগুলো ব'ল্‌লো ছন্দা। পাছে বিজুদার কানে গিয়ে তার উপস্থিতিটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, পাছে হটাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে যায় সে তার কাছে, —শুধু এই ভয়, এই লজ্জা আর এই সঙ্কোচ। কথাগুলো তাই একরকম চুপিসারেই ব'ল্‌লো সে

পাশের ঘরে বিজন কি একখানি বই প'ড়তে প'ড়তে অকস্মাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল, নইলে মা'র গলার শব্দ থেকেও ছন্দার উপস্থিতিটা অনুমান ক'রে নিতে পারতো। কিন্তু কিছুই সে বোধ ক'রলো না। বরং তন্দ্রার ঘোরে ক'ল্‌কাতার জীবনের ব্যর্থ একটা মুহূর্ত্তকে স্বপ্নে জড়িয়ে কেমন অস্থির হ'য়ে উঠছিল সে নিজের মধ্যে।

সহানুভূতির কণ্ঠে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, হঠাৎ আবার কি নিয়ে মেজাজ উগ্র হলো অঞ্জনার ? আজকাল তো তাকে ন'ড়ে বস্‌তে অবধি হয় না।'

ছন্দা বললো, 'মেজাজ দেখাবার লোক থাকলে ছুতো পাবার অভাব কি মাসীমা ! সকাল থেকে সতেরো কাজে ব্যস্ত থেকে কাল রাত্রের বাসি দুধের কড়াটা মাজতে একটু দেরী ক'রে ফেলেছিলাম, এই হলো রাগের কারণ ; তাই নিয়েই আমার তিন পুরুষের নিকুচি হয়ে গেল।'

সহ্য করতে পারছিলেন না নির্ম্মলা, বললেন, 'তুই কিছু বল্‌লি নে ?'

—'বলবার মুখ কোথায় মাসীমা? ব'ললে যে আগুন লেগে যাবে!' অলক্ষ্যে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল ছন্দা।

নির্ম্মলা বললেন, 'ধিকি ধিকি আগুনের চাইতে একদিনে কিছু একটা প্রলয় ঘটে গেলেই বা মন্দ কি! তুই তো আজ আর সত্যিই জলে পড়িসনি মা!'

—'জলেই তো পড়েছি মাসীমা। এ সংসারে একমাত্র আপনার কোলে মুখ লুকোনো ছাড়া আমার কি সত্যিই কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই আছে!'—ব'লতে গিয়ে কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে উঠলো ছন্দার।

এ কথার উত্তরে কিছু বলা সহজ নয়। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে নির্ম্মলা বললেন, 'যা, ওঘরে গিয়ে তোর বিজুদার সঙ্গে দেখা ক'রে আয়।'

—'এখন থাক্, পরে আসবো।'

—'পরে আস্‌বো কি রে, সঙ্গে যে তোর দেখাই হলো না!'

—'সময় তো চলে যায়নি, পরেই আসবো মাসীমা, এখন উঠি।'

বাধা দিলেন না নির্ম্মলা।

নীরবে একসময় উঠে পড়লো ছন্দা। কিন্তু সত্যিই কি উঠে আস্‌তে ইচ্ছা করছিল তার? মাঝ-উঠোনে একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে: ঘর থেকে বিজুদা হঠাৎ ডাক্‌লো না তো তার নাম ধ'রে? কান দু'টো মুহূর্ত্তের জন্য একবার অতিমাত্রায় সচেতন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মনের ধাঁধা নিজের কাছে ধরা পড়লো। পা দু'খানিকে আরও দ্রুত এগিয়ে দিল সে এবারে বাড়ীর দিকে।

এম্‌নি ক'রে আরও একটা দিন কেটে গেল। বিজনের কাছেও এটা কম বড় প্রশ্ন ছিল না। অথচ সেও সহজভাবে উপযাচক হ'য়ে ছন্দাকে কাছে ডেকে নিতে পারছিল না। অশান্তির আগুন তার বুকেও কি কম জ্ব'লেছে এই নিয়ে!

কিন্তু তৃতীয় দিনে এর একটা আকস্মিক নিষ্পত্তি ঘ'টে গেল। আকস্মিকই বা বলি কেন, সকল লজ্জা সকল দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে ছন্দা এসে নীরবে বিজনের দুয়োরের সামনে দাঁড়ালো। অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিত বেশ, পরণের থানে কিছু মলিনতার আভাষ সুস্পষ্ট। নিরাভরণ হাতে দরজার একটা পাল্লা ধ'রে আনত দৃষ্টিতে এসে দাঁড়ালো ছন্দা। ঘরে ব'সে কি একখানি বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ডুবে ছিল বিজন। নিঃসঙ্কোচেই এবারে তাকে সাড়া দিতে হ'লো। ব'ললো, 'আয়, কাছে আয় ছন্দা।'

কী একটা দুরন্ত আবেগে সমস্তটা দেহ একবার নড়ে উঠ্‌লো ছন্দার। কত দীর্ঘকাল বিজুদার এই কণ্ঠস্বরটুকু শুনতে পায়নি সে। তবু যেন পা চ'ল্‌তে গিয়েও চ'ল্‌তে চাইছে না, কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে আস্‌চে পা দু'খানি।

আর একবার ডাক্‌লো বিজন: 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয় ভিতরে এসে ব'স্।'

এবারে আর ইচ্ছে ক'রেও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'লো না ছন্দার। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাশের তক্তপোষে ব'সে প'ড়েই সহসা হু-হু ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো সে। এ কান্না যে কিসের কান্না, বিজনের কাছে তা অস্পষ্ট রইল না। ব'ল্‌লো, 'আমি সব শুনেছি; তোকে যে সান্ত্বনা দেবো, এমন শক্তি আমার নেই। তবু একটা কথা বলি, পৃথিবীতে কান্নাই কান্নার শেষ নয়, অশ্রুর পরেও কিছু আছে। সংসারে মৃতের মতো বাঁচায় বড় গ্লানি। এম্‌নি ক'রে কেবল চোখের জল ফেলে তেমন গ্লানি যেন কখনও ডেকে আনিস নে, ছন্দা। চোখ মুছে স্থির হ'য়ে ব'স।'

শান্ত হ'তেই চেষ্টা ক'রলো ছন্দা, কিন্তু অশ্রুর ধারা তাতে রুদ্ধ হ'লো না। ব'ল্‌লো, 'তোমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবধি আজ আর শক্তি নেই আমার, বিজুদা।'

বিজনের কণ্ঠও কেমন ভারী হ'য়ে উঠেছিল, ব'ল্‌লো, 'নিজেকে এত নীচে নামিয়ে দিলি তুই কেমন ক'রে?'

—'নীচু তলার মানুষ হ'য়ে উপর তলার স্বপ্ন দেখ্‌বো, তেমন অবকাশই বা জীবনে কোথায়!' কতকটা শান্ত হ'য়ে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'মাসীমার কথাটাই সত্যি, পোড়া বাংলাদেশের হতভাগিনী বিধবাদের কোথাও মাথা উঁচু

ক'রে কথা ব'ল্‌বার অধিকার নেই। কিন্তু এই জীবনকে, এই বৈধব্যকে সত্যিই কি আমি কামনা ক'রেছিলাম, বিজুদা? সত্যিই কি কোনোদিন কল্পনা ক'রতে পেরেছিলাম অদৃষ্টের এই পরিহাসকে?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষের কল্পনা যদি বাস্তবে রূপ নিত, স্বর্গরাজ্য ব'লে কি তবে স্বতন্ত্র কোনো জগৎ থাক্‌তো? পৃথিবী তবে স্বর্গে পরিণত হ'তো, স্বর্গের ঈশ্বর তবে মাটির মানুষের সঙ্গে একত্রে সুখ-দুঃখের খেলা খেল্‌তেন। কিন্তু তাই কি?'

অতি দুঃখেও একবার মনে মনে হাসি পেলো বিজনের। হাসি পেলো নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা ক'রেই। কাকে সে সান্ত্বনা দিচ্ছে? তার নিজের সান্ত্বনা কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্তে সে-ই কি কম দগ্ধ হ'চ্চে! ভগবান তাঁর স্বর্গের উচ্চাসন ছেড়ে একবারও কি এই ছোট গ্রামখানির ছোট ঘরখানির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন? যে দাঁড়িয়েছে, সে ছন্দা—নিজের অদৃষ্টকে যার অদৃষ্ট দিয়ে মাপা যায়, যার হাসি দিয়ে নিজেকে হাসানো যায়।

নিজের প্রসঙ্গটা এবারে চেপে যেতে চেষ্টা ক'রলো ছন্দা, ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতার পাট একেবারেই তুলে দিয়ে এসেছ তো বিজুদা?'

—'আপাতত তাই এসেছি। পারলুম না সেখানে থাক্‌তে। ক'ল্‌কাতার মতো শিল্প-নগরে গেলে সব চাইতে বেশী মনে পড়ে আমাদের এই গ্রামকে।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এতকাল গ্রামে থেকে গ্রামকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নি, ক'ল্‌কাতায় গিয়ে প্রথম সেই মর্য্যাদা দিতে শিখ্‌লাম, তাই আবার গ্রামে ফিরে এসেছি। এবারে যদি তার পায়ে একটুকুও ঋণের বোঝা নামাতে পারি!'

—'সেই ঋণ কি আমার জীবনেও কম ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো বিজুদা, তাই তো এখানে এম্‌নি ক'রে ম'রছি।' ব'লে বিজনের মুখের দিকে একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ছন্দা, তারপর অলক্ষ্যেই কখন্ চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

বিজন ব'ল্‌লো, 'জীবনে একবার যদি আশ্রয় পেলি, তবে তার অমর্য্যাদা ক'রে এম্‌নি ক'রেই বা এখানে প'ড়ে আছিস্ কেন? কেন দিনরাত উঠ্‌তে ব'স্‌তে এমন ক'রে পীড়ন সইছিস্?'

—'আশ্রয় কি সত্যিই আছে, যা আছে—তাকে কি আশ্রয় বলে বিজুদা?' আর্দ্রকণ্ঠে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'অদৃষ্ট মানো তো তুমি? এও আমার অদৃষ্ট; ইচ্ছে ক'রলেই কি এই পীড়নের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি!'

উত্তর দিতে গিয়ে একবার থামলো বিজন, তারপর সমবেদনার কণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'বাংলার পল্লী-নারী, পল্লীর স্নিগ্ধতার মতই মন তোদের নরম, তোরা কি পারিস বিদ্রোহ ক'রতে? তোরা পারিস নীরবে অত্যাচার সইতে আর আড়ালে ব'সে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদ্‌তে। এ তোর দোষ নয় ছন্দা, দোষ এই মাটির—দোষ এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলা দেশের।'

চোখ দু'টি ছল্‌ছল্ ক'রছিল ছন্দার, নিজেকে যথাশক্তি চেপে গিয়ে ব'ল্‌লো, 'তবু পরজন্ম ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে যেন এই বাংলার গ্রামেই আবার জন্ম নিতে পারি—যেখানে র'য়েছ তুমি, মাসীমা আর কাকাবাবু।'

ম্লান হেসে বিজন ব'ললো, 'তোর কাকিমাও কি নেই সেখানে?'

—'তা থাক্।' ব'লে উঠে পরলো ছন্দা, বাড়ী থেকে কমক্ষণ হ'লো আসেনি সে। গিয়ে আবার কি মূর্ত্তি দেখ্‌তে হয় কাকিমার, কি জানি! ব'ল্‌লো, 'আমি এখন আসি বিজুদা।'

তারপর আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালো না সে।

কিছুক্ষণ উদাসীন দৃষ্টিতে বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে রইল বিজন। ক্রমে দৃষ্টি গিয়ে প'ড়লো নবগঙ্গার তীরে। দূর নয় নবগঙ্গা। জানালা দিয়ে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় তার তীরভূমি। দেখ্‌লো—একজোড়া চখা দম্পতি ইতস্ততঃ খেলা ক'রে চ'লেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক বলাকা, তাদের বিক্ষিপ্ত পক্ষবিস্তারে সাদা হ'য়ে গেছে আকাশখানি। কতক্ষণ যে অন্যমনে ব'সে ব'সে এই দৃশ্য দেখ্‌লো বিজন, তা সে নিজেও জানলো না; তারপর একসময় মাসিকের পৃষ্ঠার মধ্যে আবার মনটাকে ছেড়ে দিল সে।

তেইশ

গ্রামে এসে নিজের ঘরখানিকে নানা গ্রন্থ আর সাময়িক পত্রে সাজিয়ে নিয়েছিল বিজন। নিজের বিক্ষুব্ধ মনটাকে তবু যদি গ্রন্থসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কিছুটাও অন্ততঃ মুক্তি পাওয়া যায়! কিন্তু মনের মুক্তি যে একেবারেই স্বতন্ত্র জিনিষ, এ কথাটা বোধ করি তার জানা ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই গ্রন্থ আর সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে মনটা বিছিন্ন হ'য়ে উড়ে গেছে অতীতের ছায়া লোকে। দৌলতপুরের সেই হোষ্টেল, ক'ল্‌কাতার সেই মেস, রাসবিহারী এভিন্যুতে কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটওয়ালা রেবাদের বাড়ী। স্মৃতির সমুদ্র-নীর আকণ্ঠ পান ক'রে কখন্‌ নিজের মধ্যেই হত-চেতন হ'য়ে পড়ে বিজন। বড় দুর্ব্বিসহ এই মুহূর্ত্তগুলি। গ্রন্থের শব্দঝঙ্কার তখন মিথ্যা হ'য়ে যায়, সাময়িক পত্রের প্রলুব্ধ কাহিনীর চমৎকারিত্ব তখন কাঁটার মতো এসে গায়ে বেঁধে। ছন্দাকে আজ কাছে পেয়েও কেমন যেন তার প্রতি এক অদ্ভুত সম্ভ্রমে সারা মন তার নুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নিজের কাছেই প্রশ্ন তুলে ধরে সে: কেন মানুষের আপন ইচ্ছায় বিধাতার এই মাটির সৃষ্টি পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? কিন্তু পৃথিবীর কোনো অভিধানে, কোনো ধর্ম্মতত্ত্বেই কি এ প্রশ্নের কিছু সমাধান আছে? নিজের প্রশ্নে নিজেই জড়িয়ে প'ড়ে কেমন বিভ্রান্ত হ'য়ে যায় বিজন।

মনের এমন্‌ই একটা বিভ্রান্ত মুহূর্ত্তে একসময় ব'সে ব'সে সে চিঠি লিখলো মহেন্দ্রকে। অক্ষয় হ'য়ে রইল মহেন্দ্র তার জীবনে। এমন একটি অদ্ভুত চরিত্রের সংস্পর্শে এসে ভালোয়-মন্দে মিশ্রিত একটি সত্যিকারের মানুষকেই আবিষ্কার ক'রতে পেরেছে সে। ক'ল্‌কাতার জমাখরচের খাতার এইটুকুই তার লাভ দাঁড়িয়েছে। সেই লাভের উপরে আপ্‌নি থেকেই আরও কিছুটা দিয়েছে মহেন্দ্র। সেটুকু তার সহজাত হৃদয়বৃত্তিপ্রসূত ভালোবাসা। চিঠির জবাব দিতে একটা দিনও দেরী করেনি মহেন্দ্র। লিখেছে: 'ভাবের জগতে তুমি আমি এক হলেও পথ আমাদের বিভিন্ন। জীবনে তুমি আমি একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও জীবন-দর্শন আমাদের স্বতন্ত্র। যে অনুভূতি থেকে আমি জীবনটাকে ফট্‌কা বাজারে বিকিয়ে দিয়েছি, সে অনুভূতি একান্ত আমারই। জীবন নিয়ে তুমি যেন আমার মত পাশা খেলো না। কাব্যে আর যা না হোক, চিত্তের আনন্দ আছে। সে আনন্দ থেকে যেন জীবনকে বঞ্চিত করোনা

ছন্দাও ইতিমধ্যে একদিন এমন্‌ই একটা উক্তি ক'রেছিল। বড় কথা, কঠিন কথা বুঝবার মতো জীবনে সে শিক্ষা পায়নি কোনোদিন। কিন্তু কাব্যের মধ্যে জীবনের যে এক অপরিসীম রসানুভূতি আছে, একথা সে মনে মনে প্রথমদিনই উপলব্ধি ক'রেছিল—যেদিন কলেজ ম্যাগাজিনে নতুন কবিতা লিখে শারদীয় উপহার নিয়ে এসেছিল সে দৌলতপুর থেকে। সেদিন বিজুদাকে ছেড়ে তার কবিতার দিকে লক্ষ্য যায়নি, গিয়েছিল পরে—যেদিন বিজুদার অভাব ঘটলো তার জীবনে।

কিন্তু ছন্দার উক্তির উত্তর খুঁজে পায়নি বিজন। উত্তর সে নিজের কাছেই দিতে পারেনি। একদিন স্বপ্ন ছিল তার—বড় কবি হবে সে, বড় শিক্ষাব্রতী হয়ে দেশের আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে। মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল সে মাকে। কর্পূরের মতো সে সঙ্কল্প অলক্ষ্যেই কখন্‌ উড়ে গেল। আজ শুধু হাহাকার আর আত্মানুসন্ধান।...

বিজনের গ্রামে আসার খবর পেয়ে পরের দিনই চাষীপাড়ার তসর আলীরা এসে দেখা ক'রে গিয়েছিল। আড়ালে থেকে ফসলের কথাটা একবার উল্লেখ ক'রেছিলেন নির্ম্মলা, কিন্তু সেদিকে কান দেয়নি বিজন। এবারে সে নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে চাষিদের সাথে ক্ষেত-খামারের তদারকে লেগে গেল। চাষিদের সাথে ব্যবধান রচনা ক'রে তালুকদারী সম্মানের বালাই নিয়ে বেঁচে থাকা ঘৃণ্য-জীবনের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিজন অন্ততঃ সে-ইতিহাসের প্রতিলিপি থেকে দূরে থাকতে চায়। চাষির সরিক-জন হয়ে তাদের সঙ্গেই আনন্দে কাটুক তার আগামী দিনগুলো। তাতে যে নিজের ভাগের অন্নে অন্ততঃ টান পড়বে না, একথা নিশ্চিত।

চাষিদের মধ্যে এবারে এক নূতন চেতনা দেখা দিল। তসর আলী ব'ল্‌লো, 'এ যে আমরা হাতে আশমান

পেলাম দাদাবাবু। সংসারে লেকা-পড়ার গুণই আলাদা। লেকা-পড়া জান্‌লি মানুষ দেব্‌তা হয়। তুমি আমাদের দেব্‌তা, দাদাবাবু।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষ মানুষই, সে দেবতাও নয়, পশুও নয়। ধর্ম্মে আছে— সব মানুষই সমান। তোমার আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই তসর।'

এ আজ নতুন কথা শুন্‌লো তসর আলী। এতদিন তারা জেনে এসেছে—মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা উপরে খোদাতালা আর নিচে জমিদার ও তালুকদার মহাজন। তারা সেবাইৎ মাত্র, অধিনস্থ প্রজা আর আজ্ঞাবাহী গোলাম। তাদের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক শুধু খাজনা আর ফসল নিয়ে। জমিতে বুকের রক্ত ঢেলেও জমি তাদের অধিকারে নয়, এক্তিয়ারে মাত্র। পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ ক'রবার মতো সম্পর্ক তাদের জমির সঙ্গে। যথাসময়েই বিনা নোটিশে মালিকের জিনিষ মালিকের হাতেই ফিরে যায়। তারা কৃপার ভিখারী ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু মানুষে মানুষে এই সমতার কথা শুন্‌লো সে আজ এই প্রথম। তবু কণ্ঠে সংশয়ের সুর টেনেই সে ব'ল্‌লো, 'পার্থক্য কেন নেই দাদাবাবু, তুমি আমি কি এক হলাম? আমরা ছোট নোক, মুখ্যু চাষা, তোমার পায়ের যুগ্যিও নই।'

—'ছিঃ, এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে নেই তসর।' সস্নেহ কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষ মানুষের দাস নয়, মানুষ তার অবস্থার দাস। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এমন যে, কেউ দুরবস্থায় প'ড়লে সবল এসে দুর্ব্বলের ঘাড়ে চেপে বসে। এম্‌নি ক'রে চেপে চেপেই সমাজে এক শ্রেণীর বিত্তশালীর সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এ যে কত বড় মিথ্যা আর কতবড় অন্যায়, সে কথা ব'ল্‌বার নয়। আসলে সৃষ্টির দিক্‌ থেকে কোনো মানুষই কোনো মানুষ থেকে পৃথক নয়। আমাদের তেমন শিক্ষা নেই ব'লেই এতকাল আমরা ভুল বুঝে এসেছি তসর।'

তসর আলীর মুখে এবারে আর কথা যোগালো না। বহুক্ষণ ধ'রে অভিভূত দৃষ্টিতে সে বিজনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় মাথা নিচু ক'রে বিনীতকণ্ঠে ব'ললো, 'আমার মোনাকে কিছু নেকাপড়া আর বিদ্যেবুদ্ধি শিখিয়ে একটু মানুষ করে দেও, দাদাবাবু। একটা মাত্র ছাওয়াল, কিছু নেকাপড়া শেখে, এই ইচ্ছে।'

উৎসাহিত কণ্ঠে বিজন বল্‌লো, 'শেখাবো বৈ কি. নিশ্চয়ই শেখাবো। শুধু মোনা নয়, মোনার মতো আরও যারা গ্রামে ছড়িয়ে র'য়েছে, তারা সকলেই যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'তে পারে—সেই ব্যবস্থাই ক'রবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তসর।'

উত্তরে কৃতজ্ঞতাসূচক কি একটা ব'ল্‌তে গিয়েও বল্‌তে পারলো না তসর আলী। কণ্ঠে তার ভাষা দেননি খোদাতালা। মনে মনে সেই খোদাতালার কাছেই একবার সে দীর্ঘজীবন কামনা ক'রলো বিজনের জন্য।

থেমে বিজন বল্‌লো, 'জমির দিকে তাকালে আজ কান্না আসে। কাঠফাটা রোদে খাঁ খাঁ ক'রছে জমি। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি না হ'লে এ জমি যে রাক্ষসী হ'য়ে আমাদেরই গিলবে। তাতে তুমি আমি কেউই বাঁচবো না তসর। ক্ষেত নিয়ে যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের অন্ততঃ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এ কাজে হাত দেওয়া উচিৎ।'

—'এখানে কেউ কি কারুর কথা শোনে দাদাবাবু যে, সেচের ব্যবস্থা করবে!' তসর আলী বল্‌লো, 'বুঝোয় বা কে, কাজই বা করে কে? মালিক তার প্রয়োজন মিটলেই ঘরে গিয়ে খিল আঁটেন; গরীব চাষাদের ক্ষ্যামতা কি গাঁটের পয়সা খরচ করবার! মেহনতিই শুধু সার।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'মেহনৎ মিথ্যা যায় না, মেহনতেরও মূল্য আছে। সবাইকে বুঝিয়ে সেই মূল্য আদায় ক'রে নিতে হয়, তাতে আর কিছু না হোক—অন্ততঃ পরনের কাপড় আর পেটের দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা ঠিক্ থাকে। কাজের কথা বুঝিয়ে বল্‌লে মালিকেরাই বা গররাজি হবেন কেন!'

কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর তসর আলীও জানে না। সে বাড়ুজ্জেদের জমি ভিন্ন আরও দু'তিন জন মালিকের জমিতে ভাগ-চাষের কাজ করে। কিন্তু ঐ চাষ পর্য্যন্তই, জমির উন্নতির কথা নিয়ে মালিকের সাম্‌নে গিয়ে

দাঁড়াতে কোনোদিন সাহস হয়নি, আজও হয় না। তাতে নিজের অদৃষ্টের যে দুঃখ, তাকে একান্ত 'নসিব' ব'লেই মেনে নিতে হ'য়েছে। বিজনের কথায় আজ তাই প্রাণে বড় সাড়া পেলো সে। ব'ল্লো, 'এ ব্যবস্থাও তোমাকেই ক'রতে হবে দাদাবাবু। তোমাকে দেব্‌তার মতো পেয়েছি, এবারে যদি আমাদের নসিবের দুঃখ কিছু ঘোঁচে।'

বিজন ব'ল্লো, 'সংসারে কেউ কারুরটা ক'রে দিতে পারে না তসর। প্রত্যেকেরই পেটের চিন্তা আছে, সেই চিন্তাই তাকে কাজে উৎসাহ দেয়। মালিকদের সঙ্গে কথা ব'লে এ ব্যবস্থা তোমাদের নিজেদেরই ক'রতে হবে। প্রয়োজন হ'লে আমি সাহায্য ক'রবো।'

শেষ পর্য্যন্ত তসর আলীরাই কয়েকজনে উদ্যোগী হ'য়ে মালিকদের সাম্‌নে গিয়ে আবেদন নিয়ে দাঁড়ালো। বলা বাহুল্য, আবেদনে ফল হ'লো, এবং হ'লো অবশেষে বিজনের মধ্যস্থতাতেই। চাষিদেরই লাভ হ'লো তাতে। প্রয়োজনীয় ফসলের সময় ভিন্ন বছরের বাকী সময়টা মালিকদের ঔদাসীন্যে অধিকাংশ জমিই অনাবাদী প'ড়ে থাক্‌তো। তাতে মালিকের ঘরে টান না প'ড়লেও টান্‌ পড়তো চাষিদের। এ সময়টা অন্য কাজ ক'রে তাদের খেটে খেতে হ'তো। এবারে নতুন জল-সেচের ব্যবস্থায় বারোমাসি একটা পাওনা দাঁড়িয়ে গেল তাদের। দারিদ্র্যের মধ্যে কিছুটা স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে বাঁচলো তারা। সারা চাষিপাড়ায় ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল বিজনকে নিয়ে। সবাই যে তারা তার এক্তিয়ারের লোক, তা নয়; কিন্তু সকলের মঙ্গল যে বিশেষ একজনকে কেন্দ্র ক'রে, এবং সেই বিশেষ একজন যে তাদের কেউ না হ'য়েও সকলের চাইতেই আজ আপন, এই কথাটা ভেবেই বিজনের প্রতি তাদের হৃদয় আপ্‌নি থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে প'ড়লো।

এরপর বোধ করি সপ্তাহখানেকও কাট্‌লোনা। চাষি-পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নতুন এক পাঠশালা খুলে ব'স্‌লো বিজন। সমস্ত চাষিদের মধ্যে সেদিন কি উৎসাহ! আনন্দের বন্যা ব'য়ে গেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে। সবার হাতে হাতে শ্লেট-পেন্সিল, প্রথম ভাগ আর ধারাপাত। সংখ্যায় তারা একশোর কম হবে না। বিজন গুরু হ'য়ে ব'স্‌লো শাসনের বেত হাতে নিয়ে নয়, স্নেহের অঙ্গুলি প্রসারিত ক'রে। চালাঘর নেই, ছাউনি নেই, গাছের ছায়ার নীচে সবুজ ঘাসের গালিচায় রচিত আসন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় ক'রে ব'সে সুর ক'রে প'ড়তে সুরু ক'রে দিল প্রথম ভাগের বর্ণানুক্রমিক ফলা-বানান আর কড়াকিয়া-গণ্ডাকিয়া। শ্লেটের বুকে ফুটে উঠ্‌লো অপটু হাতের অক্ষম অক্ষরগুলো। সস্নেহ কণ্ঠে গুরু মন্ত্র দিল: 'বলো - না ব'লে কেউ কারুর জিনিষ নেবো না, কেউ কাউকে আঘাত ক'রবো না, মিথ্যা বা কটু কথা ব'ল্‌বো না, গুরুজনকে ভক্তি ক'রবো, পরের সাহায্যে এ জীবন ব্যয় ক'রবো, নিজের মতো ক'রে ভালো বাস্‌বো সকলকে; উঁচু নীচু ব'লে কোনো জাত নেই, সকলেই আমাদের আপন,সকলেই আমাদের ভাই।'

একসঙ্গে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হ'য়ে উঠ্‌লো এই মন্ত্র, প্রথম সূর্য্যোদয়ের এই জীবনবেদ। তারপর দল বেঁধে সকলের একসঙ্গে ছুটি। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নেয় বিজন।—এরাই ভবিষ্যৎ জাতির মেরুদণ্ড। বলা যায় কি—এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোনো নেপোলিয়ান, লেনিন কিম্বা রবীন্দ্রনাথ। দেশকে এগিয়ে নেবে এরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আর স্বাধীনতায়। কৃষিলক্ষ্মীর অমৃত আশীর্ব্বাদে দেশ হবে কিষাণ-রাজ্য। মাটির মানুষ দু'টো ধানের জন্য সেদিন আর বুক ফেটে কাঁদবে না; দেশ হবে শান্তির অমর তীর্থ।

আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত্তে মাঝে মাঝে নতুন এক উজ্জ্বল জীবনের ফতোয়া এসে বিহ্বল চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে যায় নতুন ক'রে তখন মাথা তুলে দাঁড়াতে সাধ যায় বিজনের।

কিন্তু গ্রামের চক্রবর্ত্তী-বাচস্পতিদের কাছে বিষয়টা কেমন যেন বড় বাড়াবাড়ি ব'লে বোধ হ'লো। তার সঙ্গে এখানকার ভীষণ এবং সাহসী পুরুষ হরি মুখুজ্জে ও তাঁর বিধবা পিসী সুখদা ঠাক্‌রুণের যোগাযোগটাও নিতান্ত বহিরাঙ্গীক রইল না। সুখদা ঠাক্‌রুণকে মেয়ে মহলে গ্রামের গেজেট ব'লে জানে সকলে। পাড়া চড়িয়ে সে-ই যখন-তখন এক-একটা উদ্ভট আবিষ্কার নিয়ে গলা বাজিয়ে বেড়ায়। হরি মুখুজ্জেও তাতে কম যান

না। পিসী-ভাইপোতে একেবারে রাজজোটক। তারাই সারা গ্রাম ভ'রে ছি ছি ক'রে বেড়ালো। বাড়ুজ্জেদের ছেলের শেষে এই কাণ্ড, ক'লকাতা থেকে শেষটায় কেউকেটা হ'য়ে এসে ছোটলোকদের নিয়ে মেতে উঠেছে।

কিন্তু সংসারে কে ছোটলোক, কে ভদ্রলোক—তা কারুর গায়ে লেখা থাকে না। তা নিয়ে জবাব দেওয়াও বাতুলতা।...

একসময় নির্ম্মলা বললেন, 'না পারলি ক'লকাতা থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসতে, না রাজি হলি এখানকার মাষ্টারী নিতে। শেষ পর্য্যন্ত এ তোর কী খেয়াল হলো বাবা? চাষির ছেলে চাষী হ'য়েই একদিন হালচাষ ক'রবে, মগজে কতকগুলো বইয়ের বিদ্যে নিয়ে ওরা কি ক'রবে বল্ তো?'

কথাটা বড় আঘাত ক'রলো বিজনকে। একবার ব'লতে গেল, 'ও তুমি বুঝবে না মা।' কিন্তু যত স্পষ্ট ক'রে সে বলতে চাইল কথাটা, তত স্পষ্টভাবে জিহ্বায় এলো না। থেমে ব'ললো, "আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েরাই ছেলে মেয়ে, আর ওদের ঘরের ছেলেমেয়েরা কেউ নয়; মা হ'য়ে এমন কথাও তুমি ভাবতে পারো?'

ছেলের মনের কথাটা বুঝতে এতটুকুও বেগ পেতে হ'লোনা নির্ম্মলাকে। বললেন, 'আমি কি তাই ব'লেছি বাবা?'

বিজন সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের কথাটারই পুনরাবৃত্তি ক'রে বললো, 'ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে-দের পিছনে অর্থ ব্যয় করবারও যেমন মানুষ আছে, শিক্ষকেরও তেম্নি অভাব নেই তাদের। কিন্তু হতভাগ্য এই দরিদ্র চাষীদের কথা একবার ভেবে দেখ তো মা, ওদের না আছে অর্থ, না আছে মানুষ হ'য়ে উঠবার কোনো পথ। ফ্রান্সের মতো রাশিয়ার মতো দেশে শুনতে পাই চাষিরা পর্য্যন্ত সংবাদপত্র পাঠ ক'রে জগতের ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলে। আর হতভাগ্য এই ভারতবর্ষ—এই বাংলা দেশ, এখানে আজ পর্য্যন্ত ভদ্রলোকেরই কিছু একটা শিক্ষার মান দাঁড়ালো না, নিচুতলার মানুষদের কথা তো স্বতন্ত্র। অথচ ওরা শিক্ষিত হ'য়ে সমাজের ভালোর সঙ্গে নিজেদের ভালোর কথা বুঝতে শিখলে গোটা দেশেরই যে তাতে উন্নতি! চাষির ছেলে চাষি হ'য়েই হাল চাষ ক'রবে, কিন্তু সে আর এক মানুষ: আজকের চাষি আর সেদিনের চাষিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমি শুধু সেই সুরটাই ধ'রিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রছি মা। এ পোড়া বাংলা দেশে ওদের শিক্ষার কথা ক'জনেই বা ভাবে বলো?'

বিষয়টাকে কিন্তু এত গভীর ভাবে আগে চিন্তা ক'রতে যাননি নির্ম্মলা। সুখদার গলাবাজিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। এবারে ছেলের জ্ঞান ও নতুন এই সমাজ-শিক্ষার প্রতি তার আন্তরিকতার কথা ভেবে সারা হৃদয় তাঁর এক অপরিসীম মুগ্ধতায় ছেয়ে গেল। বিজনের কথা থেকে এটুকু অন্ততঃ তিনি বুঝে নিতে পারলেন যে, যে কাজে সে হাত দিয়েছে—তার মধ্য দিয়েই একদিন সে অমর হ'য়ে উঠ্বে। মা হ'য়ে সন্তানের সেই অমরত্ব যে নির্ম্মলাও চান। মনে মনে বিজনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'সারা দেশ যেখানে পিছিয়ে আছে, সেখানে সামান্য এই গ্রামের উন্নতিতে কতটুকুই বা কাজ হবে বাবা?'

—'অনেক কাজ হবে মা।' বিজন ব'ল্লো, 'একটা গ্রামের উন্নতি—সেই কি কিছু কম! এর আলো ছড়িয়ে প'ড়বে সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে। গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কংগ্রেস আজও রূপ দিতে পারেনি। তারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে এগিয়ে গেছে, কিন্তু যাদের নিয়ে স্বাধীনতা—তাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই তারা হাতে নেয় নি। ইংরেজ চ'লে গেলেই যেন দেশ রাতারাতি শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে! তাই কি কখনও হয় মা?'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্ম্মলা। একটা কথা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, গ্রামের মাটির বুকে ধ'রে রাখলে আজ হয়ত এতখানি জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারতো না বিজন; এ জ্ঞান, এ বুদ্ধিবৃত্তি তার দৌলতপুর আর ক'লকাতার জীবনেরই সঞ্চয়। ডিগ্রী নিয়ে ঘরে

ফিরতে না পেরেছে, না পারুক্; কিন্তু যে মাথা নিয়ে ফিরেছে সে, সেই মাথাই বা এ গাঁয়ে ক'টা আছে! হরি মুখুজ্জেরা যে তার পায়ের যুগ্যিও নয়। তাদের মুখ একদিন আপ্‌নি থেকেই বন্ধ হবে।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমার ইচ্ছে ছিল, আমি স্কুলমাষ্টার হই মা, তোমার ইচ্ছাই আমি পূর্ণ ক'রেছি। পুরনো স্কুলে ত্রিশ টাকা মাইনেয় আমি যে ছাত্র পেতাম, আমার এই নতুন পাঠশালায় বিনে মাইনেয় তার চাইতে ঢের বড় ছাত্র পেয়েছি। ওরা সোনা হ'য়ে একদিন আমাকে সোনা উপহার দেবে দেখো।'

—'তাই যেন হয় বাবা। ভগবান তোর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। সংসারে মায়ের আশীর্ব্বাদের যদি কিছুমাত্রও জোর থাকে, তবে আমি শুধু এই আশীর্ব্বাদই তোকে করি বাবা। তুই যে আমার সাত রাজার ধন, আমার চোখের মণি।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলেন না নির্ম্মলা, কোথায় একদিকে নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

বিজন কতক্ষণ যে সেই দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল, ব'ল্‌তে পারবো না। পরে কাগজ কলম টেনে নিয়ে কি একটা লিখতে সুরু ক'রে দিল। পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার কাজ বেড়েছে বহু। নতুন জগতে নতুন মানুষ সৃষ্টির ডাক শুন্‌তে পেয়েছে সে, সে ডাক্‌কে কি উপেক্ষা করা চলে? [ক্রমশঃ

কৈফিয়ৎ

বটকৃষ্ণ দে

তোমার নামে কবিতা লিখি এতেই এতো কথা!
না-জানি তবে, বলি-ই আমি তোমায় ভালোবাসি
পৃথিবী বুঝি হবেই দ্বিধা, হবেই নিশ্চিত,—
বল্‌বে তুমি: "হয়েছে, কবি, থাক্, এ-কাব্যতা,
নাই-বা হ'লে প্রেমের নামে অতোটা উচ্ছ্বাসী,
বয়সটা বলো প্রেমের তরে কী আর পরিমিত।"

তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখি এতেই এতো রাগ,
না-জানি তবে, বলি-ই যদি, তোমাকে আমি চাই,
চোখের দেখা, মুখের কথা তা' হ'লে বুঝি ঠিকই
বন্ধ হবে, ফাগুনে আর ফুল-ঝরা পরাগ
ঝরবে না তো! কিন্তু, ভাবো, তুমিই যদি নাই,
কাব্যে, তবে থাকবে বলো কী-সের ঝিকিমিকি!

তুমিই যদি বিরূপ তবে কবিতা কেন আর!
একটি বারো ভাববে নাকি আমারো কথা আছে,
আমারো মন অনুক্ষণ কাহারো ছায়া যাচে,
দগ্ধ দিন কঠিন হয়ে যখনি হয় ভার,
তখন কার নামের নীল, নীলের ছোঁয়া ছুঁয়ে
বাঁচবো, বলো,—হৃদয় পাবে একটুকু আশ্রয়,—
চলবে কেন এতেই তবে পড়লে ভয়ে নুয়ে—
আমার তরে পারবে না কি দিতে এ-লাজ ভয়?

তা' হ'লে, শোন, আমার শেষ কথাটি শোন তবে,
তোমার তুমি তোমারি নয়, যখুনি একবার
দিয়েছো ধরা, গেয়েছো গান, তখুনি তুমি আর
তোমার নও; পাও-ই যদি কাব্য-নায়িকার
দাবী, তখন, বলো এমন কী আর অশোভন!
ঔচিত্যের ঘেরা-এ-তার ভেঙেছে তাই মন?

এমন বলো কী আর ক্ষতি আমার এ-উপমা
করেই যদি তোমায় আহা, করেই রূপবতী—
তা' হ'লে হায়, বলেই না কি হবে এমন ক্ষতি,—
যে-ক্ষতিটুক্ জীবন জেনে, জানবে না কো ক্ষমা!

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যা

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল মাথাধরার প্রাবল্য এত বেশী, যেন এক অভিসম্পাতের বিষয় হয়ে পড়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই কপাল টিপ টিপ করতে সুরু করলো। দিন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরার প্রচণ্ডতাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পরে সন্ধ্যের দিকে হয়ত কমে গেলো। এ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে অনেকের। দোষটা বেশীরভাগ সময় চোখ দুটোরই ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। অথচ পরীক্ষা করলে দেখা যায় তাদের বিশেষ কোন দোষ নাই। কেননা দেখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বিকেলের দিকে মাথা ব্যথা হলে হয়ত মনে করতে পারা যায়—চোখের ক্লান্তি বশতঃ হয়েছে। কিন্তু সকালের দিকে সে প্রশ্ন তো আসে না। চোখের কাজ তো তখন আরম্ভই হয়নি বলতে গেলে। একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এর পেছনে কি গূঢ় রহস্য বিদ্যমান!

আমরা চোখের চেয়ে মন দিয়েই দেখি বেশীর ভাগ। কথাটা হয় তো একটু হেঁয়ালীর মত বোধ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক তা নয়। এর প্রমান আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই বর্ত্তমান। বাড়ীর পাশে ফেরিওয়ালা কতকগুলি পণ্য বিক্রয়ের জন্য সাজিয়ে রেখেছে। ছেলে বন্ধুদের নিয়ে গল্পে মশগুল। তাকে যদি তখন বলা হয় চট করে দেখে আসতে কি কি জিনিষ বিক্রি হচ্ছে! অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদেশ পালন করতে তাকে যেতে হলো জিনিষ দেখতে। কি দেখলো জিজ্ঞাসিত হলে হয়ত দু'চারটা নাম ঠিক বলতে পারবে, আর অনেক কিছু এলোমেলো ভাবে গোঁজামিল দিয়ে বলে যাবে। এ ক্ষেত্রে 'চোখ' দিয়ে অনেক কিছুই দেখেছে সে, কিন্তু 'মন' দিয়ে দেখেনি বলেই সব ঠিক মত বলতে পারে নি। তাহলে প্রকৃত দেখা নির্ভর করছে মনের সুষ্ঠু অবস্থার উপরে। মন যদি ক্লান্ত থাকে আর তার ওপর দেখবার প্রচণ্ড চাপ যদি পড়ে তা হলে মনের আধার মগজের স্নায়ুপুঞ্জে আঘাত লাগবেই। আঘাত থেকেই বেদনার উৎপত্তি। তাই মাথা ব্যথা। ঠিক এই কারণেই যে সিনেমার দৃশ্যসমূহ সম্যক্ আগ্রহ উৎপাদনে অক্ষম, সেখানেই হয় দৃষ্টিক্লান্তি আর মাথাধরা। লোকের উপরোধে পড়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গানের মজলিসে গিয়েও মাথাধরার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। অথচ অন্যদিকে সারাদিনের আফিসের কাজের পর চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—বেশ একটু মাথাও ধরেছে—কোন কাজে মন বসছে না। তখন যদি একখানা খুব চিত্তাকর্ষক বই পড়তে সুরু করা যায়—তখন মাথাধরা কোথায় চলে যাবে তার ইয়ত্তাই থাকবে না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বই শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর উঠতেই ইচ্ছা করবে না। ক্লান্ত চোখের শ্রান্তি কেটে গিয়ে যেন শান্তি এনে দিয়েছে ঐ বইখানা।

এখন সকালের ঐ মাথাধরার পেছনে রয়েছে রাত্রে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নজনিত মানসিক অবসাদ। ঘুমের অন্তরালে মন তার বাস্তবতাকে হারিয়ে ফেলে আলেয়ার পেছনে ছোটার মত অবিরাম গতিতে অবাস্তব দুঃখদায়ক দৃশ্যাবলীর স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হয়। তারই প্রতিক্রিয়া সকালের এই মাথাধরা। ঘুমের প্রতিটি মুহূর্ত্ত স্বপ্ন-বিজড়িত। মন সেখানে অত্যন্ত সক্রিয়। স্বপ্নের গতি-বেগ এতই প্রচণ্ড যে বাস্তব জীবনে দশ বৎসরের ঘটনার দৃশ্য দেখতে দশ মিনিট সময়ও লাগেনা। মনকে অবিরাম গতিতে চালিয়ে নিয়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিদ্রার অন্তরালে। ঘটনার সমাবেশে মনকে যখন প্রফুল্ল রাখে তখনই সেই ঘুম 'সুখনিদ্রা' নামে অভিহিত হয়। মনের সব জড়তা, সব ক্লান্তি দুর করে দেয় দু'চার ঘণ্টার এই 'সুখনিদ্রা'। ফলে প্রভাতে শরীর ও মন নূতন উৎসাহে কর্ম্মে অবতীর্ণ হতে পারে। 'সুখনিদ্রা'

সারাদিনের ঘাত প্রতিঘাত বিক্ষুব্ধ মনের সমস্ত ক্ষত নিরাময় করে দেয় যাদুকরের যাদুদণ্ডের মহিমার মত। তাই মনের উপর স্বপ্নজনিত কোন রেখাপাত হয় না বলেই সকালে স্বপ্নের কথা প্রায়ই মনে থাকে না। পক্ষান্তরে দুঃস্বপ্ন মনের ওপর এমনই গভীর রেখাপাত করে যার জন্য জাগ্রত অবস্থার পরেও সেই সব দৃশ্যাবলী যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়িয়ে মনকে অবসাদগ্রস্ত করেই রাখে। তাই নিদ্রা শ্রান্তি দূর করার পরিবর্ত্তে ক্লান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে প্রায়ই মাথা ব্যথা নিয়েই ঘুম থেকে উঠতে হয়।

মনোরাজ্যে দুঃস্বপ্নের প্রতিক্রিয়া আমরা উপলব্ধি করতে পারি স্বপ্নাবস্থায় নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও কথা বলার মধ্যে। ভীতিজনিত গোঁ গোঁ শব্দ করা, কান্না, বকাবকি, হাত পা ছোড়া এ সব তো প্রতি সংসারে নিত্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় সময়েই দারুণ উৎকণ্ঠা নিদ্রাভঙ্গের কারণ হয়। তখন বুক ধড়ফড়ানি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তা এতই প্রবল আকার ধারণ করে যেন ভয়ের সমস্ত কারণ বাস্তবরূপ নিয়েই সম্মুখে উপস্থিত হয়। মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় -এক ঘটি জল পান করলে তবে যেন ধাতস্থ হওয়া গেল বলে মনে হয়।

আমরা ঘুমুই কেন? কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে সারাদিনের দৈহিক পরিশ্রম মাংসপেশীগুলোকে ক্লান্ত করে দেয়। আর দেহের মধ্যে এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন এনে দেয়—যার ফলে রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারধর্ম্ম কমে গিয়ে অনেকটা অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অম্লত্ব মগজের স্নায়ুমণ্ডলিকে বিষাক্ত করে দিয়ে অবসন্ন করে দেয়। তখনই আমাদের চৈতন্য লোপ হয়—যার অভিব্যক্তি হলো "ঘুম"। আবার ঘুমের মধ্যে এই অবসন্ন দেহে কোনরূপ সঞ্চালন না থাকায় এবং মাংসপেশীগুলি আমাদের খাদ্যের মধ্য থেকে উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করে পুষ্টিলাভ করাতে নূতন করে এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে,—যার ফলে রক্তের অম্লত্ব কেটে গিয়ে ক্ষারধর্ম্মে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখনই আভ্যন্তরিক স্বয়ংক্রিয় বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্নায়ুমণ্ডলী আবার সতেজ হয়ে ওঠে। আমাদের ঘুমও তখন ভেঙ্গে যায়।

এখানে ঘুমের মূলে আছে দৈহিক পরিশ্রম। তাই আমরা দেখতে পাই যারা সারাদিন খুব পরিশ্রম করে তারা রাত্রে খুব শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ে; আর এক ঘুমেই রাত কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ পরিশ্রমের মাত্রা যাদের খুব কম এই হিসাবে তাদের ঘুমে অনেক বাধা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায়ই দেখা যায়। শ্রমবিমুখ আয়েসী অনেকে দিনে এবং রাতে প্রায় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘুমের অন্য কারণও থাকা সম্ভব। তখন কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভিন্নমত ব্যক্ত করলেন। তাঁদের মতে মগজে সাময়িক রক্তক্ষীণতাই ঘুমের কারণ। সাময়িক রক্তক্ষীণতা মগজের স্নায়ুপুঞ্জকে আশানুরূপ উত্তেজিত অবস্থায় রাখতে না পারার ফলে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখনই চেতনার লুপ্তি হয়, অর্থাৎ আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। মগজের এই সাময়িক রক্তক্ষীণতা যদি কোন কারণে হঠাৎ বেশী হয়ে পড়ে, তখনই আমরা অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হই। ভয়, আঘাতজনিত রক্তক্ষয়, শরীরের অনেকটা জায়গা আগুনে পোড়া, এমন কি খেলার ছলে পেটে প্রচণ্ড ঘুঁসি ও একই কারণে অচৈতন্যতার কারণ হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন আসে ঠিক সময় বুঝে কেমন করে মগজে রক্তক্ষীণতা অবস্থার সৃষ্টি হয়? আমাদের এই কয়েক ইঞ্চি পরিমিত উদর গহ্বরে প্রায় ত্রিশ ফুট ব্যাপী পরিপাক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট। পেট ভরে খাবার পরে, ঐ খাদ্য পরিপাক করবার জন্য সেখানে রক্তে আধিক্য হয় প্রচুর। ফলে দেহের অন্যান্য জায়গার রক্তে টান পড়ে। সেইসব জায়গায় রক্ত সঞ্চালিত হয় কম। তেমনি ক'রেই মগজের রক্ত কমে যায়, ফলে ঘুম আসে। আমরা প্রত্যেকেই এ অবস্থার ভুক্তভোগী। দুপুরে ভাত খাবার পরেই ঘুমের ভাব আসে। তখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ব'লেই ঘুমের সজসুখ থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত হই। কিন্তু রাত্রে তো এ প্রশ্ন থাকে না। তাই খাবার পরে ঘুমের আবাহনের পরিবেশ সৃষ্টি করি—ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে।

শুধু যে পরিপাক যন্ত্রই শরীরের বেশীর ভাগ রক্ত শোষণ ক'রে নিচ্ছে তা নয়। আমাদের এই বিস্তীর্ণ গাত্র চর্ম্মও সারা দেহের রক্তের তিন ভাগের এক ভাগ রক্ত নাকি আটকে রাখতে পারে। শীতকালে ঠাণ্ডা বিছানার সংস্পর্শে আসলেই যেটুকু ঘুম এসেছিল, তাও চলে যাবার মত হয়। কিন্তু কিছু সময় পরে লেপের গরমে একদিকে চর্ম্মের রক্তবাহী শিরাসমূহ প্রসারিত হওয়ায় সেখানে রক্তের আধিক্য হয়; তেমনি অন্যদিকে 'বেনের পুঁটুলির' মত কুঁকড়ে শোয়াতে দেহের মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার রক্তবাহী শিরাও সঙ্কুচিত হয়। ফলে সেখানে আপনা-আপনি রক্ত চলাচল হয় কম। এমনি ক'রেই গাত্র চর্ম্ম ও পরিপাক যন্ত্র দেহের বেশীর ভাগ রক্ত শোষণ ক'রে নিয়ে আমাদের ঘুমের সহায়তা করে। প্রকৃতি তার আপন নিয়মে মগজে রক্তক্ষীণতার সৃষ্টি করছে এই রকম করে। আমরাও তাকে সাহায্য করছি যথেষ্ট। উঁচু বালিশে মাথা রাখি ব'লে দেহের তুলনায় মাথাও থাকে উঁচুতে। এখানেও বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী জলীয় রক্ত 'নীচু বিনা উঁচু কভু যায় না' বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। তাই মগজে রক্ত চলাচল কম হবার সুযোগ আমরা ক'রে দেই। সেই রকমেই আমরা ছন্দযুক্ত পা-দোলানোর মধ্যে দিয়ে নিম্নাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি দ্বারা মগজে রক্তাল্পতার সৃষ্টি ক'রে ঘুমের আবাহন করি।

কিন্তু এ নিয়মেরও তো ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। দারুণ শীতে সামান্য এক টুকরা কাপড় গায়ে, অভুক্ত অবস্থায় উন্মুক্ত পথপার্শ্বে অনেক অভাগা বেশ সুখে নিদ্রা যায়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, এসব ছাড়াও ঘুমের অন্য কারণ বিদ্যমান। তাই কোন কোন পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন—"আমরা ঘুমুতে চাই বলেই আমাদের ঘুম আসে।" তাঁদের মতে বাস্তব জগতের প্রতি যতক্ষণ আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমাদের চেতনা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকবে। যখনই মনোযোগের আকর্ষণ কমতে থাকবে, তখনই নিদ্রার অনুভূতি আসবে। যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই 'হাই তোলার' মধ্যে, অবশ্য আমাদের অজ্ঞাতসারে। এই 'হাই তোলার' মধ্য দিয়ে মন নিজেকে সজাগ রাখতে চেষ্টা করছে—নিদ্রালুতা নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। 'হাই তোলা' মানে জোরে এক গভীর নিশ্বাস লওয়া মুখ দিয়ে। এর ফলে দেহে বেশ একটু রক্তসঞ্চালনের সৃষ্টি করা হলো; তাতে জড়তা কমাতে সাহায্য করলো। গভীর নিশ্বাসের ফলে খুব খানিকটা অক্সিজেন-পরিপুষ্ট রক্ত দেহে সঞ্চালিত করা হলো—যার ফলে কয়েক ঝলক রক্ত মগজে বেশী যাওয়াতে রক্তহীন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। ঘুমের ভাবটা ক্ষণিকের জন্য কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে মন যদি বাস্তবের বৈচিত্র্যে আবার আকৃষ্ট হতে পারে—ঘুম তখন একেবারেই চলে যাবে। আর যদি মনোযোগের আকর্ষণ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে, তখন হাই তুলতে তুলতে কোন এক সময় দেখা যাবে সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ হয়ে গেছে।

সভ্যতার আভিজাত্য-মণ্ডিত বাস্তব জগতের বৈচিত্র্যের আকর্ষণ মনকে সতত সচেতন রাখতে চেষ্টা করে। অন্য দিকে তেমনি আদিম সহজাত প্রেরণা মনকে সর্ব্বদা প্রলুব্ধ করতে চায় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে। এমনি করেই চলেছে দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত। আদিম প্রবৃত্তির মোহ যখনই জয়লাভ করে, তখনই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আর মন তার বাসনার তৃপ্তি করে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে—সেখানে না আছে সমাজশাসনের বাধা, না আছে আইনের গণ্ডি, না আছে সভ্যতার কৃত্রিম আবরণ। মন পায় এক অনাবিল উন্মুক্ত আনন্দ। রূঢ় দিনের আলোক যখনই মনকে বৈচিত্র্যময় বাস্তব জগতের প্রতি আকৃষ্ট করতে আরম্ভ করে তখনই ঘুম ভেঙে যায়।

'এ যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম' এ অপবাদ অনেকেই পেয়ে থাকেন। এ ঘুমের বিশেষত্ব এই যে, ঘুমের অন্তরালে বাইরের শত উত্তেজনা যেন মনকে কিছুমাত্র আলোড়িত ক'রতে পারে না স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র আকর্ষণ থেকে। তাই ঘুমন্ত ব্যক্তি যেন 'মড়ার মত' পড়ে ঘুমোয়। স্বপ্নের আনন্দে এতই বিভোর যে তার মুখের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনরূপ স্পন্দনের বাহ্য প্রকাশও থাকে না। এখানে বাস্তবের বৈচিত্র্য থেকে মন কোন আনন্দ না পাওয়াতে সেটা স্বপ্নের আনন্দের দ্বারা পূরণ করে নেয়। মন

সেখানে কেবলই চাইবে বাস্তবতা থেকে পালিয়ে নিদ্রার অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে। ঘুমিয়ে তাদের যেন আর আশ মিটতে চায় না। এ যেন সেই, "জনম জনম হাম রূপ নেহারনু—নয়ন না তিরপিত ভেল" অবস্থা। তাই তাদের ঘুমের গভীরতা এতই অস্বাভাবিকরূপ বেশী হয়; যার জন্য বাড়ীর আর সকলের এমন কি প্রতিবেশী-দেরও ধৈর্য্যহানির কারণ হয়ে পড়ে। মহাকবি রবীন্দ্র-নাথ সুপ্ত আত্মার এই অস্বাভাবিক রূপ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি—কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হত-ভাগিনী!" কবির মতে বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেও ঘুমের জন্য সঙ্গসুখলাভে বঞ্চিত বলেই সে অভাগিনী। কিন্তু কার্য্যতঃ সে হয়ত অভাগিনী নয়। তার ভাগ্য অন্য দিক দিয়ে খুবই প্রসন্ন! তাই কবির নিজের ভাষায় কবিকে পাল্‌টা উত্তর দিতে পারতো—"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে চিনেছে মণি তাহার খানিক —সেই অপূর্ব্ব মানসিক আস্বাদের অধিকারিণী হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা?"

মন যদি কোন কারণে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত থাকে তা হলে ঘুম আসতে চাইবে না। বাস্তব জগত মনকে এমনই সক্রিয় করে রাখে, সেখানে আদিম প্রবৃত্তি সহজে মাথা তুলতে পারে না। তাই ঘুম আসে না। সেই জন্য চিন্তাশীল পণ্ডিত, বিচারক, সৈন্যাধ্যক্ষ, রাজ্য-পরিচালক প্রভৃতি সকলেই প্রতি জাগ্রত মুহূর্ত্ত মানব সেবায় নিয়োজিত রাখতে পারবার আনন্দে বিভোর থাকেন বলেই তাঁদের বেশী ঘুমের দরকার হয় না। কেবল শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়-ক্ষতি পুরণের জন্য দু'চার ঘণ্টা ঘুমই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আর এই অল্প ঘুমের জন্য তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের কোন অবনতি হয় না। কিন্তু স্বপ্নরাজ্যের আকর্ষণ যখনই আনন্দদায়ক না হয়ে নিরানন্দের উৎসরূপে পরিগণিত হয়, তখনই ঘুমের ব্যাঘাত তো হবেই, উপরন্তু স্নায়ুবিকারগ্রস্ত হবার কারণও হবে। ফলে অনিদ্রা রোগ বিশেষ হয়ে দাঁড়াবে। তখন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জনিত মানসিক অশান্তি নিদ্রার অন্তরালে শান্তির আশ্রয়ের অনুসন্ধানে আলেয়ার পেছনে ঘোরার মত বৃথাই ঘুরে মরবে। আশ্রয় মাঝে মাঝে খুঁজে নেবে কিন্তু সেটা ব্যাধ-তাড়িত হরিণের মত সাময়িক—ক্ষণে ক্ষণেই নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ ঘুম হবে মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা প্রায়ই ভেঙ্গে যাবে অন্তরের স্বপ্নজনিত উত্তেজনা অথবা বাহিরের সামান্য শব্দে। আর সব ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে আছে কেবল দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া।

স্নায়ুবিকারগ্রস্ত অনেকের নিদ্রাহীনতা এমনই উৎকট হয়ে ওঠে যে তারা সারারাত্র চোখ যেন আর বন্ধ করতে পারে না। একটা অনাগত ভয় তাদের মনকে এমনই আবিষ্ট করে রাখে—যেন ঘুমুলেই অবাঞ্ছিত স্বপ্ন দর্শন জনিত উৎকণ্ঠার মাত্রা বেড়েই চলবে। তাই ভোরের দিকে 'অচিরেই দিনের আলো আসবে তখন আর ঘুমুতে হবে না' এই চিন্তা মনকে অনেকটা শান্ত করে বলেই তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি, বোমার তাণ্ডব, কোলাহলের মধ্যেও অনেক সৈনিক অঘোরে কয়েক ঘণ্টা বেশ ঘুমুতে পারে বাস্তবতার আকর্ষণকে উপেক্ষা করেই। এ যেন শোকের প্রচণ্ড আঘাতের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা। তাদের স্নায়ুপুঞ্জ অত্যধিক উত্তেজনায় অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিছুক্ষণের জন্য বোধ-চৈতন্য লুপ্ত করে দেয়। যুদ্ধকালীন সৈন্য বাহিনীর মধ্যে আবার সাংঘাতিক অনিদ্রা রোগের প্রাবল্য খুব বেশী। তারা যেন চোখ বুজতে সাহস করেনা এক অজ্ঞাত ভয়ে; পাছে সে ঘুম আর না ভাঙ্গবার সুযোগ আসে। কেন না আশেপাশে তারা অনেক দেখেছে বা শুনেছে ঘুমের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটায় তাদের আর জাগতে হয় নি। চির নিদ্রায় আশ্রয় নিতে হয়েছে।

দিনের বেলায় ঘুমের মূলেও আছে সেই এক সত্য – আনন্দের সন্ধান স্বপ্নরাজ্যে। প্রকৃত ঘুম ছাড়াও 'দিবাস্বপ্ন' অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে বিভোর হওয়া প্রত্যেকের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এখানেও ঐ 'দিবা স্বপ্নের' মধ্য দিয়েই মন তার আকাঙ্ক্ষার পূরণ করে নেয়।

শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখবার জন্য ঘুমের প্রয়োজন। তাহলে প্রশ্ন আসছে প্রত্যেকের কতক্ষণ ঘুমের দরকার?

প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বিভিন্ন। তাই তার পূরণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজনের পরিমাণও হবে বিভিন্ন। সেখানে দরকার প্রত্যেকের দৈনন্দিন ঘুমের নিম্নতম একটা মান—যা অপেক্ষা কম ঘুম হলে শরীর খারাপ হবার সম্ভাবনা। এই নিম্নতম মানের সীমা অতিক্রম করে দু' এক ঘণ্টা বেশী ঘুমান দোষণীয় না হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ঘুম স্বাস্থ্যসম্মত নয় এবং সমাজসম্মতও নয়। বেশী সময় ঘুমুলে শরীরস্থ যন্ত্রসমূহের কর্ম্মশক্তি অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। সেই জন্য মূত্রস্থলীতে মূত্র অধিকক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় মূত্র-পাথরী হবার সম্ভবনা হয় বেশী। শরীরস্থ রস উপযুক্ত -সঞ্চালনের অভাবে স্থান বিশেষে মাত্রাধিক্য হওয়ায় দেহ ভার ভার বোধ, মুখ চোখ ফোলা ফোলা ভাব দেখা যায়। দেহ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় বেশী সময় থাকার জন্য দৈনিক খাদ্য উপাদানের দাহ কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়। অধিক নিদ্রায় মগজে রক্তহীন অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় স্নায়ুতন্ত্রসমূহে পুষ্টির অভাব হওয়ায় সেদিক দিয়েও মাথা ব্যথার কারণ হওয়া বিচিত্র নয়।

ব্যবহারিক জীবনে ঘুমের আধিক্য নানা প্রকারে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করে। আর ব্যক্তিগত জীবনে অধিক নিদ্রার প্রকোপের ফলে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ হয়ে নির্ভরের অযোগ্য পর্য্যায়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

যারা কায়িক পরিশ্রম বেশী করে, তাদের শরীরের ক্ষয় হয় বেশী। আর সেটা পূরণ করবার জন্য ঘুমের দরকারও হয় বেশী। কিন্তু যারা Brain worker, তাদের অল্প ঘুমই যথেষ্ট। কারণ Brain tissue-এর ক্ষয় খুব কমই হয়। অথচ অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে, অধিক ঘুম স্নায়ুমণ্ডলীকে সুপুষ্ট করবে। অধিক নিদ্রা যেমন মোটা হতে সাহায্য করে তেমনিই অনিদ্রা রোগ দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে সাহায্য না করায় দেহ রোগা করে দেয়। অনিদ্রা জনিত মানসিক উৎকণ্ঠা দেহের আভ্যন্তরীন রস সঞ্চারের সমতা রক্ষায় অপারক হওয়ায় নানা প্রকার রোগ যথা—হজমের রোগ, হৃদ্‌রোগ, ঋতু সম্বন্ধীয় রোগ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এদিকে তখন রোগের চিন্তাই প্রবল হয়ে উৎকণ্ঠার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে অনিদ্রার কারণ হয়ে পড়ে। এমনি করেই এক 'দুষ্টচক্র' সৃষ্টি দ্বারা 'চিন্তা দহতি সজীবং' কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে।

শিশু তার বাল্য জীবনের অধিকাংশ সময় ঘুমেই কাটায়। সেখানে নিদ্রার মধ্যে জননী-জঠরে থাকা-কালীন অন্তর্জ্জগতের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্বপ্নে শিশু বিভোর থাকে। নিদ্রাবস্থায় হাসি-কান্নার অপূর্ব্ব সমাবেশ তার মনোরাজ্যে কি অনুভূতি সৃষ্টি করে আমাদের তা জানবার সম্ভবনা কোথায়? ক্রমে ক্রমে বহির্জ্জগতের বৈচিত্র্যের আকর্ষণ যতই তাদের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করতে থাকে, ততই ঘুমের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। শিশুর মনোরাজ্যে সৃষ্টি হয় এক আলোড়ন, আমাদের অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্যাবলীর মধ্যে। শিশু চায় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে—আর আমরা চাই তার সঙ্গসুখ। তাই তাকে বৈচিত্র্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট করে জাগিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট হই। কালে তাকে ঘুমের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে তার মানসিক অশান্তি ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি করে দেই। যার অভিব্যক্তি তার খিট্‌খিটে মেজাজ, চঞ্চল প্রকৃতি, ভাবপ্রবণতা, জেদী, অবাধ্য, নিয়ম শৃঙ্খলা-বিরোধী মনোভাবের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। স্নেহ পরবশে শিশুসুলভ চপলতা বলে তাকে আমাদের প্রশ্রয় দেবার অবশ্যম্ভাবী ফল উত্তর কালে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি।

আমাদের উচিত শিশুর মনোরাজ্যে অকারণ আলোড়ন সৃষ্টি না করা। তা হলেই তার স্বভাব ক্রমেই মধুর হয়ে উঠবে প্রকৃতির আপন নিয়মে। সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিশু পরিচর্য্যার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনও হয়েছে প্রচুর। আগেকার দিনের 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসিরা' কতদূর বিচক্ষণ ছিলেন, শিশুদের সময়মত ঘুম পাড়িয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট রাখতে—সেটা আধুনিক মায়েরা হয়ত কল্পনাই করতে পারেন না। তাঁরা চাইবেন নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য শিশুদের ঘুমের আবরণের অন্তরালে রাখতে—সময়ে

বা অসময়ে আপন খেয়াল-খুসির ওপর। শিশুদের যেখানে ঘুমের প্রয়োজন আধুনিক মায়েরা সেখানে হয়ত বাধ্য হয়েই তাদের নিয়ে চল্‌লেন সিনেমাতে অথবা সামাজিক উৎসবে—এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যে তারা সেখানে আমোদ পাবে। ফলে জনকোলাহল বা রূপালী পর্দ্দার ছবি শিশুদের মনোরাজ্যে অকারণ অশান্তিরই সৃষ্টি করে। এমনি করেই তাঁরা নিজেদের শিশুদের স্বাস্থ্য-হানির কারণ হয়ে পড়ে।

শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম-শৃঙ্খলে তাদের জীবন বেঁধে দেওয়ার ওপরেই মায়েদের কৃতিত্ব। সেই সব মায়েদের নামই ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে আদর্শ মানবের জননী বলে। শিশুদের ঘুম পাড়ানোর উপকারিতা ও পদ্ধতি—Nursary Rhym—সেকালের পৃথিবীর সকল দেশের মায়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ছন্দযুক্ত স্পন্দনের অমোঘ কার্য্যকারিতা যে ঘুম আনায় তাঁরা বিশেষভাবে তা জানতেন। দুরন্ত অশান্ত শিশুমন মার কোলে ছন্দযুক্ত স্পন্দনের এবং সুর-লহরীর অপার মহিমায় ক্রমে শান্ত, স্নিগ্ধ হয়ে ঘুমের কোলে এলিয়ে পড়ে প্রভাতে সোনার কাঠির স্পর্শে যখন তাদের ঘুম ভাঙ্গে, তখন সুখনিদ্রাজনিত সুখ-স্বপ্নের রেশ মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব হা'সি মার মাতৃত্বকে এক অভিনব পর্য্যায়ে উন্নীত করে। সঙ্গে সঙ্গে সংসারক্লিষ্ট মার মনের কালিমাও মুছে দিতে সাহায্য করে যথেষ্ট এই সব শিশুরা। শিশু ও জননীর হৃদয়তন্ত্রীর একত্র স্বতস্ফুরিত ঝঙ্কার উভয়ের জীবনকে সুষমামণ্ডিত ক'রে চির উদ্ভাসিত করে রাখে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আধিক্য আপনা থেকেই কমে আসে। তাই কিশোর বয়সে নিদ্রার প্রয়োজন হয় কম শিশুদের অপেক্ষা। এমনি করে জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিদ্রা তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম রক্ষা করে চলে। যেখানেই তার ব্যতিক্রম, সেখানেই অসুস্থ অবস্থা দেহের ও মনের

গান

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

মালার বদলে দেব না তোমারে গাঁথা মালা কোনো ফুলে,
আমার এ গলা শূন্য আজিকে তোমারে কি দেব খুলে!
সকালের গাঁথা মালা সাঁঝে হায়
নিমেষে ঝরিয়া শুকাইয়া যায়,
দুইদিন গত হোলে তারি কথা যায় যে সবাই ভুলে।
আজিকে তোমারে এইখনে মালা দেব আমি যেইখানি
সুতোর বদলে তব স্মৃতি দিয়ে গাঁথিব যে তাহা জানি।
সাজানো কথায় রচিব যে গান
তাহাই ফুলেরি গন্ধ সমান,
ছড়াইবে মোর ভালোবাসা তব হৃদয়েতে ঝড় তুলে।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চতুর্ভুর্জ চক্রবর্ত্তীর বাটীর কক্ষ]

(চতুর্ভুর্জ একখানি পত্র পড়িতে পড়িতে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছেন—দূরে বসন্ত দাঁড়াইয়া)

চতুর্ভুর্জ—বসন্ত ! তুই না জাতিতে নাপিত—

বসন্ত—(চমকাইয়া) আজ্ঞে হঁ্যা—নরসুন্দর—আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ত্রৈলোক্যনাথ এই ভুরসুটে এসে প্রথম বাস—

চতুর্ভুর্জ—থাম্। (আবার পত্র পড়িতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে) না এ অসম্ভব—আমার দ্বারা এ অসম্ভব—বস্না—

বসন্ত—হঁ্যা তাই বলছিলুম—তার পূর্ব্বে আমাদের বাস ছিল—

চতুর্ভুর্জ—পত্র-বাহককে বলে দে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। আর শোন এরকম পত্র যেন আমার কাছে ফের—আচ্ছা থাক্—তাকে শুধু যেতে বলে দে—

(বসন্তের প্রস্থান)

আমাদের বাহুবলে গড়া আমাদের জন্মস্থান—কেন তার উপর দিয়ে অত্যাচারের কালস্রোত বহাব ? আমায় লোভ দেখিয়েছেন এতবড় রাজ্যের সেনাপতি আমি—আমার ঐ একটা ভাগ্নী। মা আমার সর্ব্বশস্ত্র ও শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা—অচঞ্চলা লক্ষ্মী। (সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা—মামা ! শুনেছেন ?

চতুঃ—কি মা?

সুমিত্রা—শঙ্করীর বিয়ে। রাজা রুদ্রনারায়ণ তার পানিপ্রার্থী। এইমাত্র সর্দ্দার কাকা রাজবাটী থেকে ফিরে এলেন। কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেল। এক সপ্তাহ পরে বিয়ে হবে। বেশ হোল মামা—শঙ্করী রাজার রাণী হোল।

চতুঃ—(গভীর চিন্তামগ্ন)

সুমিত্রা—মামা ! কি ভাবছো ?

চতুঃ—কি বললে মা ? শঙ্করী ভুরসুট রাজ্যের রাণী হবে ?

সুমিত্রা—বেশ হলো, না মামা ? শঙ্করী সর্ব্বগুণান্বিতা। ভুরসুটের সৌভাগ্য, অমন শক্তিময়ী দেবী আজ তার সিংহাসন অলঙ্কৃত কর্ব্বে। মামা ! আজ এ রাজ্য ধন্য হোল।

চতুঃ—সুমিত্রা ! আমি ভুরসুটের কি, বলতে পারিস মা ?

সুমিত্রা—আমি আর কতটুকু জানি ! তবে গুরুদেবের মুখে শুনেছি আপনারই বাহুবলে এ রাজ্য শাসিত। আজ যে ভুরসুটবাসীরা অত্যাচারী পাঠান দস্যুর হাতে নিপীড়িত হয় না, সে শুধু আপনারই হস্তধৃত অসির ভয়ে। মামা ! আপনার বীরত্ব এ রাজ্যের গৌরব। আপনি ভুরসুট রাজসিংহাসনের স্তম্ভভিত্তিস্বরূপ, এ কথা ত গুরুদেবের কাছে কতবার শুনেছি।

চতুঃ—মা ! সবই ত বুঝলাম। আমার আর কিছু কি নেই ? আমি এতই নিঃস্ব ! এ রাজ্যের রাজা-মন্ত্রী-গুরুদেব-অমাত্য এদের কারুর কি চোখে পড়ে না আমার আর কি আছে ? মা—আমার সবার বড় সম্পদ তুমি—আমার সবার বড় গর্ব্ব আমার নিজ হাতে গড়া মাতৃহারা সুমিত্রা। মা রে, অস্ত্রবিদ্যা আমি জানি কিনা তার পরীক্ষা হলে দেখাব ভুরসুট রাজ্যের সেনাপতির অস্ত্রশিক্ষা নিস্ফল হয়নি। মা ! আজ কি কর্ব্বো—আমার গৃহ শূন্য—ভাগ্য মন্দ—তবে আমি জানি আমার মা শিক্ষায়-দীক্ষায়-বীর্য্যবত্তায় কারুর চেয়ে ছোট নয়।

সুমিত্রা—মামা! শঙ্করী আমার বাল্য সহচরী—আমি তাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি। আর মামা আমি ত বলেছি—তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। স্বর্গের রথ যদি বাসুদেব চালিত হয়ে এসে আমায় উঠতে বলে—আমি বলব যেখানে আমার মামা নেই সেখানে যাবার আমার সময় নেই—আপনি ত তা জানেন। মামা! শঙ্করীর সৌভাগ্যে আমি সুখী—এ তাদের প্রেমের মিলন—মামা!

চতুঃ—সব বুঝি মা—সব জানি। পিতৃমাতৃহারা স্নেহময়ী কন্যা আমার! এর ভেতর (নিজের বুকে হাত দিয়া) কি আছে যেদিন জানবি, সেদিন বুঝবি তোর মামার আঘাত কোথায় লাগলো। আমি রাজ্যের সেনাপতি—শত্রুর অস্ত্র বুক পেতে নিতে এগিয়ে যাবো আমি—আর রাজ্যের সৌভাগ্য নির্ণয়ে আমি কেউ নই। জান মা? জান? আজ এখানে দাঁড়িয়ে তোমার আদরের ভুরসুটের জন্য কি করেছি? (বসন্তের প্রবেশ) কে? কি চাই?

বসন্ত—সর্দ্দার দীননাথ চৌধুরী মহাশয় এসেছেন।

চতুঃ—এখানে কেন? বল—

সুমিত্রা—মামা! শঙ্করীর বাবা এসেছেন। যা বসন্ত, এখানে নিয়ে আয়। (বসন্তের প্রস্থান) মামা! (নিকটে গিয়া) আমি তোমার মা। আমার কথা তুমি কি না শুনে পারবে!

চতুঃ—(গম্ভীর হইয়া রহিল) তা বটে।

(বসন্ত ও দীননাথের প্রবেশ ও পরে বসন্তের প্রস্থান)

দীননাথ—ভাই! সুমিত্রা মা! তোমরা দু'জনেই আছ, বেশ হয়েছে। ভাই চতুর্ভুজ! সব শুনেছ ত? আর কটা দিনই বা আছে! সব ঠিক ঠাক ক'রে নাও। আমার ত তোমরাই সব। চতুর্ভুজ! আমার বাল্যবন্ধু! কেমন সব ঠিক হবে ত?

চতুঃ—হ্যাঁ তা' হবে বৈকি? সব হবে। তবে কি জান? আমার শরীরটা—

সুমিত্রা—এ আর বলছেন কি? আমাদেরই ত সব কর্ত্তে হবে।

চতুঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই? রাজার ঘরে বিয়ে! যোগ্য ব্যবস্থা কর্ব্বো। সুমিত্রা মা যখন বল্‌ছে, যাও দীননাথ, সব ঠিক হবে।

দীননাথ—হ্যাঁ! আমার আর ভাবনা কি—তোমরা যখন আছ। যাই একবার ও-পাড়াটায় যাবো। তা' হ'লে আমার ছুটী তো—চক্রবর্ত্তী—সুমিত্রা মা—

(দীননাথের অগ্রসর—চতুর্ভুজ ও সুমিত্রা আগাইয়া দিল)

সুমিত্রা—মামা! বোস—তোমার পূজার যোগাড় করা হয় নি। (প্রস্থান)

চতুঃ—পূজো! কার পূজো কোরবো মা—তাই ভাব্‌ছি! মা! তোমার প্রবোধ বাক্য আমার অন্তরকে শান্ত কর্ত্তে পারলে না। মা মরা সন্তান তুমি—আমার সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমায় আমি মানুষ ক'রেছি—তোমার মঙ্গল চিন্তা ক'রে—তোমাকে মর্য্যাদানুযায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত কোরব এই আমার সাধনা। সব কষ্ট সব দুঃখ হেসে সহ্য ক'রেছি—আজ তা বিফল হবে! মা! তা যে পারবো না। মনের কোণে লুকিয়ে রেখেছিলুম ভুরসুট রাজ সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে আমার ব্রত উদ্‌যাপন কোর্ব্ব। আজ তা এত সহজে শেষ হবে? বসন্ত! বসন্ত!!

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত—হুজুর!

চতুঃ—সেই পত্রবাহক কতদূর গেল? ফেরাতে পারিস্—দেখ ত—আশাতীত বকসিস্—

(প্রস্থান)

বসন্ত—(চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজসভা মণ্ডপ]

(রাজার বিবাহের পর আজ প্রজাগণ, সর্দ্দারগণ ও অমাত্যবর্গ মিলিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রজারা এসেছে। মণ্ডপ—চন্দ্রাতপ—সিংহাসন ও তৎ-

পশ্চাতে অন্তঃপুরিকাগণের আসন। জাঁকজমক নেই—ভক্তশিল্পী আন্তরিকতা দিয়ে সযত্নে সাজিয়েছে—দূরাগত নহবৎ ধ্বনি—সকলের মুখে শান্তি ও ঔৎসুক্য। পরস্পর পরস্পরের কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন।—শঙ্খ-নিনাদে রাজ-আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হলো—রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতির প্রবেশ—সকলে উঠিলেন। রাজা ও পরে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন—পরে হরিদেবের প্রবেশ—সকলে সম্মান প্রদর্শনার্থ উঠিলেন ও পরে বসিলেন)।

—শ্রীচরণ ভট্টা—

জয় জয় নারায়ণ জগৎ পালন
জয় জয় ব্রাহ্মণ পুরুষ প্রধান।
জয় জয় নৃপতি রুদ্রনারায়ণ
জয় জয় বীরেন্দ্রভূষণ।
বাংলার সন্তান হও ভারতে প্রধান।
জয় গাথা তব গাহিবে চারণ॥

(গান শেষ হইলে হরিদেব মঙ্গলাচরণ করিলেন)

রুদ্রনারায়ণ—(ধীরে ধীরে উঠিলেন) গুরুদেব! প্রজাগণ! আজ ভুরস্লুটের একটা স্মরণীয় দিন। আজ তোমাদের রাজ্যে রাণী এসেছেন। এই সিংহাসন এক মহান্ দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র আসন। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশে (হরিদেবের প্রতি) আমি তোমাদের মঙ্গলা-মঙ্গল চিন্তা করছি আর করবো। তোমরাও এক অখণ্ড বিশ্বাসে এই সুউচ্চ আসনের অধিকারীকে পূজা করছো—এ পূজার তুলনা নেই। প্রজার অন্তর্নিহিত স্বভাবজ ভক্তিকে কেন্দ্র করে আর্য্য ঋষিরা এত বড় একটা রাষ্ট্র-তন্ত্রের সুব্যবস্থা করে গেছেন। প্রজার অন্তরের রাজভক্তি পরিপূরিত হয় রাজার অনাবিল প্রজা পালনের বৃত্তি দিয়ে। রাজার কর্ত্তব্য—এই অমূল্য সম্পদটিকে শুধু কথায় নয়, ঋষিকথিত কর্ম্মপন্থা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা—সেইটেই রাজ্যের আসল শক্তি। রাজ্যের এই শুভদিনে তোমাদের রাণীর বিশেষ আগ্রহে আর গুরুদেব প্রমুখ উপদেষ্টাগণের নির্দ্দেশ অনুসারে যে সকল নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হবে, তা মন্ত্রী তোমাদের বলবেন।

(রাজা বসিলেন—হর্ষধ্বনি)

দুর্লভ—(ধীরে ধীরে উঠিলেন) গুরুদেব! রাজা! দেবীরাণী! আর ভুরস্লুটের প্রজাবৃন্দ! আজ রাজ্যের স্মরণীয় দিন। এমন দিনে সন্তানেরা মায়ের দর্শন চায়। কতদূর হতে কত প্রজা দেবী দর্শনে এসেছে—মাকে সন্তানেরা দেখবে—সিংহাসনের অপূর্ণস্থান পূর্ণ হবে। রাজা! গুরুদেব! (প্রজাগণের হর্ষধ্বনি)

হরিদেব—বিচক্ষণ মন্ত্রী! তোমার নির্দ্দেশ অবশ্য গ্রহণীয়। মা! (পর্দ্দার অন্তরাল হইতে শঙ্করী দেবীর হাত ধরিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন) সেনাপতি চতুর্ভুজ!

চতুঃ—(চমকিত হইয়া) ভুরস্লুটরাজ! দেবী রাণী! ভুরস্লুটের সম্মান রক্ষায় আমার হস্তধৃত অসি সদা নিয়োজিত থাকবে। আপনাদের আদেশ—রাজ্যের কল্যাণ—আমার পরম কর্ত্তব্য। মহামান্য ভুরস্লুটরাজ আজকের স্মরণীয় দিনে আপনাকে ও রাণীকে ভুরস্লুট-রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে আমি আমার আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করছি।

(সিংহাসনতলে নতজানু হইয়া তরবারি স্পর্শ করিলেন—রাজা উঠিয়া সসম্মানে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং রাণীও অবনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও সভাস্থ সকলে হর্ষধ্বনি করিল।)

মন্ত্রী—আজ ভুরস্লুটেরই এক সর্ব্বগুনান্বিতা ওজস্বিনী নারী রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন। এমন একটা স্মরণীয় দিনে ভুরস্লুট যাতে শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-কর্ম্মে সর্ব্বতোমুখী হয়ে ওঠে এবং প্রজারা যাতে শান্ত, সরল ও অচ্ছেদ্য উৎসবের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা রাজ্যের কল্যাণকামীরা সমীচীন মনে করে আসর আমোদ, আহ্লাদ, পান, নৃত্যগীত বন্ধ করেন। এই শুভদিন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেবাশ্রম, সুরক্ষিত দুর্গ, শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্ত রাজ্যে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। এ সকলের ব্যয় নির্ব্বা-হার্থে রাজকোষ থেকে যথোপযুক্ত অর্থব্যয় হবে। আর মহামান্য সর্দ্দার দীননাথ চৌধুরী মহাশয় বহু অর্থ এ কার্য্যে দান করেছেন। এ সকল কার্য্যের জন্য কোনও নূতন কর

ধার্য্য হবে না। মহাশক্তির আধার রাণী তোমাদের রাজ্যে নিয়ে এলেন অপূর্ব্ব শক্তির সাধনা!

(সকলে হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনি করিল)

বিশ্বনাথ—মহান্ রাজা—রাণীমা! আমরা আজ আশার অতীত দৃশ্য দেখলাম। আমরা এ আনন্দের দিনে মায়ের পায়ে ভক্তি-অর্ঘ্য দেব তাই রাজার অনুমতি প্রার্থনা করি।

(রাজা ও রাণীর গুরুদেব ও মন্ত্রীসহ কিছুকাল পরামর্শ)

রুদ্র—রাজ্যের সুবিজ্ঞ প্রজা তুমি—যা বল্লে সে বিষয়ে আমাদের অভিমত কিছুই নেই—তোমাদের রাণী কিছু বলবেন—

(একটা সংযত হর্ষধ্বনি সমস্ত সভায় খেলে গেল' তারপর সব স্তব্ধ।)

শঙ্করী—(ধীরে ধীরে উঠিয়া শির অবনত পূর্ব্বক সম্মান জ্ঞাপন করিয়া শান্ত-পরিস্কার-অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে) গুরুদেব! রাজা! আমার পূজনীয়গণ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমার প্রিয় সন্তানগণ! আজ যে অধিকার তোমরা আমায় দিয়েছ। তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তোমাদেরই সহায়তা আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। আমার সন্তানগণ! তোমাদের নিকট থেকে ভোগের জন্য, আমার আত্মতৃপ্তির জন্য এতগুলো ভোগ্য বস্তু নেবার আবশ্যকতা কি? প্রজার অখণ্ড সুখ-শান্তি বিধান করে তাদের সরল জয়গান আমাদের সব চেয়ে বড় পাওয়া প্রার্থনা করি, তোমাদের অফুরন্ত রাজভক্তিই যেন আমাদের সবার বড় উপহার হয়। তোমরা যা' এনেছ তা' আমার ফিরিয়ে দেবার অধিকার নেই—আমি তা সানন্দে গ্রহণ করে তোমাদের সন্তানদের ভুরসুটের ভবিষ্যৎ শান্তিবাহিনীকে আমি তা' উপহার দিলাম। আমাদের উপহার তোমরা—আমাদের পুরস্কার ভুরসুটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জ্জন—আমাদের কাম্য মানবতার প্রতিষ্ঠা। (ধীরে ধীরে বসিলেন।)

(হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনি থামিলে একটি তীর তার মুখাগ্রে পুষ্পগুচ্ছ সিংহাসন তলে আসিয়া পড়িল, সকলে চকিত—সেনাপতি চতুর্ভুজ নিষ্কোষিত অসি হস্তে দাঁড়াইয়া—হরি দেব, রাজা ও রাণী শান্ত)

চতুঃ—কে একাজ করলে শীঘ্র বল?

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল—আমি। আমি বিদ্রোহী—আমি মুক্ত—আমি আনন্দ—আমি একাজ করেছি। (অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।)

(সেনাপতি আবার কি বলিতে গেলে রাজার ইঙ্গিতে নিরস্ত হইল। কালুসর্দ্দার ধীরে ধীরে আসিয়া বালকের নিকট দাঁড়াইল—রাণী শঙ্করী শান্ত দৃষ্টিতে কুনালের দিকে চাহিয়া)

নগরপাল—(ধীরে ধীরে উঠিয়া) মহারাজ! এই বালক রাজাদেশ অমান্য করেছে। রাস্তায় রাস্তায় নাচ গান করে বেড়িয়েছে।

রাজা—বালক! তুমি বিদ্রোহী! তুমি মুক্ত?

কুনাল—হ্যাঁ রাজা।

রাজা—আমি তোমায় বন্দী কোরবো—তোমাকে দমন কোরবো—

কালুসর্দ্দার—কেন রাজা এমন কথাটি বলছিস্? বড় মজার ছেলিয়া আছেরে রাজা, বড় মজার ছেলিয়া—

রাজা—সর্দ্দার! এত রকম অন্যায় কর্ল্লে—একে শাসন কোর্ব্বো না? আমি যে রাজা।

কুনাল—আরে বুড়া সর্দ্দার! আমি কথা বলিনা। দেখ রাজা আমার ঘর ঐ বনানি—আমার সৈন্য এই (তীর ধনুক দেখাইয়া) আমার শাসন আনন্দ। আমায় ধরে কে? দিদি রাণী হোল—আমি তাই গান গাইবো না—দিদির সিংহাসনে দুটো বনের ফুল ফেলে দেবো না? এ কেমন কথা রাজা? আগে আমার দিদি তবে ত রাণী। এমন রাজা তুমি—আমার দিদি কেড়ে নেবে? আমি দেবো না—(দৃপ্তভঙ্গী)

(সকলে স্তব্ধ, সকলে বাক্‌শূন্য মুখহাস্যোজ্জ্বল—হরিদেব নিমিলিত নেত্র)

রুদ্র—(ধীরে ধীরে আসিয়া হাত ধরিল) ক্ষুদ্র বালক! তোমায় বন্দী করলুম আমি, (বক্ষে ধারণ)।

কুনাল—না! না রাজা! আমায় ছেড়ে দে—এমন করিস নি—

(সকলের হর্ষধ্বনি)

[পট ক্ষেপণ]

চতুর্থ দৃশ্য

[ভুরপুটের সীমানাস্থিত জঙ্গল মধ্যস্থিত ওসমান খাঁর শিবির]

[ওসমান খাঁ বসিয়া—গভীর চিন্তামগ্ন—পাশে সুরা ও পাত্রাদি পড়িয়া আছে—আর একদিকে উন্মুক্ত তরবারি—ওসমান খাঁ উঠিয়া পরিক্রমণ করিয়া তরবারি রাখিয়া পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাহা মুখের নিকট ধরিলেন]

ওসমান—(সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া) গরল! বীরের শত্রু—যাও। প্রতিজ্ঞা করেছি—প্রতিশোধ নেবো। মহাপ্রাণ প্রভুর কীর্ত্তি ধ্বংসকারীর যোগ্য সাজা দেবো। মোগল শাসন বিধ্বস্ত কোর্ব্বো—লুট, হত্যা—অত্যাচার—বাংলা—বিহার—সমস্ত সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দেবো। মোগল সম্রাট? মহাজাতি গঠন—ভারতে সুশাসন—হা-হা হবে না—হতে পারে না! মহান্ হৃদয় আফগান বীর পারেনি—তুমি পার্ব্বে? না-না—তা হতে দেবো না। কই হ্যায়—

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা—হুজুর!

ওসমান—হুসেন আলি—জল্‌দি— (বান্দা বিস্মিত ভাব) কি দেখছো · মুর্খ—আমার চোখে দয়া নেই—আমি শয়তান—আমি নির্ম্মম—আমি পাপ আমি ধ্বংস—আমি দানব—যাও, যাও বান্দা—হ্যাঁ কি বলছিলুম (চিন্তা)—এই যা যা শিগ্‌গীর যা—যা বল্লুম তাই কর। (ক্লান্ত হইয়া আসনে বসিল—বান্দার ধীরে ধীরে প্রস্থান, পরে হুসেনের প্রবেশ—ওসমানকে ক্লান্তভাবে অর্দ্ধশায়িত দেখিয়া)

হুসেন—একি! হুজুর! আবার আপনার অসুখ—(তাড়াতাড়ি পাত্র পূর্ণ করিয়া) হুজুর! একটু খান। আপনি বড় ক্লান্ত। আমায় ডাকেন নি।

ওসমান—হুসেন! আমি আর ও ছোঁব না। আমার কাজ গুলিয়ে যায়। আমি হারিয়ে ফেলেছি।

হুসেন—না-না হুজুর! কিছু না—বাংলার জলো হাওয়া—এটা ওষুধ। এই নিন্ (মদ্যপাত্র ধরিল)

ওসমান—খাব? দাও—(পান করিয়া) হুসেন? তুমি কোথায় যাও?

হুসেন—সব দিক দেখছি (বেশী করিয়া ঢালিল) এই দেখুন এটা ঢালা যাক—পরে দরকার হলে—

ওসমান—আচ্ছা দাও, যখন ঢেলেছ দাও (পান করিয়া) আর না।

হুসেন—হুজুর গান শুনবেন—একটু গানের (যেন অন্যমনস্ক ভাবেই মদ ঢালিল)—ঐ দেখ, আবার ঢেলে ফেললুম—যাক এটা এখন সরিয়ে রাখি, কি বলেন?

ওসমান—দাও-দাও—হুসেন! ঢেলেছে যখন দাও (পান করিল). একি করলে হুসেন—বড় কম ঢেলেছ—ভরে দাও, গলা ভিজলো না।

হুসেন—(বেশী করিয়া ঢালিয়া) এই নিন, আর দেবো না।

ওসমান—(পান করিল) হুসেন তুমি যেও না—আর দেখ ওটাকে সরিয়ে রেখো না—দেখি দেখি কতটুকু খেলুম—আঃ দাওনা তুমি ভারী বেয়াদব। (উঠিয়া নিজে বোতল লইয়া পান করিল) এইবার আমি প্রস্তুত। নিয়ে এস—হুসেন গান শোনাও—(বসিল)

হুসেন—হুজুর আজ ভাল জিনিষ আছে—

ওসমান—কেন তুমি ওসব কর—কতদিন বলেছি—না-না ওসব—(হুসেন বাহিরে গিয়া একজন গায়িকা স্ত্রীলোক ও বসন্ত সহ প্রবেশ, ওসমান নিকটে গিয়া বসন্তকে লক্ষ্য করিয়া) হুঁ! হুসেন এ কেন? এই—এই তুমি কেন? হুসেন! একে কেন আন্‌লি—আঃ—

হুসেন—(মদ দিয়া) এই নিন্ হুজুর!

ওসমান—(পান করিয়া) আমায় ভোলাচ্ছ? (স্ত্রীলোকটির নিকটে গিয়া) তোমাকে ধরে এনেছে—তা হোক—ভয় কি, একটা গান গাও—ছোট্ট দেখে—

স্ত্রীলোক—আমি তো ভাল গাইতে জানি না।

ওসমান—আরে হুসেন, গাইতে জানে না তবে কেন আনিস্? আচ্ছা নাও আমি গাইছি। এই হুসেন, আর আর একটু 'সুর'—না-না ওতে আকার দে—(মদ্যপান) হ্যাঁ—দেখ আমি ঘুমোব। যাও, আমার প্রতিশোধ, আমার অত্যাচার, আমার উদ্দেশ্য সব এক সঙ্গে মিশিয়ে রঙিন হয়ে গেল। এস সুন্দরী—(স্ত্রীলোকটী অগ্রসর হইলে কিছুকাল তার দিকে দেখিয়া) এই নে আসরফি (এক থলিয়া মুদ্রা দান), যা আর না। (শয্যা গ্রহণ)

বসন্ত—কি গো সাহেব—নবাব সাহেব কি সত্যিই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন?

হুসেন—আরে এখন আগুন লাগলেও নয়—ভূমিকম্প হলেও নয়। এস ভাই একটু আমোদ করি।

বসন্ত—এখানেই?

হুসেন—(মদ ঢালিয়া নিজে খাইল) আবার কোথায় যাব? (মদ ঢালিয়া) আরে ভুল হয়ে গেল! সুন্দরী! এসো।

স্ত্রীলোক—আমি ভাই ওসব খাই না—আমার পা টলে।

বসন্ত—থাক্না, ঢের হয়েছে। থলিটা কোথায় রাখলি? আমার কাছে দিয়ে ওটুকু টুক্টুকে ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে ঢেলে দে—খেতে কে বল্‌ছে (মদের পাত্র ধরিল)

স্ত্রীলোক—থলিটা আমার কাছে থাকনা—আর আজ আমি মদ খাব না।

বসন্ত—(নিজে এক চুমুক খাইয়া) ওরে আমার সোনারে—খাঁ সাহেব মুখটা ফেরাও ত—(মদ খাওয়াইয়া দিল)

স্ত্রীলোক—বাড়ী যেতে হবে না?

বসন্ত—তা হবে না? থলেটা রেখে যা। বাড়ী গেলে কি আর পাবো? বাইরে একলা যাবি ত মরবি! হ্যাঁ! এ আর ভাল মানুষ বসনা পাস্‌নি। নে আমাদের একটু ঢেলে দে –

(স্ত্রীলোকটি (দুজনকে মদ দিল—বসন্ত ও হুসেন উভয়ে পুনঃ পুনঃ মদ খাইল)

হুসেন—দেখ সুন্দরী! তুমি আমার মনকে নিকে করেছ—সত্যি বল্‌ছি।

স্ত্রীলোক—(বসন্তের দিকে চাহিয়া) আর কত গিলবে? (বোতল ও গেলাস কাড়িয়া লইল) বাড়ী যেতে হবে না?

বসন্ত—এই দে—দে (নিকটে গিয়া)

স্ত্রীলোক—আজ আর না, রাত হয়েছে, বাড়ী চল।

বসন্ত—(হুসেনকে একান্তে কি বলিল) চল যাই—তোর আজ যেন কি হয়েছে। ভাই কিছু মনে কোরো না।

(বসন্ত ও স্ত্রীলোকের প্রস্থান)

হুসেন—সয়তানী ত বাবা ছেলে বেলা থেকেই করছি। কিন্তু এই মেয়ে মানুষ জাতটাকে চিনলুম না। এদের কাছে হার মান্‌তেই হলো। আচ্ছা এই যে সয়তান সেজেছি—এতে লাভ কি? এই যে এমন লোকটাকে হাত ধরে জাহান্নামে নিয়ে চলেছি—মেয়ে মানুষ নিয়ে খেলা করছি—এতে লাভ কি? কেনই বা করি? আরে বাবা! হুসেন সাহেব দেখছি একদিনেই পীরের দরগায় গিয়ে তার দালিজে আসর জমিয়ে বোসলো। দুত্তোর—এ সব কি? সয়তানিই আমি করি—আমার ভাল লাগে। আমার দেহে সয়তানের বাসা—আমার মাথার মধ্যে সয়তানের বাচ্চারা চুডিগ ডিগ খেল্‌ছে—আর আমি হবো সাচ্চা!

(বসন্তের পুনঃ প্রবেশ) কি গো, আবার এলে?

বসন্ত—এই নাও ভাই তোমার ভাগ—(অর্থ দিতে গেল)

হুসেন—আরে বসন্ত—রাখ-রাখ। পরে ভাগ হবে, এর মধ্যেই কেন? শোন একটা কথা বলি—(কর্ণে কি বলিল)

বসন্ত—ভাই যখন বন্ধুত্ব করেছি, কিছু ভেবো না—সেরা কাজ পাবে-আমার কাজ বাজিয়ে নেবে। আমি কি করি দেখনা। কিন্তু বড় শক্ত কাজ ভাই—তবে আমি বসনা—কে না জানে—নোনা জলের ঘায়ে বাঘের ভিতে ঘোগের বাসা করবো। কিছু ভেবোনা খাঁ সাহেব! আদাব—

হুসেন—ওরে বাবা! আমার পিসে মশাই!

পঞ্চম দৃশ্য

[দিল্লী দুর্গ মধ্যস্থিত দেওয়ানী খাস (মন্ত্রণা কক্ষ)]। ভারত সম্রাট আকবর শাহ বঙ্গদেশের মানচিত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। দূরে বিশ্বস্ত খোজা মুর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া—কক্ষ নিস্তব্ধ—সম্রাট একবার মানচিত্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি যেন খুঁজিতেছেন—আবার মানচিত্রখানি দেখিয়া—)

আকবর—(কতকটা আশ্বস্ত হইয়া) আমারই ভুল হয়েছিল—এবার ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ—নিশ্চয়ই সম্ভব। পাথরের নিরস কাঠিন্য কাজে লেগেছে—নদীর সরলতা আমি আয়ত্ত্ব কোর্ব্ব। বঙ্গদেশবাসী—এদের শক্তি—এদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—এদের রাজভক্তি অতুলনীয়—এরা শুধু ভারত কেন বিশ্ববিজয় করতে পারে। বঙ্গদেশের পণ্ডিত শীলভদ্র পাণ্ডিত্যে বিশ্বের পূজা পেয়েছিল। কাজে লাগাতে হবে। বাঙ্গালী! তোমার অভিমান—মর্য্যাদাজ্ঞান—ভাবপ্রবণতা—আমি সদ্ব্যবহার কোর্ব্ব। তোমায় আমি জয় কোর্ব্ব—(পুনরায় মানচিত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ—একজন খোজা আসিয়া পূর্ব্বের খোজাকে নিঃশব্দে কিছু বলিয়া প্রস্থান—দ্বারস্থিত খোজা হাত তুলিয়া কুর্নিশ করিল—সম্রাটের দৃষ্টি পড়ায়)

কি? কি—কি চাই?

খোজা—(পুনরায় কুর্নিশ করিয়া) শাহন্‌শাহ। মহারাজা মানসিংহ এবং রাজা তোডরমল্ল দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

অকবর—হ্যাঁ—(ইঙ্গিতে ভিতরে আনিতে আদেশ ও পরিক্রমণ করিয়া গভীর চিন্তা—খোজার প্রস্থান ও পরে মানসিংহ ও তোডরমল্লের প্রবেশ ও অভিবাদন) এস, এস, বড় সুসময়ে এসেছ। জয়ের আনন্দ আমার পূর্ণতা লাভ কোরল।

মানসিংহ—সম্রাট! কোন যুদ্ধের কথা ত শুনিনি। তবে—

আকবর—ওরে ভাই! এবার আমার জয় বড় সুন্দর -কিন্তু বড় কষ্টসাধ্য। তাই এত আনন্দ।

তোডরমল্ল—কই আমাদের ত বলেন নি? আমরা ত শুনিনি।

আকবর—(হস্তোত্তলনে ইঙ্গিত করিয়া)—আচ্ছা মান! বল প্রয়োগ ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি অস্ত্রাঘাতে বিধ্বস্ত করেছ অনেক। বীরের শোণিতে অমর দেশ-প্রেমিকের দেহগুলোকে ভাসিয়ে দিলে কি জয়লাভ হয়? শাশ্বতকালের সভ্যতার নিদর্শনগুলোকে নির্ব্বিচারে ভেঙ্গে দিয়ে বিজিতের অন্তরে প্রলয়ের ছবি এঁকে দিয়ে কি জয় করা হয়? মল্লজী—সুবিজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী—

মান—(কিছু বলিতে গেল)

আকবর—(কোমলভাবে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া) তা হয় না—সে জয় নয়—সেটা নির্ম্মম ধ্বংসলীলার ক্ষণিক আধিপত্য। সেই নিষ্ঠুর লীলার প্রতিচ্ছবি বুকে নিয়ে বিজেতা ও বিজিত উভয়েই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মাত্র। একে জয় বল যুদ্ধজয়ী বীর?

(মানসিংহ ও তোডরমল্ল অপার বিস্ময়ে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া—তাঁহাদের মুখে কথা নাই)

পারবে না মান—পারবে না তোডরমল্লজী—বুকের সত্যকে চাপা দিতে পারবে না। মানুষকে মানবতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধার সন্ধান পেয়েছি—তাই আমার জয়ের আনন্দ। যাক্—বাংলার কি হলো? রামসিংহ ত অনেকদিন হোল এসেছে।

মানসিংহ—হ্যাঁ, সম্রাট—আর সে এসে ত বেশ ভাল খবর দিলে—কিন্তু এখনো কেউ এলো না কেন? এ বিলম্ব ত অসঙ্গত।

আকবর—না, না, মান—অধৈর্য্য হয়ো না। পথ অল্প নয়। তারপর ব্যবস্থা করে আসতে হবে। কিরে?

(খোজা আসিয়া কুর্ণিশ করিল)

খোজা—বাংলার ভুরসুট রাজ্যের এক কর্ম্মচারী এসেছেন। সম্রাটকে বহুত বহুত সেলাম দিয়ে অপেক্ষা করছেন।

আকবর—কর্ম্মচারী! ভুরসুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ—আচ্ছা তাকে অপেক্ষা করতে—কি মহারাজ মানসিংহ, না না—রাজা তোডর তুমি—তাঁকে এখানেই নিয়ে এস

(তোডরমল্ল ও খোজার প্রস্থান

দিন-শেষের সাথী ফটো—সুবোধচন্দ্র করণ

(সম্রাট চিন্তান্বিত) হঁ্যা মানসিংহ! রাজা রুদ্রনারায়ণ কি অল্পবয়স্ক?

মানসিংহ—হঁ্যা সম্রাট, এর বয়স অল্প।

(তোডরমল্ল ও দুর্লভ দত্তের প্রবেশ—খোজা স্বস্থানে চলিয়া গেল—দুর্লভ নিমেষে সব দেখিয়া লইলেন—সম্রাট তাহা লক্ষ্য করিলেন—দুর্লভ সকলকে যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন—সম্রাটের ইঙ্গিতে তোডরমল্ল দুর্লভকে সমাদরে বসাইলেন।)

তোডর—সাহন্‌শা। ইনি ভুরসুট রাজ্যের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী—এঁর নাম শ্রীদুর্লভ দত্ত। ইনি রাজ্যের সর্ব্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ।

আকবর—আপনাকে দেখে খুসী হলাম। আপনার রাজ্যের—রাজার সব কুশল ত?

দুর্লভ—মহামান্য সম্রাট! আপনার অনুগ্রহে সমস্ত কুশল। মহান্ সম্রাট! আমার রাজা হুজুরকে বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে তাঁর না আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সম্রাট! ভুরসুটের সীমান্তে অত্যাচারী দস্যুরা উপস্থিত। এমন সময়ে রাজ্য ছেড়ে তিনি না এসে আমাকে পাঠিয়েছেন।

আকবর—সুযোগ্য মন্ত্রী! এ ত ভাল কথা। রাজা রুদ্রনারায়ণ যোদ্ধা বীর। এমন দিনে কর্ম্মক্ষেত্র ছেড়ে না আসাই ভাল। আমার সর্দ্দার রামসিংহ আপনাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বেশ-বেশ ভাল, আমি খুসী আছি।

দুর্লভ—মহাপ্রাণ সম্রাট। আপনার বিশাল অন্তরে বাংলা যে স্থান অধিকার করে আছে—আপনি যে অনুক্ষণ বাংলার মঙ্গলকামী, তার জন্য বাংলা চিরকৃতজ্ঞ।

আকবর—(তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্ল্লভের প্রতি চাহিলেন—পরে স্মিত হাস্যে মানচিত্রখানি হাতে তুলিয়া লইয়া) মন্ত্রী! সমগ্র বাংলার মধ্যে ভুরসুট কতটুকু অংশ?

দুর্ল্লভ—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মহামান্য সম্রাট! এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সুরক্ষিত ও শক্তিশালী থাকলে বাংলার আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াও অটুট থাকবে।

মানসিংহ—বাংলার সকল নদীগুলোই জলযানের উপযোগী, কি বলেন?

আকবর--মহারাজা মানসিংহ! আপনার একথা খুবই ঠিক। এইটেই বাংলার বৈশিষ্ট্য—এতেই তার আসল শক্তি।

দুর্ল্লভ—সম্রাট! এ কথাও যেমন সত্য আবার এই জলপ্রণালীগুলো বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরও সৃষ্টি করেছে। বাংলার পৃথক রাজ্যগুলিকে একাধারে শাসন কোরতে না পারলে এমন সুন্দর শক্তিশালী প্রদেশ ভারতের কোনও কাজেই আসবে না। এর নদ-নদীগুলো কূলবর্ত্তী অধিবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি অকাতরে এনে দেয় সত্য, কিন্তু এই নদীগুলোই সমস্ত প্রদেশে একটা মজ্জাগত ভেদের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এর মেধা—এর বীর্য্য—এর বিশাল প্রাণশক্তি অতুলনীয়। এগুলোকে আয়ত্ত ক'রে কাজে লাগাতে পারলে—মার্জ্জনা কোর্ব্বেন সম্রাট, সমস্ত ভারত চমকিত হবে।

আকবর—মন্ত্রী দুর্ল্লভ! আমি তাই চাই। আপনাদের সম্রাট আমি—বাংলার রাজগণকে দিল্লীর সিংহাসনের চারপাশে সমান আসনে বসিয়ে তাদের মধ্যে সাম্য চিরস্থায়ী কোর্ব্ব। এখন বলুন মন্ত্রি—পাঠান দস্যুর অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য আপনার রাজা কি ব্যবস্থা করেছেন?

দুর্ল্লভ—সম্রাট! সেই বিষয়ে আপনার এবং মহারাজা মানসিংহের ও টোডরমল্ল প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারিগণের উপদেশ গ্রহণ করতে ভুরসুটরাজ আমায় পাঠিয়েছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে রাজা রাজ্যেরই এক সর্ব্বগুণান্বিতা রমণীর পাণিগ্রহন করেছেন। সেই মহীয়সী নারী রাজকার্য্যে রাজাকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করছেন। ভুরসুটে এখনও পাঠান দস্যুর অত্যাচার হয়নি, তবে তারা দ্বারপ্রান্তে সুযোগের অপেক্ষা করছে। আমরা এসকল জেনে সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত আছি এবং সবদিক দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছি। সুরক্ষিত দুর্গ, সৈন্যবল ইত্যাদি সব ব্যবস্থার জন্য রাজকোষ হতে বহু অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা রাজা করেছেন। আর আমাদের নৌবল আছে—তারও শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে। সম্রাট! শত্রুর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে রাজ্যে সক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই প্রস্তুত হচ্ছে। আপনার অনুকম্পা, আদেশ পাবার জন্য সম্রাট। আমার রাজা আমায় যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। ভুরসুটের আনুগত্য গ্রহণ করে আমার রাজাকে বাধিত করুন।

আকবর—আমি সব কথা শুনলুম। আমি সুখী হলুম। আপনার সকল বিষয় আমি অনুমোদন না করার কোনও কারণ দেখি না। এতে আপনার রাজা আমার সাহায্য পাবেন। কি বল মান! তোডরমল্ল! এ সবই ত ভাল ব্যবস্থা। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমি আমার অনুজ্ঞাপত্র আপনাকে দেবো। ভারতে ভারত সন্তানেরা যাতে স্বার্থগত উদ্দেশ্যে চালিত না হয়, তার ব্যবস্থা হোক—আল্লার দয়ায় সকলের উপর শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

গদাধরের পুনর্জ্জন্ম

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

"একটু টামাক খাওয়াটে পারেন, মশাই ?"

কথাটা শুনে মনে হ'লো যেন চেনা-চেনা গলা। কিন্তু, কে, ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম—"কে হে তুমি ?"

জবাব পেলুম—"চিন্‌ছেন না ? আমি গডাঢর চণ্ডোর।"

ব্যস্, নামটা শুনেই চেনা গেল লোকটি কে। বললুম—"এসো এসো, ভায়া। প্রথমে চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু তোমার নাম না জানে কে ? প্রমদার ছোট ভাই, শশিভুষণের বড়ো কুটুম, আর রমেশ-মজুমদারের ইয়ার-দোস্ত,—তুমি তো স্বনামধন্তি পুরুষ।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ, আপনি টো সবই জানেন ডেখি। এটোটা যখন জানেন টখন আপনিও টো কুটুম-মানুষ। টামাকটা খাওয়ান্ ডেখি একবার।"

তামাকের চুল্লি আমার চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বলে। তবু—সেই কখন হ'তে এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একলা একলা ব'সে আছি,—কথা-বলার সঙ্গী যখন হঠাৎ জুটেই গেল তখন আলাপ পরিচয়টা জমাবার ইচ্ছাও হলো। তাই একটু ঘুরপাক দিয়ে আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলুম। বললুম—"আমি তো তোমার কুটুম-চেনার সুবাদে কুটুম। এতো আদত কুটুম থাকতে আমার কাছে এসেছো কেন তামাক খেতে ?"

গদাধর চন্দ্রের জবাব পাওয়া গেল—"আডট কুটুম বল্‌ছেন কাকে ? আপন চেয়ে পর ভালো, পর হ'টে জঙ্গল ভালো, আমলই ডেয় না এখন কেউ ! ম'রে গেলে কে কার ডিডি কে কার ডাডা ?—সবই ফক্কিকার।"

গদাধরের তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে ; বুঝলুম—ঠিকই বলছে কে কার দাদা কে কার দিদি ! কিন্তু,···ঐ যে কি বললো—ম'রে গেলে ! লোকটা কি তবে ম'রে গ্যাছে নাকি ? শুধোলুম—"একি বল্‌ছো তুমি ? কোত্থেকেই বা কথা বল্‌ছো ? তুমি স্বর্গে, না মর্ত্ত্যে ?"

"স্বর্গেও নয়, মর্ট্যেও নয়।"

তবে ? লোকটি কি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে নাকি ? আহা, তা হ'লে বেচারা খায়ই-বা কি, আর থাকেই-বা কাকে নিয়ে ?—আমার মনের এ কথা হয়তো টের পেয়েই গদাধর হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো ; তারপরে বল্‌লো—"কি ভাব্‌ছেন অটো ? ভাব্‌ছেন বুঝি আমি শূন্যের উপর ডোল খাচ্ছি, আর সেখানে একলা একলাই ডিন কাটছে ? আশমানেই ঠাকি আর জমিনেই ঠাকি, একলা ঠাক্‌বো কোন্ ডুঃখে ? স্যাঙ্গাট্ আছে না—নীলকমল ?"

নীলকমল ! জিজ্ঞেস করলুম—"নীলকমলকে স্যাঙ্গাৎ পেয়েছো ? সেই নীলকমল, যে বেহালা বাজিয়ে গান গায়—পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো ?"

গদাধর বল্‌লো—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই বটে। কিন্টু সে টো এখন ও-গান আর গায় না, গায়—আম অহিম না জুড়া করো ভাই—এই গান।"

বল্‌লুম—স্যাঙ্গাৎটিকে সঙ্গে আন্‌লে না কেনো ? তার মুখে একবার ও রামধুনটা শোনা যেতো।"

গদাধর জানালো, "সে গ্যাছে ডুডুর জোগাড়ে।"

"তুমি খেতে এসেছো তামাক, আর সে গ্যাছে দুধের জোগাড়ে, ব্যাপারটা কি হে ? কোনো উৎসবের ঘটা আছে নাকি ?"

গদাধর বল্‌লো, "উট্‌সব হবে কেনো ? আমরা ডুজনেই যে রোজ টামাকও খাই আর ডুডুও খাই।"

"কেনো, ও-দুটো জিনিষ মুখে না পড়লে বুঝি অমের্ত্তের সোয়াদ পাওয়া যায় না ?"

"কি বল্‌ছেন আপনি—নেহাট ছেলে মানুষের মটো কঠা ? অমেরটোর সোয়াড আমরা পাবো কোঠায় ?

অমেরটো শুডু ডেব্‌টারাই খায়। মানুষ যাগযজ্ঞি করে; টার ঢুঁয়ো নাক-মুখ দিয়ে সমস্তই টেনে নেয় ডেব্‌টারা; আর চরুর পায়েস যা হয় টাও হাপুস্‌-হুপুস করে টারাই গেলে। ঐ ডুটোই খাঁটি গাওয়া জিনিষের পোষ্টাই খাবার কিনা, সেইটেই টো অমের্‌টো। টার ভাগ আমরা পাবো কেনো?"

জিজ্ঞেস কর্‌লুম, "তাই বুঝি তোমাদের ভাগ তামাক আর দুধ?"

"হ্যাঁ, আম্বরী টামাক আর একঠেঙ্গে গাইয়ের ডুডু—এই ডুটোতে মিলে হয় সোমরস। ম'রে গিয়েছি কিনা, টাই আমাদের ঐ সোমরস খেয়েই বেঁচে ঠাকৃটে হয়। কিন্তু ঐ টামাক আর ডুডু বা জোটে কোট্‌ঠেকে? আম্বরী টামাক টো যে-সে খেটে পায় না, খায় শুডু রাজারাজড়ারা আর নবাব বাড্‌শারা। আপনিও টো সেই রকম রাজারাজড়া-মানুষ, নইলে আপনার কাছে ঐ আম্বরী টামাকের গড়গড়াটা ডেক্‌বো কেনো? আর ওটা ডেখেই তো টামাক খেতে চাইলুম আপনার কাছে। স্যাঙ্গাট নীলকমল ঢুর্‌ছে একঠেঙ্গে গাইয়ের ডুডুর খোঁজে। টাও টো রাজারাজড়ারা আর নবাব-বাডশারা পোষেন কিনা। টার জন্ত কোন্ মুল্লুকে ছুটতে হয়, কে জানে?"

সোমরসের মালমশলা কি জানা গেল। কি করে তা তৈরী হয়, গদাধরের কাছে তাও জানতে চাইলুম।

গদাধর বল্‌লো—"একপেট আম্বরী টামাকের ঢুঁয়ো টেনে পেটে ঢকঢক্ ক'রে একঠেঙ্গে গাইয়ের ডুডু ঢেলে দিলেই টিন ডিনেই সোমরস টৈরী হ'য়ে যায়, আর একবার টা টৈরী হ'য়ে পেটে ঠাক্‌লে সাট দিন ঢ'রে ক্ষিডে টেষ্টা একডম খটম্। কিন্টু, ঐ ডুটো জিনিষ জোটানোই মুস্কিল। টাই, আমি আর স্যাঙাট নীলকমল বেহ্মার কাছে গিয়ে ঢন্না দিয়ে পড়েছিলুম; বল্লুম—'ঠাকুর্ডা, ম'রেও যে পোড়া পেটের ক্ষিডে সাম্‌লাটে পারি না; সোমরসের আম্বরী টামাক আর একঠেঙ্গে গাইয়ের ডুডুর জন্ত একশোবার নীচ উপরে ছুটোছুটি কর্‌টে হচ্ছে; আরটো পারি না। আপনি আমাডের বর ডিন্—হয় রাজারাজড়ার; নয়, নবাব বাড্‌শার ঘরে গিয়ে আমরা জন্মাই; টা হো'লে টামাক আর ডুডুর জন্তে আর হায়রাণি হ'টে হবে না'।"

জিজ্ঞেস কর্‌লুম—'পিতামহ ব্রহ্মা সে বর দিলেন?'

গদাধর বল্‌লো—"টিনি বল্‌লেন—'টঠাষ্টু! কিন্টু, বট্‌স, কয়েকটা ডিন সবুর করো। নারডমুনিকে পাঠিয়েছি নখ বাজাটে। টিনি ফিরে এলেই বুঝডে পারবো কোঠাকার রাজারাজড়া বা নবাব বাডশার কুলে টোমাডের জন্ম নিটে পাঠাবো।' সেই অপেক্ষাই কর্‌ছি, ডাডা। রাজারাজড়া কি নবাব বাড্‌শার ঘরে এবারকার জন্মটা নিটে পারি টো, মনের সাঢে গুড়ুক গুড়ুক ক'রে গড়-গড়ার নলে আম্বরী টামাক টান্‌বো। আর ডুডু? টখন ডুডু-ডই-ক্ষীর-সণ্ডেশ কট খাই কট ফেলি, কে টার হিসাব রাখবে?"

পুনর্জ্জন্মের আশায় গদাধর চন্দ্রের মুখের স্বর গদগদ হ'য়ে উঠলো।

—"ভালো ভালো,"—আমিও ভাবলুম পিতামহ ব্রহ্মার বরে গদাধরচন্দ্রের আম্বরী তামাক আর দুধের অভাব না হোক্! তার আয়েসের আমেজের কথা ভেবে আমারও সর্ব্বাঙ্গ নাগরদোলায় দোল খেতে লাগলো।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গদাধরচন্দ্রকে তামাক খেতে দেবো ব'লে আল্‌বোলার নলটা তুল্‌তে গেলুম। কিন্তু, কোথায় সে আলবেলো? আলবোলার বদলে কার মাথার চুলে আমার হাত ঠেক্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নের দিকে শব্দ হ'তে লাগ্‌লো খক্-খক খক্।

সেই খক্-খক্-খক্ শব্দ শুনে হঠাৎ চম্‌কে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখি—আমার তিন বছরের দাদুভাই আল-বোলাটা সরিয়ে নিয়ে তার নল টান্‌ছে, আর খক্-খক্ ক'রে কাশ্‌ছে। আর, যার মাথার চুলে আমার হাত পড়েছে, সে আর কেউ নয়, আমার সাত বছরের দিদিমণি। একবাটি দুধ হাতে নিয়ে একপাশে সে ব'সে আছে।

প্রতিকূল দৈবং

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নদী বহে সেথা কর্ম্মনাশার
বায়ু বহে সেথা ব্যর্থতার,
সার্থক নয় কিছুই সেখানে
কেন যে বুঝিনে অর্থ তার।
তার তরুলতা সব নিষ্ফল,
ঝলসিয়া যায় সহসা সকল,
পদ্মাও যায় ফল্গু হইয়া
শুধু চিনা রাখি' মত্ততার।
বিন্ধ্যের মত উঠি' গিরি সেথা
মৈনাক সম মগ্ন হয়।
মৎস্যচক্র ভেদি'—সচকিতে
পার্থের শর ভগ্ন হয়।

বৃত্রাসুরকে না করিয়া নাশ
যায় দম্ভোলি কাটাইয়া পাশ,
দেবতার বর অমোঘ—জানি না
কুমন্ত্রে কার স্বপ্ন হয়।
হীরকের দানা বাঁধিতে বাঁধিতে
হয়ে যায় সেই অঙ্গারি,
সাগর মথিয়া সুধা বাদ দিয়া
হলাহল যায় পান করি'।
শব সাধনার ক্লেশ সয় তারা,
সিদ্ধির ফল তারা হয় হারা,
নিজে বলি হয়ে তাপিত ধরাকে
যায় বরাভয় দান করি'।

●

নাতনী আমাকে চোখ মেলতে দেখে বল্‌লো, "এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলে, দাদু? ঘুমের মধ্যে কি ছাই, তামাক-তামাক দুধ-দুধ বল্‌ছিলে? আর আমার চুল ধ'রেই বা টান্‌ছিলে কেনো? আমি কতক্ষণ দুধ নিয়ে ব'সে আছি, তোমার অষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে না? অষুধ খেয়ে দুধটা খেয়ে নাও।"

সকাল-বিকাল দু'বেলা আমার বুড়ো বয়সের কালো-মাণিক অষুধের ডেলা মুখে গোঁজার অভ্যাস, আর তার সঙ্গে একবাটি দুধ। নাতনী সেই দুধ নিয়েই এসেছে। সকালবেলা কালোমাণিকের মাত্রাটা হয়তো একটু বেশীই হয়েছিল। এতক্ষণ তারই জের চল্‌ছিল।

নাতি আলবোলাটা সরিয়ে নিয়েছিল, সেটা কাছে টেনে এনে নাতনীকে বল্‌লুম, "দুধের বাটিটা রাখ এখন। আগে আম্বরী তামাকের ধোঁয়ায় পেট পুরে নেই, তারপর চক্‌চক্ ক'রে দুধটা গলায় ঢেলে দেওয়া যাবে, খাঁটি সোমরস তৈরী হবে।"

নাতনী আমার কথায় কি বুঝ্‌ল, সেই জানে। আমি আলবোলার নলে টান দিলুম—ভুরুক্-ভুরুক্-ভুরুক্।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্ত' কি বাস্তব ?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ছুটি পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জন্মভূমি কাঁটালপাড়ার বাড়ীতেই অবস্থান করেন। এ পর্য্যন্ত চাকুরী পাওয়ার পরে তিনি বাড়ীতে খুব কমই আসিতেন। বহরমপুরে থাকা কালে মাতৃশ্রাদ্ধের সময় ছাড়া আসিতেই পারেন নাই। বঙ্গদর্শনের কাজে তিনি বহরমপুরেই থাকিতেন। সেখানে শরীরটাও ভাল যাইত না। Casual Leave লইয়া মাঝে মাঝে বঙ্গদর্শনের কাজেই কলিকাতা আসিতেন। এবার একাদিক্রমে (মাঝে ১৮ মাস ব্যতীত) তিনি পাঁচ বৎসর কাল বাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দেশের সেই মধুর স্মৃতি সম্বন্ধে পাঠককে কিছু নিবেদন করিব।

১৮৭৪-এর২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত অবকাশ; ৪ঠা মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বারাসতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, বারাকপুরের রাস্তায় মোটে ১৪ মাইল ব্যবধান; অনেক সময়েই পাল্কিতে যাতায়াত চলিত। বিশেষতঃ পূজার সময় এবং অন্যান্য ছুটির মধ্যে বাড়ীতেই থাকিতেন।

২৫শে অক্টোবর (১৮৭৪) হইতে ২৩শে জুন (১৮৭৫) পর্য্যন্ত ৮ মাস মালদহে। অতঃপরে প্রায় নয়মাস অবকাশ লইয়া বাড়ী থাকিবার পরে ১৮৭৬-এর ২০ মার্চ্চ হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হন।

তিন বৎসর বাড়ী হইতেই অপর পারে চুঁচুড়ায় যাতায়াত করিতেন।

১৮৭৯-এর জুন মাসে বাড়ী হইতে বাস উঠাইয়া হুগলী জোড়াঘাট অবস্থান করেন।

বাড়ীতে বৃদ্ধ যাদবচন্দ্র স্বয়ং অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একখানি দানপত্র সম্পাদন করিয়া পুত্রগণকে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদিগকে পৃথক করিয়াই দেন। উত্তর দিকে বাড়ী করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণকে কয়েক বিঘা জমি দেন। বঙ্কিমচন্দ্রকেও বাড়ীর দক্ষিণদিকে তুল্যাংশরূপ জমি দান করেন। সঞ্জীবচন্দ্রকে থাকিবার জন্য দোতলার দক্ষিণ দিক দেন এবং পূর্ণচন্দ্রকে দেন উত্তর দিকটা। সকলেই পৃথক হন, কেবল পূর্ণচন্দ্রকে নিজ সংসারভুক্ত করিয়া রাখেন। পূর্ণচন্দ্র এই সময় মোটে ৬০৲ বেতনে সব-রেজিষ্ট্রারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সদর বাটীও সঞ্জীবচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্রকেই দেন।

এই দানপত্রের পরেই চারিভ্রাতা পিতার ইচ্ছানুক্রমে একখানি এগ্রিমেণ্টে (চুক্তিপত্রে) এমন ভাবে আবদ্ধ হয়েন যে, সম্পদে বিপদে সকলেই পরস্পরের সাহায্যে তৎপর থাকিবেন। কিন্তু এই দানপত্রের পরিণাম বড় শুভ হয় না এবং এক সময়ে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণও হয়, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানে বাড়ীতে অবস্থানই ছাড়িয়া দেন। কৃষ্ণকান্তের উইল কবি-কল্পিত কাহিনী মাত্র নয়। ইহা যাদবচন্দ্রেরই বাড়ীর কাহিনী আর কৃষ্ণকান্ত যাদবচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নহেন। কথাটা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে (১৮৭৩ খৃঃ) অকৃত্রিম সুহৃদ দীনবন্ধুর মহাপ্রয়াণ হইয়াছে, সাহিত্যাকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র অপসারিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণেও বন্ধু-বিয়োগ শেলের মত বাজিয়াছে। এখন রহিলেন কেবল জগদীশনাথ ও মধ্যম জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র। কিন্তু বাড়ী আসিয়া শুনিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটিগিরিটি গিয়াছে। তিনি স্পেসাল রেজিষ্ট্রারের পদে স্বল্প (মাত্র দুইশত টাকা) বেতনে চাকুরী করিতেছেন। ভ্রাতার এই অবনতিতে তিনি খুবই মর্ম্মাহত হইলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র অসম্ভব ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। চাকুরীটি যাইবার কারণও এই ব্যঙ্গপ্রিয়তা এবং স্পষ্টবাদিতা। তিনি কোন অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রদত্ত বিবরণটি প্রামাণ্য বিধায় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম—

"সঞ্জীব তখন 'প্রবেশনারী' ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েকটা পরীক্ষায় পাশ হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। কি একটা নাকি বোধ হয় ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্‌স্ য়্যাক্ট পাশ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিসনার হইলেন। সঞ্জীববাবুও একজন কমিসনার হইলেন। একদিন কমিটীতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে, সঙ্কল্প হইল ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজসাহেব বলিলেন, 'আর ৭৫৲ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গালা নামগুলো কে বুঝিবে ? ওগুলো ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গাল বলিলে কেহই চিনিবেনা, Daughter in Law's Lane বলিতে হইবে।' জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না অথচ তিনি বারবার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, '৭৫৲ টাকায় হইবে না, আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।' জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কেন ?' সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'আদালতের সম্পর্কে যতলোক আছে সকলের নামই ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালিপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালিপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে ? উঁহাকে Black-footed friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজসাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপী লইয়া কমিটী হইতে উঠিয়া গেলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব, কাজ ভাল করিলে না। বাড়ী গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীব তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গিয়াছেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাশ করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানিনা। কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।"

সম্বন্ধ নাই একথা বলা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্র "সঞ্জীবনী সুধায়" এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। ঘটনাও প্রায় তদ্রূপই দাঁড়াইয়া ছিল, তখনকার নিয়ম ছিল যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে Ist. Standard পাশ করিবার পরে তাঁহার দুই বৎসরের মধ্যে 2nd Standard পাশ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার চাকুরী থাকিবে না। ১৮৬৪-এর সেপ্টেম্বরে সঞ্জীব ডেপুটীর পদে নিযুক্ত হন আর Ist. Standard ১৮৬৬ সালের এপ্রিলে পাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানান যে, ১৮৬৮ অক্টোবর মধ্যে পাশ করিতে না পারিলে তাঁহার চাকুরী থাকিবে না। এই শেষ পরীক্ষায় আর তাঁহার পাশ করা হইল না। নিম্নলিখিত নম্বর তিনি পান।

In Higher Standard Examination.

	Judicial	Revenue
Oct. 1867	68	90
Ap. 1868	116	61
Oct. 1868	90	75
April 1869	23	58

এই Judicial-এ তিনি বাস্তবিক ২৩ পান নাই, ৭৩ পাইয়াছিলেন। নিয়োগের তারিখ হইতে ছোটনাগপুরের কমিসনার কর্ণেল ড্যানটন, যশোহরের কলেক্টর J. Monro তাঁহার প্রশংসা করা সত্ত্বেও আর Revenue Report এ (1863—69) খুব efficient officer বলিয়া সাহেবেরা তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, সেই ভাবে ছোট লাট বাহাদুরকে Memorial-ও করিয়াছিলেন, তথাপি চাকুরী আর হয় নাই। তিনি যে ৭৩ পাইয়াছিলেন, ২৩ নয়, তাহাও লেখা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না, তিনি সবরেজিষ্ট্রারই রহিয়া গেলেন।

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য—তিনি লিখিয়াছেন—

......অল্পদিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন। ডেপুটীগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

"কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গভর্ণমেণ্টের এমন একটা গলদ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরাণী যদি কোন কৌশল করে তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট একথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটীগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটী চাকরী দিলেন—বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।"

"যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেনসস্ হইল। এ কার্য্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration-এর উপর অর্পিত। সেনসসের অঙ্ক সকল ঠিকঠাক দিবার জন্য হাজার কেরাণী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।"

এই সঞ্জীবচন্দ্রের কতকগুলি দোষগুণ ছিল, গুণগুলি যেমন অসাধারণ, দোষও প্রায় সেইরূপই। তিনিও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার Bengal Ryot, জাল প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি গ্রন্থ খুবই মূল্যবান। এক সময়ে Bengal Ryot হাইকোর্টের জজদেরও বিচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন। তাঁহার পালামৌ ভ্রমণ, কণ্ঠহার, মাধবীলতা, দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট অতীব উপাদেয় উপন্যাস। সর্ব্বোপরি তাঁহার মনটী বড় সাদা ছিল। রহস্যালাপে, সহানুভূতিতে এবং ঔদার্য্যে তাঁহার তুলনা ছিলনা। যখন বাড়ীতে যাইতেন তাঁহার কথা শুনিতে লোক ঘিরিয়া থাকিত। সাধারণের সঙ্গে বঙ্কিম যেমনই গম্ভীর ছিলেন, তিনি আবার তেমনি সদালাপী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দোষেই সংসার ভাঙ্গে। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া খরচ করিতেন, এবং অর্থাভাব হইলেই ঋণ করিতেন, আর সেই ঋণে পিতাকেও টানিয়া আনিতেন। কাহাকেও কিছু দিতে হইবে, একটা পয়সা না দিয়া টাকাটাই ফেলিয়া দিতেন, উচ্চশ্রেণী (Second class) ছাড়া গাড়ীতে চড়িতেন না। কখনও ট্রাম গাড়ীতে উঠেন নাই, ঘোড়ার গাড়ীতেই যাইতেন, আর পোষাক-পরিচ্ছদে বেহিসাবে ব্যয় করিতেন। পিতাও তাঁহাকে অতিরিক্ত ভালবাসিতেন ও আবদারে সহায়তা করিতেন। যাদবচন্দ্র ২২৫৲ টাকা পেনসন পাইতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কুলাইত না। পূজা-পার্ব্বণ, ক্রিয়াকাণ্ড, দান-ধ্যান, পণ্ডিতগণকে সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ব্রহ্মোত্তরের আয়, নিজের পেনসন, পুত্রদের সহায়তা কিছুতেই তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিতে পারে নাই। একমাত্র পূর্ণচন্দ্রের ভরণপোষণের ভার স্বেচ্ছায় লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬০৲ টাকায় ঢুকিয়া তিন বৎসরের মধ্যেই ২০০৲ টাকা বেতনের এসেসর হন। ১৮৭১ হইতে পাকা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। পিতা সঞ্জীবচন্দ্রকে যেমন ভাল বাসিতেন, তাঁহার পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রও

তেমন আদুরে নাতি ছিলেন। পিতার ঋণভারে পরোক্ষে দায় বঙ্কিমচন্দ্রের, কারণ তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ তিনি অসম্ভব পিতৃভক্ত ছিলেন। নানারূপ চিন্তায় বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করিল।

জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ উপার্জ্জনশীল, ব্যয়কুণ্ঠ না হইলেও হিসাবী। তবে তাঁহার তিনটী পুত্র এবং অনেকগুলি কন্যা হইয়াছিল। বিশেষতঃ যাদবচন্দ্রের "দানপত্রের" পরে তিনি নিজেই পিতৃদত্ত জায়গায় (যাদবচন্দ্রের বাড়ীর উত্তর দিকে) একটী আলাদা বাড়ী করিয়াছিলেন। বঙ্কিম তাহা করিলেন না। তিনি পিতা, সহোদরদ্বয়, শৈশবের বাড়ী ও রাধাবল্লভ ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। পরিণামে ফলতঃ তাঁহাকেও বাড়ী ছাড়িতেই হইয়াছিল, কিন্তু আপাততঃ সঞ্জীবচন্দ্রের ঔদার্য্যেই পিতৃভিটা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। পূর্ণচন্দ্রও ছিলেন বঙ্কিম-ভক্ত। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার অংশে উত্তরে সরিয়া গেলে তিনি আরও উত্তরের অংশে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে আবার নূতন কামরা হইল। সঞ্জীব ও পূর্ণ নিজেদের অংশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সদরের অংশও দিলেন। বঙ্কিমের এইবার বাড়ীতে অবস্থান কালে এই সব বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বংশের মুখোজ্জ্বলকারী, একান্ত অনুরক্ত, অতীব পিতৃভক্ত, তাঁহাকে ছাড়িতেও পিতার প্রাণ চাহিতেছিল না। তাই সঞ্জীব ও পূর্ণ কার্য্য তাঁহার মনঃপূত না হইলেও পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তিনিও সঞ্জীব ও পূর্ণচন্দ্রের 'দানপত্রে' অমত করিতে পারেন নাই।

এই দানপত্রখানির কাগজখানি হুগলী ষ্টাম্প ভেণ্ডারের কাছে ১লা মে (১৮৭৪) খরিদ করা হয়। বঙ্কিম তখনও বাড়ীতেই ছিলেন, কিন্তু ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া পরে সম্পাদিত হয়। এই দানপত্রখানির নকল পাঠকের বুঝিবার জন্য সমগ্র দান-পত্রখানির উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন।

"বহু জনমান্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওলদে শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবনে ৺শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া হাবেলিসহর লিখিত শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কস্য বসত বাস্তু দানপত্রমিদং সন ১২৮১ লিখনং কার্য্যঞ্চাগে সদর রেজিষ্টারী নৈহাটী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ পরগণা এলাকা হাবেলিসহর পরগণা সাকিন কাঁটালপাড়া গ্রামে আমাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী যাহা আছে তাহার চৌহদ্দি পূর্ব্ব সীমানা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের বাড়ী উত্তর সীমানা শ্রীনীলমনি চট্টোপাধ্যায় ও সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়দিগের বসত বাটী ও গলির রাস্তা পশ্চিম সীমানা শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায় বসতবাটী ও অক্ষয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের জমিন দক্ষিণ সীমানা সদর রাস্তা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কমবেশী দুইবিঘা জমিনের উপর বসতবাটি আছে; ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পিতা ঠাকুর মহাশয় সন ১২৭২ সালের ২১ মাঘ লিখিত দানপত্রের দ্বারা আমাদিগের দুই-ভ্রাতাকে ভদ্রাসন বাটী সমুদয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ভদ্রা-সনের দক্ষিণের অন্দর মহল (খানা) চৌহদ্দি পূর্ব্বসীমা সদর মহল উত্তর সীমানা আমি শ্রীসঞ্জীব আমার অন্দর মহল পশ্চিম সীমানা রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটী ও অক্ষয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের জমিন দক্ষিণ সীমানা সদর রাস্তা এই চতুঃসীমা-বচ্ছিন্ন কমবেশী ।১ ছয় কাঠা জমিন মায় দোতালা পোক্তা ইমারত দোহারা যাহার মূল্য আন্দাজী পাঁচহাজার টাকা হইলে যদিচ পিতাঠাকুর মহাশয় আমাদিগের দুইভ্রাতাকে উক্ত ভদ্রাসন দান করিয়াছেন তথাপি আমাদের মানস যে উক্ত ভদ্রাসন তুমি ও আমরা দুইভ্রাতা বসবাস করিতে থাকি—অতএব আমাদের সুস্থা-বস্থায় ও স্বচ্ছন্দ সময়ে উল্লিখিত চৌহদ্দিস্থিত জমিন মায় ইমারত তোমাকে দান করিলাম। কিন্তু সদরবাটি ও পূজার দালান ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগের দোতলা ও একখানা দোহারা ঘর সমস্ত ও পশ্চিমভাগে যে যে ঘরে সদরের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাও নীচে উপরে গলির পথ যাহাতে আমাদের যাতায়াত হইয়া থাকে ও জল যাইবার পথ সকল তিন ভ্রাতায় সমানাংশে এজমালীতে রহিল আর তোমার অন্দর মহল্ অর্থাৎ যাহা তোমাকে দান করা হইল ঐ মহলের উপরের পূর্ব্বঘরের পূর্ব্বাংশের নূতন বারান্দা যাহা তোমাকর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ বারান্দা হইয়া আমাদিগের তিন ভ্রাতার সদর ও মফঃস্বল বাড়ীতে যাতায়াতের নিরূপিত আছে ঐ পথ নিবারিত হইবেক না এবং তুমি কোন বাধা জন্মাইতে পারিবানা; ফলতঃ ঐ বারান্দা তুমি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছ এজন্য ইহার স্বার্থ তোমার থাকিল আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে, এই দানপত্রের লিখিত দ্বিতীয় চৌহদ্দিস্থিত জমিন মায় ইমারত অর্থাৎ এক্ষণে তুমি যে মহলে বাস করিতেছ সেই মহল তোমাকে দান করা গেল ও ঐ মহল তোমার নিজ চিহ্নিত হইল। এতদর্থে অত্র দানপত্র লিখিয়া দিলাম, তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করিতে রহ, ইতি সন ১২৮১ তাং ১২ আশ্বিন।
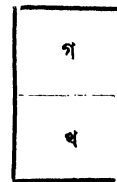
ক—সদর

খ—পূর্ব্বে শ্যামাচরণ থাকিতেন। যাদবচন্দ্র দানপত্রে সঞ্জীবচন্দ্রকে দেন। সঞ্জীব বঙ্কিমকে দেন।

গ—পূর্ব্বে সঞ্জীব বাস করিতেন—দানপত্রে ইহা পূর্ণচন্দ্রকে দেওয়া হয়। এখন বঙ্কিমকে খ অংশ দিয়া সঞ্জীব এখানে বাস করিতে লাগিলেন।

ঘ—দানপত্রের পর পূর্ণচন্দ্র ঘ চিহ্নিত নূতন মহল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দখিলকার রহিলেন।

ক—সদরবাটী—সঞ্জীব, বঙ্কিম ও পূর্ণচন্দ্রের।

এই দানপত্র হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আর সার্দ্ধশতাব্দীবাদে শরৎ কুমারীর পুত্র ব্রজেন্দু, নীলাম্বুর, পুত্রত্রয় নীলাদ্রি, হিমাদ্রি ও বিন্ধ্যাদ্রি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত দৌহিত্রগণ ১৯২৯খৃষ্টাব্দে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ও আষাঢ় মাসে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সব-জজ বিপিন বাবুকে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হন। ইতিপূর্ব্বে সঞ্জীবচন্দ্রের অন্দর মহলাদিও বিপিনচন্দ্রই খরিদ করিয়াছিলেন, এখন সমগ্র বাড়ীটি বিপিনচন্দ্রের পুত্রদের দখলে। শ্যামাচরণের বাড়ীর আর অস্তিত্ব নাই। রেলওয়ে কোম্পানী দখল ও খরিদ করিয়া নিয়াছে।

এই দানপত্রে বঙ্কিম পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন না। উপরন্তু যাদবেশ্বর শিবমন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম দিকের একটা গোয়াল বাটীতে যাহা ইতিপূর্ব্বে পিতাই তাঁহাকে উক্ত দানপত্রানুসারে দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একখানি বৈঠকখানা তৈয়ার করিলেন। এই বৈঠকখানায় বসিয়াই কৃষ্ণকান্তের উইল রচিত হয়, এখানেই সম্ভবতঃ *বন্দেমাতরম্ রচিত হয়, অন্ততঃ ইহার পাণ্ডুলিপি প্রথমে দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এখানেই অসংখ্য সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব সঙ্গীত কথাবার্ত্তা ও মজলিসে মিলিত হইয়া স্থানটিকে শ্রেষ্ঠ সারস্বত মন্দিরে পরিণত করিতেন। এস্থানের স্মৃতি বড়ই মধুর ও গৌরবময়।

ইতিমধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়ই (১৮৭৩) একটি 'বঙ্গদর্শন' মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন। বাড়ীতেই একটি সভা করিয়া যাদবচন্দ্রকে সভাপতি ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যাবতীয় ব্যক্তিকে সভ্য করিয়া এই ছাপাখানার উদ্বোধন হয়। এই ছাপাখানা হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮১ সালে 'ভ্রমর' প্রকাশিত হয়। এবং তাঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ উহাতে বাহির হয়। বঙ্গদর্শনের গ্রাহক সংখ্যাও দ্বিতীয় বৎসরে ১৫০০তে † উঠে।* সুতরাং উক্ত ছাপাখানার লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই পত্রিকা ও বঙ্গদর্শন প্রেস সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের কথাই পাঠককে উপহার দিতেছি :—

"১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি 'বঙ্গদর্শন' সৃষ্টি করিলাম, ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে একটা ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানি ক্ষুদ্রতর মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারেনা, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিকপত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকত্ব তিনি গ্রহণ করেন। সেই অনুসারে তিনি 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। কণ্ঠহার, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট 'ভ্রমরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল।"

বারাসতে বঙ্কিম Porter সাহেবের নিকট চার্জ্জ বুঝিয়া নেন এবং পরে Wilkinson-কে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া মালদহে যান। মালদহে মাত্র ৪ মাস ছিলেন। তারপরে কিছুদিন ছুটি নিয়া বাড়ী থাকেন। অগত্যা তাঁহাকে মালদহে যাইতেই হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বারাসতের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি কথা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তখন আমার বয়স ষোল সতের বৎসর হইবে। আমাদের গ্রামে ভট্টাচার্য্য পল্লীর কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহের মোকদ্দমা। ভিন্ন জাতীয়া এক কন্যার সঙ্গে ঐ ভট্টাচার্য্য বংশীয় কালীনাথের বিবাহের ঘটক ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে জাতি ও ধর্ম্মনাশের মোকদ্দমা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারাসত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ে উপর্য্যোক্ত ঘটনার সংশ্লিষ্ট আসামীদের বিচার হয়। আমরা গ্রামের বহু সংখ্যক বালক সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম।

বারাসতের আদালত গৃহ উদ্যান পরিবেষ্টিত এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারাসত জিলা ছিল…। সেদিন তাঁহার সর্ব্বজন—লোভনীয় সৌন্দর্য্যের লীলা-বিলাস-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদা ঋষিরা রামরূপে মুগ্ধ হইয়া রামের পুরুষকান্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়া সেই যে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্যের তেমন বিজলী-লীলা আর কখনও কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য্য ও চুচুঁড়ার ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি। তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। জন-সমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই।'

মালদহের রোড্‌সেসের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন। আর ১৮৭৪ সালের ২০শে নভেম্বরের আদেশে তিনি Land acqui-

* যতদূর জানিতে পারিয়াছি বন্দেমাতরম্ এইখানেই রচিত হয়। † সুলভ সমাচার ১৮৭৪।

sition Collector-এর বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। [Vide Gazette 25. 11.74] কিন্তু সে স্থানে গিয়া তাঁহার অত্যন্ত অসুখ হয়। এ অসুখ মাথার অসুখ। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মালদহে থাকিতে মাথার ব্যারাম হয়, সেই হইতে রাগ হইয়াছে, ইহা আর সুধরাইল না। যে বাড়ীতে সেখানে ছিলেন, সেথায় নাকি পূর্ব্বে নরবলি হইত। পরিবার সঙ্গে ছিল না। একদিন এক কুঠরীতে বসিয়া আছেন, কে আসিয়া ভয়ানক বেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। "কেরে? কেরে?" বলিয়া বঙ্কিমবাবু চীৎকার করিলেন। উত্তর নাই। চাকরেরা আসিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সেই হইতে মস্তিষ্কের পীড়ার সূত্র। পরদিন কাছারীতে লিখিতে লিখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" সাধনা, শ্রাবণ, ১৮৯৪।

এই সময় হইতেই বঙ্কিম নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ মই দিয়া উপরে উঠিলে ভয় পাইতেন। ভারতী, ১৩১৮।

মালদহে যাইবার পূর্ব্বেই তথাকার জলবায়ু ভাল নয় জানিয়া তিনি পূর্ব্বেই অপর জায়গার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৃহে ৩ মাস বিশ্রাম করিয়া তিনি বিলক্ষণ সুস্থ হইয়াছিলেন। ছুটী শেষ হইলে মালদহে গমন করিলে পাছে পুনরায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্য কোন জেলায় বদলী করিতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিয়োগ বিভাগের (Appointment Department এর) সেক্রেটারী মিঃ টমসনকে * ইতিপূর্ব্বে আবেদন করিয়াছিলেন। উত্তরে মিঃ টমসন লিখিয়াছিলেন যে, মালদহের রোড সেসের কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাকে তাঁহার পছন্দমত অন্য কোন জায়গায় বদলী করা হইবে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের কথানুসারে মিঃ টমসন বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত পত্র লিখিয়াছিলেন। মালদহের কাজ শেষ করিয়া তিনি মিঃ টমসনের সেই পত্রখানি লইয়া ছোটলাট বাহাদুরের সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মিঃ টমসন তখন ব্রিটিশ-শাসিত ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনার হইয়া গিয়াছেন। Mr. Ross Louis Mangeles তাঁহার স্থানে প্রধান সেক্রেটারী হইয়াছেন। মিঃ ম্যাঙ্গেলস্ লোক মন্দ ছিলেন না। তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার কতকটা রুক্ষ হইলেও অন্তরে সাধুতা ও দয়া ছিল। কিন্তু তিনি কতকটা দুর্ব্বল চিত্ত লোক ছিলেন। তিনি টমসনের পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "আপনি আপনার বিভাগীয় কমিশনারের সহিত পরামর্শ করুন। তিনি যদি আপনাকে অন্য কোন বিভাগে বদলী করিতে সম্মতি প্রদান করেন তাহা হইলে আপনাকে অন্য কোন বিভাগে বদলী করা হইবে।"

সেক্রেটারীর মুখে এই কথা শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তিনি উত্তর করেন, "সরকার পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পালনের জন্য কমিশনারের মতামতের কি প্রয়োজন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ম্যাঙ্গেলস সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, তিনি ঐ কথা কমিশনারকে লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অনেক কথার পরে অবশেষে সেক্রেটারী স্বীকৃত হইয়া কমিশনারকে পত্র লিখিলেন। কমিশনার সেই পত্রের উত্তরে মিঃ ম্যাঙ্গেলসকে লিখিলেন যে, তিনি বঙ্কিমবাবুকে ছাড়িতে পারেন না, তিনি পাবনার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন সাব্যস্ত করিয়াছেন। ঐ পত্র পাইয়াই মিঃ ম্যাঙ্গেলস বঙ্কিমবাবুকে জানাইলেন—"আপনাকে পাবনায় যাইতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু বিস্মিত হইলেন, অনেক ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "তবে কি ছোটলাট বাহাদুরের লিখিত প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই নাই?"

মিঃ ম্যাঙ্গেলসের ভাব দেখিয়া বঙ্কিমবাবুর ধারণা জন্মিল যে, তিনি অন্ততঃ ঐরূপই মনে করেন। অবশেষে ম্যাঙ্গেলস উত্তর করেন, "আমি কিছুই করিতে পারিব না।"

তখন বঙ্কিম স্বয়ং কমিশনারকে পত্র লিখিবার অনুমতি চাহিলেন। চীফ সেক্রেটারী বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন। মিঃ ককারেল তখন রাজসাহী বিভাগের কমিশনার। তিনি হালিবারি সিভিলিয়ানদিগের মধ্যে একজন অতি উৎকৃষ্ট, সুযোগ্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি দাম্ভিক ও কৌলীন্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন সত্য, আর মেজাজটিতে ঔদ্ধত্যের যথেষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান থাকিত বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহার তুল্য ন্যায়নিষ্ঠ লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। ব্যক্তিগত হিসাবে ইনি বঙ্কিমবাবুর বন্ধু ছিলেন। কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য তাঁহাকে আশাতীত সন্তোষ প্রদান করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর পত্র পাইয়া তিনি উত্তরে লিখিলেন—

"আপনি এই বিভাগের একজন অত্যন্ত যোগ্য কর্ম্মচারী। আপনাকে ছাড়িতে আমার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। আপনার বদলীতে আমি মত দিলাম।"

এই সময়ে মিঃ ম্যাঙ্গেলস বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান—

"আপনি কোন্ কোন্ জেলায় যাইতে চাহেন তাহার একটা তালিকা দিবেন।" বঙ্কিমবাবু তালিকা দিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাঙ্গেলস বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত স্থানে একটি পদ খালি হয়, আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ছুটিতে থাকিয়া কেবল Medical Certificate দিতে লাগিলেন। অবশেষে হুগলীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহারই স্থানে নিযুক্ত হইলেন।

মালদহে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪-এর সেপ্টেম্বর হইতে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৫-এর মে মাস পর্য্যন্ত কাজ করেন।

মালদহে থাকিতে বাড়ীতে একটা ব্যাপার হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঞ্জীবচন্দ্র বড়ই অপব্যয়ী ছিলেন। ইতিমধ্যে পিতা-পুত্রে (সঞ্জীব ও তাঁহার পিতা) যতীশচন্দ্রের বিবাহের জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের ও ঠাকুরদাদার আদুরে নাতির—বিবাহ! খরচ তো আর কম করা হইবে না! কিন্তু ঋণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সঞ্জীব সব ঠিক করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। বঙ্কিম এখানে কিঞ্চি-

* Sir Augustus Rivers Thompson, ইনি (১৮৮২-৮৭) বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দধিক দুইমাস আসিয়া রহিয়াছেন। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; যতীশের সবে ১৪ বৎসর বয়স। কেবল বয়সের জন্যই নয়, টাকা আসিবে কোথা হইতে? বিশেষতঃ ঋণ করিলে তাহা আর শোধ হইবে না, পশ্চাতে তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। আমরা আদ্যোপান্ত পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের তদানীন্তন মনের ভাব অনেকটা পরিস্ফুট হইবে।

১৫ নভেম্বর, ১৮৭৪

To

Babu Sanjib Chandra Chatterjee

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণ:

প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি বাঙ্গলায় লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতাঠাকুরকে পড়িতে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত—আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০৲ ষোলশত টাকা কর্জ্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ্জ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। আপনি না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ্জ দিবে। কর্জ্জ করিলে আপনার বর্ত্তমান পাঁচ হাজার টাকা ঋণের উপর ৭০০০৲ টাকা হইবে। ইহা পরিশোধের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ্জ শোধ করিয়া থাকেন। কোন মাসে কুড়ি টাকা কোন মাসে কিছুই না। অন্ত ২০ বৎসর অবধি আপনি ঋণগ্রস্ত, কখনও ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে, তাহার কি লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না। তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপনি যে ঋণ করিবেন, তাহা পরিশোধের সম্ভাবনা নাই।

যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না মনে জানিতেছেন তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপনি যদি এখন ১৬০০৲ কর্জ্জ করেন, তবে ঋণ গ্রহণ করাকে বঞ্চনা বলিতে হইবে। বরং ভিক্ষাবৃত্তি ভাল তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে অথবা পিতার সুখবর্দ্ধনের জন্য তাহা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ অধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ত্তব্য।

২। এই ৭০০০৲ টাকার ঋণ পরিশোধ হইবে না। ইহার পরিণাম কি হইবে? মহাজন ছাড়িবে না, তাহারা নালিশ করিয়া ডিক্রী করিবে। এমন কোন সম্পত্তি আমাদের নাই যাহা বিক্রয় করিয়া ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারিবে। সুতরাং আপনি যে পরিমাণে পরামর্শের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইল কি প্রকারে? এমন সর্ব্বনাশ যাহাতে ঘটিবার সম্ভাবনা সে ঋণ কেন করিবেন? ইহা জানেন যে, ডিক্রী হইলে একখানি ওয়ারেন্ট বাহির হইলেই আপনার চাকুরীটি যাইবে এরূপ নিয়ম হইয়াছে।

৩। আপনি যদি এই ঋণবৃদ্ধি করেন তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন তাহা বলা যায় না। যতীশ এ সবেরই দায়িক। যেদিন সে প্রথম উপার্জ্জন করিতে শিখিবে সেই দিন হইতে এই ঋণের ভার তাহার মাথার উপর চাপিবে। আর ইহজন্মে তাহা নামাইতে পারিবে কি না বলা যায় না। আপনাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরসা হয় না যে কখনও উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে ঋণের ভার চাপে তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যত টাকা উপার্জ্জন করে তাহার একটী পয়সাও আপনার বলিয়া বোধ করিবার অধিকার থাকে না। উদাহরণ আমাতেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ,* আর আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকুরীজীবী পিতৃঋণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যদি আর ঋণবৃদ্ধি করেন তবে আপনাকে যতীশের শত্রু বিবেচনা করিব। যদি বলেন, ঋণ না করিলে পিতার এই শেষ অবস্থায় অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইবেন আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এই সকল কথা বুঝাইলে তিনি কদাচ ঋণ করিতে বলিবেন না। তিনি পুত্র বৎসল, অবশ্য আপনার এবং যতীশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। যদি না করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে। পিতার অনুরোধে পুত্রের অনিষ্ট করিলে আপনি ধর্ম্মে পতিত হইবেন।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আপনাকে ঋণ করিতে দিবেন না। কিন্তু স্বয়ং ঋণ করিয়া যতীশের বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে বিশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা করিতে দিবেন না। তিনি যদি ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি যে ঋণ করিতেছেন, তাহা কে পরিশোধ করিবে? তিনি বলিবেন যে, আমার ২২৫৲ টাকা পেন্সন আছে, আমি তাহা হইতে পরিশোধ করিব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মাত্র। আজি নয় বৎসর হইল আমরা পৃথক হইয়াছি। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০০৲ টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০৲ টাকা আছে, অতএব এই নয় বৎসরে ৪৪০০৲ টাকা মাত্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে ঋণ পরিশোধার্থ এই নয় বৎসরে ৪৪০০৲ টাকা দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেনসন হইতে একটী পয়সাও কর্জ্জ শোধ করেন নাই। অতএব ভবিষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব তিনি এক্ষণে ঋণ করিলে পরিশোধ করিবে কে? তিনি বলিবেন, পুত্রগণ। কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পরিশোধ করিতে অশক্ত, পিতৃঋণের এক পয়সাও পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। কনিষ্ঠও তদ্রূপ, তাহার যে আয় তাহাতে কোনমতে সংসার নির্ব্বাহ হয়, ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ একপয়সাও দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, বাকী আমি কেবল একা দায়ে ধরা পড়ি। অতএব তিনি যদি এখন যতীশের বিবাহের জন্য ঋণ করেন, তবে আমার ঘাড়ে ফেলিবার জন্য। উহা আমার প্রতি কতবড় অত্যাচার হইবে তাহা তাঁহাকে আপনি বুঝাইবেন।

* ১৮৭৪, মার্চ্চ মাসে জষ্টিস দ্বারিকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পরে রমেশ মিত্র বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন।

আর একটি কথা যদিও অবক্তব্য, তথাপি এ স্থলে না বলিলে নয়। আমার উপর রাগ করিবেন না, আমার দেহের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমার শরীরে শ্বাসকাশাদির বীজ রোপিত আছে, অন্যান্য উৎকট রোগেরও লক্ষণ আছে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না, কেন না দীর্ঘজীবন বাসনা করি না। অধিক দিন বাঁচিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় এবং—প্রতিকারের চেষ্টায় কষ্ট পাইতে হয় প্রায়ই কোন না কোন ব্যাধিতে আমার শরীর রোগগ্রস্ত।

অতএব কতদিন বাঁচিয়া থাকিব তাহা বলিতে পারিনা, বোধ হয় ঋণ পরিশোধ পর্য্যন্ত আমাকে আর বাঁচিতে হইবে না। আর কেবল ঋণ পরিশোধের জন্য বাঁচিয়া কি হইবে? যদি ঋণ হইতে মুক্ত না পাই, তবে রোগের কোন চিকিৎসা হইবে না।

যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত এক পয়সাও ঋণ করিতে পারবেন না। ইহাতে বলিবেন যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল। তথাপি ঋণ কর্ত্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চারিশত টাকা পাওনা আছে, সে এখন দিবে না সত্য বটে, কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে সে দিতে পারে, সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি ২০০৲ টাকা দিতে পারেন, শ্রীযুক্ত ২০০৲, আমিও দুইশত টাকা দিব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিন। ঋণ করিতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুই তিন মাস লাগিবে। অতএব ফাল্গুন মাসে প্রণতঃ বঙ্কিম ৩০ কার্ত্তিক।"

এই পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র কি ভাবিলেন বলিতে পারি না। ১২৮১ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (অর্থাৎ ঐ বৎসরই) যতীশের বিবাহ শালিখা জমিদার বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। সঞ্জীব পরমাসুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে আনেন। বরানুগমনের সময় তিনি রাজবেশে হাতীর উপরে চড়িয়া ঘাটে উঠেন এবং চারিভ্রাতাই বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়মাস মালদহ ছিলেন, হালই পটীতে এক চৌতালা বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীর একতলায় কতকগুলি দোকান ছিল, এখনও আছে। এই বাড়ীটী ভোলাহাটের বিনোদ শাঁর বাড়ী, কাছারীর উত্তর দিকে। বাড়ী দেখিয়া মনে হয় ইহা সাহিত্য সেবীর উপযোগী নয়।

মালদহে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, তাঁহার চাপরাসী পাঁড়েকে কাছারীর সময় অনেকবার ডাকিয়া না পাওয়ায় তিনি চাপরাস রাখিয়া দিতে বলেন। পরে সে রাত্রিতে অন্দরে-বাহিরে ধরাধরি করায় চাকুরী ও খাওয়ার বন্দোবস্ত উভয়ই হইয়া যায়।

মালদহের প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণে গৌড় ও উত্তর দিকে পাণ্ডুয়া। উভয় স্থানেই হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। গৌড়ের মন্দির, বৃহৎ জলাশয়াদি, বল্লালগড় ও প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা এবং সদর দরজা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেনের রাজধানীর কথা বেশ মনে হয়। অন্দর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের,পরীখা দিয়া গঙ্গার দিকে যাওয়ার রাস্তাও আছে। এই রাস্তা দিয়া লক্ষ্মণ সেন রাজধানী ছাড়িয়া বিক্রমপুর চলিয়া গিয়া থাকিবেন। বিস্তারিত আলোচনা পাঠক শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের "গৌড়রাজ মালা" গ্রন্থে পাইবেন।

বিক্রমপুর ও লক্ষ্মণাবতী ব্যতীত লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় রাজধানী খুব সম্ভব নবদ্বীপে ছিল। 'মৃণালিনীতে' বঙ্কিমচন্দ্র নবদ্বীপকেই গৌড় করিয়াছেন। লক্ষ্মণাবতী করিয়াছেন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানকে। সেখানেই মৃণালিনীর আশ্রয়দাতা মাধবাচার্য্য-শিষ্য হৃষিকেশ বাস করিতেন। নবদ্বীপে বর্ত্তমানে রাজধানীর ভগ্নাবশেষ কম, গৌড়ে অনেক আছে। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক গৌড়কে 'নোদ্-ঈয়া' বলায় সাধারণতঃ নবদ্বীপকেই গৌড় বলিয়া ধরা হয়। প্রচলিত মতও তাই। মিনহাজ খাঁ ১২৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসেন এবং এখানে দুই বৎসর বাস করেন। ১২৪৩-এ তিনি লক্ষ্মণাবতীতে আসেন। বিক্রমপুর ও লক্ষ্মণাবতী রাজধানীর উল্লেখ করেন। তিনি 'নোদিয়হ্' বলিয়া রাজধানী উল্লেখ করেন। আবুল ফজল বলেন 'মিনহাজের 'নোদিয়হ্' নবদ্বীপ। ইহাই প্রচলিত মত। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রচলিত মতই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মৃণালিনীর পূর্ব্বে তিনি গৌড় দেখেন নাই। এবার দেখিয়াছেন। অতঃপরে পরবর্ত্তী সংস্করণেও এই স্থানই লক্ষ্মণসেনের গৌড় ছিল কিনা তাহা তিনি বলেন নাই। তাই এবিষয়ে তাঁহার কোন মতামত পাওয়া যায় নাই। নবদ্বীপে গঙ্গার অপর পারে বল্লাল ঢিপি নামে একটী স্থান আছে। অনেকে মনে করেন খনন করিলে সেখানে প্রাচীন কীর্ত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক সেখানে রাজধানীর কোন চিহ্ন আছে কিনা তাহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেখানেও রাজধানী থাকিলেও থাকিতে পারে। এই অনুমানেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র গৌড় দর্শন করিবার পরেও নবদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা (হউক তাহা কল্পিত) পরিবর্ত্তন করেন নাই। তবে মালদহের নিকটস্থ এই গৌড় ও পাণ্ডুয়া তাঁহার মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপরে তিনি মালদহে বসিয়াই লিখিতেছেন—

"গৌড়ের ইষ্টক লইয়া মালদহ, ইংরাজ বাজার, ভোলাহাট, রায়পুর, গিলাবাড়ী, কাশিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ। কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।"*

পরবর্ত্তী 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানটিকে 'লক্ষ্মণাবতী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মালদহে বঙ্কিম ১৮৭৫ সালের জুন মাসের কতক সময় পর্য্যন্ত ছিলেন।

হুগলী বদলী হইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র যে নয়মাস মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া বাড়ীতে ছুটীভোগ করিতেছিলেন ১৮৭৫ ২৪শে জুন হইতে ২০শে মার্চ্চ ১৮৭৬ পর্য্যন্ত। তাহাতে কয়েকটী

*বাঙ্গলার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন ১২৮১, মাঘ (১৮৭৫ ফেব্রুয়ারী)।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে, এইখানে তাহা বিবৃত করা আবশ্যক। গরমের সময় দেশে আসিয়া প্রথমে প্রাণটা জুড়াইলেন। কিন্তু মনটা নানারূপ তিক্ততা পরিপূর্ণ ছিল।

এই বৎসরে বাড়ী আসিবার পরে কলিকাতায় যুবরাজের শুভাগমন হয়। সেই উপলক্ষে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করেন। অন্তঃপুর মহিলারা যুবরাজকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যুবরাজ কাহারও হস্ত ধরিয়া অলঙ্কারাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। এবং জগদানন্দবাবুর স্ত্রী ১০।১২ হাজার টাকার একখানি স্বর্ণহার যুবরাজকে পরাইয়া দেন ও একজোড়া বালা যুবরাজ পত্নীকে উপহার দেন। (সোমপ্রকাশ ২৭শে পৌষ)

এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া হিন্দুপেট্রিয়ট, অমৃতবাজার, মিরার প্রভৃতি দেশীয় সংবাদ পত্র খুব তীব্রভাবে জগদানন্দবাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করে। হেমচন্দ্র "বাজীমাত" লেখেন এবং গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার জগদানন্দ, হনুমান চরিত্র প্রভৃতি প্রহসনে জগদানন্দ বাবুর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। দেখিতেছি বঙ্কিমের লেখনীও একেবারে নীরব থাকিতে পারে নাই। তিনি "স্পেশিয়ালের পত্রে" একটি সুন্দর প্যারডী লিখিয়াছেন। যুবরাজের সহগামী কোন স্পেশিয়াল দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেন লিখিতেছেন—

"বাঙ্গালীরা স্ত্রীলোককে পরদানশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সত্য সর্ব্বত্র নয়। যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিং-পিস্ লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালীরা পৌরাঙ্গনা লইয়া সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শীকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সীসের গুলীতে ছার পক্ষীজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালীর মেয়ের নয়ন বাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে, বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালীর কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমরাও ফৌলিং-পিস্‌টীকে দুই একখানি সোনার গহনা পরাইয়া—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কিনা।

"আমি এমত বলিনা যে, সকল বাঙ্গালীর মেয়ে এরূপ ফৌলিং-পিস অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপনী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি তাহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে:

'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি'

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।"

এই 'স্পেসিয়ালের পত্রে' আরও কয়েকটি জাতীয়তাপূর্ণ সুন্দর ইঙ্গিত আছে—

রাজধানীর নাম Calcutta, ক্যালকাটা, অর্থাৎ এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, তাই উহার নাম কালকাটা।

দেখিলাম অধিকাংশ বাঙ্গালী ম্যাকেষ্টারে তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে, ভারতবর্ষ ম্যাঞ্চেষ্টারের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত, এক্ষণে ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেণ্টলুন পরে এবং কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে এবং কেহ কাহার অনুকরণ তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ ব্রিটিশরাজ্য বেঙ্গলদেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণ ধন ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরাজই জানে। বাঙ্গালীতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালীদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই; তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি; এবং গোলেস্থান এবং বোস্তান নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। এই দুইখানি পুস্তকের স্থূলমর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

— — — বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজীর একটি শাখা মাত্র। ইহাতে একটি সন্দেহ হইতেছে—যদি বাঙ্গালা ইংরাজীর শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এই দেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ আমাদের খৃষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে। এবং অনেক ইউ-রোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না। ইহা এক প্রকার স্থির। (১) তাহার পর কবে ইহাদের ভাষা হইল বলা যায় না। বোধ করি পণ্ডিতপ্রবর মক্ষমুলর মনোযোগ করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সে পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

— — — — — — —

বাঙ্গালীদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যা-

বাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলি বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন্ জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না। কেন না আমি সেই পণ্ডিতপ্রবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে (২) পড়িয়াছি যে. বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে Mitra শব্দ Mitre শব্দের অপভ্রংশ; অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালীদিগের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২

এই বৎসরেই বর্ষ সমালোচনাও (অগ্রহায়ণ) বাহির হয়, তাহাতে অনেক কথার পর লিখিত আছে—

"বৎসর সমালোচনায় তিনটী গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। প্রথম বৎসরটী চলিয়া গিয়াছে, ফিরাইবার জন্য কেহ চেষ্টা পাইবেন না। নিস্ফল হইবে। তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে পাঠক আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা। কেননা আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস-জল ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস-জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

এই কথা দেশপ্রেমিকের কাছে যে কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, তাহা দেশপ্রেমিকই বুঝিতে পারে।

এই দুইটি প্রবন্ধ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনীর সামান্য ২৷৪টী অধ্যায় ও আরও দুই একটী প্রবন্ধ ছাড়া চতুর্থ বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোন রচনা বাহির হয় নাই।

যাহাহউক, বঙ্গদর্শন যে নিয়মিত ভাবে বাহির হইত না তাহার প্রমাণ পৌষ মাসে যুবরাজের আগমনের কথা পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসের কাগজে বাহির হওয়া। অথচ বঙ্কিমও তখন বাড়ীতে। ভিতরে খুবই গলদ ছিল, নতুবা বিক্রীও হইত, হিসাবও পিতৃদেব যাদবচন্দ্র নিজে দেখিতেন, তবে এরূপ বেবন্দোবস্ত হইবার কারণ কি? সঞ্জীবচন্দ্র থাকিতেন তখন বর্দ্ধমানে, সব দেখিতে শুনিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী থাকিয়াও চতুর্থ খণ্ডের বিশেষ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই, এদিকে আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি মাসিক পত্র খুব যশার্জ্জন করিয়াছে। সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে, নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া চতুর্থ বর্ষের পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলেন। আজ সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল। বঙ্গদর্শন যখন উঠিয়া যায়, বঙ্কিম তখন কাঁঠালপাড়া হইতেই হুগলীতে যাতায়াত করিতেন।

(১) Mr. Larinzer, (২) Chips from a German Workshop.

এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোনো দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোনো সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, যদি সে তাহাদিগকে উদ্ধৃত না করিল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়?

—বঙ্কিমচন্দ্র

লাল সাড়ী

শ্রীগুরুদাস বাগচী

সন্ধ্যার বাহুপাশে আবদ্ধ দিবাকর যখন অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করে তখন যদি গোপনে কারো আনাগোনা সুরু হয় তাতে কার না মনে সন্দেহ জাগে? —বিশেষ ক'রে সে যদি হয় এক পূর্ণযৌবনা মনোহারিণী তরুণী—আর তার সুঠাম দেহকে ঘিরে থাকে অগ্নিশিখার মত জলন্ত একখানি লালসাড়ী।

পাড়ার নিরাহ সাদাসিধে মানুষ শ্রীধরবাবু। শোনা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ভদ্রলোকটি কোন এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে স্বপ্রচেষ্টায় 'সু'-প্রতিষ্ঠিত। বাইরে থেকে তাঁর ছোট সংসারের পানে তাকিয়ে ঈর্ষার সঞ্চার হয় অনেকেরই প্রাণে—কারণ সকলেরই প্রায় ধারণা সুখ নাকি এখানে ঘরপোষা। শ্রীধরবাবুর একমাত্র কন্যা রত্না—রূপসী ও বিদুষী।

এই ছিপ্‌ছিপে গৌরবর্ণ মেয়েটাকে নেশার মত পেয়ে ব'সেছে লাল রঙ। শুধু নিজের মনস্তুষ্টির জন্যই লাল আভার লালসা—না অপর কারো মনে আগুন জ্বালাবার সাধেই তার এ খেয়াল তা একমাত্র সেই সঠিক জানাতে পারে। তার এই বাহারী লালসাড়ীর চটকে সে পাড়ায় 'লালসাড়ী' নামেই পরিচিতা।

পাড়ার যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখে থাকে এই লালসাড়ীকে ঘিরে। কল্পলোকের রঙীন্ তু'লতে মানসপটে তারা এঁকে চলে অদ্ভুত অপরূপ ছবির পর ছবি—এমন কি সেই আবেশময় মুহূর্ত্তে অনেক সময় তারা নিজেরাই বি'স্মিত হয় অকস্মাৎ কণ্ঠলগ্ন রত্নালঙ্কারের শোভা দেখে।

এই হেন মেয়ে রত্না কিনা সাঁঝের বাতিটি জ্বলার সাথে সাথে তার লাল সাড়ীর আঁচল উড়িয়ে—বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষের ইঙ্গিত জানিয়ে—হাওয়ার গায়ে দেহ এলিয়ে বিশেষ এক ভঙ্গিমায় সকলের মন জ্বালিয়ে—প্রত্যহ পাড়ি জমাতে শুরু ক'রেছে কোন্ এক না জানা পথে!

সত্যিই এ অসহনীয়! তাই আলোচনার আর অন্ত নেই।

যুবক মহলেই সাড়া জাগে বেশী। রোয়াকের জম্‌কালো আড্ডায় মাতব্বর ন্যাড়া মুরুব্বি চালে বলে—'বুঝলি না—লালসাড়ীর এই দেমাকের মাঝে বেবাক্ সব চাল! যতই জাঁক করুক না কেন—সব ফাঁক হ'য়ে গেছে। অত ক'রে মানা করা সত্ত্বেও না না ক'রে শেষে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য হ'য়েছিল আদিম যুগের ঈভও—আর এ তো কোন্ ছার!'—নীরব সম্মতি জানায় তার সঙ্গী-সাথীরা।

বয়স্কদের নজরেও এ ব্যাপার সজোরে এসে ঠেকে। চুপিসারে এ নিয়ে আলোচনা সুরু হয় তাঁদের বৈঠকখানার আসরে। পরচর্চ্চাপ্রিয় সরকার ম'শায় সেদিন মন্তব্য করেন সরকারী মেজাজে—'বুঝলে হে—কালের হাওয়ায় সব অকালপক্ক হ'য়ে উঠেছে। দেখে দেখে ঘেন্নাপিত্তি সব বেমালুম উবে গেল। ব'লতে পারো রাতের বেলায় সোমত্ত মেয়ের আবার কি কাজ? সব গেল, মান ইজ্জত নিয়ে ঘর করা দায় হ'য়ে উঠল! ছিঃ ছিঃ—শেষে কিনা শ্রীধরের মেয়েটাও লেখাপড়া শিখে পেছল পথে পা হড়কালো!'

কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোচনা—এত সোরগোল সেই লালসাড়ী কিংবা তার বাড়ীর কেউই কিছুই জানতে পারে না এ সম্বন্ধে। আড়ালে-আবডালে কোথায় কখন যে এইসব নোংরা আলোচনার পরিসমাপ্তি হয় চরমে—তা টের পাওয়া যায় না বিন্দুবিসর্গ। শুধু একলা চলার পথে প্রায়ই যেমন পাড়ার অসভ্য চ্যাংড়াদের টিট্‌কারী সইতে হ'ত লালসাড়ীকে তা যেন মাত্রায় কিছু বেড়েছে ইদানীং।

সেদিন এই টিট্‌কারীর পরিণতি হয় সাংঘাতিক। সবেমাত্র সন্ধ্যার আড্ডায় একে একে সকলে এসে জমায়েত হ'য়েছে নির্দ্দিষ্ট রোয়াকে। এমনি সময়ে সেখান দিয়ে যথারীতি লালসাড়ী চলে সগর্ব্বে উন্নত মস্তকে। সকলে মনের ভাষা প্রকাশ করে ইসারায়-ইঙ্গিতে, কিন্তু হঠাৎ পালের গোদা ন্যাড়া বেফাঁস তার স্বরচিত ছড়াটি ব'লে ফেলে একটু জোরে—

'ঠমকি ঠমকি চলে গো দেমাকী—
হয়তো আলেয়া নয় তো জোনাকী।
সাঁঝের বেলায় চলে গো হেলিয়া
উড়ন্ত মেয়েটা পাখ্না মে'লিয়া॥'

আর যায় কোথায়? থমকে দাঁড়ায় অগ্নিমূর্ত্তি লালসাড়ী—ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ওদের পানে। সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে সকলে, এই বুঝি ঘটে কিছু অভাবনীয়! লালসাড়ী কি যেন ব'লতে এসে সম্বরণ ক'রে নেয় নিজেকে—চ'লে যায় আপন পথে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যুবকের দল, কেউ কেউ দোষারোপ ক'রতে থাকে ন্যাড়াকে। গর্ব্বিত ভাবে বলে ন্যাড়া—'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জানা আছে কত ধানে কত চাল, ডুবে ডুবে জল খেলে আর সামনাসামনি এসে বল থাকে না।'—

অন্ধকার ঘরে অকস্মাৎ বিজলীবাতি জ্বলে উঠলে যেমন চোখ যায় ঝল্সিয়ে—ন্যাড়ার অবস্থাও হয় ঠিক তেমনি লালসাড়ীর আবির্ভাবে। সবেমাত্র ন্যাড়া রাত্রের আহারপর্ব্ব চুকিয়ে বাইরের ঘরে ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে খুব মৌজের সাথে—এমন সময় ফিরতি পথে সেখানে এসে উপস্থিত লালসাড়ী, প্রশ্ন করে একেবারে মুখোমুখী—'কি যেন বেশ একটা ছড়া বানিয়েছেন, মানেটা বুঝিয়ে দেবেন কবিবর?' আম্তা আম্তা করতে থাকে হতচকিত কবিবর, ব'লে চলে লালসাড়ী—'কি হ'ল—একেবারে ঘাবড়িয়ে মেয়েছেলের অধম হয়ে পড়লেন যে? সামনাসামনি কিছু বলবার সাহস নেই, কেবল পেছন থেকেই ফুট কাটতে শিখেছেন!' ন্যাড়া বলতে চেষ্টা করে কি যেন—'না—মানে—'। ফোয়ারা ছোটে লালসাড়ীর মুখে—'থাক্—মানে আর বোঝাতে হবে না, অভদ্র কোথাকার! লজ্জা করে না আপনার এই ভাবে মেয়েদের টিট্‌কারী কাটতে? বাড়ীতে যদি কোন মেয়েছেলে থাকে তো জেনে নেবার চেষ্টা করবেন কি ভাবে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।' গায়ের ঝাল মিটিয়ে বাক্যবাণে ন্যাড়াকে অপদস্থ করে সেখান থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে পড়ে লালসাড়ী।

আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করেন ন্যাড়ার মা, লালসাড়ী বেরিয়ে যেতেই তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন ছেলেকে—'কি রে—কি ব্যাপার—মেয়েটা ঐভাবে অসভ্যের মত রাত্তির বেলা এসে চেঁচামেচি করছিল কেন?' এবার আত্মপ্রকাশ করে বীর ন্যাড়া—'কি আবার হবে—উনি রাত-বেরাতে এখানে-সেখানে নেচে নেচে বেড়াবেন, আর তাই নিয়ে যদি কেউ কিছু বলে তবে গায় না বেজে কি পারে!'

ন্যাড়ার মার কাছ থেকে ঐ রাত্তেই তার বাবাও শুনলেন এ কথা। পরের দিন রাত পোয়াতে না পোয়াতে এর কান থেকে ওর কানে—এমনি ক'রে দশ কানে কথাটা পৌঁছাতে সময় লাগে না বেশী। বিদেশী হাবভাব নকল করার চেষ্টা ক'রলে কি হবে মেজাজটা তো একেবারে দেশী! এমন কি শ্রীধরবাবুও অবশেষে জানলেন সবকিছু, তবে তা একটু কেন—বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিত!

মারমূর্ত্তি হ'য়ে ছুটে এলেন ন্যাড়ার বাবা শশীবাবু, আক্রমণ করেন নিরীহ গোবেচারী শ্রীধরবাবুকে—'এ কি অন্যায় কথা-মশায়! আপনার মেয়ে সন্ধ্যার পর এখানে-ওখানে কি ক'রে বেড়াবে, তার ওপর আবার বাড়ী ব'য়ে চোপাও ক'রে আসবে?' অনেকগুলো অপ্রিয় কথা শোনার পর শ্রীধরবাবু কি যেন একটা বোঝাতে চাইলেন শশীবাবুকে—কিন্তু বৃথাই. তিনি এত বেশী উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে এক তরফা কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে নেহাৎ অফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আর বিলম্ব না করে ছুটলেন বাড়ীমুখো।

এতক্ষণে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভীতা-ত্রস্তা সুস্তা, পিতার বিরস মুখশ্রী দেখে সে ব'লতে থাকে নম্র-কণ্ঠে—'কাদের কি বোঝাতে চাইছ বাবা, ওরা কখনও কিছু সঠিক ভাবে জানবার চেষ্টা করেন না—সবকিছু আগে থেকেই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন।' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে শ্রীধরবাবু বলেন গম্ভীর স্বরে—'হুঁ—সেই জন্যেই তো আজ হালে পানি জুটলো না। তোর নামে যা তা ব'লে গেল—আর আমি বাপ হ'য়ে নীরবে সব সহ্য ক'রলাম। কি কর'ব—সবই আমার বরাত। না হ'লে তোকে কি আর আমি বেঁচে থাকতে এই ভাবে চুন'াম কিনে টিউশানী ক'রতে হয়!'

সম্পাদকীয়

ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশন ও পণ্ডিত জওহরলাল

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তপঞ্চাশৎ অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। অনেক দিক হইতে এই অধিবেশনের একটা বিশিষ্টতা রহিয়াছে। প্রথমত: ভারতের বাহিরে ক্রমশঃই অবিশ্বাস ও মনান্তরতার একটা বিষাদপূর্ণ ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। আজ শুধু কোরিয়ার যুদ্ধ নহে—পারস্যের তৈল খনি ও ঈজিপ্টের আত্মপ্রতিষ্ঠা লইয়া দেশে দেশে মনান্তর অত্যন্ত উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। দ্বিতীয়ত: ভারতের অস্থি-উদ্ভুত পাকিস্থানে এক শ্রেণী জঘন্য প্রকৃতির মনুষ্যের কার্য্য-কলাপে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। তৃতীয়ত: দ্বিধা-বিভক্ত ভারতের খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন ও স্বাস্থ্যহীন জনসাধারণকে রাজ-নীতি-বিশারদগণ আসন্ন নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নানা প্রকার আশা ও ভীতির প্রতিকৃতি দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। এই নেতৃত্বের বিশেষত্ব এই যে, রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী আজ সভাপতি হইয়া স্বহস্তে কংগ্রেস-যান চালনার রজ্জু ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতিও যেন তাঁহার ছলনাময়ী কলা-কৌশলের কিঞ্চিন্মাত্র দেখাইবার উদ্দেশ্যে সভাপতির চক্ষুর সম্মুখে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ও শত শত কর্ম্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সুন্দর নগরীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে অগ্নিদগ্ধ করিয়া শ্মশানে পরিণত করিয়া দিলেন।

কিন্তু কোন বিপত্তিই পণ্ডিতজীর কর্ম্মনিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; দগ্ধ সত্যবতী নগরের ভস্মের উপরে বসিয়াই তিনি সভাপতিত্ব করিয়া দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে অনেক কথাই কহিয়াছেন। হিন্দু কোড্ বিল হইতে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা পণ্ডিতজীর বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, বক্তৃতাতে তিনি নূতন কিছুই বলেন নাই। পুরাতন কথাই নূতন ভঙ্গিমায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে অভিনব ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যা, পাক-ভারত সম্পর্ক, কাশ্মীর সমস্যা ও বৈদেশিক নীতি—সবই তাঁহার বিশদ আলোচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অমিলন ও অসম্প্রীতির ভাব ভারতের
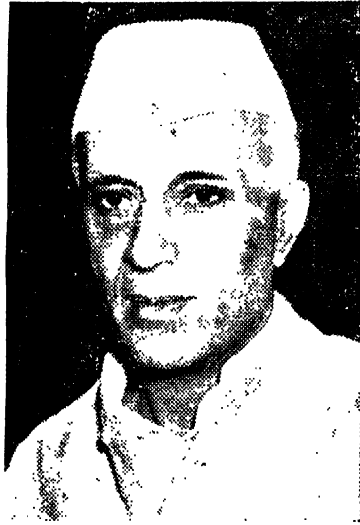
পক্ষে অমঙ্গলজনক এবং এই দুই দলের মধ্যে যাহাতে কোন বিরোধ সৃষ্টি কেহ বা কাহারাও না করিতে পারেন, সেই দিকে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন। তাঁহার হাতে যতক্ষণ শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা তিনি কোন রকমেই সহ্য করিবেন না।

এইরূপ নিষ্ঠাপূর্ণ অথচ ওজস্বিনী বাগ্মীতা আমরা প্রশংসা করি! কিন্তু তিনি কি ভাবে তাঁহার ইচ্ছাকে

পূর্ণ করিবেন, সেই সম্বন্ধে কিছুই না বলাতে আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই বাগ্মীতা শুধু ভারতবাসী-সুলভ কর্ত্তব্যের প্রতি সদিচ্ছারই প্রকাশ—না ইহার পশ্চাতে এই সদিচ্ছা যাহাতে সত্যই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য ঐকান্তিকতা আছে!

পণ্ডিতজী ঐতিহাসিক। তিনি জানেন মুসলমান রাজত্বকালে ভারতের ভাগ্যাকাশে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার অবতারণা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাম তাহাদের নির্ম্মল মধুর জীবন-যাত্রা, হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়া, একে অন্যকে ভাই-চাচা সম্বোধন করিয়া—সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইত। যাহাকে আমরা আজ সাম্প্রদায়িক বিভেদ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করি, তাহার কিছুই তখন জন-সাধারণের মধ্যে ছিল না।

বাহিরের লোকের নিকট প্রবাদ ছিল, এই ভারতে নাকি সোনা ফলিত—দুঃখ বা অভাব কাহাকে বলে ভারতের লোক নাকি তাহা জানিত না। তাই না সাত সমুদ্র তেরো নদী বাহিয়া, জীবনকে বিসর্জ্জন দিবার ভয় সত্ত্বেও, ভারতে আসিবার পথ খুঁজিয়া নেওয়া এত প্রয়োজন ছিল?

এমন অবস্থা হইতে সাধারণের মনে কি বিষক্রিয়া দ্বারা যে এই সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিতে পারিল তাহা পণ্ডিতজীকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে, যেখানে অগণিত লোকসঙ্ঘ ভাইয়ের প্রীতিতে মনের আনন্দে বাস করিত—সেই সরল লোক-গুলির মন এই ভাবে কলুষিত হইল কি প্রকারে? মানুষের সুন্দর বাসস্থান হিসাবে যে গ্রামের সাবলীল জীবনযাত্রা ছিল আদর্শস্থানীয়, সে গ্রাম আজ অবাসযোগ্য ও অস্বাস্থ্যপূর্ণ হইল কেমন করিয়া?

এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি কোথায় ছিল—কিসের উপরে ছিল তাহার ভিত্তি, এই তথ্য তাঁহার নিকটে পরিষ্কার হইবে। তিনি দেখিবেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এমন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উপরে যাহাতে এই দেশের প্রত্যেক লোক নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগকে চাকুরীর জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না, বা কাল কি করিয়া দিন গুজরাণ হইবে—এই ভাবিয়া অস্থির হইতে হইত না। এই ভারতে প্রবাদ ছিল, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিয়েছেন তিনি' এবং এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল।

যে ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে দেশের প্রত্যেক জনসাধারণ খাওয়া, পরা ও থাকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন, আমরা সেই ভিত্তি হইতে এতদূর সরিয়া আসিয়াছি যে, আজ সেই জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের সংসারে অন্ন-বস্ত্রের অভাব দিন দিন এতই বাড়িয়া চলিতেছে যে, শীঘ্রই তাহার গতি ফিরাইতে না পারিলে তাহার আরও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পক্ষে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের মত হইয়া বাঁচা যখন কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, তখনই মাত্র জন-সাধারণ নানাভাবে মনের সঙ্কীর্ণতা লইয়া চিন্তা করিতে থাকেন এবং এই অবস্থায় ঝগড়া, মারামারি, সাম্প্রদায়িকতার বীজ সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাদের বিষ-কার্য্য আরম্ভ করে।

জনসাধারণ যখন এইরূপ মনের অবস্থা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন যদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেহ কেহ বুঝাইতে আরম্ভ করেন যে, ঝগড়া বা মারামারি করিলে অথবা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির দ্বারা কার্য্য করিলে, তাহার বা তাহাদের আশু লাভ আছে—তখন যে সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি বৃহত্তর রূপ ধারণ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একথা পণ্ডিতজীকে বুঝিতে হইবে এবং বুঝিলেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, যে কারণে অর্থাভাব ও অসন্তুষ্টি, ঠিক সেই কারণের বীজেই লুকায়িত রহিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা। আবার যদি এমন দিন কখনও আসে—যেদিন কাহারও ঘরে চালের অভাব বা কাপড়ের অভাব বা স্বাস্থ্যের অভাব বা আবাসের অভাব বোধ থাকিবে না,

সেদিন নেতারা যতই কেন গরম-গরম বক্তৃতা দিতে থাকুন না কেন, এত সহজে সাম্প্রদায়িকতা বা অসন্তুষ্টির ছায়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারিবেন না।

কিছুদিন হইতে পণ্ডিতজীর নিকট আমরা শুনিয়া আসিয়াছি যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই দেশের দারিদ্র্য ও বেকার অবস্থা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে বা কি প্রকারে কার্য্য করিলে এই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে বা যাহা হইতে উৎপাদিত বস্তুর বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহাকে কি অবস্থায় আনিতে পারিলে তবে উৎপাদনের বৃদ্ধির কার্য্য করা সম্ভব হইতে পারে— এবম্বিধ কোন বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তারপর, শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই কি বেকার বা দারিদ্র্যের সমস্যা দূর হইতে পারে? জনসাধারণের হস্তে কি প্রকারে সেই উৎপাদিত দ্রব্যভাণ্ডার প্রয়োজন অনুসারে বিনা ঝঞ্ঝাটে আনিয়া উপস্থিত করান যাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও নিশ্চয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে। এবং সর্ব্বোপরি জনসাধারণের কি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা থাকিলে এই বণ্টন-পদ্ধতি সুচারুরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহাও নিশ্চয়ই ভাবা দরকার।

আমাদের বিশ্বাস পণ্ডিতজী যদি প্রচলিত পাশ্চাত্য অর্থনীতির মোটা কথা না বলিয়া প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপরে মানব-প্রয়োজন সিদ্ধির অর্থনীতির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কাজে লাগাইতে পারেন, তবেই একমাত্র এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

আততায়ী কর্ত্তৃক পাক্-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ নিহত

গত ২৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার অপরাহ্নে রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় অভিভাষণের উদ্যোগকালে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ এক আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। আততায়ী সৈয়দ আকবর ঘটনাস্থলেই জনসাধারণের হাতে নিহত হয়। ইহার পিছনে কোনো নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। ভারতে আফ্‌গানিস্থানের রাষ্ট্রদূত ডাঃ নজিবুল্লা খাঁ বলেন: প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য সৈয়দ আকবরকে কেহ টাকা দিয়া নিয়োগ করিয়াছিল। সৈয়দ আকবর বিখ্যাত জাদ্রান সর্দ্দার বাবরক খাঁর পুত্র এবং জেমারকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সাত বৎসর পূর্ব্বে জেমারক আফ্‌গান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং তাহার ভ্রাতার সহিত তাহাকে আফ্‌গানিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। তাহাদের উভয়কেই পার্লামেণ্টের এক প্রস্তাবের দ্বারা আফ্‌গান নাগরিক-অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। দুই ভ্রাতা ভারতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় লাভ করিয়া বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে বেতন পাইতেছিল এবং ভারত বিভাগের পর পাকিস্থান সরকারের কাছ হইতেও অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিতেছিল।

মিঃ লিয়াকত আলী খাঁকে হত্যা সম্পর্কে আততায়ীর এই দুষ্প্রবৃত্তি কোন্ চক্রে কি ভাবে কাজ করিয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহার বিচার হইবে। উন্মত্ত আততায়ীর এই জাতীয় কার্য্যবিধি আজ শুধু পাকিস্থানেই নয়, ভারতে গান্ধী-হত্যার মধ্যেও ইহার বীজ নিহিত ছিল, এবং এই জাতীয় হত্যার ইতিহাস সমস্ত বিশ্বের ইতিহাসেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিঃ লিয়াকত আলী খাঁর মতবাদের সঙ্গে বহু রাজনীতিজ্ঞের মতবিরোধ থাকিলেও তাঁহার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ও সজীব চিন্তাপ্রসূততার দ্বারা যে পাকিস্থান রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। মিঃ জিন্নার পরলোকগমনের পর মিঃ লিয়াকত আলী খাঁই ছিলেন পাকিস্থানের অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি বিশেষ নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সঙ্গেই নেতৃত্বের কঠোর দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন:

'আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই আমরা বন্ধুভাবে মিলিত হইয়াছি। জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা একসঙ্গে কাটাইয়াছি এবং একত্রে বড় হইয়া উঠিয়াছি। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমাদের সম্পর্কের এই ব্যক্তিগত দিকটি বিলুপ্ত হইবে না। বৃহত্তর দিক দিয়া একথা বলা যায় যে, কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খাঁ পাকিস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন পাকিস্থানের জনসাধারণের মনোভাব ও কার্য্যকলাপ সংযত করার জন্য তাঁহার প্রভাব কাজে লাগানো হইত। ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর দিক দিয়া তাঁহার মৃত্যু একটি শোচনীয় ঘটনা।'

পাকিস্থান রাষ্ট্র ও তাহার জনসাধারণের এই নিদারুণ আঘাতে এবং মিসেস্ লিয়াকত আলী রাণা বেগমের গভীর শোকে আমরা তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং লিয়াকত আলী খাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কমনা করি।

লিয়াকত আলী খাঁ

জীবনী

১৮৯৫ সালের ১লা অক্টোবর পূর্ব্বপাঞ্জাবের কর্ণাল সহরে লিয়াকত আলী খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রুকুমদ্দৌল্লা সমসের জঙ্গ্ বাহাদুর। ইরাণের স্বনামখ্যাত রাজা নওশেরওয়ানের বংশধর বলিয়া লিয়াকত আলী খাঁর বংশের মর্য্যাদা আছে। ১৯১৫ সালে তিনি প্রথম আলিগড়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া লিয়াকত আলী খাঁ বিলাত গমন করেন এবং অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি লণ্ডনে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী করেন। মুসলীম লীগের কার্য্যপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইয়া ১৯২৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁহাকে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের অবৈতনিক সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পূর্ণ ১১ বৎসর তিনি উক্তপদে বহাল ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্যপদ্ধতিকে মোটামুটি নিম্নোক্ত রূপে ভাগ করা যায়: (ক) ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত যুক্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য; (খ) ১৯৪০ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত; (গ) ১৯৩১ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট। এই সময়ে কিছুকালের জন্য তিনি আগ্রা এবং আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। (ঘ) ১৯৪০ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত দিল্লীর এ্যাংলো-অ্যারাবিক কলেজ এণ্ড স্কুল সোসাইটির সভাপতি; (ঙ) ১৯৪৩ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলীম লীগ পার্টির ডেপুটি লীডার; এই সময়ে তিনি মুসলীম লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলীম লীগ ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিলে মিঃ লিয়াকত

আলী খাঁ অর্থসচিবপদে নিযুক্ত হন। অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে তিনি মুসলীম লীগ ব্লকের লীডার ছিলেন। পরে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের জন্য দুইটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে লিয়াকত আলী খাঁ অর্থ, পররাষ্ট্র, বহির্বিভাগ ও দেশরক্ষার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলীম ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মিঃ জিন্নার সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ—এই দুইভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত উক্ত সময়েই গৃহীত হয়। মিঃ জিন্নার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিয়া পাকিস্থান হইবার পর লিয়াকত আলী খাঁই প্রথম ইহার প্রধানমন্ত্রী হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত মার্চ্চমাসে তাঁহারই নির্দ্দেশ ক্রমে পাকিস্থানের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল আকবর খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পাক্ সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন; উহাই বর্ত্তমানে রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা নামে চলিতেছে।

কলুটোলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতার উচ্ছ্বসিত জনবহুল রাজপথে যখন শারদীয়ার শুভ উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিকেরা আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক এমনই একটি দিনে—অর্থাৎ গত ২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার মহানবমীর দিন কলুটোলা ষ্ট্রীটের একটি ত্রিতল বাড়ীতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৯ জন নরনারী ও শিশু জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর কলিকাতার হালসিবাগানে কালীপূজার মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেদিন যে জীবনান্ত অবস্থার পরিস্থিতি ঘটিয়াছিল, তৎপর কলুটোলার এই আকস্মিক ঘটনার মতো অনুরূপ কোনো ঘটনা এযাবৎ কলিকাতায় ঘটিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহাকে নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা বলা চলে না। তদন্তের ফলে প্রকাশ যে, কলুটোলার উক্ত বাড়ীর নীচের তলায় পেট্রোলের টিন জমা থাকিত। চোরাবাজারের কারবার চলিত এই পেট্রোলের। সামান্য একটা বিড়ির আগুন হইতেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। বলা যদি কি এই চোরাকারবার সাময়িক? দীর্ঘকাল যাবৎই হয়ত এই ভাবে জনসাধারণের সজাগ চক্ষুর অন্তরালে এই চোরাকারবার দিব্যি স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। বস্তুতঃ চোরাকারবারের ঘটনায় কলুটোলা অঞ্চলের কিছুটা কুখ্যাতির সঙ্গে ইদানিং অনেকেই পরিচিত ছিলেন। কথা হইতেছে এই যে, চোরাকারবারের বিষয়টি আদৌ উল্লেখ না করিলেও লোকের আবাসস্থলে এইরূপ পেট্রোল মজুদের অনুমোদন কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ কিভাবে করেন? ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী ইহা কি দণ্ডনীয় নয়? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ মজুদখানা এযাবৎ পুলিশের নজরে পর্য্যন্ত আসে নাই। ইহা কলিকাতার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষেরই অযোগ্যতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক। মৃত্যুলীলা সংঘটিত হইবার পর প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কলিকাতার বেতারে বিজয়ার অভিভাষণ প্রসঙ্গে মাত্র এই নারকীয় মৃত্যুলীলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, শুধু দুঃখপ্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই তিনি এ ঘটনার মূল তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার প্রতিবিধানেও তৎপর হইয়াছেন।

উদ্বাস্তু ও বেকার সমস্যা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে গত সুদীর্ঘ চারি বৎসরের অবকাশেও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। এখনও দলে দলে অসংখ্য শরনার্থী পূর্ব্ববঙ্গের স্থায়ী বসবাস তুলিয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা একদিকে ক্রমেই যেমন বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি বেকার সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গেই বেকার সমস্যা একটি গুরুতর বিষয় ছিল, আজ তাহা উদ্বাস্তু সমস্যায় একত্রীভূত হইয়া অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই অনির্দ্দিষ্ট জনসংখ্যার উপযোগী চাকুরী বা উপার্জ্জনী পদের অভাব। দেশে নূতন নূতন আরও বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া না ওঠা পর্য্যন্ত ইহার সমাধান সম্ভব নয়। ততদিন কি এই অসংখ্য জনসমষ্টি তবে দুর্গতির দুয়ারে বসিয়া মৃত্যুসাধনা করিবে? ইহার আশু সমাধানের জন্য আমরা জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ পর্য্যন্ত রেশনকার্ডে যে খাদ্যবরাদ্দের ব্যবস্থা ছিল, তাহাই জনসাধারণের যথোপযুক্ত ছিল না। বাঙালী অন্নে অভ্যস্ত, সেই অন্নের ঘরেই ঘাট্‌তি। রেশনে চাউল মাথাপিছু এক সের পাঁচ ছটাক হইতে কমাইয়া চৌদ্দ ছটাক করিবার পর পুনরায় যখন খাদ্য বরাদ্দের হার আংশিক বৃদ্ধি পাইল, তাহাতে চাউলের ঘাট্‌তি ঠিকই রহিল, গমজাত দ্রব্য বাড়ানো হইল। তাহাতে বাঙালীর ক্ষুন্নিবৃত্তির সমাধান হইল না। এখনও বহুলোক ভাতের অভাবে আটা, আটার অভাবে নিরম্বু উপবাসে জীবনান্ত মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছে। সংবাদ-পত্রে অন্নাভাবজনিত মৃত্যু-সংবাদ মাঝে মাঝেই দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও বা তাহা অসমর্থিত সংবাদেও পর্য্যবসিত হয়। এই জাতীয় সংবাদগুলি প্রায়ই চোখকে কণ্টকিত করে এবং হৃদয়কে বিদ্ধ করে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরও তাহা দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণ নাই। তাঁহারা ইহার আশু সমাধানের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, জানি না। কিন্তু এ অবস্থা আরও দীর্ঘকাল চলিলে অন্নগত বাঙালী অন্নহীন অবস্থায় কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই আজিকার বড় প্রশ্ন।

‘নিখিল ভারত জনসঙ্ঘ’ সম্মেলন

গত ২১শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে সর্ব্বভারতীয় দল-রূপে ‘নিখিল ভারত জনসঙ্ঘের’ প্রথম উদ্বোধন-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন : ‘জনসঙ্ঘ’কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তব্যানুসারে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করা হইবে। দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলি হইতেছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, কুশাসন, দুর্নীতি এবং পাকিস্থানের নিকট হীন আত্মসমর্পণ। এই সমস্ত সমস্যার জন্যই প্রধানতঃ কংগ্রেস ও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট দায়ী এবং দেশের এই আসল সমস্যাগুলি ধামাচাপা দিবার জন্যই শ্রীনেহরু সাম্প্রদায়িকতার রব তুলিয়াছেন।’ জনসঙ্ঘের লক্ষ্য সম্পর্কে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন : ‘পুনর্মিলিত ভারতই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অভিমত এই যে, ভারতকে বিভক্ত করিয়া শোচনীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।’ তাঁহার মতে—সঙ্ঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং উভয় দেশের পুনর্মিলন যে উভয় দেশের জনগণের পক্ষে মঙ্গলকর এবং তাহাতে শান্তি ও স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হইবে, তাহা উভয় দেশের জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া উভয় দেশকে পুনর্মিলিত করাই সঙ্ঘের অভিপ্রায়। কংগ্রেস পাকিস্থান-তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতকে দুর্ব্বল এবং ভারতের সম্মান ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। জনসঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা কংগ্রেস-অনুসৃত মুসলমান-তোষণ নীতির বিরোধী। যতদিন পাকিস্থান পৃথক থাকিবে, ততদিন পাকিস্থানের প্রতি পাকিস্থানের অনুরূপ আচরণ করাই ভারতের উচিত। পাকিস্থানের হিন্দু সংখ্যালঘু ও উদ্বাস্তু সম্পত্তি-সম্পর্কিত সমস্যাবলীর উপরও সঙ্ঘ বিশেষ জোর দেন।

আমরা জানিতাম ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ভারত বিভাগ সমর্থন করিয়াছিলেন। আজ আবার কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া নূতন নূতন দলের বৃদ্ধি করিয়া যে কি ভাবে দারিদ্র্যাদি হইতে দেশকে তিনি মুক্ত করিবেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে।

ডক্টর আম্বেদকরের পদত্যাগ

সম্প্রতি ডক্টর আম্বেদকর ভারত সরকারের আইন সচিবের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত হেতু উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রধান : (ক) ভারতের তপঃশীলী জাতি-সমূহের স্বার্থ ক্ষুণ্ণতা, এবং (খ) ভারতের পররাষ্ট্রনীতি। উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে হিন্দু-কোড বিল লইয়া যে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল, উক্ত বিলে নাকি তপঃশীলী জাতিসমূহের অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত তিনি একমত হইতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ এই দুইটি কারণেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে

হইয়াছে। আরও একটি কারণ বোধ করি ছিল, তাহা হইতেছে মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগের হিড়িকে জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আগামী নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ানো। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেই যে জনপ্রিয় হওয়া যায় না, এমন উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। আসলে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ (ক) ভারতের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে তপঃশীল জাতিসমূহের অধিকারকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে না, এবং (খ) ভারতের পররাষ্ট্র নীতি গত চারি বৎসর যাবৎ যখন একই পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তখন তৎসম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্তের অবকাশ তিনি ইতিপূর্ব্বেই পাইতেন।

মিঃ কিদোয়াইয়ের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি কলিকাতায় কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির প্রেসিডেণ্ট্ আচার্য্য জে. বি. কৃপালনীর মতে দলের অন্যতম সদস্য মিঃ রফি আহম্মদ কিদোয়াইয়ের মনোভাব বিবেচনার জন্যই এই অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসে থাকাকালে মাঝে মাঝেই তিনি কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টির অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে যথাসময়ে যে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডে তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরে আলোচনা না হইয়াছে, তাহা নয়। অতঃপর নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া মন্ত্রীত্ব তথা কংগ্রেস-সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সরাসরি তিনি আচার্য্য কৃপালনীর পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু স্বল্পকাল মাত্র। ইতিমধ্যে তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে বোধ করি আরও বেশী পরিচিত হইবার অবকাশ পান। পুনরায় কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন: 'এমন ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে যাহাতে আমাকে কংগ্রেসে ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে।' তিনি বলেন: কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনর্গঠন এবং আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য চরিত্রবান ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হইবে বলিয়া কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট্ শ্রীনেহরু যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার পর তাঁহাদের কংগ্রেসে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ কিদোয়াই বলেন যে, কংগ্রেস ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিতে হইলে তাঁহার পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত।

অতঃপর আগামী কংগ্রেস নির্ব্বাচনে মিঃ কিদোয়াই কি অংশ গ্রহণ করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। তবে কৃপালনীর কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টিকে তিনি যে তাঁহার কার্য্যদ্বারা কিছুটা ক্ষীণবল করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে ডাঃ গ্রাহামের উক্তি

কাশ্মীর সংক্রান্ত আপোষ-আলোচনার বিতর্ক সম্প্রতি প্যারিসে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক পুনরায় আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে। গত ১৮ই অক্টোবর কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহাম নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার ব্যক্তিগত বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন: 'উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি হইলে তাহার প্রথম ফলস্বরূপ জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবে; গত তিন বৎসর যাবৎ তাহারা ইহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা হইবে যে, জনগণই জনগণের রাজা এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরের প্রজা। জনসাধারণের সার্ব্বভৌমত্বই হইল আসল সার্ব্বভৌমত্ব। কোনো পক্ষ হইতেই বলপ্রয়োগ করিলে বা নিষ্পত্তি বিলম্বিত করা হইলে কাশ্মীরের জনসাধারণ তাহা শেষ পর্য্যন্ত বরদাস্ত করিবে না। বলপ্রয়োগ বা অযথা বিলম্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতিবিরুদ্ধ কাজ হইবে। তাহা বেশী দিন চলিতে পারে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণের দ্বারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ যদি না দেওয়া হয়, তবে ক্রমাগত এই বিরোধ এক দুষ্টক্ষতে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের অশেষ ক্ষতি ও অকারণ শক্তির অপচয় ঘটিবে। ভারত ও পাকিস্থানের বন্ধুত্বের পথে প্রধান

অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের বহু সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হইবে। অন্যান্য সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা না করিয়াও একথা বলা চলে যে, কাশ্মীর সম্পর্কিত বিরোধই আজ প্রধান সমস্যা। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইলে উদ্বাস্তুর সম্পত্তি ও সেচের জল সরবরাহ প্রশ্নের সমাধানও সহজতর হইয়া আসিবে

পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহা স্বাভাবিক চিত্তে অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ডাঃ গ্রাহামের বিবৃতিকে কেন্দ্র করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যবিধি সম্পর্কে পাকিস্থানের নূতন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন: কাশ্মীর সংক্রান্ত বিরোধটির প্রতি যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন, নিরাপত্তা পরিষদ তদনুরূপ গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি একথাও বলেন যে, মানুষের ধৈর্য্যের সর্ব্বদাই একটা সীমা রহিয়াছে।

ভারত সরকার কিন্তু সে ধৈর্য্য এখনও হারান নাই। তাঁহারা গ্রাহাম রিপোর্ট সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছু মন্তব্য না করিয়া পরবর্ত্তী কালের বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ব্যবস্থার জন্য ডাঃ গ্রাহাম ছয় সপ্তাহ সময় হাতে লইয়াছেন।

এই ছয় সপ্তাহের জন্য আমরা অবশ্য ধৈর্য্য হারাইব না।

কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি আলোচনা

কোরিয়া সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি আলোচনার মুখ্য প্রতিনিধি ভাইস্ এড্‌মিরাল চার্ল্‌স জয় যুদ্ধবিরতি আলোচনা পুনরারম্ভ সম্পর্কে মিত্রপক্ষের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, উহা অনুমোদন করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও উত্তর কোরীয় সংযোগরক্ষা অফিসারগণ যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরবর্ত্তী পদক্ষেপে প্রধানতঃ ৮টি বিষয়ে একমত হইয়াছেন। যথা:— (১) পান-মুন-জন অঞ্চলে আলোচনা আরম্ভ করা হইবে; (২) যে স্থানে বৈঠক বসিবে, উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ একসহস্র গজ নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া গণ্য করা হইবে; (৩) নিয়মিত বা অনিয়মিত সেনাদল বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ আলোচনা স্থলে কোনরূপ আক্রমণাত্মক কার্য্য চালাইতে পারিবে না; (৪) সামরিক পুলিশ ছাড়া অপর কোনো সশস্ত্র ব্যক্তিকে আলোচনা স্থলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। আলোচনাস্থল এলাকার অভ্যন্তরে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট অফিসারগণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। উভয় পক্ষের সামরিক পুলিশ বাহিনীতেই দুইজন করিয়া অফিসার ও পনেরো জন করিয়া পুলিশ থাকিবে; (৫) প্রতিনিধি দলের অনুপস্থিতিকালে সামরিক পুলিশের মাত্র পাঁচজন লোক সেখানে মোতায়েন থাকিবে। এ সকল সামরিক পুলিশের হাতে পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি ছোটখাটো অস্ত্র থাকিবে; (৬) উভয় প্রতিনিধি দলই অবাধে পান-মুন-জনের আলোচনা স্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং সেখানে অবাধে চলাফেরা করিতে পারিবেন। উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দলে কে কে থাকিবেন, তাহা নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন; (৭) আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য ব্যাপারে কি কি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে, তাহা উভয় পক্ষের সংযোগ রক্ষা অফিসারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা স্থির করা হইবে; (৮) যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা পুনরায় কবে ও কখন্ আরম্ভ হইবে, তাহা উভয় পক্ষের সংযোগরক্ষা অফিসারগণ স্থির করিবেন।

সন্ধির দ্বারা শান্তি শেষ পর্য্যন্ত কোন্ পর্য্যায়ে উপনীত হয়, তাহা দেখিতে আমরা উন্মুখ রহিলাম।

মিশর সমস্যা

মিশর সমস্যা ক্রমেই জট পাকাইয়া উঠিতেছে। স্বকীয় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে মধ্যপ্রাচ্য অভিমুখে সুয়েজখাল অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী ক্রম-অগ্রগতির পথে। মিশরের বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রালফ্ ষ্টিভেন্‌সন মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানান যে, মিশরীয় পুলিশ বৃটিশ নাগরিকগণের জীবন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য না হওয়ার দরুণই পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শালেহদীন পাশা ঘোষণা করেন যে,

'ইংরাজেরা যত শীঘ্র না মিশর ত্যাগ করিতেছে, ততদিন তাহাদের সহিত আমাদের কোনই সংশ্রব থাকিবে না। মিশর যে পথ স্থির করিয়া নিয়াছে, সে পথেই অগ্রসর হইবে। কেহই আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।' এদিকে ইতালি ও আমেরিকা ইঙ্গ-মিশর বিরোধে মধ্যস্থতার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এ সম্পর্কেও শালেহ দীন পাশা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঘোষিত মত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

সাম্প্রতিক সঙ্কটে মিশরের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারতস্থ মিশরী রাষ্ট্রদূত জনাব ইস্‌মাইল কামাল যে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বৃটিশরা ক্যানেল এলাকা নিয়ন্ত্রণের মিশরের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করিয়া এবং তরবারি ঘুরাইয়া এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। মিশর বরং ভারতীয় আদর্শে শান্তিপূর্ণ নীতিই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন, 'বৃটিশরা ক্যানেল এলাকা দখল করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ ভঙ্গ করিয়াছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশদের এই সনদ ভঙ্গের প্রতিরোধ করিতে হইবে।'

২২শে অক্টোবরের পি. টি. আই'র একটি সংবাদে প্রকাশ: মিশর সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক আইন বিশারদের মতে—বৃটেন যদি ১৬ই অক্টোবর তারিখের পর হইতে সুয়েজখাল অঞ্চলে বে-আইনীভাবে অধিকৃত ঘাঁটিগুলি হইতে সশস্ত্র বৃটিশ বাহিনীকে সরিয়া যাইবার নির্দ্দেশ না দেয়, তাহা হইলে মিশর ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিবে। মিশর এই অভিযোগ করিবে যে, বৃটেন রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে।

ইহার উত্তরে বৃটেনের জবাব নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকিবে, মনে করি।

পারস্যের তৈল সমস্যা

পারস্যের তৈলখনি রাষ্ট্রীকরণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা সম্প্রতি একটি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পারস্যের অর্থদপ্তর এখানকার ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর প্রধান প্রতিনিধিকে তৈলশিল্প-রাষ্ট্রীকরণের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত আলোচনায় যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মিঃ সেডন এ-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন; কিন্তু ইরাণী সূত্রে বলা হয় যে, তিনি এ সম্পর্কে নির্দ্দেশ চাহিয়া কোম্পানীর লণ্ডনস্থ হেড্ অফিসে তার করিয়াছেন। ইরাণীগণ বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে আলোচনা করিতে সম্মত না হইলে তাঁহার পারস্যে অবস্থান করার কোনো অর্থ হয় না। ইরাণীগণ আরও বলেন যে, রাষ্ট্রীকরণের ফলে কোম্পানীর যে ক্ষতি হইবে, সরকার তাহা দিতে সম্মত আছেন। গত ২২শে অক্টোবর ফিলাডেলফিয়ায় পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দিক বলেন: '...if the British are sincere in their acceptance of the principle of nationalization, the way lies open to negotiate for the purchase of oil from Persia.' অর্থাৎ—রাষ্ট্রীকরণের নীতি সম্পর্কে বৃটেন যদি সরলভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করে, তবে দেখিবে পারস্য হইতে তৈল ক্রয়ের আলোচনার পথ খোলাই রহিয়াছে।

কিন্তু সেই সহজ পথ বৃটেন আদৌ গ্রহণ করিবেন কি?

ফরমোজায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প

গত ২৩শে অক্টোবর 'তাইপে'র এক সংবাদে প্রকাশ: মাত্র ২৮ ঘণ্টার মধ্যে ফরমোজায় ৪৩ বার প্রচণ্ড এবং ৯১ বার অপেক্ষাকৃত মৃদু ভূমিকম্প হয়। ১৫০ জন হতাহত ও বহু সহস্র লোক ইহার ফলে গৃহহীন হইয়াছে। ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও অধিক লোক ভীতি-বিহ্বল চিত্তে সহর ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছে।

ফরমোজার এই জাতীয় ভূমিকম্প আজ নূতন নয়। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে কোয়েটা এবং অনতিকাল পূর্ব্বে আসামে এই জাতীয় ভূমিকম্পের তীব্র আধিক্যের ইতিহাস এখনও মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে—ভূমিকম্পের বিশেষ কোনো স্থান-কাল বিচার্য্য নয়, যে কোনো স্থলে যে কোনো সময়ে ইহার প্রকাশ সম্ভব। ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া ইহার

প্রতিকারার্থে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা একমাত্র বৈজ্ঞানিকদেরই অনুসন্ধানের বিষয়। অন্যথায় যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আজ ফরমোজা, কাল কোয়েটা বা আসামই মাত্র নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু অঞ্চলকেও হয়ত এইরূপ ভূমিকম্পের তীব্র আধিক্যে জীবনাস্ত হইতে পারে।

আমাদের ৺বিজয়া সম্ভাষণ

শারদীয় পূজা অবকাশে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতা, লেখক-লেখিকা ও দেশবাসী সর্ব্ব-সাধারণকে আমাদের ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। মিলিবার এবং মেলাবার সাধনাই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের লক্ষণও তাহাই। আমাদের সংস্কৃতি-গত জীবনে যদি সেই মিলিবার এবং মেলাবার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, তবেই আমাদের পূজা সার্থক, আয়োজন সার্থক, জীবন সার্থক। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের সাধনাই বঙ্গশ্রীর সাধনা। মাতৃ-উৎসবে আমরা ভাইয়ের মতো মিলিব, সংস্কৃতির সাধন-মণ্ডপে আমরা সবাইকে মেলাবো—জাতীয় ঐতিহ্যের মূলে এই কথাটিই বড় কথা। কোনো জাতির সংস্কৃতিই কোনো বিশেষকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে না। তাহার সমাজ-ব্যবস্থা, তাহার শিক্ষা, তাহার রীতি ও আচারপদ্ধতি দেশের নির্ব্বিশেষ প্রাণ-ধারারই স্বতস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। সংস্কৃতি খাঁটি হয় এই নির্ব্বিশেষের মিলন-সাধনা দ্বারাই। বঙ্গশ্রী বাংলার সেই নির্ব্বিশেষ জনসাধারণেরই মিলনক্ষেত্র। আমরা যেখানে এক এবং একত্র—সেখানে আমাদের সেই সম্মিলিত শক্তিদ্বারা দেশের শান্তি ও কল্যাণ সৃষ্টি করিব। দেশের যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যেখানে অভাব-দারিদ্র্য, যেখানে অশিক্ষার কালো ছায়া, আমাদের সম্মিলিত সাধনার দ্বারা আমরা যেন সেখানে সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপালোক জ্বালিতে পারি—যে আলোয় অবগাহন করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যমুক্ত মানুষ প্রাণ খুলিয়া সহজ হাসি হাসিতে পারিবে। আমাদের প্রিয়-পরিজনকে আজকের বিজয়া-সম্ভাষণের মধ্য দিয়া আমাদের সেই সাধনা জয়যুক্ত হউক; ভগবান আমাদের সহায় হউন।
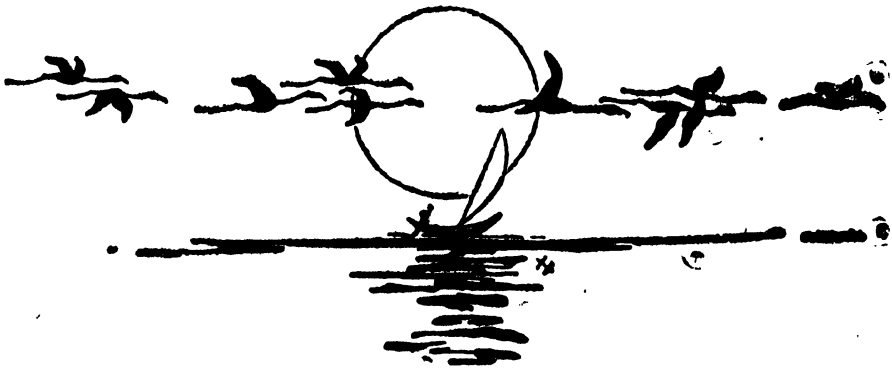
শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্‌ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হাসি ফোটো—রামকিঙ্কর সিংহ

কান্না [ফোটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
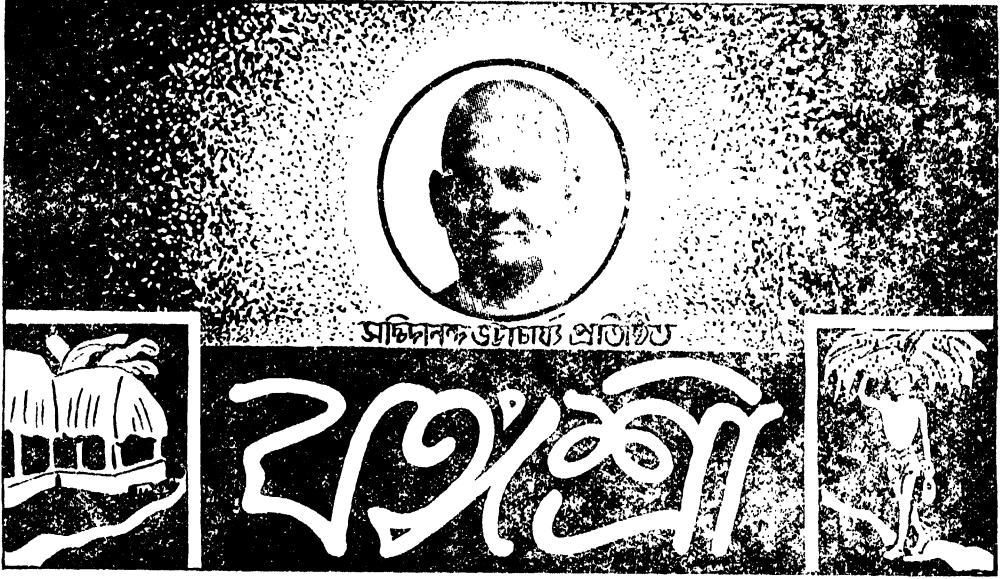
ঊনবিংশ বর্ষ অগ্রহায়ণ—১৩৫৮ ১ম খণ্ড – ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ-সম্পত্তি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাকিস্থান এখন ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র। সুতরাং বিশীর্ণ ভারতের বহির্ভাগে আমাদের যে-সকল দায়-দেনা ও সম্পদ-সম্পত্তি (Foreign liabilities and assets) আছে, সেই সকল পররাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্থান অন্যতম। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে তথাকথিত বৃটিশ-ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভারত ও পাকিস্থানে পরিণত হইবার পর, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার "গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া"তে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রে, এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে—সর্ব্বত্র, ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রতিষ্ঠান বিশেষের, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে, যত-কিছু বৈদেশিক দায়-দেনা এবং সম্পদ-সম্পত্তি ছিল, তাহার একটি সঠিক বিবরণ সংগ্রহের ঘোষণা ছিল। এই তথ্য-সংগ্রহের ভার পড়িয়াছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। প্রত্যেক উন্নত দেশে, অর্থনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তদ্দেশীয় দেনা পাওনার হিসাব-নিকাশ সম্পর্কীয় সংখ্যা সঙ্কলন (statistics) অতীব প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্ব্বে, ভারতে এই প্রকার সংখ্যা-সঙ্কলন কখনও হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পর, অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের ন্যায়, ভারতকেও তাহার আন্তর্জ্জাতিক মূলধন-বিনিয়োজন (investment) এবং দেনা-পাওনার জমা-খরচ পরিস্থিতি বিষয়ে উক্ত ভাণ্ডারকে, ভাণ্ডারের বিধানানুযায়ী, অবহিত রাখিতে হয়। এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত, এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার্থ অত্যাবশ্যক

সংখ্যা-সঙ্কলনের ত্রুটী সংশোধনার্থ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক গবেষণা পরিচালকের প্রতি এই কর্ত্তব্যভার অর্পিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়মপূর্ব্বক ধারাবাহিক ভাবে এই আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার সংখ্যা-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার অতি গুহ্য বিষয় হইতেছে, বিদেশে নিয়োজিত মূলধনের সুদ, এবং বৈদেশিক দায়-দায়িত্বের নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থ। এই হেতু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জ্জাতিক মূলধন-বিনিয়োজন পরিস্থিতি এব আন্তর্জ্জাতিক সম্পদ-সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত এবং আন্তর্জ্জাতিক দায়-দায়িত্বের নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থের পরিসংখ্যান। জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত—যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং মহাদেশীয় য়ুরোপে এইরূপ সংখ্যা-সঙ্কলন প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে; এবং তত্রত্য অধিবাসীরা এই বিষয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যে প্রকার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হয়, ভারতে অবশ্য তাহা করা হয় নাই। যে সকল বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তি হইতে অর্থাগম হয় এবং যে সকল বৈদেশিক দায়-দায়িত্বের নিমিত্ত সুদ প্রদান করিতে হয়, মাত্র সেই সকল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

প্রধানত নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। (১) ভারতে বাস করেন এমন ব্যক্তিবর্গ,—যাহাদের আয়ত্তান্তর্গত সম্পদ-সম্পত্তির উপর ভারতের বাহিরে বাস করেন এমন ব্যক্তিবর্গের কোন প্রকার অধিকার আছে; কিংবা যাহাদের ভারতের বাহিরে সম্পদ-সম্পত্তি আছে। (২) রেজেষ্ট্রীকৃত নহে, কিংবা ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত অংশীদারী কারবার যাহাদের ভারতের বাহিরে সম্পদ-সম্পত্তি, কিংবা দায়-দায়িত্ব আছে। (৩) ব্যাঙ্ক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যে-সকল প্রতিষ্ঠান, কিংবা যৌথ-কারবার ভারতের বাহিরে সমিতিবদ্ধ, কিংবা রেজেষ্ট্রীকৃত—অথচ ভারতের অভ্যন্তরে কারবার পরিচালনা করে। (৪) যে-সকল ভারতীয় যৌথ-কারবারে বিদেশে দায়-দায়িত্ব কিংবা সম্পদ-সম্পত্তি আছে। (৫) বিনিময় এবং ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত যে-সকল তপশীল-ভুক্ত কিংবা তপশীল-বহির্ভূত, ব্যাঙ্কের বিদেশে দায়-দায়িত্ব কিংবা সম্পদ-সম্পত্তি আছে। (৬) ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় বীমা-প্রতিষ্ঠান এবং (৭) যে-সকল ব্যক্তিবর্গ ভারতে বাস করেন অথচ ভারত ব্যতীত বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত কিংবা অন্য কোন পরদেশের জন্মগত কিংবা অধিবাসগত অধিকারে, তত্রত্য নাগরিক পর্য্যায় কিংবা তজ্জাতিভুক্ত। সংগৃহীত তথ্যের খুঁটিনাটি, কিংবা বিশেষ বিবরণ গোপন রাখিয়া, একুন কিংবা পরিমণ্ডলান্তর্গত তথ্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু, কোন দেশের আন্তর্জ্জাতিক ঋণ পরিশোধ-পরিস্থিতি, যে-কোন সময়ে কোন-না-কোন বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তি এবং দায়-দায়িত্বের পরিবর্ত্তনে সদ্য সদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, সেই হেতু, বিচার-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই সম্পদ-সম্পত্তি কিংবা দায়-দেনা, অন্যান্য সম্পদ-সম্পত্তি এবং দায়-দেনা হইতে পৃথক রাখিতে হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সম্পদ-সম্পত্তি এবং দায়-দেনাকে স্বল্প-মেয়াদী এবং শেষোক্ত শ্রেণীর সম্পদ-সম্পত্তি এবং দায়-দেনাকে দীর্ঘ-মেয়াদী আখ্যা দেওয়া হয়। এই রীতি অনুযায়ী, যে-সকল দায়-দায়িত্ব তথ্য-সংগ্রহ সময় হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে পরিশোধনীয়, তাহাদিগকে স্বল্প-মেয়াদী এবং যে সকল দায়-দায়িত্ব দ্বাদশ মাসান্তে কিংবা তদতিরিক্ত কালে পরিশোধনীয় হয়, তাহাদিগকে দীর্ঘ-মেয়াদী গণ্য করা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, ব্যাঙ্ক-গুলির নিজ প্রয়োজনার্থ কিংবা বিদেশীয়দিগের নিমিত্ত রক্ষিত সোনা-রূপার তাল, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ, হস্তান্তর-করণ-যোগ্য দলিলপত্র, বরাত-চিঠি, ঋণ, দাদন এবং অনুরূপ দাবি-দাওয়া, বৈদেশিক বিনিময়ের ভবিষ্য সম্ভব্য অগ্রিম চুক্তি (foreign exchange futures) এবং দ্বাদশ মাসের মধ্যে পরিশোধনীয় সর্ব্ববিধ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় খৎ স্বল্প-মেয়াদী পর্য্যায়ভুক্ত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পরিসংখ্যান ভারতের বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব এবং সম্পদ-সম্পত্তির সর্ব্বপ্রথম সঠিক সংখ্যা সঙ্কলন। ইহাতে আমাদের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক

পরিস্থিতি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কিরূপ ছিল, তাহাই প্রকট। ইহা সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় তরফের দীর্ঘ-মেয়াদী এবং স্বল্প-মেয়াদী বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ-সম্পত্তির আন্তর্জাতিক জমা-খরচ। অন্যূন ২৮,০০০ ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত দাখিলী বিবৃতির ভিত্তির উপর এই পরিসংখ্যান বিরচিত। ইহাকে সরকারী বিনিয়োজন-ক্ষেত্রে বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিষ্ঠা প্রসার ও প্রতিপত্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই পরিসংখ্যানে বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব কিরূপ তাহা আমরা জানিতে পারি। শিল্প, বাণিজ্য এবং ধন প্রতিষ্ঠান—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৃটেনের অর্থ বিনিয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চলতি দেনা-পাওনার জমা-খরচের পরিস্থিতির পরিচয় ইহাতে অবশ্য নাই; তবে এইটুকু আমরা জানিতে পারি যে, মুনাফা, সুদ ও লভ্যাংশের খাতে, অর্থ প্রেরণের (remittances) পরিমাণ কুড়ি হইতে পঁচিশ কোটি টাকা। এই বিবৃতি অনুযায়ী গত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে, আমাদের বৈদেশিক দায়-দায়িত্বের পরিমাণ ছিল ১০৪৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে বিভিন্ন সরকারী এবং অর্দ্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ ৬৪৮ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী কায়-কারবারের অংশ ৩৯৮ কোটি টাকা। ঐ তারিখে ভারতের বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৩৯১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে সরকারী ব্যাপারে প্রাপ্যের পরিমাণ ছিল প্রকৃষ্টতম—ষ্টার্লিং সংস্থিতির সহিত ২১৯৬ কোটি এবং বে-সরকারী ব্যাপারে ১৯৫ কোটি টাকা। এই অঙ্ক হইতে দেখা যাইতেছে যে, দীর্ঘ-মেয়াদী হিসাব অনুযায়ী সরকারী অংশে সম্পদ-সম্পত্তি, দায়-দায়িত্ব অপেক্ষা ১৬৩০ কোটি অধিক হইয়াছিল এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে দায়-দেনা, সম্পদ-সম্পত্তি অপেক্ষা ১০৯৩ কোটি অধিক হইয়াছিল। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে, ভারত ১৩০০ কোটি পরিমাণে উত্তমর্ণ ছিল। কিন্তু ঐ তারিখের পরে কয়েকটি বিষয়ে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তির হ্রাস ঘটিয়াছে, নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে। প্রথমত, কিছু কিছু সম্পদ-সম্পত্তি পাকিস্থানে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক এই পরিসংখ্যানের পরে আদান-প্রদানের জমা-খরচে ঘাটতি ঘটিয়াছে। তৃতীয়ত, নিরাপত্তা হেতু সংগৃহীত ভাণ্ডারজাত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য প্রদান রূপ কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কারণে। এতদ্ব্যতীত, দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক কায়-কারবারে নিয়োজিত অর্থ সম্পদের খাতায় লিখিত মূল্য-মান (book value) হইতে বাজার-প্রচলিত মূল্য-মানের (marketi-value) পরিবর্ত্তন, আমাদের দায়-দায়িত্ব এবং সম্পদ-সম্পত্তির মধ্যস্থিত ব্যবধান হ্রাস করিবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থান হইতে প্রাপ্তব্য ৩০০ কোটি এবং বর্ম্মা হইতে প্রাপ্তব্য ৫৩ কোটি টাকা সমেত ভারতের বৈদেশিক অর্থ বিনিয়োজনের উদ্বৃত্ত অঙ্কের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছে ৬৬৪ কোটি টাকা। পরিশেষে, চলতি মুদ্রার পৃষ্ঠ-পোষক ষ্টার্লিং সংস্থিতির কিয়দংশকে (sterling assets as currency reserve) পৃথক রাখিতে হইয়াছে, কারণ ইহা আদান প্রদানের ঘাটতি পূরণার্থ (meeting balance of payments deficits) প্রাপণীয় হইবে না! ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চলতি মুদ্রার নিক্রমণ বিভাগের অর্থ-সম্পদের অঙ্ক অনুযায়ী ইহার পরিমাণ ৪০০ কোটি মুদ্রা। আমাদের বৈদেশিক দায়-দায়িত্বের ৬৪৮ কোটি টাকা সরকারী খাতে এবং ৩৯৮ কোটি টাকা বে সরকারী খাতে। সরকারী দায়-দায়িত্বের ৪২৬ কোটি টাকা দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পর পরিশোধনীয়; এবং বক্রি ২২২ কোটি স্বল্প-মেয়াদী অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে পরিশোধনীয়। বে-সরকারী দায়-দায়িত্বের অঙ্কে, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ, ঋণ, অগ্রিম অর্থ (advances), হস্তান্তর-করণযোগ্য দলিলাদি, যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠান-বিশেষের শাখাগুলির মধ্যে, লেন-দেনের অবশিষ্টও অন্তর্ভুক্ত। এই অঙ্কে কিছু সরাসরি দায়-দায়িত্বও আছে; যথা (১) শাসন-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় যৌথ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সেয়ারে বিনিযুক্ত অর্থ (৮৫ কোটি), (২) বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানাদির শাখায় নিবদ্ধ

অর্থ (১৬৭ কোটি), এবং শাসন-নিয়ন্ত্রিত অংশ কারবারে নিবদ্ধ অর্থ (২ কোটি)। ভারতের বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তি ভারতীয় দায়-দায়িত্বের তুলনায় বিভিন্ন। আমাদের দীর্ঘ-মেয়াদী বৈদেশিক দায়-দায়িত্বের প্রকৃষ্টাংশ কায়-কারবারে নিযুক্ত বৈদেশিক মূলধন। পক্ষান্তরে, আমাদের সাগরপারের ধন-সম্পত্তি শিল্পে নিযুক্ত নহে (non-industrial)। আমাদের দীর্ঘ-মেয়াদী বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তির অধিকাংশ বিভিন্ন পরদেশী রাষ্ট্রের দায়-দেনা এবং জমিজমা, বাড়ীঘর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মকেন্দ্র সংক্রান্ত।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভারতে বৈদেশিক ধন-বিনিয়োজনের (investments) খাতায় লিখিত অর্থাৎ যথার্থ-মূল্য (equity or book value) ৩২০'৪২ কোটি টাকা ছিল নিম্নলিখিত কয়েকটি দফায় নিবদ্ধ :

ধন-বিনিয়োজনের শ্রেণী-বিভাগ

	কোটী টাকা
বৈদেশিক যৌথ প্রতিষ্ঠানের শাখা	১৪৫'৭৬
বৈদেশিক-শাসিত ভারতীয় যৌথ-প্রতিষ্ঠান	৮৪'৯৬
বিবিধ স্বীয়-কর্তৃত্বশূন্য বিনিয়োজন (portfolio)	৬৬'৮০
ব্যাঙ্ক	২৬'০২
বিদেশ হইতে শাসিত প্রতিষ্ঠান	১'৫৭
বৈদেশিক বীমা প্রতিষ্ঠান	—৪'৬৯
মোট	৩২০'৪২

এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সরাসরি অর্থাৎ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় শাখায় নিবদ্ধ অর্থের পরিমাণ, সমগ্র বৈদেশিক ধন-বিনিয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বিবিধ পর্য্যায়ের সমগ্র অর্থ টাকার খতে নিবদ্ধ; এবং মূলধন রূপে ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক-শাসিত ভারতীয় যৌথ কারবারে নিবদ্ধ মূলধনও সরাসরি বিনিয়োজন। এই অর্থের শতকরা ২৫ অংশের অধিক সাধারণ সেয়ারে নিবদ্ধ এবং বিদেশ হইতে শাসিত। এই দেশে অবস্থিত ম্যানেজিং এজেন্সি (পরিচালক সঙ্ঘ) অধিকৃত অংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিনিময় ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব স্বল্প-মেয়াদী। বৃটিশ বীমা প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই দায়-দায়িত্ব অপেক্ষা সম্পদ-সম্পত্তি অধিক। এই বৃটিশ বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সমগ্র বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের ভারতের নিকট দায়-দায়িত্বের পরিমাণ ৪'৬৯ কোটি টাকা। বিনিযুক্ত ধন-সম্পদের বিভিন্ন বিভাগের অংশ পরিমান আমরা উপরে দিয়াছি। এখন আমরা বিভিন্ন দেশের অংশ পরিমাণ নিম্নে তালিকাকারে প্রদান করিতেছি।

বিভিন্ন দেশের বিনিযুক্ত মূলধন পরিমাণ

দেশ	কোটী টাকা
বৃটেন	২৩০'০০
আমেরিকা	১৮'০০
পাকিস্থান	১৫'০০
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্‌	৮'৯০
সুইজারল্যাণ্ড	৬'০১
ক্যানাডা	৫'৭৩
নেপাল	৪'৩৭
অন্যান্য	৩২'৪১
	৩২০'৪২

যুক্তরাজ্যের অংশই অবশ্য স্বভাবত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও যুক্তরাষ্ট্রের অংশ অতি কম। পাকিস্থানের অংশই প্রণিধানযোগ্য। ইহার অধিকাংশ বিবিধ পর্য্যায়ভুক্ত। ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে ধনিকদিগের (investors) তৎপরতাই ইহার প্রধান কারণ। নেপালের অংশ হইতে ভারতের সহিত তাহার স্বার্থ সংশ্রব অনুভবযোগ্য। কায়-কারবার হিসাবে অঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, শিল্পে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১৮৮'৫৭ কোটি; ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৮৫'৩২ কোটি এবং আর্থিক ব্যাপারে (financial) নিয়োজিত অঙ্কের পরিমাণ ৪৬'৫৩ কোটি টাকা। এই শেষোক্ত অঙ্ক বিবিধ এবং সরাসরি বিনিয়োজনে নিবদ্ধ। শিল্পে বিনিযুক্ত অর্থ

ষ্টার্লিং ও রৌপ্যমুদ্রা উভয়বিধ মূলধন সম্পন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানে ব্যাপৃত। ব্যবসায়ে বিনিযুক্ত অর্থের পরিমাণ যে সমধিক, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকট। ইহাতে আমদানী রপ্তানী কারবারের গুরুত্ব সূচনা করে।

বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজনের শ্রেণী বিভাগ

	কোটী টাকা
ব্যবসা	৮৫'৮২
উৎপাদন শিল্প	৬৬'৮৪
জনহিতকর প্রতিষ্ঠান	২০'৫৮
পরিবাহন	১৫'২০
খনি সংক্রান্ত	১৩'০১
আর্থিক	৬৬'৫৩
বিবিধ	৭২'৯৪
মোট	৩২০'৪২

এখনও চা-কফির আবাদ (plantation) এবং পাথুরিয়া কয়লা ব্যতীত অন্যান্য খনি-সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় বৈদেশিক সত্ত্বাধিকার শতকরা ৬০ অংশ কিংবা ততোধিক। অন্যান্য শিল্পের সত্ত্বাধিকার বহুল পরিমাণে ভারতবাসীর। পাট শিল্পে বহিঃস্থ মূলধনের পরিমাণ ১৫'৭৪ কোটি; এবং সরাসরি ধন-বিনিয়োজনের পরিমাণ ৯ কোটি। কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত ১১'৭ কোটির প্রায় সমগ্রই ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রায় পর্য্যবসিত। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পে বিনিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ প্রদত্ত হইল:

শিল্প	কোটী টাকা
চা	২১'৬২
খনিজ তৈল	২২'৫৭
তড়িৎ	১৯'৩৫
পাট	১৫'৭৪
কার্পাস	১১'৭০
অর্ণব যান	৮'৮৮
লৌহ ইস্পাৎ ও লৌহ পিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	৬'৫২
পাথুরিয়া কয়লা	৪'৯৪
কফি	১'২১

খনিজ তৈল শিল্পে নিবদ্ধ মূলধনের গুরু পরিমাণ হইতে মনে হয়, উত্তোলন ব্যতীত বৈদেশিক বণ্টন-প্রতিষ্ঠান-গুলির অঙ্কও ইহার অন্তর্ভুক্ত। অর্ণবযান পরিচালন ব্যাপারে বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের অংশ সমধিক। লৌহ ও ইস্পাত বিভাগে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির তৎপরতা বিশিষ্ট প্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিবদ্ধ।

প্রত্যেক প্রকার কায়-কারবার নিবদ্ধ মূলধন সম্পদের একুন পরিমাণ কত এবং তাহার কত অংশ বৈদেশিক তাহা এখনও নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য সে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে এইমাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত সমগ্র প্রতিষ্ঠান-প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত একুন ধন-বিনিয়োজনের বৈদেশিক অংশ সামান্যই; এবং ভারতীয় রৌপ্য-মুদ্রা-মূলধনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-প্রচেষ্টার মাত্র শতকরা দশ অংশ বৈদেশিক। ভারতীয় ধনিকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর প্রায় ৭৫ কোটি টাকা মূল্যের কায়কারবারে নিবদ্ধ সম্পদ-সম্পত্তির বৈদেশিক সত্ত্বাধিকার হস্তগত করিয়া স্বদেশের অধিকারে আনয়ন করিয়াছে। এই সম্পদের খাতায় লিখিত মূল্য (Book Value) ৫০ কোটি টাকা।

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের নূতন মূলধন বিনিয়োজনের একটু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। গত খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় এবং বৈদেশিক উভয়বিধ মূলধনের পরিমাণ নিরাশাপ্রদ। ভারতীয় ধনিকদিগের পক্ষ হইতে যেমন প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা এবং প্রযত্নশীল উদ্যমের অভাব ছিল, বৈদেশিক ধনিকদিগের তরফ হইতে তেমনি আগ্রহের অভাব ঘটিয়াছিল। গত-পূর্ব্ব দুই খৃষ্টাব্দের ন্যায়, গত খৃষ্টাব্দেও ভারতীয় মূলধন লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত ছিল। নূতন মূলধন বিনিয়োজনের সমষ্টি ছিল মাত্র ৮৫'০৮ কোটি টাকা। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ৪৬ অংশ কম; এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় মাত্র শতকরা ৮ অংশ অধিক। একটি মাত্র আশাপ্রদ লক্ষণ এই ছিল যে, বৈদেশিক শিল্পপতিগণ রাজকর-স্বরূপ দক্ষিণার (royalty fees) বিনিময়ে, বৈদ্যুতিক দ্রব্য সামগ্রী, ঔষধ ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক

দ্রব্যাদি, দ্বিচক্রযান, এবং ডিইসেল্ এঞ্জিন প্রভৃতি শিল্পে, ভারতীয় কর্ম্মিগণকে শিল্প-কৌশল ও শিল্পী-নৈপুণ্য শিক্ষা প্রদান করিতে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও রক্ষা হেতু পাউডার ক্রীম্ প্রভৃতি প্রস্তুতির নিমিত্ত কয়েক জন বৈদেশিক ধনিক মূলধন সংগ্রহের আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রসাধন দ্রব্যাদির নিমিত্ত দুর্লভ বৈদেশিক বিনিময় সম্পদ ব্যয় করিতে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, স্বদেশে মূলধন বিনিয়োজনের অধিকতর চাহিদা হেতু ভারত সরকার কর্ত্তৃক মুনাফা দেশান্তর করণের এবং মূলধন স্বদেশীয় করণের সুযোগ-সুবিধা বিধান সত্ত্বেও, বিদেশীয় ধনিকগণ ভারতে মূলধন বিনিয়োজনে বিরত ছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সরকার ১৯৪ খানি মূলধন সংগ্রহের আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন ; এবং এগুলির মোট পরিমাণ ছিল ৬৬'১০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৬ কোটি টাকা পরিমিত ২৯ খানি আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল, যেহেতু সেগুলি ছিল বোনাস্ সেয়ার সংক্রান্ত। ইহার মধ্যে কয়েকখানি সরকারের শিল্প পরিবর্দ্ধন পরিকল্পনার বিরোধী ছিল। অভারতীয় শিল্পপতিদিগের নিকট হইতে ৪'০৮ কোটি পরিমিত ৫৩ খানি মূলধন সংগ্রহের আবেদনপত্র আসিয়াছিল। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত বলিয়া ৭১'৫৯ লক্ষ পরিমিত আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। বিশেষ প্রনিধানযোগ্য বিষয় এই যে, স্বাধীনতা(?) অর্জ্জনের পরবর্ত্তী তিন বৎসরে বৈদেশিক সহযোগিতা-সম্পন্ন ৮৮টি শিল্প-পরিকল্পনা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি লাভ করিয়াছে। পাঁচটি অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আবেদন কৃত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৩'৬৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০'৪ কোটি টাকা। পরিকল্পনাগুলি স্বয়ং সচল যান (automobiles), দ্বিচক্রযান, পাট তুলা প্রভৃতি কলকারখানার যন্ত্রপাতি, সেলাই ও গ্রামোফোনের সূচ, বিজলী সংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী, লৌহসংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য ধাতু, কৃষি যন্ত্রপাতি, রং, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাঁচা ফিল্ম, পশম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, বনস্পতি ঘৃত, ক্রীড়া সামগ্রী, ফটো সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এবং খাদ্য সংক্রান্ত। বৈদেশিক সহযোগিতার প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির সত্ত্বাধিকার এবং পরিচালন কর্ত্তৃত্বের প্রকৃষ্ট অংশ রহিয়াছে ভারতীয়দের হস্তে। প্রত্যেক শিল্পে ভারতীয় কর্ম্মীদের সম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ভারতীয় এবং বৈদেশিক কলকারখানায়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সংক্রান্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা বিহিত থাকিবে এবং বৈদেশিক সহযোগিগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে শিল্প কৌশল ও শিল্পী-নৈপুণ্য বিষয়ে অকপট সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে। পাট ও তুলার কলকারখানাগুলিতে নিবদ্ধ মূলধন সমস্তই বৃটিশ ধনিকদের এবং তাহার পরিমাণ ৯'৫ কোটি টাকা। এই কারবারে অন্য কোন বৈদেশিকের মূলধন নিয়োজিত হয় নাই।

পতন

সুবোধ বসু

ছাত্রমহলে অধ্যাপক জ্যোতিভূষণের বাবু বলিয়া নাম আছে। বাস্তবিকই তিনি সৌখিন মানুষ। তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী, তাঁর সাজ-পোষাক, তাঁর চলন-বলন সবই সুরুচিসম্মত। বালিগঞ্জে এক নিভৃত রাস্তায় তাঁর নিজস্ব বাড়িটি বড়ো নয়। কিন্তু তার সামনে ফুলের ছোট বাগান, তার জানালায় ভালো পর্দা, তাঁর বসার, পড়ার, খাবার এবং শোবার কামরাগুলি যথোচিত আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামে ছিমছাম।

জ্যোতিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আয় যে কোনও মোটর গাড়ির সেলসম্যানের চেয়ে কম। কিন্তু সুন্দরভাবে থাকার পক্ষে এই আয়ই তাঁর যথেষ্ট। তিনি অকৃতদার। তাঁর অন্য গলগ্রহ নাই। বদ খেয়াল নাই। নেশার মধ্যে এই সুন্দর ফিটফাট হইয়া থাকার নেশা।

প্রায় বছর আটচল্লিশের সুপুরুষ লোক জ্যোতিভূষণ। লম্বা, একহারা। পরিপূর্ণ মুখ, চশমায় মোড়া কোমল টানা চোখ, টিকলো নাক, সুকুমার ঠোঁট। কলেজের অধ্যাপক না হইয়া সিনেমার নায়ক হইলেও কিছু বেমান দেখাইত না। এই সুন্দর চেহারার প্রতি উচিত রকম যত্ন নেওয়ায়ই ছাত্র ও সহকর্মী মহলে তাঁর বাবু নাম রটিয়াছে। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতিকে যারা ঈর্ষ্যা করে তারা বলে—'ফুল বাবু।'

জ্যোতিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 'কম্বাইন্‌ড্ হ্যাণ্ড' পঞ্চু কালো পাম্পশু আয়নার মতো চকচকে করিয়া, ধুতি কোঁচাইয়া ক্যাম্ব্রিকের শাদা পাঞ্জাবির হাতা গিলে করিয়া আলনায় সাজাইয়া দিয়াছে। নিজের শয়নঘরে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসিয়া অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ অলসভাবে মাথার চুল ব্রাশ করিতেছেন।

'আবার আরেকটা!' তিনি আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের কাছে সোদ্বেগ উক্তি করিলেন। মনটা খারাপ হইয়া গেল। তিনি ড্রেসিং টেবিলের একটা টানা খুলিয়া ক্রোমিয়ম প্লেটকরা একটা চিমটে বাহির করিলেন। বাম গালের জুলপির দিকে সেটা আগাইয়া আনিলেন।

মাত্র গত কালই দুই জুলপি হইতে গোটা ছয়েক পাকা চুল তুলিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন, আর নাই। হঠাৎ আরও একটা চোখে পড়িল।

'হয় তো আরও অনেক নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।' জ্যোতিভূষণ মনে মনে বলিলেন।

আসন্ন জরাকে এমনভাবে ঠেকান যায় না, তা তিনি যথেষ্টই বোঝেন। হয়তো ইতিমধ্যে ঘাড়ের কাছে তাঁর দৃষ্টির বাহিরে অনেক শাদা চুল উঁকি মারিয়াছে। তবু তিনি শাদা চুলের এই আবির্ভাবটা বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। যখনই চোখে পড়ে, টানিয়া তুলিয়া ফেলেন।

জ্যোতিভূষণ সুগন্ধি লোশন-মাখা চুল পরিপাটি করিয়া ব্রাশ করিলেন। কোঁচানো ফরাশডাঙ্গা ধুতি পরিলেন, ক্যাম্ব্রিকের লম্বা পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। সিল্কের এবং সুতীর দু'রকমের রুমাল সুগন্ধযুক্ত হইয়া পকেটে উঠিল। মুখ দেখা যাওয়া পাম্পশু পায়ে পরিয়া তিনি আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য করিলেন।

একটু সুরুচিসম্পন্ন মনে হয়, তার বেশি নয়। কলেজের ক্লাসের পক্ষে কিছুই বেমানান নয়। ছেলেরা নাকি ঠাট্টা করিয়া বলে—'প্রেফেসার মুখার্জ্জি আঙুলে কিউটেক্স মাখেন।' এটা ছেলেদেরই উপযুক্ত অতিরঞ্জন। তিনি সুন্দর হইতে চান, তা বলিয়া ফুল বাবু হইতে চান না। ভগবান যদি তাঁকে সুদর্শন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে সেটা জ্যোতিভূষণের এমন কিছু অপরাধ নয়। তাঁর অনেক সহকর্ম্মীই তাঁর মতো জামা-কাপড় পরিয়া আসেন। তাঁহাদের চেয়ে তাঁকে যদি বেশি সুসজ্জিত

মনে হয়, তবে সে কি তাঁর দোষ! সুন্দর হওয়া কি দোষের?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার্স-রুমে নিজস্ব টেবিলের উপর জ্যোতিভূষণ তাঁর দামি ফোলিও ব্যাগটা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহকর্মী অধ্যাপক সেন আসিয়া বলিলেন, 'মিস ঘোষ আপনার খোঁজ করছিলেন, জ্যোতি বাবু।'

মিস্ ঘোষ পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিউটর এবং নানা ছাত্র প্রতিষ্ঠানের 'মক্ষিরাণী'। খুব সুন্দরী না হইলেও খুব কায়দাদুরস্ত চটপটে মেয়ে মিস্ ঘোষ। তিনি যাকে খাতির করেন, সে-ই নিজেকে ধন্য বোধ করে।

'কেন, মিটিংয়ে বক্তৃতার ফরমাস?' চেয়ার টানিয়া জ্যোতিভূষণ নিরাসক্ত কণ্ঠে কহিলেন।

'তার আমি কি জানি?' অধ্যাপক সেন রসিকতা করিয়া কহিলেন। 'আপনাদের মধ্যে কি প্রয়োজন অপ্রয়োজন, বাইরের লোকের তা জানবার কথা নয়।'

'তা যান না, আধুনিক চীনের ছাত্র-সংহতি সম্বন্ধে আপনিই ওঁদের পরিষদের মিটিংয়ে বক্তৃতা করে' আসুন না!'

'ওরে সর্ব্বনাশ, এ রকম চেহারায় কখনও সভাপতি, চীফ গেষ্ট হওয়া যায়!' অধ্যাপক সেন রগড়ের সুরেই কহিলেন। 'চেহারার ওপর আর কিছু নেই, মশায়। আপনার মতো একখানা চেহারা হলে দুনিয়ার লোক পেছনে ছুটে আসত।'

'অথচ আমি একটা স্ত্রীও জোটাতে পারলাম না।' জ্যোতিভূষণ পরিহাসও গম্ভীরভাবেই করেন।

'আহা, একবার কথাটা বলেই দেখুন না।' অদম্য অধ্যাপক সেন বলিলেন।

অনেকেই বলে—এখনও নাকি তিনি সুপাত্র বিবেচিত হইতে পারেন। আটচল্লিশ বছর বয়সে কথাটা জ্যোতিভূষণের কাছে পরিহাসের মতোই মনে হয়।

জ্যোতিভূষণ যে আদর্শহিসাবে বিবাহের বিরোধী, ঠিক তা নয়। যোগাযোগ হয় নাই। মাথার উপরও চাপ দিবার কেহ ছিল না। তা ছাড়া, প্রথম যৌবনে তিনি বড় লাজুক ছিলেন মেয়েদের যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন। যখন বাধ্য হইয়া উহাদের সম্মুখীন হইতে হইত, তখন নীতিবোধের উপদেশ মাফিক তাহাদের বড় বেশি সম্মান করিতেন। প্রেমের উদ্‌ভবের জন্য যে সব আদান-প্রদান দরকার, তাহা সাবধানতার সঙ্গে পরিহার করিয়া সুনীতি অব্যাহত রাখিতেন। ফলে, আজও তিনি অকৃতদার।

এতদিনে অবস্থাটা সহ্য হইয়া গিয়াছে। এটাকেই সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দেখিয়া তিনি আরাম বোধ করিতেছেন। সংসারীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রায় খুশি হন। আজ স্ত্রীর অসুখ, কাল ছেলের হাত ভাঙিয়াছে, পরশু মেয়ের হুপিং কফ, এ সব যতই দেখেন, ততই অস্ত্রীক জীবন তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়। এত সব ঝামেলা তাঁর সহ্য হইত না। কত স্বাধীন, কত বোঝাহীন হাল্‌কা নিরুদ্বেগ জীবন তাঁর।

আবার দু' এক সময় মনটা বিগড়াইয়া যায়। কষ্টার্জ্জিত আনন্দের জন্য লালায়িত বোধ করেন।

ক্লাসের পর জ্যোতিভূষণ সরাসরি বাড়ি ফিরিতে পারিলেন না। চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সওয়া পাঁচটায়।

কিছুদিন ধরিয়াই পড়িতে বড় অসুবিধা হইতেছিল। লাইনগুলি কেবলই যেন এলোমেলো হইয়া ওঠে। হয় তো চশমার 'পাওয়ার' বাড়িয়া থাকিবে।

পাওয়ার বাড়া সম্বন্ধে জ্যোতিভূষণের একটা আতঙ্ক আছে। মেধাবী ছেলেদের রীতি অনুযায়ী তরুণ যৌবনে একবার তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টা কিন্তু শুরুতেই বানচাল হইয়া যায়। এই পরীক্ষার আগে যে ডাক্তারী পরীক্ষা লওয়া হইত, তাহাতে জ্যোতিভূষণ অমনোনীত হইলেন 'মাইওপিয়া'র জন্য। তাঁর দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট রকম সুদূর-ভেদী নয়।

ইহার পর তাঁর চশমার মাইনাস পাওয়ারে আরও বিয়োগান্ত সংখ্যা যোগ হইয়াছে, কিন্তু পড়ার এরকম অসুবিধা ইতিপূর্ব্বে আর অনুভব করেন নাই।'

ডাক্তারের সঙ্গে সময় ঠিক করাই ছিল। দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জ্যোতিভূষণ ডার্ক-রুমে যাইবার আহ্বান পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও একদিন পরীক্ষা হইয়াছে, সেই সব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি চলিল।

'কত বয়েস হলো, প্রফেসার মুখার্জ্জি?'

'আটচল্লিশে পড়েছি।'

'তবে আর দোষ কি!' ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন। 'চল্লিশেই তো চালসে পড়ার কথা। আট বছর ফাঁকি দিয়ে কাটিয়েছেন।...পড়ার জন্য আলাদা লেন্স চাই। এক সঙ্গেই করে দেব, না আলাদা আলাদা চশমা নেবেন?'

জ্যোতিভূষণ বেশ একটা ধাক্কা খাইলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনেকেরই দূরের এবং কাছের দৃষ্টির জন্য আলাদা আলাদা বা সম্মিলিত চশমা আছে। ব্যাপারটা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ইহা অতি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে, তাঁর চোখ জোড়াও তাঁর চুলগুলির পথ অনুসরণ করিতেছে। দেহের সকল যন্ত্রগুলিই নিস্তেজ হইয়া পড়িবার নোটিশ দিতেছে।

বেশ একটু মন-মরা হইয়াই জ্যোতিভূষণ বাস্‌-এ আসিয়া চাপিলেন এবং রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও গড়িয়া-হাটার মোড়ে আসিয়া নামিলেন।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। দলে দলে সুবেশ নরনারী বেড়াইতে বা সওদা করিতে বাহির হইয়াছে। তরুণ দম্পতী সহাস্যমুখে চলিয়াছে; তরুণী মেয়েরা কলহাস্য করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েসহ বাবা ও মা বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। বাচ্চাদের উৎসাহ এবং আব্দারের অন্ত নাই। এরই মধ্যে স্বামী স্ত্রীর কত সপ্রেম চাউনি নজরে পড়ে।

জ্যোতিভূষণ এই মধুরতা হইতে বঞ্চিত। ইহার প্রতি যখন লোভ হয়, তখন এই দৌর্ব্বল্য যুক্তি দ্বারা জ্যোতিভূষণ পরাস্ত করেন। ইহাই সম্পূর্ণ চিত্র নয়, তিনি মনে মনে বলেন। অনেক গল্পের মধ্যে ইহা মাত্র দু' ছত্র গান; অনেক কাঁটার মধ্যে ছোট্ট একটিমাত্র ফুল!

'এতক্ষণে বাড়ি ফিরছেন?'

একটা মোটর ঠিক তাঁর সামনে ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই স্তব্ধগতি গাড়ির জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া বছর সাতাশ-আটাশের একটি কায়দা-দুরস্ত যুবতী তাঁহাকে সম্বোধন করিল।

'ওঃ, মিস্ ঘোষ!' জ্যোতিভূষণ চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন। 'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?...না, য়ুনিভার্সিটি থেকে আপনার কিছু পরেই বেরিয়েছিলাম। তার-পর আবার চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হলো। সেখানে ঘণ্টা দেড়েক...।'

'আমার মা।' অধ্যাপিকা মিস্ ঘোষ তার পাশে উপবিষ্টা এক বর্ষিয়সীর প্রতি জ্যোতিভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 'মা, ইনিই প্রফেসার জ্যোতিভূষণ মুখার্জ্জি। আসুন না ভেতরে! আমাদের বাড়িটাও একবার দেখে আসবেন!'

জ্যোতিভূষণকে আগাইয়া যাইতে হইল। মিস্ ঘোষের মাকে সসম্ভ্রম নমস্কার জানাইতে হইল, ভদ্রতা-কুশল প্রশ্ন করিতে হইল এবং বৃদ্ধার অনুরোধে তাঁহাদের গাড়িতে চড়িয়া তাঁহাদের বাড়ি যাইতে হইল।

ইহাই সূত্রপাত। যেন একটা মোহে পাইয়া বসিল জ্যোতিভূষণকে। দিন যায়, আর এই হাস্যকর দুর্ব্বলতা তাঁকে আরও বেশি করিয়া গ্রাস করে। পাগলামিরও মাত্রা থাকা উচিত, জ্যোতিভূষণ মনে মনে নিজেকে সাবধান করেন, কিন্তু কার্য্যকালে মাত্রা রাখিতে পারেন না।

মিস্ ঘোষ সাতাশ। জ্যোতিভূষণ আটচল্লিশ! কুড়ি বছরেরও বেশি পার্থক্য। কুড়ি বছর! যেন মেয়ে আর বাবা! অবশ্য বয়স অনেকটা হইলে পার্থক্যটা খুব বিসদৃশ মনে হয় না। তবু তো কুড়ি বছরের প্রকাণ্ড তফাৎ!

মিস্ ঘোষ জ্যোতিভূষণের সঙ্গ অপছন্দ করেন না। তার মা আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করেন। অনেক নিমন্ত্রণ পায় জ্যোতিভূষণ সে বাড়িতে। তাঁদের গাড়িতে অনেক বেড়ায়। কিন্তু তাঁর প্রতি মল্লিকা ঘোষের কোনও রকম আসক্তি আছে, তাহাই বা কোন্ লক্ষণ দিয়া প্রমাণিত

হয়? এক সহকর্ম্মীর প্রতি আরেক সহকর্ম্মীর বন্ধুসুলভ ব্যবহার এমনই কি আশ্চর্য্য ব্যাপার?

একবার মরিয়া হইব কি? জ্যোতিভূষণ আজন্ম বিবেচক ও সংযমশীল। নারীজাতিকে সম্ভ্রম দেখাইতেই সে অভ্যস্ত। একবার উন্মাদনার রাজ্যে পা বাড়াইয়া দেখিবে কি?

মনের নবোদ্গত আবেগের কাছে সকল প্রকার দ্বিধাই হয়তো হার মানিত। এমন সময় প্রচণ্ড এক নিষেধ আসিল অভাবিত দিক হইতে।

সন্ধ্যাবেলা জ্যোতিভূষণ যখন রাস্তায় পায়চারি করিতে বাহির হইতেন, তখন একটি বাড়ির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে নিচতলার একটি ঘর প্রায়ই তাঁর নজরে পড়িত। সেই ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় চারজন লোক তাস খেলিতেন। কখনও কখনও দু' চারজন দর্শকও উপস্থিত থাকিতেন, তবে মোট লোক-সংখ্যা কখনই খুব বেশি হইত না। চুপচাপ শান্ত দলটি। বাড়ির কর্ত্তা প্রায়ই শুধু গায়ে বসিতেন। উপরে পাখা খুবই আস্তে আস্তে ঘুরিত। খেলায় তর্কাতর্কি কখনই হইত না। শুধু বাড়ির গিন্নী যখন একথালা পাঁপড়ভাজা বা চিনাবাদাম, অথবা রূপার ডিবায় পান সাজাইয়া লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণের মতো সহাস্য মুখে উপস্থিত হইতেন, তখনই খেলোয়াড়দের মধ্যে জীবনের সঞ্চার দেখা যাইত; হাসি এবং কথাবার্ত্তার একটু গুঞ্জন উঠিত। গিন্নী হয়তো স্বামীর পাশে আসিয়া একটু বসিতেন। আবার খেলা শুরু হইত।

এমন স্নিগ্ধ, এমন মধুর মনে হইত গার্হস্থ্য জীবনের রস যে, জ্যোতিভূষণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। চারদিকে এত হট্টগোল, কলহ ও রেষারেষি, অথচ ইহারই মধ্যখানে এক দম্পতীকে বেষ্টন করিয়া নিরুদ্বেগ নিরীহ জীবন-রসের একটি মধুর ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিভূষণের প্রায় লোভ হইত।

ক'দিন আগে বেড়াইতে গিয়া জ্যোতিভূষণ কিন্তু এই ঘরটিতে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মেঝেতে তাসের সভাটি নাই; তাহার স্থলে একাধিক চেয়ারে বেশ কয়েকজন লোক ঘরের একপ্রান্তের খাটটি বেষ্টন করিয়া নীরবে বসিয়া আছে। খাটের উপর একজন স্ত্রীলোক শায়িত। তেপায়ায় ওষুধের নানা রকম শিশি ও রোগীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ রাখা। 'গিন্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!' জ্যোতিভূষণ আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে মনে মনে বলিয়াছিলেন।

আজ আবার এই পথেই জ্যোতিভূষণ ফিরিতেছেন। বিকালে মিস্ ঘোষের বাড়িতে ছাত্রদের এক প্রতিষ্ঠানের কমিটি-মিটিং ছিল। জ্যোতিভূষণ তাহাতে যোগ দিতে যান। মিটিংয়ের পর মিস্ ঘোষ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে চা পান ও গল্পগুজব করিয়া সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন। বড় ভালো লাগিতেছে ইহাদের সঙ্গ। মল্লিকা ঘোষের দেমাক বলিয়া অপবাদ আছে। সে বেশী 'স্মার্ট', বেশী মাতব্বর বলিয়া লোকে অভিযোগ করে। কিন্তু তার মাধুর্য্য ছাড়া আর কিছুই তো জ্যোতিভূষণের চোখে পড়িতেছে না। যারা দীপ্তি ও ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য্যকে ভয় করে, তারাই ইহার নিন্দা করে। মল্লিকার দীপ্তি জ্যোতিভূষণকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁর বয়স কমাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। এমন চলিতে থাকিলে কে জানে তিনি তরুণ ছোক্‌রার মতো আচরণ করিয়া বসিবেন কি না!

পথ চলিতে চলিতে সহসা তাস খেলার ঘরটি জ্যোতিভূষণের চোখে পড়িল। তিনি প্রায় ধাক্কা খাইলেন। দেখিলেন, ঘর নির্জ্জন। মেঝেতে তাসের দলটি নাই। খাটের পাশের চেয়ারগুলি নাই। তে-পায়াটি রিক্ত। শুধু জনশূন্য খাটে পাশ বালিশে ঠেস্ দিয়া বড়ো একটা বাঁধানো ফটো করুণভাবে খাড়া হইয়া আছে।

'গিন্নীটি মারা গেছেন!' জ্যোতিভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন।

সেই দিন হইতে মিস্ ঘোষের বাড়িতে যাওয়া জ্যোতিভূষণের বিরল হইতে বিরলতর হইয়া উঠিল। এমন কি, য়ুনিভার্সিটিতেও মল্লিকাকে তিনি যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। যে বন্ধনের মধ্যে পা বাড়াইবার জন্য হঠাৎ এই মধ্যবয়সে জ্যোতিভূষণের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য

তীব্র আবেগ দেখা দিয়াছিল, তাসের ঘরের ট্র্যাজিডি তাহার যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। এই তো জীবন। এই তো সংসার-সুখ। যা পাওয়া যায়, ক্ষতির সম্ভাবনা তার সহস্রগুণ বেশী! খতিয়ান করিলে লোকসানের অঙ্কটাই বড়ো। বেশ আছেন জ্যোতিভূষণ। একক নিঃসঙ্গ জীবনে যেমন স্ফূর্তির অভাব, তেমন আবার অশান্তি এবং আঘাতের আশঙ্কাও কম।

জ্যোতিভূষণ আবার তাঁহার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিলেন। পরিপাটি করিয়া ঘর সাজান এবং সুন্দর সাজপোশাক করেন। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসিয়া চুল ব্রাশ করিতে করিতে নিজের নিটোল, সতেজ, সযৌবন মুখ লক্ষ্য করেন। ক্রোমিয়মপ্লেটকরা চিম্‌টে দিয়া পাকা চুল তুলিয়া ফেলেন। পথ চলার চশমাটি পাণ্টাইয়া পড়ার চশমা কানে বসাইয়া স্বচ্ছন্দে আবার আগের মতো অজস্র বই পড়েন।

এই ভাবে মাস দু'য়েক কাটিবার পর ইনষ্টিটিউটে ছাত্রদের এক উৎসবে জ্যোতিভূষণ প্রধান অতিথি হইয়া গিয়াছেন। মল্লিকার সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য এসব সভা ইদানীং তিনি যথাসম্ভব পরিহার করিতেন। এবার পারা গেল না। জ্যোতিভূষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সভা ভঙ্গের আগেই পালাইবেন।

সভাপতি হইবার কথা ছিল এক মিনিষ্টারের। কিন্তু জরুরি কাজ পড়ায় তিনি শেষমুহূর্ত্তে আসিতে পারিলেন না। মিস্ ঘোষের প্রস্তাবে এবং অন্যদের সমর্থনে জ্যোতিভূষণকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল।

অধ্যাপিকা মল্লিকা ঘোষের উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়া সেদিনের উৎসব আরম্ভ হইল। বক্তৃতায় যৌবনের জয়-গান করিয়া মিস্ ঘোষ কহিলেন: যৌবনের সবচেয়ে বড় গুণ, সে ভীরু নয়। সে মাথা উঁচু করিয়া আগাইয়া চলে। হয়তো দু'পা গেলেই মৃত্যু, কিন্তু যৌবন অকুতোভয়! নিজের জীবনরসে সে নিজেই মাতোয়ারা। বার্দ্ধক্য মৃত্যুকে সেলাম করিয়া চলে, কিন্তু যৌবন কাহারও কাছে মাথা নিচু করে না। তাই যৌবন এত সুন্দর। বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে সে আগাইয়া চলে। যাহা সে চায়, বিনা দ্বিধায় দুই মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়া সে মৃত্যুকে জয় করে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর ঘণ্টা দুয়েক কাল সঙ্গীত আবৃত্তি নৃত্য প্রভৃতি সহযোগে মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়া যৌবন সে সন্ধ্যার জন্য নিশ্চপ হইল। উৎসব ভাঙিল।

মল্লিকা কহিলেন, 'আপনি বাড়ী যাচ্ছেন তো, প্রফেসার মুখার্জ্জি? সঙ্গে আমার গাড়ী আছে।...আপনি দু' মিনিট দাঁড়ান! আমি ভেতরে একবার ব'লে আসি...।

মল্লিকার গাড়ীতে জ্যোতিভূষণ গত দুই মাস চাপেন নাই। মল্লিকা যে আমন্ত্রণ জানাইবে, সে অবকাশই দেন নাই। আজ এড়াইবার উপায় ছিল না।

'অনেক দিন আমাদের বাড়ী আসেন না।' চলন্ত মোটরের পিছনের গদিতে পিঠ এলাইয়া মল্লিকা কহিলেন

'নানা কাজকর্ম্মে আট্‌কে যাই।' আমতা আমতা করিয়া জবাব দিলেন জ্যোতিভূষণ।

'কাল আসুন না সন্ধ্যার দিকে! আমি বাড়ীতেই থাকব।'

'আচ্ছা বেশ। যদি পারি, যাব।' জ্যোতিভূষণ কহিলেন

'বক্তৃতায় অনেক বাজে কথা বলেছি কি?'

'না, কেন, বেশ হয়েছে।' জ্যোতিভূষণ কহিলেন 'কিন্তু দেখুন, আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন, যা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক রকম সত্য, তাকে অস্বীকার করাটাই সবচেয়ে বাহাদুরি? চ্যাংড়ামিকেও তবে তারিফ্ করতে হয়। যৌবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে বলেই কি মৃত্যু নেই, জরা নেই?'... কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব জ্যোতিভূষণের।

মল্লিকা একবার সকৌতুকে জ্যোতিভূষণের দিকে তাকাইলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, 'অস্বীকার করলে তা থাকবার উপায় কি! লজিকে তাই বলে না?...যারা সারাক্ষণ মরবার ভয়ে আছে, সারাক্ষণ নিজেদের বুড়ো মনে করছে, মৃত্যু আর বার্দ্ধক্য তাদের কাছেই সত্য। যারা এদের আমলই দেয় না, মৃত্যুর কথা ভাবে না, চুল পাকলেও জীবন-রস উপভোগ করতে পারে, জরা মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ বৈ কি!......এই মনোবৃত্তিকেই

আমি যৌবন বলেছি, নইলে বয়সের দিক থেকে যে ছোক্‌রা, মনের দিক থেকে সেও বুড়ো হ'তে পারে। আবার বয়সের দিক থেকে যে প্রবীণ, তার মধ্যেও হয়তো তারুণ্যের সোনা ছড়ানো।… কিন্তু মাথামুণ্ডু যা বলেছি তার সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি হতে পারব না। …ঐ দেখুন, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে! কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর! ওর মাধুর্য্য অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর কথাটা ভাবাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?…'

সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নার রূপার স্রোত মোটর গাড়ীর জানালার কাচ ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে অজস্র ধারায়। মল্লিকা ঘোষের কপালের উপর ছোট চুলগুলি লাফাইয়া বেড়াইতেছে স্বপ্নশিশুর মতো। তার বালা পরা নিটোল হাত কোলের উপর আলগোছে রাখা। কিংখাবের ব্লাউজের নানা জায়গায় জ্যোৎস্না ঝিকমিক করিতেছে। শাড়ির সোনালী পাইপিং-খচিত আঁচল একদিকের কাঁধ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। চুলে মাথা-ঘষার গন্ধ।

জ্যোতিভূষণ এক লাফে যেন গত দুই মাসের ঔদাসীন্য ডিঙাইয়া আসিলেন। এই সুযোগ! এই তো সুযোগ! জীবনে এত বড় উন্মাদনা আর নাই। এত বড় সার্থকতা আর নাই। এই সেই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এই মুহূর্ত্ত মল্লিকা তৈরি করিয়া দিয়াছে। ইহা জ্যোতিভূষণ গ্রহণ করিবেন। বলিবেন, 'মল্লিকা, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে না হইলে আমার জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মনে প্রাণে আমি তরুণ। আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের কোণায় কোণায় যৌবনের সোনা ছড়ানো আছে…।'

'মল্লিকা দেবী!' জ্যোতিভূষণ অকস্মাৎ বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন।

মল্লিকা স্মিতমুখে চাহিলেন।

'আমাকে এখানেই নামতে হবে।' জ্যোতিভূষণ যেন একটা আর্ত্তনাদ দমন করিয়া কহিলেন।

'সে কি!' সবিস্ময়ে মল্লিকা কহিলেন। 'বাড়ি যাবেন বল্লেন না?'

'না, যেতে একটু দেরি হবে।' জ্যোতিভূষণ গোঁজ হইয়া কহিলেন।

যেন বিবেকের দংশনে চমকিয়া উঠিয়া জ্যোতিভূষণ কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজের উপর দখল পাইবার চেষ্টা চলিতেছে। চোখে অনুতপ্তের করুণ দৃষ্টি। মুখের রেখায় ভাবাবেগ চাপিবার স্পষ্ট আভাষ।

মল্লিকা এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু তার ভদ্রতা অক্ষুণ্ণ রহিল। শোফেয়ারকে সে গাড়ি থামাইতে আদেশ করিল। কহিল, 'কাল আসা চাই কিন্তু। আবার যেন কোনও দরকার বসিয়ে বসবেন না।'

জ্যোতিভূষণ প্রায় স্খলিতপদে মোটর হইতে রাস্তায় নামিলেন। মল্লিকার বিদায়-সূচক হাত নাড়া তাঁর চোখেই পড়িল না। পাংশু ভীত মুখ। যেন একটা প্রকাণ্ড দুষ্কর্ম্ম করিতে গিয়া একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে নিজেকে রোধ করিতে পারিয়াছেন। কি হঠকারিতাই করিতে বসিয়াছিলেন তিনি! মধ্য-বয়স্ক অধ্যাপকের এই কাণ্ড!

জ্যোতিভূষণ কাছের গ্যাস্-পোষ্টটার তলায় আগাইয়া গেলেন। তাঁর ডান হাতের বদ্ধ মুঠোতে রুমালটা সজোরে চাপা ছিল। চোরের মতো একবার সভয়ে চারদিকে চাহিয়া তিনি মুঠো আল্‌গা করিলেন। লং ক্লথের সাদা রুমালটা আঙুলের টিপুনি হইতে ছাড়া পাইয়া শিথিল ফুলের দলের মতো হাতের তেলোর উপর ছড়াইয়া পড়িল। ঐ সঙ্গে রুমালে একটা রক্তের ছোপের উপর চকচক করিয়া উঠিল একটা শাদা দাঁত!

মাত্র একটু আগে গাড়ির ভিতর জ্যোতিভূষণের হাতে তাঁর মাড়ি হইতে এই দাঁতটি খসিয়া আসিয়াছে!

নীলদর্পণ

শ্রীকালিদাস রায়

উত্তর ইউরোপে ধূম ও কুয়াশার জন্য চুনকাম করা গৃহগুলি তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হইয়া যায়—সেজন্য গৃহের ভিত্তি প্রাচীর নীলরঙে রাঙানো হয়। এই নীলরঙ ইদানীং রাসায়নিক উপায়ে কয়লার কাথ হইতে প্রস্তুত করা হইতেছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইহা নীল গাছ হইতে উৎপাদিত হইত। নীল চাষের পক্ষে বাংলার মাটি খুব উপযোগী ছিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া নীলের কারবার সুরু করে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী অন্যকেও নীল চাষের অধিকার দেয়। তখন বিলাত হইতে বহু সাহেব আসিয়া এদেশে নীলকুঠি স্থাপন করে। তাহারা প্রথম প্রথম জমিদার ও জোতদারদের কাছ হইতে নীল গাছ খরিদ করিয়া তাহা হইতে রঙ বাহির করিত। ক্রমে তাহারা দেখিল—নিজেরাই নীলের চাষ করিতে পারিলে বা সাধারণ লোককে নীল চাষ করিতে বাধ্য করিলে আরও অনেক বেশী লাভ করিতে পারে। এজন্য তাহারা জমিদারদের কাছ হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া সাধারণ রায়তদের নীল চাষের জন্য নামমাত্র দাদন দিতে লাগিল। নিতান্ত দুঃসময়ে অভাবে পড়িয়া রায়তরা ঐ দাদন গ্রহণ করিত এবং বাধ্য হইয়া ধানের বদলে জমিতে তাহাদের নীল লাগাইতে হইত। পর বৎসরের জন্য দাদন না লইলে তাহারা তাহাদের উৎপাদিত নীল গাছের দাম পাইত না। ক্রমে তাহারা শ্বেতচর্ম্ম, বন্দুক, লাঠিয়াল ও সরকারী সাহায্যের জোরে যে-কোন চাষীকে যে-কোন জমিতে নীল চাষ করাইতে বাধ্য করিত। অসম্মত হইলে অত্যাচার উপদ্রবের অন্ত থাকিত না। অথচ নীল গাছের দরুণ প্রাপ্য অর্থ ঠিকমত পাইত না। একবার নীলচাষ আরম্ভ করিলে কিছুতেই তাহা হইতে মুক্তি ছিল না। ইহার অনিবার্য্য ফল হইল—নীলকররাই তাহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু হইয়া দাঁড়াইল। ভালো ভালো জমিতে নীল চাষ করায় খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইত। যাহার বহু বিঘা জমি আছে—তাহাকেই চাউল কিনিয়া খাইতে হইত। অর্থের অভাব হইলে পেটের ভাত সংগ্রহ করাও কঠিন হইত—এদিকে কৃষাণদের বলদ পুষিতে হইত, খাজনা ঠিকমত দিতে হইত—নিজেদের শ্রমশক্তি নীলকরদের জন্য নিঃশেষে প্রয়োগ করিতে হইত।

ইহা ছাড়া, কথায় কথায় কুঠিতে ডাক পড়িত, সামান্য একটু ত্রুটীর জন্যও অকথ্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। অনেককে এই উপদ্রবের ভয়ে ভিটামাটি, জমি-জায়গা ছাড়িয়া নীলকুঠি হইতে বহু দূরে গ্রামান্তরে উঠিয়া যাইতে হইত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর বাংলার মাটি নীল গাছে ভরিয়া গেল। যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও পাবনা জেলাতেই সবচেয়ে বেশী জন্মিতে লাগিল। নীলকররা নীল চাষের ব্যাপারে পৃথক আইন পাশ করিয়া লইল। দশ পয়সা দাদন লইলেও সে চুক্তিবন্ধে আসিয়া পড়িত—এজন্য চাষীরা কিছুতেই দাদন লইতে চাহিত না। জোর করিয়া তাহাদের হাতে দাদন গুঁজিয়া দেওয়া হইত। চুক্তি ভঙ্গ হইলে তাহারা ফৌজদারী আইনে দণ্ডভোগ করিত। নীলকররা সরকারী দণ্ডের জন্য অপেক্ষাও করিত না—তাহারা চাষীদের কুঠিতে ধরিয়া আনিয়া সরাসরি বিচার করিত—তাহাদের আটক করিয়া রাখিত—দারুণ প্রহার দিত—অস্থাবর ক্রোক করিত।

তাহারা যখন দাদন দিত, তখনই কত মণ নীল দিতে হইবে তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়া দিত। ইহাও চুক্তির অঙ্গীভূত থাকিত। চুক্তিমত নীল দিতে না পারিলে বাধ্য হইয়া পর বৎসরের জন্য আবার দাদন লইতে হইত। আরও বেশী জমিতে নীল লাগাইতে হইত। ইহার ফলে

অনেক চাষীর একেবারেই খাদ্যশস্যের চাষ করাই হইত না। নীলের দামও চাষীরা ঠিক করিয়া পাইত না। নীলকররাই ইচ্ছামত দাম ধরিয়া নীল দখল করিত।

ইহা ছাড়া—নীলকররা নিজেদের খাস জমির চাষ আবাদের জন্য সাধারণ চাষীদের বেগার ধরিত। নীলকরদের অত্যাচারে তাহাদের ঝি-বৌ-এরও ইজ্জত থাকিত না। গ্রামের কোন সভ্য শিক্ষিত লোক বা জোতদার ভাগিদার শ্রেণীর লোক যদি নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিত, তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যা মকদ্দমায় জড়াইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিত। তাহাদের ভিটে ছাড়া করিয়া ছাড়িত। ইহার কোথাও কোন প্রতিকার ছিল না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট নীল করদেরই বন্ধু এবং সহায়। পুলিশের লোকেরা সবই ছিল নীলকরদের ভৃত্যসেবকের মত। গরিব রায়তরা সুপ্রিম কোর্টেও নালিশ করিতে পারিত না।

চাষীদের মধ্যে কখনও কোন বিদ্রোহ হয় নাই, তাহা নয়—কিন্তু যেখানেই বিদ্রোহ হইয়াছে, সেখানেই হয় নীলকরদের লাঠিয়ালরা নয় সরকারী পুলিশ তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়—সেই সময় নীলকর সাহেবদের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়—তাহার ফলে অত্যাচার চরমে উঠে। ইংরাজের প্রজা নীল্‌করদের গোলামে পরিণত হয়।

সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। নিরীহ নিরস্ত্র বাংলার চাষীরাও শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইল। যশোহর খুলনা ও উত্তরবঙ্গের ৫০ লক্ষ নীলচাষী একসঙ্গে নীল লাগাইব না বলিয়া ধর্ম্মঘট করিল। নীলকরদের নিদারুণ অত্যাচার চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই চাষীরা বশীভূত হইল না। তখন সরকার বাধ্য হইয়া নীল কমিশন বসাইলেন। তাহার ফলে নীল চুক্তির আইনটা রদ হইল। কিন্তু তাহাতেও অত্যাচার থামিল না।

বাংলার রায়তরা যখন নীলকরদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিল, তখন নগরের সভ্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরা নীরব ছিল না। সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক পত্রগুলিতে প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে লেখালেখি হইত। সবচেয়ে এ জন্য লড়িয়াছিল—হিন্দু পেট্রিয়ট। ইহার সম্পাদক ছিলেন হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিশ বাবু নির্ভীকভাবে দিনের পর দিন নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। এই সকল সংবাদপত্রপরিচালকরা শোনা কথার উপরই নির্ভর করিতেন।

স্বচক্ষে নীলকরদের অত্যাচার দেখিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। প্রথমতঃ ইঁহার নিবাস ছিল যশোহর জেলায়—ইঁহারই নিজ গ্রামে ও তাহার চারিপাশে নীলকরদের রাজত্ব চলিতেছিল পুরামাত্রায়। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন ডাকবিভাগের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট। সরকারী কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তিনি স্বচক্ষে প্রজার দুর্দ্দশা ও নীলকরদের উপদ্রব দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার-অভিজ্ঞতার ফল এই নীলদর্পণ নাটক বুকের রক্ত দিয়া লেখা। নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে সমগ্র দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। তারপর মাইকেল যখন ইহার অনুবাদ করিলেন ইংরাজিতে এবং লঙ সাহেব ইহা প্রকাশ করিলেন, তখন ইংরাজ মহলও বিচলিত হইলেন ইংরাজ সরকার ব্যাপারটিকে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ বিলাতে পার্লামেণ্ট ইংরাজি নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্খালনের জন্য সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে নীলকরদের উপদ্রব অনেকটা উপশান্ত হইল। জগতে যে কয়খানি সাহিত্য পুস্তক মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নীলদর্পণ অন্যতম। বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদন ইহাতেও হয় নাই। মানুষের আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ যাহা পারে নাই—বিজ্ঞান তাহা করিয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক উপায়ে কয়লার কাথ হইতে নীলরঙের আবিষ্কারের ফলে এই মহাপাপের চিরনিবৃত্তি ঘটে।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে বেনামী প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পরিচয় পত্রে লেখা ছিল—"নীলকর বিষধর দংশন-কাতর প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।' বিলাতী নীলকররা গত শতাব্দীতে

প্রজাগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। এই প্রজা-পীড়নের প্রতিকারকল্পে দীনের বন্ধু দীনবন্ধু এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। অতএব কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের মতই ইহা উদ্দেশ্যমূলক নাটক। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পাদরি লঙ্ সাহেব ইহার একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে একমাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইহা ছাড়া তাঁহার এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। সেকালের কলিকাতা সমাজের বিখ্যাত সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ এই টাকা লঙ্ সাহেবকে দান করেন। এই গ্রন্থের প্রচারের জন্য সীটনকার সাহেবের লাঞ্ছনা কম হয় নাই। যাহাই হউক, ইংরাজিতে অনূদিত হইলে তাহা হইতে ইউ-রোপের অন্যান্য ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হয়! সে-কালের কোন বাংলা গ্রন্থের ঐ সৌভাগ্য হয় নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই "গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি নীলদর্পণের অনুবাদ ও প্রচারে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিপদ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদের জন্য মাইকেল মধুসূদন তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রিম কোর্টের চাকরী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" মধুসূদনের নাম ইংরাজী অনুবাদে না থাকিলেও তিনিই যে অনুবাদক তাহা সরকার জানিতে পারিয়াছিলেন।

"মিসেস ষ্টোএর Uncle Tom's Cabin প্রকাশিত হইলে আমেরিকার দাসপ্রথার মূলে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিল, Dickensএর Nicholas Nickleby ও Oliver Twist প্রকাশিত হইলে বিলাতে শিশুপীড়নের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তেমনি নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দূরীভূত করিবার জন্য অসামান্য সহায়তা করিল। দেশবিদেশের অল্পসংখ্যক যথার্থ পুণ্যবান্ সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে দীনবন্ধু অন্যতম।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন)

নীলদর্পণের সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক, নীলকরদের অত্যাচারদমনে ইহা বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

"এই নাটকখানি লইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ৺মধুসূদন সান্যালের বাটীতে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা (National Theatre) খোলা হইয়াছিল। একই অভিনয়ক্ষেত্রে গোলোকচন্দ্র, সাবিত্রী, উডসাহেব ও এক চাষার চরিত্র অভিনয় করিয়া অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভিনেতৃগণ কলিকাতা টাউনহলে নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যার্থ এই নাটকের অভিনয় করেন। (সুবল মিত্রের অভিধান।)

একটি জাতির ঘর বাড়ীতে রঙের জৌলুসের জন্য আর একটি জাতির হাজার হাজার লোকের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া তাহাদের উদ্বাস্তু করা, তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা—ইহা যে মানব সভ্যতার পক্ষে কতদূর পাশবিকতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় তাহা ইতিহাস ভুলিয়া যাইতে পারে, সাময়িক সাহিত্য তাহা ভুলিতে পারে না। এইরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার যদি সাহিত্যিকের মর্ম্মস্পর্শ না করে তবে আর কোন মানবদুঃখ তাহাকে বিচলিত করিবে? ভূমিকায় দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন—"তোমাদের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?" উৎপীড়িত দরিদ্র চাষীদের বেদনা ও নীলকরদের অত্যাচার তাঁহার কবি-হৃদয়কে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে তিনি যে ইংরেজের অধীনে রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার জীবিকা যে নীলকরদের সজাতি ও বান্ধবদের হাতে, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এতদূর নির্ভীকতা বঙ্গ সাহিত্যে আর কেহ দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি যে এই পুস্তক লিখিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহা একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

দীনবন্ধু সত্যই ছিলেন 'দীনবন্ধু'—দীনের প্রতি দয়ার তাঁহার অবধি ছিল না। দীনের কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার

করেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "দীনবন্ধু সবের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীলদর্পণ এই গুণের ফল।" দীনবন্ধু নীলদর্পণের নবীনমাধবে তাঁহার দরদী হৃদয়খানি সঞ্চারিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর অন্তর্গূঢ় বেদনাই নীলদর্পণের হতভাগ্য পাত্র-পাত্রীগুলির মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে।

নীলদর্পণের শোচনীয় দৃশ্য নীলকরদের অত্যাচারের একটি প্রতিনিধিমূলক চিত্র। একই কুঠি হইতে অতি অল্প দিনের মধ্যে এতগুলি অত্যাচার না-ও হইতে পারে। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত।" দীনবন্ধু কয়েকটি প্রকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি সম্ভাবিত ও সুসমঞ্জস ঘটনার যোগে এই চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্রটিকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার জন্যই তিনি নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু নাটকীয় চিত্র হিসাবে ইহা সরস, বিশ্বাস্য ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার ভিত্তিমূলক মূল্য যথেষ্ট। নীলদর্পণে তিনি পরবর্ত্তী নাট্যসাহিত্যের পথের নির্দ্দেশও দিয়াছেন নানা ভাবে। নীলদর্পণে তিনি যে চরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা ব্যক্তিমূলক নহে, জাতিমূলক। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তিনি দুইটি জাতীয় চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির চরিত্রেও দুইদিক আছে—বাঙ্গালী চরিত্রেও দুইদিক আছে।

ইংরাজের চরিত্রের একদিকের তিনি আভাস মাত্র দিয়াছেন—জঘন্য দিকটারই অঙ্কন করিয়াছেন দুইটি কুঠিয়াল ও একটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চরিত্রের মারফতে। এই চরিত্র চিত্রণ এমনই অবিকল ও বাস্তবমূলক যে ইহা সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। আমরা এ যুগে এ শ্রেণীর সাহেব দেখি নাই, কিন্তু অনায়াসে গত শতাব্দীর কুঠিয়াল সাহেবের চরিত্র ইহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি। এজন্য ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালী চরিত্রের দুই দিকই তিনি দেখিয়াছেন—তাঁহার গোলোক, নবীনমাধব, সাধু, তোরাব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী ইত্যাদি চরিত্রে একদিক ফুটিয়াছে—আবার গোপী দেওয়ান, আমিন, পদী ময়রাণী ইত্যাদি চরিত্রে আর একদিক ফুটিয়াছে। দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মভীরু, সে স্নেহপ্রেমভক্তি ভালবাসাকে আশ্রয় করিয়া সাধুভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চায়। তাহার সহিষ্ণুতার অন্ত নাই, চিরদিনই মুখ বুজিয়া সে বহু অত্যাচারই সহ্য করিয়াছে—অত্যাচারীর সহিত সন্ধি করিয়াও সে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু এই সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রান্ত হইলে সে জীবন উৎসর্গ করে—আর সন্ধি করিতে পারে না।

অপর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আছে যাহারা স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য চরম অপমান সহ্য করিতে রাজী। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, ইতরতা, অসাধুতা নির্ম্মমতা ইত্যাদিই তাহাদের আশ্রয়। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীরাই যুগে যুগে অত্যাচারী নরপশুদের সহায়ক। কেবল স্বার্থের জন্য ইহারাই স্বজাতির সর্ব্বনাশ করে—পরম উপকারী নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তিকেও জেলে পাঠাইতে বা সর্ব্বস্বান্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেনা। ইহারাই সাহেবের লাথি খাইয়া প্রশ্ন করে—"হুজুরের পায়ে লাগেনিত?" East India Company-র সময় হইতে এই শ্রেণীর বাঙ্গালীরাই সাহেবদের দুষ্কর্ম্মের বুদ্ধিদাতা ও সহায়ক, ইহাদের জন্যই সাহেবদের এদেশে এত দুর্ণাম, এত নৈতিক অধঃপতন। গ্রামবাসীদের যে চরিত্রের পরিচয় এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—সাধু সজ্জন পরোপকারী ব্যক্তির উপর অযথা অত্যাচার হইলে গ্রামবাসীরা হায় হায় করে; কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারেনা। তাহাদের চরিত্রের মূলমন্ত্র—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

নীলদর্পণে মোক্তারের আবেদনগুলি সুরচিত। নাটকের স্থলে স্থলে গিরীশচন্দ্রের টেকনিকের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। ক্ষেত্রমণির চিত্রটিতে বিন্দুমাত্র অবাস্তব কল্পনার সহায়তা আছে বলিয়া মনে হয়না—রচনাগুণে ইহা অতি করুণ বাস্তবচিত্রে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, হয়ত প্রকৃত ঘটনা।

নীলদর্পণ সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত—

"দীনবন্ধুর অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটকের প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তৎকালীন প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin, 'টম কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে।' নীলদর্পণ নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁহার আর কোন নাটকেই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।"

নীলদর্পণের আখ্যানাংশ এই -

স্বরপুর গ্রামের গোলক বসু একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার ঘরের লাঙলের চাষ ছিল, বাঁধান পুকুর ছিল, দু'চার ঘর প্রজা ছিল—গাঁয়ের লোকে তাঁহাকে খুব মানিয়া চলিত। তাঁহার দুই পুত্র নবীনমাধব ও বিন্দু মাধব। নবীনমাধব সুশিক্ষিত তেজস্বী যুবক। তিনি নীলকর সাহেবের অত্যাচার হইতে গ্রামবাসী চাষীদের বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি রায়তদের দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দিতেন, উকিল মোক্তারদের শলা পরামর্শ দিতেন, অনেক সময় তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনে হাকিমের রায় ফিরিয়া যাইত। তাঁহার চেষ্টাতেই নীলকর সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ানের দুই বৎসর কয়েদ হয়। ইহার ফলে নবীনমাধবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়—তাঁহাকে বাধ্য করা হয় ৫০ বিঘা জমিতে নীলচাষের জন্য, তাঁহার পুকুরের চারিপাশে নীলের জন্য চাষ দেওয়া হয়। প্রাপ্য টাকা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হয়। ইহাতেও নীলকর সাহেবের রাগ পড়িল না। দেওয়ান গোপীচাঁদের পরামর্শে উক্ত গোলোক বসুর নামে মিথ্যা মোকদ্দমা বাধাইল। গোলক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য সাহেব তোরাব ও অন্যান্য ৩৪ জন রায়তকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা গ্রামের এই মহাপুরুষের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চায় না—সেইজন্য ইহাদের কুঠির গুদামঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইল। তারপর অতিরিক্ত প্রহারের দ্বারা ইহাদের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অঙ্গীকার আদায় করা হইল। এদিকে নবীন মাধব পিতার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য বড়ই বিপন্ন। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই। তাঁহার পত্নী সৈরিন্ধ্রী মোকদ্দমা চালানোর জন্য গায়ের গহনা খুলিয়া দিতে চাহিল—নবীন মাধব তাহা লইতে স্বীকৃত নহেন। তিনি কোনপ্রকারে টাকার যোগাড় করিয়া মোকদ্দমা চালানোর জন্য ইন্দ্রাবাদে আসিয়া ভ্রাতা বিন্দুমাধবের বাসায় উঠিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়াও নবীন পিতাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট উড সাহেবের পরম বন্ধু, কাজেই সুবিচার হইল না। গোলোক বসুর জেল হইল। গোলোক বাবু জেলে তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনে গলায় কাপড়ের ফাঁস বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

নবীন মাধব শ্রাদ্ধশান্তির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় শুনিলেন—তাঁহার বাটী সংলগ্ন পুকুরের পাড়ে নীলকর নীল বুনিবে। একথা শুনিয়া নবীন ৫০ টাকা সেলামী লইয়া উড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। ঐ টাকা

নজর দিয়া নবীন অন্ততঃ একমাস প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব তাহাতে মর্ম্মান্তিক কটু কথা প্রয়োগ করিলেন। নবীন শোকে দুঃখে অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন, তিনি ক্রোধ সংযম করিতে না পারিয়া সাহেবের বুকে লাথি মারিলেন। সাহেব এক লাঠিয়ালের লাঠি কাড়িয়া লইয়া নবীনের মাথায় মারিল। তাহাতে নবীন সংজ্ঞাহীন হইয়া প'ড়িল। তোরাব নামে নবীনের একজন অনুগত রায়ত নবীনকে কোলে করিয়া বাড়ীতে আনিল—কিন্তু বাঁচাইতে পারিল না। তোরাব উডের নাক কামড়াইয়া কাটিয়া লইয়া আনিয়াছিল। নবীন-মাধবের আর চৈতন্য হইল না। নবীনের মাতা সাবিত্রী উন্মাদিনী হইলেন। উন্মাদ অবস্থায় তিনি বিন্দুমাধবের পত্নী সরলাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন।

এইভাবে নীলকরদের অত্যাচারে বঙ্গদেশে কত পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

জীবনটা কি স্বপ্ন কেবল
নতুন ফসল ফলবে না—
হাজার বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে, চলবে না ?
চামেলী আর হাসনুহানা
আনবে মানা—
তার প্রেমে কি আজকে তুমি অমন তরো
সেই কি বড় ?
ডাগর মেয়ের হরিণ চোখে
হাজার লোকে
ভুলছে বলে
তুমিও কি অসাড় হ'য়ে পড়বে ঢলে',
জীবনটা কি এলোমেলো
এতই খেলো ?
থামলে পড়ে চল্‌বে না ;
তোমার কাছে অনেক আছে
কিছুই কি তার বলবে না ?

জমা-খরচ

শান্তশীল দাশ

মাটির পৃথিবী, মাটির মানুষ : কেহ শাশ্বত নয়,
তবু চুল-চেরা হিসেব নিকেশ—কত লাভ, কত ক্ষয় !
জমা-খরচের খাতাটা বন্ধু, তুলে রাখ এক পাশে,
নাও হাসিমুখে আপনার ঘরে, যখন যা' কিছু আসে।
এ-মাটির বুকে মরুপ্রান্তর আছে দুঃসহ জ্বালা,
তারই সাথে আছে শ্যামতৃণদল, কাননে কুসুমমালা।
ঝরা-কুসুমের দীর্ঘ নিশাস, মিথ্যা সে-নয় জানি,
ক্ষণিকের দান মধু-সৌরভ, সেও তো সত্য মানি।
মানুষের কাছে আঘাত পেয়েছি, দুঃসহ বেদনায়,
কপোল ভেসেছে নয়নের জলে, নিঃসীথ হতাশায়।
সব-পাওয়া মোর সফল হ'য়েছে এই মানুষের মাঝে,
মানুষের দান সংগীত হ'য়ে অন্তরে মোর বাজে।
কী-পেলাম আর কত হারালাম, হিসেব নিকেস করে,
মেলে না বন্ধু, এ জমা-খরচ সারাটি জীবন ধরে।
হয়েছে যা জমা তা' হতে খরচ হয়নিকো এক কণা,
খরচ যা হ'ল ফিরে সে পাবার মিছে শুধু জল্পনা।

অদৃশ্য সম্পদ

ষ্টিফান্ জুইগ ● অনুবাদঃ সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

[ষ্টিফান্ জুইগ ১৮৮১ সালে ভিয়েনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ইহুদী। জুইগ একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা, জীবনচরিত ইত্যাদি সকল বিষয়েই লিখতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ছোট গল্প লেখক হিসেবে এঁর খ্যাতি অধিক। ইনি বলেন—'স্বল্পতাই আমার মতে শিল্পের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু।' জুইগের ছোট গল্পের কলাকৌশল, আঙ্গিক, রূপকর্ম্ম, বাঁধুনি (Form) কিরূপ উচ্চাঙ্গের, তা বক্ষ্যমান কাহিনী পাঠ করলেই রসিক ব্যক্তি অনায়াসে উপলব্ধি করবেন। বাংলা অনুবাদে মূল ভাষার দূরত্ব থাকলেও সত্যিকার ভাবুকের পক্ষে রসভোগের আত্মীয়তা খুঁজে পেতে দেরী হবে না।" ১৯৪২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। অনুবাদক]

ড্রেস্‌ডেন্ ছাড়িয়ে প্রথম জংশন আসতেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের কামরায় ঢুকে সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে মুচকে একটু হাসলেন এবং পূর্ব্ব পরিচিতের মত আমার দিকে ফিরে বিশেষ ভাবে একটা ঘাড়নাড়া দিলেন। আমি থতমত খেয়ে যাওয়ায় তিনি আমায় তাঁর নামটা জানিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তিদেরই একজন। তিনি বার্লিনের অন্যতম খ্যাতনামা কলারসিক ও শিল্প-ব্যবসায়ী। যুদ্ধের আগে আমি বহুবার তাঁর কাছে স্বহস্তলিপি (অটোগ্রাফ) ও দুষ্প্রাপ্য বই কিনেছি। তিনি আমার পেছন দিকের খালি আসনটায় এসে বসলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য আমরা এমন সব বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা বললাম, যা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। তারপর, আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি যে জায়গা থেকে ফিরছেন. সেখানে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। বললেন, তাঁর সাইত্রিশ বৎসর শিল্প বিক্রয় ব্যবসার ইতিহাসে এটা সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভূমিকার এইটুকু বললেই যথেষ্ট। চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্রের জটিলতা পরিহার করতে আমি আমার কথায় কিছু না ব'লে তাঁর নিজের কথাতেই এই কাহিনী বিবৃত করব।

[তিনি বললেন] টাকার মূল্য যখন থেকে গ্যাসের মত হাওয়ায় মিশে যেতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই আমার ব্যবসার অবস্থা যে কিরকম দাঁড়িয়েছে তা আপনার অজানা নেই। যুদ্ধের মুনাফাখোরেরা নামকরা পুরানো ছবি (ম্যাডোনা প্রভৃতি), চার-পাঁচশ বছর আগেকার ছাপা বই, দেওয়ালে টাঙ্গাবার নক্সাকাটা প্রাচীন কাপড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা দুঃসাধ্য; তার ওপর আবার আমার মত লোক, যে নিজের আনন্দ ও উপভোগের জন্যে ভালো জিনিষগুলো আটকে রেখে দেওয়াই বেশী পছন্দ করে, নিজের বাড়ীখানাকে খালি করতে না দেওয়ার ব্যাপারে সে হবে একদম অনমনীয়। কারণ যদি একবার এদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে এরা আমার কামিজের হাতার বোতামগুলো এবং লেখবার টেবিলের বাতিটা পর্য্যন্ত কিনে নেবে। বিক্রীর উপযোগী 'পণ্য' সংগ্রহ করা ক্রমশই কষ্টকর হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে 'পণ্য' কথাটিতে হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন, তাই আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। কারণ কথাটি আমি নতুন ধরণের ঐ খরিদ্দারদের কাছেই শিখেছি। অন্যায় আদান-প্রদান…। একজন অসভ্য লোক যেমন কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ওভারকোটের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আমিও তেমনি চিরাচরিত অভ্যাসের বশে ভেনিসের আদিযুগের কোনও প্রেস থেকে মুদ্রিত একটি অমূল্য বইকে দেখে থাকি এবং কয়েক হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোটের আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির চেয়ে গার্দিনো অঙ্কিত একটি রেখাচিত্র আমাকে অধিক সম্মানের উপযুক্ত কোনও প্রেরণা সঞ্চারিত করতে পারে না।

এইসব লোকের পক্ষে টাকা পোড়ানির লোভ দমন করা অসম্ভব। সেদিন রাত্রে আমি যখন দোকানের চারি পাশে তাকালাম, তখন মনে হ'ল সত্যকার দামী জিনিষ এত অল্প অবশিষ্ট আছে যে, এবার এর বাইরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল। পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে এমন সুন্দর একটা ব্যবসা আমার হাতে এসে প'ড়েছে; কিন্তু ১৯১৪ সালের আগে অবধি দোকানে বাজে মাল এত জমেছিল যে, একটা রাস্তার ফিরিওয়ালাও ঠেলা গাড়ী নিয়ে এইসব জিনিষ ফিরি করতে লজ্জাবোধ করত।

এই উভয় সঙ্কট অবস্থায়, দোকানের পুরানো খতিয়ান-বইয়ের পাতাগুলো উল্টে দেখার কথা আমার মনে পড়ল। হয় তো পুরানো খরিদ্দারদের কাছে গেলে দেখা যাবে যে স্বচ্ছলতার দিনে তারা যা কিনেছিল আজ তাই বিক্রী করতে ইচ্ছুক। একথা সত্যি, এই রকম বহুদিন পূর্ব্বের খরিদ্দারের তালিকার সঙ্গে সৈন্য-দলের মৃতদেহে পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের সাদৃশ্যই অধিক: প্রকৃত পক্ষে আমি শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে, যারা সুদিনের সময় দোকান থেকে জিনিষ কিনেছে তাদের অধিকাংশই হয় মৃত অথবা তাদের অবস্থা এমন দরিদ্র্য-পূর্ণ যে সম্ভবত: তাদের কাছে যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিল তার সবই বিক্রী করে দিয়েছে। যাই হোক, আমি এমন একজন ভদ্রলোকের একতাড়া চিঠি খুঁজে পেলাম যিনি—যদি বেঁচে থাকেন, মনে হয় জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হবেন। কিন্তু তিনি এত দিনের পুরানো খরিদ্দার যে তাঁর কথা আমি ভুলেই গেছি, কারণ ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে বিরাট বিস্ফো-রণের পর তিনি আর কিছুই কেনেন নি। হাঁ, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। তাঁর প্রথম কয়েকটা চিঠির তারিখ অর্দ্ধশতাব্দীর অনেক আগেকার—যখন আমার পিতামহ ব্যবসার মালিক ছিলেন। সাঁইত্রিশ বছর আমি এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় কর্ম্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছিল বলে মনে করতে পারি না।

সমস্ত নির্দ্দেশ থেকে বোঝা গেল যে তিনি নিশ্চয়ই একজন সেকেলে খেয়ালী-প্রকৃতির মানুষ যাঁদের সামান্য কয়েকজনই জার্ম্মানীর কয়েকটি প্রাদেশিক শহরে টিকে আছেন। তাম্রফলকে ক্ষোদিত অক্ষরের ন্যায় তাঁর লেখা এবং অর্ডারের প্রত্যেকটি দফার নীচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া। যাতে ভুল না হয় সেজন্যে প্রত্যেকটির মূল্য কথায় এবং সংখ্যায় বসানো। এই সব বৈশিষ্ট্য, এবং বইয়ের দু'দিককার ছেঁড়া সাদা পাতা-গুলোকে চিঠির কাগজ হিসেবে ব্যবহার করা ও বাতিল হয়ে যাওয়া খামে পুরে পাঠানো, একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তির দারিদ্র্যেরই ইঙ্গিত করে। তাঁর স্বাক্ষরের নিম্নে সর্ব্বদা তাঁর অভিধা ও পদবী পুরোপুরি লেখা আছে: "অবসর প্রাপ্ত বন-পর্য্যবেক্ষক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা; অবসর প্রাপ্ত লেফটেনাণ্ট; প্রথম শ্রেণীর লৌহ-ক্রুশ-ধারক।" যেহেতু তিনি ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের একজন বহুদর্শী যোদ্ধা, অতএব মনে হয় তাঁর বয়স এখন আশীর কাছাকাছি হবে।

তাঁর সমস্ত কার্পণ্য ও খামখেয়ালীতা সত্ত্বেও মুদ্রিত চিত্রের এবং খোদাইয়ের সংগ্রাহক হিসেবে তিনি অদ্ভুত চাতুর্য্য, জ্ঞান ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অর্ডার-গুলি গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রথমে সেগুলি একুনে কম টাকার হলেও, যে যুগে একগাদা সুন্দর জার্ম্মান কাঠ খোদাই (উড-কাট্) কেনবার মত লোকের অভাব ছিল না, সেই যুগে এই গ্রাম্য ভদ্রলোক এমন কতকগুলি ধাতুফলকে অঙ্কিত ও সেই জাতীয় (এচিং) চিত্র সংগ্রহ করেছেন যা যুদ্ধের মুনাফাখোরদের বহু ঢক্কানিনাদিত সংগ্রহকেও পরাস্ত করে। তার মধ্যে কয়েকটি ছবি যা তিনি বহু বছর ধরে নামমাত্র মূল্যে আমাদের কাছ থেকে কিনেছিলেন—তার মূল্য আজ অনেক টাকা; এবং তিনি যে অন্য জায়গাতেও এই রকম দাঁওয়ে জিনিষ কেনেন নি—তা মনে করার কোন কারণই নেই। তাঁর সংগ্রহ কি ছড়িয়ে পড়েছে? তাঁর খরিদের শেষ দিনটি থেকে শিল্প ব্যবসার খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমি এত বেশী ওয়াকিবহাল যে এমন একটা সংগ্রহ পুরোপুরি হস্তান্তরিত হয়ে যাবে এবং আমি ঘুনাক্ষরেও জানতে পারব না, তা কখনই বিশ্বাস হয় না। তিনি যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সমস্ত সম্পদ

সম্ভবত: তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীদের কাছে অক্ষত অবস্থায় রাখা আছে।

ব্যাপারটা এমনই মজার লাগল যে পরদিন (গতকাল বৈকালে) আমি স্যাক্সনীর অন্তর্গত একটা অল্প জনবসতি-পূর্ণ শহরের দিকে যাত্রা করলাম। ছোট্ট রেল ষ্টেশনটা ছাড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে যখন এগিয়ে চলেছি, সেই সময় মনে হল যে এই রকম একটা নগণ্য বাড়ীতে—যে বাড়ীর আসবাব-পত্রের সঙ্গে আপনি নিঃসন্দেহে পরিচিত—অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির কাছে যে রেমব্রান্তের অপূর্ব্ব এচিংয়ের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, তার সঙ্গে ডুরারের কাঠ খোদাই এবং মন্টিগ্‌নাসের সমুদয় চিত্র থাকতে পারে, তা ভাবা অসম্ভব। যাই হোক, আমি তাঁর খোঁজ নিতে পোষ্ট আফিসে গেলাম এবং একজন বন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যে জীবিত আছে—তা জানতে পেরে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। কোন্ দিকে গেলে তাঁর বাড়ীর হদিস পাওয়া যাবে, তা তারা বলে দিল এবং আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, যে সময় আমি সেদিকে অগ্রসর হলাম সেই সময় আমার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দ্রুততর হতে থাকল। তখনও দুপুরের অনেক বাকী।

যে শিল্পরসিকের খোঁজ করছি তিনি গতশতাব্দীর ষষ্ঠদশকে নির্ম্মিত সস্তার একটি আলগা বাড়ীর তেতালায় বাস করেন। দোতালা একজন দরজীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর একতালায় বাঁদিকে স্থানীয় ডাকঘরের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামের ফলক রয়েছে, আর ডানদিকের দরজায় পোর্সিলিন ফলকে আমার জিজ্ঞাসিত নামটি বর্ত্তমান। তাঁকে আমি আবিষ্কার করে মর্ত্ত্যে টেনে আনলাম। ঘন্টি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কালো ফিতার টুপী পরা ললিতকেশা এক বৃদ্ধা রমণী বার হয়ে এলেন। আমার পরিচয় পত্রটা তাঁর হাতে দিয়ে কর্ত্তা বাড়ী আছেন কি না জিজ্ঞাসা করলাম। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি একবার আমার দিকে ও পরিচয় পত্রটার দিকে এবং তারপর আর একবার আমার দিকে তাকালেন। ভগবান বর্জ্জিত এই ছোট্ট শহরে রাজধানীর একজন অধিবাসীর আগমন একটা উত্তেজক ঘটনা। যাই হোক, যতটা মৈত্রীর সুর তাঁর দ্বারা সম্ভব, তাই নিয়ে তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে দু'এক মিনিট দালানে অপেক্ষা করতে বললেন এবং একটা দেউড়ীর ভেতর দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। প্রথমে আমি একটা ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনলাম, তারপর উচ্চ উল্লসিত কণ্ঠে একজন বললেন: 'বের্লিন থেকে বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রব্যবসায়ী হের র‍্যাক্‌নার এসেছেন বলছ? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি নিশ্চয়ই খুব খুসী হব।" তারপর বৃদ্ধা রমণী পুনরায় দেখা দিয়ে আমাকে ভেতরে যেতে আহ্বান জানালেন।

ওভার কোটটা খুলে ফেলে আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। অনাড়ম্বর আসবাবে পূর্ণ ঘরের মাঝখানে একজন লোক আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ হলেও তিনি সবল, তাঁর গোঁফ ঝোপের মত ঘন এবং তিনি অর্দ্ধসামরিক কায়দায় আঁটজামা পরে আছেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। যদিও তাঁর হাবভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং আদৌ বলপূর্ব্বক নয়, তবু তাঁর বহিরঙ্গের কঠিন্যের সঙ্গে এটার অদ্ভুত অসামঞ্জস্য আছে। তিনি আমার দিকে কথা বলতে এগিয়ে এলেন না, বাধ্য হয়ে (না বলে পারছিনা—এতে আমার একটু রাগও হল) আমি নিজেই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত দিলাম। এই সময় লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর হাতও আমার হাতের খোঁজ করছেনা বরং তা আমারই ধরার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। অবশেষে গলদটা কোথায় তা বুঝতে পারলাম। তিনি দৃষ্টিহীন।

ছেলেবেলা থেকেই অন্ধের সঙ্গ আমার কাছে অস্বস্তিকর বোধ হয়। এমন কোন লোক যে ভালভাবেই বেঁচে আছে অথচ পরিপূর্ণভাবে সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারেনা, তাকে দেখলে আমি বিব্রত হই এবং হতবুদ্ধি হয়ে লজ্জা অনুভব করি।

তাঁর শাদা ঝাড়ালো ভ্রূযুগলের নীচে স্থির এবং দৃষ্টিহীন চক্ষুগোলকের দিকে তাকানমাত্রই আমার মনে হল—আমি যেন একটা অন্যায় সুবিধা নিচ্ছি এবং আমি যেন এই ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম। অন্ধ লোকটি কিন্তু এই অস্বস্তির কথা নিয়ে সময় কাটাবার মত

অবসর দিলেন না। দুর্দ্দান্ত আনন্দে হেসে উঠে তিনি সজোরে বললেন, "বাস্তবিকই আজ একটা শুভদিন। আপনার মত বের্লিনের একজন বড়লোকের এখানে শুভাগমন একটা অলৌকিক কাণ্ড বলে বোধ হচ্ছে। আপনার মত ব্যবসায়ী ব্যক্তি যখন অভিযানে আসেন তখন আমাদের মত গ্রামের লোকদের সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের এই অঞ্চলে একটা কথার চলন আছে: চারদিক থেকে বেদের প্রাদুর্ভাব হলে দরজা বন্ধ করে রাখ এবং জামার পকেটে বোতাম লাগিয়ে দাও।—আপনি কেন এসেছেন তা অনুমান করতে পারি। আমি শুনেছি যে ব্যবসায় আর লাভ হয় না। খরিদ্দার নেই কিম্বা যা আছে তা খুব অল্প। সুতরাং পুরানো খরিদ্দারের খোঁজ চলেছে। আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনাকে শুধু হাতেই ফিরে যেতে হবে। আমাদের মত পেনসন-ভোগীদের খাবার উপযোগী শুকনো রুটি দেখলেই যথেষ্ট আনন্দ। একসময় আমি অনেক কিছু সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এখন আর ক্ষমতা নেই। আমার কেনার দিন শেষ হয়ে গেছে।"

আমি তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলাম যে, তিনি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েছেন এবং আমি কোনও জিনিষ বিক্রীর মতলব নিয়ে আসিনি। তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়ায় তাঁর মত জর্ম্মানীর একজন বিখ্যাত সংগ্রাহক ও আমাদের অনেক কালের খরিদ্দারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা গেল না। কথাটি আমার মুখ থেকে বার হবার আগেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখাবয়বে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এতক্ষণ তিনি শক্ত হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার তাঁর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এবং সমস্ত দেহ গর্ব্বে ভরে গেল। তিনি যেদিকে তাঁর স্ত্রী আছেন বুঝতে পারলেন সেই দিকে ফিরলেন এবং ঘাড় নেড়ে যেন বললেন—'ওগো শুনলে?' তারপরে পুনরায় আমার দিকে ফিরে তিনি পূর্ব্বব্যবহৃত রুক্ষ সামরিক কর্ম্মচারীর কণ্ঠস্বর ত্যাগ করে শান্তভাবে এমন কি মৃদুস্বরে বললেন:

"কি সুন্দর লোক আপনি···আপনার আগমন যদি আমার মত একজন বৃদ্ধের কাছে ব্যক্তিগত আলাপ ভিন্ন আর কিছুতে পরিণত না হত, তাহলে আমি আরও দুঃখিত হতাম। যাই হোক, আমার এমন কতকগুলো ছবি আছে যা দেখা আপনার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি বের্লিনে ভেনিসের আলবার্টিনায় কিম্বা লুভারেও (প্যারীর ওপর ভগবানের অভিসম্পাত পড়ুক) যা দেখবেন, তার চেয়েও যে মানুষ পঞ্চাশ বছর আপনার রুচি অনুযায়ী পরিশ্রম সহকারে ছবি সংগ্রহ করে আসছে, তার কাছে এমন সামগ্রী আছে—যা প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই দেখতে পাওয়া যাবে না। লিস্ বেথ আমার আলমারীর চাবিটা দাওতো একবার।"

এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ স্মিত হাসি হাসতে হাসতে কথাগুলো শুনেছিলেন, এবার তিনি চমকে উঠলেন। তিনি তাঁর হাত দুটো আমার দিকে তুললেন, অনুনয়ে জোড়-কর করলেন এবং মাথাটা নাড়লেন। এই ইঙ্গিতের অর্থ কি তা বুঝতে পারলাম না। তারপর তিনি স্বামীর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, "ফ্রাঞ্জ, তুমি আমাদের এই অভ্যাগত বন্ধুটিকে অন্য একসময় আসবার কথা বলতে ভুলে গেছ। যতই হোক এখন আমাদের মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়ে এসেছে।" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে গেলেন, "দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে অপ্রত্যাশিত অতিথিকে আপ্যায়িত করার মত যথেষ্ট খাবার আমাদের নেই। আপনি নিশ্চয়ই হোটেলে আহার করবেন। অনুগ্রহ ক'রে যদি পরে এসে এক কাপ কফি পান করেন, তা হলে আমার কন্যা আনা মারিয়া তখন উপস্থিত থেকে দেখা শোনা করতে পারে, কেননা ছবি সম্বন্ধে সে আমার চেয়ে বেশী পরিচিত।"

আর একবার তিনি সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তিনি যে আমাকে তৎক্ষণাৎ ছবির সংগ্রহ দেখার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে বলছেন, তা পরিষ্কার বুঝলাম। আমার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সঙ্কেত মত আমি বললাম যে প্রকৃতপক্ষে আমি 'সুবর্ণ মৃগ' হোটেলে আহারের বন্দোবস্ত করে রেখেছি, তবে তিনটের সময় সানন্দে ফিরে এসে হের ক্রণফেল্ডের পছন্দমত ছবিগুলি

দেখার যথেষ্ট সময় পাব। কারণ ছ'টার আগে আমি তো ফিরে যাচ্ছি না।

প্রিয় খেলনা থেকে বঞ্চিত শিশুর মত সেই প্রবীণ ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ হলেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত গম্ভীর গর্জ্জনে বলতে থাকলেন, "আমি ভাল রকমই জানি যে আপনাদের মত বের্লিনের পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে সময়ের মূল্য খুব বেশী। তবু বলব যে আমার সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক কাটালে আপনার ভাল বই মন্দ লাগবে না। আপনাকে আমি মাত্র দু'তিনটি ছবি দেখাব না, আমি দেখাব সাতাশটি বাক্সর সংগ্রহ, এক একটি এক একজন নামকরা শিল্পীর, আর প্রত্যেকটাই পুরোপুরি ঠাসা। যাই হোক, আপনি যদি ঠিক তিনটের সময় আসেন, তাহলে ভরসা রাখি যে, ছ'টার মধ্যে শেষ করতে পারব।"

তাঁর স্ত্রী আমাকে বাইরে আসার পথ দেখিয়ে দিলেন। দালানের প্রবেশ পথে, সদর দরজা খোলবার আগে তিনি অতি মৃদু স্বরে বললেন: "আপনি ফিরে আসার আগে আনামারিয়া যদি আপনার সঙ্গে দেখা করে তা'হলে আপনি কি কিছু মনে করবেন? আমি এখনই আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, তবে নানা কারণে সেটা করলেই ভাল হয়।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ খুব আনন্দের কথা। সত্যিই আমাকে একা একাই খেতে হচ্ছে, আপনার কন্যা তো আপনাদের আহার শেষ হলেই সোজা চলে আসতে পারেন।"

এক ঘণ্টা পরে আহার শেষ করে আমি যখন 'স্বর্ণ মৃগের' বৈঠকখানায় বিশ্রাম করছি, সেই সময় আনা-মারিয়া ক্রণফেল্ড এসে উপস্থিত হল। একজন বয়স্কা কুমারী, শীর্ণদেহা ও সলজ্জা, পরণের পোষাক অত্যন্ত সাদাসিধা, মনে হল আমার কথা ভেবে যেন সে মুষড়ে পড়েছে। আমি তার অস্থিরতা দূর করতে যথেষ্ট চেষ্টা করলাম এবং যদিও আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় হতে এখনও অনেক বাকী, তবু তাকে জানালাম যে, যদি তার বাবা খুব অধৈর্য্য হয়ে থাকেন, তাহলে অবিলম্বে আমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। এই কথা শুনে সে লাল হয়ে গিয়ে আরও বেশী হতবুদ্ধি হল, তারপর বেরুবার আগে আমাকে গোটা কয়েক কথা বলবে বলে বাধবাধভাবে অনুরোধ করল। আমি জবাব দিলাম, "তাহলে দয়া করে বসুন, আমি সাগ্রহে আপনার কথা শুনছি।"

কি ভাবে যে আরম্ভ করবে তা সে সহজে বুঝতে পারল না। তার হাত এবং ঠোঁট দুটো কাঁপছে। অবশেষে সে বলল: "আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে আমরা একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করব। আপনি ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা আপনাকে তাঁর ছবির সংগ্রহ দেখাতে চাইবেন; আর সেই সংগ্রহ...সেই সংগ্রহ। বলতে কি, তার অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে।"

সে হাঁপাতে থাকল, প্রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মত হল এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে চলল:

"আমি খোলাখুলি ভাবেই বলছি...আপনি জানেন যে কি রকম কষ্টের ভেতর দিয়ে আমরা দিন কাটাচ্ছি, আমার বিশ্বাস আপনিও তা বুঝতে পারছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার অল্প কয়েক দিন পরেই বাবা অন্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি আগে থেকেই ক্ষীণ হয়ে ছিল। বোধ হয় উত্তেজনাতেই এরকম হল। যদিও তাঁর বয়স সত্তরের ওপর, তবু অনেক দিন আগের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের কথা স্মরণ করে তিনি যুদ্ধে যেতে চাইলেন। স্বভাবতঃই তাঁর এ কাজের কোন প্রয়োজন ছিল না। তারপর আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ হলে তিনি এই ব্যাপারে মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পান এবং ডাক্তারের মতে এটাই নাকি তাঁর অন্ধত্ব আক্রমণকে ত্বরান্বিত করে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অন্য সব বিষয়ে তিনি এখনও বেশ সবল আছেন। ১৯১৪ সাল অবধি তিনি অনেক দূরেও বেড়াতে পারতেন এবং পাখী শিকারে যেতেন। দৃষ্টি হারানোর পর থেকে এই চিত্র সংগ্রহই হয়েছে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। প্রত্যেক দিন তিনি এগুলি দেখেন। 'দেখেন' বললাম বটে, কিন্তু দেখতে কিছুই পান না। প্রত্যহ বৈকালে বাক্সগুলি টেবিলের ওপর রাখেন এবং বহুবৎসরের অভ্যাসের ফলে পরিচিত ছবিগুলিতে একটির পর একটি আঙুল বুলিয়ে যান। আর কিছুতেই তাঁর মন ওঠেনা। তিনি আমাকে নীলামের বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়তে দেন। এদের মূল্য যতই বাড়ে তিনিও তত উৎসাহিত হন।"

"এই অবস্থার একটা ভয়াবহ দিকও আছে। বাবা মুদ্রাস্ফীতির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না; জানেন না যে আমাদের যৎপরোনাস্তি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; জানেন না যে তাঁর মাসিক পেন্‌সন্ থেকে আমাদের একদিনের খাবারও কুলায় না। তারপর আমাদের আরও কতকগুলি পোষ্য আছে। আমার ভগ্নীপতি ভার্দ্দুনে নিহত হন, তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে আছে। অর্থের এই টানাটানি অবস্থা বাবাকে জানান হয়নি। আমরা যতদুর সম্ভব খরচ কমিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তবুও সবকিছু মেটান সম্ভবপর হয়না। প্রথমে আমরা তাঁর প্রিয় সংগ্রহে হাত না দিয়ে জিনিষপত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রয় করতে আরম্ভ করি। বিক্রয় করার মত জিনিষ কমই ছিল, কেননা বাবা যা কিছু বাঁচিয়ে ছিলেন তাই দিয়ে কাঠখোদাই, তামার ফলকে খোদাই (উডকাট ও কপার প্লেট) এবং ঐ জাতীয় ছবি কিনে রেখেছেন। সংগ্রাহকের নেশা! অবশেষে এমন একটা সময় এল যখন হয় তাঁর সংগ্রহ বিক্রয় করতে হয় নইলে তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়। আমরা অনুমতি চাইলাম না। চাইলেই বা কি কাজে লাগত? তিনি ঘুনাক্ষরেও জানতেন না কি রকম কষ্টে কত মূল্য দিয়ে আমাদের খাবার জোগাড় করতে হয়। এমন কি তিনি একথাও শোনেন নি যে জার্ম্মানী যুদ্ধে হেরে গিয়ে আল্‌সেস্ লোরা সমর্পণ করেছে। খবরের কাগজ থেকে আমরা তাঁকে এই ধরণের খবর পড়ে শোনাই না।

"প্রথমেই যে ছবিটি বিক্রয় করলাম সেটি খুব মূল্যবান, রেমব্রান্তের এচিং এবং ক্রেতা আমাদের অনেক দাম দিলেন—কয়েক হাজার টাকা। ভাবলাম এই টাকায় আমাদের অনেক বছর চলে যাবে। কিন্তু ১৯২২।২৩ সালে টাকা কি রকম ভাবে গলে গেছে তা আপনি জানেন। আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ কেনার পর বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলাম। দু'-মাসেই সেই টাকা উবে গেল। আমাদের তখন আর একটা খোদাই বিক্রয় করতে হল এং তারপর একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে চলল। এই ঘটনা মুদ্রাস্ফীতির চরম দুর্দ্দিনের সময়ই ঘটে এবং প্রত্যেকবার ক্রেতা এত দেরীতে টাকা দিতে থাকল যে তার অঙ্গীকৃত মূল্যের তুলনায় আমাদের পাওনা দশভাগের একভাগে কিম্বা শতভাগের একভাগে দাঁড়াল। আমরা নীলামের দোকানে গেলাম। যদিও লাখ টাকারও বেশী ডাক উঠল, তবু আমরা ঠকে গেলাম। লক্ষ বা কোটি টাকার নোট হাতে পাবার সময় বাজে কাগজের সমান হয়ে গেল। দিনের রুটি যোগাতে সংগ্রহ সব ফুরিয়ে গিয়ে এখন সামান্যই বাকী আছে।

"এই কারণেই আপনি যখন আজ আমাদের বাড়ীতে এলেন, মা তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বাক্স খোলায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এই ধর্ম্মের বড় প্রতারণাটা ধরা পড়ে যাবে। তিনি স্পর্শমাত্রই এর প্রত্যেকটি দফা বুঝতে পারেন। আপনাকে বলে রাখি যে তিনি যাতে এগুলি নাড়াচাড়া করার সময় কিছু প্রভেদ বুঝতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা চিত্র সরিয়ে ফেলার পর সমান মাপের এবং সমান পুরু সাদা কার্টিজ কাগজ লাগিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। একের পর এক হয়ত বুলাতে বুলাতে এবং গুণতে গুণতে তিনি প্রায় তাদের সত্যি করে দেখার আনন্দ উপভোগ করেন। ছবিগুলি তিনি এখানকার কাউকে দেখাতে চান না, বলেন এখানে কোনও সমঝদার রসিক এবং দেখবার উপযুক্ত লোক নেই; কিন্তু এর প্রত্যেকটি তিনি এত বেশী ভালবাসেন যে আমার মনে হয়—তিনি যদি কোনও রকমে টের পান যে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাহলে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে! শেষবারের মত তিনি এগুলি যাঁকে দেখিয়েছেন, অনেককাল আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছিলেন ড্রেসডেনের তাম্রফলকে-খোদাই-চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক।

"আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি,—" তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়ল— "যে-সম্পদ তিনি আপনার সামনে খুলে ধরবেন তার সবই দেখার জন্যে মজুত আছে, তাঁর এই ভ্রম ভেঙ্গে দেবেন না এবং তাঁর বিশ্বাসে আঘাত হানবেন না। এগুলি নেই জানতে পারলে তিনি আর বাঁচবেন না। আমরা হয়তো তাঁর প্রতি অন্যায় করেছি, কি এ ছাড়া উপায়ই বা ছিল কি? আমাদেরও তো বাঁচতে হবে। পুরাণো ছবির চেয়ে অনাথ শিশুদের জীবন অধিক মূল্যবান। তা ছাড়া ইদানীং প্রত্যহ

বৈকালে তিনঘণ্টা ধরে এই কাল্পনিক সংগ্রহের প্রত্যেকটি নিদর্শনের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলাই তাঁর জীবনের পরম সুখ। দৃষ্টি হারাবার পর বোধ হয় আজকের দিনটিই হবে তাঁর সব চেয়ে রমণীয় অভিজ্ঞতা। একজন বিশেষজ্ঞকে তাঁর সমস্ত সম্পদ দেখাবার সুযোগের জন্যে তিনি কতদিন থেকে আশা করে রয়েছেন! আপনি যদি দয়া করে এই বিশ্বাসঘাতকতায় রাজী না হন — —

এই আবেদন যে কত করুণ আমি তা আমার উত্তাপহীন আবৃত্তিতে আপনাদের বোঝাতে পারবনা। আমার ব্যবসাজীবনে আমি অনেক জঘন্য আদান-প্রদান দেখেছি। মুদ্রাস্ফীতিতে ধ্বংস হয়ে গিয়ে মানুষ একটুকরো রুটির বিনিময়ে তাদের পুরুষানুক্রম-লব্ধ প্রিয় বস্তুটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে দেখে তাকেও উপেক্ষা করেছি। তবু আমার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মম হয়ে যায় নি। তাই এই ঘটনা তাড়াতাড়ি আমার মনকে স্পর্শ করল। বলাবাহুল্য যে, আমি অভিনয় করতে সম্মত হলাম।

আমরা দু'জনে তাদের বাড়ীতে গেলাম। পথে যেতে যেতে আমার শুনে দুঃখ হল (যদিও আমি বিস্মিত হই নি) যে কি অসম্ভব অল্প দামে এই সরলা ও সদয় হৃদয়া রমণী ছবিগুলি বিক্রয় করে দিয়েছে—তার বেশীর ভাগ অসাধারণ মূল্যবান্ এবং কতকগুলি অতুলনীয়। এই থেকেই মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে আমার সাধ্যানুযায়ী ওদের সকল প্রকার সাহায্য করব। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমরা একটা উৎফুল্ল চিত্তের উচ্ছ্বাস শুনতে পেলাম: 'এই যে আসুন! আসুন!' অন্ধের তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি সাগ্রহে অপেক্ষমান পদক্ষেপ চিনতে পেরেছেন।

বৃদ্ধা রমণী আমাদের ভিতরে নিয়ে যাবার সময় একটু হেসে বললেন: "সাধারণতঃ ফ্রাঞ্জ মধ্যাহ্ন আহারের পর খানিকক্ষণ দিবানিদ্রা দেয়, কিন্তু আজ উত্তেজনায় একদম ঘুমোতে পারে নি।" মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বুঝে নিলেন সব ঠিক আছে। ছবির বাক্সগুলি টেবিলের ওপর গাদা করে রাখা হয়েছে। অন্ধ সংগ্রাহক আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আগে থাকতেই আমার জন্যে রাখা একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। "আসুন, আমরা এখনই সুরু করি। অনেক কিছু দেখবার আছে, হাতে সময়ও অল্প। প্রথম বাক্সয় আছে ডুরারের ছবি। প্রায় সম্পূর্ণ সংগ্রহ, আপনি দেখুন যে এর প্রত্যেকটি চিত্র অপরগুলির চেয়ে নিখুঁত। অপূর্ব্ব নিদর্শন। আপনি নিজেই এর বিচার করুন।'

কথা বলতে বলতে তিনি বাক্সটা খুললেন, বললেন, "আমরা অবশ্য এ্যাপফেলিপ্‌স পর্য্যায়ের ছবি থেকেই আরম্ভ করব।" তারপর শান্তভাবে ও সাবধানে (যেমন করে কেউ সহজে ভঙ্গুর ও বহুমূল্য জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করে) তিনি সাদা কাগজের প্রথম তা-টি তুলে ধরলেন এবং সপ্রশংস ভাবে সেখানি আমার চক্ষুষ্মান দৃষ্টি ও তাঁর অন্ধ চক্ষুর সামনে রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি এত আগ্রহ ভরা যে, সহজে বিশ্বাস করতে পারলাম না, তিনি অন্ধ। এটা যে সত্যি নয় তা আমার জানা থাকলেও, সেই কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে যে একটা স্বীকৃতির আভাষ আছে তা সন্দেহ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

—"এর চেয়ে নিখুঁত ছবি আপনি আর কখনও দেখেছেন? দেখুন এর রেখাগুলো কি রকম উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি বর্ণনা স্ফটিকস্বচ্ছ। আমি ড্রেসডেনের একটা ছবির সঙ্গে আমার ছবির তুলনা করেছিলাম। সেটা ভালো বটে, কিন্তু এই যে নমুনা দেখছেন, এর তুলনায় সেটা একেবারে খেলো। তা ছাড়া আমার কাছে এর বংশানুক্রমিক সমস্ত সংগ্রহই আছে।" তিনি কাগজটি উল্টিয়ে পেছন দিকে এমন স্থির বিশ্বাসে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন যে, অনিচ্ছা সত্বেও সেই অস্তিত্বহীন লিপিগুলি পড়বার ভান করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

"নাগলার সংগ্রহের অনুসরণে রেমী এবং ইস্‌ডেলের ছবির মুদ্রন। আমার খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষদের কেউ কখনও ভাবতেই পারতেন না যে তাঁদের সম্পদ এই ছোট্ট ঘরে এসে অবস্থান করবে।"

নিঃসন্দিগ্ধ উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিটি যখন সেই সাদা কাগজের তা-টি ওপরে তুলে ধরলেন, তখন আমি থর থর করে কেঁপে উঠলাম, তিনি যখন বহুকাল পূর্ব্বে মৃত সংগ্রাহকগণ প্রদত্ত অতিপরিচিত একটি ছাপের ওপর

যথাস্থানে হাতের আঙুলের একটি নখ রাখলেন, তখন আমার গায়ের চামড়া ভয়ে শিউরে উঠল। এটা এত ভয়াবহ মনে হল যে, তিনি যে সমস্ত লোকের নাম করলেন তাঁদের বিদেহী আত্মা পর্য্যন্ত যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। যে পর্য্যন্ত না আমি ক্রনফেল্ডের স্ত্রী ও তাঁর কন্যার বিহ্বল মুখাবয়ব দেখতে পেলাম, ততক্ষণ আমার রসনা টাকরায় আটকে রইল। তারপর আমি নিজেকে সামলে নিলাম এবং আমার অভিনয় আরম্ভ করলাম। আন্তরিকতার সুর টেনে নিয়ে আমি সজোরে বলিলাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ছবিটি অনবদ্য।"

বিজয়গর্ব্বে তাঁর দেহ স্ফীত হয়ে উঠল।

"কিন্তু এটা কিছুই নয়", তিনি বলে গেলেন। "এই দেখুন 'বিষাদ' এবং 'প্রেম'-এর উজ্জ্বল চিত্র। শেষেরটি অবিসম্বাদিত ভাবে অতুলনীয়। বর্ণের কি নবত্ব। এ সব দেখলে আপনার বের্লিনের সহকর্ম্মীরা এবং সাধারণ চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়কেরা হিংসায় সবুজ হয়ে যাবেন।"

এর বিশদ বর্ণনায় আমি আপনাদের বিরক্ত করব না। এই ভাবে একটার পর একটা বাক্স পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুঁজতে খুঁজতে দু'ঘণ্টারও অধিক সময় কেটে গেল। এই দু'তিনশ সাদা কাগজ নেড়েচেড়ে দেখা একটা বিরক্তিকর কাজ। তা ছাড়া, অন্ধসংগ্রাহকের পক্ষে যেগুলি বাস্তবের ন্যায় অভ্রান্ত, যথাসময়ে তার গুণাবলীর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হওয়ায় তাঁর বিশ্বাস বারম্বার আমার মধ্যেও (এখানেই আমার মুক্তি) একটা বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে দিল।

একবার কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে এল। তিনি আমাকে রেমব্রাণ্টের একটা উচ্চাঙ্গের 'এণ্টিওপ' (antiope), দেখাচ্ছিলেন, যার মূল্য অপরিমেয় এবং নিঃসন্দেহে যেটা একটা গানের বদলে বিক্রী করা হ'য়েছে। পুনরায় তিনি এই চিত্রের ঔজ্জ্বল্য বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলেন, কিন্তু স্নায়ুতোভাবে এই ছবির ওপর আঙুল চালনা করার সময় তাঁর অনুভূতিসম্পন্ন আঙুলের অগ্রভাগে কি একটা পরিচিত খাঁদকে হারিয়েছে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভ্রূগুল মেঘাবৃত আকার ধারণ করল, ঠোঁট কাঁপতে থাকল এবং তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এটাই সেই এণ্টিওপ? আমি ছাড়া আর কেউ তো কাঠখোদাই বা ধাতু ফলকে নির্ম্মিত চিত্র স্পর্শ করে না। কি করে তবে এটা অন্য জায়গায় যাবে?"

তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে ছবিটা টেনে নিয়ে আমার স্মৃতি থেকে এর সাদা পটভূমির উপর বিভিন্ন বর্ণনা ও বৈচিত্র্য আরোপ করে আমি বললাম—"এটাই তো আপনার এণ্টিওপ, হের-ক্রণফেল্ড।"

তাঁর হতবুদ্ধিতা কেটে গেল। আমি যতই প্রশংসা করতে থাকলাম তিনি ততই উৎফুল্ল হলেন এবং অবশেষে আনন্দে গদগদ হয়ে তিনি রমণী দু'জনকে বললেন:

"এই একজন লোক যিনি সত্যিকারের সমঝদার। এই 'সংগ্রহে' অর্থব্যয় করার জন্য তোমরা আমায় অনেক গঞ্জনা দিয়েছ! একথা সত্যি যে গত পঞ্চাশ বছরেরও অধিক আমি নিজেকে বিয়ার, মদ, তামাক, ভ্রমণ, থিয়েটার দেখা, বই কেনা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে যা কিছু জমান সম্ভব তার সবটাই তোমাদের এই অবজ্ঞার বস্তুতে খরচ করেছি। কিন্তু দেখ হের র‍্যাকনার আমার দেওয়া রায়কেই সমর্থন করেন। আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা শহরের যে কোনও লোকের চেয়ে বড়লোক হবে, ড্রেসডেনের সর্ব্বাপেক্ষা ধনীদের সমান, আর তখন তোমরা আমার এই বাতিকের জন্য অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন এই সংগ্রহের একটাও সরাতে পারবেনা। আমাকে কবরস্থ করার পর এই রসিক ব্যক্তিটি অথবা অন্য কেউ তোমাদের বিক্রী করতে সহায়তা করবেন। বিক্রী তোমাদের করতেই হবে, কেননা আমি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পেন্সনও বন্ধ হয়ে যাবে।"

কথা বলতে বলতে তাঁর আঙুলগুলি অপহৃত-চিত্রের বাক্সগুলি সাদরে নাড়তে থাকল। এই দৃশ্য যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। বহুকাল যাবৎ, ১৯১৪ সালের পর থেকে আমি কোন জার্ম্মাণের মুখে এমন অবিমিশ্র সুখের অভিব্যক্তি দেখিনি। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা অশ্রুরুদ্ধ নয়নে ও উল্লসিত মনে তাঁকে লক্ষ্য করল, ঠিক যেন সেই পুরাকালের নারী যারা, ভয়বিহ্বল অথচ উৎফুল্ল ভাবে

জেরুজালেম্ প্রাকারের বাইরে উদ্যানে পাথরকে গড়িয়ে সরে যেতে এবং সমাধিস্থল শূন্য হয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু আমার যথেষ্ট সমাদর ভদ্রলোকের প্রয়োজন হলনা। যে পর্য্যন্ত না আমি পরিশ্রান্ত হয়ে দেখলাম যে মিথ্যা আঁকা ছবিগুলি তাদের খাপে পুরে টেবিলে কপি দেবার মত জায়গা খালি করে দেওয়া হয়েছে, ততক্ষণ তিনি এক বাক্স থেকে আর এক বাক্সয় এক ছবি থেকে আর এক ছবিতে ঘুরে বেড়ালেন। আমার অতিথিসেবক ক্লান্ত হওয়া দূরে থাক, নতুন যৌবনের উদ্দীপনা লাভ করেছেন বলে মনে হল। কি প্রকারে এই বহুল সম্পদ লাভ করেছেন তা গল্পের, পর গল্প ব'লে বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গতঃ প্রত্যেকটি ভালো ছবি আর একবার দেখাতে চাইলেন। আর বেশী দেরী করিয়ে দিলে আমি গাড়ী ধরতে পারবনা—এই কথা ব'লে যখন আমি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁকে বারণ করলাম, তিনি তখন বিরক্তি প্রকাশ করলেন···অবশেষে তিনি আমার যাওয়াতে সম্মত হলেন এবং আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলাম। তাঁর স্বর শান্ত হল; আমার হাত দুটো তিনি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন এবং অন্ধের বিচক্ষণ সমাদরে নাড়তে থাকলেন।

কম্পিত স্বরে বললেন: "আপনার আগমনে অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছি। এতদিন পরে একজন যোগ্য সমঝদারকে আমার ছবিগুলি দেখাতে পারায় যে কি আনন্দ বোধ করছি! অন্ধবৃদ্ধের কাছে আপনার আগমনকে সার্থক করে তুলতে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমি কিছু করতে চাই। আমার উইলের একটা ক্রোড়-পত্রে এই সর্ত্ত থাকবে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান, যার সততা সর্ব্বজনবিদিত, আমার ছবির নীলামের ভার গ্রহণ করবে।'

তিনি সাদরে তাঁর একটা হাত মূল্যহীন বাক্সর গাদার ওপর রাখলেন।

"আমার কাছে অঙ্গীকার করুন যে এগুলি দিয়ে একটা সুন্দর তালিকা প্রস্তুত করবেন। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গৌরব-স্তম্ভ আর কিছুই চাই না।"

আমি সেই দুইজন রমণীর দিকে তাকালাম যাঁরা অসামান্য সংযমের পরিচয় দিচ্ছেন, ভয়—পাছে তাঁদের কম্পনের শব্দ এঁর তীক্ষ্ণ কর্ণকুহরে গিয়ে পৌঁছায়। আমি অসম্ভবের প্রতিজ্ঞাই করলাম, তিনিও প্রত্যুত্তরে আমার হাতে চাপ দিলেন।

তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আমার সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। তাঁরা কথা কইতে সাহস করলেন না, কিন্তু তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। আমার নিজের অবস্থা এঁদের থেকে একটু ভাল। শিল্প ব্যবসায়ী আমি, সুলভ ক্রয়ের সন্ধানে এসেছি। তার পরিবর্ত্তে যা ঘট্‌ল তাতে আমি হয়ে গেলাম একরকম সৌভাগ্যের দেবদূত, যেন অশ্বারোহী সৈনিকের অশ্বের মত শায়িত অবস্থায় এক বৃদ্ধ লোককে সুখী রাখার প্রতারণায় সহায়তা করছি। মিথ্যা কথার জন্যে লজ্জিত হলেও মিথ্যা বলতে পেরেছি ভেবে আনন্দিত হলাম। আর যাই হোক, আমি এমন একটা উল্লাস জাগিয়ে দিয়েছি যা এই দুঃখ ও বিষাদময় যুগে দুর্লভ মনে হয়।

আমি রাস্তায় এসে নামামাত্র একটা জানালা খুলে গেল এবং আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম। যদিও বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পাননা, কোন্ দিকে আমি হাঁটব তা তাঁর জানা আছে; এবং তাঁর চক্ষুহীন দৃষ্টি সেই দিকে ফিরল। তিনি খুব বেশী বাইরের দিকে ঝুঁকে আছেন এবং পাছে তিনি পড়ে যান এই ভয়ে তাঁর উদ্বিগ্ন স্বজনরা তাঁর চারদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একটা রুমাল নাড়তে নাড়তে তিনি সজোরে বললেন, "আপনার যাত্রা রমনীয় হোক, হের র‍্যাকনার।"

তাঁর কণ্ঠস্বর ছোট ছেলের মত শোনাল। আমি কখনও সেই আনন্দময় মুখটি ভুলতে পারব না, সে মুখের সঙ্গে রাস্তার পথচারীদের উদ্বিগ্ন চেহারার একটা বিষম পার্থক্য আছে। যে ভ্রান্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমি সহায়তা করলাম তা তাঁর জীবনকে উৎকর্ষতা দান করল। গ্যেটেই না বলেছিলেন: "সংগ্রাহকেরাই সুখী প্রাণী!"

এডিনবরায় আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

এইদিন সন্ধ্যায় এডিনবরার ব্যবসায়ী সওদাগর সম্প্রদায় তাঁদের 'মার্কাণ্টস্ হলে' আমাদের সকলকে 'ককটেল পার্টিতে' যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবিধ স্ফটিক পানপাত্রে নানা রঙীন সুরার আনন্দধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এইসব পার্টিগুলিতে যোগদানের ফলে আমরা কংগ্রেসে সমাগত দেশ-বিদেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতর ক'রে নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম। পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিনিধি আমরা সভায় যে যাই বলি না কেন, এডিনবরায় সপ্তাহকাল আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও সহচরের মতো ঘুরেছি। একসঙ্গে ব'সে চা পান ক'রেছি, মধ্যাহ্ন ভোজনে এক সাথী হয়েছি।

এইদিন রাত্রে আমরা গেলুম এডিনবরার লাইশিয়ম থিয়েটারে প্রসিদ্ধ স্কট্ নাট্যকার জেমস্ ব্রাইডির নূতন নাটক 'কুইনস্ কমেডির' প্রথম রজনীর উদ্বোধন অভিনয় দেখতে। 'গ্লাসগো সিটিজেনস্ থিয়েটার' এই অভিনয় মঞ্চস্থ ক'রেছিলেন। অতি অপূর্ব্ব নাটক এবং ততোধিক অপূর্ব্ব তার অভিনয় কৌশল, সাজ-পোষাক, মঞ্চ-ব্যবস্থা ও দৃশ্যপট। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তিন ঘণ্টা ব'সে সেই আশ্চর্য্য অভিনয় দেখে আনন্দে ভরপুর হয়ে বাড়ী ফিরলুম। আপনারা হয়ত ভাবছেন, 'ককটেল পার্টি' ফেরত থিয়েটারে গেছি। আমাদের রঙীন চোখে নিশ্চয় নেশার আবেশ জড়ানো ছিল। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আমাদের শেরী শ্যাম্পেনের গ্লাস, আমাদের টেবিলে ভরে দিয়ে যা'ওয়া প্রবাল মদিরা ও স্ফটিক সুরার পাত্রগুলি পার্শ্ববর্ত্তী বিদেশী বান্ধব-বান্ধবীদের ভোগে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে আমরা শুধু লেমন কোয়াশ, জিঞ্জার এল ও অরেঞ্জ সিরাপ আস্বাদন ক'রেই পরিতৃপ্ত ছিলুম।

পরের দিন ২২শে আগষ্ট মঙ্গলবার পেন কংগ্রেসের পঞ্চম দিবসে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রতিনিধিদের জন্য একটি ষ্টীমার পার্টির ব্যবস্থা ক'রেছিলেন গ্লাসগো ও ক্লাইড্ বন্দর দেখিয়ে আনবার জন্য নিয়ে গেলেন তাঁরা আমাদের স্পেশাল ট্রেণে ক'রে এডিনবরা থেকে গ্লাসগো। গ্লাসগোর মেয়র দি রাইট অনারেবল লর্ড প্রভোষ্ট, ভিক্টর ডি ওয়ারেন এম-বি-ই, টি-ডি এবং গ্লাসগোর নগরপালবৃন্দ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আমাদের সেখানে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বাড়ীতে প্রাতর্ভোজন সেরে আমরা বেলা ৯টায় এডিনবরা থেকে আমাদের 'ডেলিগেটস্ স্পেশ্যাল' ধরলুম। ট্রেণ আমাদের একেবারে গ্লাসগো ষ্টেশনে এনে নামিয়ে দিলে। এখানে আমাদের জন্য সারি সারি খানকয়েক টুরিষ্ট বাস দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আমাদের নিয়ে গ্লাসগো বন্দরের ষ্টীমার ঘাটে পৌছে দিলে। ষ্টীমারে ওঠবার 'গ্যাংওয়েতে' স্বয়ং গ্লাসগোর মেয়র দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি করমর্দ্দন ক'রে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াটসন সাহেব ও ডাগ্লাস ইয়ং তাঁকে আমাদের পরিচয় দিচ্ছিলেন—ইনি জাপানের মিঃ টোমোজি ওবে, ইনি ইটালীর প্রোফেসার বোনাভেন্তুরা টেকচি, এঁরা ইণ্ডিয়ার মিঃ ও মিসেস দেব ইত্যাদি। আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ ও বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা ষ্টীমারেই ছিল। এ ছাড়া যার যখন খুসী, চা, কফি, 'আইস ক্রীম', ও 'মিঠে পানির' সদ্ব্যবহার করতে পারবেন, সে ব্যবস্থাও ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে বেশ বোঝা গেল যে, এডিনবরার মেয়রের সঙ্গে গ্লাসগোর মেয়রের পাল্লা দিয়ে জেতবার চেষ্টা চলছে। স্কটল্যাণ্ডের এই প্রসিদ্ধ নগর দু'টির পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি বহু প্রাচীন অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই প্রতিযোগিতায় এবার গ্লাসগোরই জিত হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ, এডিনবরার লর্ড প্রোভোষ্ট তাঁর
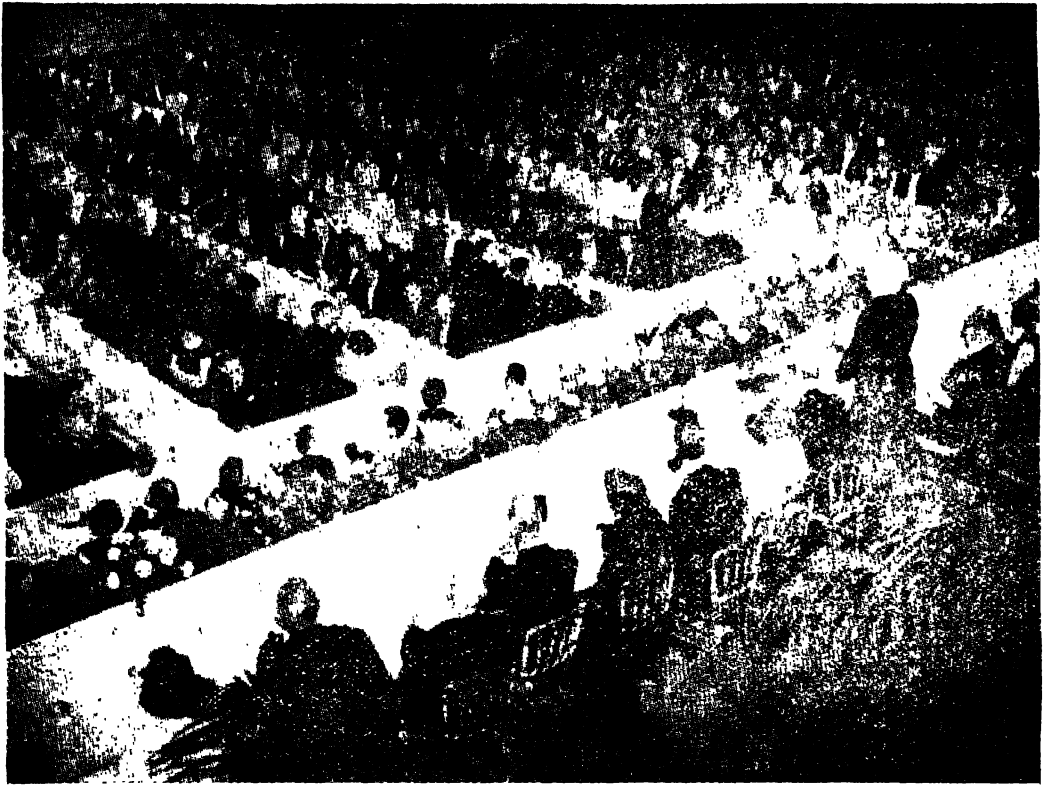
এডিনবরা সঙ্গীতকক্ষে আন্তর্জ্জাতিক পি. ই. এন্ ক্লাবের সদস্যদের ভোজ-সভার একটি দৃশ্য
সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করিতেছেন—দক্ষিণে দণ্ডায়মান লর্ড প্রোভোষ্ট্।

দপ্তরের কায়দা-কানুন ষোল আনা বজায় রেখে খুব একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে বিশ্বের সাহিত্যিকবৃন্দকে শুধু তাঁর After-Dinner বক্তৃতার দ্বারা আপ্যায়িত ক'রেছিলেন। কিন্তু গ্লাসগোর লর্ড প্রোভোষ্ট তাঁর দপ্তরখানার আদপ-কায়দা এদিন অফিসে খুলে রেখে আমাদেরই মধ্যে আমাদেরই একজন হয়ে এসে মিশেছিলেন। শুধু ভুরি পরিমাণ পানভোজনেরই ব্যবস্থা নয়, তিনি ষ্টীমারে আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্কটিশ নৃত্য-গীতের বিশেষভাবে আয়োজন ক'রেছিলেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী স্কটল্যাণ্ডের সুনীল সাগর ও নদীপথে বিশ্বের সুধী সাহিত্যিকগণের সমভিব্যাহারে এই তরণীবিহার আমাদের জীবনে অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এই অল্প পরিসর ষ্টীমারের মধ্যে সারাটি দিন যাত্রীরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে পড়ায় কত দেশের কত যে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত হবার ঘনিষ্ট সুযোগ হ'য়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়।

ডিনার টাইমের আগেই আমরা এডিনবরায় ফিরে এলুম। সারাদিন সাগর জলে হৈ-হল্লা করে এসে রাত্রে আর কোথাও বেরুইনি। এই সময় এডিনবরায় প্রসিদ্ধ শিল্পী রেমব্রাঁর চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছিল। আজ সেখানে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারা গেল না। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে তারিখে সেখানে যাওয়া যাবে স্থির করা গেল। ২৩শে তারিখে বুধবার সকালের অধিবেশনে আরও অনেক দেশের অনেক প্রতিনিধি বিবিধ প্রবন্ধ পড়লেন। তার মধ্যে লণ্ডনের বড় পাবলিশার সা-

ষ্ট্যানলি আন্‌উইনের প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন যে, Best seller মানেই Best বই নয়। অনেক তৃতীয় শ্রেণীর বইও Best seller হয়ে উঠেছে দেখেছি। বিশেষ করে, যে বইয়ের মধ্যে সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু adventure আছে, Romance আছে, Mistry আছে, Horror আছে, Sex appeal আছে এবং Stunt আছে, সে বইয়ের সবচেয়ে কাটতি! আক্ষেপের বিষয় এই যে, একখানা এরকম বই বাজারে চালু হলেই অন্য অনুকরণে আরও পাঁচখানা সেই ধরণের বই ফরমায়েজ দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় কোনও একজন নূতন লেখকের একখানা বই বাজারে খুব চালু হয়েছে দেখলে সেই একই লেখককে ধরে আর পাঁচজন পাবলিশার তার সেই প্রথম বইয়ের ছাঁদে আরও বই লেখাতে বাধ্য করেন, ফলে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সাহিত্যের উন্নতি যদি এই 'পেন কংগ্রেসের' কাম্য হয়, তবে এই ধরনের বই বার করা বন্ধ করতে হবে।

ইংলণ্ডের প্রতিনিধি জন আরভিন (John Ervine) নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে শ্রোতাদের ভিতর থেকে কে একজন উঠে বাধা দিলে কি একটা অসম্মানজনক কথা বলে। আরভিন তাকে বিরক্ত হয়ে অত্যন্ত তিক্ত ও কঠোর একটা উত্তর দিলেন। ভদ্রলোকও আবার তার চেয়েও কড়া এক প্রত্যুত্তর করলেন, তখন আরভিন তাঁকে ধমক দিয়ে মুখ বুজে বসতে বললেন, নইলে এখনি তিনি বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে তাঁকে ঘাড় ধরে সভা থেকে বার করে দিয়ে আসবেন বললেন। এরকম বাদবিসম্বাদ আমাদের মতো অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতিদের সভায় হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, কিন্তু এত বড় সুসভ্য ও নিয়ম শৃঙ্খলার অনুবর্তী জাতির সাহিত্য সভাতেও যে হয় তা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এদিন এডিনবরা য়ুনিভারসিটির চ্যান্সেলার ও সেনেটের সদস্যগণ আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। South Bridge-এর ধারে পুরাতন কলেজ গৃহের Upper Library-তে আমাদের টেবিল পড়েছিল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা গ্রন্থকারদের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট ছিল তাঁরা সকলকে আহ্বান করতে পারেন নি। আহারের ঘটা দেখে মনে হল যে খাদ্যাভাব পৃথিবীর আর যেখানেই থাক্, স্কটল্যাণ্ডে নেই।

বৈকালীন অধিবেশনেও অনেকে তাঁদের প্রবন্ধ পড়লেন অথবা বক্তৃতা দিলেন। পাকিস্তানের অন্যতমা প্রতিনিধি বেগম শায়েস্তা ইক্রামউল্লা সাহেবা আজ একটি চমৎকার ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। ইনি কলকাতার মেয়ে। এর পিতা ডাঃ সোয়ারবর্দ্দী সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। বেগম শায়েস্তা লণ্ডনের পি-এচ্-ডি। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিরূপ মনোভাবের জন্য বাধ্য হয়ে ইনি ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গেছেন। ভারতের প্রতি বিশেষ করে বাংলার প্রতি এঁর গভীর মমতা আজও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ইনি প্রকৃত জ্ঞানী ও চিন্তাশীলের ন্যায় এমন একটি উঁচু পর্দ্দায় সুর বেধে মনোহর ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন যে সমস্ত সভা তাঁর উচ্চ প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো। সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ ছিল না তার মধ্যে। মোস্লেম শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও আনেননি তিনি। তাঁর সুললিত সুমধুর অথচ তেজগর্ভ ভাষণের মধ্যে ছিল নিখিল মানবের কল্যাণ কামনা প্রসূত এক বিশ্বজনীন প্রেমের আবেদন।

এই দিন বেলা ৪ টের মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হল। কারণ অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকায় Lauris for Castle এ Secretary of State for Scotland আন্তর্জাতিক পেন প্রতিনিধিদের একটী গার্ডেন পার্টিতে আহ্বান করেছিলেন। এখানে প্রচুর চা, কফি, drinks এবং বিবিধ ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল। ষ্টেটব্যাণ্ড ভাল ভাল মনমাতানো সুর বাজিয়ে চলেছিলেন। বেলজিয়ামের রাণী ও রাজকুমারীরা এই উদ্যান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। কাজেই প্রেস ফটোগ্রাফারদের ভীর লেগেছিল এখানে। তাঁদের ক্যামেরা যে আমাদেরও বাদ দেয়নি সেটা টের পাওয়া গেল পরদিনের সংবাদপত্রগুলিতে আমাদের সচিত্র বিবরণ দেখে। বহু নূতন লোকের সঙ্গে এখানে

আলাপ হয়েছিল। ভোজনপর্ব্বটা এত বেশী হয়ে গেল যে 'গার্ডেনপার্টি' থেকে আর ডিনার খেতে না ফিরে সেদিন রাত্রে আমরা গেলাম কিংস্ থিয়েটারে Glyndebourne Opera সম্প্রদায়ের Ariadne auf Naxos গীতিনাট্যাভিনয় দেখতে। এই গীতিনাট্যখানির আন্তর্জ্জাতিক প্রশংসা শোনা ছিল। এঁদের Carl Ebert এযুগের একজন নামকরা শিল্পী। সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছিলেন বিখ্যাত সুরকার সার টমাস বীচাম। সুতরাং অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য।

স্কটিশ পি. ই. এন্ ও ন্যাশ্‌নাল বুক লীগের সহযোগে 'দি স্কটসম্যান' প্রযোজিত প্রদর্শনীতে দর্শক সাধারণের একটি দৃশ্য।

পরের দিন ২৫শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকালের অধিবেশনে যাঁদের বলা বাকী ছিল তাঁদের সুযোগ দেওয়া হল। তুরস্কের মহিয়সী মহিলা শ্রীযুক্তা হালিদে এদিব এদিন সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা উপস্থিত সকল সদস্যকে মুগ্ধ করেছিল। বিকেলের অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও কর্ম্মীবৃন্দ নির্ব্বাচিত হলেন। আগামী বৎসর এই নিখিলবিশ্ব আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলন ভারতবর্ষে আহ্বান করবার বিশেষ আগ্রহ ছিল সার সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের, কিন্তু, এ ব্যাপারের বিরাটত্ব ও ব্যয়ের বহর দেখে তিনি আর ভরসা করলেন না। পি-ই-এন কংগ্রেসের আন্তর্জ্জাতিক অধিবেশন সুইজারল্যাণ্ডের আহ্বানে আগামী বৎসর জেনিভায় হবে স্থির হল।

কংগ্রেসের এই শেষ দিনে বিকেলের দিকে His Majesty's Govt. of Great Britain and the British Colonies আমাদের জন্য Parliament Hall এ একটি বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। দি রাইট অনারেবল হেক্টর ম্যাকনীল P. C. M. P Secretary of State, Scotland পার্লিয়ামেণ্ট হলের প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দ্দন করছিলেন। শ্রীযুক্ত ডাগলাস ইয়ং এখানে প্রত্যেককে তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় দিতে অনুরোধ করলেন। দেখলুম এবং শুনলুম আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধি সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের সঙ্গে করমর্দ্দনের সময় আপন পরিচয় দিচ্ছেন—I am Prof. Heinrich Stranmana of Switzerland. মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা অনুসরণে আমরা পরিচয় দিলুম Mr. and Mrs. Dev from the Republic of India. এখানেও চা, কাফী, মিঠাপানি, বিবিধ সুরা ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। এখান থেকে বেরুতে দেরী হয়ে যাওয়ায় আমরা সরাসরি Assembly Hall-এ P. E. N. Club এর Annual Dinner এ যোগ দিতে চলে গেলুম। স্কটিশ পি-ই-এন সেণ্টার এই রাত্রে কংগ্রেসে উপস্থিত সমস্ত পি-ই-এন প্রতিনিধিদের বিরাট এক নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ ব্যবস্থাই প্রচুর ছিল। ভোজনান্তে বক্তৃতার পালা শেষ করে বাড়ী ফিরতে প্রায় মধ্যরাত্রি হ'ল। এদের এই খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাঁচ সাত শ লোক একসঙ্গে বসে খাচ্ছে—একটা কোনও টুঁ শব্দ বা গোলমাল নেই। কারও পাতে কোনও জিনিষ ফেলা যায় না।

পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ভাঙ্গা আসর। ২৬শে আগষ্ট যে যার বাড়ী ফেরবার পালা। কিন্তু, এডিনবরার আতিথেয়তা তখনও শেষ হয় নি। ওঁরা ২৫শে তারিখে রাত্রেই বলে দিয়েছিলেন আমাদের কাল Dunfermline এ এ্যাণ্ড্রু কার্নেগী ট্রাষ্ট থেকে মধ্যাহ্ণ ভোজের নিমন্ত্রণ আছে, অপরাহ্ণে St. Andrew's Universityর Vice Chancellor আমাদের চা'য়ে ডেকেছেন। অতএব যদি অসুবিধা না হয় সকলে কালকের দিনটাও থেকে গেলে তাঁরা খুশী হবেন। দেখা গেল সব দেশের সাহিত্যিকেরাই সমান! সেই—সিধে ভাত খাবি? ...হাত ধোবো কোথায়?' সকলেই প্রায় থেকে গেলেন। প্রাতঃরাশের পর খান আষ্টেক বিরাট বাসে চড়িয়ে আমাদের তাঁরা নিয়ে চললেন Culross Dunfermline, Folkland এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ St. Andrews University দেখাতে। এই নিয়ে আমাদের স্কটল্যাণ্ডে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হল। এডিনবরা, গ্লাসগো, সেন্ট এ্যাণ্ডরুজ। ডানফার্মলাইন একদা দরিদ্র বালক এ্যাণ্ড্রু কার্নেগীর নানা কীর্ত্তি মণ্ডিত Pittencrieff Park এর শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হলুম। এখানে একটি হট হাউসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতীয় আবহাওয়া সৃষ্টি দ্বারা কলা গাছ আম গাছ তাল গাছ খেজুর গাছ ইত্যাদি করে রেখেছেন তাঁরা। এইখানে মহাসমারোহে আমাদের মধ্যাহ্ণভোজে পরিতৃপ্ত করলেন এঁরা। এখান থেকে Folkland হয়ে আমরা অপরাহ্ণে St. Andrews বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলুম। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে St. Andrews Universityর Vice-Chancellor আমাদের একেবারে রাজকীয় সংবর্দ্ধনা জানালেন। চা ও মিষ্টান্নের প্রভূত আয়োজন করেছিলেন এঁরা। এখান থেকে ফিরে সেই রাত্রেই মোটঘাট গুছিয়ে রাখা হল। পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর আমরা এডিনবরা ছাড়লুম। [সমাপ্ত

●

আমি যেখানে জগতের সামিল, সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর ব'লে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন ক'রবার চেষ্টা করি, না পালন ক'রলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু, আমি রূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র ব'লে জান্‌তে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন ক'রে দিয়েছ—কেননা, স্বাধীন না হ'লে প্রেম সার্থক হ'বে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিল্‌বে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হ'তে পারবে না। এই জন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ; আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ।

—রবীন্দ্রনাথ
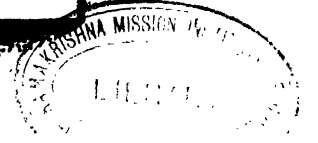
রণজিৎ কুমার সেন

চব্বিশ

একসময় ছন্দা এসে ব'ললো, 'আমাকেও তোমার পাঠশালায় ভর্তি ক'রে নাও না বিজুদা! নিজেকে নিয়ে দিন আর কিছুতেই কাটে না। সকাল থেকে একই কাজের মধ্যে একই ঝক্‌মারী নিয়ে মানুষ কতক্ষণ পারে বলো? জীবনে লেখাপড়াও তো তেমন কিছু শিখিনি, তোমার গুরুগিরিতে নতুন ক'রে হাতেখড়ি দিতেও আনন্দ।'

ছন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিজন ব'ললো, 'আনন্দের পথের সন্ধান এতদিনে যাহোক তবে কিছু একটা পেলি! হাসালি তুই ছন্দা। গুরুবাদে এই অচলা ভক্তি এযুগে অচল। গুরুবাদ ক'রে-ক'রেই গোটা দেশটা ধর্মান্ধতায় মজে' আছে। তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। পাঠশালায় আজ তোকেই প্রয়োজন ছিল সব চাইতে বেশী। অধ্যয়নের জন্যে নয়, অধ্যাপনার জন্যে। আমার গুরুগিরির গুরুত্ব সেখানে কিছুমাত্র নেই। নতুন মানুষ সৃষ্টির কাজে সেখানে সবাই আমরা এক।'

ছন্দা ব'ললো, 'আমি ক'রবো অধ্যাপনা, মাষ্টারনী হবো আমি! তবেই হ'য়েছে। এ তো দেখচি আরও বেশী হাসালে তুমি বিজুদা!' ব'লে নিজেই একবার সকৌতুকে হেসে উঠলো ছন্দা।

গ্রামে এসে অবধি আজ এই প্রথম স্বাভাবিকভাবে হাসতে দেখলো ছন্দাকে বিজন। বেশ লাগলো। তবু যদি হাসির মধ্য দিয়ে নিজেকে কিছুটাও মুক্তি দিতে পারে ছন্দা! ব'ললো, 'দেশ যদি আশা করে, তবুও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকবি?'

ছন্দা ব'ললো, 'দেশ কোথায়, দেশকে তো চিনতে পারিনি বিজুদা! দেশ ব'লতে যা চিনেছি, তা এই কাকিমার সংসার। সংসার যা আমার কাছে আশা করে, তা-ই যে আজ অবধি দিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। পদে পদে নিজের অযোগ্যতা নিজেকে এসে বেঁধে। তার-পরেও তুমি ব'লছো দেশ, দেশের আশা?'

বিজনকে এবারে থামতে হ'লো, হার স্বীকার ক'রতে হ'লো তাকে। ব'ললো, 'এম্‌নি ক'রে ব'লবি জানলে আমিই কি বলতুম তোকে মাষ্টারীর কথা! তোর মতো মেয়েদেরই তো আজ দেশের কাজে এগিয়ে আসা উচিৎ। তাতে সংসারও রক্ষা পায়, দেশও প্রাণ পেয়ে বাঁচে। কিন্তু জানি, এখানে তা হবার নয়; এখানে পদে পদে সমালোচনা, পদে পদে কান-লাগানি, পদে পদে বিরুদ্ধ আচরণ। গ্রামকে ভালোবেসেও গ্রামের এই কুশ্রীতার জন্যে ঘৃণায় ম'রে যাই।'

প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে ছন্দা ব'ললো, 'তা যাক্‌ গে। কিন্তু তুমি যেভাবে মাঠের কাজে চাষিদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছ, তাতে যে শেষ পর্যন্ত শরীরটাকেও মাটি ক'রে দেবে বিজুদা! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, দিনরাত ওদের সঙ্গে তুমি লেগে আছ। এম্‌নি ক'রে তোমার কিছু একটা বড় রকমের অসুখ হোক্‌, এই কি তুমি চাও?'

—'অসুখ কেন হবে রে! মনে নেই বাল্যশিক্ষার সেই প্রথম মন্ত্র: পাঁচজনে পারে যাহা—আমিও পারিব

তাহা—পারিব না একথাটি বলিও না আর। সব কিছুই অভ্যাসের অধীন, একবার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে আর তা নিয়ে সংশয় থাকে না।' ব'লে মুখ টিপে একবার হাস্‌লো বিজন।

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'নীতিকথা তোমার রাখো। ও নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি মেলে না। আমার মাথা খাও তুমি বলো—এম্‌নি ক'রে এত বেশী পরিশ্রম তুমি ক'রবে না?'

—'পাগ্‌লী আর কাকে বলে!' স্মিতহাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'পরিশ্রম ক'রবো না, তবে কি ননীর পুতুল হ'য়ে ঘরে ব'সে থাক্‌বো! জানিস্‌, মাঠে গিয়ে চাষিদের পাশে দাঁড়াতে ওদের মধ্যে আজ কতখানি কর্ম্মস্পৃহা আর উৎসাহ বেড়েছে! মালিক আর প্রজার মধ্যে পার্থক্যের বেড়া ভেঙে না দিলে জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগে। মানুষ হ'য়ে কখনও সেই আঘাত চোখের সাম্‌নে সহ্য করা যায়? তুইই বল্‌ না?'

—'কিন্তু মানুষের নিন্দা, তারও কি কোনো মূল্য দিতে চাও না তুমি?'

—'না, সত্যিই চাই না। নিন্দার দিকে কান রাখ্‌লে মন কখনও কাজের পথে এগোয় না। কাজের দ্বারাই নিন্দাকে জয় ক'রে নিতে হয়।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লেই নিন্দে করে; তাদের চোখ যদি খুলে দেওয়া যায়, তবে আজকের মূর্খতায় সে-নিন্দা একদিন তারাই নিজেদের ক'রবে। এ বিশ্বাস না রাখলে হয়ত এম্‌নি ক'রে কাজে এগিয়ে যেতে পারতুম না। অসুখ যদি করেই, তোর ঐ স্নিগ্ধ হাতের সেবা কি পাবো না, ব'ল্‌তে চাস?'

লজ্জা পেলো এবারে ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'এ হাতের সেবা পেলেই তুমি রোগমুক্ত হবে, এ বিশ্বাস তোমার কোত্থেকে এলো?'

—'যে বিশ্বাসে একদিন সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালো-বাস্‌তে পেরেছিলাম তোকে, ভালোবাসা পেয়েছিলাম তোর!'—চোখের নরম দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য একটা উজ্জ্বল আভা খেলে গেল বিজনের।

এবারে আর এমন শক্তি রইল না ছন্দার যে, স্বাভাবিক ভাবে বিজনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়। লজ্জায় সে নিজের মধ্যে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লো, 'এমন ক'রেও এ কথা মুখে আন্‌তে হয়! ছিঃ।' তারপর আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে বিদায় নিয়ে ব'ল্‌লো, 'আসি এখন বিজুদা, পারতো আমার কথা রেখো।'

উত্তরে বিজন স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌তে পারলোনা যে 'রাখ্‌বো'। শুধু ছন্দার যাত্রাপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বুকের মধ্যে একটা ভারী নিঃশ্বাস চেপে নিল সে।

ছন্দা ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনের সীমা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

এরপর বোধ করি একটা বেলাও ভালো ক'রে কাটলো না। অনিশ্চিত একটা ঘটনায় বাতাস হঠাৎ কেমন মন্থর হ'য়ে উঠ্‌লো। একসময় অঞ্জনা এসে দাঁড়ালেন নির্ম্মলার দুয়োরের সাম্‌নে। তিনি যে গল্প ক'রতে এলেন, তা নয়; গল্পের পাট চুকে গেছে দীর্ঘ-কাল, তা নিয়ে তাঁর লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। মনের কিছু-একটা জ্বালা মেটাতেই আজ তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব। হাঁক দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'বলি বিজুর মা ঘরে আছ?'

সাড়া দিয়ে নির্ম্মলা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন: 'অঞ্জনা যে, কি মনে ক'রে হঠাৎ? এস, ঘরে এস।'

কিন্তু দাওয়া ছেড়ে এক পা-ও আর ন'ড়লেন না অঞ্জনা। ব'ল্‌লেন, 'থাক্‌, এই বেশ আছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তও ঘরে তিষ্ঠোতে দেবে না?'

—'কেন, হঠাৎ এমন কি ক'রলাম যে, তিষ্ঠোনো তোমার দায় হ'য়ে উঠেছে!' বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন নির্ম্মলা।

অঞ্জনা ব'ল্‌লেন, 'দায় হ'য়ে উঠেছে ভিন্ন কি! ভাত কাপড় দিয়ে মেয়ে পুষ্‌বো আমি, আর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কানে তার মন্ত্র প'ড়ে দিয়ে গাল-গল্পে আট্‌কে রাখ্‌বে তোমার বাড়ীতে, এ কোন্ সৃষ্টিছাড়া অলক্ষুণে

ব্যাপার? বলি চক্ষু লজ্জাটাও তো আছে, না তার মাথাও খেয়েছ বিজুর মা?'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থামতে হ'লো নির্ম্মলাকে। এতখানি আশা করেননি তিনি অঞ্জনার কাছ থেকে। অঞ্জনা আজ এ কী কথা ব'লে তাঁকে আঘাত ক'রতে চাইছে? থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'বড় গলা ক'রে একথা শোনাতেই আজ তবে বাড়ী ব'য়ে এসেছ? তোমার ঘরের মেয়ে হ'লেও ছন্দা আমাদের সকলেরই আদরের। এ আজ নতুন নয়। কানে মন্ত্র প'ড়ে দেবার কথাই বা আজ এই প্রথম উঠলো কি ক'রে? কি মন্ত্র দিয়েছি, ব'লতে পারো?'

গলা এতটুকুও খাদে নামালেন না বা দ্বিধা ক'রলেন না অঞ্জনা, যেমনি কাংসকণ্ঠে তিনি এতক্ষণ ব'লে যাচ্ছিলেন, তেমনি সুরেই ব'ললেন, 'এর আর ব'লবার কি আছে! মেয়েটা দিনরাত আমার হাড়-মাস চিবিয়ে খাক্—এই তো তোমরা চাও। বলি, এত যদি দরদ, তবে রাখলেই তো পারো নিজের ঘরে এনে, আমারও আপদ চোকে, অন্নও বাঁচে।'

—'এ তুমি কি ব'লছো অঞ্জনা?' নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না নির্ম্মলা; ব'ললেন, 'ওর বয়সী একটা বিধবার একবেলা চাট্টি ভাত খেতে ক' টাকাই বা তোমাকে ব্যয় ক'রতে হয় মাসে? তাই নিয়ে খাবার খোঁটা দিচ্ছ? ছিঃ, ছিঃ, তুমি না মা, তুমি না হিঁদুঘরের বউ, এরপর তোমার যে নরকেও স্থান হবে না অঞ্জনা! মানুষকে এমনি ক'রে কখনও খাবার খোঁটা দিতে হয়? সংসারে যে যার নিজের ভাগ্যে খায়; দুনিয়ায় কে কাকে খাওয়াতে পারে, বলো? আজ না হয় কপালই ভেঙেছে মেয়েটার, একদিন তো রাজেন্দ্রাণী হ'য়েই শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল! ব'লতে গেলে আজই বা ওর অভাব কি! মানুষের দুরদৃষ্টের সুযোগ নিয়ে এমন ক'রেও কটূক্তি ক'রতে হয়!'

রাগে এতক্ষণ জ্ব'লে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা! ব'ললেন, 'থাক্, হ'য়েছে; বাইরে থেকে এমন ধর্ম্মোপদেশ না দিলেও চ'লবে। যার পুড়ুনি, সে ছাড়া বুঝবে কে? ঐ রাজেন্দ্রাণী রাজেন্দ্রাণী ক'রেই তো মেয়েটার মাথা খেলে তোমরা। কথায় আছে—মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর, কেঁদে মরে পাড়া পড়শি। তোমাদের হ'য়েছে তাই। এমনি ক'রে মুখ-মিষ্টি দেখিয়ে তোমরা আর আমার পিছনে লাগবে না, এই ব'লে দিলুম বিজুর মা। তাতে যে কিছু সুবিধে ক'রতে পারবে, তা মনে কোরো না।' ব'লে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না অঞ্জনা, সমস্ত দেহের উপর দিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গী খেলিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে তিনি চোখের পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

নির্ম্মলা যে কতক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, ব'লতে পারবো না। আত্মধিক্কারে সমস্ত মন তাঁর কেবলই রি রি ক'রে উঠছিল। বিজন এ সময়ে ঘরে ছিল না, থাকলে হয়ত আকস্মিক এই ইতিহাস অনেকখানি বেঁকে যেতো। নিজের কানে শুনে অঞ্জনার এ ঔদ্ধত্য সে বরদাস্ত ক'রতে পারতো না। কিন্তু নির্ম্মলাকে নীরবে কান পেতে শুনতে হ'লো। যাকে কেন্দ্র ক'রে এত কথা, সেই অভাগী মেয়েটার জন্য দুঃখে একবার বুকখানি হু-হু ক'রে উঠলো তাঁর। কেন ভগবান মনটাকে তাঁর কঠোর ক'রে দিলেন না সংসারে, তবে তো আর সারা বুকের স্নেহ নিয়ে আজ তাঁকে এমন অপমান সইতে হ'তো না নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে! মুখের উপর আজ স্পষ্ট শাসিয়ে গেল অঞ্জনা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ দুঃখ—এ অপমান কোথায় গিয়ে ঢাকবেন তিনি?

ততক্ষণে অঞ্জনা নিজের ঘরে এসে ছন্দাকে নিয়ে প'ড়েছেন। —'রাজেন্দ্রাণী, ওলো আমার রাজেন্দ্রাণী লো! সারা রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খায়, এ মেয়ের হ'য়েছে তাই। বাপের মাথা খেয়ে স্বামীর মুখে পিণ্ডি দিয়ে রাজেন্দ্রাণী এসে আমার ঘরে অধিষ্ঠিতা হ'য়েছেন। পাড়ার মানুষের মুখে মেয়ের আর প্রশংসা ধরে না। সকলের সঙ্গে যখন এত মস্করা, তখন আমার কপালে এসে এমন মরণদশা কেন, দুনিয়ার লোক তো ভাত ছড়িয়ে ব'সে আছে, সেখানে গিয়েই দিব্যি বহাল তবিয়তে থাক্ না! পোড়ারমুখীর কি মরণও নেই কপালে? পাড়ায় পাড়ায় তো দিব্বি ঘুর্ ঘুর্, কত হাসি কত মস্করা ঘরে ঘরে, বাসায় এলেই মেয়ে আমার ভিজে বেড়াল। হতচ্ছাড়ী, পোড়ারমুখী, হাভাতে কোথাকার।'

রাগের মাথায় এক্ষুণি হয়ত দু'ঘা বসিয়ে দেবেন তিনি ছন্দার পিঠে। বিচিত্র নয়। মুখের সঙ্গে হাত দু'খানিও আজকাল নিস্‌পিস্‌ করে বৈ কি অঞ্জনার। এমন অনেক সময়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছে ছন্দা—অবলীলাক্রমে হাত দু'খানি তাঁর উদ্যত হ'য়ে উঠেছে, আঘাত ক'রতে শুধু বাকী রেখেছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে কথার এ আঘাতের চাইতে সে আঘাত হয়ত শতগুণে ভালো। তার দাগ মুছে যেতে সময় লাগ্‌বে না, কিন্তু কথার এ দাগ যে প্রতিমুহূর্ত্তে গভীর থেকে আরও গভীর হ'য়ে সমস্ত জীবনসত্তাকে তার মসীময় ক'রে তুল্‌ছে। অথচ সমস্ত চেতনা দিয়ে নীরবে এই মসীচিহ্ন ধারণ না ক'রে উপায় নেই। পথ তার রুদ্ধ, সাম্‌নে তার বিকট অন্ধকারের খল্‌ খল্‌ হাসি। সেদিকে তাকাতে গেলে ভয়ে ত্রাসে নিজের মধ্যে আঁৎকে ওঠে ছন্দা। অঞ্জনার রূঢ় উক্তি যত বড় রূঢ়তা নিয়েই তাকে দগ্ধ করুক, নীরবে নত মস্তকে তাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই তার। আজও নীরবে সেই স্বীকৃতিই তাকে জানাতে হ'লো। অথচ এ স্বীকৃতির পিছনে তার হৃদয় যে কতখানি ভেঙে গুঁড়িয়ে থিতিয়ে গেল, তা কেউ দেখ্‌তে এলো না।

রাগে গজ্‌ গজ্‌ ক'রতে ক'রতে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে একসময় পান সাজ্‌বার সরঞ্জাম নিয়ে ব'স্‌লেন অঞ্জনা। অনেকক্ষণের মধ্যে এক খিলি পানও তাঁর মুখে ওঠে নি। পান না খেলে গলার ভিতরটা আপ্‌নি থেকেই কেমন খড়খড়িয়ে ওঠে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব'লে তখন কিছু জ্ঞান থাকে না অঞ্জনার।

কিন্তু যিনি এ সংসারের সমস্ত জ্ঞান নিয়ে ব'সে আছেন, তিনি আজ হতমান বিপর্য্যস্ত জীবনে একেবারেই পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। লাঠি ভর ক'রে ভিন্ন আজ আর এক পা-ও ন'ড়বার ক্ষমতা নেই রসিকলালের। প্রাক্‌টিশ্‌ একরকম বন্ধ হ'তেই ব'সেছে। আগে আগে বাইরের বৈঠকখানা ঘর ছেড়ে তবু তিনি এখানে-ওখানে গিয়ে ব'স্‌তেন, খাবারের ডাক প'ড়লে অন্দর মহলে গিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে আস্‌তেন, আজকাল অধিকাংশ সময়েই তাঁকে বৈঠকখানা ঘরে এনে খাবার দিয়ে যেতে হয়। স্নানের জন্য ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে স্বতন্ত্র পাত্রে গরম জল এনে দুয়োরে রাখ্‌তে হয়। জীবনে যে আজ তাঁকে এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে, বুঝ্‌তে পারেন না রসিকলাল। মনটা যখন অতিরিক্ত বিষণ্ণ ও ভারী হ'য়ে ওঠে, মাঝে মাঝে আপন মনে ব'সে ব'সে তিনি রামপ্রসাদী সুর ভাজেন কণ্ঠে, তারপর অলক্ষ্যেই আবার কখন্‌ বিস্মৃতলোকে হারিয়ে যান।

এমন কিছু-একটা বিস্মৃতি হ'লে হয়ত ছন্দা বেঁচে যেতো, কিন্তু মনের সমুদ্র তার বড় উত্তাল তরঙ্গমুখর। সেখানে অতলস্পর্শী ভারী পাথর খণ্ডটিও সেই তরঙ্গমুখে সদা ভাসমান। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রেও ঘুম এলো না ছন্দার। বাইরে প্রতিপদের চাঁদের ক্ষীণ আলোর রেখা এসে দাওয়ায় প'ড়েছে। নীরবে উঠে এসে একসময় সেইখানেই ব'সলো ছন্দা। কাকিমার রূঢ় উক্তিগুলি কেবলই বার বার ক'রে মনে জেগে সমস্ত হৃদয়টাকে তার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। সমাজের আর-আর পাঁচ জনের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে একবার মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে হ'লো—কেন এম্‌নি ক'রে অজানা অনিশ্চিতের মধ্যে একদিন তার মালা বদল হ'য়ে গেল! কেন এই বৈধব্যের অভিশাপ? এ তো সে চায়নি, এ যে সে আজও চায় না। পারতো না কি সে দীর্ঘজীবীর জীবনলক্ষ্মী হ'য়ে স্বামী-সোহাগে সুখে থাক্‌তে? সমাজের আর পাঁচজন যেমন ক'রে আছে। তাদের দীপ্ত ললাটের গাঢ় সিঁদুর-বিন্দু প্রতি-মুহূর্ত্তে ঘোষণা ক'রে দিচ্ছে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যময় এয়োতীর ঐশ্বর্য্যময়তাকে। ললাটের সে সিঁদুর কবেই তার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। ঊর্দ্ধাকাশে প্রতিপদের চাঁদের দিকে এক-বার চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠলো বিজনের মুখখানি। পারে না কি এই মুহূর্ত্তে গিয়ে বিজুদাকে সে ডেকে তুল্‌তে? নিদ্রাহীন রাত্রির একা-কিত্ব যে কি দুঃসহ, এ সে কাকে বুঝাবে! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কেমন একটা আত্মধিক্কারে নিজের মধ্যে ভেঙে প'ড়লো ছন্দা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ সে কি ভাবছে এতক্ষণ ধ'রে? শ্যামলকান্তির আত্মা যে স্বর্গে থেকে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। প্রতিপদের চাঁদের দিকে মুখ তুলেই সহসা সে মনে মনে একবার শ্যামলকান্তির উদ্দেশ্যে উচ্চা-

রণ করে উঠলো: 'না, না, ভুলিনি তোমাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ডেকে নাও তোমার কাছে আমাকে। পতিহারা পতিব্রতা যে তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে ম'রছে, তাও কি দেখতে পাওনা তুমি? তোমার কাছে ডেকে নিয়ে তোমার ঘরের চাবি আবার আমার হাতে তুলে দাও তুমি। এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে আমিও তোমার সাথে চির অবিনশ্বর হ'য়ে থাকবো।'

টশ টশ ক'রে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের দু'টো পাশ ভিজে গেল ছন্দার। রাত্রির নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে ভোরের আভা তখন ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে উঠচে।

পঁচিশ

ইতিমধ্যে ক'লকাতায় মহাসমারোহে একদিন ব্রাহ্ম-মন্দিরের আচার্য্যের পৌরোহিত্যে রেবা আর দিলীপ দত্তের শুভ পরিণয়ের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হ'য়ে গেল। মিঃ মল্লিকের রাসবিহারী এভিন্যুর বাড়ীটার উপর সমস্তটা বালীগঞ্জ অঞ্চলের দৃষ্টি এসে ঠিকরে প'ড়তে দেরী হ'লো না। নানা বর্ণের আলোর বন্যায় নব যৌবনের রাজ-সজ্জার সে কি অপূর্ব্ব নৃত্যচ্ছটা! রেবার গানের ক্লাবের মেয়েরা এসে হলঘরটাকে নাচে আর গানে মুখর ক'রে তুললো। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীটা এসে ভেঙে প'ড়তে দেরী হয়নি সেখানে। কোনো ব্যবস্থাতেই ত্রুটি নেই মিঃ মল্লিকের। ভাঁড়ারের ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিয়ে গোটা অন্দর মহলটাকে আঁকড়ে রইলেন মিসেস মল্লিক। পরিবেশনের ব্যাপারে একা নিশিকান্তই যথেষ্ট, দশটা মানুষের শক্তি নিয়ে আজ সে একাই নানাদিকে ছুটোছুটি ক'রছে। গ্রামোফোনের সঙ্গে এ্যাম্প্লিফায়ার জুড়ে দিয়ে নানা রাগের কনসার্ট চালিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল মধ্যালয়ে, আলোকোজ্জ্বল রূপসজ্জার সঙ্গে সুরের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা রূপকথার স্বপ্নপুরী হ'য়ে উঠেছে। সারা ঘরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, কোনোদিকে ফাঁকি রাখতে রাজি ন'ন্ মিঃ মল্লিক। ক্রিয়াকর্ম্ম ব'লতে জীবনে এখানেই তাঁর সুরু, এখানেই শেষ। অতএব তার মধ্যে ফাঁকি থাকলে নিজেই সেই ফাঁকির জালে আবদ্ধ হ'য়ে সারাজীবন বৃশ্চিকদংশনে জ্ব'লে ম'রবেন মিঃ মল্লিক। কোনোদিকেই তাই সতর্কতার অভাব নেই। উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে বাড়ীটা আজ পরম তীর্থ হ'য়ে উঠেছে। জীবনে আজ এই প্রথম তীর্থস্নান মিঃ মল্লিকের।

তেমনি আজ এই প্রথম বাসররাত্রি যাপনা রেবা আর দিলীপের। এতদিন তারা পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মতো নানা দিকে উড়ে বেরিয়েছে, সেখানে কাছের পাওনাকে ষোলকলায় মিটিয়ে নিয়েও কি যেন একটা বড় রহস্য থেকে আড়ালে প'ড়ে ছিল তারা; বাসর রাত্রির সৌরভ-মুখর পরিবেশে আজ সে রহস্য উজ্জ্বল দিবালোকের মতই তাদের স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। দিলীপ ব'ল্‌লো, 'আমার নিঃসঙ্গ রাত্রির শয্যায় আজ থেকে সাথী পেলাম। এতদিনে আমার সকল নিঃসঙ্গতা ঘুচ্‌লো।'

—'আমারই বুঝি ঘুচলো না?' ব'লে মুখ টিপে হাসলো রেবা। টোল প'ড়ে গাল দু'টিকে মনোরম দেখালো।

সেণ্ট্ আর ফুলের গন্ধে ম-ম ক'রছে বাসরকক্ষ। নীরবে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে রেবার সেই টোল-পড়া সুন্দর গালের উপরে মৃদু একটি চুম্বন এঁকে দিল দিলীপ। সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় শিহরণ খেলে গেল রেবার। নিজেকে দিলীপের বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লো, 'দুষ্টু, অসভ্য কোথাকার।' হয়ত আরও কিছু একটা বিশেষণ প্রয়োগ ক'রতো রেবা, তার পূর্ব্বেই দিলীপের অধরে চাপা প'ড়ে গেল রেবার ঠোঁট দু'টি। ভাববিহ্বলকণ্ঠে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে—তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করিতে দর্শন। এটা সভ্য সমাজেরই কথা, নইলে রবীন্দ্রকাব্য এতদিনে ডাষ্টবিনে স্থান পেতো। দুষ্টু আমি—না তুমি, বলো তো?'

কথা ব'ললো না রেবা, শুধু আবেশবিহ্বল চোখ দু'টি মেলে মনে মনে নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রতে লাগ্‌লো দিলীপকে।

উপহারের অনেক সামগ্রী ইতিপূর্ব্বেই বাসরকক্ষে এনে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। সেই দিকে উঠে হঠাৎ কি খেয়ালে ছোট্ট একটা এলুমিনিয়মের এ্যাটাচিকে হাতে

তুলে নিতে নিতে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'কাপ-ডিস থেকে সুরু ক'রে কানের ঝুম্‌কো অবধি উপহার কিন্তু তুমি মন্দ পাওনি, যাই বলো। বন্ধুকৃত্যের ব্যাপারে প্রিয়জনেরা হাজার হোক কার্পণ্য করেনি।'

পালঙ্কের উপর উঠে ব'সে রেবা ব'ল্‌লো, 'এখন বুঝি উপহার দেখেই রাতটুকু নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দেবে ঠিক্ ক'রলে?'

—'না, না, তা কেন! আমাদের রাত কাটাবার এগুলোও তো কম বড় সাথী নয়, তাই একবার স্পর্শসুখের সুযোগ নিচ্ছি।' ব'লে এ্যাটাচির ঢাক্‌নাটা খুলে ফেল্‌তেই কৌতুকে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো দিলীপ। ব'ল্‌লো, 'শীগ্‌গির উঠে এস, একটা মজার জিনিষ দেখবে এস।'

কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে রেবা ব'ল্‌লো, 'তুমি এস, এসে বসো এখানে।'

আপত্তি ক'রলো না দিলীপ। তেম্‌নি হাস্‌তে হাস্‌তেই এসে খোলা এ্যাটাচিটাকে সে রেবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধ'রলো।

দেখা গেল—একটুকরো সুন্দর সিল্কের কাপড়ের উপর সামান্য একসেট সেলাইয়ের সরঞ্জাম, তার পাশে শায়িত র'য়েছে সেলুলয়েডের সুসজ্জিত একটি ডল পুতুল। ছোট্ট একটা রঙিন কার্ডে ইংরেজি কয়েকটা অক্ষর: To Reba—The best property of marriage, কিন্তু কার্ডটির কোথাও উপহারদাতার কোনো নামোল্লেখ নেই।

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে কি ভাবে ঠাট্টা ক'রেছে, দেখ।'

মনে হ'য়েছিল—রেবাও দিলীপের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রেবার মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো, 'রাবিশ এ্যাণ্ড্ ভাল্‌গার। এই দেখে তুমি এম্‌নি ক'রেও হাস্‌তে পারছো?'

—'হাসির ব্যাপারই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়ে ব'সেছে তোমার বন্ধু!' সহাস্যে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'উপহার যিনি দিয়েছেন, তাঁর রসজ্ঞানের তারিফ ক'রতে হয়, যাই বলো।'

সমস্ত মুখখানি ততক্ষণে লাল হ'য়ে উঠেছে রেবার। ব'ল্‌লো, 'একে তুমি রসজ্ঞান ব'ল্‌ছো? কে দিয়েছে এটা—আমি হাতের লেখা দেখেই চিন্‌তে পেরেছি। এর জবাবও আমি কালই তাকে দেবো।'

—'জবাব দিতে গিয়ে তুমি হাস্যাস্পদ হবে। সংসারে যা চিরদিনের সত্য, তাকে নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েই সুখী হ'তে হয়।' থেমে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'আজকের উপহারটা হয়ত নিতান্তই ঠাট্টা, কিন্তু আমাদের জীবনে একদিন এর বাস্তব রূপায়নটাকেই বা অস্বীকার করি কি ক'রে! পারো তুমি, বলো?'

'জানি না, যাও, নন্-কোঅপারেশন, আড়ি তোমার সঙ্গে।' ব'লে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে প'ড়লো রেবা।

রাত্রি ব'সে ছিল না। ঊর্দ্ধাকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ ক'রে জ্ব'ল্‌ছিল। দিলীপও আর অপেক্ষা না ক'রে সুইস অফ ক'রে দিয়ে এসে শুয়ে প'ড়লো। দেয়াল-বাতির মৃদু শিখাটি শুধু অনির্ব্বাণ হ'য়ে রইল। শিয়রের জানালা দিয়ে স্পষ্ট লক্ষ্যে পড়ে আকাশে তারার মিছিল। ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এলেও দিলীপের কাব্যানুরাগ কম ছিল না। বিলেতের নিঃসঙ্গ জীবনে তার যে সমস্ত গ্রন্থ সাথী ছিল, রবীন্দ্র-কাব্য ছিল তার অন্যতম। জানালার দিকে মুখ তুলে একবার সে আপন খেয়ালেই আবৃত্তি ক'রে উঠ্‌লো—

…'জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হ'য়েছে হারা,
অঙ্গুলী তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমরা যাত্রা করিতে সারা।'…

ভেবেছিল—রেবা এবারে সাড়া দেবে; কিন্তু হঠাৎই যেন কি হ'লো রেবার! কেমন একটা আকস্মিক বিষণ্ণতায় সমস্তটা মন তার ছেয়ে গেল। বিজনের কথা মনে প'ড়লো। কী নির্ম্মম ভাবেই না তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সে! আজ এই শয্যার সাথী যদি তার বিজন

হ'তো—তবে কি সেও এম্‌নি ক'রেই রাত্রিটাকে মুখর ক'রে তুল্‌তো না? কবি নিজের কবিতা দিয়ে কি জাগিয়ে রাখতো না তাকে? ভাবতে গিয়ে চোখ দু'টো হঠাৎ কেমন ঝাপ্সা হ'য়ে এলো তার। দুই বিন্দু অশ্রু জ'মে উঠলো চোখের কোণে। দিলীপের তা দৃষ্টি এড়াল না। ব'ল্‌লো, 'এ কি, তুমি কাঁদ্‌ছো? এতখানি সিরিয়াস তুমি, জান্‌তুম না।'

বালিশেই চোখ দু'টো রগ্‌ড়ে নিয়ে রেবা বল্‌লো, 'কাঁদবো কেন! এমন সুখের রাত্রিতেও যদি কাঁদি, তবে হাস্‌তে পাবো কবে?'

দিলীপ বল্‌লো, 'মিথ্যে ব'লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, কিন্তু চোখ দু'টো যে খোলা, তাকে ঢাক্‌বে কি ক'রে?'

মুখে হাসি টান্‌তে চেষ্টা ক'রে রেবা বল্‌লো, 'এখুনি না আবৃত্তি ক'রছিলে, তাই ভাবছিলাম—নব জীবনের কূলে যাত্রা ক'রতে গিয়ে অতীত জীবনের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব'লেও তো কিছু আছে!'

—'চোখের জলই তবে তোমার সেই কৃতজ্ঞতা?' দিলীপ বল্‌লো, 'ইউরোপীয়ান মেয়েদের সঙ্গে এইখানেই তোমাদের পার্থক্য। তারা অতীতকে ছেড়ে আস্‌তে জানে, জানে ব'লেই আনন্দে তাদের বিষাদের ছায়া পড়ে না। তোমরা অতীতকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে সুখকেও খাঁটি সুখ ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারো না।'

রেবা এবারে অনেকটা সহজ হ'তে চেষ্টা ক'রলো।—'মেমদের কাছে সেখানেই যে আমাদের বৈশিষ্ট্য। ওরা চায় সবাইকে ছেড়ে সুখী হ'তে, আমরা চাই সবাইকে নিয়ে সুখী হ'তে। ভেবো না যে, তুমি বিলেত ঘুরে এসেছ ব'লে আমি অম্‌নি মেম হ'য়ে যাবো! তুমিই বা এমন কি সাহেব হ'য়ে এসেছ!'

বিরোধের বন্যা এবারে সাগরে এসে কূল পেল। দিলীপ আর এই নিয়ে কথা কাটতে গেল না। স্মিত হাস্যে রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লো, 'এসো, তারা দেখি; বেশ লাগ্‌ছে আজ আকাশের তারাগুলোকে। এম্‌নি ক'রে কোনোদিন যেন দেখ্‌বার অবকাশই ঘটে নি!'

কাছেই কোথাও থেকে বড় ক্লকের আওয়াজ শোনা গেল। রাত দু'টো। আরও কতক্ষণ যে তারা এম্‌নি করে পুষ্পিত বাসররাত্রিকে মুখর ক'রে জেগে রইল, বল্‌তে পারবো না। এ সময়ে মাণ্ডরার একটি নিভৃত গৃহের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই, তবে দেখ্‌তে পাই—একদিকে গভীর ঘুমে নাক ডাক্‌ছে নির্ম্মলার, অন্যদিকে একান্ত চিত্তে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চলেছে বিজন, জীবন আর গ্রন্থ সেখানে একসূত্রে গাঁথা। হেরিকেনে যে কখন্ তেল ফুরিয়ে সল্‌তে নিভে এসেছে, সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। [ক্রমশঃ

ভারতে ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়

অধ্যাপক শ্রীহিমাংশু রায়

গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রসার আশাপ্রদ হইলেও ইহার সাধারণ ভিত্তিকে কোনমতেই শক্তিশালী বলা চলে না। ১৯১৩ সালে ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যাঙ্ক, পিপল'স ব্যাঙ্ক, কাজ গুটাইতে বাধ্য হইলে অন্যান্য অনেক ব্যাঙ্ক ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে ৫৫টি ব্যাঙ্ক কাজ গুটায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে আবার কতিপয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর মন্দাকালীন পুনর্ব্বার অনেক ব্যাঙ্ককে কাজ গুটাইতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কাজ গুটাইতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যে ট্রাভাঙ্কর ন্যাশনাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাস পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম গুটাইবার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর	কাজ গুটাইবার ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
১৯১৪	৪৩	১০৯·১
১৯১৫	১১	৪ ৬
১৯১৬	১৩	৪·২
১৯১৭	৯	২৫·২
১৯১৮	৭	১·৪
১৯১৯	৪	৪·০
১৯২০	৩	৭·২
১৯২১	৭	১·২
১৯২২	১৫	৩·৫
১৯২৩	২০	৪৬৫·৪
১৯২৪	১৮	১১·৩
১৯২৫	১৭	১৮·৭
১৯২৬	১৪	৩·৯
১৯২৭	১৬	৩·১
১৯২৮	১৩	২৩·১
১৯২৯	১১	৮·১
১৯৩০	১২	৪০·৫
১৯৩১	১৮	১৫·০
১৯৩২	২৩	৭·৯
১৯৩৩	২৬	২·৯
১৯৩৪	৩০	৬·২
১৯৩৫	৫১	৬৫·৯
১৯৩৬	৮১	৪·৯
১৯৩৭	৬৫	১১·৫
১৯৩৮	৭৩	২৯·৯

১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৪৫ ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে যথাক্রমে ৮৬, ১০২, ৭৭, ৪৯, ৫১, ২২, ২৬, ২৭ ও ৩০টি ব্যাঙ্ক কাজকর্ম্ম গুটায়। পশ্চিম বঙ্গের কমিটি অব ষ্টেট ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন-এর মতে এক পশ্চিম বঙ্গেই ১৯৪৬-৫০ সালের মধ্যে ৫৫টি যৌথ ব্যাঙ্কের পতন হয়। ইহার মধ্যে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কও রহিয়াছে। এই ৫৫টি ব্যাঙ্কের মোট আদায়ী মূলধন ১, ৩৭, ৫০, ০০০ টাকা।

ভারতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম গুটাইবার মূলে বিবিধ কারণ বর্ত্তমান। ইহাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা চলে, গঠনমূলক সম্পর্কিত ও সাধারণ কারণসমূহ।

গঠনমূলক ত্রুটি-বিচ্যুতির মূলে রহিয়াছে ব্যাঙ্কিং আইনের অভাব বা অসম্পূর্ণতা। সুগঠিত ব্যাঙ্কিং আইনের অভাবের সুযোগে অনেক স্বল্প আদায়ী মূলধন বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসাধারণের অর্থ এমন সব সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হইয়াছিল—যাহা প্রয়োজন কালে বিক্রয় করা সম্ভপর ছিল না। তদুপরি

ঋণ বা দাদনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সিকিউরিটি রাখা হইত না এবং মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের অর্থ ফটকা কাজে ব্যবহার করা হইত। সম্পদের অনুপাতে দাদনের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে অধিক হইত। ঝুঁকি বিকেন্দ্রীকরণ নীতিও বিশেষভাবে অবলম্বিত হইত না। বলা বাহুল্য, ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে কাজ গুটাইতে হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ৮৬টি ব্যাঙ্ক কাজ গুটাইতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে ৩০টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ৫,০০০ টাকার কম এবং এই ৩০টি ব্যাঙ্কের ৩টি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ছিল ১,০০,০০ টাকা ও আদায়ী মূলধন ২,০০০ টাকার কম।

পরিচালনাও অশেষ ক্রটিপূর্ণ। ডাইরেক্টরদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া অনেক উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী বিনিয়োগ ও দাদন ব্যাপারে স্বীয় স্বার্থ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিয়া ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এইরূপ পরিচয় বিরল নহে। আভ্যন্তরীণ হিসাব-পরীক্ষা ক্রটিপূর্ণ বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী খারাপ ও সন্দেহজনক ঋণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন বা অপচয় পূরকের সঙ্গত ব্যবস্থা না করিয়া ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। আবার কোন কোন ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসের সংখ্যা অসঙ্গত রকম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাখা-অফিস তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাও সন্তোষজনক ছিল না।

সাধারণ কারণ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য জনসাধারণের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থার অভাব। উন্নত দেশে ব্যাঙ্ক সঙ্কট সাধারণতঃ সাধারণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ভারতে নিতান্তই গুজবের ফলে ব্যাঙ্ক সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যুদ্ধোত্তর মন্দা ও ভারত বিভাগকেও ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী করা চলে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের অসাধুতার জন্যও জনসাধারণ ব্যাঙ্কের উপর বিশেষ আস্থা সম্পন্ন নহেন। ব্যাঙ্ক সঙ্কট সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোভাবও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বেনারস ব্যাঙ্ক ও ট্রাভাঙ্কর ন্যাশনাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক অব কমার্স ও ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কাজ গুটাইতে বাধ্য হওয়ায় অনেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা ও ইহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ছিল ইহাদের সময়োচিত সাহায্য প্রদান করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্টের ১৭নং ধারা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড ব্যাঙ্কদের বিপদে সাহায্য করিতে বাধ্য, অবশ্য উপযুক্ত জামিনের বিরুদ্ধে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বলা হয়, উপযুক্ত জামিন না পাওয়াতে ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৭ সালে এক অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে এই ধারার কড়াকড়ি হ্রাস করা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিক হইতে তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ছিল পতনোন্মুখ ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দেওয়া। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধোত্তর মন্দা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার প্রাক্কালেই ইহার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্ট সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কদের বিপদে যথাযোগ্য সাহায্য করিবার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া উচিত ছিল

বিয়োগান্ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

হাজরা লেন-এর যে জায়গাটা ভেঙে-চুরে কল্‌কাতা ইমপ্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট নতুন রাস্তা বের ক'রছে, সেখান দিয়ে বড় একটা গাড়ি-ঘোড়া যাতায়াত করে না। অনেক সময় ছোট ছেলে-মেয়ে সব ইচ্ছামত খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়—হৈ-চৈ ক'রে পাড়ার পাঁচজনের কানমাথা জ্বালিয়ে তোলে। ইটের রক্ত-কদর্য্যতার মাঝে জায়গায় জায়গায় ব্যাকরণের অনুশাসন মুক্ত ছন্দঃপতনের মত খান্ ক'এক খোলার বস্তি আর টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর বাড়ি দীনভাবে পিঠ বাঁকিয়ে মাথা খাড়া ক'রে কোনমতে নিঃশ্বাসটুকু নিয়েই যেন বেঁচে আছে। আজ কেমন তাদের এ-শান্তি ভঙ্গ ক'রে একখানা দলছাড়া রোলস্-রয়েস্ গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছোটার মুখে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌লো।

পথের একটি পূর্ণগর্ভা হৃষ্টে কুকুরী দোকান থেকে ছুঁড়ে দেওয়া একখণ্ড মাংসের লোভে যেমন ছুটে রাস্তা পার হ'তে যাবে, অমনি গাড়িখানা সশব্দে তার উপর এসে পড়লো। দেহের সবখানি শক্তি দিয়ে ব্রেক্-এর উপর চাপ দেওয়ার এক শব্দ শোনা গেল, আর তারই ঝাঁকানি খেয়ে বিরাট যন্ত্রদানব ক্রুদ্ধ-গর্জ্জনে খানিকটা এগিয়ে নিশ্চল হ'য়ে গেল। পাঁচসাতটি বিকাশোন্মুখ রক্তপিণ্ড শাবকের সঙ্গে কুকুরীটি একেবারে দলিত-পিষ্ট হ'য়ে 'কেঁউ কেঁউ' শব্দে ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ জানিয়েই চিরতরে চোখ মুদ্‌লো।

ধনীর বিলাস চক্রতলে প্রাণ দিল অবজ্ঞাত হৃষ্টে এক পথের কুকুরী।

ষ্টিয়ারিং হাতে তরুণ চালক সেই দিকে একবার তাকিয়ে আবার গাড়ি সচল করার জন্যে ষ্টার্টারের উপর চাপ দিতেই পাশে উপবিষ্টা তরুণীটি তার হাত চেপে ধরলো। ক'এক গজ এগিয়ে গাড়ি আবার থেমে গেল। তরুণীটি ত্রস্তে নেমে এসে রক্তাপ্লুলিপ্ত কুকুরী আর পিষ্ট ভ্রূণকটির পানে নির্নিমেষে চেয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার তরল আঁধার বেদনাহত মনের পটভূমিকায় মলিন ওড়নাখানি বিছিয়ে দিয়েছে তখন। তরুণীর দুই চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু বোধ হয় চক্ চক্ ক'রে উঠলো। প্রসাধনে পরিশোভিত তার তন্বী দেহশ্রী হ'তে এতক্ষণ আভিজাত্যের সুরভি বের হয়ে আসছিল, কিন্তু, এবার যেন তার প্রকৃত সত্তাকে দেহের বাইরে টেনে এনে সকলের সামনে নির্ম্মোকহীন ক'রে মেলে ধরলো।

যুবকটি বল্‌লো—ওদিকে তাকিয়ে অমন দাঁড়িয়ে থেকে কি আর ক'রবে রেবা। যা' হবার তা'তো হ'য়ে গেছে, এবার এসো আমরা যাই।

রেবা অনড় পাথরের মত গাড়ির উপর বাঁ হাতখানি রেখে অপরূপ করুণাভরা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো, কথাগুলো হয়তো তার কানেই গেল না। যুবকটি তাকে একটু ঝাঁকানি দিয়ে সচেতন ক'রে বল্‌লো—এসো, রেবা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রেবা ধীর গতিতে গাড়িতে এসে বস্‌লো। খানিক আগে সে যেন ছিল পৃথিবীর অধিকর্ত্রী, আর এই মুহূর্ত্তেই হ'য়ে পড়লো দীন হ'তেও দীন। গাড়ি একটু এগোতেই সে অস্ফুটে বল্‌লো—আর ওদিকে নয়, বাড়ি ফিরে চলো।

ময়লা ফেলা গাড়ি এসে যথাসময়ে এ সব জঞ্জালরাশি সাফ ক'রে নিয়ে গেল, কেবল সাক্ষী দিতে পথের বুকে থাকলো ঘন একটা রক্তের দাগ, আর অন্য কোন এক স্থানে রেখে গেল সেই পরিমাপের প্রকাণ্ড এক চিড়—শত ঘর্ষণেও যে চিড়ের এতটুকু মুছলো না।

* *

কথাশিল্পী অশোক রায় মাত্র এইটুকু লিখেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। কোন্ পরিণতির দিকে গল্পের গতি

টেনে নিয়ে চ'লবে, এ যেন এক মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। দেওয়ালে টাঙানো 'পদ্মকরে বীণাপাণি'র প্রকাণ্ড ছবিটির দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে সামনের টেবিলে মাথা নামালো। খোলা জানালার ফাঁকে অপরাহ্ণ সূর্য্যের লোহিত বরণ শার্সির উপর এসে প'ড়েছে—সদ্য আগত বসন্তদিনের মোহময় শীতালি বাতাস বইতে শুরু ক'রেছে। কেয়ারিতে এনে রাখা রজনীগন্ধার গুচ্ছ—ভেসে আসে তার মধু-সুরভি। সহসা যেন সে-সুরভি মধুরতর হ'য়ে উঠলো। অশোকের চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো অপূর্ব্ব এক নারীমূর্ত্তি—জ্যোতির্ম্ময় মণির মতো তাঁর আয়ত চোখদুটি আভাযুক্ত, অসংবদ্ধ বেণী,—কালো চুলে সারা পিঠ ঢেকে দিয়েছে। কলম খসে গেল হাত থেকে, অশোক জিজ্ঞাসা ক'রলো—কে আপনি?

উত্তর দিল নারী—দুর্ভাগ্য আমার যে চিনতেই পারোনি। পরিচয় দিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার অভিলাষ আমার নেই আপাতত। শিল্পী তুমি, জেনে রাখো এইটুকু—আমার প্রকাশেই তোমার পরিচয়। আমি ছাড়া তুমি শিল্পী-সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়।

অশোক ঠিক বুঝতে পারলো না, বিহ্বলের মত কিন্তু সসম্ভ্রমে প্রশ্ন ক'রলো—কি চান্‌ আপনি এখানে? বুঝতেই পারছেন, বাজে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই এখন।

অপরিচিতা হেসে উত্তর দিল—তাই নাকি, এত ব্যস্ততার মাঝেও আমার জন্যে কিছুটা সময় খরচ করতেই হবে তোমায়, শিল্পী। আমার প্রশ্ন, তোমার এ-কাহিনীর শেষ কোথায়!

অশোক হেসে ব'ল্‌লো—সে-প্রশ্ন আমাকে না ক'রে এই কলমটিকে ক'রলে হয়তো কিছু কাজ হ'তো। লেখার মুখে এ-কলম যেখানে থামে সেইখানেই হয় লেখার পরিণতি। একটা উপলক্ষ্য নিয়ে কলমকে আমরা ছেড়ে দিই—এই মাত্র।

—ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না। দুর্গোৎসব কি পাঁঠার ইচ্ছামত সময়ের অপেক্ষায় স্থগিত রাখার ব্যবস্থা আছে? তোমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি কিছু কাজ করে না কলমের উপর—একথা আজ আমাকে বিশ্বাস ক'রতে বলো?

অশোক ব'ললো—কথাটা ঠিক তা' নয়। সাহিত্য প্রকাশ-ধর্ম্মী—প্রাণশক্তির পূর্ণতায় সে আপনার প্রকাশ পথে আপনিই মুখর হ'য়ে ওঠে। আমরা নিমিত্ত হ'য়ে মাত্র একটা কাঠামোর সৃষ্টি করি। প্রকৃত উদ্দেশ্য—রস-সৃষ্টি, যা আশ্রয় করে ঘটনার সংঘাতকে। এই দুইয়ে মিলে যখন এক বিরাট কিছু তৈরী হয়ে যায়, তখন আমরা নিজেদেরই সৃষ্টির দিকে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। পাঁচজনের সুখ্যাতিতে বুক ওঠে ফুলে।

অপরিচিতা ব'ললে—রসসৃষ্টির অজুহাতে যে-বিয়োগান্তের সৃষ্টি ক'রতে চলেছো, এক অসহায়া নারীর জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলার লোভে কলম উচিয়েছো, হয়তো তোমরা তাতে আনন্দ পাবে—পাঁচজনের বাহবা পাবে, কিন্তু কতো বড় অবিচার হবে তার ভরা বুকের ক্ষুধার উপর। তোমাদের আর্ট তো বলে, 'দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির বড়ো একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখ্‌লে চলে না, তাতে বাস ক'রতে হয়।' নিষ্ঠুর শিল্পী—তা যদি জান্‌তে—

অশোক আবার হাসে। জবাব দেয়—'নিষ্ঠুর শিল্পী'—স্ববিরোধী কথা, ফুলের থেকেও কোমল উপাদানে শিল্পীর মর্ম্ম গড়া। দূর থেকে মনে হয়, এরা প্রাণহীন, পাষাণ, কিন্তু এদের বুকের তলে ফল্গুর ধারা বন্যার মত ছুটে চলে, তার খবর কে রাখে! শুধু বাইরেরটা দেখে কাউকে বিচার ক'রতে নেই, তাতে পক্ষপাত দোষ ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা—আমাদের লেখনী করে নব নব বিয়োগান্তের সৃষ্টি, আর তারই বেদনা আমাদের বুকে হাহাকার ভ'রে তোলে।

অপরিচিতা বলে—সীতার বনবাসে রামচন্দ্র সারা-জীবন হাহাকার ক'রে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু তবু সে কি বিচার? ব্যথার সৃষ্টি ক'রে নিজে ব্যথাহত হওয়ার মধ্যে শিল্প থাকতে পারে, কিন্তু পৌরুষ নেই।

সৌরভ সহসা যেন মিলিয়ে গেল। * * *

* * * এতক্ষণ যে আনন্দ নিয়ে রেবা আর তার

স্বামী শেখর গাড়ি ছুটিয়ে লেক্‌-এর দিকে চলেছিল, এই হঠাৎ ঘটে-যাওয়া অনর্থপাতে সে-আনন্দটুকু কোন্‌খান দিয়ে যেন কর্পূরের মত উপে গেল। বিয়ের পর চারবছর কেটে গেছে—শেখরের শত অনুরোধেও রেবা কোনদিন একা তার সঙ্গে বের হয়নি। আজ হঠাৎ বোধ হয় বাধামুক্ত জোয়ার জলের মত আনন্দ-বন্যা ডেকে এসেছিল, তাই শেখর আপিস্‌ থেকে ফেরার আগেই সাজগোজ সেরে একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে বসেছিল রেবা, আর শেখর হাজির হ'তেই ড্রাইভারকে গাড়ি বের ক'রতে ব'লে নানা খুঁটিনাটি কাজে বাড়ির আর সবাইকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল—হতভম্ব শেখর বুঝতেই পারেনি, এত আনন্দের উৎস কোথায়! জিজ্ঞাসা করলো তাই—আজ যে এত ঘটা, ব্যাপার কি গো!

রেবা জবাব দিয়েছিল—আন্দাজ করো তো

যার কোন অর্থ হয় না, এমন সব কতকগুলো আজ-গুবি অনুমান ক'রে শেখর ব'লে চল্‌লো—মা আদর ক'রে একছড়া হার উপহার দিয়েছেন, বাড়ির মেনি বিড়ালটার তিনটি বাচ্চা হ'য়েছে—এমনি আরও কত কি। কিন্তু কোন অনুমানই ঠিক হ'লো না, কৌতুকময়ী রেবা তার কথায় হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। শেষে বল্‌লো—নাও, অনেক হ'য়েছে। বাইরে গিয়ে সব ব'ল্‌বো'খন, এখন কিন্তু কোন কথা নয়।

শেখর ব'ল্‌লো—ওরে বাবা, এ যে রীতিমত কাব্য-

'আজ শুধু কূজন গুঞ্জন,
তোমাতে আমাতে শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—'।

রেবা ব'ল্‌লো—বেহায়া। মা র'য়েছেন, চোখ নেই?—তারপর তা'র জামার আস্তিন ধ'রে টেনে বের ক'রে নিয়ে এলো।

আজ তার কম আনন্দের দিন নারী জীবনের চরম সার্থকতা ভাবী-মাতৃত্বের আস্বাদ আজই মাত্র সে জান্‌তে পেরেছে। সে-ও আর পাঁচজন মেয়ের মত মা হ'তে চ'লেছে। কোলে তা'র আস্‌বে ফুটফুটে, গোলগাল খোকা; ডাকবে তাকে 'মা, মা' ব'লে—শত আবদার আর অভিযোগে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌বে, মুখর হ'য়ে উঠবে তা'র এখনকারের নীরব মুহূর্ত্তগুলো—তবেই তো তা'র এ-জীবন ভ'রে উঠবে কানায় কানায়। এ-শুভ সংবাদ অনেক আড়ম্বরে, অনেক ভূমিকায় একান্তে আর স্বপ্নিল পরিবেশে স্বামীকে না জানালে চলে কেমন ক'রে! নদী যতই সাগরের দিকে এগিয়ে আসে, ততই সে শতখান হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় ছড়িয়ে পড়ে—আনন্দ-সাগরের অতল, অনুপ বার্ত্তা পেয়ে রেবাও যেন তেমনি ক'রে শতধারায় ফেটে প'ড়তে চেয়েছিল, কিন্তু লক্ষপতি যেমন ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্ব্বস্ব খুইয়ে না পারে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে, না পারে উপায় কিছু সন্ধান ক'রে নিতে, সেও তেমনি এ-বিপর্য্যয়ে মা পারলো সহস্র ধারায় অশ্রুকে ডেকে আন্‌তে, না পারলো কিছু বুঝে উঠতে।

এমনি আয়োজন ক'রেই আজ সে স্বামীকে সুখবরটা জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর প্রেমের চরম মুহূর্ত্তে কোথা হ'তে অজ্ঞাত শবর বাণ উঁচিয়ে ধরলো এ-বাণ এসে বিঁধলো অন্যভাবে—হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে একটি তৃতীয় প্রাণ হনন ক'রলো। উপলক্ষ্য তারাই—তাই, ফলস্বরূপ ঋষির উদ্যত অভিশাপ বজ্রের মত এসে পড়লো রেবা আর শেখরের শিরে। সে-দিনটি ছিল সোনার রঙে রঙিন, শৈবালের কোমলতায় স্নিগ্ধ হ'য়ে প'ড়লো—হঠাৎ মেঘের গ্লানিতে মলিন, পাঁকের ক্লেদে পঙ্কিল। রেবা থেকে থেকে শিউরে ওঠে—যে-শিশু স্বপ্নিল পথে সর্ব্বাঙ্গে কাদা ধূলা মেখে দূর থেকে হামা দিয়ে কচি হাত দু'টি বাড়িয়ে আধো আধো স্বরে তাকে 'মা, মা' ব'লে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আস্‌ছিল, হঠাৎ এক ভূমিকম্পের বিরাট মোচড়ে ধরণী সে-শিশুকে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেল্‌লো, শত চেষ্টায়ও সে তা'র হদিস্‌ খুঁজে পেলে না—স্মৃতির সাক্ষ্য দিতে রইলো শুধু একটি প্রকাণ্ড চিহ্ন।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শেখর দেখলো, রেবা বিছানায় নেই। চকিত হ'য়ে সে ডাকলো—রেবা!—সাড়া নেই। আবার ডাক্‌লো—রেবা!

সে স্বর ঘরের চার-দেওয়ালের মধ্যেই অনুধ্বনিত হ'তে লাগলো। শেখর ত্রস্তে আলো জাল্‌লো—শূন্য ঘর। ছুটে বাইরে এলো—বারান্দার এক কোণে রেলিং-

এর উপর ঝুঁকে কে না দাঁড়িয়ে! রেবাই তো বটে, যাক্ বাঁচা গেল। শুক্লা নবমীর অস্তগামী চাঁদের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না তার মুখে এসে প'ড়েছে—বড়ো স্নিগ্ধ দেখায় তাকে; কএক ঘণ্টার ব্যবধানে তার শরীরের সব রক্তটুকু কে যেন নিঃশেষে নিংড়িয়ে নিয়েছে, গোলাপী গণ্ডদুটো ছাই-এর মত শাদা হ'য়ে গেছে। গভীর স্নেহে শেখর তা'কে কাছে টেনে বেদনাহত কণ্ঠে ডাকলো—রেবা।

খানিক পরে অশ্রুপূরিত কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল-কেন গো!

শেখর ব'ল্লো—এমন ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সব কথা আমাকে খুলে বলো। —তা'কে নিয়ে সে ঘরে এলো। কাছে বসিয়ে আবার বললো—কি হ'য়েছে তোমার? কিছু লুকিয়ো না আমার কাছে, লক্ষিটি।—তা'র মাথাটি বুকের কাছে নিবিড়তর করে আন্লো।

তা'র এ আদরে রেবা উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ আর ধরে রাখতে পারলো না। কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডুকরে উঠলো—ওগো, খোকা যে আমার কাছে আর আসবে না গো—

শেখর অবাক হয়ে গেল। তার শরীরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে ব'ল্লো—কি ব'ল্ছো তুমি, রেবা। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না, কোথায় তোমার খোকা?

রেবা তেমনি থেকেই জবাব দিল—তুমি বুঝ্‌বে না গো, খোকা এসেছিল,—সে ফিরে গেল। আমি মা হ'য়েও তা'কে ধ'রে রাখতে পারলুম না।

খানিক চুপ থেকে শেখর যেন বুঝতে চেষ্টা করলো ক'দিন থেকে সে রেবার মধ্যে ভাবী-মাতৃত্বের চিহ্ন লক্ষ্য ক'রছিল, কথাটা সত্যি কিনা জিজ্ঞাসা করবে মনে ক'রেও তা' হয়ে ওঠেনি সুযোগমত। আজ তা'রই মত অন্তর্বত্নী পথ-কুকুরীর হত্যার কারণ নিজেকে মনে ক'রে তার ভাবী-সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে এতখানি কাতর হ'য়ে প'ড়েছে, এতক্ষণে তা বুঝতে পারলো। হয়তো-বা সন্তানের আগমন সংবাদটি তাকে জানাবার জন্যেই এত ঘটা ক'রে নিরালায় যাবার প্রয়োজন হ'য়েছিল। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা যে নারীর কাছে কতোখানি, শেখর আজ তার খানিকটা অনুমান ক'রতে পারলো। ব্যথিত কণ্ঠে সে ব'ল্লো—যা হ'য়ে গেছে তার প্রতীকার করার হাত তো আমাদের নেই, রেবা। ঐ নিয়ে কেঁদে কেঁদে তোমার খোকার অমঙ্গল আরও ভারি ক'রে তুলো না। অনেক রাত হ'য়েছে—একটু ঘুমিয়ে নাও।

রেবা তেমনিই পড়ে থাকলো। সে যে এতটুকুও আশ্বস্ত হয়েছে, তা মনে হ'লো না। ভাবী আশঙ্কার উচ্ছ্বাস এইভাবে কান্নার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হ'য়ে গেলে ব্যথাটা খানিক উপশম হ'তে পারবে মনে ক'রে শেখর তা'কে তেমনই থাকতে দিয়ে গভীর স্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

জীবনের ভাঙ্গা গড়ায় পরিবর্ত্তিত, কোথাও বেদনায় ব্যথিত—কুহেলির সংঘাতে কোথাও মুখর মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তের পর দিন, দিনের পর মাস নিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। অপরিপূর্ণতার সীমানায় অচলায়তনের ছেদ টেনে দেয়। আগে ছিল শরতের ছায়াশীতল প্রভাত আর সন্ধ্যা, রেবা ও শেখরের জীবনকে ঘিরে নিয়ে, এইবার আগত দিন যেন কুয়াসা-হিম-প্রপীড়িত রাজত্ব ক'রে যাবে দুরন্ত শীত।

দেখতে দেখতে ক'টা মাস কেটে গেছে। ডাক্তারের উপদেশ মত শেখর রেবাকে প্রফুল্ল রাখার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু শত চেষ্টাকে বিফল প্রতিপন্ন ক'রে রেবার শরীরের আর মনের উপর কালো-কালো দাগ রেখে যাচ্ছে—কালের যাত্রার স্পর্শ। শেখর বড় ভাবনায় পড়ে গেল। আজ রাত থেকে তা'র একটু জ্বরের মত হ'য়েছে যেন। সে নিষেধ ক'রলো—বাইরে এসে কাজ নেই, নিত্য করণীয় সব বন্দোবস্ত ঘরের মধ্যেই ঝিয়ের সাহায্যে সেরে নেওয়া যেতে পারে। রেবা সে-কথা শোনেনি—কি-কাজে একটু বের হ'তেই সে নিজের ইচ্ছামত বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে সশব্দে আছড়ে প'ড়লো সিঁড়িতে।

সংজ্ঞাহারা অবস্থায় ধরাধরি ক'রে এনে বিছানায় শোওয়ানো হলো তখনই। ডাক্তার আর নার্স-এ ভ'রে গেল বাড়ি—সর্ব্বত্র সে কি থম্‌থমে ভাব। কখন কি হয়,

কখন কি হয়! জ্ঞান ফিরলো ঘণ্টা দুই পরে কিন্তু তখন অসহ্য যাতনা শুরু হ'য়েছে। যমে ও মানুষে বহুক্ষণ টানা-টানির পর রেবা জীবন ফিরে পেলো বটে, কিন্তু তা'র বহু আকাঙ্ক্ষিত যে-শিশুটি ভূমিষ্ঠ হ'লো, সে চোখ মেলে একবারও পৃথিবীর রূপ দেখার সুযোগ পেলে না। এত কষ্টের মাঝেও জ্ঞান হ'তেই রেবা যেন কিসের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। শেখর প্রস্তুত ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ফেললো এক নিঃশ্বাসে—এত ব্যস্ত কেন, রেবা! তোমার খোকা তোমারই আছে, ভয় নেই, তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

স্বস্তিতে রেবা চোখ বুঁজলো, আর শেখর জামার হাতায় চোখ মুছলো।

আরামে তখন রেবা চোখ মুদ্‌লো বটে, কিন্তু খানিক পরেই সে সোয়াস্তি রুদ্ররূপে প্রকাশ পেলো। স্বভাব সুন্দর তার আয়ত চোখের সে দৃষ্টি আর নেই। এখন তা রক্তজবার মত লাল—যেন ঠিকরিয়ে বের হ'তে চায়। প্রয়োজনের বেশী কথা সে কোনদিন ব'লতো না—এখন তার বাধামুক্ত বাক্যস্রোতের সামনে দাঁড়ায় কে! সব কথাই কিন্তু তার খোকার দুঃখ সুখ, হর্ষ বিষাদ নিয়ে। কখনো বলে—লক্ষ্মী সোনা আমার, আর দুরন্তপানা ক'রো না—আমি যে আর পারি না। কতো স্নেহের অভিযোগ, কতো আকুলতা। আবার কখনো রুদ্র-দানবী মূর্ত্তি—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? দূর করে দাও, দূর করে দাও—কেন আসবে ওরা? আমার খোকাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? ইস, মেরে চামড়া গুটিয়ে দেবো না।—খোকা, মাণিক আমার, ওদের কাছে যেও না, ওরা তোমায় বাঁচতে দেবে না। রাস্তায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িচাপা দিয়ে মারবে।

এসব কথার অর্থ শেখর ভালো করেই বোঝে। এত দিন সে যে সন্তানের ভালো মন্দ নিয়ে রাতদিন কল্পনায় অনুধ্যান করেছে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ। ক্রমে শ্বাসকষ্ট দেখা দিল, ডাক্তার অক্‌সিজেন ব্যবস্থা ক'রলেন।

সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে লঘু পাখায় ভর ক'রে অন্য সব দিনেরই মত। সারা দিনই আকাশে দু'এক খণ্ড মেঘ ছিল, এখন ঘন কালো একখানা দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন ক'রে মাথা তুলতে লাগলো। সঙ্গে তার বাতাসের স্বনন্। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আসছে স্তিমিত হ'য়ে। হঠাৎ—* * *

* * * কলম থেমে গেল। এই মামুলি কহিনী রচনার সার্থকতা খুঁজে পেলে না অশোক। কলম রেখে আবার টেবিলে মাথা নোয়ালো সে।

আবার সেই অপূর্ব্ব সৌরভ। শিয়রে কার করস্পর্শে চমকে উঠলো অশোক—কে? দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে সেই রমণীমূর্ত্তি, মুখে সেই সূক্ষ্ম হাসিটি, কিন্তু একটু যেন ম্লান তা' এখন। বললো সে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমায়? যাক্, তাতে কিছু যায় আসে না। একটু থামো, সমাপ্তি টেনো না তোমার কাহিনীর। আমার কিছু বলার আছে।

—কি বলতে চান, বলুন। অশোক কোমল হয়ে আসে।

—তখন না বড়াই করেছিলে রসসৃষ্টির? এইখানে সমাপ্তি রেখা টানলে কি রসসৃষ্টি হ'তো তোমার, আমার বুদ্ধির তা' অগম্য। তার চেয়ে একটু সুবিচার করো না কেন। তাকে বাঁচাও, আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হোক কানায় কানায়। চাঁদের মতো খোকা আসুক তার কোল জুড়ে—

অশোক তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—কচি দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ডাকুক—মা, মা গো। এই তো?—

—ঠিক তাই। এটুকুর জন্যেই সে যে পাগল গো—

পরিহাস করে অশোক বললো—তারপর?—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি—

—বিদ্রূপ রাখো। তোমার প্রাণে কি এতটু মায়া নেই। বুভুক্ষিত জীবন নিয়ে কথার ছিনিমিনি খেলে কি যে তোমার আনন্দ! শোন অনুরোধ আমার—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে চাপিয়ে মৃত্যুর যাতনা তার বিষাক্ততর করো না। তার চেয়ে বরং—

—কি তার চেয়ে?

—এক কাজ করো। তার খোকা বড় হোক, কিছু দিন রেখার মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ হোক। তার পর একদিন খোকার অসুখে তার আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলে তাকেই তখন জগৎ থেকে—

—বাঃ, খুব সহানুভূতি দেখালেন তো। বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে বিষ দিয়ে মারা—ম্যাকবেথ নতুন করে সুরু করবো নাকি? একেই তো বলে art for art's sake. এই আপনার উপলব্ধি হতে পারে, কিন্তু রেখার জীবনের চেয়ে আমার কাছে সত্য যা' তাকে ফরমাস মত গড়তে পারবো না। আমার সত্য আপন গতিপথে দুর্বার—

—আর একটা আইডিয়া মনে এসেছে; শোন—তা'র সে ছেলে আরও বড় হোক। রেবা তাকে রাখুক তার আঁচলটুকু দিয়ে ঘিরে ঘিরে—চোখের আড়াল করবে না সে কোন সময়েই। হঠাৎ এক অসতর্ক ক্ষণে ছেলে তার পথে বের হয়ে আসুক, তারপর তোমার সে রোলস্ রয়েস খানা তো কলমের ডগায় রয়েছেই।

—বাকিটুকু শেষ করুন এবার। সে সংবাদ শুনে রেবা ছুটে আসুক খোকার মরণশীতল দেহখানির পাশে। আছড়ে পড়ুক বুকে সংজ্ঞাহারা হয়ে—যে সংজ্ঞা কোনদিন আসবে না ফিরে আর।—এক সাথে মা আর ছেলে—ধূ ধূ করে জলে উঠবে চিতাবহ্নি। ট্রাজেডির আগুশ্রাদ্ধ হয়ে যাবে—সেক্ষপীয়র হার মানবেন আমাদের কলমের মুখে।

—আবার বিদ্রূপ। আর্টকে তোমরা যত বড় ক'রেই ভাবো না কেন, তা শুধু মনের বিলাস ছাড়া আর কি? মানুষেরই হাসিকান্না নিয়ে তার হিসাবনিকাশ—একটা প্রাণপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে কবিত্ব করা যায়, কিন্তু তা'তে তার কামনা পূর্ণ হয় না। তোমরা আদি কবির 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ' নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করো, কিন্তু প্রিয়বিরহসন্তপ্ত—ক্রৌঞ্চীর দুঃখে একবিন্দু চোখের জল খরচ ক'রতে চাও না। এই তোমাদের আর্ট। তপ্ত লোহায় হাত বুলোলে তা ঠাণ্ডা হয় না, তার মেজাজ নামাতে চাই—জল। বুঝলে সাহিত্যিক?—

অশোক খানিক ভেবে ব'ল্লো—আপনার যুক্তি মানি। কিন্তু নিরুপায় আমি। রেবাকে বাঁচানো যায়, তা হবে যে আরও মর্মান্তিক—

অপরিচিতা আগ্রহভরে বলে—কি হবে তা, বলো বলো—

অশোক বলে—তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না। অন্ধকার পটভূমিকায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবো তা'র জীবননাট্যের শেষ পাতায়—। একটু দাঁড়িয়ে দেখুন তার জীবনের পরিণতি কোন পথে টানি—

খস্ খস্ ক'রে শেষ তিনটি অনুচ্ছেদের উপর লম্বা রেখা টেনে অংশটুকু বাদ দিয়ে অশোক আবার লিখে চলে। *

* * খানিক পরে রেবা আবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে—খোকা কোথায়?

শেখর জিহ্বায় কৃত্রিম শক্তি প্রয়োগ ক'রে বলে—সে নার্স-এর কাছে ঘুমোচ্ছে, রেবা। একবার দেখবে তুমি তাকে?

রেবা বল্লো—ঘুমোচ্ছে? তবে থাক, ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই।

শেখর বলে—আর তুমিও একটু সুস্থ হয়ে ওঠো, তা'হলেই তাকে তোমার কাছে এনে দেবো, কেমন?

এবার যেন সত্যিই সে নিঃশঙ্ক হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শেখর আশ্বাস দিয়েছে, তার খোকা ভালোই আছে, সে নিজে সেরে উঠলেই তাকে কোলে পাবে, এই সান্ত্বনাই যেন তাকে জীবন ফিরিয়ে দিল—সারাদিনটি সে আরামে বড়ো ঘুমটাই ঘুমিয়ে নিলো।

রেবা ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠছে—শেখর কত আনন্দেই না আবার সংসার সাজানোয় মন দিয়েছে, তা'কে ঘিরেই তো সব কিছু। কিন্তু মাঝে মাঝে তা'র খোকাকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা, তার অনুযোগ শেলের মত বুকে বিঁধতে থাকে।—এই তো আমি ভালো হ'য়ে উঠেছি গো, একবার দাও না এনে খোকাকে। আমি মা—চোখের দেখাও কি পেতে নেই আমার? এত নিষ্ঠুর হ'লে তুমি কি ক'রে?—অনেক ভুলিয়ে প্রবঞ্চনা ক'রে ডাক্তারের নিষেধ জানিয়ে তাকে নিবৃত্ত রাখতে হ'য়েছে —এ-দাহ তাকে পুড়িয়ে খাক ক'রে দেয়। কতদিনই-বা

এভাবে ফাঁকি দিয়ে রাখা যাবে, শেখর তা' ভেবে পায় না।

অনেকদিন পর রেবা আজ ঘর থেকে দু'পা হেঁটে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের রঙের হোলিখেলা—দু'এক খণ্ড মেঘের সীমন্তে কে যেন তা সযত্নে আরও গাঢ় ক'রে লেপে দিয়েছে। চঞ্চল বাতাসে তার এলোমেলো চুলগুলো উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির মহাসৌন্দর্য্যের এই উদার পরিসর বড় ভালো লাগে। আকাশের রঙ এমন নীললোহিত, বাতাস এমন অলস-বিহ্বল, ঘন বিন্যস্ত বড় বড় বাড়ির শীর্ষে সৌরকর এমন বিসর্পিত বুঝি সে কোনদিন দেখেনি।

শেখর এক এক লাফে দুই তিনটি সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে এসে সামনে তাকে দেখেই হেসে ব'ল্‌লো—বাঃ, এই তো বেশ বাইরে আস্‌তে পেরেছ। একবার হাওয়া খেতে বেরোবে নাকি? গাড়ি বের করতে ব'ল্‌বো?

কথাটা ব'লেছিল এমনি খেয়ালের বশে, কিন্তু এ-পরিহাস রেবার ক্ষতস্থানে নতুন ক'রে আঘাত হান্‌লো। মুহূর্ত্তে মুখ তার ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। শেখর দেখেই বুঝলো, অসাবধানতায় আজ সে মহা ভুল ক'রে বসেছে। কথাটা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করলো—সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, ঠাণ্ডা লাগানো আর উচিত হবে না, রেবা। তাই বলছিলাম। এসো, ঘরে এসো—

বড় সুন্দর সন্ধ্যাটা বিশ্রীরকম কটু হ'য়ে গেল। খানিক পরে কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ জমে আকাশটাকে ছেয়ে ফেল্‌লো। মুষলধারে বৃষ্টি নামলো ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। চোখ বুজে শুয়ে ছিল রেবা। হঠাৎ ব'লে বস্‌লো—খোকাকে এনে দাও, আজ আমি কিছুতেই তাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।

শেখর অনুনয় ক'রে বলে—আজ রাতটা যেতে দাও, রেবা। তোমার শরীরটা আবার বোধহয় খারাপ হচ্ছে আজ,—কাল তুমি তাকে নিও'খন।

ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে রেবা বললো—না গো না, আমার আর কোন অসুখই নেই। তোমার পায়ে পড়ি, একবার তা'কে এনে দেখাও আমাকে।

এতদিনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আর কতদিন 'নাইকে আছে' ব'লে চালানো যায়। অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাজিত সে তাড়াতাড়ি তার কথা শেষ ক'রে ফেললো—খোকা আমাদের কোনদিন ছিল না, আজও নেই রেবা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাদের ছেড়ে গেছে।

রেবা তবুও একবার বললো শেষ আশাটুকু নিয়ে—তবে, তবে যে—

জবাব দিল শেখর—হ্যাঁ, সব কথাই মিছে—

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যেন সারা পৃথিবীটা দুলে দুলে উঠলো, খড়মড় শব্দে দরজা জানালাগুলো ভেঙে পড়লো বুঝি। একবার শুধু তার মুখ দিয়ে আর্ত্তস্বর বের হয়ে এলো—মা গো!—তারপর নিশ্চল পাথরের মত পড়ে থাকলো, নিষ্ঠুর বজ্রাঘাতে বুঝি চেতনাটুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে।

গভীর রাত। মাথার কাছে নীল কাগজে আড়াল করা আলো, চেয়ারে বসে কি প'ড়তে প'ড়তে বোধহয় শেখর ঘুমিয়ে গেছে, পিছনের দিকে মাথাটা পড়েছে ঝুলে। রেবা উঠে বসলো।

কি ভেবে জানালার কাছে গিয়ে টেনে তা খুলে ফেল্‌লো—এক ঝট্‌কা বৃষ্টি তার বুক-মুখ ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আকাশ বাতাস তখন উদ্দাম হয়ে প্রলয় মাতা-মাতি শুরু ক'রেছে। প্রলয়ের দেবতা বুঝি হাজার বাহু মেলে গাছপালা বাড়িঘরের মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে গুঁড়িয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প। বৃষ্টি বাতাসের সেই স্বননের মাঝে দূরাগত এক অস্পষ্ট কান্নার সুর শুন্‌তে পেলো রেবা। সব ইন্দ্রিয়গুলোকে ঘাড় ধরে কানের কাছে জড়ো ক'রে সেই স্বর শোনার জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো সে। এবার ডাক শুন্‌তে পেলে—ওমা, মা গো!

তার চোখদুটো থেকে আগুন ঠিকরিয়ে বের হ'তে লাগলো। আবার ডাক শুন্‌লো—ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ফেল্‌লো। আবার সেই করুণ কণ্ঠের আর্ত্ত-আহ্বান—ও মা, মা গো! ও মা, মা গো!!

* * * অশোকের সামনের অপরিচিতা নারীটি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো—না না, আর না। একি পরিণতিতে আন্‌লে তোমার নায়িকাকে, নিষ্ঠুর—

নিষ্ঠুর তুমি, থামো—। অবরুদ্ধ কান্নায় বুক তাঁর ওঠা-নামা করতে লাগলো, লম্বা চাঁপার কলি আঙুলের ফাঁকে অশ্রুর মুক্তাবিন্দুগুলো টল্‌টল্‌ ক'রে উঠলো—এ আমি সইবো কেমন ক'রে! তোমার রসসৃষ্টি নিয়ে থাকো তুমি। আমি চললাম—। ঝড়ের গতিতে মূর্ত্তি নিষ্ক্রান্ত হলো। কলম সমাপ্তির দিকে আগিয়ে চ'ললো—।*

* * * রেবা চীৎকার ক'রে সাড়া দিল—খোকা, ডাকছিস্‌ আমায়, বাবা?

আবার সেই কণ্ঠ—ও মা, মা গো!!

রেবা ক্ষিপ্র গতিতে এক এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে উত্তর দিল—একটু দাঁড়া, বাবা, এই যে আমি—

সদর দরজার কাছে আবার ডাক শোনা গেল—ও মা, মা গো!

শরীরের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে রেবা বন্ধ দরজা খুলে ফে'ল্‌লো। আবার সেই ডাক—ও মা, মা গো! ও মা, মা গো!!

সেও উত্তর দিল—খোকা, এই তো আমি এসেছি, বাবা। ভয় কি তোমার—?

সে উত্তর অনন্তে মিলিয়ে গেল। ঝড় ও বৃষ্টির রুদ্র-মাতনের মাঝে বিকৃত মস্তিষ্ক রেবা সেই নীরন্ধ্র-অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল…।

মৃত্যু

শ্রীকরুণাময় বসু

শরতের ছল-ছল পূর্ণিমা রাত্রি,
নরম ভিজে ঘাসের উপর শিশির বিন্দু ঝরে পড়ছে,
টুপ টুপ টুপ।
নিঃশব্দ নিশুতি রাত্রি,
খাল বিলের জলে ম্লান নক্ষত্রের ঝিকিমিকি।
গ্রাম পেরিয়ে খানিকটা দূরে চলে গেলাম,
অতি নির্জ্জন বিস্তীর্ণ মাঠের সীমানা,
ঢালু বালুতটের নীচে সরু আলের পথ,
নরম ভিজে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ছে,
টুপ টুপ টুপ।
মুহূর্ত্তের জন্য মনে হ'ল এখানে সময়ের নদী
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে,
হারানো মুখ, হারানো কালের সুখ-দুঃখ
আবার জেগে উঠল কোজাগরী পূর্ণিমার
জোয়ারের মুখে;
ক'দিন আগে এইখানে নরম মাটির নীচে
ছোট খোকনকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে
রেখে গেছি।
সে আছে, আছে, এইখানেই আছে;
কোন কালের জন্যই সে আর হারিয়ে যাবেনা,
অনন্তকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইল এই ক্ষুদ্রতম
ইতিহাস,
এই দু'দণ্ডের অশ্রুজল,
কান্নায় যে এত আনন্দ আগে তা কি জানতাম?
মৃত্যুর অন্তরালে যে এত বিস্তীর্ণ মুক্তির অবকাশ,
আগে তা' বুঝিনি।
সোনা আমার, মাণিক আমার,
মধ্যবিত্ত বাপের অপরিসীম দারিদ্র্যের উপর
তোমার অপার করুণা, আশ্চর্য্য স্নেহ,
তাই তুমি তাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়ে গেলে।
তোমার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি,
অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করেছ,
তবু এই নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থাকে তুমি হাসি মুখে
ক্ষমা করে গেলে।
এই নরম মাটির উপর গজাবে নতুন ধানের চারা,
ভোরের শিশিরে, পরন্ত রৌদ্রে আন্দোলিত হ'বে
সবুজ ধানের শীষগুলো—
লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা ও আনন্দ নিয়ে,
যে নরম মাটির নীচে বিকীর্ণ রয়েছে
আমার মৃত পুত্রের কংকাল।

মিশর ও সুদান

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শৃঙ্খল মোচনের ইতিহাস, দুঃসহ নিপীড়ন ও নিষ্ঠুর দমননীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের ইতিহাস। সেই প্রতিবাদের ঢেউ একদিকে যেমন পুরাতনকে ভাঙছে, অন্যদিকে তেমনি আবার নতুনকে গড়ছে। তাই প্রাচ্যখণ্ডে আজ সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের সংগ্রাম চলেছে। আজ বিশেষ ক'রে মধ্যপ্রাচ্যের ঐসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে একটা নবজাগরণের জোয়ার দেখা দিয়েছে। সেই জোয়ারের জলধারার চাপে জীর্ণ, নোনাধরা সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীর কোথাও ধ্বসে পড়ছে, কোথাও বা ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

মিশর, সুদান ও ইরাণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তো ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ সুরু হয়ে গেছে। এই কয়টি অঞ্চলেই বৃটিশ স্বার্থে আঘাত লেগেছে। আবার এই তো সেদিন জর্ডানের রাজা আবদুল্লা আর ইরাণের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল্ আলি রাজমারা আততায়ীর হস্তে নিহত হ'লেন। দু'টি ঘটনাতেই বৃটিশ প্রমাদ গণনা করলো। মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাবের ভিৎ ক্রমেই টলমল ক'রে উঠছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিণ স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে রাজমারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আর রাজা আবদুল্লাকেও বলা চলে বৃটিশের দালাল। আরব জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে কোনদিনই সুনজরে দেখে নি। এমনি ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বত্র বৃটেন উত্যক্ত হয়ে উঠেছে, কোথাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছে না। তাই গত কয়েক দশক ধ'রে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলির শিরঃপীড়ার অন্ত নাই।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাছে রুশ প্রভাব প্রসার লাভ করে, এজন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তো বরাবরই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'নিকট-প্রাচ্যে কম্যুনিজম' শীর্ষক যে রিপোর্ট পেশ করে, তা'তে স্পষ্ট ভাবেই ইরাণ, তুরস্ক ও মিশর সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

মিশরের সঙ্গে সুদানের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এই মিশর ও সুদান আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্বে নীল নদের অববাহিকায় মিশর অবস্থিত। মিশর স্বাধীন হ'লেও বৃটিশের আশ্রিত। মোট আয়তন প্রায় ৩,৮৬,১৯৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯,০৮৭,৩০৪। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তুলা। এ ছাড়া গম, ভুট্টা, চাউল, পেঁয়াজ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

সুদান ব'লতে এখন আমরা ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানকে বুঝি। কিন্তু আগে সুদান আরও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। সাহারার দক্ষিণস্থ সমগ্র অঞ্চলটিকে বলা হ'ত সুদান। ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের আয়তন ৯,৬৭,৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৪৭ সালের হিসাব মত ৭৫,৪৭,২০০। নীলনদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ মিশরের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অবশিষ্টাংশ সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এজন্য মিশর ও সুদানের মধ্যে বরাবরই একটা যোগাযোগ বর্ত্তমান।

১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তির পরিবর্ত্তন আর সুদানকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী নিয়েই মিশরের বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৪৬ সাল থেকে এই চুক্তি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে আলোচনা চলছে। বৃটেন চুক্তির পরিবর্ত্তন ইচ্ছা ক'রলেও সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে বৃটেন সৈন্য অপসারণ ক'রতে রাজী নয়। বৃটিশ সৈন্য না থাকলে নাকি মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা রসাতলে যাবে, এই তার যুক্তি। কিন্তু খাল অঞ্চল থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারিত না হ'লে মিশর কারও সঙ্গে কোনরূপ রক্ষা-চুক্তি ক'রতে প্রস্তুত নয়। ১৯৪৬ সালে চুক্তি পরিবর্ত্তনের

মিশরীয় ফ্রেস্কো বা দেয়াল-চিত্র (বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত)

আলোচনা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু পরবৎসরই তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে আবার আলোচনা সুরু হয়ে গত আগষ্টে ব্যর্থ হয়। মিশরের জনসাধারণও চুক্তি বাতিল করার জন্য সরকারকে যথেষ্ট চাপ দেয়।

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে কায়রো থেকে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা ঘোষণা করলেন যে, মিশর সরকার ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তি ও ১৮৯৯ সালের সুদান যৌথ শাসন চুক্তি বাতিল করেছে। প্রধান মন্ত্রী মিশরের রাজা ফারুককে সুদানের রাজা ব'লে ঘোষণা করলেন এবং আরও জানালেন যে, সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য আর কোন সুবিধাদি পাবে না।

বৃটেন কিন্তু মিশরের এই ঘোষণাকে মেনে নিল না। '৩৬ সালের চুক্তির পরিবর্ত্তে অন্যকোন চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য রাখার সিদ্ধান্ত তারা করলো। মিশরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ। মধ্যপ্রাচ্যরক্ষা সংস্থায় যোগদানের আহ্বান মিশর প্রত্যাখ্যান করলো। বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবীতে তারা রইল অটল।

সুয়েজ খাল থেকে সমস্ত বিদেশী শক্তিকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারবে, এ বিষয়ে মিশর হয়ত সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়। তবে তারা যে চাপ দিচ্ছে তার মূলে একটা কূটনৈতিক চাল আছে বৈ কি!

আমরা সুদানেরই ইঙ্গিত করছি। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুদান মিশরের হাতছাড়া হয়। সে ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা ক'রছি। সুদানে এখন পুরোপুরি বৃটিশ শাসনই চলছে বলা যায়। তবে সুদান যৌথ শাসন চুক্তিতে সুদানে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে মিশরকেও কিছু সত্ত্ব দেওয়া আছে। মিশর ১৮৯৯ সালের চুক্তি বাতিল করেছে আর সেই সঙ্গে মিশরের রাজাকে সুদানের রাজা ব'লে ঘোষণা করেছে। সুদানে অন্য কারও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, মিশর তা চায় না। এর অন্যতম প্রধান কারণ

নীল নদ। নীল নদের জল মিশরের প্রাণ। এই নদীর উৎস সুদানে। কাজেই সুদান থেকে নীলের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব। সুদান ব্যতিরেকে মিশর বাঁচতে পারে না। সুদান যারই অধীনে থাকুক না কেন, মিশর তার দাস হয়ে থাকতে বাধ্য হ'বে। এই জন্যেই মিশর চাপ দিচ্ছে।

এর পরের অধ্যায়ের সূচনা হ'ল মিশরীয় ও বৃটিশ ফৌজের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে। মিশরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হ'ল। অধিক সংখ্যায় বৃটিশ সৈন্য প্রেরণ আরম্ভ হ'ল। স্নায়ুযুদ্ধের পরিণতি হ'ল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।

এই হ'ল মোটামুটি মিশর-সুদানের বর্ত্তমান পরিস্থিতি। কিন্তু বর্ত্তমানকে উপলব্ধি করতে হ'লে অতীতের সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই অতীত ইতিহাসের গোটাকয়েক পাতা এখানে তুলে ধরা হ'ল।

প্রাচীন কাল থেকেই ইউরোপীয়রা মিশরকে 'ঈজিপ্ট' নামে অভিহিত ক'রে আসছে। কিন্তু প্রাচ্যখণ্ডে এই দেশের নাম পরিবর্ত্তনের মূলে আছে বাইবেল। বাইবেলে উল্লিখিত হামের (Ham) বংশধর মিসরেইমের (Mizraim) নাম থেকেই মিশর নামের উৎপত্তি হয়েছে।

খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্য্যটক হেরোডোটাস যখন মিশরের মাটিকে নীল নদের দান ব'লে বর্ণনা করেছিলেন, তখন তিনি হয়ত জানতেই পারেননি যে অতি বড় একটি সত্যকেই তিনি প্রকাশ ক'রে গেলেন। বর্ত্তমানে স্পষ্ট-রূপেই প্রমাণিত হয়েছে যে, মিশরের জমির একটা বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে নীল নদের জলপ্রবাহের দ্বারা। সুদান ও আবিসিনিয়ার পর্ব্বতমালা থেকে পলিমাটি এনে নীলনদ এই দেশের বিভিন্ন স্থানে দিয়েছে ছড়িয়ে। এমনিভাবে বহু শতাব্দী ধ'রে পলিমাটির আস্তরণ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে মিশরের ভূখণ্ড।

নদীমাতৃক দেশ এই মিশর। নীল নদের জল তার জীবনস্বরূপ। এই নদীটি শুধুমাত্র মিশরের ভূখণ্ড সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে এর কূলপ্লাবিত জলধারায় মশরের মাটি হয়ে ওঠে উর্ব্বর সেই বন্যার জলেই মিশরীয়দের সমৃদ্ধি; গবাদি পশু ও অধিবাসিদের জীবনধারণ নির্ভর করে সেই বন্যার জলের ওপর। একবার বন্যার জলে ভূখণ্ড প্লাবিত হয়ে যায়, আবার ধীরে ধীরে সেই জল অপহৃত হয়। অতি প্রাচীন-কাল থেকেই এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে চলে আসছে। আবিসিনিয়া ও পূর্ব্বসুদানে বৃষ্টিপাতের ফলেই নীল নদীতে এই বন্যা দেখা দেয়। বৃষ্টিপাত মিশরে অতি সামান্যই হয়। তাই অতি প্রাচীন কালেই মিশরীয়রা এই নদীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। সম্ভবতঃ এই দেবতার পূজাই মিশরের প্রাচীনতম পূজা। যুগ-যুগান্ত ধ'রে নীল নদ মিশরীয়দের কাছে এক বিরাট রহস্য রয়ে গেছে। তাই এর উৎপত্তি প্রভৃতি নিয়ে কত কাহিনী, কত উপকথা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়েছে। এই নীল-দেবতা তাদের কাছে এতই উচ্চ পর্য্যায়ের যে দেবজ্ঞানে পূজা করলেও এই দেবতার কোন চিত্র বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের চেষ্টা হয় নি। কারণ তাদের ধারণা এই দেবতার বিরাটত্ব তাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, অনুভূতির অতীত। তুচ্ছ মানুষ তারা, এই দেবতাকে কল্পনা করার শক্তি কোথায় তাদের?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল মিশরে। পিরামিড, স্ফিংস্ ও পাষাণমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও তার সাক্ষ্য বহন ক'রে বিরাজ করছে।

পণ্ডিতেরা গবেষণা ক'রে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ কবে সুরু হয়েছিল কেউ ব'লতে পারে না, তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ১০,০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই যুগের অবসান হয়।

১০ হাজার খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের অনেক পূর্ব্বেই নীল উপত্যকার উভয় দিকে এবং নীল নদের কাছে লোকের বসতি ছিল। এরা সম্ভবতঃ জলের মাছ আর বন্যজন্তু, সরীসৃপ ও পোকা-মাকড়ের উপর নির্ভর ক'রে জীবন-ধারণ করতো। পর্ব্বতাদির গুহাই সম্ভবতঃ এদের আবাস ছিল। প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র ছিল এদের সহায়। এই যুগে নির্ম্মিত অস্ত্রাদির মধ্যে যেটুকু সভ্যতা বিকাশের

ইঙ্গিত ছিল, পরবর্ত্তীকালে নূতন প্রস্তর যুগে তা' পূর্ণতা লাভ করেছিল।

নূতন প্রস্তর যুগের আদি পর্ব্বের বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মিশরীয়রা ক্রমে নীলনদ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করছিল ব'লে অনুমিত হয়। তারা ক্রমে বার্ষিক বন্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে উচ্চ ভূমি নির্ম্মাণ, বাঁধ, পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ক'রতে শিখলো, অস্ত্রাদির উন্নয়ন ক'রতে আরম্ভ করলো। এই যুগের শেষভাগে মিশরীয়রা মৃতদেহ কবর দিতে আরম্ভ করে। এই কবরের মধ্যে থেকে সে যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

নূতন প্রস্তর যুগে কবর খনন করা হ'ত আবাদী জমির বাইরে মরুভূমির প্রান্তে। স্মরণাতীত সেই যুগেও মিশরীয়রা আবাদী জমির মূল্য উপলব্ধি করেছিল। মৃতদেহগুলিকে কখনও তৃণ নির্ম্মিত মাদুর বিশেষ, কখনও বা পশুচর্ম্ম দিয়ে আবৃত করা হ'ত। অতঃপর এগুলিকে বাক্সের মধ্যে রাখা হ'ত বা বিরাট মৃৎপাত্র দিয়ে আবৃত করা হ'ত।

কবরের মধ্যে যে সকল মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তা' বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। নানা আকারের প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র ও অস্ত্রাদিও পাওয়া গেছে। যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সকল পাত্র নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। অস্ত্র নির্ম্মাণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মিশরীয়রা যে চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা মেলে না।

কতকগুলি কবরের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত দ্রব্যাদিও পাওয়া গেছে। এই ধাতুগুলি সুদান থেকে আনা হয়েছিল ব'লে অনুমান করা হয়। হস্তীদন্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও অলঙ্কারও পাওয়া গেছে। এই হস্তীদন্তও সম্ভবতঃ সুদান থেকে আনা হয়েছিল। দেখা গেছে প্রাচীন কাল থেকেই মিশরের সঙ্গে সুদানের যোগাযোগ ছিল। এ যুগে মিশরীয়রা গাছের ডালপালার সাহায্যে গোলাকৃতি গৃহ নির্ম্মাণ করতো।

সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যে মিশরে উচ্চস্তরের সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তা অনস্বীকার্য্য। এই সভ্যতা স্বয়ংসম্ভূত, না কোন বিদেশী প্রভাবের ফল, তা গবেষণার বিষয়। অবশ্য অনেক ইংরেজ পর্য্যন্ত প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মধ্যে বিদেশী প্রভাব প্রমাণ ক'রতে সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রাচীন মিশরের আকৃতিটাই এমন ছিল যেন দেশটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। আদিম অধিবাসীরা তা উপলব্ধি করেছিল ব'লেই নিজেদের দেশকে 'তউই' বা দ্বি-দেশ বলতো। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দেশটি এইরূপ পৃথকভাবে

মিশরের বিভিন্ন যুগের প্রস্তর নির্ম্মিত চিত্র।
যন্ত্রশিল্পী থেকে সুরু ক'রে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নানাভাবের শিল্পমূর্ত্তি এখানে দেখা যাচ্ছে।

শাসিত হ'ত ব'লে অনুমান এবং মিশরীয়দের ধারণা দেবতা, উপ-দেবতারাই নাকি তখন রাজ্য শাসন করতো।

অথণ্ড মিশরে প্রথম মানুষের রাজত্বের সময় থেকে মিশরে ঐতিহাসিক যুগের সুরু হয়েছে বলা চলে। কিন্তু প্রথম রাজার রাজত্বকালের নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখ বহু গবেষণা ক'রেও স্থির করা যায় নি। কোন কোন গবেষক পণ্ডিত ৩৮৯২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দকে প্রথম রাজার রাজত্বকাল ব'লে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ বা ৪৪৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ব'লে স্থির করেছেন। বস্তুতঃ ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটনার সঠিক তারিখ নির্ণয় সম্ভব নয়।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় অনেকগুলি রাজবংশ এবং অন্য বহু জাতি মিশরে রাজত্ব করেছে। প্রথম রাজবংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা নারমার। তিনি উত্তর মিশর জয় ক'রে বর্ত্তমান কায়রোর প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে রাজধানী স্থাপন করেন। উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করার কৃতিত্ব তাঁর। 'মেন' বা ''মেনা' নামে তাঁকে অভিহিত করা হ'ত। ইনি একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। এর পর ক্রমে ক্রমে 'আহ', 'চের', 'চে', 'সেমতি' বা 'খাস্তি' নামক রাজারা রাজত্ব করেন। শেষোক্ত রাজার রাজ্যকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না, শিল্পকলা রসিকও ছিলেন। সেম্‌তির পর মেরপেবা, স্মেরখাট, সেন, বিয়েনেকেসের রাজত্বের পর প্রথম বংশের শেষ হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় বংশের রাজত্ব সুরু হয়। এই বংশের রাজ্যকাল প্রায় ২০০ বৎসর। তারপর আরম্ভ হয় তৃতীয় বংশ। তৃতীয় বংশের প্রথম রাজা খাসেখেমের রাজত্বকালে প্রস্তরের সাহায্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যের উন্নতি হয়। এই বংশের শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের একটা অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

চতুর্থ বংশের প্রথম রাজা স্নেফেরু বিশেষ প্রতিপত্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে মিশরকে পৃথিবীর বাণিজ্য কেন্দ্র করা যায়। তিনি নৌকাদি নির্ম্মাণ ও বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেন। স্বর্ণ উৎপন্নকারী দেশ সুদানে হানা দিয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণও নিয়ে আসেন। মিশরের জন্য তিনি প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় ক'রে যান। তাঁর অনুবর্ত্তী রাজা খুফু গির্জ্জার তিনটি পিরামিডের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎটির নির্ম্মাণকর্ত্তা। এর পরবর্ত্তী দু'জন রাজা অবশিষ্ট পিরামিড দ্বয় নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং চতুর্থ বংশটি শ্রেষ্ঠ পিরামিড নির্ম্মাণের জন্য স্মরণীয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশের কয়েকজন রাজাও পিরামিড নির্ম্মাণ করেন। এরপর একাদশ বংশ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন শক্তিশালী রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না।

অতঃপর সুরু হ'ল মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্য-যুগ দ্বাদশ থেকে চতুর্দ্দশ বংশ অর্থাৎ ২৫০০-২১০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে এ যুগ সীমাবদ্ধ। তবে বলা বাহুল্য এ বিষয়েও মতভেদ আছে। এই যুগের শেষভাগে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের যাযাবর জাতিরা একত্র হয়ে মিশর আক্রমণ ক'রে বসলো। এদের বলা হয় হিকসস (Hyksos)। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাই এই যুগকে হিকসস যুগ নামে অভিহিত করেছেন। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ বংশের রাজ্যকাল এই যুগের অন্তর্গত। অষ্টাদশ বংশের প্রথম রাজা আহ্‌মেস হিকসসদের মিশর থেকে বিতাড়িত ক'রে নিজেদের রাজত্ব কায়েম ক'রতে সক্ষম হয়েছিল।

অষ্টাদশ বংশের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৮০—১৩৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। এ সময়ে বিশেষ ক'রে তৃতীয় আমেন-হেটেপের ৩৬ বৎসরকাল শাসনের মধ্যে মিশরে বাণিজ্যের চরম উন্নতি দেখা গিয়েছিল। ফলে মিশর ক্রমে সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। এই বংশের রাজ্যকালে ধর্ম্ম ও নৈতিক দিক থেকেও প্রভূত উন্নতি লক্ষিত হয়।

আনুমানিক ১৩২০-১২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ উনবিংশ বংশের রাজ্যকাল। এর পর থেকে প্রায় ৭২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত মিশরে নানারকম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলে। উত্তর সিরিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে বহুবার দেশ আক্রান্ত হয়।

নুবিয়ানরা যে আক্রমণ চালায়, তা'তে তাদের নেতা পিয়াংখি সাফল্য লাভ করে এবং ৭২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অখণ্ড মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৬০ সাল পর্য্যন্ত চলে এদের রাজত্ব।

এরপর মিশর আবার এল মিশরীয়দের শাসনে। একটা ঘরোয়া কলহের সুযোগ নিয়ে সেমটেক রাজা হয়ে বসলো। সুরু হ'ল ষড়বিংশ বংশ। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় আহ্‌মেসের রাজত্বকালে পারস্য কর্ত্তৃক মিশর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পশ্চিম এশিয়াঞ্চল তখন পারস্যের অধিপতিদের অধিকারে। তাই বিচক্ষণ কুটনীতিজ্ঞ রাজা আহ্‌মেস অবস্থা বুঝে গ্রীকদের সঙ্গে বিশেষ সদ্ভাব রাখতে আরম্ভ করলেন, যাতে প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য থেকে মিশর বঞ্চিত না হয়। কিন্তু পূর্ব্বদিকে যে নতুন শক্তির অভ্যুদয় হচ্ছিল, তার গতিবেগ রোধ করার সৌভাগ্য মিশরীয়দের হ'ল না। তাই চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্বের পর ৫২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আহ্‌মেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিশরের বুকে নেমে এল দুর্ভাগ্যের কাল ছায়া। আহ্‌মেসের রাজত্বের সময়েই পারস্যের খ্যাতনামা রাজা সাইরাস ব্যাবিলন ও এশিয়া মাইনর জয় করেছিলেন। আহমেসের মৃত্যুর পরেই পারস্যের আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। আহ্‌মেসের পুত্র তৃতীয় সেমটেক পিতার সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস আক্রমণ চালালো এবং একটি মাত্র যুদ্ধেই মিশরের ভাগ্য নিরূপিত হয়ে গেল। মিশরীয় বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হ'ল। ক্যামবিসেস মিশরের রাজা হ'ল ৫২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। ৩৬০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অব্যাহত রইল পারস্যের রাজাদের শাসন। মিশরীয়রা কিন্তু তাদের অনাচার মোটেই সুদৃষ্টিতে দেখতো না।

এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মিশরীয়দের মুক্তিদাতারূপে আবির্ভূত হ'লেন ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডার। তিনি দেখলেন দেবতা ও দেবস্থানের প্রতি পারস্যের রাজাদের শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই। তাদের অধর্ম্মীয় কার্য্য বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ৩৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পারস্যের রাজা ডেরিয়াসকে পরাস্ত ক'রে মিশর অভিমুখে অগ্রসর হ'ন। ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সঙ্গে মিশরকে সংযুক্ত ক'রে একটি বিশাল ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য পত্তনের মহৎ আশা তাঁর অন্তরে। আলেকজাণ্ডার মিশরে প্রবেশ করলেন ৩৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। পারস্যের সরকারী কর্ম্মচারীরা আত্মসমর্পণ করলো আর মিশরীয়রা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম জেনারেল টলেমি (Ptolemy) শাসনভার পেল। টলেমি-নৃপতিরা

ব্রুসেলস্‌ মিউজিয়ামে রক্ষিত
বিচিত্র শিল্পখচিত মিশরীয় কাঁচ পাত্র।

গ্রীক প্রথায় মিশরের শাসনকার্য্য চালাতে লাগলো। ফলে মিশরের সরকারী ভাষা হয়ে দাঁড়ালো গ্রীক। তবে বিশেষ ক'রে আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সহর আলেকজান্দ্রিয়াতেই এই গ্রীক প্রভাব শিকড় বিস্তার করলো। মিশরের অন্যত্র প্রাচীন মিশরীয় ঐতিহ্যই বজায় রইল। একদিকে আলেকজান্দ্রিয়া ও তার সন্নিকটস্থ স্থানে গ্রীক শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রভাব, অন্যদিকে মিশরের অবশিষ্টস্থানে মিশরীয় কৃষ্টির প্রসার। ফলে গ্রীকদের রাজত্বকালে মিশরে একই সঙ্গে পাশাপাশি দু'টি সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল—গ্রীক সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতা।

অতঃপর মিশর আসে রোমানদের অধিকারে। ৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ থেকে রোমানরা মিশর শাসন ক'রতে থাকে।

এ সময় মিশরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাবাল্য দেখা যায়। প্রায় ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলার পর রোম শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং মিশর তাদের হস্তচ্যুত হয়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অংশরূপে শাসিন হতে থাকে।

৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবেরা হানা দিল। মিশরে আরব অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলো, কিন্তু জনসাধারণের একাংশ পূর্ব্ববৎ খৃষ্ট-ধর্ম্মকেই অবলম্বন ক'রে রইল। এইভাবে দু'টি পৃথক ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হ'ল। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মিশরে এই দুই ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব রয়েছে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন খলিফা ও মামেলুকদের রাজত্ব চললো।

এবার আরবদের পালাও শেষ হ'ল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সেলিমের নেতৃত্বে তুর্কীরা মিশর দখল ক'রলো। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নেপলিয়ন মিশরে অবতরণ ক'রে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করলেন। পিরামিডের যুদ্ধে তিনি তুরস্ক বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই নেলসন ফরাসী নৌবহরকে বিধ্বস্ত করেন। ১৮০১-২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা ফরাসীদের মিশর পরিত্যাগ
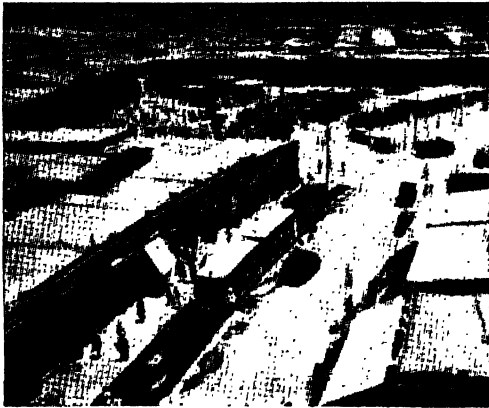
সুদানের বৃহত্তম নগরী ওমদুরমান-এর প্রধান 'স্কোয়ার'।

করতে বাধ্য করলো। ইংরেজরা পুনরায় তুর্কীর হাতে তুলে দিল মিশরকে।

১৮০৫ সালে মেহেমেত আলি মিশরের 'পাশা' নির্ব্বাচিত হ'লেন। পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সুদান মিশরের অধিকারভুক্ত হয় এবং মিশরের রেলপথ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি হয়।

১৮৬৭ সালে ইসমাইলের রাজত্বের সুরু। স্কুল স্থাপন বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ও সুয়েজ খাল খনন শেষ করা ইসমাইলের কৃতিত্ব। আনুষ্ঠানিক ভাবে সুয়েজখালের উদ্বোধন হয় দু'বছর পর।

১৮৮২ সালে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে এবং সার গারনেট উল্‌সলে কায়রো দখল করেন।

১৯১৪ সালে মিশরকে বৃটিশ প্রোটেক্টরেট ঘোষণা করা হ'ল। ১৯২২ সালে গ্রেট বৃটেন মিশরকে স্বাধীন রাজ্য ব'লে স্বীকৃতি দিল। অতঃপর ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তি ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী পাঠকের জানা আছে।

মিশরের সঙ্গে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের সম্পর্ক কি, পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। উত্তরাঞ্চলের নাম নুবিয়া। মিশর ও আবিসিনিয়ার মধ্যবর্ত্তী নীল উপত্যকায় বসবাসকারী নুবিয়ানরা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেনি। সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় আরব অভিযানের ফলে মিশর মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু নুবিয়াকে তারা জয় ক'রতে পারে নি। 'বেনিওমায়া' উপজাতীয় আরবেরা অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই লোহিত সাগর অতিক্রম ক'রে নীলের তীরবর্ত্তী স্থানে বসতিস্থাপন ক'রতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ আরব থেকে অধিক সংখ্যায় এই উপ-জাতীয়রা এসে ওমায়া জাতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। নিগ্রোজাতির সঙ্গে তাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান চ'লতে থাকে। এদের বংশধরেরা 'ফুঞ্জ' নামে অভিহিত। পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এরা বেশ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় এবং এই শতাব্দীর মধ্যেই তারা উত্তরাভিমুখে মিশর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিজয় অভিযান চালায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফুঞ্জদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে 'হামেগ'রা। এই সময় থেকে সুরু

হয় রাজ্যের অবনতি, দেখা দেয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা। এদের রাজা ব'লে স্বীকার ক'রতে জনগণের মধ্যে আপত্তি দেখা দেয়। মিশরের কবলে আসার সময় পর্য্যন্ত সুদানে এই বিশৃঙ্খলা সমানে চ'লতে থাকে।

এরপর সুদানের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্য্যায়। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের কথা। মেহমেত আলি তখন মিশরের পাশা। তিনি নির্দ্দেশ দিলেন নুবিয়ায় অভিযান চালাবার। সুদানের সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরাদি হস্তগত করাই ছিল তাঁর অভিযানের লক্ষ্য। দু'বছরের মধ্যেই অভিযান সম্পূর্ণ হ'ল। মেহেমেত আলির পুত্র ইসমাইলের নেতৃত্বে ফুঞ্জদের প্রাচীন সাম্রাজ্যটিতে মিশরীয় শাসনের গোড়াপত্তন হ'ল।

মিশরীয়রা বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলো। মিশরীয় কর্ত্তৃত্ব প্রসারের প্রয়াস চললো সুদানে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুদানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ের ব্যাপকতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। এ ছাড়া কর আদায়কারীরা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালাতো নির্দ্দয়ভাবে। মিশরীয়দের কুশাসনে সুদানীরা ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলো।

এই সময় মহম্মদ আমেদ নিজেকে 'মাহদি' বা ইসলামের পথপ্রদর্শক ব'লে প্রচার করলো। দেশের লোক যেন এইরকম একজনকেই চাইছিল, যে তাদের মিশরীয় শাসনের অত্যাচার থেকে বিমুক্ত করবে। বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা সর্ব্বত্রই মিশর বাহিনীকে পরাস্ত করলো। ১৮৮৩ সালে এই মাহদি সুদানের কয়েকটি অঞ্চলে একচ্ছত্র কর্ত্তা হয়ে বসলো।

মাহদি-অভিযানের ফলে সুদানে মিশরীয় শক্তি প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ১৮৮৫ সালে মাহদির মৃত্যু হ'লে শাসনরজ্জু এল 'খলিফা' আবদুল্লার হাতে। ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত খলিফার শাসন চললো। কিন্তু ঐ বৎসর সার কিচেনারের নেতৃত্বে পরিচালিত ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনীর হাতে খলিফা পরাস্ত হ'ল এবং সুদানেরও পতন হ'ল।

সুদান পুনর্বিজয়ের মূলে ছিল গ্রেট বৃটেন ও মিশরের যৌথ সামরিক প্রচেষ্টা। কাজেই ঝানু কূটনীতিক বৃটিশ সরকার এ সুযোগ ছাড়তে চাইলো না। তারা এই অধিকারে সুদানের শাসন ব্যাপারে একটা অংশ দাবী করলো। ফলে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী বৃটেন ও মিশরের মধ্যে সুদান যৌথশাসন চুক্তি সম্পন্ন হ'ল। চুক্তি অনুসারে সুদানের ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল গভর্ণর-জেনারেলকে। ইনি বৃটিশ সরকারের সুপারিশক্রমেই নিযুক্ত হ'ন। সুতরাং সুদানে কার্য্যত বৃটিশ শাসনই প্রবর্ত্তিত হ'ল বলা চলে।

মিশর-সুদানের এই জটিল পরিস্থিতি পরিশেষে কি রূপ নেবে কে জানে? সম্প্রতি আবার বৃটিশ মন্ত্রি-সভায় গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়েছে। মিশর-সুদানে এর প্রতিক্রিয়া কি ভাবে দেখা দেয় তা'ও লক্ষ্য করবার বিষয়।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর সংগ্রাম যে অনেকখানি সাফল্য এনে দিয়েছে তা স্বীকার ক'রতেই হবে। আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আরও কত আশাই না নিপীড়িত মানবজাতির মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। কে ব'লতে পারে ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাদের জন্যে কোন্ পথ নির্দ্ধারিত আছে?
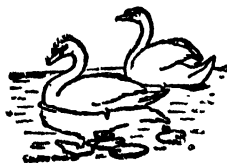
জ্যোৎস্নার অভিশাপ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ঢাকুরিয়া লেক (যাহা বর্ত্তমানে লোকে বালিগঞ্জের ঐতিহ্য বলিয়া মনে করে) জনশূন্য। কিন্তু একেবারে জনশূন্য বলা চলে না। একটি খর্ব্বাকৃতি কৃষকায় ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে জলের ধার দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। সহসা তাহার ভাবগতিক দেখিলে মনে হইতে পারে খুব জরুরী একটা কাজের তাড়া তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। যাহারা একটু কল্পনাবিলাসী তাহারা ভাবিতে পারেন, এতরাত্রে একা যখন লেকের জলের সামনে দৃঢ়তার সহিত কোনো মানুষ ছুটাছুটি করে তখন বুঝিতে হইবে ব্যর্থ প্রণয়ের বিষময় ফল তাহার জীবনস্বাদ কাড়িয়া লইয়াছে—লোকটি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রেমের জ্বালা জুড়াইতে বদ্ধপরিকর। আজ এমন জ্যোস্না যে লেকের শান্ত জলের উপর মৃদু হাওয়ার ঈষৎ কম্পনটুকু পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ওপারের পথে যে আলোটি জ্বলিতেছে তাহার প্রতিফলন তির্য্যকভাবে যেন কোন্ মায়াপুরীর রহস্যময় ঈশারা দিতেছে। ঝিরঝিরে হওয়া, ঝিম্ ঝিম্ নিঝুম এপারের উদ্বাস্তুদের ঘরগুলি। কলিকাতার দিক হইতে একখানি মালগাড়ী রেললাইনের উপর দিয়া চলিয়াছে, তাহারই শব্দ ভাসিয়া আসিল। পথিকটি কিন্তু জলে ঝাপ দিল না। বড় একটি শিরিষ গাছের প্রায় নিষ্পত্র ডাল পালার ফাঁক দিয়া যে পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না মাটির উপর এবং জলে আলোছায়ার প্যাটার্ণ বুনিয়াছে পথিক সেখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণিমার মধ্যরাত্রির কি অপূর্ব্ব রূপ।

প্রসঙ্গত বলিতে পারি যে পথিকটি আত্মহত্যা করিবে না। গাছতলায় একটি গরুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই সে অমন থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য আপনারা বলিতে পারেন, লেখক হইয়া এমন একটা সিচুয়েশনকে নষ্ট করিতেছি কেন? তাহার সরল জবাব, পথিককে আমি চিনি। সে প্রেমে পড়ে নাই (পড়িলে কি হইত বলা যায় না)। এত জোর দিয়া তাহার মনের খবর ব্যক্ত করার শক্তি একমাত্র আমারই আছে, কারণ সেই পথিক ব্যক্তিটি আমি নিজে।

যাই হোক, আত্মপ্রচারের ক্ষেত্র এটা নয়। গল্প বলিতেছি গল্পই বলিব।

পথিকটি গরুটির কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিল। গরু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না বা বিচলিত হইল না। শুধু একবার ঘাড় ঘুরাইয়া প্রশস্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া পথিকের হাত চাটিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পথিক অদূরে গাছের নীচের বেঞ্চে বসিয়া আপন মনে হাসিল। তাহাকে জাগিয়া থাকিতেই হইবে।

...একা একা পূর্ণিমার রাত্রি জাগিয়া কাটানো আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। স্বভাবতই আমি 'ঘুমকাতুরে'। জ্যোৎস্নার আলোতে খোলাছাদে ঘুমাইতে খুব ভালোবাসি। তবু কেন এমন পাগলের মত রাতদুপুরে এই গাছতলায় জাগিয়া কাটাইতেছি তাহা এতদিন কাহাকেও বলি নাই। কারণ, কথাটা এক এক সময়ে নিজেই বিশ্বাস করিতে চাহি না। কিন্তু একথা সত্য যে, আমি জ্যোৎস্না যেমন ভালোবাসিতাম এখন তেমনি তাহাকে ভয় করি। বিশেষ করিয়া পূর্ণিমার রাত্রে ঘুমাইতে পারি এমন দুঃসাহস আমার নাই। পাছে ঘুমাইয়া পড়ি এই আশঙ্কায় পথে বাহির হইয়া ইতস্তত ঘুরিয়া রাতটুকু কাটাইয়া দিই। যত সহজে কথাটা বলিলাম, কাজটা কিন্তু তত সহজ মোটেই নয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে উপায়ান্তর নাই সেক্ষেত্রে এইভাবেই চলিতে হইবে।

গরুটির দিকে তাকাইয়া আমার মায়া হইল, বলিলাম 'তোর আবার কি হয়েছে?' জবাব আশা করি নাই। এখন একমাত্র প্রাণী ওই গরুটিই আমার সঙ্গী। অতএব তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কিছুক্ষণ কাটিবে।

বলিলাম: ব্যাপার কি, তুই এমন উদাস হয়ে কি দেখছিস।

জবাব নাই। দূরে দিগন্ত রেখায় আকাশ নির্মেঘ, ঘন অন্ধকার গাছের মাথায় মাথায়—সেখানে জ্যোৎস্না থাকিলেও দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া পথ হারাইয়া ফেলিতেছে।

এমনি জ্যোৎস্নারাত্রি আমার কিশোর তরুণ মনে কি মায়াই বিস্তার করিত!···দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারি না সে কথা মনে পড়িলে! পর পর চারটি পূর্ণিমার রাত্রি আমার জীবনে চিরন্তন বিভীষিকা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছে।

প্রথম। তখন ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র। ফুল ভালোবাসি। চোখে ফুলের স্বপ্নরূপ—যদিও বোটানীর ছাত্র, তবু রজনীগন্ধার সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা কল্পনারূপই আমার মনে সত্য হইয়া থাকে। এমনি একটি পূর্ণিমা। না, সে পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আলো মধুর ছিল, আর ছিল আনন্দ নিস্যন্দিনী অব্যক্ত বেদনা। পূজার পর, কোজাগরী পূর্ণিমা।

অমরেশের বাড়ি লক্ষ্মীপূজার নিমন্ত্রণ ছিল। আয়োজনের ঘটার উপরে উপরি আবদার স্বরূপ অমরের ছোট বোন মালতীর যত্নের আতিশয্য। সে বারবার বলে: কলকাতার হোষ্টেলে বুঝি তোমাদের উপোস করিয়ে রাখে। আহা কী চেহারা হয়েছে। দুটো খাও দিখিনি।

মালতীর বিশ্বাস এক আসনে বসিয়া তাহার যত্নের আতিশয্যে আমার হৃতস্বাস্থ্য সে ফিরাইয়া দিবেই। সেদিনের একরত্তি মেয়ে মালতী এই ক'মাসেই বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে। সত্য কথা বলিব, তাহার এই স্নেহের উপদ্রব খুব মধুর লাগিল।

কিন্তু কত আর পারা যায়। পরিশিষ্ট দুটি সন্দেশ আর তুলিতে পারিলাম না। গুরুভোজনের পরে মিষ্টি খাওয়া আমার সাধ্য নয়।

তবু মালতী ছাড়িবে না। আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অবুঝ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"আচ্ছা বেশ, শুনবে কেন আমার কথা। কথা রেখে দুটো মিষ্টি খাওয়া যায় না এমন নয়!"

বলিব কি, দিগন্ত রেখার ওই নির্মেঘ তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া মালতীর কথা মনে পড়িতেছে আজ। শুধু আজ নয়, কত দিন কত বার মনে পড়িয়াছে তার হিসাব দেওয়ার সাধ্য নাই।

অনেক রাত্রে ফিরিয়া ক্লান্ত দেহখানি বিছানায় ফেলিয়া দিয়া জ্যোৎস্নার কথা প্রায় ভুলিয়া নিমেষের মধ্যে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়ি। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিল নিজেরই আর্তকণ্ঠের চিৎকারে!

বিছানার উপর বসিয়া ঘামিতেছি। কার্ত্তিক মাসের শেষ রাত্রি—বেশ ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া আসিতেছে খোলা জানালা দিয়া—তবু ঘামের বিরাম নাই

দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। অদ্ভুত স্বপ্ন। নিজের মনকে চাবুক মারিলাম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়া। স্বপ্ন—স্বপ্নই। ···তবু মনটা মাঝে মাঝে ভারি হইয়া ওঠে।···মালতীর বড় বড় দুটি চোখ কাতর মিনতিমাখা দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিতেছে—"সেদিন দুটো মিষ্টি যদি তুমি খেতে!" প্রশ্ন করিলাম: তোমার কি হয়েছে মালতী?

—আমি আর বাঁচব না।

—কি এমন হ'ল? ম্যালেরিয়া বই ত নয়। অমন ত সবারই হয়, ফি বছর হয়।

—না, আর বেঁচেই বা কি লাভ! ভালো লাগে না কিছুই।

—কেন?

—কেন জানো না!

কোজাগরী পূর্ণিমায় যে দুঃস্বপ্ন দেখিলাম তাহার ঠিক এক মাসের মধ্যেই মালতী জ্বরে পড়িল। অমরেশ এবং আমি একই হষ্টেলের রুম-মেট। জ্বরের সংবাদ আসামাত্রই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমরেশকে বলিলাম: তুই বাড়ী চ'লে যা।

অমরেশ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া সিগারেট ধরাইয়া দুই টান মারিয়া পুঞ্জীভূত ধোঁয়া আমার মুখের উপর উড়াইয়া দিল।

আমিও আর বলিলাম না কিছু। কি বলিব? স্বপ্নের কথা—অমন আজগুবী একটা স্বপ্নের কথা কি বলা চলে? তার উপর আবার অমরেশ আমার চেয়েও বিজ্ঞানী—সে নাকি পিওর সায়েন্সের ছাত্র।

তিন দিন পরে যখন টেলিগ্রাম আসিল, তখন অমর আমাকে বলিল—তুইও চল্!

আমি যাই নাই। মালতীকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছি, তবু যাইতে পারিলাম না।

পাগলের মত একটা কথা ভাবিতেছি: এবার একটা স্বপ্ন দেখিব। মালতীর সম্বন্ধে একটা সুন্দর স্বপ্ন আমাকে দেখিতেই হইবে। কি জানি কেমন করিয়া আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছে, যদি স্বপ্নের মধ্যে মালতীকে সুস্থ স-হাস দেখি, তাহা হইলে আবার মালতী বাঁচিয়া উঠিবে।

মালতীর মৃত্যু-সংবাদ বহন করিয়া অমরেশ যেদিন সন্ধ্যায় দেশ হইতে ফিরিল, সেদিনও পূর্ণিমা।

দ্বিতীয়: অমরেশ কিছু বলিল না। আমিও কিছু না শুধাইয়া সব কিছুই বুঝিতে পারিলাম। সে রাত্রে ঘুম আসিল না। বিছানায় বৃথা ছটফট করিয়া লাভ নাই। আজও পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। মনে পড়িতেছে মালতীর অভিমানে বিষণ্ণ দৃষ্টি। পাশের বিছানায় অমরেশ বোধ-করি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে ছাদে উঠিয়া আসিয়া ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কাহার কাছে কী এক ব্যর্থ অভিযোগ জানাইল আমার অবুঝ মন। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল জানি না।

ঘুম ভাঙিয়া দেখি প্রাচীরের আলিসায় মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়াই কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শুধু ঘুম নয়। আবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। দুঃস্বপ্ন। নিরুপায় আমি—ভাগ্যের অমোঘ নির্দ্দেশ কেন যে আবার আমার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইল, জানি না! কি দেখিলাম? তাহার প্রত্যেকটি কথা বলিতে বড় কষ্ট হইবে। থাক, সে আর না-ই শুনিলেন। মামার মৃত্যু-শয্যার ছবি স্বপ্নের মধ্যে সত্যরূপে প্রতিভাত হইল।

এ-কথা কাহাকে বলিব? বলিলে হাসিবে—পাগল বলিবে।

অথচ একা-একা এইভাবে একটা বজ্রের নিয়ত আঘাত সহিতে পারি এমন শক্তি আমার কোথায়!

পর-পর চারটি পূর্ণিমায় চারটি মৃত্যু-শয্যার ছবি স্পষ্ট দেখিয়া আমি প্রায় উন্মাদ হইয়া গেলাম। কাহাকেও কিছু বলিতে পারি না—অথচ ঠিক অঙ্কের নির্ভুল হিসাবের মতই সত্যরূপে চারটি মৃত্যু ফলিয়া গেল!

যদিও এর যে কোনো একটি স্বপ্নই পাগল হইবার পক্ষে যথেষ্ট, তবু আমি পাগল হই নাই কেমন করিয়া তাহা জানি না। তবে মালতীর কথা মনে পড়িলে আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

সেই সব কথায় যখন মনটা ডুবিয়া গিয়াছে, তখন একসময়ে ঘাড়ের কাছে একটা মৃদু রুক্ষ স্পর্শে চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম—গরুটি আমার ঘাড়টা আস্বাদন করিতেছে। টের পাইলাম ঘাড়ে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। কতক্ষণ একটা মানুষ না ঘুমাইয়া থাকিতে পারে! মাথাটা ভারী হইয়া আসিতেছে। ঘাড়ের উপর তাহার ওজন বেশ কয়েক মন বলিয়া বোধ করিতেছি। কাজেই গরুর ঘাড় লেহনে বিশেষ বিরক্ত হইলাম না, শুধু অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সরিয়া বসিলাম।

কটা বাজিয়াছে জানি না। এখন ঘুমাইতে পারিব না। সেই চারটি পূর্ণিমা রাত্রির বিভীষিকা স্মৃতি আমাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। জীবনে যাহাদের কোন কাজেই আসিলাম না, যাহারা আমাকে প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ বিলাইয়া দিল, তাহাদের মৃত্যুর ছায়া কেনই বা আমার মত হতভাগার জীবনকে আচ্ছন্ন করিতে চায়! না, পারিব না।—এবারে নামিয়া আসুক আমার নিজের মৃত্যুর ছায়া। এক-এক সময় এতই অসহ্য মনে হয় যে, ইচ্ছা করে নিজের প্রাণটা শেষ করিয়া দিই। কিন্তু তাও পারি না।—

বিশেষ করিয়া আজ ঘুমাইতে পারিব না। স্বচক্ষে দেখিতেছি মা আমার মৃত্যুর দিকে একটু একটু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। যদি ঘুমাই—তাহা হইলে আর রক্ষা নাই।

পাহাড়াওয়ালার ভারী জুতার শব্দ। একটু আশ্বস্ত বোধ করিলাম।

হাতের লাঠিটা দিয়া আমার গায়ে এক খোঁচা দিয়া পুলিশটি আমাকে যেন জাগাইতে চেষ্টা করিল। আমি হাত তুলিয়া সেটা রোধ করিতে সে রীতিমত চটিয়া গেল। : ক্যা মতলব?

আমি বলিলাম : কিছু না, বসে আছি এমনি।

সে বিশ্বাস করিল না। কেনই বা করিবে?

আমাকে উপদেশ দিবার চেষ্টা করিল, বলিল : 'প্রেমে পড়লেই জলে ঝাঁপ দিতে হবে তার কি মানে আছে। তুলসীদাসজীর কথা কে না জানে।' এই ধরনের অনেক মূল্যবান কথায় আমাকে সে ভিজাইয়া বাড়ী পাঠাইবার চেষ্টা করিল।

ঘুম পাইয়াছে, অথচ জাগিয়া থাকিতে হইবে—একটা কিছু ত চাই। কাজেই আমি আর আপত্তি না তুলিয়া মধ্যে মধ্যে 'হাই' তুলিতেছিলাম।

আসর যখন এক তরফা জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একটা বিপদ বাধিল।

বড় গাড়ী আসিল! তাহার মধ্য হইতে আরও লোক নামিল। একজন বাঙালী অফিসারই হইবে বোধ হয়—আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই পাহারাওয়ালা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিল।

অফিসারটি বলিল : অনেক ত বয়েস হয়েছে—এখনও চন্দ্রাহত হওয়ার রোগ সারল না মশাই!

নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলাম।

সে বলিলো : জানা আছে কি আপনি বেআইনী কাজ করেছেন?

: হ্যাঁ।

: তবে, কেন করছেন?

: আমার ইচ্ছে।

: ও আচ্ছা। চলুন তাহলে থানায়।

আপত্তি করিলাম না। অফিসারটির কথায় বার্ত্তায় মনটা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিকট এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি চাহিবার স্পৃহা নাই।

তা ছাড়া, আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটা কিছু ঘটিতেছে, ইহারও একটা নেশা আছে বই কি!

থানার দারোগা আমাকে দেখিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন : দেখুন, বার বার এমন কেন করেন?

অফিসারটি আমাকে চেনেন। কারণ, আরও বার দশেক আমাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। অথচ আমার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া কেন জানি না, ইহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, গোবেচারী ছাড়া আমি আর কিছুই নহি।

আমি বলিলাম : কি করি বলুন?

ওসব Somnumbulism-এর দোহাই আর শুনব না এর পর। আপনি লেখকই হোন, আর যে-ই হোন—আমাদেরও ত একটা দায়িত্ব আছে। বার বার এরা আপনাকে ধ'রে আনবে আর আমি সন্দেহের অজুহাতে ছেড়ে দেবো, এ হয় না। আজ সারারাত আপনি আমার সাম্‌নের এই চেয়ারে ব'সে থাকুন। রাত্রে ছাড়ব না, বুঝলেন?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, বুঝিয়াছি।

কিন্তু দারোগার কেন যেন মনে হইয়াছে, আমি বুঝি নাই—। তিনি আরও অনেক কথা বলিয়া শেষে মন্তব্য করিলেন : অবশ্যি আপনারা কবি-লেখক, আপনাদের জন্যে আলাদা আইন হওয়া উচিত, কিন্তু তা যখন নেই তখন আমিই বা কি করব বলুন?

একটু হাসিলাম।

থানার ঘর। নথিপত্র আর কোলাহল। এখানে জ্যোৎস্নার প্রবেশাধিকার নাই। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। ভোরের দিকে দারোগাবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙিল, বেশ সদালাপী, ভদ্রলোক, বলিলেন : চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল ম'শাই!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে চাহিয়া দেখি, শুধু চা-ই নয়, চারখানি বিস্কুটও প্লেটের উপর দেওয়া হইয়াছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম : পূর্ণিমার রাত্রিটা প্রভাত হইল! এখন আমি এক মাসের মত নিশ্চিন্ত।

মনের মধ্যে কে যেন ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিল : একমাস আর তোমার দেখা পাব না!

হাসিলাম। একী দুর্ব্বলতা! মালতীর ডাগর দু'টি চোখ আজও ভুলিতে পারি নাই। কী ছেলেমানুষী!

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—এই কবিতাটির জন্য কবিগুরুকে জীবদ্দশায় বোধ হয় কিছু বিরূপ সমালোচনা শুনিতে হইয়াছিল। এখনো মাঝে মাঝে রসজ্ঞ সমালোচকগণ ইহা লইয়া স্বপক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করিয়া থাকেন। ভক্তগণ কর্তৃক স্থানে অস্থানে এ কবিতার উদ্ধৃতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র কবিতাটী উদ্ধার করিতেছি।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝ খানে॥
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া।
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে এ কবিতার কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা যে ভাবে কবিতাটী গ্রহণ করিয়াছি, বিবৃত করিতেছি।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলী বৈরাগ্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—
"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।
যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার এই চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য।

বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ চেষ্টা "যতমান"। কোন আসক্তি অবশিষ্ট থাকিলে তাহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা "ব্যতিরেক"। চিত্ত আর কোন বিষয়েই আকৃষ্ট হয় না, তবে পূর্ব্ব সংস্কারবশে মাঝে মাঝে ঔৎসুক্য আসিয়া দেখা দেয়, ইহারই নাম "একেন্দ্রিয়"। সর্ব্ববিধ সংস্কার বিনাশ "বশীকার"। এই অবস্থায় ইহলোক স্বর্গলোক এমনকি ব্রহ্মলোকেও আসক্তি থাকে না। কবিগুরু এই বৈরাগ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তাঁহার কাম্য নহে।

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীভগবানের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বৈরাগ্য অন্যতম। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-রহিত অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও ভগবান রূপে অভিহিত হন। ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন। এই ছয়টি ঐশ্বর্য্যের নাম—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ॥

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের নাম "ভগ"। হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ বর্জ্জিত পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ ভগবৎ শব্দবাচ্য।

সর্ব্ববশীকারিত্ব ঐশ্বর্য্য, অচিন্ত্যশক্তি বীর্য্য শ্রীভগবানের সর্ব্বকল্যাণকর লীলার গুণ কীর্ত্তনই যশ, অপরিমেয় অক্ষয় সম্পদের নাম শ্রী, সর্ব্বজ্ঞতা ও সপ্রকাশতা জ্ঞান, সর্ব্ববিধ মায়িক বস্তুতে অনাসক্তি বৈরাগ্য। কবি কথিত বৈরাগ্য এই বৈরাগ্য নহে। পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) বলিয়াছেন—

"জ্ঞান বৈরাজ্ঞ ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ॥"

'বৈরাগ্য অর্থে ভোগ্য বিষয় ত্যাগ। এই ত্যাগ দুই প্রকার "যুক্ত বৈরাগ্য" ও "ফল্গু বৈরাগ্য।" যুক্ত বৈরাগ্য —যথাযোগ্য বিষয়ভোগ অনাসক্ত হইয়া। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফল ত্যাগ নহে, সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে কর্ম্মানুষ্ঠান যুক্ত বৈরাগ্য। যাহা ভগবৎ সেবার আনুকূল্য করে, তাহার অনুষ্ঠান, ভগবৎ কিঙ্করক্সপে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ, কংসারির সংসারে থাকিয়া তাহার সেবা যুক্ত বৈরাগ্য। ফল্গু বৈরাগ্য—অন্তঃসলিলা বৈরাগ্য। অন্তরে ভোগবাসনা নির্ম্মূল হয় নাই, বাহিরে কঠোরভাবে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধের প্রচেষ্টা ফল্গু বৈরাগ্য। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ, অবচেতনে একটা অহং বুদ্ধি থাকে—আমি ত্যাগী। বাসনার মূল নির্ম্মূল না করিয়া শাখা প্রশাখা ছেদনের চেষ্টার কঠোর সংগ্রামে হৃদয় নীরস হইয়া যায়, তাই, ইহার নাম ফল্গু বৈরাগ্য। নীরস হৃদয়ে ভক্তি দেবী উদিতা হন না। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান বৈরাগ্য সাধনার প্রথমাবস্থায় ভক্তির উদ্বোধনে সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু পরে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগের জন্য প্রথমাবস্থায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়তো সহায় হয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ইহাদের ভক্তি সাধনে সাহায্য করিবার কোন শক্তি নাই। ভক্তিই ভক্তির উত্তরোত্তর উন্মেষে সাহায্যকারিণী। ভক্তি রসস্বরূপের মহাভাব স্বরূপিণীর আরাধনা করেন বলিয়া নিজেও রসভাবময়ী। চিরসুন্দরের সেবিকা বলিয়া নিজেও সুন্দরী। সুতরাং ভক্তির সাধনে অন্তর সরস ভাবময় ও সুন্দর হয়। ইহার সঙ্গে নীরস জ্ঞান বৈরাগ্যের সম্বন্ধ নাই। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এইরূপ ভাবাবিষ্ট হইয়াই বলিয়াছিলেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসন কবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রে মর্ত্তের মাটীতে তিনি অমর বাঞ্ছিত অমরারও পরপারের অমৃত প্রার্থনা করিয়াছেন। সমস্ত সংসার কবির লক্ষবর্ত্তিকায় আলোক প্রজ্জলিত করিবে, সে আলো কিন্তু সেই চিরসুন্দরের রূপের জ্যোতিতেই উজ্জ্বল। কবি বলিয়াছেন, "যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে-গানে। তোমার আনন্দরবে তার মাঝখানে। এ সংসারের যত কিছু আনন্দ, সমস্ত পার্থিব আনন্দের মধ্যে সেই ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্ম-অনুভূতিই কবিকে আনন্দদান করিতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন—"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া। প্রেম মোর ভক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়া।"

মৃন্ময়ের মাধ্যমে চিন্ময়ের অনুভূতি, বিশ্বমাঝে বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎকার, অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও এই পথের পথিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কবিতায় কবি যেন চিন্ময়ের আলোকেই মৃন্ময় বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই বিশ্বের দৃশ্যে গন্ধে গানে সেই বিশ্বনাথের অনুভূতিই তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছে। অর্থাৎ রস-স্বরূপের আস্বাদনে পরিপূর্ণ হৃদয় কবি পার্থিব সমস্ত আনন্দের মাঝখানে নূতন করিয়া ভগবদানন্দের অনুভূতিই লাভ করিতেছেন।

আচার্য্য শঙ্করের মতানুবর্ত্তিগণ বলেন—বৈরাগ্য ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না। স্বাভাবিক বৈরাগ্যোদয়ে যে কর্ম্মত্যাগ, ইঁহাদের মতে তাহাই বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ। বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ নিষ্ফল। আশ্রম পরম্পরার অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর গৃহী হইবে, গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে, তাহার পর প্রব্রজ্যা। কিন্তু "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনদ্বা"। বৈরাগ্যোদয়ে যে কোন আশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নির্দ্দেশ আছে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। বৈরাগ্যোদয় হইলে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এই মতে বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়।

শম দমাদি বৈরাগ্যোদয়ে সহায়তা করে বলিয়া অনেকে সমদমাদিকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "বিবেক চূড়ামণি" গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের উক্তি—

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভান মাত্রতা

যদি বৈরাগ্য না জন্মে শম দমাদি সাধনও মরুভূমিতে

জলবিন্দুর ন্যায় নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ বৈরাগ্য ব্যতীত শমাদি সাধনে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—(পূর্ব্বে উদ্ধৃত)

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই ভাবেই বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র কিন্তু বৈরাগ্যের প্রসংশা করিয়াছেন, এবং সে বৈরাগ্যের অর্থ অনাশক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কবিতাটী নৈবেদ্যের মধ্যেই আছে।—ভারতের শিক্ষা।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চীতে
সর্ব্বফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে,
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

মৃত্যুবরণ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সারাজীবন স্বয়ম্বরা বেশে—
মালাটী নিয়ে ফিরেছি দেশে দেশে
বরের নাই দেখা
দিবস রাতি সন্ধানিয়া ফিরেছি একা একা।

লগ্ন মিছে,—লগ্ন কেন চাই?
চাতকী সম চেয়েছি বারিবাহ
আকাশে উড়ি উড়ি
মেলেনি কভু ফটিক জল বজ্রানলে পুড়ি।

এবারে তাই মরণ পানে চেয়ে
চলেছি ধেয়ে জীবন পথ বেয়ে
মিলন মধু খনে
বাসর রচি শেষের রাতে মরিব সে মরণে।

মরণ রূপে হে মরমিয়া বঁধু!
মরণ ক্ষণে বরণ করি বধূ
মন্ত্র পড়ি কানে
আমারে তুমি গ্রহণ কোরো কণ্ঠমালা দানে।

কতনা সুখ কত দুখের ভাব
সেই তো হবে আমার উপহার
যৌতুকেরি মত
সমর্পিয়া সকল কিছু রহিব আঁখি নত।

পরমাদরে চিবুকখানি ধরি
তুলিয়া যবে চাহিবে মরি মরি
আমার আঁখি পানে
তোমার সনে মিলিবে প্রাণ
আঁখিতে আঁখি দানে
মরণ কেবা জানে?

শহীদ হরিহর

মিহির আচার্য্য

ঘোলাটে মেঘে ঢেকে রয়েছে আকাশটা। ভোর অনেকক্ষণ হলেও শেষরাতের একটা ঝিম-ধরা বিষণ্ণতার ছোপ। সূর্য্য আজ আর উঠবে না মনে হয়। না উঠুক। কী হয় রাত ভোর হয়ে, সূর্য্য উঠে—প্রতিদিন পুরাণো পুঁথির পাতা ওলটানো, দিনের-পর-দিন মৃত্যুকে তিলে তিলে বরণ করে নেয়া, ক্ষয় করে ফেলা বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে।

চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু... চোখ অস্বীকার করলেও, মস্তিষ্কের মধ্যে সেই অজস্র জলধারার মতো সোচ্চার গর্জ্জন, কানের পর্দ্দায় সেই নিত্যকালের কাহিনীর গমক।

গায়ের চাদরটা দীর্ঘ করে নাকের ওপর টেনে দিলেন হরিহর।

বড়ো রাস্তার মোড় থেকে কিসের ও আওয়াজ! শ্মশানযাত্রীর কলরব? কান খাড়া করে দিলেন হরিহর। না শ্মশানযাত্রীর চীৎকার নয়—বৈতালিক সংগীত। ঘুমে জড়ানো, বেপথু গলায় ছেলেমেয়েদের গানের চেষ্টা। প্রভাত-ফেরী।

ভেতরে বারান্দায় ছেলেমেয়েরা জেগে উঠেছে। আজকের বিশেষ দিনটি আর বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে ক্ষয় করতে রাজি নয় তারা।

'খোকা'—পাশের ঘর থেকে সৌদামিনীর ভাঙা গলা।

'মা?' বড়ো ছেলে সুকান্তর আওয়াজ।

'তোর পকেটে পয়সা আছে বাবা?'

'দু' আনা পয়সা আছে মা—'

'তাই দে। ও বাবা তরু—যা না একবারটি বাজারে —চারপয়সার চা আর চিনি নিয়ে আসবি—'

তরু চীৎকার করে উঠেছে বদখত গলায়: 'না আমি পারবো না, পারবো না, কখ্খনো না—ছোড়দাকে বলো—'

'নিরু তা হলে তুই যা বাবা—'

'না। আমি পারবো না। আমার লজ্জা করে। চার পয়সার চা চিনি দিতে চায়না। দেখলে না, সেদিন তরুকে কী রকম গালাগালি করে উঠেছে!'

'নিরু. বখামো কোরো না। যাও বলছি—'সৌদামিনী ধমকে উঠলেন।

'না—না—না। আমি পারবো না বলে দিলুম—' নিরু ভীষণ গোঁ ধরে থাকে।

নিরু আচমকা কেঁদে উঠলো ফ্যাঁশ করে। সৌদামিনী রাগ সামলাতে না-পেরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছে ওর পিঠে। 'সব সত্তুর পেটে অন্ন দিয়েছি। আমার হয়েছে যতো জ্বালা...'

'মা, দাও পয়সাটা আমাকে দাও। আমি এনে দিচ্ছি' —জামা গায়ে দিয়ে চটি শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেলো সুকান্ত।

'খুকু—চায়ের জলটা চড়িয়ে দে মা—'

'দিচ্ছি মা—'বড়ো মেয়ে সুচিত্রা রান্নাঘরে চলে যায়।

নিরুর কান্নার একঘেয়েমি ক্রমশ পাতলা হতে-হতে মিলিয়ে গেলো এক সময়।

'কই উঠবে না তুমি?' ঘর ঝাঁট দিতে এসে স্বামীকে তাগিদ দিলো সৌদামিনী।

কোনো সাড়া নাই।

'কই—শুনছো—ওঠো বেলা হয়ে গেছে—'

'হুঁ—' হরিহর সাড়া দিলেন এবার, কিন্তু ওঠবার কোনো তাড়া দেখা গেলো না তার মধ্যে।

ধূসর চোখ মেলে বিছানা থেকে মাথার ওপরের কড়ি-কাঠের দূরত্ব মাপছিলেন হরিহর। কী সহজেই জটিল একটি সমস্যার আশু সমাধান হয়ে যায়। ওকোণের টেবলটা টেনে আনো মাঝামাঝি, টেবলের ওপর চেয়ারটা তুলে দাও, তারপর ওর ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই

কড়িকাঠের আলকাৎরা-লেপা আস্তরণগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়বে মাথার ওপর, চাদরটা গলিয়ে বের করে নাও বরাবর। ব্যস। একটা অবলম্বন তৈরী হলো। এবার গলার সংগে বেঁধে নাও চাদরটা শক্ত করে, তারপর পা দিয়ে চেয়ারটাকে আছড়ে ফেলে দাও। কিছুক্ষণ ঝুলবে শরীরটা, হাঁশপাশ লাগবে, একটু ছট্‌ফটানিও হয়তো হবে—তা হক। এছাড়া হাতের নাগালে চটকরে আর কী সমাধান পাওয়া যাচ্ছে।

'বাবা—' তরু ছুটে এসেছে।

শরীরটা হঠাৎ পিতৃত্বের অপরাধে হিম হয়ে যায় হরিহরের। এখুনি হয়তো নাকিসুরে ঘ্যান ঘ্যান করে উঠবে। রোজকার দাবী-দাওয়া। 'বাবা পয়সা দাও—মুড়ি আনতে হবে। খিদে পেয়েছে।' ভয়ে কাঁপতে লাগলেন হরিহর। ভয় নয়, অপমানে।

'বাবা—' তরুর কণ্ঠে অধৈর্য্যতা।

'উঁ ?'

'পয়সা দাও—ফ্ল্যাগ কিনবো—'

আশ্বস্ত হলেন হরিহর। যাক। বাঁচা গেছে। খাবার দাবী করেনি। মরার মতো চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন তিনি।

'ও বাবা শুনছো—পয়সা দাও—' অনেকক্ষণ একঘেয়ে চীৎকার করে কাঁদো-কাঁদো গলায় ভেতরে চলে গেলো তরু।

'মা ওমা— বাবা পয়সা দিলে না। ফ্ল্যাগ টাঙাতে হবে না ?' তরুর গলা পাওয়া যাচ্ছে ভেতর থেকে।

'কেন ? তেরঙে তো সেই ফ্ল্যাগটা আছে। ঐটেই দিদিকে বের করে দিতে বল্‌—'সৌদামিনী পরামর্শ দিলে।

'বারে! ঐটে টাঙানো যায়। পুরানো হয়ে গেছে, রঙ উঠে গেছে কবে!'

'জ্বালাসনে তরু—ঐটেই টাঙিয়ে দিগে যা—'

'হ্যাঃ দেবে! তিলকরা ওদের তেতলার ছাতে কী সুন্দর সিল্কের ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে। আর আমাদের ছাই ওই ছেঁড়া!'

'ওদের তেতলা বাড়ি তোদের একতলা। তফাৎ থাকবে না ?' সৌদামিনী যুক্তি দেখালো।

তরু মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। রাগে ফোঁশ-ফোঁশ করতে লাগলো।

'কী হয়েছে রে তরু ?' সুকান্ত এসে দাঁড়ালো কাছে।

'ত্যাখো না দাদা, একটা ফ্ল্যাগ কিনে দিতে বলছি···ঐ পুরানো ছেঁড়া ফ্ল্যাগ টাঙানো যায়!'

'তুই কী বোকারে! দেশ স্বাধীন হয়েছে কবে, আগে বল্‌ ? তিন বছর আগের স্বাধীনতা পুরানো হবে না, ছিঁড়ে যাবে না ?' কৌতুকভায় হেসে উঠলো সুকান্ত।

সৌদামিনী বললে, 'তুই আর ওদের মাথাগুলো খাসনে খোকা—'

সুকান্ত হাসলো আবার।

'ওমা ত্যাখো—নিরুর কাণ্ড···' ছুটতে ছুটতে এলো সুচিত্রা। হাসির উচ্ছাসে ফুলছে সে।

'একীরে কী করেছিস···' চোখ ফিরিয়ে দেখলো সৌদামিনী। ছোট্ট কঞ্চির আগায় এক টুকরো কালো নিশান ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে হাটছে নিরু।

হো-হো করে হেসে ফেটে পড়লো ওরা দুই ভাই বোনে। সুকান্ত আর সুচিত্রা। সৌদামিনীও কাণ্ড-কারখানা দেখে প্রথমে না-হেসে পারলো না। তারপর হাসি চেপে গম্ভীর গলায় নিরুকে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে ও ভূত—তোকে এফ্ল্যাগ কে তৈরী করে দিলে ?'

'বারে! আমি নিজে করেছি, না দাদা ?' বলে ঘুরে সুকান্তের কাছে সমর্থন চাইলো নিরু। 'কী বলে যে বলো না দাদা ? ইয়ে আজাদী···'

বেগতিক দেখে সরে পড়লো সুকান্ত।

সৌদামিনী থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছে

'দেখেছো কাণ্ডটা—?' স্বামীর সামনে চা এগিয়ে দিতে-দিতে বললে সৌদামিনী।

'হুঁ···খোকা বাড়িশুদ্ধ সবাইকে ইয়ে না করে তুলে ছাড়বে না। এরচেয়ে যদি একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টাও করতো। বি-এ পাশ ছেলে।···বাপ-মার দুঃখ কষ্ট কী বুঝলে!'

'ত্যাখো—খোকার সম্বন্ধে অমন কথা বোলোনা। চাকরি করে খোকার বাপই কোন্‌ দুঃখ-কষ্ট ঘোচাতে

পেরেছে, শুনি? সকাল-সন্ধ্যায় ছুটো ট্যুশানি করছে না ও?'

'হুঁ—বললাম ইনস্পেক্টারের চাকরিটা করতে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে সেধে বলেছিলেন…'

'লজ্জা করে না তোমার বলতে। তুমি নিজে বি-এ. পাশ করে কেন দারোগার চাকরীটি নিলে না। কেন সেকেণ্ড মাষ্টার হয়ে কাটিয়ে দিলে জীবনটা?'

'আহা—তা—' কোন জবাব দিতে না পেরে থেমে গেলেন হরিহর।

দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেলো সৌদামিনী।

বড় রাস্তার ওদিক থেকে মাইকে জাতীয় সংগীত ভেসে আসছে।

নতুন দিন। অতি কষ্টে ঢোক গিললেন হরিহর। তিনশ' পঁয়ষট্টির একটানা দিনগুলোর মধ্যে একটু কিছু যদি নতুনত্বের আমেজ দিতে পারতো আজকের এই দিনটি। ভিন্ন আস্বাদ। কিন্তু কই জোর করে যেন আনতে হচ্ছে নতুনত্বের আঘ্রাণ, কাগজের গোলাপ শুঁকে গন্ধ পাবার চেষ্টা! অথচ ওই দিনটির তপস্যায় যৌবনকে নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছেন তিনি, স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার বাঁধা-ধরা সড়ককে নিজের হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন অদ্ভুত জিদে। কিন্তু কী মিললো এই আত্মবলিদানের মারফত…কী পেলাম?

উঠে বসলেন হরিহর। বেরোতে হবে। চাল ডাল তেল নুন।

সূর্য্য কী আজ আর উঠবে না?

জানালার বাইরে বিরাট আম গাছটার মাথায় ফ্যাকাসে আকাশ। মাছের চোখের মত মৃত, পাংশে। এ-আকাশের কোনো ভাষা নেই। হরিহরের সংসারের মতোই অর্থহীন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

'একী কোথায় যাচ্ছিস?'

সুকান্ত।

'আমাদের ডেমোনেষ্ট্রেশন বেরোবে বাবা, সাড়ে সাতটায়—'

'আজকের দিনে আর হাঙামা করিসনে খোকা। এইতো সেদিন একটা মিথ্যে কেসে জড়িয়ে দিলে তোকে!'

সুকান্ত দাঁড়ালো।

'তুমি কী বলতে চাও, বাবা?'

'এ্যা! না—কী হবে মিছিমিছি হুজ্জুতি করে। কী হবে, কিছু হয় না—দেখলাম তো সারাজীবন… একটা নেশা, উচ্ছ্বাসমাত্র…' ছেলেকে বাধা দিতেও সাহস পাচ্ছেন না হরিহর। থরথরিয়ে উঠছে বুকের ভেতরটা।

'তুমি ভুল করেছো বাবা। আমাদের কাছে এটা নেশা নয়, পেশা…একমাত্র পেশা…' সুকান্ত পা বাড়ালো।

'একী তুইও…?' আটকে গেলো গলার স্বর হরিহরের।

সুচিত্রা। সুকান্ত।

'দাদা—আর দেরী কোরোনা। চলো—'

ওরা ভাইবোনে বেরিয়ে গেলো।

নেশা নয়, পেশা! ছেলের কথাটা মনে মনে আবার স্মরণ করে শিউরে উঠলেন হরিহর। তাহলে আমাদের ভুলটা কী সেইখানেই। নেশাগ্রস্তের মতো দেশের নিরেট মাটিকে আঁকড়ে ধরেছিলাম আমরা, পেশা করে নিতে পারিনি। তাই দেউলে হয়ে গেলাম, হৃতসর্ব্বস্ব, অঙ্গার।

রাজপথ।

পৃথিবী। আলো গান হাসি রং। এ যেন এক নতুন পৃথিবী। ছেলেবেলায় রূপকথায় পড়া স্বপ্নপুরী। এতো আনন্দ—এতো খুসি! ভাটা-পড়া বুকের রক্তগুলোতে পর্য্যন্ত শিরশিরানি বইয়ে দেয়। এই বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য্যের ঠাশবুনোনে যেন নেশা পেয়ে বসেছে। জীবনে যখন এতো আলো তখন তাঁর ঘরে এ অন্ধকার কেন!

শোভাযাত্রা। সংগীত। কলকণ্ঠ।

গলা শুকিয়ে যায় হরিহরের।

মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন কী রকম এক ভোঁতা অনুভূতি। কানের ভেতরে এক রাশ ঝিঝির সমস্বর,

সমস্ত শব্দ-ধ্বনি যেন তালগোল পাকিয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকে চোখের সামনে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি।

না! আজকের দিনটা অন্ততঃ আর জীবনকে নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করতে পারবেন না তিনি। রোজ ভিক্ষে করে দিন-এনে-দিন-খাওয়া পুরানো জীবনের রেওয়াজটা না হয় আজকের জন্যে নিরস্ত থাকুক। আজকের এই উৎসবের উচ্ছ্বাসে মনের খানা-গর্ত্তগুলো বুজিয়ে দিতে চান তিনি।

স্কুলের মাঠে জমায়েত ঘন হয়ে উঠেছে।

ছাদের কার্ণিশের সংগে বাঁধা একটা নতুন বাঁশ, মাঝামাঝি দড়ির গায়ে গুটিয়ে রাখা ফ্ল্যাগটা, সময় মতো উড়িয়ে দেয়া হবে।

'এইযে হরিহরবাবু এসেছেন—' ইতিহাসের শিক্ষক বিনোদবাবু।

হেডমাষ্টার ফিরলেন। 'আপনার এতো দেরী! আজকের দিনটাও অন্ততঃ নিষ্ঠার সংগে পালন করবেন আপনারা—'

'আজ্ঞে—' হরিহর বোকার মতো চেয়ে রইলেন। কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন না, কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না তিনি।

'আপনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। আপনাকে দিয়েই আমরা স্কুলের ফ্ল্যাগ হোয়েষ্ট সেরিমনি অবতারণ করবো—' হেডমাষ্টার বললেন।

'আমি—?' যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না হরিহর। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে ঘার টান করে পতাকার বাঁশটার দিকে তাকালেন। বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। পা টলছে, থরথর করছে হাতের কব্জি দুটো।

'এখন হরিহরবাবু ফ্ল্যাগ হোয়েষ্ট করেছেন—' পবিত্র গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ঘোষণা করলেন হেডমাষ্টার।

হরিহর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ছাদে উঠতে লাগলেন।

খোলা ছাদ। মাথার ওপরে বিষণ্ণ মরা আকাশ। নিচে দর্শকের অতোগুলো চোখ চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

আকাশের পানে আবার ক্ষুব্ধ চোখে চাইলেন হরিহর।

এ-আকাশে সূর্য্য কী আজ আর উঠবে না?

বাঁশের গা থেকে ফ্ল্যাগের দড়ির ফাঁশটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগলেন তিনি। হাত দু'টো অতো দুর্ব্বলভাবে কাঁপছে কেন!

দড়িটা ধরে টান দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন হরিহর।

একটা চীৎকার। স্কুলের সুমুখে পথের ওপর দৃষ্টি আটকে গেছে তাঁর। ছানি-পড়া চোখের সামনে ধুলোর ধোঁয়ার মধ্যে কতোগুলো অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। ভিড়-করা মানুষ, জীর্ণশীর্ণ, কারু হাত ভাঙ্গা, পা খোঁড়া, গর্ত্তে-ডোবা চোখগুলো জ্বলছে ওদের, মুষ্টিবদ্ধ হাত, চীৎকার করছে, একযোগে কতোগুলো ক্ষুধার্ত্ত বন্দী বাঘ যেন গর্জ্জন তুলেছে।

ছবিটাকে চোখের সামনে আরো স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে চোখদুটো রগড়ে নিলেন হরিহর। কাদের মুখের আদল ভাসছে, কারা চীৎকার করছে, আওয়াজ তুলছে। সুচিত্রা··· সুকান্ত···সুকান্ত···সুচিত্রা···

আরো এক পা এগিয়ে আসেন হরিহর। বিদ্যুতের মতো ঘটনাগুলো ঘটে গেলো। কার্ণিশের বাইরে একটা পা প্রথমে অবলম্বন হারিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলো, তারপর হরিহরের গোটা দেহটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে গেলো, ছাদ থেকে সিমেণ্ট-বাঁধানো বারান্দা, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়লো পাথরের মতো প্রাণহীন শক্ত দেহটা।

রামপ্রসাদ ও বাংলার সমাজ

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বেতারে আজকাল রামপ্রসাদী গান প্রায় নিত্যকারের কর্ম্মসূচীতে স্থান পাচ্ছে, এটা বড়ই সুখের কথা। যদিও সে সময়টা অনেকেই তাঁদের আদরের যন্ত্রটিকে বিশ্রাম দিয়ে থাকেন, তথাপি একবার অন্ততঃ দমকা হাওয়ার মতো সেই মান্ধাতার আমলের সুরটিকে তো বাতাসে ভাসানো হয়! তা ছাড়া রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সান্ধ্যানুষ্ঠানে অথবা বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন-ক্ষেত্রে বিজলী পাখার তলায় গিলে দিয়ে কোঁচানো ঢিলে আদ্দির পাঞ্জাবী তরুতরিয়ে বেহালাদার যখন প্রসাদী-সুর-বিকাশে আপন প্রাধান্য বিস্তার ক'রতে থাকেন আর শ্রোতৃমণ্ডলী মলয়স্পর্শে কাশপুষ্প দামের মত তালে তালে দুলতে থাকেন, তখন বুঝি সাধক কবি রামপ্রসাদের সৌভাগ্যের আর অবধি থাকে না! এ যুগের সভ্য সমাজ সর্ব্বত্র আড়ম্বর ক'রেই পূজা-অর্চনা ক'রে থাকেন। রামপ্রসাদও তাই কেবল আড়ম্বরের একটী উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে আছেন।

প্রাচীনপন্থী এক সম্প্রদায় এখনও আছেন, যাঁরা রামপ্রসাদ সম্পর্কে আর কিছু না হোক গুটিকতক কাহিনী আবৃত্তি ক'রে ভক্ত-রামপ্রসাদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে বেশ একটা দীপ্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে থাকেন। এই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা যতই ক্ষীণ হোক এবং যতই এঁদের কোন পরিচয় বা প্রচার না থাকুক, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে যদি কোথাও রামপ্রসাদের কোন কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার থাকে, তবে সেটা এঁদেরই বংশধরদের মধ্যে। নচেৎ কেবল প্রসাদী সুরের মধ্যে যে রামপ্রসাদের চর্চ্চা হ'চ্ছে, তা নিছক ফ্যাসানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে নবজীবন লাভ ক'রলো, গণনা ক'রে বলা যায় তা কখনও দীর্ঘায়ু হ'তে পারে না।

কথা হ'চ্ছে, রামপ্রসাদ কি কেবল একটা সুরের প্রবর্ত্তক? অথবা কেবল একজন মাতোয়ারা কালীভক্ত? কোন্ সূত্রে ও কি পর্য্যায়ে বাংলার সমাজে তাঁর অমরত্বের দাবী?

এই প্রশ্নের জবাব যে কেউ কখনও দেয়নি তা নয়; বর্ত্তমান প্রবন্ধের কৈফিয়ৎ হলো—

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

মণিগুলিকে বজ্রের দ্বারা বিদ্ধ করার কাজ মহারথীরাই ক'রে গেছেন, এখানে কোনগতিকে তাদের সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করা হবে। এই গাঁথুনির কাজে যে দক্ষতার প্রয়োজন, তা এ প্রবন্ধের কখনই নেই, সুতরাং শক্তগুলো হয়তো বাদ প'ড়ে যাবে, এ-কথা আগেই নিবেদন ক'রে রাখা ভালো।

কেন আমরা ভুলি যে, রামপ্রসাদ ছিলেন একজন সংসারী লোক? সংসারের পীড়নে তিনিও নিয়েছিলেন এক (টেম্পোরারী) কেরাণীগিরি? দিন চালানোর জন্যে তিনিও তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে তোমার-আমার মতো তিনিও যে ক্ষুদ্র ফসল ক্ষেতখানিকে বুকের রক্ত মনে ক'রে তার চারধারে বেড়া বেঁধেছেন কত যত্ন ক'রে। হয়তো বা কতদিন কাপড় আরও খানিক গুটিয়ে প'রে খালে-বিলে জাল ফেলে বেড়িয়েছেন মাছ সংগ্রহ ক'রবেন বলে। হয়তো বাংলা দেশের শতকরা আশীজনের মতো তিনিও সামান্য ভূসম্পত্তি বজায় রাখতে গিয়ে আদালতের অলিতে-গলিতে ঘোরা-ফেরা ক'রেছেন। ডিক্রীজারি, নিলাম-রদ প্রভৃতির ঘূর্ণি-পাকে তাঁকেও নাজেহাল হ'তে হ'য়েছে। তবে? তবে কেন আমরা রামপ্রসাদকে কেবল সাধক বা ভক্ত ব'লে আড়ষ্ট ক'রে তুলে ধরি? আবার যিনি এতখানি সংসারে মেতেছিলেন তাঁকে পুরোপুরি সাধক বলবো কি না, সেও তো একটা সমস্যা? কেউ কেউ হয়তো এর সমাধান ক'রে দেবেন এই ব'লে যে, রামপ্রসাদ ছিলেন একটা পাগল। সবই করতেন—যা যা আমরা করি, আর তারি

মধ্যে পাগলের মত কালী কীর্ত্তন ক'রে বেড়াতেন। অর্থাৎ তা' হ'লে রামপ্রসাদ ছিলেন যেন ঐ নৈহাটীর গয়ারাম সদ্দারের মতো। সে দিনের বেলা লোকের বাড়ী মজুর খাটে আর সন্ধ্যের পর রাস্তায় রাস্তায় ভীষণ চীৎকার ক'রে বন-জঙ্গলের জানোয়ারগুলোর পিলে চমকিয়ে দেয়। তাই কি? এ রকম কোন একজনের কাছ থেকে আমরা কি কোনদিন আশা ক'রতে পারি

"মা, আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখঢাকা বলদের মত।"

তবে রবীন্দ্রনাথ "পাগলে"র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বুঝি রামপ্রসাদকে অবিসম্বাদিতরূপে পাগলই বলতে হয়। তিনি বলেছেন, "প্রতিভা খেপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলটপালট করিতেই আসে। ... ... খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খেপামির একপ্রকার বিকাশ এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না।"

আমাদের রামপ্রসাদও ছিলেন এই প্রতিভাত্মক খেপামিগ্রস্ত পাকা সংসারী। সংসারের তাড়নায় জমিদারী সেরেস্তায় হিসাব লেখার কাজ করেছেন, যেমন আর পাঁচ জন করে, কিন্তু প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়েছে হিসাব খাতার আশে-পাশে—

"দে মা আমায় তহবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী···"

ইত্যাদিতে। ভাগ্যে সেই জমিদার জহুরী ছিলেন, তাই জহর চিনেছিলেন, নচেৎ সেরেস্তার মোড়ল-মাতব্বর আর সকলেই তো পাগল বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের কথা হলো, সংসার রামপ্রসাদ বেশ ভাল ভাবেই করেছেন, অথচ সাধন-ভজন তাঁর একদিনও বাদ পড়েনি। অথবা ঠিক করে বললে এই বলতে হয়, সংসারই ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ও সূত্র। তিনি ছিলেন বীরসাধক। সংসারাশ্রম ত্যাগ করে বনে গিয়ে নির্জ্জনে যে সাধনা, তার মধ্যে যে একটা পরাজয়ের স্বীকৃতি আছে, তা এই সাধকের মধ্যে ছিলো না। শতদিকে শতবাধা মুখ ব্যাদান করে যেখানে মানুষকে ধাপে ধাপে নামিয়ে আনবার জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে ঠিক সেখানে বসেই যিনি বলতে পারেন—

"কাজ কি আমার যেয়ে কাশী
ঘরে বসে পাই যদি মা গয়া-গঙ্গা-বারাণসী?"

তাঁর সেই "ঘরে বসার" স্বরূপটা বুঝতে গেলেই পাওয়া যায় এই বীরসাধনার পরিচয়।

তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন, নিজের জীবনে আচরণ করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, সংসার একটা বন্ধন-মাত্র নয়, এখানেই পাওয়া যায় মহাজীবনের আস্বাদন; সংসার মিথ্যা নয়, একে মহাসত্য বলে গ্রহণ করাই সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ। তবে এটা যে কণ্টকাকীর্ণ,—কুসুমাস্তীর্ণ নয়; এও তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথা হলো,—পরীক্ষা-ক্ষেত্রটি বড়ই কঠিন দেখে সেটা পাশ কাটিয়ে গেলে কি বুদ্ধিমানের কাজ করা হবে, না কি উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তার ভ্রূকুটিগুলোর জবাব দিতে পারাটাই মানুষের কাজ হবে? তিনি জানেন যে, "কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে" যারা সর্ব্বদাই আহারের লোভে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু তাই ব'লে এ জল ছেড়ে পালিয়ে যাবো—এ চিন্তা না করে নিজে "বিবেক-হলদি" গায়ে মেখে ডঙ্কা মেরে ঘুরে বেড়ান, তার গন্ধ পেয়ে কোন কুমীরই তাঁর ধারে ঘেঁস্‌তে পারে না। তিনি জানেন, হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে গুণরাজি বর্ত্তমান, তা রত্নাকরের অগাধ জলে থাকে চাপা দেওয়া; কিন্তু তাই ব'লে ভাগ্যের উপর নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন না, কেমন ক'রে ওস্তাদ ডুবুরী সেজে সেগুলোর উদ্ধার করা যায়, তার শিক্ষায় নিজেকে সারাজীবন নিয়োজিত রাখেন। তিনি জানেন, 'এ সংসার ধোকার টাটী', কিন্তু তাই বলে এটাকে মিথ্যা-মায়া মনে ক'রে চোখ বুজিয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে গোণা দিন কাটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চান না,—এখানে থেকেই 'মায়ার বেড়ি কিসে কাটি' তার উপায় উদ্ভাবন করে চলেন।

রামপ্রসাদ যে মাতোয়ারা কালীভক্ত ছিলেন, এ কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, কিন্তু ভক্তিকে তিনি জীবনের কোন্‌ কাজে লাগিয়েছিলেন, বা আদৌ কোন

কাজে লাগিয়েছিলেন কি না এ সব কথা অনেকেই আমরা ভেবে দেখি না। যাঁরা কেবল ভক্তির জন্মেই ভক্তি-চর্চ্চা করেন, রামপ্রসাদ যে তাঁদের দলের ন'ন, এটা যত্ন ক'রে মনে রাখা দরকার। ভক্তির জন্মে আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে দেখা যায়, ভক্তি মানুষের মনে আনে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত একটা আবেশ, উন্মাদনা, বিহ্বলতা। বৈষ্ণবী ভক্তি মানুষকে ক'রে দেয় কর্ম্মবিমুখ, জগতকে ক'রে তোলে একটা ঘৃণ্যস্থান, যা ছেড়ে যেতে পারলেই যেন ভক্তের জীবন ধন্য হয়। কিন্তু রামপ্রসাদের ভক্তি-সাধনার মধ্যে কোথাও এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও চেয়েছিলেন, "দাও ভক্তি, শান্তিরস,...যা সর্ব্বকর্ম্মে দিবে বল...।" তাঁর ভক্তি ছিল শক্তিরই পরিপোষক। মানব জমি পতিত থেকে যাবে, এ তিনি সহ্য ক'রতে পারতেন না, সেখানে আবাদ ক'রে সোণা ফলাবার জন্মে ছিল তাঁর অনন্ত ব্যাকুলতা। এই কৃষি-কাজ যে বড়ই কঠিন তা তিনি জান্‌তেন। সংসারকে এড়িয়ে কেবল ভক্তিগদ্‌গদ্ হয়ে দিন কাটাবার কল্পনা যদি তাঁর থাকতো তবে এই কাঠিন্যের কোন প্রশ্নই আসতো না। কিন্তু কর্ম্মজগতের ঘূর্ণীর মধ্যে থেকে ঐ মনের কৃষিকাজ চালাতে হবে বলেই তিনি ভাল ক'রে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। ফসল দুটো চারটে কোন গতিকে ফলালেই যে হয় না, তার রক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে যে সবই মাটি হয়ে যায়, তা এই কৃষকের বেশ খেয়াল ছিল, এবং এই রক্ষার কাজটা বেশী কঠিন বলে, তিনি পাছে 'ফসল তছরূপ' হয় সেই জ'ন্যে তাঁর ইষ্টমন্ত্র যে কালী-নাম তা দিয়ে বেশ শক্ত করে একটা বেড়া দিয়ে নিয়ে, তার পর 'চুটিয়ে' ফসল তুলে নিয়েছিলেন। নির্ব্বাণের ভক্তি তিনি কোনদিনই চাননি, তাঁর কথা হোলো—

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি॥"

রামপ্রসাদ কালীভক্ত ছিলেন বলে, অনেকে পৌত্তলিক বলে অতি সংক্ষেপে তাঁর সাধনার মূল্যাবধারণের কাজ সেরে দেন। কিন্তু তাঁর মূর্ত্তিপূজার স্বরূপটা একবার চোখ মেলে দেখে নেওয়া ভাল নয় কি? তাঁর মায়ের মূর্ত্তি তো নিছক মাটি-খড়-বিচালি দিয়ে তৈরী নয়, সে যে ত্রিভুবনময়ী: "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাও জান না। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার ক'রতে চাওরে উপাসনা॥" রামপ্রসাদ কালী-মূর্ত্তির সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে বস্‌তেন। কিন্তু তাঁর পূজার মন্ত্র ছিলো অভিনব: "জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়,আলোচাল আর বুট ভিজানা।"—এই গান যখন সেই পরমতত্ত্বজ্ঞের বিরাট কণ্ঠ থেকে ভরাট হ'য়ে বেরিয়ে আসতো, তখন কি এ জগতের সকল মায়া ভেদ ক'রে এই সাধক বাইরে সেই পুতুল-পূজারী থেকেও অন্তরে অদ্বৈতবাদের নির্ম্মলতার ষোল আনা অধিকার ভোগ ক'রতেন না? রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদের কথা বহু শাস্ত্রসমর্থন ও বহু পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিয়ে যান, ঠিক সেই তত্ত্বই কি নিতান্ত সাদা কথায় গলা ধ'রে ধ'রে গান করে রামপ্রসাদ আমাদের আগেই বুঝিয়ে যান নি? বরং সেই তত্ত্বকে সাধারণ লোকের পক্ষে স্থায়ীভাবে ধরে রাখবার পথ অনেক বেশী সহজ ক'রে দিয়ে গেছেন।

তাই বলছিলাম, রামপ্রসাদ কেবল একটা সুরের প্রবর্ত্তক বা কেবল একজন মাতোয়ারা কালীভক্ত ন'ন, বাংলার সমাজে তাঁর আসন আরও বিস্তৃততর ক্ষেত্রে পাতা রয়েছে; তাঁর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য নেহাৎ দু'চার কথায় সেরে দেবার মতো নয়।

তিনি যে সাধনার পথ দেখিয়ে গেছেন, সেই মাতৃপূজা, সেটা হলো বাংলার একান্তরূপে নিজস্ব। বাংলা মাতৃ-পূজার দেশ; মায়ের চেয়ে বড়ো এখানে কেউ নেই। জন্মভূমিকে এই বাংলাই সর্ব্বপ্রথম প্রণাম করেছে 'বন্দে মাতরম্' ব'লে, আর তাই শিখেছে সারা ভারত। এ যেমন রামপ্রসাদের পরের কথা বলা হোলো, তেমনি রাম-প্রসাদের অনেক আগেই যে এদেশ ছিলো প্রধানতঃ আদ্যাশক্তির দেশ, এ কথা কারও অজানা নেই। সুতরাং এই বীর-সাধক তত্ত্বজ্ঞানের চরম শিখরে উঠে থাকলেও সাধন-পদ্ধতিকে সেই সনাতন রীতিতেই রেখে গেছেন, খালি দিয়ে গেছেন তাতে নূতন আলো, নূতন শক্তি, নূতন

গতি। কোমলে-কঠোরে বাংলা যে চিরকালই অনন্যা, তাই কোমল-কঠোরে কালীমূর্ত্তিই তার চিরকালের উপাস্যা। এই বাংলার সন্তান হ'য়ে রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে কি এর ব্যতিক্রম হতে পারে? তাই রামপ্রসাদ বাঙালীর পরমাত্মীয়, তাঁর সঙ্গে এ সমাজের একেবারে নাড়ীর যোগ। তিনি এ সমাজের পরম গুরু, আবার প্রাণের বন্ধু; কিছুতেই নিজেকে একটা অভাবনীয় দূরত্বে নিয়ে যাননি। গার্হস্থ্যধর্ম্ম, সাধন-ভজন ইত্যাদি বিষয় ছেড়ে তিনি যে ধ'রেছিলেন আগমনী গান, সে কেবল সকলের হ'য়ে বাৎসল্যরসের অনুশীলন করবার জন্যে। মা ও মেয়ের চোখের জল বাংলার বড় আদরের, বড় শ্রদ্ধার, বড় বিশুদ্ধ উপভোগের জিনিষ। চোখের জলে বাংলা সব ক'রতে পারে, এরই মধ্যে এদেশে ধরা রয়েছে সকল ধর্ম্মের সারাংশ। এখানকার বীরেরাও চোখের জলে বীরত্বের জ্যোতি বাড়িয়ে নেয়, ম্লান বা নিষ্প্রভ হ'তে দেয় না। বীর-সাধক রামপ্রসাদও তাই আগমনী-গানের অশ্রু-সজল স্পর্শ দিয়ে তাঁর সমগ্র সাধনাকে সঞ্জীবিত করে রেখে গেছেন।

রাম-রাজ্য

অনিমেন্দু চক্রবর্ত্তী

গণ-দানবের ক্রোধে প্রকম্পিত রাঘব-সাম্রাজ্য,
স্বেচ্ছায় স্বাগত তাই ভক্তপ্রাণ ডলার-দেবতা,—
দুষ্কৃত-বিনাশে হবে নিরাপদ মূলগত ধন,
শাখায় ঝুলিবে কালে পরিপক্ক সুদের ফসল।
অন্ন নাই,
বস্ত্র নাই,
বাস্তু নাই,
নাই—নাই শুনিবার কোথা কর্ণধার?
স্বরাজের ভিত্তি গড়ো শীর্ণহাড়ে প্রাণপিণ্ড ত্যাগে,
শান্তির প্রতিমা পিছে চেপে রাখো
দুর্ব্বিনীত জ্বলন্ত নিশ্বাস।
গৃহ-স্বার্থ নয় আর—বিশ্বশান্তি সমূহ বিপদে,
কোটি করোটির বজ্রে ধ্বংস করো অবাধ্য মানুষে,
ইন্দ্রের শাসন-স্বর্গে ভীতা লক্ষ্মী হাস্থন বিরামে,
তারপর রাম-রাজ্যে 'সীতারাম' জমিবে অদ্ভুত!

সনেট

আলোক সরকার

দেখ না আকাশ সব মেঘে মেঘে ভরে গেলো।
হাওয়া
কেমন প্রেমের মতো শান্তির শীতল জল আনে।
বসে আছি প্রতীক্ষায় একা এই দুয়ারেতে গানে
এমন উদাস করা হেমন্তের সুর। এই চাওয়া
বলো আর কতকাল? আরো কতকাল এই চাওয়া!
জীবনের এ-ফাল্গুনী কৃষ্ণচূড়া লালিমার গানে
পলাশের দাক্ষিণ্যের বর্ষায় অম্লান হবে। প্রাণে
সব জিজ্ঞাসার অবসান। আনন্দিত দীপ্ত পাওয়া।
সে কতো সূর্য্যের জন্ম এই দুয়ারের প্রতীক্ষায়।
কত ঝড় ডেকে গেলো। বিশ্বাসের প্রদীপ্ত শিখায়
এতটুকু দ্বিধা নেই অনির্ব্বান আকুল আরতি।
ম্লান হেসে ঠেলে দিয়ে যুক্তি তর্ক কী অবহেলায়
একা আজো বসে আছি। দেখো তুমি আকাশ আবার
মেঘে ভরে। দয়া করো। টানো দীর্ঘ প্রতীক্ষার যতি।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রাসাদ কক্ষ]

(হরিদেব এবং দীননাথ বসিয়া)

হরিদেব—দীননাথ! ভূরস্থুটের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার বিষয় আজ রাজা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা কর্ব্বেন। শঙ্করী মায়ের প্রেরণায় রাজ্যে যে নব-জীবনের উন্মেষ হয়েছে, তাতে আমরা সকলেই আশান্বিত। কিন্তু তবুও কেন জানি না সর্দ্দারজী, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না—

দীননাথ—গুরুদেব! মায়ের পূজার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছেন—সমস্ত জাতিকে এমন করে জাগিয়েছেন তবু মা আমার মুখ তুলে চাইবেন না?

(সুমিত্রা সহ সেনাপতির প্রবেশ)

হরিদেব—এস চতুর্ভুজ—আয় মা সুমিত্রা—

(উভয়ে প্রণাম করিলেন—চতুর্ভুজ আসন গ্রহণ করিলেন।)

সুমিত্রা—দেব! কতদিন আমার ভগ্নীকে দেখিনি তাই দেখতে এলাম। (দীননাথের প্রতি) কাকা! আপনাকেও আজ এখানে দেখতে পেলাম—কতদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

হরিদেব—মা, শঙ্করী আর তুমি ছিলে আমার আশ্রমের প্রাণ। তোমাদের আদর্শে আমার আশ্রমের শিক্ষা-দীক্ষা সহজ ও সুসাধ্য হ'য়ে উঠতো। মা! সমগ্র ভূরস্থুট চেয়ে আছে তোমাদের দিকে। মা! তারা চায় জাগরণ—আলো প্রেরণা—

সুমিত্রা—দেব! আপনাদের শিক্ষার গৌরবকে অমলিন রাখতে পারবে ভূরস্থুটের সন্তানরা। আমাকে এমন করে বলবেন না—মহান আদর্শের আধার আপনারা! আমার কতটুকু শক্তি—অসীম শক্তির আধার আপনি—মামা—কাকা—(ধীরে ধীরে রুদ্রনারায়ণের প্রবেশ) এই ত্যাগী শক্তি সাধকদের আদর্শে ভূরস্থুট আজ গৌরবান্বিত!

রুদ্রনারায়ণ—ঠিক বলেছেন দেবী!

সুমিত্রা—(মৃদু হাসিয়া) মহান্! আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শ্রেষ্ঠ পূজারী! আপনার রাজ্যে মাতৃপূজার আয়োজন সবার মর্ম্ম স্পর্শ করেছে—তাই দেখতে এলাম আমার বোনটিকে—আর বলতে এলাম সত্যই অভূতপূর্ব্ব!

রুদ্র—আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার অলৌকিক-উদ্দীপনায় রাজশক্তি পরিপুষ্ট হয়েছে। (একান্তে) এখানে আর বিলম্ব না করে রাণীর কাছে চলুন। সেখানে আপনার উপস্থিতি বড় দরকার।

(পরিচারিকা সহ সুমিত্রাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া বসিলেন।)

বলুন দেব! মন্ত্রী এখনও এলেন না কেন? বিপদ-শঙ্কুল দীর্ঘপথ—জানি মন্ত্রী অশেষ কৌশলী, তবুও ভয় হয়। হ্যাঁ, কিছু গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ আপনাদের সঙ্গে কর্ত্তে চাই।

চতুঃ—বলুন আমরা প্রস্তুত।

রুদ্র—আমি জানি রাজ্য আমার সুরক্ষিত—আর আপনার সৈন্যসব সুশিক্ষিত এবং সকল প্রকার বিপদের জন্য সকল ব্যবস্থাই করা হয়েছে এবং সদা সতর্ক প্রহরী সব দিকেই দৃষ্টি রেখেছে। বর্ত্তমানে আরও কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাই আপনাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য।

দীননাথ—ভূরস্থুটের রক্ষার জন্য—তার সৈন্যবল ও নৌ বল যথেষ্ট। তবে শত্রু কে এবং তার বল কি প্রকার তাও জানা আবশ্যক।

রুদ্র—এইটাই ত সমস্যা! পাঠান সর্দ্দার চান আমি তার সাহায্য করি আর মোগল সম্রাটও চান ভারতে

আধিপত্য বিস্তারে ভুরস্থুটের আনুগত্য। এই কার্য্যের জন্য মন্ত্রী গেছেন দিল্লীতে আর পাঠান জানাচ্ছে তার দাবী। মোগল কিম্বা পাঠান কার সহায়তা করা কর্ত্তব্য তারই পরামর্শ আমি চাই—

দীননাথ—রাজা! ভুরস্থুটের শক্তি বৃদ্ধি করে—স্বরাজ্যে ও বাংলার শান্তি অক্ষুন্ন রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। তাতে যদি পাঠান সহায়ক হয় তবে পাঠানকে আমরা কেন না সাহায্য করি?

চতুঃ—সকল সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিত। পাঠান বা মোগল যাদের সাহায্য করলে আমাদের সুবিধা বেশী, তাদেরই আমরা সাহায্য কোর্ব্ব।

হরিদেব—রাজা! আজ ভারতে একটা গঠনের সময় এসেছে। এ পুণ্য ভূমির শাশ্বত কালের সাধনা সমগ্র জাতির অন্তরকে শুভ্র পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত করুক। বিরুদ্ধ শক্তির অর্থহীন দ্বন্দ্ব দুরীভূত হোক। পাঠান—মোগল—হিন্দু সকলেরই জন্মভূমি ভারত—মার পূজায় সকলেরই অধিকার সমান। মানুষকে রক্ষা করার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করার শক্তি তারই হাতে তুলে দেন ভগবান, যে তাকে চালনা করে সৃষ্টির সহায়করূপে সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য্যের বীজ বপন কর্ত্তে। রাজা! অন্তর আমার বলছে সে বাণী আসবে। শক্তি দিয়ে শক্তির অধিকার কতক্ষণ থাকে—জান না কি অত্যাচার—ধ্বংস-মৃত্যু দিয়ে দুর্ব্বলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে মহাশক্তিশালীও তার আধিপত্য হারিয়ে ফেলে। যে শক্তির গৌরবকে প্রেমের অমল স্পর্শ দিয়ে অক্ষুন্ন রাখবে তারই হাতে তুলে দাও শাসনের পবিত্র দণ্ড—সেই শক্তি পরিপুষ্ট কর। ধ্বংস-কারীর ধ্বংসের নেশা অটুট থাক, সৃষ্টি-শৃঙ্খলা-শান্তি তার অধিকারের বাইরে—

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—ছাওনাপুর দুর্গাধিপতি সূর্য্যদেব সাক্ষাত প্রার্থী। বিশেষ গোপনীয় রাজকার্য্য—

রাজা—(সকলের দিকে চাহিয়া) এখানেই নিয়ে এস—(প্রতিহারীর প্রস্থান ও পরে সূর্য্যদেবের প্রবেশ ও অভিবাদন) কি সর্দ্দার—এমন কি জরুরী সংবাদ? আপনাকে বিশেষ ক্লান্ত ও বিচলিত দেখছি।

সূর্য্যদেব—ওসমান খাঁ খানাকুল জঙ্গলের পরপারস্থিত কয়েকখানি গ্রাম লুট করেছে—তাতেও দুর্বৃত্ত শান্ত হয়নি—শত-সহস্র গ্রামবাসীর বাসস্থান জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের উপর অসম্ভব অত্যাচার করেছে—তারা দলে দলে জঙ্গল পার হয়ে এসে ছাওনাপুরে আশ্রয় নিতে আসছে—স্ত্রী-লোক—শিশু—বৃদ্ধ—অশক্ত। খানাকুল জঙ্গলের কালু চাঁড়াল তাদের রক্ষক। রাজা! পাঠান সর্দ্দারের এই অহেতুক অত্যাচারের খবর পেয়ে ছাওনাপুর দুর্গের হিন্দু মুসলমান সৈন্যগণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে আমি নিজে এসেছি। হুকুম দিন—

রুদ্র—স্থির হও সূর্য্যদেব! বড় সুসময়ে তুমি এসেছ। সেনাপতি! কর্ত্তব্য স্থির কর। এ অত্যাচার শান্ত করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। হয় বল প্রয়োগে—না হয় পাঠান সর্দ্দারের দাবী পূরণ করে। সে চায় অত্যাচার আর পীড়ন আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে তার অধিকার স্থাপন কোর্ত্তে—

দীননাথ—রাজা! বাংলার শান্ত-সুন্দর দেহে অত্যা-চারের আঘাত বাংলা মায়ের সন্তানেরা সহ্য কর্ব্বে না। প্রতিকার কর রাজা। গুরুদেব! বীর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার সন্তানদের মাতৃ-অঙ্গে এ আঘাত প্রতিরোধ করবার যোগ্য ব্যবস্থা করুন।

রুদ্র—সেনাপতি! ওসমানের সৈন্যবল কত?

চতুঃ—আমার মনে হয় পাঠান সর্দ্দার সমগ্র শক্তি নিয়ে বাংলায় আসেনি। তবে তার সঙ্গে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য পাঁচ সহস্র আছে।

রুদ্র- উত্তম। সূর্য্যদেব! ছাওনাপুর বেশ সুরক্ষিত আছে ত? (সূর্য্যদেব ইঙ্গিতে তার উত্তর দিলে) তবে আমার আদেশ—হ্যাঁ গুরুদেব! (চরণদাসের প্রবেশ) কি খবর চরণদাস?

চরণদাস—মন্ত্রী মহাশয় ফিরেছেন এবং অবিলম্বে সাক্ষাৎ প্রার্থনার অপেক্ষা করছেন—আদেশ—

রুদ্র—হ্যাঁ নিয়ে এস—(চরণদাসের প্রস্থান)

হরিদেব—রাজা মন্ত্রী যখন এসেছেন—তাঁর বার্ত্তা শুনে সকল দিক ভেবে কর্ত্তব্য স্থির করাই বিধেয়।

রুদ্র—যথা আজ্ঞা গুরুদেব! ছাওনাপুরাধিপতি! আপনি কিছুকাল বিশ্রাম করুন। যথাযোগ্য আদেশ শীঘ্র পাবেন। কে আছিস্ (প্রতিহারীর প্রবেশ) সর্দ্দার-জীকে আরামবাসে নিয়ে যা—তিনি পরিশ্রান্ত।

(সূর্য্যদেব ও প্রতিহারীর প্রস্থান—অপরদিক দিয়া দুর্লভদত্ত প্রবেশ করিলেন ও সকলকে অভিবাদন ও সম্ভাষণ।)

রুদ্র—পথে কোন বিপদ হয়নি ত? আমরা সকলে চিন্তান্বিত অন্তরে তোমার অপেক্ষা করছি।

দুর্লভ—না পথে কোন বিপদ হয় নি, তবে ফিরবার পথে ভুরসুট সীমান্তে পাঠানের অত্যাচারে মন বড় বিচলিত হলো। সাবধান না হলে হয়তো আমারও বিপদ হতো। যাক সে কথা। রাজ্যের সব কুশল ত? সেনাপতি! গুরুদেব! অনেকদিন রাজ্য ছাড়া।

হরিদেব—হ্যাঁ সমস্ত কুশল মন্ত্রি! এখন আমরা তোমার বার্ত্তা শোনার জন্য উৎসুক। বল মন্ত্রি! দিল্লীর বাদশার সঙ্গে তোমার কোন কথা হোল?

দুর্লভ—হ্যাঁ গুরুদেব! মহামান্য সম্রাট—মহারাজা মানসিংহ ও তোডরমল্লজীর সামনে আমার সঙ্গে বহু বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সম্রাট বিচক্ষণ, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সকলকেই ব্যক্ত করেছেন। ভারতের ক্ষুদ্র স্বার্থগত বৈষম্য দূর করে একটা জাতির হাতে তুলে দিতে চান ভারতের সুখ-শান্তি রক্ষার ভার। বাংলাকে আর তার সন্তানদের তিনি চিনেছেন। তাঁর মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাংলার স্থান সর্ব্বাগ্রে। তাই বাংলার সাহায্য তিনি চান। পাঠানের অত্যাচার তিনি সাময়িক বলে মনে করেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গালী পাঠানকে বিধ্বস্ত ও আয়ত্ত করবে। তিনি ভুরসুট রাজ্যের বন্ধুত্ব চান—তাঁর জাতিগঠন কার্য্যে ভুরসুট রাজকে সাহায্য করতে তিনি সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলার ভুঁইয়া রাজারা অনেকেই সম্রাটকে সাহায্য কর্ব্বেন, তিনি আশা করেন।

রুদ্র—এখন আপনাদের অভিমত জানতে ইচ্ছা করি।

হরিদেব—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি রাজা, ভুরসুটের শান্তি তুমি রক্ষা কর।

চতু:—রাজার আদেশ আমার সর্ব্বথা পালনীয়—আদেশ করুন—

রুদ্র—আমি স্থির করেছি—ভুরসুট সর্ব্বান্তঃকরণে দিল্লীর সম্রাটের মহান্ আদর্শ গ্রহণ কর্ব্বে—পাঠানকে তার অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি দেবে। ভুরসুটের বীর সৈন্যগণ ছাওনাপুর দুর্গ থেকে আক্রমণের যোগ্য ব্যবস্থা করুন। সেনাপতি—

চতু:—আপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে, তবে ভুরসুট সৈন্য প্রস্তুত থেকে আক্রমণের প্রতীক্ষা করে—এই আমার সমীচিন বলে মনে হয়।

দুর্লভ শত্রুকে রাজ্য সীমানার বাইরে আক্রমণ করাই বিধেয় বলে মনে করি।

চতু:—রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা সব ঠিক রাখা আবশ্যক। ভুরসুটের শিশু ও নারীর রক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বোপরি আবশ্যক—তাই বলছিলাম কিছু সময়—

দীননাথ—সেনাপতির এ যুক্তি বিবেচনার বিষয়।

চতু:—রাজ্যের স্ত্রীলোক-বৃদ্ধ-শিশু-অশক্ত সকলকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করার দরকার তাই আমি সকলকে স্মরণ করাতে চাই।

(সুমিত্রার প্রবেশ)

রুদ্র—আসুন দেবী! মোগল সম্রাট চায় ভুরসুটের মিত্রতা আর পাঠান সর্দ্দার চায় অত্যাচার দিয়ে আধিপত্য স্থাপন কোর্ত্তে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসায় আপনার বক্তব্য বলুন। নগর, নারী ও দুর্ব্বলদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সময়ের আবশ্যকতা আছে। ততদিন আমরা পাঠানকে বাধা দিতে পারবো না।

সুমিত্রা—গুরুদেব আর আপনারা বিচক্ষণ সমরকুশলী বীর। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি আপনারা। আমার এখানে কথা বলার অধিকার কোথায়?

হরিদেব—মা সুমিত্রা! রাণীর কথার মধ্যে যে তোমার বাণী আছে তা আমরা জানি। বল মা, শক্তি পূজায় তোমাদের কথা আমাদের বড় শক্তি।

সুমিত্রা—মহাত্মন্‌। ভুরসুটের নারীশক্তি মায়ের পূজায় সদা জাগ্রত! ক্ষমা করবেন—আমার ভগ্নী—আমার সহচরী এ রাজ্যের রাণী—রাজ্যের নারীশক্তিকে গড়ে তুলেছেন। আত্মরক্ষায় শুধু নয়—রাজ্য রক্ষায়, জন্মভূমির সম্মান রক্ষায় তারাও প্রস্তুত। পাঠান হোক আর মোগল হোক যে মদমত্ত সামান্য খেয়ালের বশে নিরীহ লোকগুলোর উপর অত্যাচার করবে, সামান্য গৃহস্থের শান্ত জীবনযাত্রায় বাধা দিতে আসবে, সেই অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে ভুরসুটের নারী-সৈন্য পশ্চাৎপদ হবে না। পাঠান যদি চায় সে শক্তির আস্বাদ তা হলে বিলম্ব কেন? রাজা! আদেশ দিন—মায়ের পবিত্র অঙ্গে অত্যাচারীর অস্ত্রের আঘাতের অপেক্ষায় আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না।

রুদ্র—দেবী! বুঝেছি। গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন। সেনাপতি! থানাকুলের অরণ্যে কালু সর্দ্দারের সহায়তা করো—আদেশ দাও ছাওনাপুর দুর্গাধ্যক্ষকে, একটি নিরীহ গ্রামবাসীও যেন পাঠানের দ্বারা আক্রান্ত না হয়। (উঠিলেন)

চতুঃ—যথা আজ্ঞা। আমি নিজে গিয়ে সকল ব্যবস্থা কোর্ব্বো মা!

রুদ্র—সেনাপতি আমি নিশ্চিন্ত। দেবী! রাজার আতিথ্য নয়—প্রিয় সহচরীর কাছে—

সুমিত্রা—মামা! (অনুমতি চাহিলেন)

চতুঃ—হ্যাঁ মা—

[সকলের প্রস্থান]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[থানাকুল জঙ্গলের একাংশ।]

(যুদ্ধবেশে কালু সর্দ্দার, জগাই, রমাই, বিশ্বনাথ। কয়েকজন বুনো সৈনিক দূরে দূরে পাহারা দিচ্ছে।)

কালু—আরে জগাই—রমাই—সব ঠিক আছেরে? দেখ এ জঙ্গল তুদের সব জানা। দেখিস একজনও না মরে, আমার মান আজ তুদের হাতে। আরে দুষমন কচি কচি ছেলিয়াগুলো তাদেরও ছাড়ে না! ভগবান! তুমার কাজ তুমি জান। কালু থাকতে একজনেরও প্রাণ যাবে না—আমার রাজা কি বলবে! রমাই—জগাই—তুরা আমার বড় হুসিয়ার—

জগাই—আরে ওস্তাদ অমন বলিস্‌ না। তুহার কাছে মোদের জান—যেমনটি বল্‌বি করে দিব। গাছে গাছে চড়ে আছে সাতশ বুনো ভাই—পাতাটি নড়লে অস্ত্রটি ছুড়বে—দেখিস্‌ সর্দ্দার তুহার কাছে আর কি বলি? ছেলিয়া পুলিয়া মেয়েলোক। আর কেউ যেন সীমানায় বাহারকে না যায়।

রমাই—গুরুজী! তুহার পায়ের ধুলার জোর আছে। এ জঙ্গলে পাঠানগুলো কিছু করতে পারবে না। আমরা বসে থাকবো তবে খাওয়া-দাওয়ার ওদের সব ঠিক রাখিস্‌—

বিশ্বনাথ—কোনও ভয় নেই কালু ভাই। আমার সঙ্গে যা জিনিষ আছে অনেকদিন চলবে। আর টাকা যত লাগে দেবো আমি—ও আর আমার কি হবে? এইত কাজ। শুনিস্‌নি কালু ভাই—সেই রাণীমায়ের কথা! মায়ের দয়া রে সর্দ্দার মায়ের দয়া! ছেলে মেয়েগুলোকে বাঁচারে সর্দ্দার আগে। সর্দ্দার ভাই আমায় একটা হাতিয়ার দেনা ভাই—যদি কাউকে সামনে পাই (হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে আঘাত করার ভঙ্গী।)

কালু—(হাসিলেন) সাবাস্‌! আমার বুড়ো ভাইয়া, টাকাও দিবি আবার লড়াইও করবি? তু বাঁচিয়ে থাকলে অনেক লোক বাঁচবে। যা আর দিক্‌ করিস্‌ না। জানিস না আমি কেমন হয়ে আছি এতগুলো জান বাঁচাতে! জানিস্‌ তো মোদের রাজা আর রাণীটিকে—বাপ! রাগ্‌লে আর রক্ষাটি নেই—জগাই—রমাই—দেখিস্‌ বাপ!

(জগাই-রমাইরা প্রণামান্তে প্রস্থান। —ছদ্মবেশী অনন্তকে লইয়া বিরাটকায় গজপতির প্রবেশ)

কালু—এটি কেরে—গজাভাইটি?

গজপতি—(অনন্তকে ভাল করিয়া দেখিয়া—তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া টিপিয়া—তাহার চোখ, নাক, কান সমস্ত দেখিয়া বারবার তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) এ সর্দ্দার, তু দেখ্‌ এ কথা বলে না। আর

বলিসৃত এর জানটা লিয়ে লিব একঘায়ে (হাত উঠাইয়া) আরে কথা বল্—

কালু—(একদৃষ্টে তাহাকে দেখিয়া) কি চাই তুমার ? কথা বল না বাবা—

অনন্ত—(গজপতির দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া) আমার ওর দিকে চাইতে ভয় করে। (গজপতির ভ্রূকুটি) ও কি ! অমন করছে কেন ? সর্দ্দারজী আমার বেটার একটা মেয়ে কোথায় গেল তাই খুঁজছি—সর্দ্দার রাস্তাটা যদি ব'লে দিস্—

কালু—কেমন তোর মেইয়াটিরে ? রমাই—জগাই—

বিশ্বনাথ—বলো বাবা সর্দ্দারজীকে সব খবর পাবে। আহা ! (বেগে কুনালের প্রবেশ)

কুনাল—এই যে ! এইবার নে—তোর জান ত—

অনন্ত—সর্দ্দার ! দোহাই তোমার—এই ছেলেটাই আমার মেয়ে নিয়েছে—আর আমায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

কালু সর্দ্দার—আরে কুনাল ভাইয়া—উহার বেটার মেইয়াটিরে তু কোথাকে লিবি ?

কুনাল—আমি সাদি কোর্ব্বো সর্দ্দার—আরে বেটা গায়ের কাপড়াটি ফেলবি না, তীর মারবো।

গজপতি—আরে ছেলিয়া—সর্দ্দারটি হুকুমটি দিলেই মারবো হামি—হ্যাঁ ! তীর কেন ? হাত তুদের কম জোর তাই হাতিয়ার—

(নিজের বিশাল হাত বাহির করিয়া দেখাইল।)

কুনাল—আরে সোজা কথা বলবি না আমি সর্দ্দারকে ব'লে দুবো ?

অনন্ত—আমি—সর্দ্দার এই এদিকে—বুঝলে না—বাবারা আমার ছেলের মেয়েটাকে একটু খুঁজতে বেরিয়েছি—সে কোথায় আছে—

কুনাল-চুপ্-চুপ্—মারবো আর গান গাইবো—পাজী !—শুন্ সর্দ্দার—ই জঙ্গলের উপারে দুষমনের জায়গা যেখানে, নাচতে নাচতে সেখানটিতে যাই—এই লুকটা চর আছে—এই দেখ (তোর গায়ের চাদরটি টানিয়া লইতে অনন্তের দেহে মুসলমান সৈনিকের চিহ্ন দেখিয়া সকলে শিহরিল। গজপতি তাহাকে মারিবার জন্ত ধরিল—কুনাল হাসিয়া তীর উঠাইল) আরে তুর বেটার মেইয়া আমি সাদি কোরবো রে—সাদি কোরবো।

(অনন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল)

কালু—(সকলকে নিরস্ত করিয়া) যারে গজপতি ! হাত-পা বাঁধিয়ে ঐ জঙ্গলে গর্ত্তর ভিতর রাখরে—আর তুরা সব সাবধান। আরে জানোয়ার ! টাকার লোভে দেশ চিনলি না ! সয়তানকে ডেকে এনে আপনার জাত ভাইদের প্রাণে মারবি ! তাদের ঘর জ্বালালি, সব কেড়ে নিলি, তাদের কত কষ্ট দিলি। তবু তুরা—আরে সয়তান—পাজী !

গজপতি—হুকুম দেরে সর্দ্দার ! উয়ারে ঐ গাছের গায়ে আছড়ে-আছড়ে গুঁড়া করি। কেন তু বাঁচবি—বল্—বল্ সর্দ্দার— (মস্তক ধরিল)

কুনাল—(হাসিল) মার—মার—সয়তান ! মার। আমার দিদির রাজ্যে সয়তান এলো—তোরা মার—আমি নাচি !

কালু—(হাত তুলিয়া) আরে গজা এমন পাজীরে মারিস্ না। রেখে দে, রাজার কাছে লিয়ে দিব। আমার রাজা যেমন করে তেমন হবে। এখন তোরা লিয়ে যা (গজপতির অনন্তকে লইয়া প্রস্থান) কুনাল—কুথা যাবি ?

কুনাল—আমার অনেক কাজ। হাওয়ায় মিশে থাকি —কে কোথায় আছে কি করছে—সব দেখি। আমি যাই পাঠানের আড্ডায়—আমি যাই দিদির কাছে। আমার কত কাজ রে সর্দ্দার ! কত—

(লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান)

বিশ্বনাথ—কেরে এমন সোনার ছেলে। আহা ! প্রাণ আমার নিয়ে গেল আমায় দেনা সর্দ্দার—একবার দেখেছিলুম রাজার দরবারে—আবার দেখলুম এইখানে। কে রে !

কালু—আমি জানি না ভাই। উটি বনের ছেলে বনেই থাকে। আমার রাণীমাকে ডাকে "দিদি"—নেচে-গেয়ে বেড়ায়, আবার কাজের সময় ঠিক আসবে—ভাই ধরতে লারবি, উ বনের পাখী বনেই থাকে। দেখিস্ নি রাজা খাঁচায় ওকে রাখতে পারে নি। চল দাদা সব দেখে-শুনে আসি। (প্রস্থান)

[থানাকুল জঙ্গলের অপর পার্শ্ব।
ওসমান খাঁর শিবির।]

(ওসমান, উজীর ও হুসেন বসিয়া)

ওসমান—আর কতদিন এমন ক'রে ব'সে থাকা যাবে! দেরী করছ কেন হুসেন? এগিয়ে চল। আমি জানি কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। আমার প্রভুকেও করেনি আর আমাকেও কেউ সাহায্য করবে না।

হুসেন—না হুজুর, অনন্তকে পাঠিয়েছি খবরটা আনতে—কালু চাঁড়ালের দল শুনলাম তাদের আগলে নিয়ে বসে আছে—আর কে একটা মহাজন অগাধ টাকা যোগাচ্ছে।

ওসমান—উজীর সাহেব! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—কেবল লোক মারছি, টাকা লুট করা হচ্ছে না। টাকার জায়গায় টাক চলে যাচ্ছে। আরে আমার অস্ত্রে মরে আর না খেয়ে মরে—দুটোতেই ত আমার কাজ হবে। কেবল হত্যা—ধ্বংস—আর লুট—বাংলাটাকে শ্মশান করে দাও—তারপর মোগল বাদশা রাজত্ব করবে এর গাছপালা আর নদী নালা নিয়ে (অট্টহাস্য)। (জনৈক সৈনিকের প্রবেশ) কি খবর? কি চাস্?

সৈনিক—অনন্ত ধরা পড়েছে—সেই ছেলেটা—নাচ-ওয়ালা ছেলেটা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—আমি দূরে টিলার ওপর থেকে দেখেছি—

ওসমান—হুসেন—উজীর—আর কেন? তাদের আগলে বসে আছ আর তারাও সময় গুছিয়ে নিলে। এই ক'মাস আমরা চুপ ক'রে বসে রইলুম। কি হলো! ছাওনাপুর দুর্গ কত দূর? সব গেল (উঠিয়া) এই তুই (সৈনিককে) এদিকে আয়—তোকে আমি তঙ্কা দিই?

সৈনিক—হ্যাঁ হুজুর!

ওসমান—হ্যাঁ হুজুর! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ আর একটা বাচ্চা ছেলে তাকে তোমার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল! বহুৎ আচ্ছা—হুসেন! উজীর সাহেব! সরেস লড়াই! (ঘুরিয়া-ফিরিয়া) আমি বসে বসে সব হারাচ্ছি—আর তুমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে মজা দেখছ—হুসেন—

সৈনিক—হুজুর আমার—

ওসমান—যা এখান থেকে। আমায় আর ক্ষিপ্ত করিস না—উজীর সাহেব! সমস্ত বনে আগুন লাগাব—

উজীর—তাতে আমরা আগে যাব। তারা বেরুবার রাস্তা জানে। আমরা তাও তেমন জানি না—এ জঙ্গল বাপ! আমাদের পুড়িয়ে মারবে।

ওসমান—কিছুই কোরবো না তবে কি বসে বসে মজা দেখবো? (কিছু চিন্তা করিয়া) তাঁবু উঠাও—ধীরে ধীরে এগিয়ে চল দেখা যাক কি হয়!

(প্রস্থান)

[জঙ্গলের পূর্ব্ব পার্শ্ব।]

(দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।)

১ম গ্রামবাসী—আরে এ কোথায় চলেছি—উল্টোপথ নাকি? ওরে কি হবে রে—ফিরবো কেমন করে?

২য়—আমার আবার জন্মবার! তোকে বল্লুম বেরুব না। একে জন্মবার তায় বেড়ালের হাঁচি—গেলুম এবার—

(ভয়ে ভয়ে রাস্তা খুঁজছে)

১ম—(হতাশ ভাবে মাটিতে বসিয়া) এবার গেলুম! তোর কথাতে কেন বেল খুঁজতে এলুম—এখন কোথায় যাই! (একটি তীর আসিয়া পড়িল) ওরে! এটা কিরে?

২য়—ওরে শুয়ে পড়—বান মারছেরে—ওরে শুয়ে পড় (দু'জনের শয়ন।)

১ম—এই ভাই বেঁচে আছিস্?

২য়—চুপ, কে আস্‌ছে—

(রমাইয়ের প্রবেশ)

রমাই—তুরা কে আছিস্ রে—এখানটিতে কেন আস্‌লি—মরবি বলে—পালা…

১ম ও ২য় (উভয়ে)—আমরা মরে গেছি বাবা বুনো রাজা। আমাদের টেনে নিয়ে যাও — পথ জানি না।

রমাই—ভয় নেই যা—এই দিকে চলিয়ে যা (রাস্তা দেখাইয়া দিলে)

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া একজন বুনোর প্রবেশ)

কি চাই? কি খবর?

বুনো—ওস্তাদ! হুঁসিয়ার—দুষমন এগুচ্ছে। গাছ কাটতে লাগছে। আমরা সব ঠিক আছি—তবু হুঁসিয়ার--

রমাই—সব ঠিক রাখিস, যা—(বুনো সৈনিকের প্রস্থান)।

(কালু সর্দ্দার ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

কালু—কি খবর রে রমাই?

রমাই—সর্দ্দার শত্রু আসছে। সব সাবধান! ওরা গাছ কাটছে। আরও আগু হলে বুনোরা আর কতক্ষণ যুঝবে।

(জগাইয়ের প্রবেশ)

জগাই—সর্দ্দার! হুঁসিয়ার—দুষমণ অনেক, মাথায় ঢাকা, তীর মারলে কাজ হবে না। লড়াই করতে হবে। দেখি কি হয়!

কালু সর্দ্দার—ওদের কত মারবি ভাই তোরা! এতগুলো লোককে কেমন ক'রে বাঁচাই? এতদিন ওরা আগু হয়ে আসেনি—এবারে আসছে—আমরা এত লোককে কতদিন ঠেকাব।

(চারিজন বুনো আঘাতপ্রাপ্ত গজপতিকে লইয়া প্রবেশ।)

গজপতি—আমারে তোরা ছাড়িয়ে দেরে—ছাড়িয়ে দে—সর্দ্দারের সামনে কেন আনলি? চোট লিয়ে সর্দ্দারের সামনে গজপতি আসবে না। (বসিয়া পড়িল)

কালু—তোর এমন হলো কেনরে গজপতি?

গজপতি—দুইটারে মারছি—আর একটা পিছন থেকে ঘাল করলে আমায়। দোহাই ওস্তাদ দুষ আমার লয়—আমায় ওরা ছাড়লে না—উহারকে মারতে দিলেক না।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল—আমি ঘাল করেছি সর্দ্দার! আমার তীর তাকে শেষ করেছে।

গজপতি—আয়রে তু আমার কাছে (কুনাল তার কাছে গেলে সে যন্ত্রণা ভুলে তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে) আরে সর্দ্দার বড় ভাল ছেলিয়ারে—

(বেগে একটি বুনো সৈনিকের প্রবেশ)

বুনো—সাবধান সব—দুষমণ এগুচ্ছে—জঙ্গলের বড় গাছ কাটছে। ইধার-উধার সব ধার দিয়ে আসতিছে।

কালু—বিশ্বনাথ ভাই! এখন উপায় কি করি! রমাই দেরে আমায় হাতিয়ার! বিশুভাই! এখান থেকে সরে যাও। দেখি কি করতে পারি।

বিশ্বনাথ—তা হবে না—আমি ভাই তোমার পাশটিতে থাকবো।

(আরও দুইজন বুনোর প্রবেশ)

বুনো—আমাদের লোক মরছে অনেক। দুষমণ ক্ষেপে উঠেছে। উরা ইদিকে জোরে আসছে—

কালু—জান কবুল আটকাবি—তোদের বুড়ো সর্দ্দারের মান যাবে?

সকলে—না সর্দ্দার তা হবে না—

গজপতি—(অতিকষ্টে) না সর্দ্দার সেটি হবে না।

(উঠিতে চেষ্টা করিল পারিল না)

কালু—রমাই! একে উঠিয়ে নিয়ে যা আমার ঘরে।

গজপতি—আমি যাবো না।

কালু - আর সময় নেই রে, কথা শোন—

(গজপতি রমাইয়ের উপর ভর করিয়া প্রস্থান—দূরে সৈনিকের কোলাহল।)

আরে বুনোর রক্ত মাথায় চড়লো—সব এগিয়ে চলরে! বিশ্বনাথ—আমার যা আছে সব দেবো রে—শিশুগুলোকে বাঁচা—মেয়েগুলোকে রক্ষা কর!

(সূর্য্যদেবের প্রবেশ—দূরে বহু সৈন্যের কোলাহল)

সূর্য্য—কালুভাই! আমি এসেছি। বড় দেরী হলো কি?

কালু—কে রে? আমায় এমন করে ডাকলে? ভাই! এখন একা এলে কি আর হবে! পারবো কি?

সূর্য্য—রাজা রুদ্রনারায়ণের আদেশ! রাণী শঙ্করীর আশীর্ব্বাদ! শুনলে না তাদের রণোল্লাস! অমি একলা নই ভাই—আমরা তিন হাজার ভুরসুটের সন্তান তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকে অমর করতে এসেছি। হুকুম দাও সর্দ্দার—

(কালুর উল্লাস ও সকলের জয়ধ্বনি)

বিশ্বনাথ—সমস্ত এনেছি! কি বল সর্দ্দার! আমার যা আছে। ভাই যক্ষদেবের আমলের মোহরের ঘড়াগুলো—নাও—আঃ

সূর্য্যদেব—সামন্তজী! ও সবের আমরা কি জানি? রাজার সঙ্গে বোঝগে।

(দূরে ভুরসুটের সৈন্যগণের উল্লাসধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল) [ক্রমশঃ]

একটি অসমর্থিত সংবাদ

সত্য দাস

আসমুদ্র হিমাচলে প্রান্তিকে প্রান্তিকে
তোমাকে পেলাম কাল নতুন আঙ্গিকে।
কৃষিতীর্থে কৃষকের অন্তর্বেদনায়,
শোষণের চিতাবহ্নি জ্বালাযন্ত্রণায়,
শিল্পশালে হাপরের বিবর্ণ ধোয়ায়,
হে সময়, ক্রুদ্ধ মুখ দেখেছি তোমায়।
অপমানে দুই চোখে আগ্নেয় সম্ভার,
শ্রেণীগত সংগ্রামের উত্তরাধিকার
দেখেছি তোমার হাতে মানচিত্রে আঁকা—
রিক্তবাহী জনতার মুক্তির পতাকা!
বিপ্লবের ছায়াকাঁপা চোখের তারায়
রাত্রির অন্তিম লগ্নে দেখেছি তোমায়।

চোখের নেশা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কতবার দেখিয়াছি তবু লাগে ভালো।
এ যেন অবোধ শিশু জনমি' ধরায়
প্রথম দেখিছে চাহি' সবিতার আলো
অপার-বিস্ময়ে দু'টি আঁখি মেলি' হায়!
জানি কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত তোমার
পরাণ-পাগল-করা মূরতি মধুর;
অস্থিমাংসমেদমজ্জা এই যার সার—
তারি লাগি'—জানি—মোর লোভ সুপ্রচুর
এ শুধু চোখের নেশা—হৃদয়ের নয়;
মোহমুগ্ধ হৃদয়ের বিকৃত উচ্ছ্বাস
কুৎসিতেরে করি' তোলে লাবণ্য-নিলয়,—
মেঠোফুলে পায় স্ফুটপঙ্কজসুবাস।
ভাঙ্গিয়ো না এ কুহক,—দুঃসহ জীবন
বাস্তবের বেশ ছাড়ি' হউক স্বপন।

পদাতিক

প্রভাত বসু

থেকে থেকে পদশব্দ শুনি
একজনের নয়,
অগণিত জনতার।
রুক্ষ, পথক্লান্ত, রক্তসিক্ত চরণের
অস্পষ্ট ইঙ্গিত
দ্বারের কাছে এসে মিলিয়ে যায়
নীরব জনতা
বেদনারুদ্ধ প্রাণকে বয়ে এনেছে
যুগ যুগ ধ'রে
দুঃখের রাজপথ বেয়ে।
তারি সুর জাগে
অধীর, ত্রাসসঞ্চারী, অযুত পদধ্বনিতে
পদাতিক চলে যাবে
সোনার মন্দির ধূলিসাৎ ক'রে;
নতুন তৃণ জাগবে নতুন ভোরে।
তারি কণ্ঠে ফুটবে
বেদনাপারের ভাষা॥

ভূমির উর্ব্বরাশক্তি

স্বাধীনতার পর আমাদের নিজেদের খাওয়াইবার ভার যখন আমাদের হাতে আসিয়া পড়িল—তখন হইতে কি করিলে দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা যায়, তাহা লইয়া যথেষ্ট বাক-বিতণ্ডা চলিয়াছে। আমরা এ যাবতকাল এই তর্কের মীমাংসা স্বরূপ দেখিয়াছি যে, আমাদের খাদ্যনীতি দুই মুখে পরিচালিত হইয়াছে—এক দিকে বাহির হইতে খাদ্যের আমদানী এবং তজ্জন্য আমাদের বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাবের নানারূপ অসুবিধা এবং অপর দিকে দেশে অধিকতর শস্য উৎপাদিত হইবার জন্য পতিত জমি যাহাতে কর্ষিত হয় এবং কর্ষণ-কার্য্য যাহাতে যান্ত্রিক-লাঙ্গল দিয়া আরও বিশেষ জোরের সঙ্গে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর আমরা শুনিয়া আসিয়াছি যে, শীঘ্রই দেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে এবং ইতিমধ্যে দেশের লোককে একটু কষ্ট, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার ও এমন কি এক বেলা না খাইয়া থাকিবারও সঙ্কল্প করিতে হইবে।

কিন্তু এই নীতি যে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ একদিকে দেশের খাদ্য-সঙ্কট বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অপর দিকে বাহির হইতে খাদ্য আমদানির দায়ে দেশে অর্থ-সঙ্কটও ক্রমাগতই অধিক হইতে অধিকতর হইয়াছে।

এই জটিল অবস্থায়ও আমাদের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রী কে. এম. মুন্সী যে কি করিলে খাদ্যের এই সঙ্কটাপন্ন সমস্যা দূর করা যায় সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতেছেন, তাহা হার্টকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট (Harcourt Butler Technological Institute) ও ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেক্‌নোলজির (Indian Institute of Sugar Technology) যুক্ত অধিবেশনে তিনি যে সভাপতি রূপে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়। তাঁহার এই চিন্তার জন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করি, কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে চিন্তার সঙ্গে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যেখানে রহিয়াছে সেখানে কার্য্যে সুফলতা আসিবেই। মুন্সীজি বলিয়াছেন—'একমাত্র মাটিই যুগ যুগ ধরিয়া জীব ও উদ্ভিদ সকলের প্রাণ ধারণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। এই হেতু ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইলে আবাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। ইতিহাসে দেখা যায়, যে দেশের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পায়, সেই দেশের অস্তিত্ব লোপ পায়।' তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ভূমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসই কাঁচা মালের অভাবের মূল। এই উর্ব্বরাশক্তিকে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কি উপায়ে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কি উপায়ে নিজ দেশের ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যাদি দেশস্থ লোকের প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে, এই প্রশ্ন লইয়া আজ সমস্ত দুনিয়ার সব দেশেরই গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চিন্তাকুল। ইংলণ্ডে রিকার্ডো সাহেব ভূমি সম্বন্ধে অর্থনীতির মূল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়া স্বনামধন্য হইয়া আছেন; কিন্তু তখন ধারণা ছিল যে, ভূমি কর্ষিত হইতে থাকিলেই ভূমির ফলপ্রসূতা কিছু

কিছু হ্রাস পাইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী আমেরিকান অর্থনীতিকগণ এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিলে এবং ভূমিকে সরস রাখিবার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনানুরূপ সার দিবার উপায় থাকিলে ভূমিতে যে ফলপ্রসূতা হ্রাস পাইবেই তাহার কোন অর্থ নাই। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে যে, অপরপক্ষে বহু জমির উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কার্য্য চালাইয়া আজ আমেরিকা নিজেকে খাদ্য-প্রশ্ন হইতে মুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া আমাদের নিকট বুঝাইতে চাহিতেছেন।

কিন্তু তাঁহারা নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেছেন। বৈজ্ঞানিক কর্ষণ-কার্য্য ব্যয়-বহুল। ইহাতে খাদ্য-দ্রব্যের দাম ক্রমাগত বাড়িয়াই যাইতেছে এবং সাধারণ লোকের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া সুলভ হইতেছে না। তদুপরি অধুনাতন উপায়ে জমিতে সার দেওয়া ও জলসেচন ব্যবস্থায় ভূমি হইতে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে তাহা আশানুরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ হইতেছে না। মানুষ পূর্ব্বের মত সুঠাম সবল দেহ ঋজু রাখিয়া দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত অটুট স্বাস্থ্য রাখিয়া বাঁচিতে পারিতেছেন না। বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্যই এদিকেও নজর করিতেছেন, কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই।

আমরা পাশ্চাত্যের দিকে চাহিয়া আছি, তাই আমরাও আজ বিভ্রান্ত। কি করিলে আমরা আবার মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারি এই চিন্তা যেন আজ নৈরাশ্যের বিষাদের ছায়াপাত করে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষের নেতাগণ যদি ভারতীয় কৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করেন—যদি সত্য সত্যই গ্রাম্য লোকের চক্ষু ও মন লইয়া গ্রামের কথা ভাবেন, তবে তাঁহাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হইবে যে, আমাদের এই সুজলা সুফলা জন্মভূমি যুগে যুগে শুধু ভারতবাসীর নয়—সারা দুনিয়ার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন এবং তজ্জন্যই কালে কালে এই ভারতের দিকেই নজর ছিল প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশের। আমাদের নেতৃগণ যদি তাঁহাদের প্রশ্নের সমাধানের জন্য ভারতবর্ষে কি ব্যবস্থা ছিল এই দিকে নজর করেন, তবে অচিরেই ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে—শুধু ভারতবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি ত অত্যন্ত সাধারণ কথা—আজ আবার তাঁহারা চেষ্টিত হইলে এই দেশের জমিতে এমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব যাহা দ্বারা সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা সহজ হইবে। ভারতের জমিতে সত্যই এই ক্ষমতা নিহিত আছে।

জমিকে আবার সেইরূপ সুফলা করিয়া তুলিতে হইলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিকে বাড়াইতে হইবে। কোন প্রকারে শুধু জমির উর্ব্বরাশক্তিকেই বাড়াইলে চলিবে না। আমাদের কথা বুঝাইতে হইলে আরেকটু স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার অনেক উপায় আছে। জমিতে কিছু সার দিলে সমূহ উৎপাদন কতকটা বাড়ে। আবার জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলেও সাময়িক উৎপাদনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে সারের বা সেচের বন্দোবস্ত হইতে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা প্রতি বৎসরই বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক নূতন ভাবে প্রয়োজনমত না করিতে পারিলে উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি না হইয়া আবার শমতা প্রাপ্ত হয়। দেখা যায় যেসব স্থলে কিছুদিন এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে সার এবং সেচ দেওয়া হইয়াছে বা যান্ত্রিক লাঙ্গলের সাহায্যে জমি গভীরভাবে কর্ষিত হইয়াছে সেখানে দশ বা পনের বৎসর পরে উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির হার ক্রমাগতই লোপ পাইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, যে যে স্থলে এইভাবে কৃষিকার্য্য করা হইয়াছে সেই সেই স্থানের উৎপাদিত দ্রব্যাদি মানুষের

পক্ষে সুস্বাদু বা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় নাই। ইহা স্বাস্থ্যের অবস্থা ও কৃত্রিম উপায়ে কৃষিকার্য্যের বৃদ্ধির চিত্র দেখিলেই বোঝা যাইবে। তদুপরি এই কৃত্রিম উপায়ে কৃষিকার্য্য যে রকম ব্যয়বহুল তাহাতে কৃষকশ্রেণী আর নিজ নিজ ব্যবস্থায় কৃষিকার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্রমশঃই ধনবান ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান-সমূহের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় এবং ফলে ক্রমশঃই তাঁহারা বিকল হইয়া পড়েন। উৎপাদিত শস্যেরও অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে—ফলে লোকের পক্ষে সুলভ ও সহজ খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

আমরা তাই মনে করি যে, জমির উর্ব্বরাশক্তি যে কোন উপায়ে আজ কিছু বৃদ্ধি করিতে পারিলেই আমাদের প্রশ্নের সমাধান হওয়া ত দূরের কথা— আরও জটিল হইয়া পড়িবে।

প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি বলিতে আমরা এই বুঝি যে, স্বভাবতঃই জমি যাহাতে সরস থাকে এবং শস্যাদির খাদ্য-সামগ্রী যাহাতে আপনা হইতেই জমিতে জমা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে নদীগুলিকে নিজ নিজ স্বাভাবিক স্রোতের পথে অবাধ গতিতে বহিতে দিতে হইবে। নদীগুলি শৈলমালা হইতে ভূতলে পতিত হইয়া যদি স্ব স্ব প্রকৃতিগত স্রোতপথে বিনা বাধায় প্রবাহিত হইতে পারে তবে আপন শক্তিতেই তাহারা গভীর হইতে গভীরতর গহ্বর খনন করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জমির নীম্নে চারিটি স্তর সাধারণতঃ থাকে। সর্ব্বোপরিভাগে আছে শুধু মৃত্তিকা; তৎপরে রহিয়াছে বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা; তৃতীয় স্তরে আছে বালুকারাশি এবং চতুর্থ স্তরে রহিয়াছে খনিজ পদার্থ বা অন্যান্য আগ্নেয় প্রস্তর স্তর। এই চতুর্থ স্তরের মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। যদি নদীগুলি বালুকা স্তর পর্য্যন্ত গভীর থাকে তবেই আগ্নেয় স্তরের উষ্ণতায় বালুকার সঙ্গে সংযোজিত হইয়া জলধারা-সম্বলিত খাদ্য-প্রাণ, শস্যাদির খাদ্যে পরিণত হইয়া উহা বাষ্পাকারে ক্রমাগত উর্দ্ধদিকে উঠিয়া মৃত্তিকা-স্তরে খাদ্য হিসাবে স্বভাবতঃই অবস্থান করিবে। এবং বালুকা স্তর সহজেই জলকে চোষণ করিয়া নেয় বলিয়া দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী যে ভূমি থাকে তাহার নিম্নে সরসতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যদি নদীগুলিকে তাহাদের আপন বেগে আপন স্রোতে বহিতে দেওয়া হয় তাহা হইলেই জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং জমি অনেকগুণ ফসল উৎপাদন করিবে।

ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল যদি পাঠ করিয়া কেহ ভ্রমণে বাহির হন, তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন কত শত নদী ছিল এই দেশে—যাহা আজ শুষ্ক বালুকারাশিতে পরিণত হইয়াছে। তিনি ইহাও দেখিবেন যে, যত পৌরাণিক সৌধমালার ধ্বংস-স্তূপ তাহার অধিকাংশই আজ এই সব শুষ্ক নদীর তীরে অরন্য সমাবিষ্ট হইয়া মানবের অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন একদিন ছিল যখন এই সব অগণিত স্রোতস্বিনীর জলধারা কল কল রবে অসংখ্য হাস্য-কোলাহলপূর্ণ জনাকীর্ণ জনপদকে সুন্দর করিয়া তুলিত এবং সবুজ শস্য-ক্ষেত্রগুলিকে ভরপুর করিয়া স্নিগ্ধ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ার সৌন্দর্য্যে চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিত।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে, এখন স্বাধীন চিন্তার দ্বারা কবে আবার ভারতের সেই রূপ ফিরিয়া পাইব—কবে আবার দেখিব দুনিয়ার লোকের আরাধনার স্থান হইয়াছে এই ভারত—তাই এখানকার মাটিতে পা দিয়া তাঁহারা ধন্য বোধ করিতেছেন?

বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাচালক মিঃ চার্চ্চিল আবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে রক্ষণশীল দল মোট ৬২৫টি আসনের মধ্যে ৩২১টি আসন লাভ করিয়া কমন্স সভায় বৃহত্তম গোষ্ঠী হিসাবে কার্য্য করিবার অবকাশ পাইবেন। কিন্তু শ্রমিক দলও ভোট লাভে খুব হটিয়া যান নাই। তাঁহারাও মোট ২৯৫টি আসন লাভ করিয়াছেন। ফলে রক্ষণশীল দল হইতে শ্রমিকদলের ভোট সংখ্যা মাত্র ২৬টি কম। এত অল্প সংখ্যক ব্যবধান লইয়া রক্ষণশীল দলের কার্য্যকারিতার বিশিষ্টতা ব্যাহত হইবে সন্দেহ নাই।

এই ভোট-যুদ্ধের ফলে বৃটেনে উদারনৈতিক দল মাত্র ৬টি আসন লাভ করিতে পারিয়াছেন। আইরিশ জাতীয়তাবাদী দল মাত্র ১টি আসন লাভ করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দল একটী আসনও লাভ করিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পাঠকদের স্মরণ করিতে হইবে যে গত মহাযুদ্ধের অবসানের পরেই ১৯৪৫ সালে বৃটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে রক্ষণশীল দল হারিয়া যান এবং শ্রমিকদল বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করিয়া ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫১ এই ছয় বৎসর বৃটেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন, ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতেও শ্রমিকদলই জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভোটাধিক্য মাত্র ছয় ভোটে দাঁড়াইতে শ্রমিকদলের কার্য্য-সূচী অনেকটা শ্লথ হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও মিঃ এটলী তাঁহার সাহস ও চেষ্টার দ্বারা গত দেড় বৎসর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। তারপরে এই সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে মিঃ এটলীকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িতে হইল। যে সাধারণ জনমণ্ডলী মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে চালিত রক্ষণশীল দলের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার মিঃ এটলীর শ্রমিকদলের কার্য্যকারিতায় বিশ্বাসহীন হইয়া রক্ষণশীল দলকে আবার রাজত্ব চালাইবার সুবিধা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে বৃটেনের জনসাধারণ নানারূপ দুঃখ, কষ্ট, অসুখ ও অসুবিধায় পতিত হইয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে কোন দলকে রাজত্ব করিতে দিলে তাঁহাদের মঙ্গল বিধান সুনিশ্চিত হইবে। এক দলের কথা ও প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহাদের আশ্বাসে শান্তি পাইতে চাহিতেছেন। আবার কিছু দিনের মধ্যেই ইহা যখন স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে যে আশা শুধু আশারই বাণী থাকিয়া যাইতেছে তখন অন্য দলকে কর্ত্তৃত্ব দান করিতে ব্যস্ত হইতেছেন। এই অনিশ্চিত মনোভাব জাতির দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। এবং এই দুর্ব্বলতা হইতে অচিরে জাতিকে উঠাইতে না পারিলে যে শেষ পর্য্যন্ত বৃটীশসিংহ কোনরূপে কি দাঁড়াইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু জাতির এই দুর্ব্বিসহ ভার বহন করিবার কর্ত্তৃত্ব যাহারা গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নামিয়াছেন, তাহাদের কার্য্যকলাপ হইতে যে জাতির ভরষা পাইবার বিশেষ কিছু আছে তাহা মনে হয় না; কারণ এবার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল উভয়েই সত্যিকার প্রশ্নের মুখাপেক্ষী হইতে

চেষ্টা করেন নাই। বরঞ্চ কি প্রকারে সেই প্রশ্নকে পিছনে রাখিয়া কথার বুলি দিয়া জনসাধারণকে তুষ্ট করিবেন সেই চেষ্টাই করিয়াছেন।

১৯৫০ সালে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছিল, এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব তাহার পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ এই তর্ক-যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি শ্রমিক দল বা রক্ষণশীল দলের মধ্যে কেহই এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই যাহাতে জাতীয় ব্যাধির সত্যিকারের রূপ প্রকাশিত করিয়া তাহা নিবারণের দায়িত্ব নিতে হয়। শ্রমিকদল বলিয়া আসিয়াছেন যে যুদ্ধোত্তর বৃটেন তাঁহাদেরই সৃষ্টি এবং অধুনাতন অসুবিধাগুলির কারণ রহিয়াছে বৃটেনের বাহিরে অন্যত্র। বৃটেনে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার কোন কার্য্যই করিবার নাই। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। শ্রমিকদল আরও দেখাইতেছেন যে তাঁহারা যতক্ষণ গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিবেন ততক্ষণ সস্তা খাবার, অল্প ভাড়ায় বাড়ী, নানারূপ সামাজিক সুখ-সুবিধা তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া দিবেন। তদুপরি বেকার সমস্যা দেশে থাকিবে না এবং যুদ্ধকামী দেশগুলিকে ক্রমাগতই শান্তিকামী করিয়া তুলিবেন।

অপর পক্ষে রক্ষণশীল দলের কথাও অম্নি অস্পষ্ট ভাষায়ই বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন যে শ্রমিক দল যাহা যাহা দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাহার সমস্ত ত তাঁহারা দিবেনই, উপরন্তু তাঁহাদের শাসনাধীনে আরও বহু সংখ্যক গৃহ নির্ম্মিত হইবে, দেশ যুদ্ধাস্ত্রে শক্তিমান হইবে, দ্রব্য-সম্ভারে দেশ ভরিয়া উঠিবে, উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে ও কর কমিয়া যাইবে। কিন্তু কি প্রকারে যে তাঁহারা এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবেন তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বলেন নাই—শুধু এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন যে নূতন লোকের হাতে শাসন ভার পড়িলেই পুরাতনী হইতে উন্নততর ফল স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যাইবে।

কিন্তু এই তর্কাতর্কির কোনও সুফল ফলা দুরূহ। রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়া তাহা নিয়া লোক-সমাজে সাধারণের মত ঠাট্টা তামাসা চালাইয়াছেন এবং অপর পক্ষে শ্রমিকদল কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে রক্ষণশীল দলের অকৃতকার্য্যতার শোচনীয় পরিনাম ও তাহাদের শ্রমিকদিগের উপর অসহযোগী মনোভাবের কথার অবতারনা করিয়া দেশের জনসাধারণকে ভয়ার্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, একদিকে বৃটেনের জনসাধারণ হতবুদ্ধি ও হীনবল হইয়া পড়িতেছেন এবং অপরপক্ষে তাঁহাদের শাসনভার গ্রহণ করিবার নেতৃগণ প্রকৃত অসুবিধার কারণ কি তাহা বিশ্লেষণে বিরত থাকিয়া, জনসাধারণকে কথার বুলি দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে বৃটেন জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল শুধু তাহাদের ওজস্বিনী নির্ভিকতা ও তুল্য-বিচারের ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য, সেই বৃটেনে আজ এই মনোভাব দেখিলে দুঃখিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। অপরের কথা দূরে যাউক, নিজ দেশের ভাই-বোনদের কাছে নিজেদের দুঃখের কথা বলিবারও সাহস তাহাদের আজ নাই। মিঃ চার্চ্চিল অথবা মিঃ এট্‌লী যে একথা জানেন না যে তাঁহাদের দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য-দ্রব্য হয় না এবং তাহার বেশীর ভাগই বাহির হইতে লইয়া আসিতে হয় —একথা বিশ্বাস করা যায় না। একথাও বিশ্বাস করা যায় না যে, মিঃ চার্চ্চিল অথবা মিঃ এট্‌লী ইহা জানেন না যে, শুধু চাকুরী দিয়া লোককে সুস্থ সবল সুন্দর মানুষ তৈয়ারী করা যায় না। এই বৃটেনের অনন্যসাধারণ ব্যক্তি মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র প্রাণ সম্বলিত মানুষ লইয়া কোন বড় দেশ বা গোষ্ঠীর রচনা হইতে পারে না। চাকুরী বা ভিক্ষার প্রবৃত্তি

সৃষ্টি করিয়া সেই বৃটেনের মানুষকে তাহার নেতৃগণ সাময়িক রক্ষা করিয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু দেশ কি সেই চেষ্টায় অকৃতকার্য্যতার অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে না?

রক্ষণশীল দলের শাসনভার গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখিতেছি যে, বহুদিন-লুক্কায়িত আঘাতের ফলে আজ কী ভীষণ ব্যাধির অবতারণা হইয়াছে। বৃটেনের ক্রয়-শক্তি আজ বিপর্য্যস্ত। সাধারণ জন-শ্রেণীকে আজ কম আহারে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। একটা অসহায়তা যেন দেশের জনমণ্ডলীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

এমতাবস্থায় মিঃ চার্চ্চিলকে আবার যদি দেশের অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে পরিচিত হইতে হয়, তবে অত্যন্ত সাবধানতা ও চিন্তার সহিত শাসনের কাজ চালাইতে হইবে। গত মহাযুদ্ধে যেই প্রকারে তিনি কি ভাবে যুদ্ধ জয় করিবেন এই চিন্তায় নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ঠিক সেই নিষ্ঠা ও একপ্রাণতা নিয়া আজ তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে যে, কি করিলে বৃটেনের জনমণ্ডলীর অভাব দূর করিয়া তাহাদের আবার শ্রেষ্ঠ মানুষের মত বাঁচিবার অবকাশ দিবেন। আমাদের বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা যেমন তাঁহাকে মহাযুদ্ধের জয়ী নেতা করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিক সেই প্রকারে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কালজয়ী মহাপুরুষ হিসাবে পরিগণিত হইয়া বিশ্ববরেণ্য হইতে পারিবেন যদি সেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লইয়া তিনি চিন্তা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন—কি করিয়া বৃটিশ জাতি তথা সমগ্র দুনিয়ার লোক অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি ও অকালমৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ভারতের ঋণ

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশকে অর্থ সাহায্যের কথা সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রেই বোধ করি অবগত থাকিবেন। কোনো ব্যাঙ্ক বিনা সুদে কাহাকেও টাকা ধার দেয় না, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কও দেয় নাই। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে তাহাদের এই ঋণ দানের সংখ্যা অন্যূন ১১৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। তন্মধ্যে এক ভারতবর্ষই এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ডলার। কি কি কারণে ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার যে একটা মোটামুটি হিসাব না আছে, তাহা নয়। প্রধানতঃ তিন দফায় ভারতবর্ষ এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। যথা—প্রথম দফায় রেলের উন্নতি পরিকল্পনায় ১৫ বৎসরের মেয়াদে ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট শতকরা ৪ ডলার সুদের হারে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার, পরে অতিরিক্ত বিবেচনায় ১৯৫০ সালের ১৬ই তারিখে উহার স্থলে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ডলার; ইহাতে বাৎসরিক মোট ৬৬ লক্ষ টাকা সুদ দিবার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী দ্বারা দেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ৭ বৎসরের মেয়াদে সাড়ে তিন ডলার সুদে ১৯৪৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ১ কোটি ডলার লওয়া হইয়াছে; এবং তৃতীয় দফায় দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০ বৎসরের মেয়াদে ৪ ডলার সুদে ১৯৫০ সালের ১৮ই এপ্রিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুদের এই টাকা ভারতবর্ষ কি ভাবে এবং কত শীঘ্র পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে, ইহা চিন্তার বিষয়। প্রথম দফায় উল্লিখিত রেলের উন্নতি পরিকল্পনা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বোধ

করি এই ঋণ গ্রহণের অব্যবহিত কিছুকাল পরেই ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় রেল কোম্পানী Silver Arrow Train-এর প্রদর্শনী দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণকে এই আশা দিয়াছিলেন যে, অচিরেই ট্রেণসমূহের প্রভূত উন্নতি হইবে। এই উন্নতি অবশ্য যাত্রী জনসাধারণের সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু আজ ১৯৫১ সালের এই নভেম্বর মাস পর্য্যন্তও ট্রেনসমূহের অনুরূপ কোনো উন্নতির সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত হইবার অবকাশ পাইল না। বরং ইতিমধ্যে মাইল প্রতি ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ শুষিয়া লওয়া হইতেছে। দেখা যাইতেছে, রেলযাত্রীর যাতায়াতের অসুবিধা আজ চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ট্রেন-দুর্ঘটনার ইতিহাসও জড়িত; ভারত সরকার তথা রেল কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তাহার কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় দফায় কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী দ্বারা দেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টারই বা বাস্তব রূপ কোথায়? আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে বলিয়া ভারত সরকার যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কাজ বা কার্য্যোপযোগি ব্যক্তিদের কর্ম্মতৎপরতা কোথায়?

তৃতীয় দফায় ঋণ লওয়া হইয়াছে বোকারোকোণার পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য। ১৯৫২ সালের শেষাশেষি বোকারো হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও অন্যান্য বিষয়ের মতো বিঘ্নিত হইয়া দীর্ঘকালের জন্য চাপা পড়িবে কিনা, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ঋণদানকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাহার যে সুদের হার, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন দেশকে নিজের নিজের শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী সেই ঋণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভারত আজ নানা সমস্যার জটিল গ্রন্থিতে আবদ্ধ। তাহার পক্ষে আদৌ এত দীর্ঘ মেয়াদী সূত্রে এত অধিক পরিমাণ সুদ পরিশোধ করা সম্ভব কিনা, তাহা ভারতের অর্থনীতি বিশারদগণই ভালো বলিতে পারিবেন। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, বিনা কার্য্যপ্রস্তুতার উপর ভিত্তি করিয়া ভারত সরকার সুদসহ এই ঋণ পরিশোধ করিতে যাইয়া সজোরে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবেন না তো? জনসাধারণ একেই মৃতপ্রায়, শেষ পর্য্যন্ত মরার উপর খাড়ার ঘা না পড়ে, ইহাই চিন্তার বিষয়।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে লবণ সমস্যা

সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্থানে লবণ সমস্যা দুর্ভিক্ষের আকারে দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে দুই আনা করিয়া লবণের সের, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব্ব পাকিস্থানে সেখানে দুই টাকা করিয়া, এমন কি কোনো কোনো অঞ্চলে দশ টাকা বারো টাকা করিয়াও লবণের সের বিক্রয় হইতেছে। ইহাকে লবণের দুর্ভিক্ষ ভিন্ন কি বলা যায়! খাদ্য-সামগ্রীর একেই যে-হারে দাম চড়িয়াছে, তাহাতেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য্য লবণের দর যদি এই ভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে মানুষের চরম দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। জাহাজের অভাবে করাচী হইতে লবণ পাঠানো সম্ভব হয় নাই বলিয়াই নাকি পূর্ব্ব পাকিস্থানে এই আকস্মিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহাই লবণ দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ কিনা, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানে একেবারেই যে লবণ

নাই, একথাও বলা যায় না ; নতুবা চোরাবাজারে এই ভাবে উচ্চ মূল্যে কি করিয়া লবণ বিক্রয় হইতেছে ? লবণ নিশ্চয়ই ছিল, এবং যথাসময়ে ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা বোধ করিয়া চোরাকারবারীরা তাহা গুদাম-জাত করিয়াছিল ; এখন মহার্ঘ্য মূল্যে ধীরে ধীরে তাহা কালোবাজারে চালাইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন, তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, উভয় বঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় থাকিলে আজ নিশ্চয়ই এ অবস্থার সৃষ্টি হইত না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যতীত আজিকার পৃথিবীতে কোনো রাজ্যেরই চলিতে পারে না। এই সহজ কথাটির উপর পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। আজ পূর্ব্ববঙ্গেরই শুধু লবণ সমস্যা নয়, উভয় বঙ্গেই আজ খাদ্যবস্তুজনিত নানা সমস্যায় জনসাধারণের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রগত অসহযোগিতার মনোভাব হইতেই সৃষ্টি হয় জনগণের এই জীবন-সমস্যা। লবণের ব্যাপারটি তাহার মধ্যে একটি।

ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় আজ বিশেষ ভাবে শুধু একটি মাত্র ধ্বনিই শোনা যাইতেছে : 'লবণ দাও, না হয় গদী ছাড়।' এতদ্ব্যতীত মাদারগঞ্জ ও মাকিহাটি হইতে উত্তেজিত জনতার লবণ লুঠের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে গভর্ণমেণ্ট নিতান্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই মাত্র বসিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্ব পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট অবশ্য ইতিমধ্যে এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত মূল্যে লবণ বিক্রয় করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পূর্ব্ববঙ্গ জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার ও আটক করা হইবে, কিন্তু অর্ডিন্যান্সই যথেষ্ট নয়। কালোবাজারের মালিকেরা অর্ডিন্যান্সকেও ফাঁকি দিতে জানে। যাহাতে সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়া মজুদজাত লবণ জন-সাধারণের হাতে আসিতে পারে, মনে করি পূর্ব্ব-পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রস্তাব

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই উন্মুখ। শান্তি আন্দোলন আজ গণ-আন্দোলনের রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে, যুদ্ধক্লান্ত হতমান বিপর্য্যস্ত মানুষ মাত্রের পক্ষেই ইহা আশার কথা। সম্প্রতি জাগ্রেবে অনুষ্ঠিত শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা সম্মেলনে যুগোশ্লাভিয়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত শান্তি প্রস্তাবটি ৮৬—০ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বিশ্বসংগ্রামের অনিবার্য্যতাকে পুরাপুরি অস্বীকার করা হইয়াছে এবং শান্তি রক্ষার ১০টি মূল নীতি ঘোষিত হইয়াছে। যথা—(১) সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্ব্বভৌম অধিকার ও সমানাধিকার মানিয়া চলিতে হইবে ; (২) ঐক্যবদ্ধ সার্ব্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার সকল জাতিরই রহিয়াছে ; (৩) আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য্য, সামরিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাপ দিবার চেষ্টা নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে ; (৪) আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সমাধানের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে নিখুঁত করিয়া তুলিতে হইবে ; (৫) ঔপনিবেশিক সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করিতে হইবে এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি স্বীকার করিতে হইবে ;

(৬) আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ যদি অপর রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হয়, তবে তাহাদের কার্য্যের নিন্দা করিতে হইবে; (৭) অনুন্নত দেশ সম্পর্কে আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে; (৮) মানবিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা মানিয়া চলিতে হইবে; (৯) অস্ত্রসজ্জা ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হইবে—আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধিনে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণই লক্ষ্য থাকিবে; (১০) আন্তর্জ্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে, অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দিতে হইবে—জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ সকলেই পাইবে।

উপরোক্ত মূল নীতিগুলির মধ্যে প্রায় সমস্ত সমস্যারই সমাধানের ইঙ্গিত ও সেই সঙ্গে বিশ্বের পারস্পরিক দেশগুলির মধ্যে এক সাংস্কৃতিক মিলনের আভাষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নীতি হিসাবেই না রাখিয়া অবিলম্বে যাহাতে ইহাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়, আশা করি যুগোশ্লাভিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সেই দিকে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি ফ্রেডারিক মঁঃ জুলিয় কুরী গত ১লা নবেম্বর ভিয়েনা বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন, 'অন্য জগতের জন্য শান্তিকে জমা রাখিয়া দিলে চলিবে না। যে পৃথিবীকে আমরা নূতন করিয়া গঠন করিব, তাহাতেই শান্তিকে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে।' অতঃপর তিনি বলেন: শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে সকলেই পাশাপাশি বাস করিতে পারে। যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতবিরোধ আলাপ-আলোচনার দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাসমতে প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ বিরোধ তাহার নিজস্ব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকিলে আর কোন যুদ্ধ হইবে না।

এ বিষয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগোষ্ঠিকে আজ চিন্তা করিয়া নিরস্ত্রীকরণ নীতির মধ্য দিয়া পৃথিবী হইতে যুদ্ধের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে অগ্রসর হইতে হইবে। গত দুইটি মহাযুদ্ধ পৃথিবীকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, যুদ্ধেই যুদ্ধের শেষ নয়, যুদ্ধ দ্বারা কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহার জন্য চাই মানসিক পরিবর্ত্তন ও পারস্পরিক দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সৃষ্টি। আজ বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাই সেই চিৎ-শক্তি, অস্ত্রশক্তি নয়। আশা করি বিশ্বের কল্যাণ সৃষ্টির পথে বৃহত্তর শক্তিগোষ্ঠি সেই শক্তির পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

চীন-ভারত মৈত্রী

গত ২৮শে অক্টোবর চীনের এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় সাময়িক অবস্থিতির পর দিল্লী যাত্রা করেন। প্রজাতন্ত্রী চীনা সরকারের উদ্যোগে গঠিত এই প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের অতিথিরূপে ছয় সপ্তাহকাল ভারত পরিভ্রমণ করিবেন। প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ তিং-সি-লিন দমদম বিমান ঘাঁটিতে সাংবাদিকবৃন্দকে বলেন যে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারত ও চীনের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। চীনা প্রতিনিধিদলের ভারত ভ্রমণ চীন ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবে বলিয়া তাঁহারা আন্তরিকভাবে আশা

করেন। চীনা প্রতিনিধিদলের সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিউ-পেই-য়ু বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন এবং চীন-ভারত মৈত্রীর সম্পর্ক দৃঢ়তর করাই তাঁহাদের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য।

অপরদিকে দিল্লী স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যক্ষ ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশনের সহিত চীন ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। চীনের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'নূতন চীন যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা এশিয়ার অধিবাসীদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিবে। বিপ্লবের পর চীনা জনসাধারণ যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, চীনা সাধারণ তাহাদের অধ্যবসায় ও উৎসাহ দ্বারা শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা করিয়া যে কোনো শিল্পোন্নত দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে।' চীনের নব জাগরণ সম্পর্কে ডাঃ রাও বলেন, 'এই প্রকার গণচেতনা ও জাতীয় আন্দোলন ১৯৩০-৩১ সালে আমাদের দেশে দেখা গিয়াছিল। ঐ সময়ে আমাদের দেশে উদ্দেশ্যসিদ্ধির যে দৃঢ় সঙ্কল্প, উৎসাহ, ঐক্য, আত্মত্যাগ ও নিয়মানুগত্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, চীনেও তাহা দেখা যাইতেছে। ভারত ও চীনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর গণচেতনা অথবা জনসাধারণের রাজনীতি চর্চ্চা যখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অধিকতর সংহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে চীনের প্রধান লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।' ভারত ও চীনের মধ্যে প্রাচীন মৈত্রীর উল্লেখ করিয়া ডাঃ রাও বলেন যে, ভারত ও চীনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাহা উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটায় নাই। চীনা জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতের নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব শুধু মৌখিক নয়, ভারত কার্য্যতঃও চীনের প্রতি বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছে। দূরদর্শী শ্রীজওহরলাল নেহেরু সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়া এবং নূতন চীনকে স্বীকার করিবার জন্য অন্যান্য দেশকে আহ্বান করিয়া যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে চীনবাসীদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারত ও চীনের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হইতে যাইতেছে।

সেই দৃঢ়তার ভিত্তিতে চীনে ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশন এবং ভারতে চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সাম্প্রতিক ভ্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা চীনের এই প্রতিনিধিদলকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ভ্রমণের দ্বারা শুধু ভৌগোলিক পরিবেশকে দর্শন করিলেই উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। একদিন চীন-যাজক ফা-হিয়ান ও হিউ-এন্-সাং ভারতে আসিয়া ভারতের মর্ম্মের দিকটিকেই উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ভারতের বোধিদ্রুম হইতে একদিন যে মহামন্ত্র উদ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সুরের প্রসাদ লইয়া চীনা যাজকবৃন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জাতিকে নব দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সে-দিন আর এ-দিন। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় পার্থক্য ঘটিলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভারত আজও তাহার পুরাতন ঐশ্বর্য্য হইতে রিক্ত হয় নাই। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মণীষীদের সাধনার মধ্যে ভারতবর্ষ আবার নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিল। রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি রাজনারায়ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, পণ্ডিত মালব্য—ইঁহাদের সাধনা ও কীর্ত্তি শুধু ভারতবর্ষকেই নয়, সমগ্র

এশিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাহাদের সাধনপীঠ এই ভারতবর্ষ শুধু তাহার ভৌগোলিক পরিবেশের উপরেই দাঁড়াইয়া নাই, তাহার হাজার হাজার বৎসরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই তাহার পরিচয়। সে পরিচয় কেবল কলিকাতা ও দিল্লীর রাজপথে অনুসন্ধান করিলেই মিলিবে না, ভারতের নগরে গ্রামে তীর্থে তীর্থে নানা জনপদের শান্ত সবুজ নির্জ্জনতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে সেই পরিচয়ের স্বাক্ষর। মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রামমুখী জীবনমাত্রই সেখানে নয়, তাহারও উপরে আছে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের জ্যোতিঃ। সেই জীবন ও জ্যোতির সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলে ভারতের সঙ্গে চীনের আত্মিক সংযোগ একান্ত ও দৃঢ় হইয়া উঠিবে না। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে আমরা এই দিকটি সম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

দীর্ঘকাল ধরিয়া চীন ও ভারতকে রাষ্ট্রনীতির বিষাক্ততায় জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ এবং সাধনা—এই ছিল উভয় দেশের সাম্নে একমাত্র পথ। সেই পথে অগ্রসর হইয়াই এই দুইটি মহাদেশ আজ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভিত্তিতে আত্মমর্য্যাদায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। সব দিক হইতেই চীন ও ভারতের একটি নিবিড় সাদৃশ্য রহিয়াছে। সেই নিবিড় সম্বন্ধকে নিবিড়তর করিয়া তুলিতে হইবে। ভারত কর্ত্তৃক নয়া গণতান্ত্রিক চীনকে স্বীকার করিয়া লইবার মূলে রহিয়াছে সেই নিবিড়তা সৃষ্টির আগ্রহ। এই দুইটি মহান দেশের যুক্ত প্রাণধারা ও একাত্ম সাধনা যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীকে নবপ্রাণে উদ্বুদ্ধ করুক্, এই শুধু কামনা।

কলিকাতায় ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ নু'র বক্তৃতা

গত ২৯শে অক্টোবর কলিকাতাস্থিত বর্ম্মী কন্‌সাল অফিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করিয়া ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ নু স্বতস্ফূর্ত্ত ভাষায় যে বক্তৃতা দেন, বর্ত্তমান জাগতিক পরিস্থিতির দিক হইতে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এশিয়ার মৈত্রী ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন, ইন্দোচীনকে স্বাধীনতা দানের প্রশ্ন, ব্রহ্মের জনসাধারণ ও ভূমিসংস্কার সমস্যা, চাউল রপ্তানী, জাপ-শান্তি চুক্তির প্রশ্ন, বর্ম্মী নির্ব্বাচন, কারেণদের স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেই প্রধানতঃ থাকিন্‌নু তাঁহার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখেন।

তিনি বলেন: 'এশিয়ার মৈত্রী ও সংহতি-প্রতিষ্ঠার পথে এশিয়ার বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। ঐ সংহতি স্থাপনে সফলতা অর্জ্জন করিতে কিছু সময় লাগিবে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কতক দেশ এখন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে নাই। যেমন ইন্দোচীন। এশিয়ার সংহতির কোনো পরিকল্পনায় ইন্দোচীনের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আরও প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। এশিয়ার সংহতির রূপ কি হইবে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। এশিয়ার সংহতি প্রতিষ্ঠার যে কোনো পরিকল্পনার প্রতি চীনের যে সমর্থন পাওয়া যাইবে, তাহা নিশ্চিত।'

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তিনি বলেন: 'ব্রহ্মদেশের জনসাধারণ যুদ্ধকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। তাহারা বিগত মহাযুদ্ধে বহু দুর্ভোগ ভুগিয়াছে। বিশ্বশান্তি স্থাপনের যে কোনো প্রচেষ্টায় বর্ম্মী জনসাধারণ একান্তভাবে সহায়তা করিবে। পৃথিবী ক্রমশঃ শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধ হউক—ইহা কেহই চাহে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন কতক লোক আছে, একমাত্র তাহাদের মুখেই যুদ্ধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।'

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে থাকিন্ নু বলেন : 'কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানের পক্ষ হইতে যদি তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ জানান হয়, তবে তিনি আনন্দের সহিত তাহাতে মত দিবেন। ব্রহ্মের ভূমি সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন : 'বর্ম্মী ভূমি রাষ্ট্রীয়করণ আইন' অনুসারে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তথাকার ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ভূস্বামীদের নিকট হইতে জমি লইয়া উহা চাষিদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপের জন্য ভূমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। ব্রহ্মের শিল্পপ্রতিষ্ঠনসমূহও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।' চাউল রপ্তানী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টন। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশীয়ায় বৎসরে প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ হইতে পনের লক্ষ টন পর্য্যন্ত চাউল রপ্তানী করিতেছে।

জাপ-শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশীয়ার প্রধান মন্ত্রিগণের মধ্যে একটি বৈঠক হইবে বলিয়া থাকিন্ নু আশা প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহ কর্ত্তৃক সানফ্রান্সিস্কোতে গৃহীত জাপ-শান্তিচুক্তি অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঐ সম্পর্কে আর কিছু করণীয় নাই। বর্ম্মী নির্ব্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ব্রহ্মদেশে চারিটি পর্য্যায়ে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার মধ্যে দুই পর্য্যায়ের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে; তৃতীয় ও শেষ পর্য্যায়ের নির্ব্বাচন যথাক্রমে আগামী ১৬ই নভেম্বর ও ডিসেম্বরের কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। ১৯৫২ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর মধ্যে নির্ব্বাচনের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কারেণদের সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া থাকিন্ নু বলেন : কারেণ-রাজ্য-আইন অনুসারে কারেণদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া স্থির হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট পপুয়ানের (পূর্ব্ব রেঙ্গুন) কতকাংশ এখন পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের অধিকারে রহিয়াছে বলিয়া কারেণ রাষ্ট্রের সূচনা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা সম্ভব হয় নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত কিছুকাল পর্য্যন্তও ব্রহ্মে কারেণ-বিদ্রোহের ফলে যে ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল কারেণদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-প্রচেষ্টা। থাকিন্ নুর গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কারেণদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকার করিয়া নিয়া বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সুবিবেচকেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইন্দোচীন যদি তাহার ন্যায্য স্বাধীনতার অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে, তবে এশিয়া ফ্রণ্টে যে এক নূতন আলোকসম্পাত ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। থাকিন্ নু'র বক্তৃতার মধ্যে সেই আলোর ইঙ্গিতই রহিয়াছে।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জু

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জু সম্প্রতি তাঁহার রাজন্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র ও আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। গত দীর্ঘ তিন বৎসরে রাজ্যপালের গুরু দায়িত্ব হিসাবে তিনি যে অসাধারণ নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাহা দীর্ঘকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের

পক্ষে দুর্দ্দিনের অমানিশার এখনও অবসান হয় নাই। সমগ্র ভারতের পক্ষেই অবশ্য একথা প্রযোজ্য। দেশের এই দুর্দ্দিনের উল্লেখ করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভাকক্ষে বিদায়ভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ কাটজু বলেন: 'আমরা সঙ্কটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি এবং এমনও হইতে পারে যে, আরও বিপদের দিন আমাদের সাম্‌নে আছে। ভগবান যেন আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার সাহস দান করেন।' এই প্রসঙ্গে তাঁহার আত্মশক্তি ও ভগবৎভক্তিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নানাবিধ আচরণ ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়াই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতীয় ঐতিহ্যের তিনি একজন বিশেষ সাধক। ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া যখন 'হিন্দী' বা 'হিন্দুস্থানী' প্রভৃতির দাবীতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নানারূপ বিতর্ক দেখা দিয়াছিল, তখন তিনিই একমাত্র ব্যক্তি—যিনি ভারতের মূল দেবভাষা 'সংস্কৃত'কে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী তুলিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সেই জটিল বিতর্ক হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন। মত ও আদর্শের পথ হইতে তিনি একটি দিনের জন্যও বিচ্যুত হন নাই।

বাংলা দেশকে তিনি কতখানি ভালবাসিয়াছিলেন, তাহা গত ৩১শে অক্টোবর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁহার বেতার-বক্তৃতা হইতেই উপলব্ধি হইবে। তিনি বলেন: 'এত স্নেহ, আমার ধারণা, আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল! আমার ছাত্রজীবন হইতে আমি ভাবিয়া আসিয়াছি যে, বাংলাদেশ কেবল আমার জন্মভূমির পূর্ব্বখণ্ডই নহে, ইহা হইল সেই দেশ যেখান হইতে সূর্য্যকিরণের মতো আলো উদ্ভাসিত হইয়া লক্ষ লক্ষ গৃহকে আলোকিত করিয়াছে এবং পুরুষানুক্রমে স্বাধীনতার দিকে লক্ষ লক্ষ লোককে পথ দেখাইয়াছে।...' পূর্ব্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের সম্পর্কে তিনি বলেন: 'পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ব্ববঙ্গের অনেক উদ্বাস্তুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইয়াছে। কেহ তাঁহাদের উদ্বাস্তু নামে অভিহিত করুক্, ইহা আমি পছন্দ করি না। উদ্বাস্তুরা আমাদের একান্ত স্বজন। সঙ্কটকালে তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রাতাদের নিকট আশ্রয় লাভের জন্য আসিয়াছেন।...'

ইহা হইতেই ডাঃ কাট্‌জুর দরদী হৃদয়ের পরিচয় সম্যক উপলব্ধি হয়। তিনি বলিয়াছেন—যেখানেই তিনি যান না কেন, তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীর বে-সরকারী প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবেন এবং তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত আশ্বাসের কথা। ডাঃ কাট্‌জুর নতুন মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি

ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলায় স্থায়ী বাঙালী রাজ্যপাল বা গভর্ণর এই প্রথম। এই দিক হইতে ডাঃ মুখার্জ্জির এই পদলাভে বিশেষ একটা ঐতিহাসিক মর্য্যাদা আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বয়সে তিনি প্রবীণ হইয়াও অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতার অধিকারী। এই প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মোন্নতির পথে যে সেই কর্ম্মক্ষমতা পূর্ণভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহা তাঁহার পূর্ব্বাপর কার্য্যাবলী হইতেই অনুমিত হয়। অন্ন-বস্ত্র ও উদ্বাস্তু সমস্যাই আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাবলীর সমাধান

সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই তিনি সচেতন। এই সমস্যাজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য দেশের অন্যান্যদের সহিত তিনিও সরকারের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে চেষ্টা করিবেন ও কাজ করিয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা আশা করি, কোনো প্রতিবন্ধনই সেই প্রতিশ্রুতির পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। এদিক হইতে বাংলায় বাঙালী রাজ্যপালের পক্ষে একটা কঠিন পরীক্ষাও বটে। এ পরীক্ষা তিনি হাসিমুখে উত্তীর্ণ হইলেই রাজ্যপাল হিসাবে তাঁহার প্রকৃত গৌরব। আমরা অবশ্য জানি—সে গৌরবের তিনি অধিকারী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

১৮৭৬ সালে ৩রা অক্টোবর ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৯ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। ১৯১৫ হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত ডক্টর মুখার্জ্জি কলেজ সমূহের ইন্স্পেক্টর ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বোর্ড, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস্ ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। দুইবার ভারতীয় খৃষ্টান পরিষদের তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ মুখার্জ্জি অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এবং বর্ত্তমানে তিনি সংসদের সদস্য ও ভারতের গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া মাদকবর্জ্জন পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ক্যাল্কাটা রিভিয়ু'র তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার 'সাম নন্পলিটিক্যাল এচিভমেন্টস্ অব দি কংগ্রেস', 'কংগ্রেস এ্যাণ্ড দি ম্যাস,' 'এণ্ডিং এ ডেঞ্জারাস ট্রেড,' 'ইণ্ডিয়াস ওপিয়ম পলিসি আণ্ডার বৃটিশ রুল', 'হোয়াই প্রোহিবিশন,' 'হি ফলোজ ক্রাইষ্ট,' প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 'মডার্ণ রিভিউ,' 'ক্যালকাটা রিভিউ,' 'হিন্দুস্থান রিভিউ' প্রভৃতি বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রসমাজের দরদী বন্ধু হিসাবে তাঁহার তুলনা দুর্ল্লভ। তাঁহার বেতনের এক বিরাট অংশ দরিদ্র খৃষ্টান ছাত্রদের সাহায্যার্থ তিনি দান করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য লক্ষাধিক টাকার তিনি বৃত্তির

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনাড়ম্বর, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। দেশে ডাঃ মুখার্জ্জীর ন্যায় মানুষ দুর্লভ না হইলেও খুব বেশী যে নাই, একথা নিশ্চিত। সেই স্বল্পসংখ্যকদের তিনি অন্যতম। তাঁহার আজিকার এই পদমর্য্যাদা তাঁহার সেই সুকীর্ত্তিত জীবনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

কাশ্মীর-গণপরিষদ

গত ৩১শে অক্টোবর বিপুল উদ্দীপনা ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদের উদ্বোধন হয়। রাষ্ট্রিক্ দিক হইতে নিঃসন্দেহে ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ, গত দীর্ঘ চারি বৎসর-ব্যাপী দ্বিধা ও অচল অবস্থা চলিবার পর এবারে যে কাশ্মীরের অধিবাসীবৃন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে নিজেরাই অগ্রণী হইলেন, গণপরিষদের এই অধিবেশন তাহারই সূচনা করিতেছে। ঝিলাম নদী-তীরে শুভ্র ধবল রাজগড় প্রাসাদে গণপরিষদের এই অধিবেশন হয়। পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন মৌলানা মহম্মদ সৈয়দ মাসুদী। কাশ্মীরীদের প্রধান পরামর্শদাতা ও বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল হইতেই খ্যাতিমান। পরিষদের সাম্প্রতিক সদস্য সংখ্যা ৭৫। মৌলানা মাসুদী বলেন: 'লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর ভাগ্য ভেল্কী দিয়া নির্দ্ধারণ করা চলে না। কাশ্মীরীদেরই তাঁহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণের অধিকার রহিয়াছে। কাশ্মীর গণপরিষদ একটি সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। বাহিরের কোনো শক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে এবং আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা।'

অতঃপর গণপরিষদ গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া মৌলানা মাসুদী বলেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে কতকগুলি অত্যাবশ্যক সর্ত্ত পূরনের কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্থান এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। কাজেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে কাশ্মীরীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য গণপরিষদ গঠনের কাজে অগ্রসর হইয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না।—লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই গণপরিষদ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং ইহা সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, গণ-পরিষদ কাশ্মীরের ভারত-অন্তর্ভুক্তির কার্য্যক্রম লইয়া জনসাধারণের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি ভোটারই এই কার্য্যক্রম অনুমোদন করিয়াছেন। মৌলানা মাসুদী বলেন: 'একমাত্র গণপরিষদই চল্লিশ লক্ষ কাশ্মীরীর ভবিষ্যৎ এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নবরূপ নির্দ্ধারণ করিবে।'

পরিষদের প্রারম্ভিক অধিবেশনের পর কাশ্মীর ও জম্মু জাতীয় সম্মেলনের অন্যতম নেতা, রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব উন্নয়ণ মন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদ সাদিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের স্থায়ী অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। মৌলানা মাসুদীই তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল্লা বলেন: 'প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতেই ঈশ্বর বা প্রকৃতির অদৃশ্য হস্ত বর্ত্তমান। কাশ্মীর গণপরিষদের পশ্চাতেও এই অদৃশ্য হস্তের ক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, গণপরিষদের সাফল্য অবধারিত এবং মহম্মদ সাদিকের নেতৃত্বে এই গণপরিষদের সুমহান উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধিত হইবে।'

যে সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর সমস্যার মধ্যস্থতায় বিশেষ তৎপর, ঠিক্ এম্নি সময়ে কাশ্মীর গণপরিষদের এই সংগঠন ও সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা পরিষদে কি প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করিবে, ইতিহাসের দিক হইতে তাহা দেখিবার বিষয়। আর একটি প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যদিও কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি সম্পর্কে গণপরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি কাশ্মীরের পূর্ব্বাপর নীতির দিক হইতে ভারতভুক্তির প্রশ্ন শেষ পর্য্যন্ত আদৌ উঠিবে কিনা, উৎসুক ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই ইহা একটি বিরাট প্রচ্ছন্ন বিষয়। গণপরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান মৌলানা মাসুদীর অভিভাষণে অবশ্য এই দুইটি প্রশ্নেরই উল্লেখ আছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি ভোটারই যে ভারতভুক্তির কার্য্যক্রম অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলানা মাসুদীর ভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলেও দৃঢ় এবং সারগর্ভ। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, একমাত্র কাশ্মীরীদেরই তাঁহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণের অধিকার রহিয়াছে। বাহিরের কোনো শক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে এবং রাজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদের সাম্‌নে কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে আর কি করণীয় রহিল? ডাঃ গ্রাহাম অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছয় সপ্তাহের সময় লইয়াছেন, উক্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়াও প্রায় নিকটবর্ত্তী। অতএব উৎসুক ব্যক্তি মাত্রেই পরিণতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জন্য উদগ্রীব রহিয়াছেন। কিন্তু কাশ্মীরের এই নয়া সিদ্ধান্তকে নতুন করিয়া নাড়া দেওয়া বোধ করি সহজসাধ্য হইবে না। এখন গণপরিষদের সামনে একমাত্র বাকী রহিল গণ-ভোট গ্রহণ। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যে গণপরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কৃতকার্য্যতার ফল লাভ করিবে, তাহা মৌলানা মাসুদীর উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হয়। দুই জাতি-থিয়োরার সমর্থকদের লক্ষ্য করিয়া মৌলানা মাসুদী একটি নাতিদীর্ঘ তথ্য পরিবেশন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান মেজরিটি অঞ্চলেও জাতীয় সম্মেলন বা গণপরিষদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষ দাঁড়ায় নাই। তিনি একথাও দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গণপরিষদের সিদ্ধান্তকে অন্যান্য সমস্ত শক্তিকেই একদিন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

গণপরিষদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ক্রমেই দৃঢ় হইয়া কাশ্মীরের সেই স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত হউক্, আবার সে আত্মমর্য্যাদায় দাঁড়াইয়া আপন সৌন্দর্য্যের দ্বারা বিশ্বকে আকর্ষণ করুক্, সমগ্র দেশের সঙ্গে আমরাও আজ এই কামনাই করি।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।